

মানসী

মর্ষবাণী

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১৩শ বর্ষ—১ম খণ্ড

(কাল্‌কন ১৩৩০—প্রাৰণ ১৩৩১)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্ৰনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল

কলিকাতা

১৬১-এ বিত্তম ষ্ট্রীট, “মানসী” প্রেসে

শ্রীশ্রীতলচন্দ্র তট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩৩১

বাণ্যাসিক সূচীপত্র

(ফাল্গুন ১৩৩০—শ্রাবণ ১৩৩১)

বিষয় সূচী

অজ্ঞতা (সচিত্র)—		উচ্চশিক্ষা ও মধ্যবিত্ত সমাজ...
অধ্যাপক ঐকালীপদ মিত্র		অধ্যাপক ঐহেমচন্দ্র দাশ ও গুপ্ত এম-এ
এম-এ, বি-এল	৪০২, ৪৪৫	খাখের দর ২০০০—
অন্ধগর্ভ (কবিতা)—		ঐক্যকলিতের শ্রী বিহারী এম-এ
ঐকালিদাস রায় বি-এ কবিশেখর	৪৭০	৩১৪, ৩৭৭, ৪৫২,
অবতার প্রসঙ্গ—		একত্র কানন—
ঐহরেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪২	ঐবিবেকর তটীচর্চা বি-এ,
অভাবে (কবিতা)—		কবির কল্পনা (কবিতা)—
ঐভাত্তোব সুখোপাধ্যায়	৫৮	ঐঐপতি প্রসন্ন ঘোষ বি-এ
আত্ম সংঘ—		কলঙ্কিনী (গল্প)—
ঐ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	১৫৩	অনারেবল্ অধ্যাপক ঐধর্মেন্দ্রনাথ মিত্র এম-
আগাধের কথা—		কাণ্ডিতে সুরমতী পূজা—
সম্পাদকীয়	১০৪, ৩১৬	ঐবতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ
আশাহত (গল্প)—		কান্দীর প্রবণ (সচিত্র)—
ঐজগদীশ বাগচেরী	৪২৮, ৫২৫	ঐপূর্ণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল
সার আত্মোব চৌধুরী (সচিত্র)—		কুটাম্ (সচিত্র)—
ঐচাঁকচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল	৪২৪	ঐরমণীমোহন ঘোষ বি-এল, রায় বাহাদুর
আত্মোব সুখোপাধ্যায়—		কুহবর (কবিতা)—
ঐহেমচন্দ্র দ.শ.গুপ্ত	৫৮০	ঐবোপেন্দ্রনাথ সরকার দেবশর্মা
আত্মোব সুখোপাধ্যায়ের অকাল মরণে (সচিত্র)—		কৈলাস পর্বত ও মানসরোভর দর্শন (সচিত্র)—
মহারাজ ঐজগদ্বিন্দ্রনাথ রায়	৪১৭	ঐকালীপ্রসন্ন রায় এম-এ, বি-এল ৩, ১১২,
আত্মোব সুখোপাধ্যায় বিরোধে (কবিতা)—		খাইবর পথে (সচিত্র)—
ঐবল্লভকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪২৩	ঐমদননাথ দে এম-এ, বি-এল
আত্মোব সুখোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে (কবিতা)—		গুপ্ত যুগ ও তৎপরবর্তী কালের মধুরা—
অধ্যাপক ঐপরিমলকুমার ঘোষ এম-এ	৫২০	ঐপুলিনবিহারী দত্ত
আবাড়ে (কবিতা)—		গোহন দূর্গ—
ঐনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৫৬২	ঐদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী

এই সমালোচনা—

ঐক্যমোহন সিংহ রায় বাহাদুর	
ঐক্যমোহন সেন রায় বাহাদুর, "কান্তি" প্রভৃতি	১০৩, ২০৫, ৪১৫, ৬১৫
চেতন ও অচেতন বাদ—	
ঐনগেননাথ হালদার এম-এ, বি-এল	১৬৭
অগ্নি (গল্প)—	
ঐক্যমোহন দেবী	২২৬
জীবনবাহুর পরলোক গমন (গল্প)—	
ঐক্যমোহন বিতাবতী ঘোষ	৪৮
জীবন-সন্ধ্যায় লক্ষ্মীবাঈ (সচিত্র)—	
ঐক্যমোহন মুখোপাধ্যায়	৮৪
জৈন সাহিত্যে রায় কথা—	
ঐক্যমোহন শীল এম-এ	১২২
কলা বরণ (কবিতা)—	
ঐক্যমোহন সরকার	৫১৭
টিক্‌টিক (গল্প)—	
ঐক্যমোহন গঙ্গা রায় এম-এ	৫১৮
জীর্ণকর মহাবীর খানী—	
ঐক্যমোহন শীল এম-এ	৩২৮
জীর্ণকর পত্র—	
ঐক্যমোহন আচার্য	২১৬
দর্শন—	
অনারবল অধ্যাপক ঐক্যমোহন মিত্র	
এম-এ	২৩১
হারার হৃদয় (সচিত্র)— মহারাজ ঐক্যমোহন রায়	
২৮৮, ৬৪৪, ৪৭৬, ৫৮৭	
হৃদয়ের শব্দ (গল্প)— ঐক্যমোহন তট্টোপাধ্যায় বি-এ	১৭৪
হৃদয়ে এস (কবিতা)—	
৮জীবনকুমার দত্ত	৩২০
দৈনিক নিজা দীর্ঘ নিজা ও যোগ নিজা—	
ঐক্যমোহন রায় এম-এ, বি-এল	১৮১, ৩৫১
দগ্ধাঙ্গ (উপভাস)—	
ঐক্যমোহন তট্টোপাধ্যায় ২২৫, ৩২৬, ৫৮৫, ৫৩৮	

নববর্ষের আরাধন (কবিতা)—

ঐক্যমোহন তট্টোপাধ্যায় কাব্যব্যাংকরণার্থ	২৮৮
নারী (কবিতা)—	
ঐক্যমোহন তট্টোপাধ্যায়	৩৭৬
নারীর মন (গল্প)—	
ঐক্যমোহন শ্রীমতী শ্রীমতী সেন	৫৪২
নির্ভর (কবিতা)—	
ঐক্যমোহন বটক এম এ	২২৬
নীলকণ্ঠের তাই ওলকণ্ঠ (গল্প)—	
ঐক্যমোহন ঘোষ	৪৫৫
পতিতার কাচিনী (গল্প)—	
ঐক্যমোহন ঘোষ	৩৩৬
পরিচয় (গল্প)—	
ঐক্যমোহন তট্টোপাধ্যায়	৩৬৩, ৪৭০
পোষ্টমাস্টার (গল্প)—	
ঐক্যমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৬৩, ৪৭০
বি এ বাদ-এট-ল ১৮৪	
প্রাণে কুমুদমালা—ঐক্যমোহন শ্রীমতী শ্রীমতী বসু	৪৫০
প্রাচ্য ও প্রত্যাচ্য—	
ঐক্যমোহন রায় চৌধুরী	৪৩৩, ৫০২
প্রাণের দরদ (কবিতা)—	
ঐক্যমোহন তট্টোপাধ্যায়	৩৬৩
বন্ধিমোহন ও বালালার ইতিহাস—	
ঐক্যমোহন চন্দ্র বি-এ	৪৬৩, ৫০৩
বন্ধিম বাবুর আমগাছ চুরি—	
ঐক্যমোহন তট্টোপাধ্যায়	৬০২
বঙ্গনারী (কবিতা)—	
ঐক্যমোহন তট্টোপাধ্যায়	৫৭২
বর্তমানের কথা—	
ঐক্যমোহন শ্রীমতী শ্রীমতী বসু	১৫৬
বাণীর হৃদ (কবিতা)—	
ঐক্যমোহন তট্টোপাধ্যায়	১২২
বাসি মালা (কবিতা)	
ঐক্যমোহন রায়চাঁদ দত্ত	১৩০

বিপ্লব গদ্য (গল্প)

ঐ প্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এল

বিরহ (কবিতা)—

ঐ কালিদাস রায় বি-এ কবিশেখর

বেদনার সুর (কবিতা)

ঐ সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বৈশাখ (কবিতা)—

ঐ হরিশঙ্কর বৈষ্ণব এম-এ

বুদ্ধদেব প্রচারে বাণী—

ঐ বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ ডাঃ বর্তমান ১২৬

ভগ্নের সার্থকতা (গল্প)

ঐ মতী বৈদ্যনাথ বোম্ভার

ভুবন ভুগান হাসি (কবিতা)—

ঐ কালিদাস রায় বি-এ কবিশেখর

ভূমিকম্পে জাপানের কতিবুদ্ধি—

ঐ অরুণীকুমার দে

মানসী (কবিতা)—

ঐ রামেন্দু দত্ত

মিলন-পথে (উপভাস)—

ঐ মতী সরোজবাসিনী গুপ্তা

মূর্তি ও মন্দির (সচিত্র)—

ঐ রমা প্রসাদ চন্দ্র বি-এ

শক্তিভক্তি (কবিতা)—

ঐ স্বতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

শিকার ও শিকারী (সচিত্র)

ঐ ব্রজেননাথ রায় আচার্য্য চৌধুরী

৩৫, ১৪২, ৩২৫, ৫০৪,

শিবাজী মহারাজের পটুগীজ অণুবাদ—

অধ্যাপক ডাক্তার ঐ স্বরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ,

শি-এইচ-ডি, প্রেসিডেন্ট-স্টাডি ক্লাব

শেখ গদ্য (গল্প)—

৩৯০ ঐ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ রামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র—

ঐ শরচ্চন্দ্র বোম্ভাল এম-এ, বি-এল

ঐতিহ্য (সচিত্র)—

মহারাজ ঐ জগদ্বিন্দ্রনাথ রায়

৭৭, ১৩০, ২৫২, ৩৫২, ৪২৩, ৬০৯

সত্যবাণী (উপভাস)—

ঐ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ বার-এট-ল

২১, ১২৮, ৪০৭, ৫১২

সদাচার—

ঐ প্রবোধচন্দ্র বোম্ভ

সন্ধ্যা (কবিতা)—ঐ লবিনাশচন্দ্র বসু

সবাই সমান (কবিতা)—

ঐ দীনেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা—

ঐ চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি-এল

সম্মানরক্ষা (গল্প)—

ঐ স্বতীন্দ্রকুমার তৌমিক

সার্থকতা (কবিতা)—

ঐ মতী শিলাবতী বসু

সাহিত্য—রায় বাহাদুর ঐ জলধর সেন

সাহিত্য সমাচার—

সাহিত্যে সুর ও কু—

ঐ স্বতীন্দ্রমোহন সিংহ বি-এ রায় বাহাদুর.

সুশোচনার ভারেরি (গল্প)—

ঐ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

হাসি (কবিতা)—ঐ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুধর্মের ভিত্তি—

অধ্যাপক ঐ বনেন্দ্রনাথ বসু এম-এ

১

লেখক সূচী

শ্রীঅবনীকুমার দে—		শ্রীঅগনীশ বাগপেদী—আশাহত (গল্প)	৪২৮, ৫২৫
ভূমিকম্পে জাপানের কতিবুদ্ধি	৬১২	রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন—	
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম-এ—সূচ্য (কবিতা)	৫৪২	সাহিত্য	৩০৬
শ্রীঅমৃতলাল শীল এম-এ—ঐক্য সাহিত্যে রামকথা	১২২	গ্রন্থ-সমালোচনা	৬১৫
তীর্থঙ্কর মহাবীরবাণী	৩২৮	শ্রীঅম্বিকুমার দত্ত—	
শ্রীআত্ততোষ সুখোপাধ্যায়—		হুলবে এস (কবিতা)	৩২০
অতাবে (কবিতা)	৮	শ্রীঅ্যোতিষিনাথ ঠাকুর—	
শ্রীকালিদাস রায় বি-এ কবিশৈল—		শেখ পদী (গল্প)	৫২
বিরহ (কবিতা)	২০	শ্রীদিগ্বির রায় চৌধুরী—	
ভূবনভুলানো হাসি (কবিতা)	৩২২	গোবিন্দ চূর্ণ	১২
অন্ধগর্ভ (কবিতা)	৪৭০	প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	৪৩৩, ৫৩২
অধ্যাপক শ্রীকালীপদ দিগ্গ এম-এ, বি-এল—		শ্রীদীনেশচন্দ্র লাহিড়ী—	
অজ্ঞতা (সচিত্র)	৪০২, ৪৪৫	সবাই সমান (কবিতা)	৩২০
শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় এম-এ, বি-এল—		শ্রীদেবেন্দ্রনাথ হালদার এম-এ, বি-এল—	
কৈলাসপর্বত ও মান সরোবর দর্শন	৬, ১২২, ৫৫৪	চেতন ও অচেতন বাদ	১৬৭
শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী এম-এ বিজ্ঞানজ্ঞ—		শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—আবাহু (কবিতা)	৫৬২
কংকনের স্মৃতিবাণী	৩১৪, ৩৭৭, ৪৫২, ৫৬৩	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় এম-এ—	
অনার্যবল অধ্যাপক শ্রীধেনুনাথ মিত্র এম-এ—		টিক্‌টিক (গল্প)	৫১৮
কলঙ্কিনী (গল্প)	৫২	অধ্যাপক শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ এম-এ—	
দর্শন	২৩১	শ্রীআত্ততোষ সুখোপাধ্যায়ের	
শ্রীমুখী গিরিবাণী দেবী—		মহাপ্রাণে (কবিতা)	৫২০
অগাই (গল্প)	২২০	শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ—	
শ্রীচন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল—		পতিতার কাহিনী (গল্প)	৩৬৬
সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা	৩৭১	নীলকণ্ঠের ভাই ওলকণ্ঠ (গল্প)	৪৫৫
সার আত্ততোষ চৌধুরী (সচিত্র)	৪২৪	শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত—	
মহারাজ শ্রীঅগদ্বিন্দ্রনাথ রায়—ঐতি-স্মৃতি (সচিত্র)		অপুংগ ও ভৎসনবর্তীকালের	
৬৭, ১৩০, ২৫২, ৩৫৫, ৪২৩, ৬০১		মধুরা (সচিত্র)	৩৮০, ৫২৪
দারার দুঃদৃষ্ট (সচিত্র)	২৮৮, ৩৪৪, ৪৭৬, ৫৮৭	শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল—	
আত্ততোষ-সুখোপাধ্যায়ের		কান্দীর স্রবণ (সচিত্র)	৬০৭
অকাল বরণে (সচিত্র)	৪১৭	শ্রীপ্রহরকুমার মঙ্গল বি-এল—	
		বিদ্রবপদী (গল্প)	৩২০

ঐ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ—

সদাচার ৭৪

আত্মসংযম ১৫২

ঐ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল—

সত্যবাণী (উপভাস) ২১, ১২৮, ৪০৭, ৫১২

পোষ্টমাস্টার (গল্প) ১৮৪

ঐ মতী প্রমীলা সেন—

নারীর মন (গল্প) ৫৪২

ঐ কবিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

গরিচর (গল্প) ৫৮৩, ৪৭০

ঐ অধ্যাপক ঐ বনভদ্রারীলাল বসু এম-এ—

হিন্দুীর হিন্দু ১

ঐ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—

৮ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিমো-গ (কবিতা) ৪২৩

ঐ বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ—

নব বর্গের আবাহন (কবিতা) ২২৮

ঐ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—

হাসি (কবিতা) ৪১৪

ঐ মতী বিভাবতী ঘোষ—

জীবনবাবুর পরলোক গমন (গল্প) ৪৮

ঐ বিকৃতিভূষণ ভট্টাচার্য্য—

নারী (কবিতা) ৩৭৬

ঐ বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়—

জীবন মুখ্যার লক্ষ্মীবাঈ (সচিত্র) ৮৪

ঐ বিমানবিহারী হকুমদার এম-এ ভাগবতরত্ন—

বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বাঙ্গালী ৩২৩

ঐ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ,—

একাত্তর কানন ৫২১

ঐ ত্রৈলোক্যনাথরায় আচার্য্য চৌধুরী—

শিকার ও শিকারী (সচিত্র) ৩৫, ১৪২,

৩২৪, ৫০৪,

ঐ মতী তত্বত্বা হার্ড—

বীণীর গুর (কবিতা) ১২২

ঐ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়—

স্বলোচনার ডায়েরি (গল্প) ১০৮

নগবালা (উপভাস) ২২৫, ৩৩৬, ৪৮৫, ৫৮

বকির বাবুর আদর্শ চুরি ৬০২

ঐ মনমোহন দে এম-এ, বি-এল—

খাইবর পথে (সচিত্র) ১৬

ঐ মণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ—হঃশ্বেত শেখ (গল্প) ১৭৪

ঐ মতীপ্রকুমার ভৌমিক

সন্ধান রক্ষা (গল্প) ৪৩৮

ঐ মতীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—

শক্তিভক্তি (কবিতা) ১২২

ঐ মতীপ্রমোহন বাগচী বি-এ—

কালিতে সরস্বতী পূজা ৯২

ঐ মতীপ্রমোহন সিংহ বি-এ রায় বাহাদুর—

এক-সমালোচনা ২০৬

সাহিত্যে গু ও কু ৩১৭

ঐ বোমেননাথ সরকার দেবশর্মা—

কুহবর (কবিতা) ৪৫৮

ঐ রমণীমোহন ঘোষ বি-এল, রায় বাহাদুর—

কুটালম্ (সচিত্র) ১৪৩

ঐ রমা প্রসাদ চন্দ্র বি-এ—

সুষ্ঠি ও মন্দির (সচিত্র) ২৬৫

বক্তৃতা ও বাঙ্গালার ইতিহাস ৪৬৩, ৫৫৩

ঐ মতী রাধারাম দত্ত—

বাসি মালা (কবিতা) ১৩০

ঐ রামেন্দু দত্ত—

মানসী (কবিতা) ৪৮৫

ঐ শরচ্চন্দ্র আচার্য্য—

তীর্থযাত্রীর পত্র ২১৬

ঐ শরচ্চন্দ্র বোমাল এম-এ, বি-এল—

ঐ রামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র ২০২

ঐ শশধর রায় এম-এ, বি-এল—

দৈনিক নিজা দীর্ঘনিজা ও যোগনিজা ১৮১, ৩৫১

ঐ মতী শিলাবতী বসু—গার্গ্যকতা (কবিতা) ৫১১

ঐশ্বরী শৈলবালা বোম্ভারী—		ঐশ্বরী সরোজবাসিনী গুপ্তা—	
ভক্তের সার্বকতা (গল্প)	২৭৮	মিলন-পথে (উপভাস)	২৫, ১৬১ ২৪৫
ঐশ্বরীপ্রতিপ্রসন্ন বোম্ভ বি-এ,—		ঐশ্বরীপ্রসন্ন বোম্ভ—	
কবির কল্পনা (কবিতা)	৫৬১	অবতার প্রসঙ্গ	৪২
ঐশ্বরীপ্রমোদন চট্টোপাধ্যায়—		অধ্যাপক ডাঃ ঐশ্বরীপ্রসন্ন সেন এম-এ,—	
সেদনার সুর (কবিতা)	১০৮	পি-এইচ ডি, প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি কলার	
প্রাণের দরদ (কবিতা)	৩৮৩	শিবাজী মহারাজের গুটুগী	
বঙ্গনারী (কবিতা)	৫৭২	অপবাদ	১০৫
ঐশ্বরীপ্রমোদন সরকার—বঙ্গবরন (কবিতা)		ঐশ্বরীপ্রমোদন সরকার এম-এ—	
সম্পাদকীয়—		নির্ভর (কবিতা)	২২৬
আমাদের কথা	১০৪, ৩১৬	ঐশ্বরীপ্রমোদন সরকার এম-এ—	
সাহিত্য-সংবাদ	২০৮	বৈশাখ (কবিতা)	৩১৬
গ্রন্থ-সমালোচনা	৬১৬	অধ্যাপক ঐশ্বরীপ্রমোদন সরকার এম-এ—	
ঐশ্বরী সরস্বতী বসু—		উচ্চশিক্ষা ও মধ্যবিদ্য সমাজ	৭১
বর্তমানের কথা	১৫৬	৮ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৫৮০
প্রাণে কুস্তমেল	৪১০		

চিত্র সূচী

অক্ষ ভিখারী (রঙীন)—		প্রাচীন যুরোপীয় নৃত্য প্রথা—	
ঐশ্বরীপ্রমোদন চক্রবর্তী	২০৮ পৃঃ সমুদ্রে	ফ্রান্স । "মিহুরে দ'লা কু" নৃত্য	২১ পৃঃ
৮ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—	৪১২ পৃঃ	ইটালী । নিরাপলিট্যান নৃত্য	২২ "
প্রাচ্য নৃত্য—হিন্দুস্থানী শাল নৃত্য	১৪৭	স্পেন । কান্সাগো নৃত্য	২৩ "
তুর্কী সাহাবান নৃত্য	১৪৮	গ্রীস । আতোর ওয়াল্টজ নৃত্য	২৪ "
দেবী বীণাপাণি (রঙীন)—ঐশ্বরীপ্রমোদন সরকার		নন্দির পথে (রঙীন)—	
নীলমণি (রঙীন)—		ঐশ্বরীপ্রমোদন সরকার	৪১৬ পৃঃ সমুদ্রে
ঐশ্বরীপ্রমোদন সরকার	১০৪ পৃঃ সমুদ্রে	সিদ্ধপ্রমোদন সরকার—	
পরীরুদ্ধ (রঙীন)—	৩১৬ " "	সিদ্ধপ্রমোদন সরকার—	
পূজারিণী (রঙীন)—ঐশ্বরীপ্রমোদন সরকার	৫২০ পৃঃ সমুদ্রে	৫৫২ পৃঃ সমুদ্রে	



দেবী বাণাপা.

চিত্রকর—শ্রী.বিজুতি ব্রহ্মণ দায় ।

মানসী মর্মনবাণী

১৬শ বর্ষ }
১ম খণ্ড }

ফাল্গুন, ১৩৩০

{ ১ম খণ্ড
{ ১ম সংখ্যা

হিন্দুবীর হিমু

প্রবল-প্রতাপ আকগান সম্রাট শের শাহের পুত্র সেলিম শাহ সুর বা ইসলাম শাহ নয় বৎসর কাল নিরুর্জ্বাদে রাজ্যশাসন করিয়া ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে গোয়া-লিয়র নগরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হিন্দুত্বের সর্বত্র যে বিপ্লব এবং গৃহবিবাদ ভীষণ দাবান্ধির মত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তাহাতে সুর-বংশ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। শের শাহ কর্তৃক বিতাড়িত মোগলগণও সেই সুযোগে তাঁহাদের দ্রুতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। ১৫৫৪ হইতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অরাজকতা এবং বিপ্লব অবিরাম চলিয়া অবশেষে দ্বিতীয় পাদিশাহের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। এই দুই বৎসর কালের অবিপ্রান্ত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে যে হিন্দু বীরের তেজোদীপ্ত উন্নত শির আমাদের আনন্দ নরনের সমক্ষে দেখিতে পাই, বিবেচ এবং অবজ্ঞার তীব্র বিব উদ্গরণ করিয়াও মোগল-ঐতিহাসিকগণের লেখনী দ্বারা কীর্তিতাতি স্নান করিতে

পারে নাই, তাঁহার নাম হিমু। কেবলমাত্র দুই বৎসরের অল্প হিন্দুত্বের রক্তিনৈতিক গগনে একটি সমুজ্জল গ্রহের মত আবির্ভূত হইয়া, হিমু আকগান এবং মোগলদিগকে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে এই হিন্দু বীর হিমুই মোগলকেশরী কিশোর বরক আকবরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, আকগানগণ নয়।

জংঘের বিষয় ভারতবর্ষের মুসলমান-যুগের ইতিহাসে হিমুকে তাঁহার যশোপবিত্র স্থান দেওয়া হয় নাই। কোনও কবির কাব্যে কিংবা ঐতিহাসিকের ইতিহাসে তাঁহার কীর্তিকাহিনী বিস্মৃত হয় নাই। রাজপুত-বীরত্ব কাহিনী পাঠ করিতে করিতে গর্বে আমাদের বক্ষ স্ফীত হয়, প্রতাপসিংহের গৌরব গাথা গাঠিতে আমাদের রসনা শতমুখী হইয়া উঠে, কিন্তু আমরা অনেকেই ভয়ত এই অকুণ্ডলকর্মী হিন্দু বীরের নাম ব্যতীত তাঁহার জীবন-বিবরণের আর কিছুই অবগত নহি। অথচ, মনুষ্য না হউক, শৌর্য্য এবং প্রতিভার তারতম্য বধ্যসূত্রে এই

হিন্দু বংশের কোন রাজপুত্র বীর অথবা সৈন্য হইবে না। দিল্লীর শেষ হিন্দু অধীশ্বর বলিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অসম্ভব হইবে না।

২

সেলিম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ফিরোজ রাজকাজিসক্ত হইয়া, দুই দিবস পর তাঁহার মাতুল সুবাহিরজ খাঁর হস্তে অতি 'নির্দয়ভাবে' মৃত্যু হয়। কথিত আছে, সুবাহিরজ তাঁহার ভগিনীর অঙ্গের বহলে প্রবেশ করিয়া শিশু সন্তানটিকে তাঁহার মাতৃ অঙ্গ হইতে ছিনাইয়া লইয়া স্বহস্তে নিধন করে। এই শিশুহত্যা, রাজ-রক্ত-রঞ্জিত হস্তে রাজকণ্ড খারণ করিয়া মহম্মদ শাহ আদিল নামে পরিগৃহণ করে। ঐতিহাসিক সুবাহিরজ খাঁ, মহম্মদ শাহ আদিল কিংবা আদালি নামে পরিচিত। আদিল নিরাকর, চরিত্রহীন এবং অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন। সম্রাট এবং লিখিত 'আমীর ওমরাহদের সংসর্গ' পরিত্যাগ করিয়া তিনি সর্বদা নীচজাতীর অশিক্ষিত পার্শ্বচর্য্যে কলঙ্কক পতিত থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রিয়-পাত্রীগণের জন্ত এবং নিজের ইঞ্জিয়লালসা চরিতার্থতার জন্ত রাজকোষে সর্বদা উন্মত্ত ছিল। 'রাজকাষ্যের সহিত তাঁহার বড় একটা সংশ্রব ছিল না। বংশমর্যাদাটান, হিন্দু বণিক হিমুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। উচ্চবংশোদ্ভূত হইলে হিন্দু হস্তে আদিলের প্রিয়পাত্র হইতে পারিতেন না। নীচবংশজাত হওয়াতেই যে তিনি আদিলের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইতে কিংবদন্তিরাণে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় সন্দেহ নাই।

মেওয়ার্ট (১) অকলে 'মেওয়ারী' নামক স্থানে হিমুর পৈতৃক নিবাস ছিল। হিমু পূর্বে সোরা বাবসারী ছিলেন; এবং কথিত আছে যে দিল্লীতে তাঁহার একটি দোকান ছিল। সেলিম শাহের রাজত্বকালে তিনি দিল্লীর গাট

বাজার অর্থাৎ পুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বংশগৌরব কিংবা শারীরিক সৌন্দর্য্য তাঁহার কিছুই ছিল না। ভাতিতে তিনি নিয়শ্রেণীর বণিক ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, তিনি কুৎসিত এবং খর্ষাকৃতি ছিলেন এবং এত দুর্বল ছিলেন যে অস্বাভাবিকের শক্তিও তাঁহার ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পক্ষীর ভিতর হইতে কিংবা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পৈতৃক পরিচালনা করিতেন। অথচ এই স্বাধীন, নীচজাতীয় বণিক, দিল্লীর আদিলের প্রধান মন্ত্রী এবং সেনাপতি ছিলেন। মানুষকে যদি তাঁহার আকৃতি এবং অবয়ব দেখিয়া বিচার করিতে হয় তাহা হইলে গোক্রাটিসও সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হন। হিমুর ক্রোধবোধ এবং কুৎসিত আকৃতির অন্তরালে যে মানসিক তেজ ও অদম্য শক্তি লুক্কায়িত ছিল, সেই শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে তৎকালে ভারতবর্ষে কাহারও সামর্থ্য ছিল না। যে আবুল ফজল তাঁহাকে শঠ এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতাপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন নাই, তিনিই আবার তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছেন।

আদিলের অমিতব্যয়িতা এবং হিমুর উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস এং অশেষ অসুগ্রহ, আফগান আমীর-দিগের ভিতর যথেষ্ট অনন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। আদিল এবং হিমুর বিরুদ্ধে চারিদিকে যুদ্ধবন্দ চলিতে লাগিল। সেকেন্দর খাঁ নামক একজন আফগান যুবক একদা সম্রাটকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ছুরিকা হস্তে তাঁহার পশ্চাদ্ভাবন করিয়াছিল। সম্রাটের পার্শ্বচর্য্যে ভাৎসকমে আক্রমণকারীকে পর্যাস্ত করিয়া তাহার প্রাণনাশ করতঃ আদিলের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। তাজ খাঁ কর্ণাণী নামক অপর একজন আফগান আমীর সম্রাটের পুত্রপ্রপৌত্র বিদ্রোহ বোধনা করিল। এদিকে রাজধানীতেও আদিলের জীবন অত্যন্ত দকটাপন্ন হইয়া উঠিল। তাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া আদিল ও হিমু তাহাকে চুনারের নিকট পরাস্ত করিলেন। কিন্তু

(১) বর্তমান মধ্যা মিলা এবং ভারতপুং ও আলোরারের অংশবিশেষ।

সম্রাটের দিল্লী পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীলক ইব্রাহিম খাঁ দিল্লী এবং আশ্রা দখল করিয়া বসিলেন। আদিল, ইব্রাহিমকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করিতে অক্ষম হইয়া চুনার সহয়ে রাজধানী স্থাপন করিলেন। আফগান সম্রাটের কেবলমাত্র পূর্ব কামেশগুলি আদিলের করতলগত রহিল।

৩

ইব্রাহিমের ভাগে রাজ্যভাগ বেশীদিন ঘটল না। আহম্মদ খাঁ নামক শের শাহের কনৈক আখীর সেকেন্দর শাহ নাম ধারণ করিয়া পত্রাবে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং 'কাবী' নামক স্থানে ইব্রাহিমকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আশ্রা হস্তগত করিলেন। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্যচ্যুত মোগলসম্রাট হুমায়ূনের ভারত আক্রমণের সংবাদ পাইয়া, সেকেন্দর দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজা করিতে বাধ্য হইলেন। এই সুযোগে ইব্রাহিম দিল্লী পুনরাধিকারকরে সঠিক 'কাল্পী' পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এদিকে আদিল ও তাঁহার স্ত্রীলক উজ্জ্বরের আশ্রম একদল সৈন্য সহ হিন্দুকে চুনার হইতে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। কাল্পীতে হিন্দুর হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া ইব্রাহিম 'বারনা' নামক স্থানে জাশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং হুমুও ইব্রাহিমের পশ্চাদ্ভাবন করতঃ বারনা অবরোধ করিলেন। (২) কিন্তু হঠাৎ বজ্রধ্বনি সহস্র শব্দে অসুস্থের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া হিন্দু বারনা পরিত্যাগ করিয়া সঠিক চুনারে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইতিমধ্যে হুমায়ূন কুত্র একদল সৈন্য সহ কাবুল হইতে বহির্গত হইয়া ভারতভিত্তিতে অভিযান করিয়াছিলেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সিদ্ধনদ অতিক্রম করিয়া হুমায়ূন তাঁহার প্রধান সেনাপতি বাইরাম খাঁকে অলঙ্কারে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে

লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শতদ্রু তীরে বাইরাম সেকেন্দরের সেনাপতিগণকে পরাভূত করিয়া সারহিন্দ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এখান সেকেন্দর স্বয়ং এক বিরাট বাহিনীসহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ইতিমধ্যে হুমায়ূন সপুত্র বাইরামের সহযোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মিলিত মোগল বাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া সেকেন্দর 'শিবালিন্দ' পর্বতভিত্তিতে পলায়ন করিলেন। দীর্ঘ পনের বৎসর নির্বাসনের পরে জুলাই মাসে হুমায়ূন দিল্লীতে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। পিতৃরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া হুমায়ূন তাঁহার সহায়তাকারী প্রধান প্রধান মোগল সেনাপতিগণকে যথেষ্টরূপে পুরস্কৃত করিলেন। বাইরাম খাঁ প্রচুর ধন সম্পত্তি পাইলেন। তাদ্রোবেগ খাঁ দিল্লীর শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে হুমায়ূন বাইরাম খাঁর তত্ত্বাবধানে তের বৎসরের বাগক যুবরাজ আকবরকে পঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া, পলাতক আফগান নারক সেকেন্দর শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আকবর 'সারহিন্দ' উপস্থিত হইয়া সেকেন্দরের উদ্দেশে 'হারিয়না' নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। (৩) 'হারিয়না' হইতে কালানাউদের পথে তিনি তাঁহার পিতার শৌচনীর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। ২৫শে জানুয়ারী হুমায়ূনের ঘটনাস্থল বিচিত্র জীবনের শেষ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রকাগার 'শের মঙ্গলের' ছাদ হইতে নারিবীর পথে হঠাৎ পদাঙ্গন হওয়ার হুমায়ূন সিঁড়ির উপর পতিত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন এবং অল্প কয়েকদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন। সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বাইরাম খাঁ অবিলম্বে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যুবরাজ আকবরকে 'কালানাউদে' রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন।

(৩) ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দর আকবরের বসন্তাধিকার করেন এবং পরে সম্রাট কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়া তথায় প্রণত্যাগ করেন।

(১) নানাদিকার ভাণ্ডাবিপণ্যের পর ইব্রাহিম খাঁ ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণে পতিত হন।

৪

এদিকে আদিল এবং হিমু, বজের শাসনকর্তা মর্দুশ শা সুরের বাতিনী 'কাপড় বাটার' যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া বঙ্গদেশ পুনরায় ভগ্নগত করিলেন। চুনারে প্রত্যাগমন করিয়া আদিল হুমায়ূনের মৃত্যুসংবাদ শুনিতে পাইলেন এবং কালাবিলম্ব না করিয়া জিৎসহস্র সশস্ত্র সৈন্য এবং দেক সহস্র হস্তী সহ হিমুকে আগ্রাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। বিরাট বাহিনীসহ হিমুর যুদ্ধ যাত্রার বার্তা শ্রবণ করিয়া মোগলগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। আগ্রার শাসনকর্তা আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আশ্রয় লইলেন। হিমু অক্লেশে আগ্রা অধিকার করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। দিল্লীর শাসনকর্তা তাদ্দীবগ খাঁ পুরাতন দিল্লীর নিকট হিমুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 'সারহিন্দে' বাইরাম এবং আকবরের নিকট পলায়ন করিলেন। দিল্লী হিমুর করতলগত হইল।

দিল্লী এবং আগ্রার পতন সংবাদ শুনিয়া 'সারহিন্দে' মোগল সৈনিকগণ অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, তাদ্দীবগ দিল্লী রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন নাই। যাহা হউক, হিমুর হস্তে দিল্লী সমর্পণ পূর্বক 'সারহিন্দে' পলায়ন করিয়া তিনি যে মূর্থতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার ফলে মোগলগণ অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। পাছে এই অবসাদ সৈন্যদিগের ভিতর বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করে, এই ভয়ে বাইরাম তাদ্দী বেগকে হত্যা করাইয়া সৈন্যদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন। (৪)

আকবর তাদ্দী বেগের হত্যার বাণীর কিছুই অবগত

ছিলেন না এবং তাঁহার অভাবক বাইরামও এই বিষয়ে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। তাদ্দীর হত্যাকালে আকবর পক্ষী শিকারে ব্যাপৃত ছিলেন। শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া বাইরামের মুখে তাদ্দীর শাস্তির কথা শুনিলেন এবং সাময়িক প্রয়োজনে ঐ হত্যা সাধিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার অভিভাবককে ক্ষমা করিলেন। বাইরামের কার্যে অনুমোদন করা ভিন্ন আকবরের তখন যে অস্ত্র উপায় ছিল না তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

অতঃপর ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ধারণের জন্য মোগল সেনাপতিদের এক সভা আহূত হইল। অনেকেই কাবুলে আগ্রার গ্রহণ করার পরামর্শ দিল, কিন্তু বাইরাম খাঁ এই পরামর্শ কাপুরুষোচিত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উপদেশ দিলেন। আকবর তাঁহার অভিভাবকের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। অবিলম্বে মোগলবাহিনী খানেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল।*

৫

হিমু এদিকে দিল্লী এবং আগ্রা অধিকার করিয়া, রাজা বিক্রমজিৎ উপাধি ধারণ করিলেন এবং রাজার ভ্রাতা প্রজাপ্রাসন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, তিনি স্বীয় নামে মুদ্রা পর্য্যন্ত প্রচলন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার প্রভু আদিলের সহিত পজব্যবহারে তিনি তাঁহার রাজ্যাধিকারের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ করিতেন না। বরঞ্চ আদিলের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও আনুগত্যের কথাই পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিতেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই কারণে হিমুকে বিশ্বাস-যাতক ও প্রবঞ্চক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য প্রঞ্জন! অপরাধ হইতে হিমুকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমাদের মতরাণী উচিত যে, হিমু একজন নিষ্কামধর্ম্মাংশলী সন্ন্যাসী অথবা আদর্শপুরুষ ছিলেন না। তাঁহাকে আমরা একজন রাজ্যলোলুপ, প্রতিজ্ঞা-শালী সৈন্যধাঙ্ক রূপেই দেখিব। হরতঃ তিনি হিন্দু-

৪। কোনও কোনও ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে শুধু কর্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া বাইরাম ঐ কার্য করেন নাই। মোগল সৈনিকদিগের মধ্যে তাদ্দীবগ খাঁ একজন প্রতিপত্তিশালী কণ্ঠস্বরী ছিল এবং সে বাইরামের প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল। কর্তব্যের আবহাওয়াতে বাইরাম এই সুযোগে তাহার প্রাণবধ করিয়া নিজেকে নিষ্কণ্টক হইলেন।*

রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার করণা করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের
তাৎকালীন অবস্থায়, ছলে বলে পরাধীন অধিকার করা
তেমন দূর্বীর ছিল না। তরবারিই তৎকালে ভারতের
একমাত্র ভাগাবিধাতা ছিল। হিমুর জার একজন শক্তি-
সম্পন্ন ব্যক্তি, আদিলের মত মুর্থ এবং অকর্মণ্য প্রকৃ-
ত দাস ও আত্মগত অধিকদিন স্বীকার করিতে পারে
না।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ও আগ্রার ভীষণ ভূর্জিক
দেখা দিল। শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল।
হিমু ভূর্জিকপীড়িত লোকদিগের হৃদয় প্রাতি দুঃপাত
না করিয়া, নিজের সৈন্যদিগের অস্ত্র শস্ত্র খাতিয়া
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক বাবাউনী,
হিমুর এই নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্রের
তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। হিমুর এই কার্যের
পোষকতা না করিয়া আমরা একথা বলিতে পারি
যে, ভূর্জিকপীড়িত লোকদিগের হৃদয় মোচন করিতে
গেলে তাঁহাকে সৈন্যবলের মারা পরিত্যাগ করিতে
হইত। তিনি নিজে হিন্দুধর্মাবলম্বী, কিন্তু তাঁহার
সৈন্যগণ অধিকাংশই মুসলমান। এই মুসলমান বাহিনীর
উপর একজন হিন্দুসেনাপতির আধিপত্য অক্ষুর রাখা
বোধ হয় সহজসাধ্য ছিল না। হিমু এক বিশাল
সাম্রাজ্য অধিকারের প্রাণী ছিলেন। তাঁহার পক্ষে
তাঁহার সৈন্য বাহিনীর মারা পরিত্যাগ করিয়া অপরের
হৃৎ মোচন করিতে বাওয়া সম্ভবপর ছিল না। পূর্বেই
বলিয়াছি, তিনি একজন কামনাবর্জিত সম্রাট বা
মহাপুরুষ ছিলেন না।

ইতোমধ্যে মোগলবাহিনীসহ আকবর এবং বাইরাম,
ইতিহাস-গাসক পানিপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
হিমু সৈন্যে দিল্লী হইতে বিগত হইয়া পানিপথের
পশ্চিমে শিবির সংস্থাপন করিলেন। যুদ্ধের প্রান্তরেই
তাঁহার আবশ্যক অনেক অস্ত্র শস্ত্র মোগলের হস্তগত
হইল। ক্ষতি খুব গুরুতর হইলেও হিমু নিকংসাহ
না হইয়া, তাঁহার আকগান কর্মচারীদিগকে উৎসাহ
দিতে লাগিলেন এবং তাহাদের বেতন ও সম্পত্তি বৃদ্ধি

করিয়া দিবন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। (৫) : ৫৫৬
খৃষ্টাব্দের এই নভেম্বর আরবিখে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ
আরম্ভ হইল। ভারতের ভাগ্য পুনরায় পরিবর্তিত হওয়ার
আয়োজন চলিতে লাগিল। হিমু মোগলবাহিনীর দক্ষণ
এবং বাম অংশ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার
রণহস্তী-সমূহের সাহায্যে শত্রুপক্ষের মধ্যাংশ বিপুল
বেগে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার বিরূপ হস্তী
'হাওয়া'র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি নিজে সৈন্য-
দিগকে পরিচালনা ও তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে
লাগিলেন। সহসা শত্রুপক্ষের একটি তীর সজোরে
তাঁহার এক চক্ষু ভেদ করিয়া তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন
করিয়া ফেলিল। তিনি হাওয়ার উপর চলিয়া
পাড়িলেন। যে মুহূর্তে হিমুর জয় প্রায় নিশ্চিত
হইয়া আসিয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁহার
পতন হইল। তাঁহার পতনের পর তাঁহার সৈন্যগণ
হতাশ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল।
মোগলগণ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিল।

হিমুর রণহস্তী 'হাওয়া' তাঁহার অচেতন প্রভুকে
পৃষ্ঠে লইয়া অরণ্যভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু
অবশেষে সা কুলী খাঁ মঃরম কর্তৃক ধৃত হইয়া
আকবর এবং বাইরামের সম্মুখে আনীত হইল। বাইরাম
খাঁ তরুণ সম্রাটকে, স্বীয় পবিত্র হস্তে বিধর্মী হিমুর
দেহ তরবারির দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া 'গাজী' উপাধি
লাভ করিতে অহুরোধ করিলেন। আবুল ফজল এবং
বাবাউনীর ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, আকবর
এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন নাই। হতাচেনন অর্জিত
শত্রুকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে অস্বীকৃত

(৫) ঐতিহাসিক বাবাউনী লিখিয়াছেন যে অকস্মাৎ হিমুর
উপর বীভৎস হইয়া এই সময় তাঁহার পতন কার্যকরিত-
ছিল। এমন কি নিজের অমঙ্গলকর কোনও পরিবর্তনের
অন্ত ও তাহার প্রস্তুত ছিল। বাবাউনীর এই বিবরণের অস্ত
কোন সন্দেহ পাওয়া যায় না। হিমুর অন্তঃসাম্রাজ্যিক একটি
কথাও বাবাউনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। বাবাউনী, ২২ খণ্ড, ৮ম পৃঃ।

হালে, বাইরাম খাঁর তরবারির দ্বারা হিমুর মস্তক দেহচ্যুত করেন। (৬) কিন্তু কোন কোনও ঐতিহাসিক এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে, আকবরই স্বহস্তে হিমুর দেহে তরবারি প্রবেশ করাইয়া তাঁহার অভ্যবস্কে অপরোপ রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রখ্যাতনামা ইংরাজ ঐতিহাসিক ডিস্মন্ট স্মিথও এই বিবরণ সমর্থন করিয়াছেন। (৭)

হিমুর মস্তক কাবুলে পৌঁছাইয়াছিল, তাঁহার দেহ দিল্লীতে বধ্য কাষ্ঠদণ্ডের উপর প্রদর্শন করা

(৬) বাদাউনী-২য় খণ্ড, ২পৃঃ। আকবরনামা-২য় খণ্ড, ৬৬ পৃঃ।

(৭) "The official story that a magnanimous sentiment of unwillingness to strike a helpless prisoner

হইয়াছিল। যোগলগণ তাঁহার ধনসম্পত্তি হস্তগত করিয়া, তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকেও হত্যা করিয়াছিল।

শ্রীবনওয়ারীলাল বসু।

already half dead compelled him to refuse to obey his guardian's instructions seems to be the late invention of courtly flatterers, and is opposed to the clear statements of Ahmad Yadgar and the Dutch writer, Van den Broecke, as well as to the probabilities of the case. At the time of the battle of Panipath, Akbar was an unregenerate lad, devoted to amusement, and must not be credited with the feelings of his mature manhood." —V. Smith's Akbar the Great Mogul, p. 39.

কৈলাস পর্বত ও মান সরোবর দর্শন

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদি, সকলেই এক একটা স্বর্গ আছে, কিন্তু সেই স্বর্গ কোথায়, তাহা স্বর্গাধিপতি ঐতিগগনই জানেন। ঐতিগগন সকলেরই এক, কেবল নামে প্রভেদ। হিন্দু ছাড়া অন্য সকলের স্বর্গ-প্রাপ্তি তাহাদের প্রাণের বিচার দিন শেষ না হইলে হয় না। কিন্তু হিন্দুধর্ম বলেন, জীবের কর্ম্মফলস্বারা স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে সপ্তস্বর্গের কথা শুনা যায় এবং কোন্ট কোথায় তাহার বর্ণনা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকলগুলির স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে না। মহাযোগী কৈলাসনাথের কৈলাসই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং কোথায় সেই স্থান, শাস্ত্রাদিতে তাহা নির্দিষ্ট আছে। এই বলিয়া যে সকল ধর্মপুস্তক ও পুরাণ প্রচলিত আছে, সেই সকল গ্রন্থেই কৈলাস ও মানস সরোবরের ইতিহাস ও উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

হিন্দুপুরাণের মানস খণ্ডে কৈলাস বা মেরু পর্বত

হিমালয়ের উত্তরাংশে মানস সরোবরের সন্নিহিতে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে। যদি ইহাই স্বর্গ হয়, তাহা হইলে কৈলাস ও সন্নিহিত হ্রদদ্বয়, মানসরোবর ও ভাবন হ্রদ যাহা সপ্তপবিত্র স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছেন, যাহা অগদ-বিখ্যাত, এবং পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের কাছে পরিচিত, দর্শন করা সম্ভব; যদিও সমুদ্রেরে স্বর্গবাস না করা যাইতে পারে, তথাপি ভগবৎ কৃপায় স্বর্গ দর্শন ও স্বর্গারোহণ হইতে পারে।

আমি উপরে "যদি স্বর্গ হয়" এইরূপ কথা লিখিয়া মনের সংশয় ও অবিশ্বাসের সূচনা করিলাম। এই বৈজ্ঞানিক সময়ে ও অবিশ্বাসের যুগ সকল কথাই একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিতে হয়, সেই কারণে গুরুত্ব করিয়া লিখিলাম। অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই, কারণ, যখন হিন্দুধর্ম কর্ম্মপ্রধান, তখন এই পৃথিবীতে আমাদিগকে কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হইবে।

কার্য কারণ ও কর্তা যখন এইখানেই, তখন তাহার উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এইখানেই। অতএব ভারতের উত্তরে হিমালয়ের পরপারে তিব্বত প্রদেশে শাস্ত্র ঋষি, ও জনপদ নির্দিষ্ট কৈলাস ও মানস সরোবর যে আমাদের ঈশ্বর স্বর্গ ইহাই বিশ্বাস হয়। হিমাচল যে স্বর্গপথের সিঁড়ি তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। বোগী, ঋষি, মুনিরা যে হিমালয়ে বাস করিতেন এবং ইহাই যে তাঁহাদের তপোভূমি ছিল, ইহাতেও যদি মনে কোনও রকম সন্দেহ থাকে তাহাও দূর হওয়া উচিত। হিমালয় দর্শনে যে সর্বপাপ বিমোচন হয় ও মনে ভগবন্তক্তি ও শান্তি আসে তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না। হিমালয় অবশ্য হিন্দুধর্মের কেন্দ্র স্থান, হিমালয় হইতে গঙ্গা যমুনা প্রবাহিত হইয়া ভারতকে শতশ্রামল করিতেছে, হিমালয়েই হিন্দুদিগের দেবাদিদেব কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের মন্দির, হিমালয়ের প্রতি পর্বত, প্রতি শিলা ও প্রতি নদী, হিন্দুদিগের এক একটি তীর্থস্থান। কিন্তু হিমালয়ের সৌন্দর্য্য এতই সুন্দর, ভগবানের লীলাভূমি এতই রমণীয় ও চিত্তাকর্ষককারী যে, সুদূর ইরোরাপ ও জাপান হইতে বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ, বিদ্বান পণ্ডিতেরা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া হিমালয়ে পরিভ্রমণ ও পরিভ্রমণ করিতে আসেন। গৌরীশঙ্কর অভিযানে ডাক্তার শ্বেন হেডিন ও কাওয়াগুচির পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত যাহার পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হিমালয় দর্শন হিন্দু "ছাড়া" অত্যাশ্চর্য্যবলীদিগেরও মনোমুগ্ধকারী। রামায়ণে বাল্মীকি বলিয়াছেন—“হিমাচল, যেখানে শিব সর্বনাথ বিরাজমান, ও যেখান হইতে গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে পদ্মস্থূলের ভায় প্রবাহিত হইয়াছেন, তাঁহার গুণকীর্তন দেবতাদের এক শত বৃগেও করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না...স্বর্গ্যকরণে যেমন তুষারবিন্দু শুক হয়, সেইরূপ হিমাচল দর্শনে মানবদিগের পাপ বিদূরিত হয়।”

আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতামত না তুলিলে প্রাচী যাহা বলিয়া গিয়াছে তাহা একবারি পাক।

বলিয়া ধারণা একটু সন্দেহ বোধ হয়। সেই কারণে, আলমোড়ার ভূতপূর্ব কালেক্টর সেরিং সাহেব নিতের পুস্তকে বাচা লিখিয়াছেন, তাহার কিরদংশ এইখানে একটু উল্লেখ করিয়া দিলে বোধ হয় রামায়ণের হিমাচল বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া ধারণা হইবে। সাহেব লিখিয়াছেন, “ইহা ভালরূপে বলা যাইতে পারে যে আমাদের জানিত সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যাহার সৌন্দর্য্য চিত্র-তুষারাবৃত হিমালয়ের অত রমণীয় সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হিন্দু ঋষি হিমালয়ের সৌন্দর্য্যের বিষয় বাহা লিখিয়াছেন তাহা কাল্পনিক নহে, এবং যমুন্দের ধারণার অতীত বলিয়া তাহা অত্যাশ্চর্য্যও নহে।”

সেই হিমালয়, সেই কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনের কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু ইচ্ছা হইলেই দর্শন হয় না, ভগবৎরূপা ভিন্ন হইতে পারে না।

আমি অনেক দিন হইতে হিমালয় দর্শনের লালসা মনোমধ্যে পরিপোষণ করিয়া আসিতেছিলাম; সেই সঙ্গে যদি কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন হইয়া যায় ইহাও আকাঙ্ক্ষা করিতাম। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা কি সহজে পূর্ণ হয়? সময় না হইলে ও সময় মত কর্তব্য না করিলে কোন ইচ্ছাই পরিপূর্ণ হয় না। কেবল পুরুষকারে সকল কর্তব্য হয় না, দৈব সাপেক্ষ।

আমার বয়স্কম যখন ১০ বৎসর, সেই সময়ে আমি স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহিত রাওলপিণ্ডি গিয়া মারি পর্বত হইতে কান্দীরের দিকে উকি মারিয়া, হিমাচলের সামান্য দর্শন পাইয়াছিলাম। আমি তখন বালক, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের ৬টা দেখিয়া আত্মা দিগ্ধ হইয়াছিলাম সে কথা আজও মনে পড়ে। পরে যখন স্কুলে পড়িতাম, ভূগোলে হিমাচলের নক্সা দেখিতাম, গঙ্গা যমুনা সিদ্ধ শতদ্রু প্রভৃতি নদ ও নদীর কোথায় উৎপত্তি স্থান শিক্ষক মহাশয় যখন বুঝাইতেন, তখন মনে ধনে ভাবিতাম, ভগবান কখনও কি এমন দিন দিবেন যে, আমি হিমাচল পরিভ্রমণ করিয়া, মান সরোবরের যে অংশ হইতে গঙ্গা শতদ্রুর উৎপত্তি হইয়াছে নিজে বাইয়া

দেখিরা আসিতে পারিব? পরে যখন কলকাত্তে পড়িতে লাগিলাম, তখন যদিও ভূগোল বিশেষ করিয়া পড়িতে হইত না, তথাপি ইতিহাস শিক্ষার জন্ত—আর্থদিগের প্রাচীন বাসস্থান ও কেমন করিয়া কোথ' হইতে তাঁহার ভারতবর্ষে আসিলেন পরিচয় করিবার জন্ত—ভূগোল ও ভূবৃত্তান্ত ভাল করিয়া শিখিতে হইয়াছিল। স্কুল ক্লাস হইতেই আমি ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার বিশেষ আগ্রহা-বিত ছিলাম। ইতার অশায়নে বঃই আনন্দলাভ করিতাম ও পরে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলাম। সেই সময়েই মানসরোবর, কৈলাস ও হিমালয় সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করিলাম। কলকাত্তে পড়িবার সময় আমরা গঙ্গার উৎপত্তি স্থান ও সিন্ধুর উৎপত্তিস্থান লইয়া অনেক ঝঁক ঝঁক করিতাম। মানসরোবর ও তাহার পার্শ্বস্থিত রাবণ হ্রদ কোথায়; মানসরোবর হইতে একটি প্রস্তাবিনী প্রবাহিত হইয়া দুইটি হ্রদকে যোগ করিয়াছে, ইত্যাদিও সেই সময়ে বড় বড় পণ্ডিতদিগের ব্যা ও বিব্রা ছিল। সিন্ধুনদ কৈলাসের নিকট হইতে উৎপত্তি হইয়াছে ইহা কেবল কথিত 'ছিল, কিন্তু কেহই স্বত্বে দেখেন নাই। তখনও সেরিং সাহেবের মানসরোবর ও রাবণ হ্রদ সংযোগকারী, প্রস্তাবিনী তথা ও ফটো প্রকাশিত হয় নাই। ডাক্তার শ্বেন হেডিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা, শতক্র. গঙ্গা ও সিন্ধুনদের উৎপ' ও স্থান নির্ণয় বিষয়ও হেডিন সাহেবের দ্বারা আবৃত্ত হওয়া প্রচারিত হয় নাই। চাপলতা বশতঃ আমি ক্ষুদ্র ভারতবাসী এই সব বিষয় লইয়া অনেক রকম কবিকল্পনা গড়িতাম এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতাম যে, তিনি যেন আমাকে তাঁহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনের ক্ষমতা দেন ও প্রাকৃতিক স্থান সমূহ নির্ণয় করিবার সাহস দেন। ক্ষুদ্র ভারতবাসীর পক্ষে—আমার মত অনভিজ্ঞ গম্বীর পক্ষে ইহা যে বামনের চক্ষাকাজকা, তখন তাহা বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু এখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। অস্তান্ত সগাদেশের রাজসরকার ও জনগণ, ভূবৃত্তান্ত আবিষ্কারক

ও পর্যটনকারী পরিভ্রাজকদিগের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। পুরাকালে যে বাদশাহেরা পরিভ্রাজক-দিগের প্রতি বিশেষ সন্মানভূতি প্রকাশ করিতেন ও তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন তাহা আইন আকবরী পড়িলেই বোঝা যায়। সুইডেন দেশের রাজা ও জনগণ ডাক্তার শ্বেন হেডিনকে এবং জাপান দেশবাসীরা কাওগা-ওটকে তাঁহাদের ভ্রমণের জন্ত কত অর্থ সাহায্য ও সন্মানভূতি করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই বিদিত আছে। আমাদের ভারতে যদি এমন সাহায্য ও সন্মানভূতি পাওয়া বাইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশীয় এক জন না একজন শ্বেন হেডিন অবশ্যই দেখিতে পাওয়া বাইত। সাহায্য ও সন্মানভূতির কথা তো অনেক দূর, কোন বিশেষ আবিষ্কারকের এ দেশে যে একটু সম্মানও হয় না। স্তর জগদীশ বসু তাহার উদাহরণ। তিনি ভারতের বাহিরে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানিত হইয়াছেন, কিন্তু ভারতবাসী ও ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহার জন্ত কিছুই করেন নাই।

সেই কারণে হিমালয় পরিভ্রমণ, কৈলাস ও মানসরোবর দর্শন বাসনা হৃদয়ের ভিতর বহুদিন লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। কিন্তু মাতৃমুখে সাহায্য নাট ককক, বাহার দর্শনের প্রেম দিনে দিনে হৃদয়ে বাড়িতেছিল, তিনিই সমগ্রায়সারে সেই প্রেম বলবতী করিয়া আমাকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কলকাত্ত হইতে বাহির হইবার পর যদিও আমার ডাক্তার হইবার কথা, তথাপি অদৃষ্টক্রমে আমি উকিল হইলাম। ওকালতি ব্যবসা করিবার জন্ত আমি নেপালের সন্নিকটবর্তী গারখপুর নির্দিষ্ট করিয়া লইলাম। ওকালতি করিতে করিতে, হিমালয়ের সৌন্দর্য্যের আভা দেখিবার জন্ত নিক হ স্থান-গুল—মশো'র, নৈনিতাল, সিমলা—ইত্যাদি দেখিবার অবসর করিয়া লইয়া ছলাম। কিন্তু বতই সে সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম, ততই দর্শনের আক'জ্জা বাড়িতে লাগিল। ইতোমধ্যে ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইলাম—পেনোয়ার হইতে কস্তা কুমারী পর্যন্ত প্রায় সকল স্থলক স্থলক স্থানগুলি দেখিয়া লইলাম।

সুদূর দক্ষিণে কক্সাকুমারীতে যখন স্বর্ষ্যাস্ত দেখিলাম, ও কুমারিকা বস্ত্রাদেবীকে শিব-মন্ডনের জন্ত যুগ যুগ হইতে অপেক্ষা করিয়া বলিয়া থাকিতে দেখিলাম, তখন হইতেই আমিও কৈলাস শিখরের স্বর্ষ্যোদয় ও দেবদেব মহাদেবের রমণীয় স্বর্গভূমি কৈলাস ও মানস সরোবর দেখিবার জন্ত আত্মারা হইলাম।

কক্সাকুমারী হইতে নিজের কার্যস্থানে ফিরিবার পরই, হিমালয় মান সরোবর ও কৈলাস দর্শন জন্ত চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। কোথায় কোন্ দিক দিয়া যাইতে হইবে, বা কোন্ পথটি সূগম তাহার অজ্ঞসন্ধান করিতে লাগিলাম। যাইবার পূর্বে আমার ইহা ধারণা ছিল (ও বোধ হয় এখন অনেকেরই ধারণা) যে সরকার হইতে আজ্ঞাপত্র বা পাসপোর্ট না পাইলে তিব্বত দেশে যাওয়া যাইতে পারে না। পূর্বে যাহারা গিন্না'ছিলেন তাঁহারা বিনা অসুস্থতিতে যাইয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন, ইহাও তিব্বত সংক্রান্ত পুস্তকে পড়িয়াছিলাম। মন করিলাম যদি নেপাল হইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া দেখিলাম, তিব্বত দেশ হিমালয়ের উত্তরে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশ কান্দীর হইতে ভারতের উত্তর পূর্বে কোণ বর্ষা ও চীন দেশের সীমা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। হিমালয় যেন সমগ্র তিব্বত ও ভারতের মধ্যে উত্তর পশ্চিম হইতে উত্তর পূর্বে কোণ পর্যন্ত একটি প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া দুইটি রাজ্যকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছে— এই প্রাচীর অতিক্রম না কিলে ভারত হইতে তিব্বত কোন মতে যাওয়া যাইতে পারে না।

এই প্রাচীর ভগবান নির্মিত ও তাঁহার ইচ্ছাধীন নির্দিষ্ট পথে ভিন্ন তাঁহার প্রাচীরের পরপারে যাইবার ক্ষমতা মনুষ্যের নাই। পথগুলি অতি দুর্গম, হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত শিখরের মধ্য দিয়া একটি একটি ঘাট বা pass আছে। পরপারে যাইবার জন্ত ইচ্ছা পূর্বত মধ্যস্থিত সংকীর্ণ পথকে ঘাট বা ঘাটি বলে। কান্দীরের উত্তরে একটি ঘাট আছে। সেই রাস্তা ও

ঘাটি দিয়া লেহলদাক হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করা যাইতে পারে। পূর্বাংশে দার্জিলিং হইয়া গাংতসি, ও চু'ম্ভালা দিয়া তিব্বতে যাওয়া যাইতে পারে। এই দুইটি ঘাটির পথ খুব পতিতিত—কারণ ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাহা কিছু ব্যাঘ্র হয়, তাহার বেশীর ভাগ, পদপ্রবাহ এই পথ দিয়া যায়। কিন্তু কৈলাস দর্শনান্তিলাবী যাত্রীদিগের পক্ষে ইহা যে কিছু দূর ও বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়িবে তাহা মানচিত্র দেখিলেই বোঝা যায়। সিমলায় নিকট হইয়া কুপুথামপুর ও বুঝ'হার দিয়া একটি পথ আছে, যাহাকে "হিন্দুস্থান তিব্বত রুট" বলে। এই রাস্তা দিয়াও যাইতে পারা যায়; কিন্তু ইহাও যাত্রীর পথ নয় ও বিশেষ বাণিজ্য-পথও নয়, সে কারণ ইহাও তত সূগম নহে। ভারতের গাড়োয়াল জেলা ও আগমোয়া জেলা হইয়া তিনটা যাত্রী পথ ও ব্যবসারীদিগের পথ আছে। নেপাল হইয়া কথোটা পথ আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, আমার কার্যস্থান ছিল নেপালের সন্নিকটস্থ গোরখপুর জেলায়। গোরখপুর হইতে হাঁটা পথে নেপালের পশ্চিমাংশ পালপাও ও রিক্তি ইত্যাদি এবং তাহার উত্তরে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান মুক্তিনাথ অধিক দূর নয়। মুক্তিনাথ হইয়া ছয়কাতোটা দিয়া তিব্বতে অনেক যাত্রী যায়। গোরখপুর হইতে কয়েক ঘণ্টা বেলে যাইয়া রক্সগল টেমেন হইতে হাঁটা নেপাল ও নেপালের রাজধানী কটমান্ডু যাইতে হয়। নেপাল কটমান্ডুর অতি সন্নিকটে পদ্মপতিনাথের দর্শন হয়। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় প্রায় ৫০ হাজার লোক পদ্মপতিনাথ দর্শন করিতে গিয়া থাকে। নেপাল হইয়া কিরণপাস দিয়া তিব্বত-যাওয়া যাইতে পারে। নেপালী পণ্টন তর্জি করিবার গোরখপুর একটি কেন্দ্রস্থান, এখানে রেক্জুটিং ডিপো আছে; সেই কারণে গোরখপুরে প্রতিবৎসর শীতকালে সহস্রাধিক নেপালী আসিয়া থাকে। এই সুযোগে তাহাদের অনেকের সঙ্গে আমি আলাপ করিলাম ও নেপালী ভাষাও শিখিলাম। তাহাদের কাছে জানিতে পারিলাম, যদিও রাস্তা

জগৎ নহে, তথাপি নেপাল হইয়া যাওয়াই সুবিধা, কারণ নেপাল হিন্দুরাজত্ব ও হিন্দুধর্মই তথায় রাজধর্ম, তাই হিন্দু নেপালীরা রাজাদিগের বখেই সাহায্য ও অতিথিসেবা করিয়া থাকে। নেপালে এখনও খাতিয়াদি খুব সত্তা এবং রাজারা তাহা সহজে সংগ্রহও করিতে পারে। অস্ত্রাভ্যাস করণেও মনে মনে তাবিলাম, নেপাল হইয়াই যাওয়া সুবিধাজনক হইবে। খাস নেপালের একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক কর্ণেল ইন্-ভীকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার কাছেও নেপালের অনেকটা সন্ধান জানিতে পারিলাম। একবার নেপালে পৌছিলে যে তিব্বত বাইবার একটা কিছু বন্দোবস্ত হইয়া বাইবে ইহা আমার খুব ভরসা হইল। নেপাল বাইলে যে হিমালয় দর্শন ও পশুপতিনাথ যাত্রা অবশ্যই হইবে তাহার কোনই সন্দেহ ছিল না। কৈলাস দর্শন ও মানসরোবর যাত্রার সুযোগও হইতে পারে, ইহাও আশা করিতে লাগিলাম। নেপালে বাইবার জন্ত দুই একটা সঙ্গীও প্রস্তুত ছিলেন। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া নেপাল দরবারে পাসপোর্টের (আজ্ঞাপত্র) জন্ত দরখাস্ত করিলাম। কিন্তু তাহাতে বিকল মনোরথ হইলাম। পরে জানিতে পারিলাম, শিবরাত্রির সময় পাসপোর্টের দরকার হয় না। অতএব ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিবরাত্রির সময় পশুপতিনাথ দর্শনের জন্ত নেপাল যাত্রা করিলাম। নেপালে পৌছিয়া পশুপতিনাথ দর্শন করিয়া, প্রায় ২১ দিন নেপালে থাকিয়া, তিব্বত বাইবার জন্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন আমার পাসপোর্টের গোলমাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিনা পাসপোর্টে বাহ্য তাল বিবেচনা করিলাম না। নেপালের পাসপোর্টকে 'লাল ছাপ' বলে। এই লাল ছাপ না থাকিলে যে তিব্বতে কালাছাপের কান্দার পড়িতে হইবে তাই আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়িল। বিকল মনোরথ হইয়া ছুঃখিত মনে ভারতে প্রত্যাগমন করিতে হইল। যদিও সব বাহা পূর্ণ হইল না, তথাপি

হিমালয়ের অনেকটা দর্শন হইল ও পশুপতিনাথের দর্শন করিয়া বড়ই শান্তিলাভ করিলাম। সেখান হইতে হিমালয়ের সৌন্দর্য বাহা দেখিয়াছিলাম তাহাও ভুলিবার নয়। নেপালীদিগের সৌজন্য ও নেপালীধর্মিত মহারাজ স্যর সামসের জং বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার কৃপা অসুগ্রহ চিরদিন মনে থাকিবে।

নেপাল হইতে করিয়া কিছুদিনের জন্ত গৃহকর্মে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু ইতোমধ্যে জন্ত পথ দিয়া বাইবার চিন্তাও করিতে লাগিলাম। গাড়োয়াল জেলা, কেরার বদরীনারায়ণ রাস্তা হইয়া বদরীনারায়ণের আরও উপর বজ্রধারার কাছ হইয়া, মানাগ্রাম দিয়া মানা হইতে দুই দিনের পার্শ্বতীর পথ অতিক্রম করিয়া মানা পাস বা মানা ঘাটি দিয়া হিমালয়ের উত্তরাংশে তিব্বতের থলিং মঠ দিয়া প্রতি বৎসর দুই একজন সাধু সন্ন্যাসী কৈলাস গিয়া থাকেন। কিন্তু মানাঘাটি বড়ই দুর্গম, কারণ মানা হইতে থলিং পর্যন্ত ছয় সাত দিনের রাস্তা। ও রাস্তার এই ছয় সাত দিন জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোন আশা নাই, কোনও রকম দ্রব্যও পাওয়া বাইতে পারে না। যদিও থলিং ও সন্নিকটস্থ মাংলাং ও চাপরাংয়ে টোলছাপণ ব্যবসা করিতে যায়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ও তাহাদের ব্যবসা অতি সামান্য। সেই কারণে মানাপথে লোকসমাগম হয় না, রাস্তাও প্রায় নাই। খুব ভাল করিয়া জানা না থাকিলে বাহারা দুই একবার গিয়াছে তাহারও যে ভুলিয়া বাইতে পারে ইহাও শুনিলাম।

বদরীনারায়ণের নীচে বসিমঠ হইয়া বাম কাউনীতি হইয়া একটি রাস্তা আছে, তাহাকে নীতির ঘাটা বলে। এই রাস্তা দিয়া নীতির সন্নিকটস্থ গ্রামের মাজ্জাগণ তিব্বতস্থিত ডাভা শিবচিলম ও গারতোপ পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যায়। যদিও এই পথে লোক সমাগম হয়, কিন্তু ঘাটাটি বড় দুর্গম। আলমোরা জেলা দিয়া ও আলমোরা হইয়া দুইটি রাস্তা গিয়াছে। একটি বোহারি ভুটীরা দিগের বেশ উটাহারা পাস দিয়া। বোহারি ভুটীরাও অনেকটা হিন্দুদিগের মত, হিন্দু রাজাদিগকে বখেই

সাধ্য করে। কোন কোনও হিন্দু বাকী এই পথ দিয়া বাইতে বিশেষ স্তুতি বোধ করেন, কারণ বোহারি ভূটিয়ারা অনেকেই কৈলাস যাত্রা করিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন কাহারও ঘরে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র ও আত্মীয় স্বজনগণ গয়া কাশীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গতির জন্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ বোহারি ভূটিয়াদের মধ্যে কেহ যদি তাহার আত্মীয় কুটুম্বাদি তাহার স্বর্গগাত হেতু কৈলাসস্থিত গৌরীকুণ্ডে তাহার অস্থি নিক্ষেপ করিয়া, মান সরোবরতীরে তাহার শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। সেই জন্ত তাঁহাতে হইতে আর শতাধিক ভূটিয়া প্রতিবৎসর কৈলাস দর্শন ও মান সরোবর যাত্রা করিয়া থাকে। আমার বোধ হয় ইহারাই একমাত্র ভারতবাসী কৈলাসযাত্রী, কেন না সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া ভারত হইতে করজনা কৈলাস দর্শন ও মান সরোবর যাত্রা করিয়াছে তাহা নথ্যগ্রহণ করা বাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের বাটা, অস্ত্র সকল বাটা অপেক্ষা দুর্গম, উটাদার বাটা পার হইতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আরও দুইটি উচ্চ শিখর বাটা (অরুণী কিংবা কুমরি বিহারি) পার হইতে হইবে। এই তিনটি শিখরের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই সেখানে রাজিবাস করা বাইতে পারে। সমস্ত পথই আর তুষারাবৃত হওয়ার, এক দিনেই তিনটি বাটা পার হইতেই হয়—সেই কারণে ইহা বড়ই স্বকঠিন। আর একটি বাটা আছে, আলমোরা জেলার নীচে উত্তর পূর্ব কোণে—বেথানে নেপাল, ভারত ও তিব্বতের সীমা আসিয়া মিলিয়াছে।—সারনা নদীর উৎপত্তি স্থান দিয়া লিপুলেক পাস। লিপুলেক পাসের রাস্তাটি খুব প্রশস্ত ও পথের চড়াইও বেশী নর। পাসের উপরিতাগে বা বাটার মাথার উপর বেশী বরফ থাকে না; শীতের আর দুই মাস পরেই বরফ গলিয়া রাস্তা খুলিয়া যায়। সেই কারণে এই রাস্তা দিয়া বাইবার বিশেষ সুবিধা আছে। ১৯০৫ সালে সেরিং সাহেব এই রাস্তা দিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে এই রাস্তার বিবরণ ভাল করিয়া দেওয়া আছে। তাঁহার পুস্তক পড়িয়া এই রাস্তাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম

ও মনোনীত করিলাম। ইহাও জানিতে পারিলাম যে লিপুলেক হইয়া গিলিতিত জেলার সন্নিকটস্থ টনকপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নামিয়া হাঁটা পথ দিয়া চন্দ্রগড় ও গির্বোরা গড় দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহাই আমাদের শাস্ত্রকথিত রাস্তা। স্বল্প পুরাণের মানসখণ্ডে মানস সরোবর যাত্রা ও কৈলাস দর্শনের পথ বিবৃত হইয়াছে; অস্ত্র পুরাণাদির মত স্বল্প পুরাণের মানসখণ্ডে ইহা উপাখ্যানের আকারেই বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি দত্তাজের কৈলাস দর্শন ও মানস সরোবর যাত্রা করিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিলে, কাশী-রাজ ধর্মজরী তাঁহাকে যাত্রাপথ জিজ্ঞাসা করিলে ঋষির দত্তাজের পথের নিরূপণ করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রকথিত পথের বর্ণনা পড়িয়া অনেকগুলি স্থান সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট করা বাইতে পারে। যদি ঐতিহ্য স্থান-গুলি এবং বিশেষ করিয়া নদীগুলি নির্দিষ্ট হইল, তাহা হইলে মানস সরোবর ও কৈলাস শিখরও নির্দিষ্ট হইল। “ইহা মানস সরোবর নয়, ইহা মন ভালাও” বলিয়া, মান সরোবর ও কৈলাসের কথা উড়াইয়া দিলে, কারণ না দেখাঙ্গর সিদ্ধান্ত করা হয়। লিখিয়া বা গির্বোরা নদী যে গওঁকী ইহাতেও যদি সন্দেহ হয় তাহা একবার বিবেচনা করা বাইতে পারে, কিন্তু সরযু ও রামগঙ্গা নদী যে অস্ত্র স্থানে নাই, এবং কাশী ও গৌরীগঙ্গার সঙ্গমস্থান যে আসকোটের কাছে, তাহাতে কোন মতেই সন্দেহ করা বাইতে পারেনা।

পথের বিবরণ আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ ও রাস্তার কি কি দরকার হইবে ও কেমন করিয়া, কেনন বেশে বাইলে সুবিধা হইবে, ইহারই একটা স্থির করা বাকী রহিয়া গেল। কিন্তু এগুলিও করিতে বেশী দেরী লাগিবে না। সারতে অব্ ইতিরা আকিস হইতে বড় স্কেলের তিন চারি শীট মাপ আনাটু-লাম। সেরিং সাহেব পুস্তকেও একটি সুন্দর মাপ ছিল। হিমালয় পর্বতের বহু পুরাতন কিন্তু অতি উত্তম মাপ একখানি পূর্বে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এইগুলির দ্বারা ভাল করিয়া পথটি বুঝিয়া লইলাম। জেলা গেজেটিয়ার, এট্‌কি-

সন্মুখের 'হিমালয়ান ডিক্টে পেনেট্রার' ভাল করিয়া পড়িয়া লইলাম। ইহা দ্বারা পথের স্থানগুলি অবস্থানগুলি কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। পূর্বে শুনিয়াছিলাম, তিব্বত দেশে বড় চোর ডাকাতির ভয়। পার্শ্বতীর প্রদেশে অনেক অসভ্য জাতির বাস, তাহারাই ছেড়া ইত্যাদি লইয়া মান সৎগোবর ও কৈলাসের নিকটস্থ পুণ্ড (বালায়) গুলিতে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আসে, এবং অবসর পাইলে চুরি ডাকাতি করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করে না। বইগুলি পড়িয়া এই ধারণাটি আরও দৃঢ়মূল হইল। একবার মনে করিলাম সন্মুখ একটি বন্দুক, না হয় রিভলভারটি লইয়া বাই। কিন্তু, পরে ভাবিলাম, যদিও আমি লাইসেন্স বণে ভারতবর্ষে ঐ অস্ত্রগুলি রাখিতে পারি কিন্তু ভারতের বাহিরে সেগুলি লইয়া বাইলে অন্ততঃ অস্ত্র আইনের বিরুদ্ধে কাব হইবে। তিব্বতের আপত্তি না হইলেও, ভারতবর্ষীয় আইন অনুসারে একটা আপত্তি হইবে। আরও ভাবিলাম, যদি সত্য ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনাধীনে সহরে বাজারে হাজার হাজার লোকের সন্মুখে ডাকাতি হইতে পারে, তা হইলে তিব্বতের বকর জাতিরা যে তাহা করিবে, সেটা কিছুই নির্বিশেষ নহে। এই সেদিন খবরের কাগজে পড়িলাম যে, কলিকাতা সাইকেল ক্লাবের কতকগুলি যুবক কলিকাতা হইতে পেশোয়ার

অভিমুখে সাইকেলে দেশ পর্যটন করতে বাহির হইয়াছিল; কাশী ও প্রয়াগ অকলে ডাকাতিদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কয়েকজন বিশেষরূপে অশ্রম হওয়ার, তাহারি বাহ্যে পূর্ণ করিতে বিরত হইয়া কিরিয়া আসিয়াছে। অতএব আমি বিশেষে এক, বন্দুক কি রিভলভার লইয়া কি নিজেই রক্ষা করিতে পারিব? অতএব অস্ত্রশস্ত্র লইতে বিরত হইলাম।

পোষাকের বিষয়—অনেকটা নেপালীয় মত করা হিঁর করিলাম। ভগবৎরূপায় ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষাই—'জাতি', হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রীয়—সকল ভাষাই কহিতে শিখিয়াছি; নেপালীও বেশ বলিতে পারি; অতএব নেপালী সাফলে ভাল হয়, কারণ যে রাস্তা দিয়া যাইব, উহা ভারতের আন্দোলন জেলা ও নেপালের সীমার ধারে গিয়াছে। এই পথে নেপালের পশ্চিমাংশের জেলা ভোটি ইত্যাদি হইতে অনেক নেপালী বাতায়ত করে। অস্ত্রাস্ত্র জ্বা সামগ্রী কি কি লইতে হইবে তাহার জ্ঞান আর বিশেষ ভাবিতে হইল না। এইবার একটা শুভ দিন দেখিয়া ঐহরি বলিয়া যাত্রা করিগেই হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়।

গোহদ দুর্গ

গোহদ স্বাধীনরাজ্য গোয়ালিয়রের অন্তর্গত তনবরগড় জেলার একটি পরগণা। তনবরগড় চমাল নদের দক্ষিণ-পূর্বতীর এবং গোয়ালিয়রের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ইহারই উত্তরে অর্থাৎ চমালের উত্তর তীরে, পশ্চিমে ধোলপুর রাজ্য এবং পূর্বে আত্রা জেলা। গোয়ালিয়র হিও রেলপথ (Gwalior Bhind State Light Railway)

গোয়ালিয়র হইতে টের্জা বা গোহদ রোড ষ্টেশন ছাড়াই মাইল, তথা হইতে অশ্বখানে গোহদ সহর চারি মাইল দূর। গত বৎসর কাঠিক মাসে গোয়ালিয়রে অবস্থান কালে আমার গোহদ দুর্গ দেখিবার সুযোগ সৃষ্টি হইল। আজ এই প্রবন্ধে গোহদ দুর্গের অতীত কাহিনী ও বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

গোহদের সহিত রাণা ভীম সিংহের স্মৃত আঞ্জিও বিজিত রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৭০৭ হইতে ১৭৩৯ অব্দ পর্যন্ত প্রায় বত্রিশ বর্ষকাল গোহদ, ডমোরিয়া রাজপুতদিগের দ্বারা অধিকৃত ছিল। অষ্ট রাণা ভীম সিংহ একদা রাজপুতগণ কর্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়া পেশবার নিকট কর্তৃক গ্রাণে করেন এবং অন্ন দিনেই তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। পেশবা বাজীরাও ভীমসিংহের কার্যকুশলতার শ্রীত হইয়া তাঁহাকে গোদহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উক্ত বত্রিশ বৎসরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথ রাও কর্তৃক গোহদ আক্রমণ। (ইনি পেশবা রঘুনাথ নহেন, এবং ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।) রঘুনাথ রাও গোহদ আক্রমণ করিলে রাণা তাঁহাকে খিলক মুদ্রা প্রদান করিয়া মুক্তলাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পেশবাদিগের একচ্ছত্র হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতীকার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেলে, পেশবা রাজকীয় ক্রমশঃ তদীয় সামন্তগণের অধীন হইয়া ছিল। এই সময়ে সিক্কিয়ারাওঁর প্রতিষ্ঠাতা মহাদ্জি সিক্কিয়া, সেনাপতি দ'বোয়ানের (De Boigne) সহায়তায় রাজ্যবিস্তারে নিযুক্ত ছিলেন। গোহদের তাৎকালীন রাণা লোকেন্দ্রসিংহ সেই অবকাশে গোয়ালিয়রের দুর্গ আক্রমণ করেন। তৎকালে গোয়ালিয়রের গিরিহুর্গ রাজাদিগের একটি শোভনীয় বস্ত্র ছিল এবং দুর্গের সহিত গোয়ালিয়রের ভাগ্যক্ষেত্র নিরন্তরিত হইত। অতুমান চারি বৎসরকাল গোয়ালিয়র দুর্গ রাণার অধীন থাকে; পরে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাদ্জি সিক্কিয়া রাণাকে যুদ্ধে পরাজিত ও দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের মাঘে রাও পেশবার মৃত্যুর পর পেশবার রাজতন্ত্র লইয়া যখন বিবাদ চলিতেছিল, তখন রঘুনাথ ওরফে রাণোবা, রাজতন্ত্রের দাবী করিলে, মহাদ্জি সিক্কিয়া প্রথমতঃ হোলকারের সহিত একযোগে রঘুনাথের সহায়তার অগ্রসর হন, কিন্তু ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার উত্তরেই পেশবাকে ত্যাগ করেন। রঘুনাথ অতঃপর

ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ইংরাজদিগের সহিত কিছুদিনের জন্য সিক্কিয়ারওঁ বিবাদ হইয়াছিল। গোহদের রাণাও ঠিক এই সময়ে সিক্কিয়ার বিরুদ্ধে ইংরাজদিগের সাহায্যপ্রার্থী হওয়ার চাক্ষুশল হেষ্টিংস উদীয়মান মহারাষ্ট্র শক্তির ঋণাত্মক মানসে মেজর পপ্‌হামকে (Major Popham) অবিলম্বে গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের বিশ্বাস ছিল যে গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করিতে পারিলে সিক্কিয়ার বিজয়-প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইবে। এই ঘটনাকে তিনি বরাবর রাষ্ট্রীয় কুটনীতির একটি উত্তম দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন; এমন কি, “ডিপ্লোম্যাসির” হিসাবে পশাণী ব্যাপারের নিয়মই ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, কিরূপে পপ্‌হাম সাহেব স্তব্ধ নিশীথে রাণার কয়েকটি মাত্র বিস্তৃত লোকের সাহায্যে অতুচ্চ গিরিহুর্গ-প্রাচীর উন্নয়ন পূর্বক দুর্গ অবরোধ করিতে সমর্থ হন, তাহার বিন্দু বিবরণ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের “মিলিটারী ক্যালেন্ডারে” প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধের সহিত উক্ত ঘটনার সম্বন্ধ এই যে, গোহদের রাণার সহায়তা পাইয়াই ইংরাজগণ গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করিতে পারিয়াছিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে হেষ্টিংস উক্ত দুর্গ গোহদের রাণাকে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ দেন এবং ঐ বৎসর মে মাসেই রাণা দুর্গ পুনরধিকার করেন। দুর্গ প্রাপ্ত হইলেও দুর্জয় মহারাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দুর্গরক্ষা অসম্ভব হইয়াছিল। পরবৎসরই সিক্কিয়া গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। গোহদের রাণী (লোকেন্দ্রসিংহের পত্নী) এই সময়ে গোয়ালিয়র দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, শত্রুকর্তৃক দুর্গ পরিবেষ্টিত দেখিয়া তিনি সহচরীদিগের সহিত গৃহের দ্বার অর্গলক্ক করিয়া অগ্নিকুণ্ডে কাম্প প্রদান করেন।

অতঃপর ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ সল্বাই এর সন্ধি উপলক্ষ্যে সিক্কিয়া রাজের সীমান্ত নিদ্ধারিত হইয়াছিল। এই সন্ধি ভারত ইতিহাসের এক মনোহর ঘটনা।

সন্ধির চতুর্থ সর্তে এইরূপ স্থির হয় যে, গোহদের রাণা যত দূর না ইংরাজদিগের সহিত সন্ধির পণ ভঙ্গ করিবেন ততদিন সন্ধিরাও রাণার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন না। চতুর্থ সর্তট এখানে উদ্ধৃত করা গেল,—

"Fourthly, that whatever country of the Maharajah's shall have been taken possession of by the Company on this side of the Jamuna, Colonel Muir shall restore; and the Maharajah shall agree not to molest or disturb the country of Lokindar Rana Chatter Singh Bahadoor, Deleer, Jung, nor the Fort of Gwalior which is at present in his possession, so long as the Rana Saheb observes his treaty with the English."

উল্লিখিত সর্তের অন্তর্গত country on this side of the Jamuna অর্থে যমুনা নদীর দক্ষিণ-তীরবর্তী জু-তাগ বুঝাইতেছে। বলা বাজ্জস্য রাণা সন্ধির পণ রক্ষা করেন নাই এবং তৎকাল ইংরাজদিগের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হওয়ার ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর সন্ধিরা মহারাজ গোহদ আক্রমণ করিয়া উহা স্বরাজ্য-ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তদনন্তর আর একবার সন্ধিরা রাজার সহিত গোহদের বিবাদ হইয়াছিল। মহারাজ সন্ধিরা অস্বাভি ইংরেজকে গোহদ রক্ষণের ভার দিয়াছিলেন। অস্বাভি কিন্তু ইংরাজের বিজয়প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া গোপনে ইংরাজদিগের সহিত এক নূতন সন্ধি-সুত্র আবদ্ধ হন ও তদনুসারে গোহদের দুর্গ তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। অস্বাভি এই সন্ধির সর্তাঙ্গবানী কাণ্ড করেন নাই; ফলে, তিনি ইংরাজদিগের বিরাগতাজন হন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল হোয়াইটের (General White) আদেশক্রমে ক্যাপ্টেন ম্যাকলিওড (Captain Macleod) রাজ্যবাগে আটপাঠ সৈন্তসহ গোহদ অবরোধ করতঃ অস্বাভিকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে ইংরাজকে শতাধিক সৈন্ত

যত্নসুখে পতিত হয়। অতঃপর, প্রায় এক বৎসর কাল গোহদ সন্ধিরা মহারাজের প্রাণা কি না, তাহা লইয়া গোল চলিয়াছিল, কিন্তু কোন মীমাংসার উপনীত হওয়ার পূর্বেই ইংরাজ সরকার উহা রাণাকেই কিরাইয়া দেন। ইহা সন্ধিয়ার অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল। গতবার জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া রাণার প্রতি সহানুভূতি উঠাইয়া লইবার আদেশ দিলে, সন্ধিরা আর একবার গোহদ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে গোহদ সন্ধিয়ার রাজ্যভুক্ত আছে। খোলপুরের বর্তমান রাণার পূর্বপুরুষগণই গোহদের রাণা ছিলেন।

গোহদ দুর্গ রাণা ভীমসিংহ কর্তৃক ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। ইহা সহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। উত্তরে শীর্ণকারা বৈশালী নদী (চলতি নাম, বৈশালী) দুর্গের পাদদেশ ঘোত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকেই উচ্চ প্রাচীর, ও তৎপশ্চাৎ সুপ্রশস্ত পরিখা। দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে বাবতীর প্রাচীর, তোরণদ্বার ও গদুদ সমূহ এবং অভ্যন্তরের গৃহাদি প্রায় সমস্তই আমূল প্রস্তরনির্মিত। সুবিশীর্ণ প্রান্তরে পাহাড় কিংবা পর্বতের চিহ্নমাত্র নাই, অথচ রেলওয়ে স্থাপনের পূর্বে কি প্রকারে যে এমন একটি বিশাল প্রস্তরদুর্গ গঠিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মহলের পর মহল, প্রাঙ্গণের পর প্রাঙ্গণ— এইরূপে দুর্গটি বহুখণ্ডে বিভক্ত এবং প্রত্যেক খণ্ডের চতুর্দিকে চকমিলান ঘিটল ও ত্রিতল কক্ষশ্রেণী। সর্ব-নিম্ন তলে প্রবেশদ্বারের পথেই বামপার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড দালান, অনেকটা অ.ম.দের দেশের ধনীগৃহের পুজার দালানের মত। দুর্গের বহির্দেপ, রক্ষা ও কর্তৃত্বাধী-বর্গের বাসের নিমিত্ত ব্যংহত হইত; প্রাচীরের গজ-সংলগ্ন কক্ষরাজির তদ্ব্যবসেব আজিও তাহার সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্তর-মহলে উপরে কতক-গুলি গৃহের নির্মাণ-প্রণালী কিংবৎ বর্তমান রকমের। ঐ সকল গৃহের ও তৎসমুখস্থ দালানের প্রাচীর অপেক্ষাকৃত মন্থ ও কালকার্য্য সম্পন্ন। কোন কোন অঙ্গনের

প্রাচীরেও প্রস্তর শিলের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। ভিতরের দুইটি প্রবেশ দ্বারে দুই বোকা বৃহৎ কাঠ-কবাট ব্যতীত আর কোনও গৃহে দরজা কিংবা জানালার কবাট আছে বলিয়া বোধ হইল না। উত্তরের সর্বপ্রথম প্রাচীরের ভিতর দিয়া একটি গুলু পথ ও সিঁড়ি ক্রমাগত বৈশালীর গর্ভে গিয়া মিশিয়াছে। আমরা এই পথে একেবারে নদীর তীরে গিয়া পৌছিয়া-ছিলাম। এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। নদীর এক পারে সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাচীর উন্নত-শিরে দণ্ডায়মান, অপর পারে সুদূরবিস্তৃত হরিৎ শস্তক্ষেত্র। পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে পূর্বদিকের দুর্গ-প্রাচীর তোরণ ইত্যাদি বহুস্থানে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং দুর্গের অভ্যন্তর ভাগ এখন অসংলক্ষ্য হওয়ার শৃংখল ও সজাক প্রভৃতির আশ্রয়স্থল হইয়াছে।

এই দুর্গের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বেই একটি প্রশস্ত প্রস্তর-নির্মিত অট্টালিকা, দূর হইতে ইহাকেও একটি ছোট-খাট দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহা “প্যালেস” নামে অভিহিত; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাণা ছত্রপতি সিংহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। বরসে দুর্গাপেক্ষা এই প্রাসাদ আধুনিক এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অভ্যন্তরে সুপ্রশস্ত অঙ্গনের চতুর্দিকে জিতল কক্ষরাশি এবং উৎসব মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সমূহ সমান্তরাল ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। অনুমান হয় যে উৎসবদিবস সময় ঐ সকল প্রকোষ্ঠ, বিশিষ্টা মহিলা দলের দ্বারা অধিকৃত হইত। বর্তমানে প্রাসাদের সর্বনিম্ন তলে পরগনার মুনসেফি, তাহশিল অফিস ও বাজনাখানা বা ট্রেজারী প্রভৃতির কার্য নির্বাহ হয়। সরকারী সভা-সমিতির অনুষ্ঠানও এই প্রাসাদে হইয়া থাকে। প্রাসাদের বহির্ভাগের চত্বরে সেকালের তিনটি পুরাতন কামান ও ভিতরের প্রাঙ্গণে ছোট বড় কতকগুল

গোলা আদিও রাখার পূর্ব গোবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। দুর্গের ভাষা প্রাসাদটিরও পশ্চাভাগ অর্থাৎ পূর্বদিক ব্রিটিশ ও মারাঠা সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া এবং ফুটরা গিয়াছে। সেই সকল ভগ্ন অংশ অস্ত্রাশি দর্শকদিগের জন্য তদবস্থায় রক্ষিত হইতেছে। দক্ষিণ পার্শ্বে পরিখা-সংলগ্ন একটি দীর্ঘিকা ও তন্মধ্যে খেত-প্রস্তরের একটি ক্ষুদ্র দেব-মন্দির সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গোহদের একটি আধুনিক দৃশ্য বৈশালী নদের বাধ। ইহা গোয়ালিয়র ইরিগেশন্ ডিপার্টমেন্টের প্রস্তুত। নদীর সঞ্চিত জলরাশি জল-প্রপাতের দ্বারা দিগন্ত সুশ্রুতি করিয়া সবেগে প্রায় বিশ ফুট নিরে পতিত হইতেছে। নদীর এই অংশ মৎস্যবহুল। পতনশীল ভলোজ্জাসের ভিতর ক্ষুদ্র বৃহৎ মৎস্যের উল্লেখন-দৃশ্য বড়ই মনোরম।

উপসংহারে আর একটি দৃশ্যের উল্লেখ করিতে চাই। রেল-পথের উত্তর পার্শ্বে দিগন্ত-প্রসারিত ভূণ ও শস্ত ক্ষেত্রে ময়ূর ও কর্ণ যুথের ভিড় বিচরণ, এতদ্দেশে নবাগত বাঙ্গালী দ্বারা এক অভূতপূর্ব আনন্দরসের সৃষ্টি করে। গোয়ালিয়র ভ্রমণকারীর পক্ষে গোহদও যে একটি দর্শনীয় স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঐতিহাসিক রায় চৌধুরী।

• এই প্রবন্ধের ঐতিহাসিক ভাগ কোন স্বতন্ত্র পবেষণায় ফল নহে, বস্তুতঃ ইহা ভারত পত্ৰবল্লী প্রকাশিত Central India State Gazetteer Series-এর অন্তর্গত Leonard সাহেব-কৃত Gwalior Gazetteer নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে গোহদ বৃত্তান্ত গোয়ালিয়রের ইতিহাসের সহিত মিজিত থাকায় এরোজনার অংশগুলি বাহিরা দিয়া দ্বারা বাহ্যিকরূপে লিখিয়াছি। ইহাতে ঐতিহাসিক ক্রম-বিভাগের ব্যতিক্রম ঘটয়া থাকিলে তাহা মার্জনা করি।—লেখক।

খাইবর পথে

আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল, হিমাচলের তুষার কিরীট শৃঙ্গশ্রেণী সম্বিত, মনোমুগ্ধকর ফলপুষ্প বৃক্ষরাশি শোভিত এবং উপলব্ধিভিনী কলনাদিনী বিস্তারিত সুমধুর পনি সুখরিত অগতে নন্দনকান্ন তুল্য প্রকৃতির লীলাভূমি কাশ্মীর উপত্যকা বিধগুচিত্তে ত্যাগ করিয়া আমরা শীতের প্রারম্ভে একদিন অপরাহ্নে রাউলপিণ্ডী নগরে কিরিয়া আসিয়াছিলাম। সে রাত্রে পূর্বে পরিচিত জনৈক বন্ধুর বাটীতে স্থপতি ভোজনে ও স্নানোত্তর পথপ্রদর্শন করিয়া পরদিবস প্রাতে আমাদের কয়েকটি সংযাত্রী গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ব্যস্ত হইলেন। আমরা অবশিষ্ট তিন জন ইতিহাস-বিশ্রুত খাইবর গিরিসঙ্কট দেখিবার মানসে পেশোয়ার যাত্রা করিলাম। পথে দুইটি ছোট ছোট নদীর পার হইরা প্রায় মধ্যাহ্নে আটক ঠেসনে উপনীত হইলাম। এই স্থানে স্নানোত্তর করিয়া সিদ্ধনদের সুবিধাও সেতু দর্শন করিবার ইচ্ছার গাঢ়ি হইতে আমরা পড়িলাম। বিপুল সিদ্ধুর বেগবান স্রোত সংবৎ করিয়া সেতুটি সুদৃঢ়রূপে নির্মিত হইয়াছে। ইহা যদিও বৈশিষ্ট্যে গৌণ, পদ্মা, গোদাবরী প্রভৃতির সেতুগুলির অপেক্ষা অনেক ছোট, তথাপি নির্মাণ কৌশলে কাহারও অপেক্ষা মীন নহে। স্রোতের প্রচণ্ড বেগঃস্থাপ করিয়া পলটিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক তন্তুর সমুখে জলের উপর আর একটি করিয়া স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। সেতুটি দুর্গ বিশেষ; শত্রুর আগমন রোধ করিবার জন্য চাদের উপর কামান স্থাপনের অনেকগুলি ছিদ্র আছে। পূনের চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরবর্তী ট্রেনে পেশোয়ার যাত্রা করিলাম। পথে নাওসেরা ইত্যাদি কয়েকটি বৃহৎ সেনানিবাস লক্ষিত হইল। এদিককার বড় বড় ঠেসন গুলি প্রায় সমস্তই সেনা নিবাস; দেখিলেই প্রতীক্ষমান হয়, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ইংরাজ রাজ কর্তৃক কিরূপ সুরক্ষিত।

সন্ধ্যা অতীত হইলে আমরা পেশোয়ার ঠেসনে পৌঁছিলাম। এখানে কমিসেরিরটের তদানীন্তন বড় বাবু ত্রীমুক্ত বেলীমাধব গাঙ্গুলীর নামে রাউলপিণ্ডী হইতে একখানি পত্র আনিয়া ছলাম। ঠেসন হইতে টোলা বানে প্রায় রাত্রি ৮টার সময় তাঁহার বাটী উপস্থিত হইলাম। রাউলপিণ্ডীতে শুনিয়াছিলাম যে, পেশোয়ারে রাত্রিকালে পথভ্রমণ বিপজ্জনক; টোলা চালকের আকৃতিও ভীতিব্যঞ্জক ছিল। সেজন্য কিঞ্চিৎ অশান্ত চিত্তে আমরা উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল। বেলীমাধব দর্শন পাইরা আমরা আশ্বস্ত ও পরম আপ্যায়িত হইলাম। তিনি অতি সজ্জন ও অমায়িক; আমাদের সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বাহাতে অভিনির্দেশের কোন অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইরা পড়িলেন।

আমাদের পেশোয়ারে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য সুপ্রসিদ্ধ খাইবর পাস দর্শন। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে আপাততঃ দুই দিন এই পথে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। ভারতবাসীদের গতরাতের জন্য সপ্তাহে কেবল দুইদিন নিষ্কিষ্ট আছে। খাইবরের নিকটবর্তী পার্শ্বপ্রদেশে আফ্রিদি, জাক'খেল, মাহুদ প্রভৃতি যে সকল ভীষণ অসভ্য মূলমান জাতিসমূহ বাস করে, তাহারা কাবুলের আমীরের বা ইংরাজরাজের বশতা স্বীকার করে না। শুনিলাম, তাহাদের দলপতিগণ খাইবর যাত্রীদিগকে নিরাপদে গতরাত করিতে দিবার জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্টের নিকট বার্ষিক বৃত্তি পায়, এবং এছাড়া সপ্তাহে দুই দিন তাহাদিগকে নিঃশঙ্কর গন্তব্য স্থানে বাইতে দেয়। অগত্যা বেলীমাধবের আশ্রয়ে আমরা দুই দিন থাকিতে বাধ্য হইলাম।

পরিবাস প্রাতঃকালে আমরা বেলীমাধব সহিত এখানকার প্রসিদ্ধ ধনী ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ত্রীমুক্ত লাল বালসুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিঃ



খাইবর গিরিসঙ্কট—কাফলা বাজা।

(মেসার্স বোর্গ এণ্ড শেপার্ড কর্তৃক গৃহীত ফটো হইতে)

বাইলাম। ইহারই অর্থ সাহায্যে পেশোয়ারে হাঁসপাতাল ও একটি বটকা স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজ রাজকর্পচারীরা ইহাকে বিশেষ সম্মান করেন। তনিলাম, মহারাজী• ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর সময় ইনি গভর্নেন্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। বেণীবাবু সহিত ইহার বিশেষরূপ পরিচয় থাকায়, আমাদের সম্মুখে অত্যর্থনা করিলেন। আমাদের খাইবর পাল দেখিবার আশ্রয় তনিয়া তৎক্ষণাৎ সীমিত প্রদেশের ইদানীং সেনাপতি জেনারেল রুপ কেনেলকে (পরে ইনি নাইট হইয়া উক্ত প্রদেশের শাসনকর্তা হন) জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার কয়েকটি বন্ধু সেইদিন খাইবর পথে বাইতে পারেন কি না; কিন্তু যে উত্তর আসিল তাহাতে আমরা আপাতত দুই দিন খাইবার আশা

পরিত্যাগ করিলাম। পৈত্রাধ্যক্ষ লিখিলেন যে, আমাদের খাইবার অনুমতি দিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু প্রাণের জন্ত তিনি দায়ী হইবেন না; অসভ্য জাতির অনুগ্রহের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিবে। অতএব দুইদিন পরে যাত্রাই স্থির করিলাম।

লালা সাহেব আত্মর বেহানী সহদা তত্বাদি আনাইরা আমাদেরকে খাইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কাবুলের যে সকল কল আমাদের দেশে বিক্রীত হয়, এখানকার সস্তা আনীত কলের সহিত তাহাদের তুলনাই হয় না। কাবুল হইতে বড় বড় বাসে আঙুর আসে; পেশোয়ারের, বাজারে ঐগুলি তাদিরা ছোট ছোট চারি পাঁচ বাসে রাখা হয় এবং তাহাই আমরা দেখিতে পাই। রেলো আসিতে কলগুলি শুকাইয়া ছোট হইয়া যায়, অনেক পচিয়া!

বার। সন্ধ্যা শুনি এখানে হরিং বর্ণ, দেখিলে বোধ হয় অগ্নক, কিন্তু আশাবনে এত ভিটে যে খাইরা জলপান না করিয়া থাকিবার না। যে বেবানা শুনি পেশোয়ারে পৌছিবার পূর্বেই ডাকিয়া যায়, সেগুলি এখানকার বাজারে অতি সাধারণ সূণ্য বিক্রীত হয়; যে কলগুলি উত্তম অবস্থায় আসে, সে সমস্ত ভারতের নানা স্থানের ব্যবসায়ীরা লইয়া যায়।

কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকের পর লালা সাহেবের অতুল্যের সহিত আমরা হরিসিংহের দুর্গ দেখিতে গেলাম। হরিসিংহ পাঞ্জাব কেন্দ্রী ষণ্মুখ সিংহের অত্যন্ত সেনাপতি এবং এই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন; তাঁহারই বাহুবলে অনিতপূর্ব পাঠান রাজ্য কাবুল পর্যন্ত শিখদিগের হস্তগত হইরাছিল এবং নাদিরশাহ কর্তৃক অগ্নজত কোহিনূর মণি আগার তাত্তবর্ষে কিরীয়া আসিয়াছিল। আমাদের দেশে রমণীগণ যেমন “বর্গী এল দেশে” বলিয়া শিতদিককে তর্য্য প্রদর্শন করে, আফগান রমণীগণ এখনও সেইরূপ হরিসিংহ আগিতেছে বলিয়া ছেলোদের ঘুম পাড়ায়। দুর্গট ছোট এবং অধিকাংশ সুগম। শত্রু আক্রমণ নিবারণের হস্ত উপরে কামান সাজাইবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সময়ে এরূপ দুর্গের কোন সামর্থ্য ও আবশ্যকতা না থাকিতে পারে। কিন্তু ষণ্মুখের রাজত্ব কালে ইহার যে দৃঢ়তা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতঃপর আমরা শিখ ধর্মশালা, মন্দির, বাজার ইত্যাদি দেখিলাম। বেনীবাবু তাঁহার আর এক সম্ভ্রান্ত শিখ বন্ধুর বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানেও হুহু কাবুলি কলের বিলম্ব সম্ভাবনার করিলাম। আমাদের দেশে টেট-খানার যেমন তাম্রকূট সেবনের সহজায় থাকে এবং উহা ঘরা আগন্তকের অত্যাধনা করা হয়, এখানে তৎপরিবর্তে টেবিলের উপর স্থিষ্ট কাবুলি কল সজ্জিত থাকে এবং 'কোন তত্ত্বলোক আসিলে তাহা ঘরা আগ্যারিত করা হয়।

মধ্যাহ্নে আমরা প্রত্যাগমন করিয়া বেনীবাবুর বাড়ীতে স্নানার্থ করিলাম। আমরা এখান প্রথম

হুহার বাসে খাইলাম। এরূপ উৎকৃষ্ট ও সুবহু বাস পূর্বে কখনও খাই নাই। কলিকাতা নিউমার্কেটের প্রথম শ্রেণীর মটন-উপার সহিত তুলনা হয় না। হুহা জাতীর মেবগুলি বড় হইলে তাহাদের পশ্চাত্তানে খানিকটা বাস ও চর্চি বর্ধিত হইয়া সুনিয়া পড়ে, এই চর্চি কাটিয়া লইয়া কাবুলি হুহের দ্বারা ব্যবহার করে; এই বর্ধিত অংশ কতন করিলেও যে বাচিয়া থাকে ও কতদূর কিছুদিন পরে তত্কারি যায়।

পর দিবস প্রাতঃকালে আমরা একখানি টোলা ভাড় করিয়া পেশোয়ার হইতে নর মাইল দূরে বারা নামক স্থানে পৌছিলাম; এই স্থানেই আফগানিস্তান ও ইংরাজ রাজ্যের সীমা। ইহার নিকটবর্তী শাহীলের অধিকারভুক্ত অন্তঃ একশত বিঘা ভরিতে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। তুলিলাম এই চাউল বিক্রয় হয় না; আবার ইহা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখেন এবং কিয়দংশ ইংলণ্ডের, ভারতের রাজপ্রতিনিধি ইত্যাদিকে উপহার প্রেরণ করেন। অতঃপর নিকটবর্তী জলের কল দেখিতে যাইলাম। কয়েকটি তলাশয়ের সুবাদে তল এই স্থান হইতে নল সহকারে পেশোয়ারে নীত হয়। বৈকালে পেশোয়ারের বৃহৎ বাজারগুলি পরিদর্শন করিলাম। চাউল, ডাল কড়াই প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন বাজার 'চাউল কামতী' 'দল কামতী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তদনন্তর এখানকার সুবৃহৎ সরাই দেখিলাম। কাবুলের কল প্রভৃতি লইয়া যে সব ব্যবসায়ী পেশোয়ারে আসে, তাহারা এই সরাইতে অবস্থান করে এবং ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য লইয়া যদ্যে প্রত্যাগমন করে। তাহাদের ভারবাহী শতাধিক উষ্ট্র ও তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছে; তুলিলাম আগামী কল্য উহাদের পৃষ্ঠে বাগ বোকাই করিয়া খাইবর পথে আফগানিস্তানে প্রত্যাগমন করিবে। এই সরাইয়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীদের বিত্তীয় স্থান হইতে আসিয়া কাবুলের কল ক্রয় করিয়া দেশ দেশান্তরে চালান দেয়।

পেশোয়ারে কয়েকটি বদবানীর সহিত আলাপ হইল। তুলিলাম, পূর্বে তাহাদের সংখ্যা অনেক অধিক

ছিল, এক্ষণে ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে। ইহারা এখানে একটি কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; ওখার মধ্যে মধ্যে উৎসব হয়। কোন বদবাসী পেশোয়ারে উপস্থিত হইলে ইহাদের আদর ও অভ্যর্থনার সীমা থাকে না। বদ বিহারে এরূপ অতিথি সংকার বিরল। অপরাহ্নে ইহাদের সহিত আমরা ভ্রমণে নির্গত হইতাম এবং সন্ধ্যায় পূর্ব্বের বাগার ফিরিয়া আসিতাম। এখানে দিবাভাগেও পথিমধ্যে সুটপাট ও খুন হয়; তিন্মু-দিগের হস্তেও এক একটি দেশী বন্দুক আছে এবং কথার কথার তাহা উত্তোলন করে। হুই জনে কলহ হইবামাত্র বলে “কেন আমার একটি ‘কারতুজ’ লোকসান করিবে?” সন্ধ্যার প্রাণ্ডই হওয়া অপেক্ষা কারতুজ নষ্ট ইহারা অধিক কতি মনে করে। পুলিশ প্রহরীরাও রাজ্যে তত্ত্ব ও দস্তাদিগের সম্মুখীন হইতে ভয় পায়। প্রহরীদের অস্ত্র পথে মধ্যে মধ্যে উচ্চ মঞ্চ আছে, তাহাতে মই লাগাইয়া অরোহণ করিয়া রাজিকালে সিঁড়িটি উপরে উঠাইয়া লয়। একদিন বারারে আমি কোন ভ্রম্য ক্রম করিবার ইচ্ছা, দোকানীর দর অপেক্ষা কিছু কম দিতে চাহিয়াছিলাম। সে এরূপ রাগান্বিত হইল যে, সতীরা তাহাকে বুকাইয়া নিরস্ত না করিলে আমার কি অবস্থা হইত বলা যায় না।

তাহার পর, খাইবর পথে বাইবার দিন। প্রাতঃ-কাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জনজ্যোত অবিরাম বাতাসাত করিতে লাগিল। ভীতিজনক গিহিসকট আজ সন্ধ্যায় কোলাহলে, উঠের ও অবস্থানের শব্দে সুখরিত। আমরা অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাজার অস্ত্র প্রস্তুত হইলাম। বেনীবাবুও আমাদের সহিত বাইবার অস্ত্র আকিস হইতে একদিনের ছুটি লইলেন এবং একখানি ক্রতগামী টোকা আনাইয়া দিলেন। খাইবর পথে তিনটি ইংরাজ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইরাছে; প্রথমটি ভারতবর্ষের সীমার পেশোয়ার হইতে কয়েক মাইল দূরে, নাম জমরুদ; দ্বিতীয় আলি মসজিদ, গিরিসকটের ন্যা-হলে, জমরুদ হইতে দশ মাইল দূরে; তৃতীয় সুতি

কোটাল, খাইবরের শেষ প্রান্তে এবং আলি মসজিদ হইতে স্রাবার দশ মাইল পশ্চিমে। সুতি কোটাল পর্য্যন্ত টোকায় বাইলে সে দিন আর প্রত্যাগমন করা যায় না; তন্মত্বে আমরা আলি মসজিদ পর্য্যন্ত বাইরা প্রত্যাগমন করিব স্থির করিলাম। পূর্ব্বরাত্রে বেনী-বাবু আমাদের অস্ত্র প্রচুর খাতিয়ামদ্বী প্রস্তুত করাইয়া-ছিলেন, তাহা সঙ্গে লইয়া আমরা টোকায় উঠিলাম। সহবাত্রী ম—বাবু শুনিয়াছিলেন যে, খাইবরের বিংশ সুসলমানগণ ককের দেখিলেই হত্যা করে; সে অস্ত্র তিনি মস্তকে এতদেপীর সুসলমানের দ্বার পাগড়ী বিধিয়া চাইলেন, এবং নাম জিজ্ঞাসা করিলে শেখ মহিম বলিবেন শির করিলেন। পেশোয়ার হইতে জমরুদ পর্য্যন্ত রেল আছে, কিন্তু আমরা সে পথে না গিয়া পেশোয়ার হইতেই টোকায় বাজা করিলাম। অতি সুন্দর সুশস্য পথ, আমাদের অশ্বদ্বয় তীরবেগে ধাবিত হইল। কোন কোন স্থানে পার্শ্বত্যাগ পথের দ্বার ‘চড়াই’ ও ‘উতরাই’ আছে, কিন্তু তাহাতে অবস্থান অক্লেশে উঠিতে ও নামিতে পারে। পথের দুই পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বতমালা সাঙ্গদেশে বহুশতাব্দীর কলঙ্ক ও বিবাদ কাহিনী লেপন করিয়া এখনও সমভাবে দণ্ডারমান রহিয়াছে। সেকেন্দর শাহ হইতে নাদির শাহ পর্য্যন্ত বিদেশীর দস্তারাজগণ এই পথে দুর্নিবার সৈন্য স্রোত প্রবাহিত করিয়া কতবার ভারতবর্ষের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছে। তাহাদের পদতরে এই পুরাতন পথ কতবার কল্মিত ও প্রতিধ্বনিত হইরাছে!

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আমরা একবার চতুর্দিক উত্তররূপে নিরীক্ষণ করিলাম। কত কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল ও কদর কতভাবে উবেলিত হইল!

পথের ধারে পর্ব্বতে উঠিতে অগ্রসর হইবামাত্র জনৈক পাঠান সৈনিক প্রহরী আমাদের নিবেদন করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করার সে উর্দ্ধে কয়েকটা গুহা দেখাইয়া বলিল যে, যে সমস্ত অসত্যবাদিতা এই জনিতে বাস করে, এই পর্ব্বতশ্রেণী তাহাদের অধিকৃত; কেবল পথটী ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের দখলে আছে। যদি কেহ

পথের বাহিরে যার তাহার জীবন রক্ষার দায়িত্ব কাহারও নাই। গিরিমাটির সাহসে বৃক্ষলতাশিশু পথ হইতে উপরে অনেকগুলি গুহা লক্ষিত হয়। তন্মিত্ত অনেক সপরিবারে উহাতেই আশ্রয় বাস করে। সকলেরই নিকটে একটি বেশী বন্দুক আছে; বন্দুক ইহাদের এত প্রিয় যে, কেহ কেহ পুত্রকল্যাণের বিনিময়েও উহা ক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের আকার হিংস্রমস্তক ভায়া, চোখ দেখিলে আতঙ্ক হয়। টোকার অগ্রসর হইয়া ইহাদের কয়েকখানি গ্রামও দেখিলাম। বরঞ্চলি সমস্তই যুগ্ম ও তৃণাচ্ছাদিত; ভায়াপি প্রত্যেকটা প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত এবং এক একটা এককোণী। এই মধ্যে কয়েকটা ছিদ্ৰ আছে তাহাতে বন্দুক স্থাপন করিয়া ইহারা শত্রুর প্রতি গুলি বর্ষণ করে। আজ সমস্ত পথটি ‘খাইবর রাইফল’ দলের পাঠান সৈন্যগণ কর্তৃক সুরক্ষিত। সপ্তাহে দুইদিন ইহারা এইরূপ প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত হয়।

আমাদের টোকা দ্রুতবেগে দাবিত হইয়া ক্রমে ‘কাকলা’ নিকটবর্তী হইল। আকগানিখানের ব্যবসায়ীগণ স্বদেশীয় পণ্যক্রয় শত শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া পেশোয়ারে আগমন করে এবং উহা বিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষীয় দ্রব্য লইয়া কিরাতা যায়। এই শ্রেণীবদ্ধ ভারবাহী উষ্ট্র ও তাহাদের চালক ও রক্ষক দিগকে ‘কাকলা’ বা ‘ক্যাগাতান’ কহে। ইহারা প্রত্যাগে পেশোয়ার হইতে বহির্গত হইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই খাইবর অতিক্রম করে। উষ্ট্রগুলি ঠিক ভারতবর্ষীয় জন্তুদিগের ভায়া নহে, বৃহৎ লোমে ইহাদের অবরূপ আবৃত। আমরা এই শোভাবাজা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। ক্রমশঃ ইহাদের অতিক্রম করিয়া আমাদের টোকা অগ্রসর হইল। গিরিসঙ্কট কোথাও বা সন্ধ্যা কোথাও বা সূর্যশস্ত, দুই দিকে উচ্চশির পর্বতমালা কোথাও বা পদ্মস্রবের নিকটবর্তী হইয়াছে, কোথাও বা দূরে চলিয়া গিয়াছে। পথে মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি সমাধি স্তম্ভ দেখিলাম, তন্মধ্যে

কয়েকটিতে আকগান বৃহৎ হত ইংরাজ সেনানীরও নাম খোদিত রহিয়াছে।

মধ্যাহ্নে আমরা দশ মাইল অতিক্রম করিয়া আলি মসজিদ গিরিদুর্গের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। টোকা হইতে অবতরণ করিয়া বিশ্রামার্থ বহল বিছাইতে উত্তম হওয়ার নিকটস্থ সৈনিক প্রহরী আমাদের একটি গুহ্যের ঘোপ দেখাইয়া তাহার ভিতর বসিতে বলিল। বাহিরে থাকিলে কোনও গুহা হইতে বন্দুকের গুলি আসিয়া আমাদের প্রাণনাশ করিতে পারে। আমরা তাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহারই নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করত খাণ্ডস্বায়ের সন্ধ্যাবহার করিলাম। অতঃপর সন্ধ্যার দুর্গের উপরে উঠিতে উত্তম হইলেন। প্রাতঃ-কালেই আমার শরীর কিছু অসুস্থ ছিল; পঞ্চম অর অধিক বেধ হইল; সেইজন্য দুর্গে উঠিতে আমি সাহস করিলাম না। ম—বাবু ও আমি ঘোপের ভিতর বসিয়া রহিলাম। দুর্গটি এক স্বতন্ত্র বলিরাজ্যের মত পাহাড়ের চূড়ার নির্মিত। আরোহণ ও অবতরণ করিবার একটি মাত্র পথ আছে। পাহাড়টি স্বভাবতই বেন সূক্ষ্ম গিরিদুর্গের জন্ত সৃষ্ট; অল্প সংখ্যক সৈন্য সাধ্যায়ে ইহাতে আশ্রয় করা যায়। দুর্গের শিখর হইতে শত্রুদিগের গতিবিধি অনেক দূর পর্যন্ত লক্ষিত হয়। কামানগুলি উপরে একরূপ ভাবে সজ্জিত আছে যে, কণকাল মধ্যেই উহা হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে পারে।

সহবাসীরা প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে নামাজাতীর পথিক আমাদের সম্মুখ দিয়া গতান্বিত করিল। কাবুল হইতে আর একটি ‘কাকলা’ শতাধিক উষ্ট্রে দাল বেঝাই করিয়া পেশোয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের পৃষ্ঠের অন্তর ও অন্তর কলের স্ফূরণে পথ অমোদিত হইল। সন্ধ্যা কিরাতা আসিলে আমরা আবার টোকার উষ্ট্রা সন্ধ্যার প্রাকালে পেশোয়ারে পৌছিলাম। সেই রাত্রে আহারাদি করিয়া ডাকগাড়ীতে গৃহের স্টেশনে বাজা করিয়া, দুই দিন পরে পাটনার উপস্থিত হইলাম।

শ্রীমদ্রথনাথ দে।

প্রাচীন যুরোপীয় নৃত্য প্রথা

(১৮৫৩ খৃঃ প্রকাশিত Read's Characteristic Dances of all Nations গ্রন্থ হইতে)



ফ্রান্স। "মিহুরে দ'লা কু" নৃত্য



ଇଟାଲୀ । ବିଶ୍ୱାସନିଷ୍ଠାନ ଗୃହ



স্পেন। ফান্সাগো নৃত্য



ଫିଗ । କାନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ

মিলনপথে

(উপন্যাস)

[পূর্ব প্রকাশিত অংশের চূড়ান্ত।—গোবিন্দ দাস একজন বৈষ্ণব, তাহার জীবন নাম রাসমণি। ইহাদের একমাত্র কন্যা মাধবী। গোবিন্দ কোনও সময় জমিদার অমৃতলাল রায়ের একটা বিশেষ উপকার করিয়াছিল, তাই রায় মহাশয় গোবিন্দকে অত্যন্ত মেহের চক্ষে দেখিতেন; মাধবী জমিদার বাবুর অন্তঃপুরে গিয়া অমৃতলালের পুত্র অশোক ও কন্যা উমার সহিত খেলা করিত। অমৃত বাবুর কুপার মাধবী তাঁর কন্যা উমার সঙ্গে স্নেহমিত্র লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। অমৃত বাবু স্বয়ং উমা ও মাধবীকে গান বাজনা শিখাইতেন। ঘরের এইরূপ শিক্ষাদীকার রাসমণি বড়ই চিন্তিত হইয়া উঠিত, কিন্তু গোবিন্দদাস, আনন্দে মেথেকে উৎসাহ দিত। ৮ বৎসর বয়সে মাধবীর বিবাহ হইল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বস্তরবাড়ী গেল। তিন দিন পরে সে ফিরিয়া আনিলে উমা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার বয়স কেমন রে?” মাধবী বলিয়াছিল, “একটুও তাল নর। অশোকদি যদি আমার বয়স হত ত কি মজাই হত, তিনজনে মিলে ‘সব সময় খেলা করতাম।’—ছাঁড়াগা, বয়স কয়েক মাসের মধ্যেই গরলোকবাত্রা করিল, মাধবী নিশ্চিন্ত হইয়া উমা ও অশোকের সহিত খেলা এবং ক্রমে লেখাপড়ার চর্চার দিনবাণন করিতে লাগিল।

উমার বিবাহ হইয়া সে স্বস্তরবাড়ী গেল। রায় মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী পরলোক গমন করিলেন। মাধবী এখন সুবতী হইয়াছে, তথাপি সে সর্বদা অশোকের বাড়ী গিয়া, তাঁর ঘর গৃহস্থালীর সব কাব্যকর্ম দেখে শোনে—লেখাপড়ার চর্চার অশোকের সঙ্গে সময় কাটায়। ইহাতে গ্রামে নিন্দা হইল। কেশব বোইমের সঙ্গে রাসমণি তাহার কন্যার মালা বদলের চেষ্টা করিতে

লাগিল, কিন্তু মেহের আন্তরিক আপত্তি জানিয়া গোবিন্দদাস ইহাতে অমত করিল। অশোক ও মাধবী পরস্পরের সঙ্গে কামনাকে প্রাণপণে দমন করিল। মাধবী আশা অশোকের বাড়ী যায় না—অশোকও চট্টগ্রামে তাহার সুশ্রীক তগিনীপতিব নিকট চলিয়া গেল। গ্রামে একজন চিরকুমার বৃদ্ধ বৈষ্ণব ঠাকুরদা ছিলেন, তাঁহার মনটি তত্ত্বিরসে পরিপূর্ণ, স্বভাবটি বড় মধুর। মাধবী তাঁহার কাছে সর্বদা যায়; তাঁর সেবা-শ্রদ্ধা করিয়া মনে একটু শান্তি পায়। মাধবীর পিতা মাতা, মাধবীকে এই ঠাকুরদার লিখায় রাখিয়া বৃন্দাবন দর্শন করিতে গিয়াছেন। ওদিকে উমা অনেক দিন পরে তাঁর দাদার সঙ্গে পিতৃগৃহে আসিবে।]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

“ঠাকুরদা!”

“কেন দিদি?”

“তোমার ভেত্রে আজ কি রাঁধব বল দেখি।”

“তোমার বা পুণী।”

“রোজই তো আমার পুণী মত রাঁধি, আজ তোমার পুণী মত রাঁধব। তোমার কি একটি দিনও নিজের ইচ্ছা মত খেতে সাধ হয় না ঠাকুরদা? নিজের ইচ্ছাটাকে এমন ক’রে অস্তরের ইচ্ছার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে নেই। ঠানবিসি যদি থাকত, বা তোমার একটি মেয়ে থাকত, তাহলে কাছে যেমন ক’রে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করতে, আমার কাছেও তেমনি ক’রে অন্তঃ একটা দিন তোমার নিজের ইচ্ছাটা প্রকাশ ক’রে বল দেখি।”

“মেয়ে থাকলে তাকে তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারতাম কি না, তা তোমার মত কে জানে বাবু? তিথিরীকে পথের ধূলা থেকে কুড়িয়ে এনে রাজার

সম্পদে 'আজ্ঞার' ক'রে রেখেছিল। কোনটা বেধে কোনটা ভোগ করব; তা ঠিক করতে পারছি নে ব'লেই তোর খুসীর উপর নির্ভর করছি।"

"চমৎকার বক্তৃতাটা হলো তোমার! বাবু—শোন এখন কি র'খব। গাছে একটা মোটা পেয়েছি, দু'টে উচ্ছে, বেগুন, আর একটা ছোট কুমড়োও পেয়েছি। ডাল তো হবেই, তার সঙ্গে বেগুন তাহা। আর মোটাটার বস্ট, একটু শুক'নি, আর—"

"রন্ধে কর দিদি। আর পেয়ে উঠা না।"

"হুঁ, যোজাই তোমার পাতে পড়ে থাকে কত কিনা।"

"তুমি পড়ে থাকতে দাও কৈ দিদি? তোমার শাদন অমাত্র করি, আমার এমন মনের জোর তো নেই-ই বোধ হয়, আর কারও নেই। দেবতারিও দেবীদের চোখ রাজানি দেখে হতজ্ঞান হয়ে যান। তাই তো আমার ব্রজচলালের মোকন চূড়া রাধারানীর রাতা পারের ওপর লুটে থাকে, তাই তো মা কালীর পারের লীচে ভোলানাথ পড়ে থাকেন। তোমাদের শক্তির যে সীমা নেই।"

"আমি আর এখন তোমার কণ্ঠ শুনতে পারিনে,—বেশ হয়ে গেছে র'খতে যেতে হবে। চলায় এখন।"

"না, একটুখানি দেরী কর; তোমার জন্তে কিছু মাছ নিয়ে আসছি।"

"না, না, আমি মাছ খাবনা। নিরানিবই তো বেশ, নইলে তোমার গারে এত জোর হল কেমন করে? তুমি তো বুড়ো হয়ে গেছ।"

"দিন পনেরো তোমার মা বাবা বৃন্দাবন গেছে, এর মধ্যে তো একদিনও মাছ খাওনি তুমি। আজ খেতেই হবে।"

"আমি আর ক'খনো মাছ খাবনা, তোমার মত বৈষ্ণব হব।"

"বুঝেছি। কিন্তু আমি ভাবছি কি; তোমার মা বাপ এলে—"

"সে ভাবনা তোমার নয়, আমার। তুমি এখন চান

করতে যাও; হোমার আদিক করতে করতে আমার রান্না হয়ে যাবে। আজ্ঞা, ঠাকুর্দা, এবার এত লোক এখান থেকে বৃন্দাবন গেল, তুমি যে বড় গেলে না?"

"ইচ্ছা করলেই কি সেখানে যাওয়া যায় দিদি? যে দিন সময় হবে, সেদিন ঠাকুর নিজেই ডেকে নেবেন আমার। তাঁর বাণী শুনেল আর কি কেউ বয়ে রইতে পারে?"

মাধবী জানিত, এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে ঠাকুর্দার অসুস্থতা তাঁহার হইতে কেবলই কথা বাহির হইবে। তাই সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। অগত্যা ঠাকুর্দাকেও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বলিতে বলিতে ঘরের উদ্দেশে বাজা করিতে হইল।

পনোরা যোল দিন হইল, রাসমণি ও গোবিন্দদাস বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছে। গোবিন্দ দাস নিজে তেমন পুণ্যলুক ছিল না, কিন্তু চর্চ্ছমনীয়া পত্নীটিকে বেশে আনিতে না পারিয়া স্তব্ধতা তাণাকে পুণ্য করিতে হইল। ঐশ্বর্য একদল বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যখন বৃন্দাবন বাজার উত্তাগ করিতে বাগিল, তখন রাসমণিই পড়িয়া থাকিবে কেন? সেকি এত বড় পাণিষ্ঠা যে ঠাকুর দর্শন করিতে পাইবে না? একটি মাত্র ঘরে মাধবী, সে তো সংসারী হইবে না। তাহার একজু'রে বাপ কিছুতেই যোগ্য বয় খুজিয়া পাইল না। মেয়েই যদি সংসারী হইল না, তবে সে কি লোভে কিসের আশার সংসার আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিবে? মাঝে মাঝে তীর্থ ধর্ম না করিয়া কি থাকা যায়? এতখানি বয়স হইল, মরণের আর তো বেশী দেরী নাই। পর-পারের জন্ত কিছু পাথের তো সংগ্রহ করিয়া লইয়া বাইতে হয়। নহিলে কি লইয়া সে পরলোকে বাজা করিবে? কিন্তু গোবিন্দ দাস অতশত বুঝিল না। তিন জনে বৃন্দাবন যাওয়ার মত তাহার টাকা নাই। রেলওয়ে কোম্পানিকে দক্ষিণা না দিয়া তো তীর্থ দর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করা যায় না। কায়েই সে স্ত্রীর বৃত্তির সারবত্তা, অল্পনয় বিনয়, রোষ, রোদন,

কিছুতেই বিচলিত হইল না। পুণালোভাত্মী মায়ের অবস্থা দেখিয়া মাধবীর ভারি হুঃখ হইল। সে ঠাকুরদ্বার শরণ লইল। চিরদিন অনেক প্রতি নির্ভর-পরাণী রাসমণিকে অত দূর দেশে বাইতে বেড়াইয়া যায় না। তাহার সঙ্গে হয় মাধবীকে, নয় গোবিন্দ দাসকে বাইতেই হইবে। মাধবীকে অন্তের সঙ্গে পাঠান যায় না। তাই ঠাকুরদ্বার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, “গোবিন্দ, তুমি বোমাকে নিয়ে চ’লে যাও। আর আমি মাধবীর কাছে থাকব। তোমার কোন ভয় নেই।”

হার, শুধু তর! তরের জন্তই কি গোবিন্দ দাসের আপত্তি? কিন্তু এই অপত্যাচীন বৃদ্ধকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে, মাধবীকে এক দিন চাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে কত খানি! কিন্তু স্বামীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার যোগ্যতা বা ইচ্ছা হয়তো রাসমণির আদ্যপেই ছিল না। সে ছই বিন শরনে ও অনশনে থাকিয়া অবশেষে জয়ী হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিল। সেইদিন হইতে ঠাকুরদ্বার গোবিন্দ দাসের বাড়ীতেই আছেন।

এখানে থাকিয়া থাকিয়া ঠাকুরদ্বার একটু ভীতি অনুভব করিতেছিলেন। মাধবীর জন্ত তিনি কি এই শেষ জীবনে ‘মোহগর্ভে’ ‘মায়াগর্ভে’ পড়িয়া গেলেন নাকি? এই চাঁদপানা মুখখানা কি তাঁহার রাখামাধবের মুখ ভুলাইয়া দিবে? না, যে অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ের সৌন্দর্য্যের একটি কণা মাধবীকে এমন জ্বলন্ত, এমন প্রিয়, এমন মধুর করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহারই প্রেম-বিন্দু মাধবীর ভিতর দিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে? এই যে সুখে হুঃখে, আনন্দে বেঁধনার চির অন্নন হাসি, এই যে অক্লান্ত সেবা চেষ্টা, ইহা ঐক্ককের কৃপাছাড়া কে লাভ করিতে পারে? মাধবীর হুঃখের গভীরতা আর বাহ্যিকই অব্যবহিত থাক, ঠাকুরদ্বার তো নাই। কিন্তু এই বালিকা হুঃখের তরাল সৃষ্টি দেখিয়া তার পার নাই, এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা মাত্র করে নাই, বের্ছার

এংশ করিয়া, জয় করিবার জন্তই অনবরত চেষ্টা করিতেছে। না জানি, ঐ ছোট বৃক্ষ খানিতে তারা কত বল লুফাইয়া আছে।

মাধবী বলিল, “হা ঠাকুরদ্বার, কোলের উপর বই খোলা রেখে কি ভাবছ আকাশ পানে চেয়ে, বল দেখি? তোমার ব্রহ্মবল্লভের নীলকান্তি মনে পড়ে গেছে নাকি?”

মাধবীর বখার ঠাকুরদ্বার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, “তাই তো সম্ভব যদি। তুমি যাকে ভালবাস, তার কোন সাদৃশ্য দেখলে, তাকে কি তোমার মনে পড়ে না মাধু?”

মাধবী হাসিয়া বলিল, “না, তোমার মত অতটা প্রেম বা কবিত্ব আমার নেই। না বাবাকে তো খুব ভালবাসি, কিন্তু টেক, কিছু দেখে টেকে বিশেষ কিছু হয়না আমার; অম্মনিই তাঁদের মনে হয়। তুমি ও কি বই পড়ছিলে? হতে কি তোমার ঠাকুরের কথা আছে নাকি?”

“ঠাকুরের কথা ছাড়া কি কোন বই আছে নাকি? আমি গীতা পড়ছি, তুমি ব’লে শোন খানিকটা। এখন তো তোমার কোন কায় নেই?”

“দোহাই ঠাকুরদ্বার! চেষ্টা ক’রে আমার ধার্মিক খানিরে তুলোনা। আমি তোমার পাখরের ঠাকুরের ভেতর কোন রস খুঁজে পাব না। আমার প্রাণ শুকিয়ে যাবে।”

কৃত্রিম কোণের সহিত ঠাকুরদ্বার বলিলেন, “ছি। অমন কথা বলতে নেই। এখন থেকে তোমাকে মালা তিলক ধারণ করতে হবে, রোজ পূজা আত্মিক করতে হবে। মালা তিলক ধারণ না করার সবাই যে তোমার কত নিন্দে করে জান না?”

বৈষ্ণব সমাজের গৃহীণীদের মত মালা তিলক ধারণ করিয়া হরিনামাকিট দেহে আত্মিক করিতে বলিয়া গিয়াছে, ইহা কল্পনা করিতেই মাধবীর খুব হাসি পাইল। সে হাসি চাপিয়া বলিল, “আমি খুবই জানি—আমার মুখের ওপর কত লোকের ব’লে যায়।

কিন্তু আমার মন কিছুতেই ও-সব করতে চায় না। আমি কি করব বল ?”

“তোমার অত বড় জ্বরে ঠাকুরের জন্তে একতিল স্থানও কি নেই ?”

“বল কি ঠাকুর্দা! তুমি বলে থাক, ঠাকুর ত্র্যম্বক ব্যোমে আছেন। আমার জ্বর কি ত্র্যম্বক ছাড়া ?”

ঠাকুর্দা আর কোন কথা না বলিয়া ঐশ্বর্যস্বামীর চাকর মনোনিবেশ করিতে সচেষ্ট হইলেন।

তুলসী তুলার সন্ধ্যার দীপ দিয়া প্রণাম করিয়া মাধবী সেইখানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই যে প্রণাম, ইহা কি নিতান্তই নিম্নার্থক ? নিতান্তই তপ্তমো ? মাধবীর জ্বরে ভগবানের স্থান আছে কিনা, ঠাকুর্দা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। মাধবী পরিহাস করিয়া বাহাই বলুক হা কেন, ভগবান তাহার জ্বর ব্যাপিরা আছেন, এই উপলব্ধি কি সত্য সত্যই তাহার অন্তরে চিরজাগ্রত হইয়া আছে ? অন্তরের মধ্যে তলাইয়া দেখিলে তো তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন। বিশ্বের ঠাকুর আজ যদি তাহাকে স্বয়ং ধরা না দেন, তবে এই অকুল পাথারে তাহার ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আর তো কিছুই দেখা যায়না। মাধবী বাহা দিয়া জ্বর পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কি মূল্যহীন, একেবারে নির্ভাজ মিথ্যা ? তাই যদি হয়, তবে হে কালালের ঠাকুর, হে অশরণের শরণ, তুমি ইহাকে সত্য কর, সার্থক কর। কিন্তু কাড়িয়া লইও না। কাড়িয়া লইলে হয়তো মরিতে হইবে। হি হি ! চিন্তের এ কি দীনতা ! মাধবী চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গেই জ্বরের সমস্ত রক্ত দীনতা সে বেন কাড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ছোট আদিনা ঝনি বহু তরল অঙ্গকারে তরিতা বাইতেছিল। বেল, টগর, করবী প্রভৃতি ফুটত ফুল ফুলিয়া রক্ত গন্ধ দ্রব্য বাতাসে তাসিয়া বেড়াইতেছিল। ঘরের এক কোণে বসিয়া ঠাকুর্দা জপ করিতেছিলেন। মাধবী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া জপনিরত বৃদ্ধের শান্ত আনন্দোচ্ছল মুখপানে একবার তাকাইয়া, আবার

আকিনার আসিয়া পাইচারি করিতে লাগিল। ঐ শান্তি ঐ আনন্দ, ঐকীবনে বোধ হয় মাধবীর প্রাণ্য নহে। কিন্তু সে জন্ত হুঃখই বা কেন ? তাহার জ্বর তো ভগবানই গড়িয়াছেন, সে নিজে তো গড়ে নাই। তাহার সুখ হুঃখ ভাল মন্দ, সবই তো তাহারই দান।

পয়দিন অতি প্রভাতে তুলসীমঞ্জরী আসিয়া ডাকিল, “মাধবি!” মাধবী সাজি লইয়া ফুল তুলিতেছিল। সিন্দুরে বলিল, “এত ভোরে কেন জাগরি ?”

তুলসী সে প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, “কাল রাত্রে বাবুর বাড়ী যাওনি ?” তাহার আশোকের প্রজা, বাবু অর্থে আশোক। প্রশ্ন শুনিয়া মাধবী ভীত হইয়া উঠিল। বলিল, “রাত্রে সেখানে যাব কেন ? কি হয়েছে ?”

তুলসী আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলিয়া একটু স্থির হইল। তবে আজ নুতন খবরটাই সে মাধবীকে দিতে পারিবে, এত ভোরে ছুটিয়া আসা নিম্নার্থক হয় নাই। সে বলিল, “কাল রাত্তিরের গাড়ীতে বাবু দ্বিবিঠাকুরকে নিয়ে ফিরে এসেছেন যে। ওরা ইষ্টিমেন ছিল, দেখে এসেছে। রাণী বেশ বড় হয়েছে, আর কি সুন্দর হয়েছে। কোলের ছেলেটি বেন রাজ পুতুর। কি সুন্দরই হয়েছে! দেখলে নাকি কোলে না ক’রে থাকা যায় না। দ্বিবিঠাকুরের সোহাদমী তো হাকিম। ছেলেমেয়ে থাকে ভাল, আর ভাল, বড় বেণী, সুন্দর হবেই বা না কেন ? দ্বিবি ঠাকুর কতদিন পরে বাপের বাড়ী এলেন। কিন্তু বা-ই বল, মা নেই, বাপ নেই, কে বা দেখে শোনে ? বড়লোকের ঘরে বটে, কিন্তু বাপের বাড়ীর সুখ নেই।”

তার পর একটু থাকিয়া বলিল, “তুই এখন বাবি, আমাকে ডেকে নিয়ে বাস। দ্বিবি ঠাকুরকে দেখে আসব।”

মাধবী এতক্ষণে কথা কহিল,—“আমি আজ যেতে পারি কিনা সন্দেহ। ঠাকুর্দা আর সব সময়ে চোখ বুজে থাকেন। ক’র উপর বাড়ী ঘর ফলে যাই বল।”

মাধবীর কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া তুলসীর বিষয় চরম সীমায় উঠিল। সে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল, তার পর উত্তপ্ত কর্তে বলিল, “এই দিদি ঠাক্কপের সঙ্গে তোমার গলার গলার ভাব ছিল। আজ কিনা বলছিস, তোমার দেখা করার সময় হবে না। মেজো বাবু যে তোমার জন্তে কতখানি করেছেন, তা কি হু’দিনেই ভুলে গেলি? এই কুঁড়ে ঘরে যদি সাত রাজার ধন এক মণিক লুকিয়েই রেখে থাকিস, তা-ই বা হু’দণ্ডে কে চুরি ক’রে নিয়ে যেত? সাথে কি শুদ্ধর লোকেরা আমাদের ছোট লোক ব’লে ঘেরা করে?”

তুলসী আর দাঁড়াইল না, কিন্তু মাধবী তরু হইয়া বিবর্ণ মুখে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রয়োজন পরিচ্ছেদ

রাজি দশটার াঁপে অশোক উমাকে লইয়া বাড়ী পৌঁছিল। পূর্বেই বহু খবর পাইয়া বখাসাখ্য আরোজন করিয়াছিল। অশোকের পক্ষ হইতেও আদরের ক্রটি হয় নাই, কিন্তু তবু পিতৃহারা মাতৃহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া উমা কাঁদিয়া ফেলিল।

পরদিন তোমার উঠিয়া উমা আর একবার চোখের জল মুছিয়া বিশৃঙ্খল গৃহের শৃঙ্খলার লাগিয়া গেল। অশোক রাণীকে লইয়া ছাদের উপর খেলা করিতে বলিল। বলিল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্তমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল।

এই অন্তমনা ভাবটা এতই স্পষ্ট যে, এক সময়ে রাণী বলিয়া উঠিল, “মাঝা বাবু, তুমি আজ খেলার মন দিচ্ছনা কেন?”

অশোক সহসা হুই হাঁত বাড়াইয়া রাণীকে টানিয়া আনিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। রাণী অবাক হইয়া মাঝা বাবুর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। অশোক বলিল, “এখন আর জেলা করেনা না, তুমি তোমার কির সঙ্গে চান করতে যাও।”

“তবে তুমি আমার পুতুল গুলি শুছিয়ে বাস্কাটা

বন্ধ করে রেখে দিও।” বলিয়াই রাণী অশোকের বাহু বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। মাঝা বাবুর খেলার মন নাই দেখিয়া, তাহারও খেলা ভাল লাগিতেছিল না।

হুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া উমা আসিয়া দ্বিজালা করিল, “মাঝা, মাধু তো একবারও এল না। সে কি আমার আসার খবর পারনি?”

অশোক অস্ত্র দিকে মুখ ক্রিয়াইয়া বলিল, “আমি তো তা জানিনে উমা।”

“ওবেলা বন্ধুকে তার কাছে পাঠাতে হবে” বলিয়া উমা বিশ্রাম করিতে গেল। ষ্টীমার ও ট্রেনে রাজি ভাগরণ করিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই যে ঘুমাইয়া পড়িল, সন্ধ্যার পূর্বে আর জাগিল না। যাক, আজ আর মাধবীকে ডাকা হইবে না—অশোক যেন একটা বিশদ হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পরদিনও উমা তোমার উঠিয়া ঝি চাকরদের লইয়া বখানিরমে কাঁবে লাগিয়া গেল। প্রতিবেশী হু’একটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে ইহারই মধ্যে রাণীর খানিকটা ভাব হইয়া গিয়াছিল। সে তাহাদের লইয়া নীচে কলরব করিতেছিল, আজ আর মাঝা বাবুর কাছে বড় যেসিতেছিল না। অশোক ছাড়া পাইয়া উপরের বারান্দার আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। এই যে সম্মুখে ছায়া-শীতল আঁকাবাঁকা পথটি পড়িয়া রহিয়াছে, অশোকের সুখ সুবিধা সম্পাদনের জন্ত ইহারই উপর দিয়া মাধবী দিনের মধ্যে পাঁচ সাত বার আনাগোণা করিত। আজ গাছের পাতার ফাঁক দিয়া তোমার সুন্দর আলো সেই পথের উপর পড়িয়াছে। এই আলোছায়ার বিচিত্র লীলার মধ্যে আজ আর চির পরিচিত হু’খানি চরণ গতি ছন্দে লীলারিত হইয়া উঠিতেছে না।

দিন ছই উমা আসিয়াছে, অশোকের সুখ সুবিধার প্রতি সে কিছু মাত্র উদাসীনও নয়। তবু অশোকের কেমনই মনে হইতেছিল, এই বিশাল বিবে সকলেরই প্রয়োজন আছে, সকলেরই বৈশিষ্ট্য আছে; কেহ

কাহারও শ্রুত স্থান পূর্ণ করিতে পারে না। শ্রুতস্থান পূর্ণ হওয়ার এতটুকু আশা, এতটুকু সম্ভাবনাও ছিল না। এই উচিত! এই উচিত! কতবড় মূল্যে অশোককে সামাজিক সম্মান ক্রয় করিতে হইয়াছে। এই বহুমূল্য জিনিষটাকে সবদেয় রক্ষা করিতেই হইবে।

“অশোক কেবল ভয় করিতেছিল, উমা কখন মাথবীকে ডাকিয়া বস। উমাকে কি বলিয়া সে নিবেদ্য করিবে? ডাকিলেও মাথবী আসিবে না, স্নেহে আত্মব্রতের অপমান করিল উমা তে মাথবীকে ক্ষমা করিলেন। তাহারই জন্য এই দু'টি স্নেহবাক্য সখীর মধ্যে ব্যবধান কল্পনা করিয়া অশোক ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

অপরাজিত অশোককে একেবারে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া দিয়া মাথবী আসিয়া উমার কাছে দাঁড়াইল। তাহাতে ক্রোধ বা অভিমানের কোন চক্ৰই ছিলনা, উজ্জল হাসির আলোকে তাহার মুখ চোখ অশ্রু করিতেছিল। ইচ্ছা সত্ত্বেও অশোক চলিয়া বাইতে পারিল না, তাহার পা দু'টা যেন কে অবশ করিয়া দিল। উমা অভিমানের সুরে বলিল, “এতক্ষণ তোমার সময় হল? আমি সকাল ০ বেলা তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম তারই জন্যে তুমি এবেলা এসেছ। আমি না গেলে তুমি কখনো আসতে না।”

মাথবী বলিল, “রাগ কর কেন তাই? খালি বাড়ী ছিল, তাই আসতে পারিনি। ত' তুমি না হয় গরিবের কুঁড়ে ঘরে পদার্পণ করেছই একটবার।”

“আঃ, কত ডগই শিখোঁছিস!” বলিয়া উমা মাথবীর গালে মুহু টোকা মারিল। তারপর মাথবীকে লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া বলিল, “আমি ভেবেছিলাম, তোর অসুখ করেছে। নইলে তুই আমার কাছে না এসে এতক্ষণ থাকতে পারনি কি করে?”

“মাথবী কি যেন জবাব দিতে বাইতেছিল, কিন্তু এমন সময়ে রাণী আসিয়া মাথবীকে দেখাইয়া দিয়া থাকে চিন্তাসা করিল, “মা, এই কি আমার মায়ী মা?” মুহূর্ত্তে এক বলক রক্ত আসিয়া মাথবীর মুখ লাগ

করিয়া দিল। অশোকের চোখে তাহা এড়াইল না। উমা তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, “না, তোর মায়ীমা।”

মাথবী নত হইয়া সাদরে রাণীকে কোলে তুলিয়া লইয়া, অগ্রসর হইয়া অশোকের কাছে বাইরা গোজা হইয়া দাঁড়াইল। তার পর তাহার সর্বাঙ্গে চকিতে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিল, “তুমি তো অনেক খানি রোগা হয়ে গেছ দেখছি। কালীতে থেকেও শরীর এত খারাপ হলো কেন?”

স্বপ্নষ্ট কর্ত্তের সহজ প্রশ্ন। সাধারণ ভাবে জবাব দিলেই হয়। অশোক জবাব দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা ফুটিল না। অশোকের অভিলষিত মুক্তি তৎক্ষণাৎ মিলিল। উমা মাথবীকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, “দাদার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা সময় পাবি। এখন আমার সঙ্গে চল।” বলিয়া তাহাকে এক রকম টানিয়া লইয়া নীচে চলিল।

সেই দিন হইতে মাথবী আবার খোজ চার পাঁচ বার উমার কাছে আসা যাওয়া করিত। পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই সে রাণী ও খোকার সঙ্গে খুব ভাব করিয়া লইল। অশোক তাহাকে এড়াইয়া এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত। দৈবাৎ বাদ কখনও দেখা হইত, তবে মাথবী হাসি মুখেই তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিত। কিন্তু অশোক সেই হান্তমুখীকে দেখিয়া অশান্ত কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত।

সেদিন মাথবী আসিয়া জানিল, উমা তাহার কাকার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে। সে কিয়দা বাইতে উদ্বৃত্ত হইল। বারান্দার অশোক দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পাশ দিয়াই মাথবীকে বাইতে হইবে। সে ধীরে ধীরে বাইতে বাইতে অশোকের পানে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ওখান থেকে উমাদি কখন ফিরবে জান?”

অশোক বাড় নাড়িয়া বলিল, “না তুমি কি একটু বসতে পারবে? আমার একটা কথা ছিল।”

মাথবী অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাবে বলিল, “আমাকে আরও কিছু বলা বাকি আছে নাকি?”

অশোক এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, “হ্যাঁ, বোস এইখানে।”

মাধবী, বলিয়া বলিল, “কি বলবে, তাড়াতাড়ি বল। আমার কাঁব আছে।”

অশোক কিন্তু তাড়াতাড়ি কিছুই বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা অর্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “আমার অপরাধ যে কতখানি হয়েছে, সে আমি জানি। তুমি আমার কেন লাজা মিচ্ছ না? আমি তো এ সহিতে পারিনি।”

মাধবী বলিল, “আমি কেন তোমার লাজা দিতে বাব? আমার মত লোকের কাছে, তোমার মত বড় লোকের কোন অপরাধই হতে পারে না।”

অশোক অত্যন্ত আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, “আর কিছু বলবে আমার?”

অশোক সে কথাই উত্তর দিল না। বখাটা তাকার কাণে গেল কিনা, বুঝা গেল না।

মাধবী চলিয়া বাইতেছিল, এমন সময়ে উমা আসিয়া তাড়াকে ধরিল। বলিল, “আমার একটু দেয়ী হয়ে গেছে তাই, তাই রাগ ক’রে চলে বাজিস নাকি?”

মাধবীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সহসা উমা শঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ওকি! হ্যাঁ, কি হয়েছে তোমার?”

অশোক তখনও আত্মহ হইতে পারে নাই। সে উমার পানে একবার চাহিয়াই ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। এই ব্যাপারে মাধবী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও লাজত হইয়া উঠিল। উমা মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদার কি হয়েছে মাধু?”

মাধবী বলিল, “তাকেই জিজ্ঞাস কর, আমি কি ক’রে বলব?”

উমা অণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “থাক তোমার ব’লে কাঁব নেই। ঘরে চল, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।” বলিয়া উমা মাধবীকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মাধবী হাসিয়া বলিল, “বন্দিনী নাকি আমি?”

উমাও হাসিয়া সুর করিয়া বলিল, “বন্দিনী তুমি মম হৃদি-কারাগারে।”

“কিন্তু তোমার কারাগারে ফণী বাবুর আর আমার এক সঙ্গে দু’জনের বায়গা হবে?”

“তাকে এখন মুক্তি দিয়েছি।”

“সত্যি নাকি তাই?”

“এ বিষয়ে ছেলেমানুষ তুই, তোমার সঙ্গে এসব আলাপ চলে না। বিঃ হ’লে সব বুঝবি। আজ্ঞা, একটা বিয়ে করনা তাই।”

“করেছি তো।”

“কাকে লো? কে সে ভাগ্যবান?”

“যে আমাকে দ্বন্দ্ব কারাগারে বন্দী ক’রে রেখেছে।”

“তামাসা এখন থাক। কাষের কথা শোন।”

এই বলিয়া উমা চুপ করিয়া রহিল। মাধবীর অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে, উমা এখন কি বলবে। উমা এই মাত্র মহেন্দ্রলালের গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আত্মীয় সন্তানদের প্রসন্নতা লইয়াও সে আসে নাই। প্রথমে মহেন্দ্রলালের রসনাতেই যে তাহার জন্ত বিবর সৃষ্টি হইয়াছিল, সে কথা মাধবীর অগোচর ছিল না। উমার মুখে সেই কথাটা শুনিবার জন্ত সে প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও তাহার বুক শুকাইয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, “বা বলবার, ব’লে ফেরেন। ইতস্তত করে কেন?”

তবু উমা কিছুক্ষণ ইতস্তত করিল। তারপর মুখ নত করিয়া মুহূর্তে বলিল, “গ্রামের লোকে তোমার আর দাদার নাকি তারি নিষেধ করছে, সেজন্য কাকা আজ এই কথা বলেন।”

মাধবী কিছুকাল চুপ করিয়া আবারো সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া শুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “নিষেধটা যে কত বড় মিথ্যা, সে তো তুমি জান।”

উমা এবার মুখ তুলিয়া বলিল, “জানি বৈকি। কিন্তু মিথ্যাকে প্রসঙ্গ দেওয়া চলে না মাধু। উচিত কাষও

সেটা নয়। সমাজে জ্ঞানমের সূচ্যকে তো উপেক্ষা করতে পারা যায় না।”

মাধবীর মুখে যে জগৎ আলিঙ্গ তাহা সে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কি করতে পারি? আমাকে কি করতে হবে, বল।”

“বিয়ে থা করে সংসারী হও না কেন মাধু?”

“ভাতেই মিথ্যা মরে’ সত্যের জয় হবে?”

“সম্ভব। আমার তো তাই মনে হয়।”

“আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি উমাদি, তোমাদের তত্ত্ব ঘরের কোন বিধব’র নাম যদি এমন মিথ্যা অপবাদ রটে যেত, সে কি বিয়ে করেই সব মুক্তির আসান ক’রে দিত?”

“আমি কোন দোষ তেবে বলিনি তাই, তোমাদের মধ্যে প্রথা আছে, তাই বলেছি।”

“আমাদের মধ্যে প্রথাটা আছে বটে, কিন্তু কেউ ব্রহ্মচর্য পালন করতে পাবে না, এমন প্রথাও তো নেই। আমরা সে বকম কিছু করলে, তোমাদের আপত্তি করার কিছু আছে?”

“কিছু নেই। মাধু, তবে তুই এই ভাবেই থাকবি, ঠিক করেছিস?”

“হ্যাঁ।”

উমা আবার চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

উমা আর কিছু বলেনা দেখিয়া মাধবী বলিল, “সন্ধ্যা হয়ে এল, ঠাকুরদার খাবার তৈরি করতে হবে। আমি এখন বাই উমাদি?”

উমা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “মাধু, কাল আবার আসবি তো? আমার ওপর রাগ ক’রে থাকবি না?”

মাধবী ব্রান হাতের সহিত বলিল, “না, রাগ করব কেন?”

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পাঁচ সাত দিন কাটিয়া গেল। মাধবী তেমন ভাবেই উমার কাছে বাতায়ত করিত। তাহার হাসি,

গল্প রহস্যের বিবাস ছিল না। উমা মাঝে মাঝে ভাবিত, মাধবী একটা অদৃত মেয়ে।

আজ মাধবী হুপুর বেণার বসিয়া বই পড়িতেছিল। ঠাকুরদা কোথায় গিয়াছেন, তাই সে খালি বাড়ী ফেলিয়া উমার কাছে বাইতে পারে নাই। এমন সময়ে তাহাকে চমকাইয়া দিগা উমাই আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল।

“এস দিদি, এস” বলিয়া সহাস্তে মাধবী উঠিয়া উমাকে বসিতে আগন দিল। কিন্তু শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত উমার গভীর মুখ দেখিয়া তাহার হাসি নিবিয়া গেল। উমা বলিয়া মাধবীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, “মাধু, তোকে আমরা কোন দিনই ছোট মনে করতে পারিনি। তুই ছোট নোস্ ব’লেই তোর কাছে একটা তিক্কা চাইতে এসেছি। হয়তো তুই আমাকে কোন বার্থপর ব’লে ঘৃণা করবি। তা করিস। তবু, দু’জনেই থাকে ভালবাদি, তোর যদি কিছু মঙ্গল হয়, তবে সে ঘৃণা গারে বাধবে না।”

মাধবী বলিল, “তুমি ক’রে আমার তাই তো বাড়িয়ে তুলছ। আসল কথাটা বল না কেন?”

উমা অত্যন্ত কাঁচর কণ্ঠে বলিল, “তুমি বিয়ে কর তাই, তোকে বিবাহিত না দেখলে দাদাও বিয়ে করবে না।”

উমার কথা শুনিয়া মাধবী স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অনেক ক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার দাদা কি এই কথা বলেছেন?”

“না, তিনি বলেন নি। তিনি তো সেজ কাকার মেজ ভামায়ের সঙ্গে মাসে মাসে মেয়ে দেখতে যাচ্ছেন, আর বাড়ী এসে বলছেন, পছন্দ হলো না। পছন্দ তাঁর কোন কালেই হবে না। শুধু সেজ কাকার মন রাখার জন্য মেয়ে দেখতে যাওয়া, তাকি আমি বুঝনে?”

“আমি বিয়ে করলেই তিনি বিয়ে করবেন, এটা তুমি নিশ্চয় বুঝছ?”

তুই বৎসর কাল জ্ঞানী তরুণী মাধবীর সমস্ত সেবা

একাত্ত সাধীপ্য—সাধাঙ্গিক অলঙ্কার বাধা সম্বন্ধে—
অশোকের মনে একটা অল্প আকর্ষণের স্রুটি করিয়াছে,
মাধবী বিবাহ করিয়া দূরে থাকিলেই প্রবল আশাতে
সেই আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া যাইবে, অশোক নিজের
কুল বৃত্তিতে পারিয়া বিবাহ করিয়া সুখী হইলে
উমার পিতৃকুল বজায় থাকিবে, এ সম্বন্ধে উমার কোন
সন্দেহ ছিল না। তাই সে দৃঢ় কর্তে বলিল, “হাঁ।”

মাধবী বলিল, “আজকের দিনটা আমাকে তাবতে
দাও, কাল আমি তোমাকে বলব।”

উমা আর্জি কর্তে বলিল, “আমার মনে হচ্ছে, তুই
আমার কথাই রাজি হবি। তা হলে কি আজ্ঞাদাই
হয় আমার। তোকে সুখী দেখব, ভাগ্যবতী দেখব,
তোমার কোলভরা সোণার চাঁদ ছেলে মেয়ে দেখব।
আর আমার বাবার ঘর তেমনি ভরা দেখব, আমার
দাদা সংসারী হবেন, এ কি আমার কম আজ্ঞাদ।
বিয়ের হলে বুঝবি তোমার মত শিশু বিধবার পক্ষে
ব্রহ্মচর্যা পালনই একমাত্র ধর্ম নয়।” বলিতে বলিতে
উমার বামিসেবার সুখ, বামিসেবার কথা মনে
পড়ায় চক্ষু দু’টি দিল হইয়া উঠিল।

মাধবী কথা কহিল না, উমার কোলের ভেগেটি
কোলে তুলিয়া লইল।

“উমা বলিল, “ঠাকুর্দা এলে তাঁর সঙ্গে দেখা ক’রে
যেতাম।”

মাধবী বলিল, “তিনি সন্ধ্যার সময় কিরবেন, ব’লে
গেছেন।”

“তবে আজ বাই আমি?”

“এস তাই।”

উমা চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় ঠাকুর্দা কিরয়া আসিয়া মাধবীকে
স্বস্ত ও চিত্তান্ত্রিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “বিদি
তোমার কি হয়েছে?”

“কিছু না। আমি বিয়ে করব”—বলিয়া মাধবী
হাসিল।

সেই হাসি দেখিয়া ঠাকুর্দা উৎকণ্ঠিত ভাবে মাধবীকে

কোলের কাছে বসাইয়া দ্বিজ্ঞাসা করিলেন, “হৈয়ালী
রাখ দিদি, আমার সব খুঁলে বল।”

মাধবী ঠাকুর্দার কোলের মধ্যে মুখ জড়িয়া
কাঁদিয়া ফেলিল। ঠাকুর্দা দুই হাতে তাহার মুখ
খানি তুলিয়া ধরিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিয়া
দ্বিধকর্তে দ্বিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ এমন নতুন
সাধ কেন হ’লো মাধু?”

মাধবী বলিল, “তা বলতে পারছি না, কিন্তু বিয়ে
আমাকে করতেই হবে। তুমি বাবাকে চিঠি লিখে
কেশব বোষ্টমের সঙ্গে সব ঠিক কর। ওখানেই মার
খুব ইচ্ছা ছিল।”

ঠাকুর্দা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে
লাগিলেন। তার পর বলিলেন, “আচ্ছা, সে হবে।
এখন তো আমার সন্ধ্যার ব্যয়গা ক’রে দাও।”

মাধবী উঠিয়া সন্ধ্যার ব্যয়গা করিয়া দিল। ঠাকুর্দার
সন্ধ্যা হইয়া গেলে, তাঁহাকে খাওয়ারিয়ারা নিজে অভুক্তই
হইয়া পড়িয়া রহিল।

মাধবী তোরো উঠিয়া ঘরের কাব কর্ম শেষ করিয়া
উমার কাছে চলিয়া গেল। বারান্দার উঠিতেই
অশোকের সঙ্গে ত্রোতার দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল।
অশোক তৎক্ষণাৎ মুখ কিরাইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া
গেল। দেখিয়া মাধবীর মন আগার কঠিন হইয়া
বাকিয়া দাঁড়াইতে চাহিল। কিন্তু সে নাকি আজ
কাহাকেও স্কন্ধ, কাহাকেও অসন্তুষ্ট রাখিবে না, মান
অভিমান, সুখ দুঃখ, নিজস্ব বলিয়াও আর দাবী করিবে
না, তাই সে অশোকের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া হালি-
মুখে বলিল, “পালিয়ে এলে বে? আমার সুখ আর
দেখবে না, প্রতিজ্ঞা করেছ?”

অশোক গভীর মুখে বলিল, “না। তেমন প্রতিজ্ঞা
করা কি সম্ভব?”

সন্ধ্যা মাধবী নত হইয়া অশোকের পায়ের উপর
মাথা রাখিয়া বলিল, “আজ আমার খুসী মনে মাপ
কর।”

অশোক বাস্ত হইয়া তাহাকে তুলিতে বাইয়া

দেখিল, শ্রাবণের খারার মত তাহার অশ্রুধারা বহিতেছে। সে মুহূর্তে বিচলিত হইয়া উঠিল। অতীত, ভবিষ্যৎ, সব ভুলিয়া গেল। সে সাদরে সম্মুখে মাধবীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া দ্রুত-দ্রুত কর্তে বলিল, “পাগল আর কি? আমি সত্যি তোমার উপর রাগ করে থাকতে পারি?”

মাধবী আর মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াইল না। ছুটিয়া বারান্দার আসিরা একটু দূর হইয়া চোখ মুখ তাল করিয়া মুছিয়া উঠার কাছে চলিল।

উমা রান্নাঘরে বীট পাতিয়া বসিয়া তরকারী কুটতেছিল। মাধবীকে দেখিয়া আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “কি ঠিক হলো তাই?”

মাধবী দ্রুত কর্তে বলিল, “আমি তোমার কথায় রাজি।”

উমা আবেগে ছুটিয়া আসিয়া মাধবীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিল, “আজ যে তুই আমাকে কত সুখী, কত নিশ্চিন্ত করলি, তা অন্তর্গামী জানেন।”

মাধবী বলিল, “নিশ্চিন্ত কেন? আমি হ’তে কোন অনিষ্টের আশঙ্কাও ক’রেছি নাকি?”

তাহার স্বরে বিজ্ঞপের আভাস পাইয়াও উমা বিচলিত হইল না। বলিল, “হি হি! কি যে বলিস তুই! দাদা আর তুই সুখী হ’বি, একটা নির্ভরতার আশ্রয় পাবি, এজন্তে কি আমি নিশ্চিন্ত হ’তে পারিনে?”

মাধবী এ কথায় অস্বাভাব না দিয়া বলিল, “তুমি তো রান্নাখাড়ার যোগাড় দেখছ, ওসব তো আমারও আছে। আমি এখন চন্ডাম উমাদি।”

“আচ্ছা, এস বোন্।”

অশোক উপর হইতে শুনিয়া, মাধবী মুহূর্তে শুধু শুধুনে কি গাফিলত গাফিলত চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে অশোক বেড়াইয়া কিরিয়া আসিলে উমা বলিল, “দাদা, এই মাসের মধ্যেই বোধ হয় কেশব বোষ্টমের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে হয়ে যাবে।” অশোক “হুঁ” বলিয়া ভ্রমণ পরিচ্ছদ খুলিয়া আলনার রাখিয়া

দিল। উমা জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কেশবকে চেন? সে তো মাধবীর অযোগ্য হবে না?”

অশোক সংক্ষেপে বলিল, “না।”

উমা অশোকের কাছে আসিয়া নিজের হাতের সোণার চুড়ি তাহাকে দেখাইয়া বলিল, “দাদা, এই প্যাটার্নের চুড়ি আমাকে গড়িয়ে দেবে? বিয়ের সময় মাধুকে দেব। তুমি তাকে কি দেবে?”

“তুই যা বলিস, তাই দেব।”

“তুমি একটা হার দিও।”

“আচ্ছা, তাই দেব। ছাদে বাট, বড় গরম।”

অশোক বাহির হইয়া গেল। অশোক ছাদের অন্ধকারে বেড়াইতে লাগিল। মাধবী বিবাহ করিতে বাইবে বলিয়াই কি আজ সকল বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিয়া গেল? বেশ তো, সে সুখী হোক। কিন্তু আজ তাহার ভাবী সুখের কল্পনার অশোকের মন আল্লাদে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে না কেন? অশোক যখন মনে মনে আপনাকে থিকার দিতেছিল, মাধবী তখন হাসিয়া হাসিয়া ঠাকুর্দাকে বলিতেছিল, “হী ঠাকুর্দা, তোমার কেশব বোষ্টম রাজি হ’তে তো?”

ঠাকুর্দা পরিতাপ করিয়া বললেন, “তোমার যে পরজ বৈধি, চলনা আজই তোমাকে সেখানে রেখে আসছি।”

“মা বাবা বাড়ী থাকলে আমার তাতে আপত্তি ছিল না।”

“সত্যি হি’দ, এতে কি তুমি সুখী হবে?”

“সুখই কি সব ঠাকুর্দা? সুখ ছাড়া ভগতে আর কি কিছুই নেই? সত্যি বলছি, সুখ আমার বরদাস্ত হয় না। ও জিমিসটা তগবান আমার ভেঁটে তৈরী করেননি।”

“তাই যদি হয়, তাতেও আমাদের আপশেব করার কিছু নেই। হুংখের অগ্নি-পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েই বাস্তব সুখ হয়। এক এক সময়ে ভাবনে হুংখ আসে, ঠিক বেতশূন্য প্রচণ্ড বৈশাখী মধ্যাহ্নের মত।

মাহুৰ বখন এই হুংখের রূপ দেখে তরে 'দশেহারি হুংখকে গ্রহণ করতে পারে, সে যে আনন্দ পায়, হয়ে পড়ে, অথবা একে দূর রেখে তরল সুখের সে আনন্দের আভা তার দেখে মনে অকুরন্ত হাসির সন্ধান করে; তখন সে এতটা মত্ত জুল ক'রে বসে। মত্ত বসন্ত করতে থাকে।"

পরম জনীর দেহ-দ্র' শাসনের মত যে এই

ক্রমণ:

ক্রিসরোজবাদিনী গুপ্তা।

শিকার ও শিকারী

(পূর্বানুস্মৃতি)

"মেদশ্চেনক্ৰশে দরং লঘু ভবত্যাখানযোগ্যং বগুঃ,
সন্ধানানপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্ছিতং ত্যক্রোধয়োঃ ।
উৎকর্ষঃ স চ ধর্মিনাং বদিত্বঃ সিধ্যতি লক্ষে চলে,
মিথ্যৈব বসনং বদতি মুগ্ধানীদধিনোদঃ কুতঃ ॥

কালিদাস।

বাজলা ১২২৭ সনে আমার পিতৃদেবে: মৃত্যুর পর হইতে আমি শিকার আরম্ভ করি। প্রথম বৎসরই মুক্তাগাছার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, আমার পুত্রবীর্য পুরাতাত ৮রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের শিকারপাটিতে যোগদান করি। তখন সেই পাটিতে গোবরডাকার স্বনামখ্যাত কামিদার ৮ জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ওরফে মহাবাবু শিকার করিতেন। তাঁহার আমার কিছুদিন পূর্ব হইতেই শিকার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

শিকার সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। ঘরিতে গেলে আমার খুড়া মহাশয়ই, আমাকে শিকার শিখাইরাছেন। বলিতে কি শিকার সম্বন্ধে তিনি আমার গুরুস্থানীয়। আমার উপর তিনি যথেষ্ট মেহশীল বলিয়াই, অধিকাংশ শিকারেই নিজের স্বার্থের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া, আমার সুবিধা করিয়া দিতেন। তাঁহার ভায় সদাশয় মহাপুরুষ, আমি জীবনে কখনই দেখিরাছি। শিকার কেন, সর্ব বিধেই তাঁহার ভায় দেবচরিত্র নীক এতদকালে বিরল।

বর্গগত মহাবাবুর সঙ্গেও এই শিকার উপলক্ষে প্রথম পরিচিতি হইয়া, পরে বান্ধবতায় দৃঢ়বন্ধনে একত্র বঁধা পড়িয়াছিলাম যে, তাঁহার শেষ দিন পর্য্যন্তও সেই শিকলে মরিচা ধরে নাই। তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে যে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে থাকিতে পরিয়াছিলাম একত্র নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। বন্ধুর ভালবাসা যে কি স্বর্গীয় জিনিস, ইহা আমি তাঁহার ভালবাসা হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিরাছি। আমার জীবনের অধিকাংশ শিকারেই ইঁহাদের সঙ্গে একত্রে করিরাছি। কোন কোন সময় কারবাধীনে আমি পৃথক শিকারও করিরাছি।

আমাদের এই সুদীর্ঘ কালের সাধনার ফল পুণ্ড্র-পুণ্ড্ররূপে লিপিবদ্ধ করা এক অসম্ভব বিরাট ব্যাপার। ইহার বহু ঘটনার বিশেষ বৈচিত্র্য না থাকায় পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইব না। তবে যে সব বিশেষ বিশেষ ঘটনার ও অবস্থার বিভিন্ন জাতীয় জন্তু-স্বতাব পরিচুট হইরাছে—“সন্ধানানপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্ছিতং ত্যক্রোধয়োঃ”—এবং নিজেরা অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইরাও কি উপায়ে মুক্ত হইরাছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। আশা করি ইহা যারা পাঠককে কথকিত আনন্দ দান করিতে পারিব।

আমাদের এই সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী শিকারে যে কত স্থানে কত রকম অবস্থার সম্মুখি হইয়া, কত শিকার

হইয়া উঠে। দূর দূরান্তর হইতে ব্যবসারিগণ, এই সকল লোকজনের নিঃস্ব ব্যবহার্য সামগ্রী, ঘোড়ার গিঠে বা নৌকার করিয়া আনিয়া, ছোটখাটো রকমের একটি পল্লীখাঁট বসাইয়া বিক্রয় করে।

এক ক্যাম্পের কার্য্য অন্তে, যখন ইহার সমস্ত জিনিষপত্র শুটাইয়া স্থানান্তরে ক্যাম্প করিবার জন্ত চলিতে থাকে, তখন গরু মহিষ হাতীর গলার ঘণ্টার শব্দ, লোকজনের কোলাহল এবং গাড়ীর ঘর্ষের শব্দ মিশ্রিত হইয়া, এক অপূর্ণ ধ্বনি উৎপন্ন হয়। শীত-কালে কবিত্ত ক্ষেত্র দিয়া চলিবার সময়, ধূলিরাশি উৎপন্ন হইয়া, আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই দৃশ্যে এবং সেই সময় পল্লী-রমণীগণের অন্তরঙ্গ হইতে সলজ্জ কোতুহল দৃষ্টিতে, নিম্ন শ্লোক দু'টা তখন আমার মনে পড়িত—

“রজোভিঃ স্তম্বনোদ্ধটুর্গর্গৈকশ্চ ঘনসঙ্গিভৈঃ।

ভুবন্তগমিব যোম্য কুর্কন্ যোম্যব ভূতকম্॥”

“ভরোংষ্টটৈ ভূবাণং তেন কেরলযোষিতাম্।

অলকেষু চমুত্রেণশ্চূর্ণ প্রতিনিবীকৃতঃ॥”

[রঘুবংশ]

হাওদা শিকার সমতল ভূমি ছাড়া পাঠাড়ে হয় না। আসাম, গারো হিল, ঐঃট, নেপাল, টেরাই ও ভূটান দোয়ারে, এই জাতীর শিকার করা যায়। সুন্দর বনের অধিকাংশ স্থানে হাব্ অর্থাৎ হুলদলে মাটি থাকায়, হাটী চলাচল করিতে পারে না বলিয়া, হাওদা শিকার চলে না।

যখন জঙ্গলের মধ্য দিয়া ৪০।৫০ কি আরও অধিক হাটী লাইন করিয়া বাইতে থাকে, তখন এক অপূর্ণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। সেই সময় শিকারীদের মনে, আশা ও উদ্বেগনা মিশ্রণে, কি যে এক নূতন ভাবের উদয় হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে অনুভব করিতে পারে না।

অন্য যত রকম শিকার আছে, তাহার সবগুলিতেই, শিকারী, নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, নিজ অস্তিত্ব শিকারকে জানিতে না দিয়া, শিকার করিয়া থাকেন।

কিন্তু হাওদা শিকার ঠিক তাহার বিপরীত, ইহাতে যেন আনোয়ারকে “চ্যালেঞ্জ” করা হয়। কতকগুলি হাটী জঙ্গল বৃক্ষাদি হুড়মুড় করিয়া ভাঙিতে ভাঙিতে অগ্রসর হইতেছে, আর যেন বিপক্ষ পক্ষকে বলিতেছে— “আমরা তোমাদিগকে মারিব, পার তো অস্ত্রধারী কর বা পলাইয়া যাও।” ইহাতে সর্বদাই আনোয়ারকে তাড়াইয়া শিকার করিতে হয়।

এই অমম যুদ্ধেও অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। বাহাদুরের হাটীতে চড়া অভ্যাস নাই, তাহাদের পক্ষে হাওদার শিকার করা কঠিন; কারণ, হাটীর গিঠে হাওদার, গদীর উপর দাঁড়াইয়া শিকার করিতে হয় বলিয়া, হাটীতে দাঁড়াইতে না পারিলে শিকার করা একরূপ অসম্ভব।

সাধারণতঃ হাটী দাঁড় করাইয়া শিকার করাই নিয়ম; কিন্তু অনেক সময় হাটী চলিতে চলিতে, চকিতেই মৃত আনোয়ার দেখিয়া, সেই অবস্থাতেই শিকার করিতে হয়। এই অবস্থায় অনেক সময়ে লক্ষ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা বেশী। কায়েই হাটী চড়ায় বেশী অত্যন্ত না হইলে, হাওদার শিকার করা কঠিন হইয়া উঠে।

খাঁচার থাকিয়া শিকার করা হয় বলিয়া যদি হাওদা শিকারকে বেশ নিরাপদ মনে করা যায় তবে তাহাও অত্যন্ত ভুল। জঙ্গলের মধ্যে বহুস্থানে শুক কুপ, কাটল, এবং গর্ভ থাকে। হাটী চলিবার সময় সর্বদাই শিকারীকে বন্দুক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয় বলিয়া, অনেক সময় এত অজ্ঞমনস্ক হইয়া পড়িতে হয় যে, হাটী চলিতেছে অথবা কি করিতেছে শিকারীর তাহা কিছুই খেয়াল থাকে না। সেই অবস্থায় হাটী চলিতে চলিতে হঠাৎ গর্ভে বা কুপে পড়িয়া গেলে, শিকারীকে ছিটকাইয়া পড়িয়া বাইতে হয়; সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকও পড়িয়া গিয়া আগুয়াজ হইতে পারে। কোন কোন সময় পড়িয়া না গেলেও হাওদার ধাক্কা খাইয়াও বন্দুক আগুয়াজ হইয়া যায়। কায়েই এই সব অবস্থার জন্য শিকারীর সর্বদাই সাবধানে থাক্য উচিত। কোন

কোন সময় কঁটা ও লতা বেষ্টিত গাছড়া জঙ্গলে বন্দুক আটকাইয়া পিছনের দিকে উল্টাইয়া পড়িয়া যায় ; সেই সময় জঙ্গলে বাদিয়া নিজেদেরই অত্যন্ত বিজ্ঞত হইয়া পড়িতে হয় ; এর পর বন্দুক রক্ষা করা তখন অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। এই সব কারণে হাওদাতে সর্বদাই এক খানা দা বা বড় ছুর রাখা উচিত।

একবার আমরা বাসামাটির নামক স্থান হইতে শিকার করিয়া ফিরিবার সময় আমাদের একজন বন্ধু শিকারী, স্বর্গীয় ডাক্তার উমেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার হাতী সহ গর্ত্তে পড়িয়া হাওদা সমেত একেবারে উল্টাইয়া হাতীর পেটের তলায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। সৌভাগ্য যে, সেদিন তাঁহার হাওদা ভাগীরথী নদী একটি অতি শান্ত হাতীর উপর ছিল বলিয়া তিনি দলিত হন নাই, নচেৎ হয় ত সেই দিন হইতেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের শিকার করার সৌভাগ্যের অবশান হইত।

এই সব কারণেই, প্রত্যেক প্রাণের শত্রু করিয়া হাওদা কসা হইল কি না, দেখিয়া লওয়া উচিত। হাওদা বাধা ঢিলা হইলে, এইরূপ দুখটনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। মাহুতগণের অমনোযোগিতায়, অথবা হাওদার দড়ি নুতন হইলেও, অনেক সময় হাওদা ঢিলা হইয়া যায়।

আরও একটি বিষয়ে হাওদার সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক থাকিবার কারণ। বনের স্থানে স্থানে ঘন ঝোপের মধ্যে মোমাছির চাক থাকে। চণ্ডাবার সময় মাহুতের অসতর্কতায়, হঠাৎ তাহাতে খাড়া লাগিলে, তাহার কল বাধা হয় তাহা সচেতন হইলেও, এই ভয়ঙ্কর সর্বদাই হাওদার কবল, রাগ কিংবা ওয়াটারপ্রুফ চাদর রাখা উচিত।

একবার আমাদের দেশে, বাড়ীর নিকটেই বাসাটি গ্রামে এক লেপার্ড শিকারের সময় পরলোকগত রাজা অগ্নিবিশেষের আচাৰ্য্য চৌধুরী মহাশয় হাওদার পিছনে, অবৈধ বংশোদ্ভব কোন এক গোমামী পড় ছিলেন। হঠাৎ এক মোমাছির চাকে খকা লাগিয়া, তাঁহার বা হস্তবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অবগত নাই। শিকারী বাধা

পোষাকের উপ : কবল মুড়ি দিতে দিতে দুই চার কামড় খাইয়াই অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু গোসাইনী হাতী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতে করিতেও অব্যাহতি না পাইয়া, অবশেষে নিকটস্থ এক পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে বাজার রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁচাকে পাকী করিয়া বাড়ী আনিতে হইয়াছিল।

তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হইয়া জীব হিংসার আনন্দ উপভোগ করিতে গিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় প্রকারান্তরে মহাপ্রভু তাঁহার এই প্রারম্ভিক বিধান করিয়া ছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি শিকারের নাম শুনিলে, তাহার জিসীমানারও যাইতেন না।

বর্ষাকালে শিকারে মোমাছি বেশী না থাকিলেও, বোলতাও উপদ্রব অত্যন্ত বেশী। প্রায় প্রতি বোনেই বোলতার চাক থাকে, এবং প্রতিদিনই দশ পনের জনকে কামড়াই। এমন অবস্থায় ঘটে যে শিকার সম্মুখে অথচ তখন বোলতার দৌরাণ্ডো লাইন লগুতক হইয়া গেল। ইহাতে এক এক সময় এত বিরক্ত বোধ হয় যে, তাহ আর বলিবার নহে। এই গোলাবোনে পড়িয়া কোন কোন সময় সমুখস্থ জানোয়ারকে একেবারেই হারাইয়া ফেলিতে হয়। একবার হোমিওপ্যাথিক লিডম্প্রাচটার নামক ঔষধের মাদার টিন্চার ব্যবহারে অত্যন্ত ফল পাইয়াছিলাম। তাহা সঙ্গে করিয়া হাওদার লংগা যাইতাম ; কাহাকেও বোলতা কামড়াইবা মাজই তুলে করিয়া একটু লাগাইয়া দিলে, আধ মিনিট মধ্যে জালা যহণা সব উপশম হইয়া যাইত। হাওদার এই ঔষধটী লইতে আম সকলকেই পরামর্শ দিই। ইহা ঢেলা, বিছা প্রভৃতির কামড়েও বিশেষ ফলপ্রসূ।

হাতী খুব শিকারী না হইলে হাওদা শিকার ভাল হয় না। হাতী স্বভাবঃই ভীক জন্তু ; ইহারিগকে শিক্ষা (Training) না দিলে শিকার করা কঠিন। হাতী ভাল পাইয়া পলাইতে আরম্ভ করিলে, সহজে কিরান যায় না। বহু চেষ্টার মাহুত গজবাগ (জহুণ) মাখানি মারিয়া ফিরাইতে সমর্থ হয়। কতক দূর পর্যন্ত ইহার উচ্ছ্বাস থাকে, পরে ক্রমাগত গজবগের আঘাতে ক্রমশঃ বাধা

হয়। এই অবস্থায় অনেক সময় বিপদের সম্ভাবনাই অধিক। বিশেষতঃ গাছড়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাতী ভয় পাইয়া পলাইলে যে কিরূপ বিপদ হয়, তাহা সহজেই বোঝা যায়। পলাইবার সময় ইহার দিগ্দিগন্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া যে যেদিকে পারে ছুটিয়া পলায়। সেই সময় খানা ডোবা, কাঁটা জঙ্গল প্রভৃতি কিছু প্রতীই ক্রক্ষেপ করে না।

সকল হাতীই শিকারে ভাল হয় না। শিকার করিতে কাহিতে কোন কোন হাতী উৎসাহীয়া যায়; কোন কোনটী একরূপ শিকারী হইয়া উঠে যে, ব্যাজাদি হিংস্র জন্তকে কিছুমাত্র ভয় করে না; এমন কি বাঘ লাক্ষাইয়া মাখার উঠিলেও কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। তখন যেন ইহার মনে করে, “ভয় কি, আমার রক্ষাকর্ত্তা উপরে আছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন।” দুই একবার যদি কোন হাতী ব্যাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, তাহার উপরস্থিত শিকারীদ্বারা উদ্ধাকে নিহত হইতে দেখে, তাহাতেও ইহাদের সাহস বাড়িয়া যায়।

হাতী শিকারী হওয়া না হওয়ার আর একটি কারণ আছে। প্রধানতঃ মাহুত যদি সুদক্ষ ও সাহসী হয়, তাহা হইলে চলনসই হাতীও ক্রমে ভাল হইয়া উঠে, কিন্তু দক্ষতা ও সাহস শিকারীর বোধ্যতা-সাপেক্ষ। শিকারী আনিড়ি হইলে মাহুতের দিল ভোট হইয়া যায়। সুতরাং হাতীর শিকার-পাণ্ডিত্যে মাহুত ও শিকারীর পরস্পরের যথেষ্ট সংযোগ আছে। সাধারণতঃ হাতী একটু বয়স হইলে, সাহসী হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। মাহুতের ভায় ইহারও ক্রমে দেখিয়া শুনিয়া কর্ণক্ষেত্রে পরিপকতা লাভ করে। কোন কোন হাতী আদীবনই বজ্রাত ও ভাগড়া থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ মেনা ও মেনী হাতী-গুলি অধিকতর চঞ্চল হয়। ১৭ ফুট পর্যন্ত উচ্চ ‘নর’ ও ‘মাদী’ হাতীকে সচরাচর মেনা ও মেনী হাতী বলে।

হাওদার হাতী একটু উচ্চ হইলে শিকারে সুবিধা, কারণ অনেক সময় জঙ্গল এত উচ্চ হইয়া পড়ে যে, হাতী হাওদা তর্ক তাহা মধ্যে ডুবিয়া যায়। তখন উচ্চ হাতী হইলে, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, এবং এইরূপ ঘন

জঙ্গল, হাওদা পিঠ করিয়া অপেক্ষাকৃত সহজে ভাঙিয়া যাইতে পারে।

হাওদা শিকারে আর একটি বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া আবশ্যিক। হাওদা শিকার কেন, সব রকম শিকারেই এইরূপ সতর্ক হওয়া উচিত। শিকার দেখিয়া অনেক সময়ই বন্দুক হাতে উঠাইয়া দুই ঘোড়া (double cock) তোলা হয়; কিন্তু কোন কারণে আগুয়াজ করা না হইলে বন্দুক হাওদার নামাইয়া রাখা হয়; তখন ঘোড়া নামাইয়া single cock বন্দুক করিয়া রাখা উচিত। ডবল কক্ তুলিয়া, নামাইয়া রাখিলে, অনেক সময় দুর্ঘটনা হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। হাওদার বন্দুক রাখিবার ৪টি করিয়া স্থান থাকে তাহা-দিগকে gun rest বলে।

হাতী লাইন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেই শিকারীকে বন্দুক হাতে করিয়া প্রস্তুত হইয়া হাওদার উপর দাঁড়াইতে হয়। কতের গোড়ায় বন্দুক আছে, যখন ইচ্ছা তুলিয়া লইতে পারিব মনে করিলে তাড়াতাড়ি সমস্ত বন্দুক উঠাইয়া কদ’ চমকিয়া যায়।

হাওদা শিকারে বন্দুক সহজে খুব সতর্ক না থাকিলে যে কিরূপ সাংঘাতিক বিপদ সময় সময় উপস্থিত হয়, তাহার দুইটা উদাহরণ নিম্নে দিতেছি।

একবার আমরা নেপালে শিকার করিবার সময় শিকারার্থে একদিন তাঁবুতে ফিরিতেছি, মধ্যে প্রকাণ্ড কুলী (কালিকী) নদী, সকল হাতীই হাওদা ও গদী সমেত আরোহী লইয়া পার হইতেছে। কোন কোন স্থানে জল বেশী থাকায় হাতীগুলি সাঁতরাইয়া যাহার যেকোন ইচ্ছা এলোমেলো ভাবে পার হইতেছিল। এক হাওদার স্বর্গার ময়ূ বাবু ও কলিকাতা হাই-কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। এই হাওদার পশ্চাতে, এক গদীর হাতীতে বাপুজী নামক এক বৃদ্ধ শিকারী ছিলেন। বাপুজী গদীতে চড়িয়া শিকার করিতেন বলিয়া তাঁহার হাতে সর্বদাই একটি হেনরি ম্যাটিন গাইফল থাকিত। ময়ূবাবুর হাতীর পিছনেই, বাপুজীর হাতীও সাঁতরাইয়া পার

হইতেছিল। হাতী পার হইবার সময়, সেই আন্দোলনে বাপুজীর পক্ষে বন্দুক রক্ষা করা কাঠন হইয়া পড়িল। খানিক পরেই আমরা দেখিতে পাইলাম, 'বাপুজী তাঁহার বন্দুকটা যোগেন বাবুকে হাওদার রাখিতে অজুরোধ করিলেন। যোগেন বাবু বন্দুক লইবার জন্য হাত বাড়াইরাছেন, বাপুজীও বন্দুক দিতেছেন, এই সময় খাকা লাগিয়া বাপুজীর হাতেই বন্দুক আগ্রাস হইয়া গে'। সঙ্গে সঙ্গেই যোগেন বাবু ছই হাতে মুখ ঢাকিলেন ও মজুবাবুর মাথার সোলাহাটি উড়িয়া গিয়া জলে পড়িল। সেই সময় সকলেই কি হইল কি হইল বলিয়া গোল করিয়া উঠিল। গুলি যোগেন বাবুর মুখের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়া, মজুবাবুর টুপিতে লাগিয়াছিল। বাক্সের আগুনের চক্রেতে যোগেন বাবুর গৌক ও মুখ, স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনার পর, বাপুজী কয়েকদিন শুক হইয়া ছিলেন। তাঁহার আত্মশ্রমের মাত্রা কিছু কমিয়া আসার পর, তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছিলেন। যদি পূর্বেই বন্দুক হইতে গুলি খুলিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে আর একরূপ দৃষ্টটনা হইত না।

আর একবার গুলি মাটিতে লাগিয়া, পিছলাইয়া গিয়া, এইরূপ একটি বিপদ ঘটয়াছিল। সেও আজ ১২।১৪ বৎসর আগেকার ঘটনা। আমরা আরো পাণ্ডুর নীচে আরামিয়া নামক স্থানে, ক্যাম্প করিয়া শিকার করিতেছিলাম। একদিন সংবাদ পাইলাম, বাউসামের বাধানে একটি জংলী মহিষ বা বরাহ আছে। বাউসাম একটি প্রকাণ্ড হাওর বা বিল। এই স্থানে অনেকই মহিষ পোবে এবং অনেক সময় সেখানে ২০ট বাধানে ৪৫ শত মহিষও থাকে। বাধানিরাঙ্গা ও কতকগুলি গোরাল, একদিন আসিয়া জানাইল যে, বরাহের উৎপাতে ওখানে বাধান ঠাণ্ডা হুস হইয়া উঠিয়াছে এবং গোরালরা হুসের অভ, বাধানে বাতারাভ করিতে পারে না। এই জন্তই বোধ হয় উহারা এত আগ্রহের সহিত আমাদের পরগণত হইয়াছিল। মহিষটা ক্রমাগত দৌরাড্য করিতে

করিতে এত বন্দবস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে বাহুব তো হুসের কথা, হাতী দেখিয়া ও প্রায় ভয় পাইত না।

আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে হাওদার না গিয়া, মাত্র ৩০টি গদীর হাতী 'লইয়া', আমরা ২০ জন শকারী যাইব। পরদিন প্রত্যুষে মজুবাবু, রাজা অগংকিশোর ও আমি, তিন হাতীতে তিনটি রাইফল লইয়া বাহির হইলাম। খানিক দূর গিয়াই, একটা প্রকাণ্ড বন তুলসীর অঙ্গলে, বরাহটিকে, ২০টা পালিত মহিষের সঙ্গে দেখিতে পাইলাম। দূর হইতে বদ্বী গুলি না করিয়া, বতদূর সম্ভাব্য নিকটে গিয়া মারিব স্থির করিয়া, তিনজন তিন দিক হইতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা খানিক অগ্রসর হইতেই, পালিত মহিষ করটা চলিতে আরম্ভ করিল; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উদ্দিষ্ট বরাহও চলিতে লাগিল। ক্রমেই দূরে যাইতেছে দেখিয়া গুলি করা হইল। সৌভাগ্য যে, প্রথম গুলিতেই উহার ডান পা তালিয়া বাওয়ার তালা পা লইয়া দৌড়াইতে লাগিল। আমরাও উহার পাছে পাছে দৌড়াইয়া গুলি বৃষ্টি করার পর, উহাকে নিধন করিলাম। আমরা যখন ক্রমাগত গুলির পর গুলি করিয়া মহিষকে নিস্তেজ করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ একটি গুলি গাছের একটি সূত্র ডালে লাগিয়া পিছলাইয়া বৌ বৌ শব্দে মজুবাবুর পারের খানিক চামড়া ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। আর একটু হইলেই পা খানা, বাউসামের হাওর রাখিয়া, কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া কাঠের পা লাগাইয়া, হুসের স্বাদ খোল দিয়া মিটাইতে হইত। যদিও ইহা আমাদের বেচ্ছাকৃত ক্রটি নয়, তথাপি আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

শিকারে, সময় সময় এইরূপ নানা অবস্থার মধ্য দিয়া, নিম্নে ও অপরকে বিপন্ন করিয়া, ইহা আমার বেশ ধারণা হইয়াছে যে, বন্দুক ও গুলি বাক্স সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। এই সব বনে, অনেক সময়ই লোকে বন কামলা বা নলখাপড়া ইত্যাদি কাণ্ড; কেহ কেহ বা বিলে মাছও ধরে। খুব সতর্ক হইয়া গুলি না চালাইলে, সর্বদা না হইলেও, মাঝে মাঝে দৃষ্টটনা হওয়ার

সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন সময়, হাতী দৌড়ের মধ্যে গুলি করিলে, গুলি গাছে বা মাটিতে লাগিয়া পিছলাইয়া উঠিয়া যায়; তখন তাহার গতিবেগ বাড়িয়া য়োর অভ্যন্তর বৈশি হয়।

হাওদা শিকার তিন প্রণালীতে হইয়া থাকে।

(:) অঙ্গলতাদা হাতী (Beater) ও হাওদার হাতী এক সঙ্গে লাইন করিয়া যাওয়া।

হাওদার হাতীকে, সর্দাদা লাইনের হাতী অপেক্ষা, ২১ হাত অগ্রে রাখাই কর্তব্য। এইরূপ লাইন করিয়া সব হাতী সমভাবে গেলে, অনেক স্থানে বনের তারতম্যে, হাতীগুলি অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া পড়ে। তখন আগের হাতীকে দাঁড় করাইয়া, পালের হাতীর অঙ্গ অপেক্ষা করা উচিত। ইহা লক্ষ্য না করিলে, হাওদা শিকার হইতেই পারে না।

কোন কোন সময় হাতী ২৩ লাইন হইয়া পড়িলে, মাহুতদিগের তাহা বড় লক্ষ্য থাকে না; কারণ, তাহার অনেক সময়ই বনের মধ্যে প্রায় ডুবিয়া যায়। অল্প শিকারীরই তাহা লক্ষ্য রাখা উচিত। কোনও স্থানে লাইন ডাইনে কি বায়ে ঘুরাইতে হইলে, একটি একটি করিয়া হাতী ক্রমে ২১ ঘুরাইয়া, সবগুলি এক সঙ্গে ঘুরাইবার চেষ্টা করিলে, লাইন নষ্ট হইয়া যায়। লাইনের উত্তর প্রান্তের হাতী ছুটীতে ছুটী নিশান থাকিলে, উহা দেখিয়া লাইন পরিচালনা করার সুবিধা হয়। অনেক সময় ঘন বনে মাহুতেরা 'সোরগোল' করিয়া যাইতে থাকে; সেই শব্দেও লাইন ঠিক রাখা যায়। কিন্তু যতই চেষ্টা করা হউক না কেন, ঘন বনে লাইন ঠিক রাখা বড়ই কঠিন।

কোন জায়গার সম্মুখে পড়িলে, কোন শিকারীরই লাইন ছাড়িয়া একা বা সঙ্গে আরও ২১টা হাতী লইয়া উঠাকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া অভ্যন্তর অন্তর। ইহা শিকার বিধির বিরোধী; ইহাতে শৃঙ্খলা (discipline) একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সেট সময় অল্প শিকারীর সম্মুখে কোন শিকার পড়িলে, তাহার শিকারের বিষ ঘটে; নিজেরও সাফল্যের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

আমাদের পার্টিতেও কোন কোন বন্ধুর, এই অভ্যাসটা অভ্যস্ত প্রবল ছিল; কিছুতেই তাঁহাদিগকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করা যাইত না। তবে কাহারও শিকার অর্থম হইলে, অবস্থা বিবেচনার ২১ স্থলে ঐরূপ করিতে হয়।

লাইন করিয়া যাওয়ার সময়, কাহার সম্মুখে জানোয়ার বাহির হইবে, তাহা অনিশ্চিত। একের সম্মুখের শিকারকে, পার্শ্ববর্তী অল্প কোন শিকারীর গুলি করা, বা আঙ হইয়া তাহার সম্মুখে যাইয়া পড়া অভ্যস্ত অসভ্যতা। হয় তো সম্মুখস্থ শিকারী, জঙ্গলের অবস্থার অল্প শিকার দেখিতে পান নাই, অথবা দেখিতে পাইয়াও ভাল মারিবার অপেক্ষার আছেন, এই অবস্থার অপরের এইরূপ ব্যবহার একেবারে নীতিবিরুদ্ধ। তবে কোন সময় যদি একরূপ অবস্থা ঘটে যে, সম্মুখস্থ শিকারী 'কছুই দেখিতে পাঠিতেছেন না; অথচ কণ-মাত্র বিলম্বে শিকার হাতছাড়া হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, তখন অপর শিকারীর উহা মারা দোষাবহ নহে।

হুল কথা এই যে, প্রত্যেক শিকারীরই নিজ নিজ সম্মুখস্থ শিকার মারা নিয়ম। কিন্তু কেহ কোন শিকারকে অর্থম করিয়া দিলে, অল্প শিকারী যদি তাহা সম্মুখে পাইয়াও না মারেন, তবে আর একজন শিকার করা চলে না। অন্তের শিকার মারিতে যাই কেন, এইরূপ হিংসাসূলক বুদ্ধি হইতে, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ শিকার মারিতে হইবে, এই নীতি অঙ্গসরগ করিলে, বার আনা শিকারও 'বাগ্' করা যায় না।

(২) দ্বিতীয় প্রণালীর হাওদা শিকারে শিকারীকে স্থানে স্থানে হাওদাসচ Stopএ (নাকার) দাঁড়াইয়া, beater হাতী দ্বারা অঙ্গলতাদা হইতে হয়। [যে সকল স্থান দিয়া জানোয়ারের পলাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাকে নাকা বলে।] আর একটা কথা সর্দিদাট মরণ রাখা উচিত, যে সকল শিকারীর উপর বেশ নির্ভর করা যায়, তাহাদিগকেই 'নাকার' দাঁড়াইতে দেওয়া সম্ভব। কোন জঙ্গলে ২১টা মাত্র 'নাকার' স্থান থাকিলে, সেই কয়েকটা শিকারীকে তথায় দাঁড়াইয়া,

অবশিষ্ট শিকারীগণকে লাইনের সঙ্গে বাইতে হয়। এই কাজের 'নাকার' দাঁড়াইয়া শিকার, বাঘ শিকারের সময়ই ভাল হয়। যদি বাঘ, ম'র (kill) করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় এবং জঙ্গল না হয়, তবে অনেক সময় লাইনের শাখে দূর হইতেই বাঘ, বিস্মৃত জঙ্গলে সরিয়া পড়ে; এই অবস্থার সুবিধামত 'নাকার' স্থান গ্রহণ করিতে পারিলে, খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। যে সব শিকারী 'নাকার' থাকিবেন তাঁহাদের জঙ্গল বা গাছের আড়ালে দাঁড়ানই বিধেয়। কারণ, শব্দ পাইয়াই লাইনের হাতী পৌছিবার বহু পূর্বে, 'নাকার' সম্মুখে, শিকার আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা আসিয়াই যদি নাকার হাতী দেখিতে পায়, তবে কিরিয়া যায়—অথবা বিপদে বাতির চইয়া পড়ে। আবার কোনও সময় গিরিয়া গিয়া, লাইনের হাতী তেদ করিয়া চলিয়া যায়। যে স্থানে লুকোচুরি, সেই স্থানেই বিপদ আশঙ্কা করিয়া, প্রকৃত শত্রুর সম্মুখীন হইতে দিখা দেখা করে

না। হাঁটা বা মাটা শিকারে এইরূপ ঘটনা সর্বদাই ঘটয়া থাকে। নাকার হাতীতেও শিকারীকে খুব সাবধানে ধনুক লংগা সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়; কারণ কোন সময় অবসর পাওয়া বাইবে তাহা অনিশ্চিত এবং তাহা একবার হারাইলে আবার পাওয়া কঠিন।

(৩) নেপাল টেরাইতে কর্ণেল খড়্গজন্ডের নেতৃত্বে, আমরা অস্ত্র এক প্রণালীতে হাওয়া শিকার করিয়াছি। Beater হাতী দ্বারা লাইন রচনা করিয়া, হাওয়ার হাতীগুলি লাইনের ৫০.৬০ গজ সম্মুখে সমদূরবর্তী হইয়া, সমস্ত লাইন জুড়িয়া, আগে আগে চলিতে থাকে, লাইন পিছনে পিছনে আইসে। এই প্রণালীর শিকারে আমরা বিশেষ ফল পাই নাই। ইহা আমি মোটেই গছন্দ করি-
তাম না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

অবতার প্রসঙ্গ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার বলিয়াছেন :—

“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্টতাং

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সন্তানামি যুগে যুগে।”

অর্থাৎ সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্টগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপন করে আমি যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করিব। ধর্মদগ্ধের ইতিহাস পাঠ করিলে এই বচনের সত্যতা উপলব্ধ হয়। ইহুদ জাতি ধর্মপথত্রস্ত হইতে থাকায় বীভৎশূর্তর জন্ম হইয়াছিল। “যেহ তমসো জ্ঞান আরব তাতিকে ধর্মালোক প্রদানের নিমিত্ত মহামদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কি উপায়ে মানব জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তলাভ করতঃ পরমাশ্রয় সাহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে তাহাই শিক্ষা দিবার

জন্ত বুদ্ধদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ মতের “নির্কাম” ও বেদান্তের “মোক্ষ” এ দুটির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ “নির্কাম” শব্দের এক অস্বত্ব অর্থ করিয়া শূন্যবাদে উপনীত হইলেন। তাহার ফলে, বহু সংখ্যক লোকের মন হইতে ধর্মভাব অপনীত হইবার উপক্রম হওয়ার, পুনর্বার ধর্মসংস্থাপনের প্রয়োজন হয়। সেই সময়ে শঙ্করাচাৰ্য্য রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ পূর্বক “অধিকার ভেদ” জ্ঞান ও তত্ত্বি মার্গ প্রদর্শন করতঃ হিন্দু ধর্মের তত্ত্বি সুদৃঢ় তাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্করের উত্তম ও কার্যাত্মকতার ফলে ভারতের ঐশীন ভীর্ণ মন্দিরগুলি পুনঃসংস্কৃত এবং অনেকগুলি নূতন মন্দির

নির্মিত হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত তিনি বেদান্ত প্রচারের নিমিত্ত হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সংখ্যাতীত মঠ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতবাসী সেই মহাপুরুষের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে পর ভারতে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপিত হয়। মুসলমানেরা পাশব বলের সাহায্যে বহুসংখ্যক ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত বহুগণিকর হওয়ার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদবাহি জন্মিয়া উঠে। সেই চক্ষুনে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। তিনি সময়ের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের এম প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত করাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্মবিষয়ে নিবন্ধন উভয় জাতির মন থেকে মোছাচ্ছ, তাহাতে জ্ঞান মার্গ প্রচারে কোন ফল হইবে না; সেই জন্য, উভয় জাতিকে ভক্তি পথে পরিচালিত করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম একরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে যে কতকগুলি মুসলমান ও তাঁহার শিষ্য হইয়া মুক্তিপত্র অগ্রসর হইয়াছিলেন। কয়েক শতাব্দী এই ভাবে চলিল পর দেশের ধর্মভাব পুনরায় শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। চৈতন্য দেবের উচ্চ আদর্শ বিস্তৃত হইয়া নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণবেরা “নেড়া নেড়ির” বলে পরিণত হইয়া উঠে। যিনি অগতের কল্যাণের নিমিত্ত সংসারের সর্বত্র জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাঁহার পুরবর্তী কালের শিষ্যগণের চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে ব্যথিত হইতে হয়। কিন্তু ইহাতে বিম্বিত হইবার কারণ নাই। এযাবৎ যে সমস্ত মহাপুরুষ পৃথিবীতে নূতন ধর্মের পবর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যদি পুনরায় মর্তে আগমন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাটবেন, তাঁহাদের ধর্মের কি পরিণাম ঘটরাছে। ছোট সন্ত বৎসর পূর্বে যৌতুট ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া পীর শিষ্যগণকে যে মন্তে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়ে যে সমস্ত জাতি আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া গর্ব প্রকাশ করেন, তাঁহারা কি বর্ষাক্ট সেই মন্তের সাধক? তাঁহারা

“বর্গরাজ্য” প্রবেশের নিমিত্ত বাইবেলের উপদেশ শ্রুতির বোধে কোনটি পালন করিয়া থাকেন? কালের প্রভাবে, খৃষ্টান ধর্মের যেরূপ অধঃপতন ঘটরাছে, বৈষ্ণব ধর্মও যে সেইরূপ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। “নেঃনেড়ী”গণের বিরূপ নৈতিক অধোগতি হইরাছিল তাহা নিম্নলিখিত গান ছুটি হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেনঃ—

নেড়ীর গান

“এই পুজোতে ঝুংকো দিবি তবে ঘরে র’ব।

নইলে তোর মুখেতে দিয়ে কালী বাঘনাপাড়ার বা’ব।

উপর কানে কানবালা নীচের কানে ছল,

খোঁপাধ লাগাব চুণ ফুল।

আবার ভারী ঘামের ডায়মন কাটা চার গাছি মল নিব।”

নেড়ার উত্তর।

“ঝুংকো ঢেঁড়ি ও’র নেড়ি কেন তো’বে বিব।

আমি পাঁচ সিকে খরচ ক’রে কত নেড়ী পাব।”

চৈতন্যদেবের অধঃপতনের কয়েক শতাব্দী পরে নেড়া নেড়ী দলের স্রষ্টা ভিন্ন হিন্দু ধর্মের পুনঃ সংস্থাপনের আরও একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ব্রটান সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হওয়ার ইংরাজ সাম্রাজ্যিক ও মিসনারি সম্প্রদায় সেই সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, ধর্ম, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, প্রথা পদ্ধতি সমস্তই তীব্র ভাবে সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলেন, ভারতবাসীর অতীত গৌরবের কিছুই নাই; তাহাদের ধর্ম, বিজ্ঞান-যুগের অনুপযোগী; বহুদর্শন, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি দর্শন ও শাস্ত্রনিচর অসভ্য জাতির অপরিমার্জিত ভাবরাশির অভিব্যক্তি, বামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থ সত্য পিতামহীর উপকথা। ভারতবাসী যদি ঐকিক মজলের কামনা করে, তাহা হইলে অতীতের স্মৃতি বিস্মৃতি-জলে ফেলিয়া দিয়া প্রতীচোর পদানত হওয়া তাহাদের কর্তব্য। ভারতবাসীর যুবকবৃন্দ এই প্রশ্নালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া

ভাষাদের সংস্কার জন্মেছিল যে, ভষজ্ঞ শৌভলিকতাই হিন্দুগণের ধর্ম ভাষাদের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সভ্য জগতেঃ ঘৃণ-উদ্বোধক। এইরূপ সংস্কারের ফলে অনেক হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল; কতকগুলি হিন্দু, খৃষ্টান ধর্মের অন্তরঙ্গণে একটি স্বাভাৱ সঙ্গীদারের সৃষ্টি করিলে; হু সংখ্যক ইংরাজ শিক্ষিত যুবক হিন্দু, কোমত প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকগণের শিক্ষাভ্রমণ মনে করায় ভগবান সিংহাসনচ্যুত হইবার উপক্রম হইলেন। এইরূপ ঘোর বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ার পুনর্বার “ধর্ম সংস্থাপনে” প্রয়োজন হইল। সেট ভ্রম হইয়াছিল যে, “অবিস্মৃত হইয়া, প্রিয়শিষ্য আমি বিবেকানন্দের সহায়্যে এক অভিনব সভ্যতার অবতারণা করিলেন। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে সর্ব প্রকার সন্দেহ দূরীভূত করবার নিমিত্ত প্রচার করিলেন যে, পৃথিবীর কোন ধর্মই মিথ্যা নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ঈশ্বর লাভের ভিন্ন ভিন্ন উপায় মাত্র। এই সভ্যতাটিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায় সমূহকে একত্রিত করার নিমিত্ত বিন্যাসিত হইল। —

“আন্তরিক ভাবে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবের ও ঈশ্বরকে পাইবে, শাক্তরাও পাবে, বৈষ্ণব বাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান, খৃষ্টান ওরাও পাবে। আন্তরিক ভাবে সবাই পাবে।”

পরমহংস দেবের পূর্বে এইরূপ সভ্য কখনও জগতে প্রচারিত হয় নাই। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানগণ প্রটেস্ট্যান্ট দিগকে জোরস্ত দৃষ্ট করিতে কুড়ি হইল নাই। প্রটেস্ট্যান্টগণ রোমান ক্যাথলিকদিগের পাকস্থলী বদৌর্ষ করিয়া গাণগতহার করিয়াছিল; মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির চূর্ণ করিয়া তদবস্থার সাহায্যে মসজিদীয় ধর্ম প্রচারের প্রয়াস পাঠাইছে; হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে অস্ত্রের সহিত ঘৃণা করিয়াছে; খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকেরা হিন্দু ধর্মের দ্বিত্ব অন্বেষণ এবং হিন্দু খৃষ্টান ধর্মের প্রতি বিবেচ্য ভাব

দর্শন কার্যে—কিন্তু কেহই এখানেও এরূপ কথা বলে নাই “তোমরা অনর্থক বিবাদ করিতেছ কেন? হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতি সকল ধর্মই সভ্য, অস্ত্রের সহিত ভগবানকে ডাকিলে সকলেই তাঁহাকে পাইবে।” এরূপ সভ্য অমূল্য, ইহা অবতার প্রকৃষেবট যুগ হইতে নিঃসৃত হইবার উপযুক্ত। এরূপ সভ্য কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রচারিত হইলে, ধর্মবিষেব নিবন্ধন পৈশাচিক নাট্য অভিনীত হইয়া পৃথিবীর ইতিহাস কলঙ্কিত হইত না।

সাকার, নিরাকার ও অবতারবাদীগণের বিবাদ ভ্রমের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভক্ত বালগাছেন, ঈশ্বর সাকার নিরাকার উভয়ই। তিনি ঐক্যের দ্বার মানব দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে ভ্রমগ্রহণ করেন একথাও সভ্য, আবার ভ্রমগ্রহণের পরিতৃপ্তি নিমিত্ত দেব দেবীর মূর্তি ধরিয়া তাঁহাদিগকে দেখা দেন ইহাও সভ্য। বেদান্তের পরব্রহ্মও যিনি, কালীও তিনি। নিজের অস্ত্রায় পাইলে তিনি ব্রহ্ম: আবার যখন সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় সঙ্গী করেন তখন তাঁহাকে কালী বলি।

এইরূপে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীমদ্ভক্ত ঈশ্বরের স্বরূপ পক্ষে বাচ্য বলগাছেন তাহা কি অপ্রাপ্ত সভ্য, অথবা বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র? তাঁহার দ্বার ভ্রমজানী, সভ্যবাদী, চিত্তেস্ত্রয় সমুদ্র পৃথিব বহুকাল ধর্ম ভ্রমগলে ভ্রমগ্রহণ করে নাই ইহা সর্ববাদী সম্মত। তাঁহার পবিত্র জীবন ও আধ্যাত্মিক শক্তি সমস্ত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকৃষ্ট করিয়াছিল। উত্তর পশ্চিম পাদেশীয় বৌদ্ধপ্রবর পাহাড়ী বাবা তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া জানিহেন। কেশবচন্দ্র সেন, বিষ্ণুচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী ধর্মবীরগণ তাঁহার শিষ্য হইতে কুড়ি হইলেন নাই। ব্রহ্মধর্ম প্রচারক বাগ্ধীর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, দার্শনিক প্রবর ব্রহ্মসুকুমার শিখ ও কলিকাতার ইন্দো-ইয়ন সর্ব প্রধান চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার, তাঁহার শিষ্য ন। হইলেও তাঁহাকে গুরুর দ্বার শ্রদ্ধা করিলেন। ইউরোপের সুবিখ্যাত মনীষী অধ্যাপক

মক্ষমুখর' তাঁহার অসূ্য উপদেশ শুনি ইংরাজিতে মুগ্ধিত করিয়া তাহা সভা ভগতে প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল টনি ও জেনেৰল এসেম্‌ব্লি কলেজের (বর্তমান স্কটিস চার্চ) তদানীন্তন প্রিন্সিপাল চেষ্টি ও কুফ নামক অপর একজন ইংরাজ তাঁহার অলৌকিক ভাবে মুগ্ধ হইয়া সংবাদপত্রে তাঁহার ত্বসী প্রশংসা করিয়াছিলেন। এক্ষণ মণাপুত্র উদ্ভাবের ভায় কতকগুলি উক্তি করিয়া গিয়াছেন, ইহা উদ্ভাব ভিন্ন কেহই মনে করিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দের ভায় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুত্র সত্যচর দৃষ্ট হয় না। আমেরিকার সুবিখ্যাত অধ্যাপক জে, এইচ, রাইট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সে দেশের সমস্ত অধ্যাপক একত্র হইলেও বিবেকানন্দের সমকক্ষ হয় না। (১) সেই বিবেকানন্দ কিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলেও আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিব। যুবক নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেছিলেন। তৎকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীর ভবনে কতিপয় যুবককে বেদান্ত সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেন। নরেন্দ্রও সেই স্থানে গমন করিতেন। কিন্তু তিনি কোন কালেই “সুবোধ বাণ্যকর” ভায় শিক্ষকের নিকট বাহা শুনিতেন তাহাই গলাধঃকরণ করিতেন না। শিক্ষক কোন একটা উক্তি করিলে নরেন্দ্র, তর্ক ও বুক্তি দ্বারা তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের প্রয়াস পাইতেন। একদিন মহর্ষি ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে যুবক নরেন্দ্র তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, “মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?” এই প্রশ্নে মহর্ষি একটু সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় নরেন্দ্র হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান

করিলেন। কিন্তু তিনি হতাশাস হইলেও তাঁহার জ্ঞানপিপাসা পূর্য্যাপেক্ষা চতুঃপন্থি পাইল। তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন, ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখিব, আর যদি না থাকেন তবে সে স্বপ্ন কথ। এইরূপ চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে চট্টনৈক বন্ধুর পরামর্শে দক্ষিণেশ্বর বাইরা শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে আসিয়াই তিনি বাগ্মতা সহকারে পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?” তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের মুখে বিবেক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “তোমাকে যেমন দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষাও ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখিয়াছি। আমি তোমাকেও দেখাইতে পারি।” এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র আশ্চর্য হইলেন; কিন্তু তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল না। দ্বিতীয় দিবস নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে আসিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র তিনি সমাধি হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অব্যক্তি হইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিলেন, “ঠাকুর তুমি কি করিলে, আমার বে মা বাপ আছে।” নরেন্দ্রের কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাবিলেন, নরেন্দ্র এখনও সর্বোচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত হয় নাই। তখন অজুলি দ্বারা পুনর্বার গাত্র স্পর্শ করিলেন—তিনি স্বতোধিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। নরেন্দ্র বতর্কণ সেই অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র সমস্তই আকাশের সহিত মিশিয়া পরস্পর লয় হইতেছে। সেই ঘটনার স্মৃতি অবলম্বনে স্বামী বিবেকানন্দ বালাগা ভাষায় যে সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার এক পদ মাত্র প্রবন্ধলেখকের স্মরণ আছে। উহা নিয়ে প্রবন্ধ হইল :—

“নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নশাৎ সূক্ষ্ম”—

সঙ্গীতটি বর্তমান সময়ে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হইয়া “ব্রহ্মসত্য—ভগৎ মিথ্যা”—বেদান্তের এই সর্বোচ্চ সত্যটি ভগতে প্রচার করিতেছে।

(১) “Here is a man who is more learned than all our professors put together”—J. H. Wright.

উপরিউক্ত ঘটনার নবোজ্জ্বল ত্রিকিৎ পরিমাণে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি চামলেটের ন্যায় জীবিতে ল'গলেন, সর্গে ও সর্গে এমন অনেক বস্তু আছে যাচা বর্ণনামাত্র কখনও কল্পনাও করে নাট। তথাপি তিনি পরমহংস দেবের সমস্ত উক্তি অকাটা সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার দেহত্যাগের সুহৃৎ ধর্ম্মাচারী ভাষাকে পরীক্ষা করিতে ক্রটি করেন নাট। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ কালে নবোজ্জ্বল জীবিতেছিলেন, “তিনি যিনি এত সময়ে বলেন, আমি অন্তর, তাতা হটলে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়।” শ্রীরামকৃষ্ণ “কখনও নবোজ্জ্বল মুখ পানে চাতিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তোমার এখনও সন্দেহ আছে। যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রামকৃষ্ণ; কিন্তু এটা বেদান্ত মতে নহে।” আমি বিবেচনায় উত্তরোত্তর ও আমেরিকার হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন হইবার কিছুকাল পরে তখনক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, “শ্রীরামকৃষ্ণ যে কে তাতা আমি এখনও বলিতে পারি না। ঈশ্বরের অবতার বসিলে, তাঁহাকে নিম্ন আসনে প্রদান করা হয়।” (২)

শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীর যাবতীর ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিবিধ অমুসারে সাধনা পূর্ব্বক অমুভূত লাভ করিয়াই বলিয়াছেন, “ধর্ম্ম লইয়া তোমরা বিবাদ কর কেন? সমস্ত ধর্ম্মই সত্য।” তিনি ভগবানকে কখনও কালীকণ্ঠে, কখনও কৃষ্ণরূপে, কখনও মঙ্গলদেব বেশে, কখনও বীণাপুটের অবয়বে দৃষ্টি করিতেন; কখনও বখনও ইহুদি মহাপুরুষ মোকেষের ন্যায় ঈশ্বরের ভোতিষ্ময় সৃষ্টি অবলোকন করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন। আবার বখন নির্বিকল্প সমাধি হইত, তখন ঈশ্বরের সহিত তাঁহার কোন প্রভেদ থাকিত না। তিনি পৃথিবীর ধর্ম্ম সম্বন্ধের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া কার্য্য অবসানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার

আবির্ভাবে ভারতবর্ষের যে কি উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ সম্ভাবিত হইলেও ভারতের বৈদেশিক শত্রুগণ তত্কাপি ছত্রভঙ্গ হয় নাই। ভারতবাসী কোন কালে স্বাধীন শাসনের উপযোগী হইতে পারিবে না, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, তাহার হিন্দুগণের ধর্ম্ম ও প্রাচীন সভ্যতার উপর পুনর্বার বজ্রাঘাত করিয়াছে। আচার্য্য নামক ভগবদ্র লেখক তৎপ্রণীত “ভারতবর্ষ এবং ভবিষ্যৎ” নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষকে একটি বর্ষের দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন পৃথিবীর বর্ষের জাতি সমূহের মধ্যে যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্ম তদপেক্ষাও নিম্ন শ্রেণীর। যোগ সাধনার পতি উপহাস করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন যে একরূপ পদ্ধতি গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই সম্ভবপর। গাফ নামক তখনক ইংরাজ সম্মেলনচক উপনিষদগুলিকে বর্ষের মন্তব্য প্রসূত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক প্রবর জনাটোন বলিয়াছেন “হিন্দুধর্ম্ম ভীতিসঙ্কারক স্বপ্ন-মিশ্রিত আবর্জনা রানি। বর্তমান ভারতবাসী এই ধর্ম্মের পতি অমুরক থাকিবে, ততদিন ইংরাজ জাতি ভারতে বদ্বীপ শাসন প্রচলিত রাখিতে অধিকারী।”

এই সমস্ত সমালোচনার চূড়ান্ত উত্তর আমি বিবেচনায় দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, “হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা ঈশ্বর অমুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। স্তবরাং তোমরা অজ্ঞান বশতঃই হটক অথবা রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত হটক, যাহা বলিতেছ, ভারতবাসী তাহাতে বিচলিত হইবেনা; তাহাদের ধর্ম্ম ঈশ্বর অমুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দুধর্ম্ম যে প্রকৃতই ঈশ্বর অমুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ইহা স্পষ্টরূপে জন্মজন্ম করাইবার নিমিত্ত বর্তমান সময়ে আর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ইনি এখনও সুপরিচিত না হইলেও, কালক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের ভার ইংরাজ নাম চিরস্মরণীয়

হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার নাম ঐ অমূল্য চক্রবর্তী। ইনি পদ্মা নদীর কুলস্থিত হেমাইতপুর গ্রামের অধিবাসী। ঐরাবত্বের জ্ঞান অমূল্য ঠাকুরও বালকতাব-সম্পন্ন। ইহার সমাধি অবস্থার ভাববাণী ভাণ্ডার সহিত ঐরাবত্বের কথামূলের সৌন্দর্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঐরাবত্বের জ্ঞান ইনিও বলেন, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মই মিথ্যা নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত জীবের লাতের ভিন্ন ভিন্ন উপায় মাত্র। তবে ইহার মতের বিশেষত্ব এই যে, ইনি বলেন শব্দব্রহ্মের সাধনা দ্বারা বহু নীতি অমূল্য হইবে, অস্তিত্ব সাধনা প্রণালীতে তত নীতি হয় না।

শব্দব্রহ্মের সাধনা পদ্ধতি নূতন নহে। ধর্ম্ম জগতে এরূপ কোন সভ্য প্রচারিত হয় নাই বাহা ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ জানিতেন না। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাইঃ—

“ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ”

“প্রজাপতির্বা ইদম্ আসীৎ তত্ত্বং বাক্ বিচীরা আসীৎ।”
—অর্থাৎ, আদিতে এক ব্রহ্ম ছিলেন এবং তাঁহার বিচীরা বাক্ বা শব্দ ছিল। উক্ত উপনিষদ আরও বলেন—

“বাগ্ধৈব পরমং ব্রহ্ম।”

অর্থাৎ বাক্ বা শব্দই পরব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন :—

“বাক্ অক্ষরম্, প্রথমজা কৃতস্ত, বেদানাং গাঞি,
অমৃতস্ত নাতি।”

অর্থাৎ বাক্ অক্ষর (অবিনাশী) পরব্রহ্ম হইতে প্রথম জাত, বেদ সমূহের জননী এবং অমৃতের নাতি অর্থাৎ কেন্দ্র।

উক্ত বচনগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বাক্ বা শব্দ, ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। বৃহদারণ্যক আরও বলেন যে এই দুইয়ের সম্মিলনে পরিদৃষ্টমান বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। যে শব্দময়ী চৈতন্ত্যধারা হইতে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদির উৎপত্তি

হইয়াছে, তাহাই অবজগতের একমাত্র কারণ। সেই ধারাই “রাধা” নামে অভিহিত হইয়া সর্ব্বভূতে বিশেষতঃ মানব দেহে প্রবাহিত। সেই জন্তই বেদান্ত বলিয়াছেন, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক নহে। কিন্তু ঋষিগণ অমূল্যমানের সাহায্যে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াই ক্ষান্ত হইয়া নাই। বিক্রমে সেই পরব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিরূপে ক্ষুদ্র “আমি” সেই বিরাট “আমির” সহিত একত্ব অমূল্য করিবে, তৎসম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিকগণ কতকগুলি পথ নির্দেশ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছেন :—

“বাটৈব ব্রহ্ম জ্ঞাতং”

অর্থাৎ বাক্ বা শব্দের দ্বারাই ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। দ্বাপরে ভগবান ঐকৃষ্ণ স্বয়ংই শব্দযোগী ছিলেন। তদীয় বংশীনিঃসৃত “রাধা রাধা” ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত নিনাদিত হইত।

ঐকৃত পক্ষে, রাধা বৃন্দাবনবাসিনী গোপাঙ্গনা ছিলেন না; ঐকৃষ্ণ বংশীর সাহায্যে “রাধা” নাম-ধাঙ্গী শব্দময়ী চৈতন্ত্য ধারার জপে নিমগ্ন থাকিতেন। প্রমাণ স্বরূপ, আমরা ব্রহ্মসংহিতা হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিলাম—

“শব্দ ব্রহ্মময় বেগুঃ বাদ্যরত্নং মুখাশুভে।”

এই ক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ঐকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম, তিনি “রাধা” নাম জপ করিতেন কেন? ইহার উত্তর ঐরাবত্ব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ—

“শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম, তিনিও রাধা বস্ত্র কুড়িরে পেরে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা করেছিলেন।”

“রাধা বস্ত্র কুড়িরে পাওয়া ও শব্দময়ী চৈতন্ত্য ধারার অমূল্যতা লাভ করা একই কথা। শ্রীরাবত্ব দ্বারাও বলিয়াছেন :—

“রাধা চিহ্নকি, আত্মাশক্তি, বেদান্তের ব্রহ্ম।”

যোগীরা অহর্নিশ এই নাম জপ করিতে করিতে অনাহত শব্দ প্রবণ করে, পরিণেবে পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। অনাহত শব্দ সম্বন্ধে পরমহংসদেব বলিয়াছেন :—

“অনাহত শব্দ সর্পদ্বাই এমনি হঠে প্রণব ধ্বনি।
পত্রের থেকে আসছে। বোণীরা শুনেতে পার; বিবাসক
জীব শুনেতে পার না। বোণী জানতে পারে যে সেই
ধ্বনি একদিকে নাতি থেকে উঠে ও আর একদিকে
সেই কীম্বদন্তী পত্রের থেকে উঠে।”

শব্দরূপ সাধনার বিশেষ এই যে ইচ্ছাতে
অতি শীঘ্র অমুভূতি হয়। সাধনার প্রথম অবস্থায়
সাধক ধ্যানস্থ হইয়া স্বীয় সংস্কার অমুসারে নানাবিধ
ঐশ্বর্যীয় রূপ এবং পর্বত, সমুদ্র, নদী, আকাশ, মেঘ
প্রভৃতি যাবতীয় জড় পদার্থ দর্শন করেন। তৎপরে
জ্যোতির্ময়গুণী, বিজলী, অতি ক্ষুদ্র হইতে বিরাট
জ্যোতিঃ ও নানাবিধ বর্ণ তাঁহার মানস নগরে পতিত
হয়। কিছু কাল সাধনা করিলে প্রথমতঃ বিজলীর,
তৎপরে দুই অবস্থিত শীঘ্র এ’জনের শব্দ, তৎপরে মেঘ
গর্জন ও পরিশেষে ব’জ্রধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে
প্রবেশ করে। এই অবস্থায় উপনীত হইয়া তিনি
দৈববাণীও শ্রবণ করেন; তখন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

ইহার পরে তিনি বেদান্তের চরম অমুভূতি লাভ করিয়া
পরমাশ্রয় সহিত একত্ব অমুভব করেন।

অমুভূতি প্রাপ্তে উপরে বাহা বলা হইল, তাহা
শুনিয়া তারতর্ক্য সাধকমণ্ডলী বিস্ত্রিত হইবেন না;
কারণ, তাঁহার জ্ঞান যে সাধনার প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানী
গুরু উপদেশ অমুসারে নিয়মিত ভাবে কার্য্য করিলে,
নানাবিধ ঐশ্বর্যীয় রূপ দর্শন ও শব্দ শ্রবণ অবশ্যজ্ঞাবী।
তবে, সাধারণ পাঠকবর্গ এই সমস্ত কথা কিরূপ ভাবে
গ্রহণ করিবেন বলিতে পারি না। তাঁহাদের প্রতি
প্রবন্ধ লেখকের এই অনুরোধ যে, তাঁহার পূর্বলক্ষ
সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্র নির্দিষ্ট পন্থা অমুসরণে
আধ্যাত্মিক সত্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হউন; তাহা হইলে
দেখিতে পারিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের অনেক কথা অমর
অক্ষরে সত্য। জড় জগতের অন্তরালে অত্র কোন বস্তু
অস্তিত্ব নাই একরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

শ্রীমহেশ্বরনাথ ঘোষ।

জীবন বাবুর পরলোকগমন

(গল্প)

শ্রীতকাল। বেলা প্রায় দুইটা বাজে। ‘আর্য্য
প্রতিভা’ সম্পাদক সুবিনয় বাবু আফিস ঘরে বসিয়া
প্রকাশীট সংশোধন করিতেছেন। সমুখস্থ টেবিলের
উপর রাখীকৃত চিঠি, প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি, নানাবিধ
সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র পড়িয়া আছে। ছাপাখানার
লোক প্রক ফেরত লইয়া বাইবার স্তম্ভ দ্বারদেশে অপেক্ষা
করিতেছে।

‘ঢং ঢং’ করিয়া দুইটা বাজিল, সুবিনয় বাবু
প্রক দেখা শেষ হইল। তিনি ছাপাখানার ভূত্যের
হস্তে প্রকগুলি প্রদান করিয়া পত্রের নিঃবাস করিলেন

এবং টেবিলের দ্রব্য হইতে একটি সিগার, বাহির
করিয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন।

মাগ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ‘আর্য্যপ্রতিভা’
এবারে বোধ হয় কিছু লিখেই প্রকাশিত হইবে।
প্রকাশিত হইলেই তাঁহাকে একবার দেশে যাইতে
হইবে। সেখান হইতে যাত্রা আসিয়াছে তাঁহার ছয়
বৎসর বয়স্ক একটি কন্যা ক্রমগত মালেরিয়া জ্বরে
ভুগিতেছে। তাহার চিকিৎসার একটা সুবন্দোবস্ত
করিতে হইবে। যদি সম্ভব হয় ত কলিকাতাতেই তাহাকে
আনিবেন।

কিরকণ বিশ্রামের পর সুবিনর বাবু পাণ্ডুলিপির তাড়াটি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ‘আর্য্য-প্রতিভা’র স্মৃতিত প্রবন্ধ-লেখক জীবন বাবু শারীরিক অস্থ্যতা নিবন্ধন গুণ কয়েক মাস লিখিতে পারেন নাই। সেই জন্য একটি ভাল প্রবন্ধের প্রয়োজন। তাড়াটি ইতঃ-পূর্বেও তিন চারিবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তেমন মনোমত প্রবন্ধ পান নাই। তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা ও গল্পেই তাড়াটি ভারী হইয়া আছে।

উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অভাবে, তিনি নিজেই কিছু লিখিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময় বন্ধু যামিনীনাথ কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে কথোপকথনের পর যামিনী-নাথ বিদায় লইলেন। দ্বারদেশ অতিক্রম করার ক্রিয়াকর্ম্ম গমন করিয়া যামিনী বাবু ফিরিয়া বলিলেন, “ও হে, শুনেছ ? আমাদের জীবন বাবু মারা গিয়েছেন।”

সুবিনর বাবু চমকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “সে কি ? কবে ?”

যামিনী বাবু বলিলেন, “তা’ত জানি না। সপ্তাহ ধানেক পূর্বে আশু একখানা পোষ্টকার্ডে অল্প কথার সঙ্গে শুধু লিখেছিল—শুনেছ বোধ হয় জীবন বাবু মারা গিয়েছেন। কি হয়েছিল, কবে মারা গেলেন, কিছুই জানিনা। তবে শুনেছিলাম ‘তিনি ডিম্প্‌পিসরাতে ভুগ্‌ছিলেন অনেক’দন, কোথায় না কি চেজে যাবেন।”

“হঁ। তা’ত শুনেছিলাম। কিন্তু এমন শরীর এত শীঘ্র যে তিনি আমাদের ছেড়ে যাবেন এ ত স্বপ্নেও তা’বিনা।”

“আজকাল ঐ রকমট হয়েচে তাই। মানুষের আর জীবনী-শক্তি নেই। আজ যে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, কাল শুনুই সে আর নেই। ওঃ তিনটা বেজে গেছে যে। আজ চলি তাই, আর এক’দন আসব।”

যামিনী বাবু বিদায় লইলেন। সুবিনর বাবু আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িলেন। জীবন বাবুর মৃত্যুসংবাদে তিনি সত্য সত্যই ব্যথিত হইয়াছিলেন। জীবন বাবুর

সহিত তাঁহার সাত আট বৎসরের আলাপ। এই মাসিকপত্রের সৃজেই উভয়ের প্রথম পরিচয়। জীবন বাবু প্রধানতঃ এই পত্রেই প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার রচনাগুলি সুবিনর বাবুর বড় ভাল লাগিত এবং তাঁহার উৎসাহের ফলে জীবন বাবু প্রায় প্রতিমাসেই ‘আর্য্যপ্রতিভা’র লিখিতেন। ইদানীং জীবন বাবু বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

জীবন বাবুর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার স্মৃতির প্রত্ন নিজ কর্ত্তব্যের কথা মনে পড়িয়া গেল। জীবন বাবুর জীবনবৃত্তান্ত সংবলিত মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধ পড়িবার জন্য বাঙ্গলার পাঠক সম্প্রদায় ‘আর্য্যপ্রতিভা’র পৃষ্ঠাগুলিই সর্ব্বপ্রথমে অন্বেষণ করিবে। আগামী সংখ্যাতেই সেই প্রবন্ধ ছাপিতে হইবে। সময় অধিক নাই। অথচ এরূপ লেখাও সহজ নহে। কারণ যদিও সুবিনর বাবু সাত আট বৎসর জীবন বাবুর সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার জীবনের ঘটনাদি সম্বন্ধে তিনি প্রায় কিছুই জানেন না। জীবন বাবু লোকটি অল্পভাবী ছিলেন এবং তাঁহার আত্মাভিমান মোটেই ছিল না। এরূপ লোকের জীবনের ইতিহাস সুবিনর বাবু কিরূপে জানিবেন ? জীবন বাবু ‘আর্য্য-প্রতিভা’ আকিসে আসিয়াছেন, প্রবন্ধ দিয়া গিয়াছেন, প্রক দেখিয়া দিয়াছেন, সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন, সম্পাদকের অনুরোধমত কোনও বিশেষ বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কখনও ত আত্মপরিচয় দেন নাই। অথচ যদি ‘আর্য্যপ্রতিভা’র তাঁহার বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে লেখা না হয় এবং অল্প কোনও মাসিক পত্রে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা বড় ভাল দেখায় না।

সম্পাদক মহাশয় অকুল পাখারে পড়িলেন। কার্য্যাধক্ষ মণিআহন বাবুকে ‘অজ্ঞান’ করিয়া এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের কোনও উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। সচরাচর জীবন বাবুই এইরূপ জীবনবৃত্তান্ত লিখিতেন, এবং সেই প্রবন্ধগুলি পাঠকসমাজে আদৃত হইত। এক্ষণে জীবন বাবুর বিষয় কাণাকে দিয়া লেখাইবেন ?

তিনি বয়ঃ প্রবন্ধের স্থচনাটি লিখিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু তাঁহা তাঁহার মনোমত হইল না। কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ভিন্নপত্রের বুদ্ধিতে রাখিয়া তিনি সেদিন সকাল সকাল বাসার কিরিয়া গেলেন।

২

ইহার পর তিন চারি দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। জীবন বাবুর মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধটি সম্পাদক মহাশয় এখনও ধরিতে পারেন নাই, যদিও গত কয়েক দিবসই তিনি ঐ বিষয় লইয়াই চিন্তা করিতেছেন।

সেদিন আকিসঘরে ব'সিয়া সুবিনর বাবু যেক্সপেই হটক একটা প্রবন্ধ লিখিবেন স্থির করিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় সেই ঘরে একটি তত্ত্বলোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সুবিনর বাবু তড়াক করিয়া লাফাটরা উঠিলেন এবং বলিলেন, “কোথেকে এলেন ম'শায় ? বা' ভাবিয়ে তুলেছিলেন আমাকে !”

আগন্তুক বলিলেন, “আমি ভাবিয়ে তুলিয়েছিলুম ? সে কি রকম ?”

“আর মশায়, সে দিন বামিনীবাবু এসে বসেন, আন্ত তাঁকে চিঠি লিখেছে আপনি যারা গিয়েছেন। আমি ত মহাসঙ্কটে পড়েছিলুম।”

জীবন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বামিনীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর একটু তুল হয়েছিল। আন্ত লিখেছিল আমি যারা গিয়েছি, তিনি পড়েছিলেন যারা গিয়েছি। তা বাই হোক, আপনার আর সঙ্কটটা কি ? বাজালা দেশে মাসিকপত্রেরও অভাব নেই, লেখকেরও অভাব নেই। বরঞ্চ আমাদের মত প্রবন্ধ লেখক হই একটার পরিবর্তে, আর্টস্টিক ঔপভাসিক হই একটা সংগ্রহ করলে আপনার কাগজটার ঐক্যবৃদ্ধি হয়। আজকাগকার কলেজের ছাত্রেরা শুনুই এই রকম সব উপভাসের মন্ত করছে।”

“না, সত্যি বলছি জীবন বাবু, আপনি আমাকে বখাওঁই মহাসঙ্কটে ফেলেছিলেন। আমাদের কাগজে

আপনিই কত লোকের জীবনের আলোচনা করেছেন, অথচ আপনার একটা জীবনবৃত্তান্তের ভিত্তি কোনও উপকরণই আমাদের দিবে যান নি।”

জীবনবাবু মুহু মুহু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, “শুনছি বিলাতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত্র অনেক সাময়িক পত্রের আকিসে মজুদ থাকে, তাঁদের মৃত্যুসংবাদ পাবারাজ সেই সকল কাগজে সেটা ছাপা হয়। তা আমারও একটা না হয় আপনার আকিসে রাখবেন, মৃত্যুসংবাদ পেলেই ছেপে দেবেন।”

সুবিনর বাবু বলিলেন, “ভগবান করুন আপনি দীর্ঘজীবী হয়ে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করুন। কিন্তু এ ক'দিন আমাকে এমন ভাবিয়ে তুলেছিলেন যে, আমার মনে হয় আপনার একটি জীবনচরিত্র আমার নিকট থাকাই উচিত।”

জীবনবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “সে দিন কাগজে দেখলাম, আমেরিকার এক বৃদ্ধ সম্পত্তী জীবিত-বহাভেই তাঁদের প্রাক্ক্রিয়া সম্পন্ন করে' আত্মীয় বন্ধুগণকে ভোজ্য দিয়েছেন। মুসলমান বাদশাহেরা জীবিতাবহাভেই তাঁহাদের সমাধিসৌধ নিশ্চিত করিয়ে রাখতেন। তা বেশ, আমি ছুটিতে পুরী বাচ্ছি। সেখানে কাঁচ কন্দ নেই, বগে বগে ভাল করে' নিজের মৃত্যুবিষয়ক একটা প্রবন্ধ নিজেই লিখে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো।”

কিরৎসন অস্তান্ত কথাবার্তার পর জীবন বাবু বিদায় লইলেন।

৩

আরও কয়েকদিবস অতীত হইয়া গিয়াছে। বাটী হইতে অল্পদূরী টেলিগ্রাম আসায় সুবিনর বাবু কার্য্যাব্যক্ষকে মাসিকপত্র প্রকাশসম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। কার্য্যাব্যক্ষ মণিবোহন বাবু সম্পাদকীয় কার্য্যের কেবলার উপাবষ্ট হইয়া, পছোচিত গাভীঘোর সহিত ছাপাখানার লোকদিগকে উপদেশ

দিতেন, বা তাসিৎ করিতেছেন। এমন সময় অস্ত্রাঙ্গ পত্রাদির সাহিত্য পুস্তক হইতে সম্পাদকের নামে একখানি চিঠি এবং একখানি পাণ্ডুলিপির প্যাকেট আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্পাদকের উপদেশমত পত্রখানি মণিমোহন বাবু তৎক্ষণাৎ সম্পাদক মহাশয়ের দেশের ঠিকানায় রিডাইরেক্ট করিয়া দিলেন এবং পাণ্ডুলিপির প্যাকেটটি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বামিনী বাবু যেদিন জীবন বাবুর মৃত্যুসংবাদ দিয়া যান, সেই দিন সম্পাদক মহাশয় জীবন বাবুর জীবন সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইবার জন্য কল্পপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা মণিমোহন বাবু জানিতেন। জীবন বাবু যখন আসিয়াছিলেন তখন মণিবাবু আফিসে উপস্থিত ছিলেন না। জীবন বাবুর মৃত্যুবিষয়ক স্মৃতিস্তম্ভ প্রবন্ধটি যে 'আর্য্য প্রতিভা'র ছাপা হইবেই তাহাতে মণিমোহন বাবুর সন্দেহ ছিল না। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পাণ্ডুলিপির উপর অক্ষর লিখিয়া ছাপাখানায় পাঠাইয়া দিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে জীবন বাবুর একটি প্রবন্ধের সহিত তাঁহার একটি প্রতিভূতি প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই হাকটোন ব্লকটিও অনেক অল্পসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। মণিমোহন বাবু রাজি পর্য্যন্ত থাকিয়া প্রবন্ধটি মুদ্রিত করাইয়া দপ্তরীর বাড়ী কাগজ পাঠাইয়া দিলেন।

৪

পুস্তিতে সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গলার একটি পুরুষ ও একটি রমণী, বাটার সংবাদের তত্ত্ব ডাক হর-করার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বথাসময়ে হরকরা আসিয়া পুরুষটির হস্তে কয়েকখানি পত্র, মাসিকপত্র ও সংবাদপত্র দিয়া গেল।

পুরুষটি মাসিকপত্রের মৌড়িক খুলিয়া 'ও হো হো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রমণী ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে গো, ও রকম করছ কেন?"

পুরুষটি আমাদের জীবন বাবু, রমণী তাঁহার স্ত্রী—সরলা। জীবন বাবু যখন কৃত্রিম ক্রন্দনের সুরে বিনাইয়া

বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, কি হবে গো, আমার স্ত্রী যে বিধবা হল গো—"

"তুমি কি পাগল হয়েছ না কি?" বলিয়া সরলা তাঁহার হস্ত হইতে মাসিকপত্রটি কাড়িয়া লইলেন। যে পাতা খোলা ছিল, তাহাতে খোটা ব্ল্যাক বর্ডার দেওয়া, প্রবন্ধের শিরোনামে লিখা ছিল "পরলোকগত জীবনঃ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

দেখিয়া সরলাও হাসিলেন। কারণ, তাঁহার স্বামীকে সম্পাদকের অঙ্গুরোধে করদিন হইল তিনি এই প্রবন্ধটি লিখিতে দেখিয়াছিলেন।

জীবন বাবু তখন কৃত্রিম শোকের সুরে বলিলেন, "ওগো, আমি মরে গেলাম, তুমি কোন্‌ প্রাণে হাসছ গো?"

সরলা বলিলেন, "ছাপাখানার ভুতদেবের সঙ্গে অনবরত কাঁচ করলে সে আর মাংস থাকে না, ভুতই হয় বটে। দেখ, তোমার ছবিটাও কালির পৌচড় দিয়ে কি রকম ভুতের মত করে দিয়েছে।"

জীবন বাবু তখন অস্ত্রাঙ্গ সংবাদপত্রগুলি খুলিয়া পড়িতে বসিলেন। আর্য্য প্রতিভার অল্পসংখ্যে সকল কাগজেই তাহার মৃত্যুসংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনেকেই মৃতের উদ্দেশে প্রছাপ্পাঞ্জলি দিয়াছে; দুই একটা কাগজের সম্পাদক এই উপলক্ষে তাঁহার রচনাপদ্ধতি 'সেকেন্স' এবং তাঁহাকে সত্য-বাবুগুণ, মনস্তত্ত্বে আনাড়ী ইত্যাদি বলিয়া কটাক্ষপাত করিতেও ছাড়ে নাই। এই সকল সম্ভব্য জীবন বাবু যখন উপভোগ করিতেছিলেন, তখন সরলা নিজ নামাঙ্কিত একখানি লেখাফা খুলিয়া একটি দীর্ঘ পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পত্রখানি পাঠ করিয়া সজল নয়নে তাহা স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন।

সে পত্রখানি পাইয়া জীবন বাবুর নয়নধর আর্দ্র হইল। সে পত্র তাঁহার কোঠহাট শ্রামস্বত্বের বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত। বহুদিন হইতে কোন বিষয় লইয়া তাঁহার পিতা ও কোঠহাটের মধ্যে মনোমালিঙ্গের সূত্রপাত হয়। কলে দুই ভ্রাতা:পৃথগ্ন হন। তাহার পর

সময়ের সহিত উত্তর পরিবারের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ
বিস্তৃত হইতেছিল। জ্যেষ্ঠভাতের দুর্জীবতার পিতার
অকাল মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া, জীবন বাবু কখনও
ধনী জ্যেষ্ঠভাতের সাহায্য ভিক্ষা বা দ্বৈধ প্রার্থনা করেন
নাই। তিনি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে-
ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে বিপন্ন শ্রামশ্রমের
একমাত্র অকৃতদার পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর, তাঁহার
মনের যে কি পরিবর্তন হইয়াছিল, জীবন বাবু সে সংবাদ
জানিতেন না। মৃত্যুর এই অলৌকিক সংবাদ সত্য মনে
করিয়: শ্রামশ্রমের প্রতি শ্রামশ্রমের রুদ্ধ হ্রে
কিরূপে সকল সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া তাঁহার
নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, এই
পক্ষে জীবন বাবু তাঁহার পরিচয় পাইলেন। জ্যেষ্ঠভাত
মহাশয় তাঁহার অতুল সম্পত্তি সরলা ও তাঁহার পুত্র-
দ্বিগকে দান করিয়া, কালীতে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি
কাটাঁইবার সঙ্কল্প সেই পক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জীবন বাবু সুবিনয় বাবুর একখানি পত্র
পাইলেন। সেই পত্রে, তাঁহার অশ্রুপরিহৃত ডুলক্রমে
তাঁহার মৃত্যুবিবরণ প্রবন্ধটি ‘বার্ষিক প্রতিভা’র প্রকাশিত
হইয়াছে বলিয়া সুবিনয় বাবু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া
করযোড়ের দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছেন।

কয়েক দিবস পরে জীবন বাবু সপরিবারে কলি-
কাতার কিরিয়া আসিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠভাতের সহিত
পুনর্মিলিত হইলেন। বহুদিন পরে দৈব ঘটনাক্রমে
তারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইলে লোকে বেক্ষণ আনন্দ অশ্রু-
ভব করে, শ্রামশ্রমের বাবু শ্রামশ্রমকে বক্ষে ধারণ
করিয়া সেই আনন্দ অশ্রুভব করিলেন।

একদিন জীবন বাবু মহাসমারোহে তাঁহার সাহিত্যিক
স্বগণকে তোলা দিলেন। কোনও বন্ধু, কি উপলক্ষে
খাওয়ান হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন যে,
তাঁহার মৃত্যুর পর, আত্মার সদস্য তর তর নিজের শ্রাদ্ধ
নিজেই করিতেছেন, সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ কার্যাদির
অলপান। সেই তোলে আর সকলেই উপস্থিত হইলেন,
কিন্তু বিস্তর অশ্রুবোধ সত্ত্বেও কেহ মণিমোহন বাবুকে
তথ্য লইয়া বাইতে পারিল না। তাঁহার ডুলের অভ্যে
জীবন বাবু প্রকৃত বিবরণের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন
একথা বলা সত্ত্বেও, তিনি লজ্জার বহাদুর জীবন বাবুর
সম্মুখীন হন নাই।

শ্রীবিভাসতী ঘোষ।

শেষ পরী

(করাসী হইতে)

১

আমি ১৬ বৎসর পার হইয়াছি—বখন তাকে
প্রথম দেখলাম। আমার মনে পড়ে, বৈশাখের কোন
সুন্দর সন্ধ্যায় এই সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। আমি
নগর হইতে একা বাহির হইয়া লক্ষ্যহীন হইয়া,
বন্দনীর মত মাঠ বদান দিয়া চলিতে লাগিলাম—

কেন চলিতেছি তাহা জানি না। কিছুকাল এইভাবে
ছিলাম। বিজনতা আমার ভাল লাগিত।

আমি দেখিলাম, কনক-রঞ্জিত নীল সমুদ্রের মধ্যে
সুখী ভূবিয়া গেল। উপকূল হইতে নানিয়া ছায়াগুলি
সমতল ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িল, নীল আকাশে তারা
গুলি একে একে ফুটিয়া উঠিল। সরোবরের ধারে

ভেকেরা ডাকিতে লাগিল; মাঝে মাঝে নাইটিফেলের গীতি-লহরী উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মন্থ অনিল হিরোণে তরুণগণ শিহরিয়া উঠিল, তরুণগণ হইয়া বাইতে লাগিল। চন্দ্রমা দিগন্তে সমুদিত—শুভ্র ও দীপ্তমান,—অলস-পর্বাঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; চন্দ্রের রশ্মি কিরণ বিভাবরী কক্ষে ঝড়িয়া পড়িতেছে। কবোঝ বায়ু প্রাণ উদ্ভাসিত জগৎকে ভরা; কুসুমিত ঝোপঝাড়ের মধ্য হইতে নীড়শায়ী পক্ষীদিগের আদর-ভরা মুহূর্ত্ত কাকলী শোনা বাইতেছে।

এই সব মধুর শব্দ, মধুর গন্ধ উপভোগের জন্য প্রাণের দ্বার খুলিয়া দিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম কতকগুলি তরুণী হাত ধরাধরি করিয়া গান গায়িতে পাড়িতে সহরে ফিরিয়া বাইতেছে। তাহারা বসন্তের গান, প্রেমের গান সমস্তই গায়িতেছে। সুপ্ত মাঠ ময়দানের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহাদের তরুণ কণ্ঠস্বর যেন দূরস্থ জল প্রপাতের শব্দ মত অনুরণিত হইতেছিল। আমি ঝোপঝাড়ের পিছনে লুকাইয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম। যে-সব শুভ্র ছায়া রাজিতে লঘু নৃত্যের জন্য সরোবরের চারিদিকে একত্র সমবেত হয়, এবং উবার প্রথম আলোকের উদ্দেশ্যেই তিরোহিত হয়, তাহারা দেখিতে কতকটা সেই রকম। তাঁহাদের আলোকে, আমি তাহাদের শ্রামবর্ণ অথবা গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাদের পরিচ্ছদের খস-খস শব্দ শুনিতে পাইলাম। বাজাপথে তাহারা তাহাদের গাজনিঃসৃত যে এক অপূর্ণ সুরভিষাগ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা আমি দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া প্রাণ তরির আশ্রয় করিলাম। সারাক্ষর সেই সৌরভ-ভরা প্রাণ-উদ্ভাসিত অনিল-উচ্ছ্বাস অপেক্ষাও এই সৌরভের আশ্রয়ে আরও যেন প্রমত্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

উহার বধন অন্তর্হিত হইল, তখন কি একটা অননুভূতপূর্ব ব্যাকুলতা আসিয়া আমার চিত্তকে অধিকার করিল; ময়দানের কিনারায় একটা চিবি ছিল, সেই চিবির উপর আমি বসিয়া পড়িলাম—

আমার সম্মুখে বস্ত্রীর্ণ ময়দান যেন হরিৎপুঞ্জের সমুদ্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দুই হাত দিয়া কপাল ঢাকিয়া, আমার ভিতরে যে কল্পন হইতেছিল, তাহার শব্দ শুনিতে-শুনিতে, তাহার কি-অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে করিতে, একটা গভীর স্বপ্ন-কল্পনার মধ্যে নিমজ্জিত হইলাম।

বাহা অনুভব করিলাম, তাহা কথার ব্যক্ত করা যায় না। একটা দারুণ বেদনার জ্বলিওঁটা যেন কাটা বাইবে এইরূপ মনে হইল। হৃদয়ে যেন একটা উৎস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সে যেন বাহির হইবার একটা পথ খুঁজিতেছে; যেন একটা বন্দী তরঙ্গ কারা ডাঙ্গিয়া বাহিরে প্রেরিত হইতে চাহিতেছে। আমি কাদিতে লাগিলাম—অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলাম। এই অশ্রুর মধ্যেও কি যেন একটা বিলাসিতা প্রচ্ছন্ন ছিল।

কিছুকাল এই ভাবেই ছিলাম। তাঁর পর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দেখিলাম, কয়েক-পা দূরে আমার সম্মুখে এক স্বর্ণের দেবতা আবর্ত্তিত হইয়া আমাকে দেখিতেছেন, আর, মুহূর্ত্ত-মুহূর্ত্ত হাসিতেছেন। পর অপেক্ষাও শুভ্র একটা লম্বা আঁখি, তাঁকে তাঁকে স্নানরূপে তাঁহার দেহ হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং মার্কেল পাথরের মত সাদা পা-ছাখানি "হৌর কি না হৌর মাটি" ভাবে ঘাসের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহার সোনালী কেশজুহু বর্ণেচ্ছভাবে তাঁহার কাঁধের চারিদিকে উড়িতেছে। যে কুসুম-কিরীটে তাঁহার মস্তক বিভূষিত ছিল, সেই কুসুমেরই মত তাঁহার গাল দুটি বেশ টাটকা তাজা ও উজ্জল। তাঁহার "হৃদে আলো" মুখমণ্ডলে, বৈশাখের প্রথম চুপনে বরকের উপর বিকসিত পেরিউইকল পুষ্পের মত তাঁর চোখদুটি জলিতেছে। তাঁহার বাহুবধন নয়; একটি হাত তাঁহার বকের উপর ন্যস্ত এবং আর একটি হাত দিয়া যেন আমাকে আহ্বান করিতেছেন।

আমি কিয়ৎকালের জন্য, মুক, হইয়া, নিশ্চল

হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। নিশ্চয়ই উনি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। কেননা তাঁহার সৌন্দর্যের ভিতর, পার্শ্ব ললা-জ্বলন্ত কোনও সৌন্দর্যই ছিল না, ভাষার বস্ত্রের মত, তাঁহার চারিদিকে একটা বায়ুমণ্ডল যেন কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিল। অংশেবে ব্যাকুলভাবে হস্তপ্রসারণ করিয়া আমি বলিলাম উঠিলাম—“কে গো তুমি?”

নৈশ বায়ু অপেক্ষাও মৃদুমধুর স্বরে তিনি উত্তর করিলেনঃ—“বন্ধু! আমি পরী,—আমাদের রাজ্য তোমার জন্মকালে, তোমার বৃকের ভিতর আমার নিদ্রা বেতে আদেশ করেছিলেন; তোমার দ্বারে সর্বপ্রথমে যে একটা আকুলতা এসেছিল, সেই আকুলতার বেগে আমি জেগে পড়লাম। আমার জীবন তোমার জীবনের দ্বারাই গঠিত। আমি তোমার ভগিনী; আমি তোমার সঙ্গিনী; জীবনের অর্ধপথ আমরা এক সনেই চলব। তার পর শুকনো ফল বেরূপ বৃদ্ধ হতে বিচ্ছিন্ন হয়, আমিও একদিন সেইরূপ মধ্য পথে তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হব। দেখ ভাই, সেই দিন আর বেশী দূরে নাই। যে গোলাপের আয়ুষ্কাল একটা প্রভাত মাত্র, তারই প্রতিক্রম আমার নিরতি। আমাকে ভালবাসবার সময় এ কথাও মনে রেখো আমাকে একসময় হারাতে হবে; আমার যখন প্রাণবিরোগ হবে, তখন হাজার কাদো হাজার হুংখ কর, আমাকে বাঁচাতে পারবে না। সত্য প্রস্তুত হও। আমার হাতে মারা-দণ্ডও নাই, সম্মোহন দণ্ডও নাই। আমার চুলের এই পুষ্প-ভূষণই আমার সমস্ত সাজসজ্জা। কিন্তু আমি তোমাকে এত ধন ঐশ্বর্য্য দান করব, যা' কোন রাজপুত্রের জন্মকালে, রাজপুত্রকে কোন বদান্ত পরী দান করে নি। তোমার মাথার এমন একটা সুকুট পরিবে দেব যে, অনেক রাজাই তাদের সুকুটের মূল্যে, তোমার ঐ সুকুট কিন্তে পারলে আপনাদের ভাগ্য-বান মনে করবে। তোমার অস্ত্র একরূপ অমৃতচরবর্ণ নিবৃত্ত করব, যা' রাজপ্রাসাদে ও রাজ-দরবারে দেখা

যায় না। আমি অদৃষ্ট হয়ে বরাবর তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। সর্বত্রই তুমি আমার কলপ্রস্থ প্রভাব অনুভব করবে। যে সব জায়গা দিয়ে তুমি চলবে, সেই সব জায়গা আমি বিভূষিত করব। রাজ্যে তোমার শয্যা আমি সুরক্ষিত করব। তুমি জেগে উঠলে প্রত্যেক প্রভাত তোমার নিকট বাতে হস্তময় হয় এই উদ্দেশে সমস্ত প্রকৃতিকে আমার অন্তরাত্মা দান করব। আ! আমরা কত সুন্দর সুন্দর উৎসব উপভোগ করব। কেবল, যে সব ধনসম্পদ তোমার কাছে আমি আনব, বন্ধু, সেগুলিকে চিন্তে শেখা চাই। তোমার হাত থেকে পালাবার আগেই দৃঢ়মুষ্টিতে এদের ধরে ফেলতে হবে। পরিধান না করে' কোন জিনিস কিরূপে স্পর্শ করতে হয়, নিঃশেষ না করে' কিরূপে উপভোগ করতে হয়—তা জানা চাই। আমাকে ছেড়ে যে অর্দ্ধাবশিষ্ট পথ তোমার একা চলেতে হবে—পূর্ব হতেই তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দেখ বন্ধু, আমি তোমাকে পূর্বেরই বলেছি, আমি খুব অল্প দিনই বাঁচিব, কিন্তু আমার এই কণ্ঠস্বর মূল্যবান জীবনকে আরও একটু দীর্ঘ করা না করা তোমার উপর নির্ভর করছে। আমি সেই সব জ্বলন্ত চারা গাছের মত, যাদের বধাপরিমাণে সূর্য্যের আলো ও বৃষ্টি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আমার পদদ্বয় বড় স্নজ্জমার, তোমার অনুসরণে তাদের ক্লান্ত করে' কোনো না। আমার কপোলের লাংবা-প্রভা পদের চেরেও কোমল, যদি তাকে শুকিয়ে ফেলতে না চাও, তা হলে জলন্ত বাসনা অনলের মধ্যে আমাকে নিয়ে যেও না—নিবিড় ছায়ার মধ্যে আমাকে নিয়ে যাবে। আমি চলে গেলে তুমি যে দারুণ কষ্ট অনুভব করবে, দেখো যেন তা বিবাক্ত না হয়ে ওঠে। আমার স্মৃতিটা তোমার যেন স্তব্ধের স্মৃতি হয়; তোমার জীবনকে আমি আর কিরণধারার সমুজ্বল ও প্রদীপ্ত করতে পারব না সত্য, কিন্তু আমি চলে' গেলে তার পরেও, অনেক দিন পর্যন্ত যেন তোমার দ্বারে তার একটি মধুর প্রতিবিম্বচ্ছটা রেখে যেতে পারি।”

এই কথা বলিয়া, শিশুর রক্ত-ধেবতা বেরূপ শিশুর শয্যা ঘোণার উপরে ঝুঁকিয়া থাকেন, সেইরূপ আমার দিকে তিনি তাঁর শুভ্র মুখটি নোয়াইলেন; এবং আমার ললাটদেশে তাঁর ওষ্ঠযুগলের স্নেহে স্পর্শ অনুভব করিলাম—সেই ওষ্ঠযুগল, উৎস-প্রাচুর্ভ তালা পুদিনার গন্ধে যেন সুরভিত। তাঁকে ধরিবার জন্য আমি হাত বাড়াইলাম কিন্তু তখন সেই শুভ্র ছায়ামূর্তি স্বপ্নের মত অন্তর্ধান করিয়াছে।

বসন্ত এটা কি যন্ত্র নয়? আমি মাঠ মরদানের উপর দিয়া বরাবর চলিতে লাগিলাম; কখন বা উদ্ভাদের তায় ছুটিতেছি; কখনও বা ঘাসের উপর শুইয়া পড়িয়া থাকি অশ্রুজলে সিক্ত করিতেছি। কখনও বা তুর্জ-বৃক্ষের গাছ-নিঃসৃত স্রব্দ বৃন্তটিকে আমার বুকে চাপিয়া ধরিতেছি; এবং মনে করিতেছি, আমার উদ্ভাদের লক্ষণ দেখিয়া সেও শিহরিয়া উঠিতেছে, কম্পিত হইতেছে; কখনও বা তারকাগণের দিকে হাত বাড়াইয়া প্রেমমুগ্ধ হৃদয়ে তাহাদের সহিত কথা কহিতেছি; কখনও বা পুষ্পগণের সহিত, কখনও বা তরুগণের সহিত, কখনও বা তৃণশস্যের সহিত কথা কহিতেছি। আমি অনুভব করিতেছি যেন আমার ভিতরে একটা রসের প্রবাহ ছুটিয়া আমার সর্বাঙ্গকে রসে স্নানিত করিয়াছে এবং উহা আমার অন্তর ছাপাইয়া উঠিয়া প্রকৃতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উৎসটি শৈলপাদকে বিদ্ধ করিয়াছে। আমি হাসিতে লাগিলাম, কাঁদিতে লাগিলাম; একপ্রকার অনির্কীচ্য সুখ ও নানবীণ আনন্দের অসীম সাগরে যেন ডালিতে লাগিলাম।

যখন প্রোটা একটু শুভ্র হইয়া উঠিল, আমার মনে হইল যেন সৃষ্টির আগরণ এই সর্বপ্রথম আমি দেখিতেছি। আমার বুক তরিয়া উঠিল; আমি গর্জতরে নিঃশ্বাস লইতে লাগিলাম, কণেকের জন্য আমার মনে হইল যেন আমার আত্মা বেহ হইতে বাহির হইয়া, মুক্তভাবে, লম্বু ভাবে আকাশের ভিতর দিয়া উড়িয়া বাইবে; এবং উদীয়মান সূর্য্য যে-সব কীর্ণ বাষ্পরাশিকে উপকূল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, সেই বাষ্পরাশির সহিত একেবারে

মিশিয়া বাইবে। পর্বতের উপরে উঠিয়া, সেই উর্দ্ধদেশ হইতে বিজয়ীর দৃষ্টিতে সমস্ত দিগন্তদেশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; আমার মনে হইল যে পৃথিবী এই সবেমাত্র আমার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং আমিই পৃথিবীর প্রভু।

২

আর একবার তিনি আমার নিকট আবির্ভূত হইলেন—তখনও আমার জিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। আমার মনে পড়ে, আশ্বিনের এক সন্ধ্যা এই ঘটনাটা হইয়াছিল। আমি নগর হইতে একাকী বাহির হইয়াছিলাম। লক্ষ্যহীন, বিষন্ন ও অবসন্ন হইয়া মাঠ দিয়া চলিতেছিলাম—যদিও স্বভাবতঃ আমি বিজন স্থানের অনুগামী নই।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; একটা কনকনে বাতাস, গাছ গুলার শেষ ডালপালার উপর ঝাপট মারিতেছে। শুষ্কের বেড়াগুলা কতকগুলি ছোট ছোট বীজাকার ফলে বিভূষিত মাত্র। দূরস্থ ক্ষেতবাড়ী-নিঃসৃত কুকুরের ঘোর বিবাদময় ঘেউ-ঘেউ রব, ডালপালার মধ্য দিয়া সমুখিত সূত্র পরিমাণ একটু নীল ধোঁয়া—ইহাট এই উজাড় পট্টা-প্রদেশের জীবনের একমাত্র নিদর্শন। তথাপি, কতক গুলি পাখী ভীতি-বিহ্বল হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়া বসিতেছে; কালো-কালো দাঁড়কাকের অধিষ্ঠানে মাটির উপর যেন কতকগুলি কালো দাগ পড়িয়াছে। সারাহের ধূসর আকাশে সারস-বৃন্দ দলে দলে সারিবন্দি হইয়া ধীর-গতিতে উড়িয়া চলিয়াছে।

এই শোকাচ্ছন্ন প্রকৃতির সহিত আমার অন্তরাআকে মিশাইয়া আমি চলিতে লাগিলাম। সূর্য্যের দিনের অবসানে মনের উপর যে একটা ঠাণ্ডা বিবাদের ছায়া বনাইয়া আসে, অনেকগুলি ধরিয়া সেইরূপ বিবাদে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি যে পত্র-তীন ঝোপ বাড়ির তলায় বসিয়াছিলাম, সেইখানে দেখিলাম, আমার পাশ দিয়া ছুইজন রমণী ধীর-গতিতে চলিয়া যাঁতেছে—প্রত্যেকেই কাঁটা গাছের বোকা মাথায় করিয়া একটু স্তব্ধ।

পড়িরাছে। এই শীত কালের জন্ত সজ্জা করিয়া রাখিবার উদ্দেশে কুটীরে লইয়া বাইতেছে।

অক্লান্ত স্মৃতি! অক্লান্ত সারিধা! বহু পূর্বে ঠিক এই সময়ে কোন এক বৈশাখ-সারাহে, ঠিক এই জায়গা দিয়া একদল তরুণী হাত ধরাধরি করিয়া গান গাইতে গাইতে বাইতেছে দেখিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স ৩০ বৎসর, আর তখন এই ঝোপঝাড় পুষ্পভূষিত ছিল।

তখন আমি হাত দিয়া মুখ ঢাকিলাম এবং সেই বৈশাখ-সারাহ হইতে এই কার্তিক-সারাহ পর্যন্ত যে সময় অশি-বাহি-চইরাছে, তাহা লইয়া মনে মনে ক্রমাগত আন্দোলন করিতে লাগিলাম। তাহার পরেই একটা বিবাদময় গভীর অবসাদে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলাম।

তাহার পর উঠিয়া দেখিলাম,—কয়েক-পা দূরে, আমার সম্মুখে একটি পাণ্ডুবর্ণ স্তম্ভ—বিবাদ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। রমণী এতটা বদলিয়া গিয়াছে যে অতিকষ্টে চিনিতে পারিলাম। তাহার প্রথম আবির্ভাবে, যে জ্যোতির্ময় বায়ুমণ্ডল তাহার চারিদিক ঘিরিয়া ছিল, তাহা আর দেখিতে পাইলাম না। তাহার ছিন্ন আমার ভিতর হইতে তাহার গৌলানন্দে সুন্দর স্তন্যগুলি দেখা বাইতেছে, তাহার পদদ্বয় রক্তাঙ্গুষ্ঠ, তাহার নিকীৰ বাহুদ্বয় তাহার শীর্ণ পঙ্কজ-পার্শ্বে শিথিলভাবে পড়িয়া আছে। তাহার চোখের নীলিমা অন্তর্জিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে; অশ্রুধারা তাহার সীসা-নীল গালে গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়াছে। হস্তভাগিনী অতি কষ্টে দেহ-ভার বহন করিতেছে; ওরফে শুক পদ্মের মত মাটির দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“তুমি কি চাও?”

“বন্ধু! আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবার সময় এসেছে। আর ত দেখা হবে না, এই শেষ-বিদায় নৈবার জন্ত আমি এসেছি।” এই কথা বৃদ্ধা শোক-সন্তপ্তকণ্ঠে, শীত-বায়ু অপেক্ষাও বিবাদময় স্বরে—বৃহৎ গুল্মনে বলিল। আমি বলিয়া উঠিলাম—“দূর হ! দূর-হ এখন থেকে! মিথ্যাবাদিনী, তুই আমার জন্ত

কি করেছিল? যে ঐশ্বর্য আমাকে দিবি বলেছিল—সে সব ঐশ্বর্য কোথায়? আমার বাজাপথে অনেক খুঁজছি, কিছুই পাই নি। যে রত্ন-ভাণ্ডার আমার গারে সমর্পণ করবি বলেছিল সে রত্নভাণ্ডার কোথায়? দৈন্ত ছাড়া আমি ত আর কিছুই পাইনি। আমার হাতে যে মুকুট পরিয়ে দিবি বলেছিল তার কি হল?—আমার মাথায় এখন কাঁটার মুকুট ছাড়া ত আর কিছুই নাই। যে ভবকালো অমৃতচরম আমাকে দিব বলে অঙ্গীকার করেছিল, সে অমৃতচরম কোথায়? অমৃতচরের মধ্যে নৈরাশ্র ও বিজনতাই ত আমার একমাত্র অমৃত। তুই বলছিল আমাদের মধ্যে এখন বিচ্ছেদ ঘটবে—তুই যদি হৃৎখের অপদেবতা হোস,—তা হলে বিচ্ছেদ হলেই বা কি? যদি আমার সমস্ত জীবন তোরই প্রভাবের বশবর্তী হয়ে পাকে, তা হলে দূর হ তুই, জাহান্নামে যা তুই—কারণ তুই অমরলের অপদেবতা!”

বৃদ্ধা বিব্রতভাবে উত্তর করিল :—

“আমি অমরলেরও অপদেবতা নই, হৃৎখেরও অপদেবতা নই;” আমাকে হাণ্ডার পর মানুষ আমাকে আর চিন্তে পারে না—আমি যে সব স্মৃতি তাকে স্মরণ করেছিলুম, তার মূল্য এখন সে আর বুঝতে পারে না—কেন না, এখন সে সব স্মৃতি আর উপযোগ কর্তে না;—মানুষের নিয়তিই এই। তোমার তাইদের মত, বন্ধু, তুমিও অকৃতজ্ঞ। তুমি আমাকে অপরাধী করচ—আমি তোমাকে অমৃতকম্পা করছি। সুহৃৎদের মধ্যেই তুমি আমাকে চিন্তে পারবে; তখন প্রথম বারে আমাকে যে রকম দেখেছিলে, একদিনের জন্ত আমাকে আবার একবার দেখবার জন্ত তুমি ইচ্ছুক হবে—এমন কি তোমার সমস্ত অবশিষ্ট পরমায়ু মূল্যেও এই অভিলାষ পূর্ণ করতে চাইবে। তুমি কাতরভাবে জিজ্ঞাসা কর,—কোথায় সে সব স্মৃতি-সম্পদ যা আমি, অঙ্গীকার করেছিলুম? কিন্তু যে সব স্মৃতিসম্পদ তোমাকে আমি মুক্তহস্তে দান করেছিলুম, তুমিই ত সে সব অবজ্ঞা

করলে? সুকুটের কথা বলছ?—আমি ত তোমার লগাটে বসন্ত প্রভাতের নবীনতা উজ্জলতা ও প্রশান্তির সুকুট পরিষে দিয়েছিলাম। অমৃতবর্ণের কথা বলছ?—আমি প্রেম, বিশ্বাস আশা ও মোহনতা—এই সব অমৃতের তোমাকে দিয়েছিলাম। তোমার দৈন্তবশ্যকে এমন হান্তময়ী ও গুহর করে তুলেছিলাম যে, অনেক প্রতাপা-বিত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি তার পাসাদ, ধন ঐশ্বর্যের বিনিময়ে সেই দারিদ্র্যকে লাভ করবার জন্য আকাজকী হতে পারত। তোমার বিজনতাকে ত আমি মোহনশব্দে পূর্ণ করেছিলাম। তোমাকে দিয়ে তোমার নৈরাশ্রকেও ভাল বাসিয়েছিলাম; তোমার অশ্রু দিয়ে তোমাকে এতটা মাতির তুলেছিলাম যে, এখন থেকে তোমার হাজার বিপদ হলেও তুমি আর অশ্রুপাত করবে না। তুমি যখন পথ 'নরে চলতে, তখন তোমার রক্ষণের জন্য মমতা ও দয়াকে আম আঁগরে রাখতাম। তুমি তখন সুহৃদেব দৃষ্টি ও প্রাকৃতিক ভাড়া আর কিছুই দেখতে পেত না আকাশ হাসিমুখে তোমার পানে চেয়ে থাকত পৃথিবীও তোমার পদতলে পুস্পিত হ'র উঠত। এখন বল দিক, আমি মুক্তহস্তে এত যে তোমাকে দান করলাম, তুমি সেই দানের ভিনিসগুল নিঃস্ব কি করে?—সেই সব ধনসম্পদের মধ্যে 'কছুই কি রক্ষ' করতে পেরেছ? তোমার যাজ্ঞপথের দুইধারে এত যে সুরের বীজ বপন করেছিলাম, এখন তার অবশিষ্ট কি-আছে? তুমি যদি কিছুই রক্ষ করে না থাক, তার জন্য কি আমি দারী?—তুমি যদি তা উপভোগ করতে না পেরে থাক, —সে দোষ ক আমার?"

এই কথাগুলির পর, একটা আলোকে আমার সমস্ত সন্তাটা আলোকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল যেন একটা আবরণ আমার চক্ষু হইতে সরিয়া গেল এবং আমার নিজের হৃদয়ের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া, জীত-বহুল চতরা পড়লাম আমি অমৃত স্বরে বলিয়া উঠিলাম ওগো "তুমি দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও—চলে যেও না। যে ধনসম্পদকে আমি অবজ্ঞা

করেছিলাম, তা আমাকে কিরিয়ে দাও; প্রকৃত আলোকে আমার চোখ খুলে যাক। আমার প্রেমকে আমার মোহকে কিরিয়ে দাও। আমার বিশ্বাসকে আমার আশাসকে কিরিয়ে দাও। যেন শুধু একটা দিন ভালবাসতে পারি, শুধু একঘণ্টাকাল বিশ্বাস করতে পারি এইটু তুমি করে দেও—তাহলে তুমি যেই হও না কেন, আমি মরতে মরতেও তোমাকে আশীর্বাদ করব।"

সে বলিল :—

—“হায়! আমারই বে মৃত্যু আসন্ন। তুমি কি দেখতে পারচ না? আমার দিকে চেয়ে দেখ; আমি খুব কষ্ট পেরেছি; আমার আর কিছুই নেই, আমার ভায়ামাত্র অবশিষ্ট আছে। দেখ, অনেক দিন থেকে একটা অজ্ঞাত রোগ আমাকে দগ্ধ করছে; একটা সর্বগ্রাসী শ্বাসবায়ু আমার অস্থিগুলোকে ভাঙিয়ে ফেলেছে; আমার বুকের জীবন-উৎসগুলিকে নিঃশেষ করে ফেলেছে। আমার হৃৎপিণ্ডে আর রক্ত এসে পৌঁছে না, আমার হাত দু'য়ে দেখ,—মৃত্যুর ভিজে ঠাণ্ডা অনুভব করবে। তথাপি, যদি তুমি ইচ্ছা কর'ত, আমি আরও অনেক বৎসর বাঁচতে পার'তাম। নিষ্ঠুর! আমার অকাল-মৃত্যু তুমিই ঘটিয়েছ। তোমাকে ক্ষমণ করতে আমার সমস্ত বল ক্ষয় করেছি আমার পা ছটাকে কতবিস্তৃত করেছি। আমি তোমার কাছে কত কথা চাইলাম, কিন্তু সব বার্থ হল; তুমি বলে' উঠলে—“চল! চল!”—আমি চলতে লাগলাম। শ্রান্ত অবসর হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে রাস্তার কাঁটাগাছে আমার পরিচ্ছদ ছিঁড়ে গেল; মধ্যাহ্ন-স্বর্ষের উত্তাপে আমার কপাল পুড়ে যেতে লাগল। আমার কটিবন্ধটাতে গ্রহি দিয়ে যে আবার এঁটে পরব, আমার সুকুটে স্নান করা ফুলগুলি যে আবার তুলব—সে সমস্তটুকুও তুমি আমাকে দেওনি। কোন একটা কুহুম-শোভিত স্তম্ভের আগ্রম—যেন একটা রহস্যময় রক্ত কানন দেখতে পেয়ে তোমাকে, যখন বলতাম :—দয়, স্তম্ভ-

শাস্তি ঐখানেই আছে.—ঐখানেই আমাদের তাঁবু
পাড়তে হবে।—তুমি কিছুতেই ধামসে না—গৌ ধরে’
বরাবর চলে যেতে এবং আমাকে নির্দয়ভাবে মরুভূমির
বালুরাশির মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে। কোনও
অত্যাচার হতে আমাকে কি রক্ষা করেছ? বড়
উঁহুনে আমার মাথা কি কখনও বাঁচিয়েছ? শ্রান্ত ক্লান্ত
অবসর ও হতাশ হয়ে কতবার তোমাকে
ছেড়ে দাব বলে স্থির করেছিলাম, কিন্তু অকৃতজ্ঞ,
আমি যে তোমাকে ভালবাসতাম। আমি তোমার কাছে
আর নেই অসুস্থ করে যখন তুমি আশ্চর্য্য হতে,
আর তার পর আমার কাছে ফিরে এসে ইসারা উল্লিতে
কিংবা করুণায় আমাকে ডাকতে, তখন আর আমি
ধাক্কে পারিই না, আমি উঠে তোমার কাছে আবার
আসতাম। কিন্তু আজ সব শেষ হয়ে গেছে বন্ধু,
আর আমি পারি না। আমার বক্তৃতাচল বন্ধ হয়ে
আসছে; আমার দৃষ্টি ক্রীণ হয়ে গেছে. আমার পা
টলছে। এসো, বাছ দিয়ে তোমার বুক আমাকে

একবার চেপে ধর; তোমার বুকের ভিতরই আমি
প্রাণলাভ করেছিলাম, তোমার বুকের উপরেই আমি
মরতে চাই।

তাকে গ্রহণ করিবার ভক্ত আমার ছুই হাত বাতাইয়া
বলিয়া উঠিলাম—“না. তুমি মর’ব না তোমাকে মরতে
দেব না; কিন্তু অজানা পথিক, আমাকে বল দিকি
তুমি কে?”

সে বলিল,—“আমি এখন আর নেই কিন্তু
একসময় ছিলাম—তোমার সৌন্দর্য্য।”

যখন সে এট কথ্য বলিল, আমি তাকে
ধরিতে উচ্চা করিলাম—কিন্তু তার আগেই সে অতীত
হইরাছে। কেবল দেখিতে পাউলাম, তার কায়গার
তার কেশ-চ্যুত কতকগুলি ফুল পড়িয়া আছে; আমি
সে সমস্ত তুলিয়া লইলাম, কিন্তু সেট ফুলে আর কোন
সুগন্ধ নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভাবে

অভাবে তার পড়বে বত
ততই তুমি বাবে নেবে,
হৃদয়ের স্মর উচ্চ প্রাণে
বাক্যে না আর—আসবে খেমে।
শিশাচ এসে নামিয়ে দেবে
তোমার প্রাণের ইষ্টদেবে—
থাকবে না আর উদার নীতি,
কিংবা প্রীতি বিশ্বপ্রাণে।
বায়ের মাথা করলে নীচ
ক্রমেই তাহা পড়বে হুয়ে—
ওঠাতে আর পারবেনাক
পেয়ে এসে ঠেকে হুয়ে।

মান অপমান থাকবে না বোধ
ভুলে নিয়ে কন্বে বিরোধ
হার রে, মনুষ্য তোমার
কোথার উড়ে বাবে হুয়ে।

তোমার প্রাণের পাগড়িগুলি
হুটেবে না আর হুবাতাসে—
হৃদয়ের সমুদ্রভিঙলি
গুড়ে বাবে হা হতাশে।
তকিয়ে বাবে বন্ধখানি,
নির্ভয়ে না সন্বে বানি,
দেখলে পরের রক্ত অঁবি
হুঁচে হয়ে কাঁপবে আসে।

বিবেক হবে মুকের মত
কইবে না সে কোন কথা—
শুন্নে মরই সার হবে তার
লরে অসীম ব্যাকুলতা।
মনটি তোমার একটু হয়ে
আসবে ক্রমে সরে সরে
হবে পাষণ— থাকবে না তার
একটুখানি কোমলতা।

তাববে তখন মানব মানার
রচনা এ বিশ্বভূমি—
—অধর্মের ভয়গতাকা
উড়ে কেবল আকাশ চুমি।
মনের আঁধার ঘনিরে এসে
দেবদেবী করবে শেষে—
ইহকাল ত কেঁদেই গেল,
পরকালেও কাঁদবে তুমি।
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কলঙ্কিনী

(গল্প)

পীতাম্বর চক্রবর্তী বশপুরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পল্লীগ্রামে সম্মান সর্বত্র অর্থের অমুগামী।। কিন্তু পীতাম্বর চক্রবর্তীর সম্মান শুধু অর্থের উপর নির্ভর করিত না; তিনি বুদ্ধমান ও ভাগ্যবান লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গ্রামের সমস্ত মামলা মোকদ্দমা সুচতুর পীতাম্বরের পরামর্শে চলিত; যে পক্ষ পীতাম্বরকে ধরিতে পারিত তাহার জয় অবশ্যস্বার্থী ছিল। তার উপর পীতাম্বরের তেজস্বী কারবার ছিল। তেজস্বী অর্থাৎ টাকা কর্তৃক দিবার একটি সুবিধা এই যে, লোকে স্ত্রের হার চড়া বালরা যতই ওজর আপত্তি করুক না, যতই সেজন্য লোকে মহাজনকে ঘৃণা করুক না, কেহই মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। কারণ, কবে কাহাকে টাকার দ্বারে পড়িতে হইবে, আর শেষে ঐ পীতাম্বর ঠাকুরের কাছেই হরত হাত বোঁদ করিতে হইবে; সেই জন্য গ্রামের সকলেই পীতাম্বরের বশ্যতা স্বীকার করিত। গ্রামে যে সব দলাদল হইত, পীতাম্বর তাহার জনক ছিলেন, আবার যখন সে সকল মিটিয়া বাইত, তখন

পীতাম্বরের দ্বারাই মিটিত। পীতাম্বর নিজে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ হইলেও তিনটি কস্তাকে কুলীনের হস্তে সম্মান করিয়া গর্ব অমুভব করিতেন। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণও একজন পীতাম্বরকে কতকটা মান্য না করিয়া পারিতেন না।

এইরূপে নানা প্রকারে প্রতিষ্ঠা ও মান অর্জন করিয়া পীতাম্বর বশপুরের সামাজিক জীবন প্রবাহকে আপনায় ইচ্ছামত পরিচালিত করিতেছিলেন, তারপর একদিন যখন তিনি শেষ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু মূর্ত্তিত করিলেন তখন যে বশপুরের পল্লীজীবন তখন বাধ শ্রোতৃবিশ্বাস মত বিকল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আর বিচিন্ত্য কি? যাহারা এতদিন পীতাম্বর চক্রবর্তীর অন্ত পসার করিতে পারেন নাই, তাহারা অপূর্ণ সুযোগ পাইলেন। দলাদলিতে যাহারা এতদিন পীতাম্বরের অন্ত খাটো হইয়া ছিলেন তাহারা শির উর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পীতাম্বরের শ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া তাহার শিশুগুণটিকে বণন করিবার পথ আবিষ্কার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

এতদন পীতাম্বর বাগানের অগ্গ্রে বা বিপক্ষে মায়ালা মোকদ্দমার তথ্য করিয়াছেন, সপ্ত পরামর্শ দিয়াছেন তাহার। তাঁহারই পাতক দিগকে পরামর্শ দিল যে, “পীতাম্বরের পাঁচনা টাকা শোধ দিবার কিছু প্রয়োজন নাই, শশুপুত্র বড় হইয়া বখন নাগিশ করিবে তখন আমরা সকলে সাক্ষী দিব যে খত জাল; কিছু তর মাট, আশ্রিত কিছু বাজার খরচ ও গাছের আম কাঠাল আমাদিগকে মলেই চলিবে।”

পীতাম্বরের পারিবারিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। পত্নী জগদম্বা সংসারের আশ্রিতে পড়িয়া চারিদিক কষ্টকার দেখিলেন। জমাকমি বাহা কিছু আছে, তাহা দেখিবার লোক নাই। তেজস্বতীর টাকা আদায় করিবার লোক নাই। গোমস্তা একজন আছে বটে, কিন্তু তাহার নিকট হঠাতে হিসাব বুঝিয়া লইবার মত কেহই নাই। তিনটি কন্যা সংপাত্রে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু শশুপুত্রের অতিভাবক যে নাই। ছইটি কন্যা শ্যামা ও কামিনী শশুরবাড়ীতে গিয়াছে; কনিষ্ঠা যামিনী বিবাহের সময় মাত্র শশুরালয়ে গিয়াছিল, তার পরে সে মায়ের কাছেই রহিয়াছে। বেচারী বখন তাহার কন্যার তুলিকার প্রহরপ্রীতি করণার রঙ ফলাইয়া শশুরবাড়ীর সম্মোহন চিত্র আঁকিতে-ছিল, ঠিক সেই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হইল। কায়েই তাহার আশার গগনে চারিদিক হইতে ঘেঘ উঠিয়া জমাট বাধিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে তাহার কপোল বহিরা বর্ষার ধারার দ্বারা অশ্রু বহিত।

গ্রামের লোকের অত্যাচার, উপকৃতের অকৃতজ্ঞতা, কুটুম্বদিগের অতিমাত্র ঘনিষ্ঠতা জগদম্বাকে ভীত ভ্রস্ত ও বিড়ম্বিত করিয়া তুলিল। তিনি উপারাস্ত্র না দেখিয়া তাহার বড় জামাইকে সংবাদ দিলেন। শ্রামার শ্রামী শিবশঙ্কর সপরিবারে যশপুরে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। নামে মাত্র শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পন্ন করিয়া শিবশঙ্কর পীতাম্বরের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে মন নিব্বিষ্ট করিলেন। ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও বখন শ্রামা বা শিবশঙ্কর নিজ বাড়ীতে যাওয়ার নামও করিলেন না,

তখন জগদম্বা একটু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কুলীন জামাইকে কিছু ত বলা চলে না। শিবশঙ্কর কথায় কথায় খাণ্ডড়কে শুনাইয়া দি-ন বে, কেবল তাঁহাদের মঙ্গলের জন্ত তিনি স্বীয় বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া যশপুরের মত কর্মকা হানে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। জগদম্বা মনে মনে খোঁচাইয়া দেখিলেন যে মঙ্গল তাঁহার একার নহে। সে-লেটি পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়াছে গুরুমহাশয়ের বেত-শোধ হয় না। খতের টাকা আদায় হয়, তাঁহার হতে পৌছে না। জমির খানে বছর খরচ চলত, এ বছর জমিদারের লোক খান বেচারী খাজনা শোধ করিয়া হইয়া অবশিষ্ট বাহা ছাড়িয়া দিল, তাগাতে তিন মাস খাবার সংস্থান হওয়া দুর্ঘট। এইরূপ ভাবে মন কাটিতে লাগিল; শিবশঙ্করের পরোপকার-ব্রতে জগদম্বার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। শ্রামা বলিত, “না, তোমার আর কি? দিনান্তে দুটি শাকতাত হলেই তোমার ক’টা দিন চলে যাবে। সস্তর জন্ত যা করিতে হয়, উনিই করবেন, সে জন্ত তুমি কিছু ভেব না।” বাস্তবিক সৌন্দর্যে তাবনার কিছু ছিল না।

২

জগদম্বার ভাবনা সে জন্ত বড় নয়। তাহার ভাবনা যামিনীর জন্ত। কারণ তিনি জানিতেন যে, সন্তোষের বাহাতে ভাল হয়, তাহা শিবশঙ্কর কখন আর না করুন, তাহার নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই। গ্রামে শত্রু প্রবল, তাহাতে তিনি মেরেমানুষ হইয়া কতকাল তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবেন? জামাই কৃপা করিয়া বাহা করেন, সে-ই লাভ। সন্তোষের তত লাভ ন’হয়, শিবশঙ্করের ত হ’বে। শিবশঙ্কর ন থাকিলে যে বায়ে ভুতে লুটিয়া থাকিবে।

জগদম্বা যামিনীর জন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। যামিনী পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব পারপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে অধিকদিন পিতৃগৃহে রাখা ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ যামিনী

যে আজকাল বড় বেশী বর্ষা ও অন্তর্যময় হইয়া পড়িতেছে। ইহা মাতার চক্ষু এড়ায় নাই। তাই তিনি বামিনীকে হস্তগত্বে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ‘জামাই কুলীন; স্ববাহের পর কস্তা প্রথম পতিগৃহে বাইবে, তাহার উপযুক্ত স্রবাসস্তার সংগ্রহ করা অগম্য সাধ্যাতীত। শিবশঙ্করকে বলিলে, তিনি চক্ষু বুজিয়া থাকেন (শিবশঙ্কর অহিফেন সেবা)। শ্রামাকে বলিলে সে সমবেদন। প্রকাশ করিয়াই কান্দে। “আহা ওর স্বস্তর কি লোক গা? মেয়ে সোমন্ত হ’ল, অথচ নেবার নামটি নেই? লোকের কি জাত মানেরও তর নেই?”

অগম্য বলেন, “তাদের কি, বাছা? কুলীন মানুষ একটার কারবার পাঁচটা বিয়ে করলেও ত কিছু বলবার যো নেই।”

শ্রামা গম্ভীরা উঠিল “কেন, তারা একাই কি কুলীন? আর কেউ কুলীন নেই, বুঝি? এই ত এঁরা সবে পাঁচ পুরুষে তল এঁদের মুখের কথাই লোকে পারের কাছে মেয়ে নিয়ে লুটোর, তবু ত এই এক। ছেড়ে আর একটা বিয়ে করুক দেখি।”

অগম্য দেখিলেন এ তর্কে অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তাই তিনি মেরের হাত ধরিয়া চোখের জল অকলে মুছিয়া বলিলেন—

“মা, সবাই কি সমান হয়! আমার শিবুর মত শত্ৰুকে গোটা মেলা তার। মা অন্নপূর্ণা বাঁচিয়ে রাখুন। কুই মা তাকে বলে ক’রে বামিনীকে স্বস্তরবাড়ী বাবার মত শুছিরে দিতে বল, আমি তাঁদের পত্র লিখি।”

শ্রামা সে তার অগত্যা গ্রহণ করিল। অগম্য বামিনীর স্বস্তর অন্নপূর্ণা মুখোকে চিঠি লিখিলেন— জামাই আসিয়া মেয়ে লইয়া বাউন; অগ্রহারণ মাস প্রায় শেষ হয় এই মাসের মধ্যে যে দিন ভাল থাকে, সেই দিনেই তিনি মেরেকে তুলিয়া দিতে রাজি আছেন।

অন্নপূর্ণা মুখো পীতাম্বরের বেয়াই; পীতাম্বরের মতই চকুর। তিনি বুঝিলেন যে, ছেলেকে পাঠাইলে সে

স্বাত্তরীয়া মারা কারার ও সুবতী বধুর কটকে তুলিয়া বাইবে, পাওনা গণ্ডা আদায় হওয়া কঠিন হইবে। বেয়াই জীবিত নই, এ অংস্থার তিনি নিজে গেলে বেধান যদি ধরিয়া পড়ে, তবে চক্ষুলাজ্ঞা ভাগ করা কঠিন হইবে। সুতরাং যথাকালে তিনি উত্তর দিলেন যে, বধুকে এতদিন পাঠান উচিত ছিল; এখন যে দিন খুসী পাঠাইলেই ত হয়। এর জন্য আবার ইচ্ছার আরির প্রয়োজন কি?

অগম্য আশ্বস্ত হইলেন। তিনি ত আর কুপার ভিখারী নন। তিনি বুঝিলেন যে, পাছে পাওনার বিষয় লোকসান হয় এই জন্যই বেয়াই এই চাল চালিয়াছেন। অগম্য সেই দিনই হাকুর মা ও হাকুরকে বলিয়া রাখিলেন যে বামিনীকে ঘোবপুরে রাখিয়া আসিতে হইবে। দিন দেখা হলে, শিবশঙ্কর হাটবাজার করিয়া জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন; তাহাতে তাঁহারও নিতান্ত লোকসান হইল না। খরচ-সাপেক্ষ যে কোনও কবে শিবশঙ্করকে একবার লাগাইয়া দিতে পারিলেই হয়।

নৌকা আসিল। হাকুর ও তাহার মাকে ডাকিয়া পাঠান হইল, শিবশঙ্কর এ সম্বন্ধে পূর্বে কোনও খোঁজ করেন নাই। তাহার যখন বাত্মার সজ্জা করিয়া পাণ চিরাইতে চিরাইতে চক্রবর্তীগৃহে আসিয়া হাটের হইল, তখন তিনি চট্টা লাগল। শ্রামাকে তখনই তলব হইল; “শ্রামা, ব্যাপার কি? আমি কি কেউ নই নাকি? হাকুর মা বাবে, আর ঐ হতভাগা পাঁজি বিটকেল হাকুরটা বাবে, অথচ আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করা হল না। এসব কি কণ্ড? তোমার ম’কে গিয়ে বল এ সব হবে টবে না। হাকুর মত চৌরাক্ষ বদমায়েসের সঙ্গে বামিনীকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না।”

শ্রামা ভয়ে ভয়ে একবার বলিল, “তা বাকু না কেন ওরা, তোমারই বা কি মাথা ব্যথা? মা বা হয় করুন গে। আর হাকুর মাও যখন বাচ্ছে—”

শিবশঙ্কর বলিলেন, “সে আমি কিছুতেই হতে

দেব না, ওরা লোক আত পাছি। কুটুম বাড়ী অমন লোক পাঠাতে নেই, তারা হাক্কর সঙ্গে অমন একটি ডবকা সেরেকে দেখলে কি বলবে বল দেখি? আমি হরিকে বলে দিচ্ছি, ঐ গিয়ে রেখে আসবে এখন।”

আগল কথা শিবশঙ্কর প্রকাশ করিলেন না। হাক্কর তাঁহার মা চক্রবর্তী পরিবারের একান্ত অঙ্গগত। এদের আরে ওদের শরীর। পীতাম্বর চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর তাঁহার তিটার যখন গ্রামা ও শিবশঙ্কর-রূপ ভোড়া যুগু চরিতে আরম্ভ করিল, তখন ওরাই কেবল জগদম্বার আশ্রিতে নীচে অশ্রু মিশাইয়াছে। জগদম্বার আদেশ তাঁহারা প্রাণপাত করিয়াও পালন করিত। পিস্তার অস্ত্র খেঁজর বকুল আম আমকল সংগ্রহ করিতে তাহাদের আলস্ত ছিল না। বামিনীর অস্ত্র দুয়ের হাট হইতে শাখা চিকণী কিনিয়া আনিতে ওরাই; শিবশঙ্কর এ শাখার কথা উহার একেবারেই স্মৃতিতে চাফিত না; উহার যে তাঁহাদের ভাল চোখে দেখিত না, সে কথা শিবশঙ্কর জানিতেন কিন্তু তাহাও প্রকাশ্যে বল যার না।

জগদম্বা বুঝিলেন। কিন্তু আমাইয়ের উপর কথা কহিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। বধবা বিশেষতঃ হিন্দু বিধবা যে বাঁচিয়াও মরিয়া থাকে। তাহার সাধ আশা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা সবই স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া স্বপ্নানে ছাই হইয়া যায়। একদিনই অশ্রু অজ্ঞাতে সঞ্চিত হইয়া জগদম্বার দুটি কাপসা করিয়া দিল মাত্র।

হাক্কর ও হাক্কর-মার যাওয়া হইবে না, তাহা তিনি বুঝিলেন। হরির সঙ্গে পাঠাইতেই বা আপত্তি কি? হরি জগদম্বার আত্মীয়; কিন্তু সেরূপে হরি এ অসময়ে দেখা দেন নাই। হরি শিবশঙ্করের মাথাতে তাই। উত্তরের একই বস, উত্তরেই প্রৌঢ়; উত্তরেই সংসারের জ্বাখেলার প্রাণ পরিপক খেলোয়াড়। পীতাম্বরের মৃত্যুর পর বে-ওয়ারিস সংসারের রক্ষণাবেক্ষণ-করে শিবশঙ্কর যখন বশপুরে আসিলেন, তখন তাঁহারই দোস্ত বা মোসাহেব হিসাবে হরিও আসিয়া জুটিলেন। জগদম্বা মাসির সহিত পূর্ণ প্রীতি রাখিয়া চলাই হরির প্রথম দৃশ্য ছিল। সেই উদ্বেগ সিন্ধু করিবার অস্ত্র হরি প্রকাশিতঃ

নির্লিপ্ত ভাবেই চলিত। হুঁবেলা ছুটি খাওয়া, শিবশঙ্করের আজ্ঞা পালন করা এবং বিকালে প্রতিবেশীর পুকুরে মাছধরা অথবা তাহাদের বৈঠকখানার পাশা ও তাহাদের আড্ডার বোগ দেওয়া হরি প্রাধান্য কাব ছিল। পরি-শ্রমের বত কিছু কাব সে সবই শিবশঙ্কর হরির দ্বারা করাইত। ক্ষেতের ধান বাড়ীতে আনা, বাগানের ফল পাণো প্রভৃতি কাব হরি আপনার জনের মতই করিত। শিবশঙ্কর জগদম্বাকে বুঝাইতেন একজন লোক রাখিতে হইলে মাহিরানা দিতে হইত; হরি শুধু পেটে ছুটি খার বইত নর। হরি তাঁহাকে বলিত, “মাসি, এদিন পরেই ত তোমার জামাই পাততাড়ি শুটাবে, তখন দেখে নিও, হরিচরণ শর্মা একাই তোমার সংসার কি করে’ ঠেকিয়ে দেয়।” হরির কথার জগদম্বার প্রাণে আশ্বাসের সঞ্চার হইত।

হরি জগদম্বার মন বেরূপ সহজে ভিজাইতে পারিয়াছিল, তাহার শিশু পুত্রট বা বামিনীর মন সেরূপ পারে নাই। সম্ভাব কোনও মতেই হরিদাম্বার সম্বন্ধে পছন্দ করিত না। হরির অদূর সে কিছুতেই সহিতে পারিত না। বামিনীর প্রতি হরি প্রথম প্রথম বড়ই পক্ষপাত দেখাইয়াছিল। কিন্তু বামিনীর বিজ্ঞপবাণে তাকে মর্শ্ব মর্শ্ব বিদ্ধ করিত। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে বামিনী সংসারকে একটু আধটু চিনিতে শিখিয়াছে। বামিনী বদিন রাত্রির রাধিতে বাইত, হরি সে ঘরের বারান্দার গিয়া রামপ্রসাদী তাঁজিতে বসিত। বামিনী তাকে বলিত, “হরি দাদার গানে গাছের পাতা ঝরে’ পড়ে, বেগুন আলুনি হয়, আর খোবা বউয়ের বোকা বাড়ে।” হরির মস্তকের টাক লইয়াও সে নানা প্রকার রহস্ত করিতে ছাড়িত না। ইহার ভিতরে যে একটু অবজ্ঞা-র তাব ছিল, তাগাতে হরি-চরণের ঘনিষ্ঠতা-প্রবৃত্তির পথে কটক দিয়া দিত। হরি বুঝিত, ওদিক না মাড়ানোই ভাল।

সেদিন হাক্কর মা যখন জগদম্বার দিকে কাতর দুটি নিক্ষেপ করিয়া তাহার দ্বারে কাচা কাপড়ের পুটুটি ঝইয়া ঘরের দাওয়া হইতে নিঃশব্দে উঠিয়া গেল, তখন

বামিনীর মনটা খাঁচায় পাখীর মত ছট্‌কট্‌ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে করিবে কি? তাহার ত কোনই হাত নাই নিজে যে দুখ-কুটরা কিছু বলিবে, মায়ের সুখের দিকে চাহিয়া সে সাহসও তাহার চলিয়া গেল। পাছে হরি দাদার সঙ্গে বাইতে আপত্তি করিলে তাহার প্রতিগৃহে বাইবার পক্ষে বাধা পড়িয়া যায়, সেই আশঙ্কাক্রমে সে কিছুই বলিতে পারিল না। অপরাহ্নে সে কাঁছিয়া কাঁটরা বিদায় লইয়া নৌকার উঠিল।

৩

বামিনীকে লইয়া একাকী নৌকারোহণে কোথায়ও বাইতে হইবে, ইহা হরিচরণ কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। এমন একটি অসম্ভব বাণীর যে কখন কি ভাবে অকস্মাৎ সম্ভব হইয়া পড়িল তাহা বুঝিতে হরিচরণের কিছু সময় কাটিও গেল। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ সূর্য্য কিরণের মধ্য দিয়া নৌকাখানি পালের সাহায্যে তর তর করিয়া যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখনও হরিচরণের চমক তাকে নাই। সে ছাপ্পনের বাহিরে পালের বাঁশে ঠেস দিয়া নিবিষ্ট ভাবে এই কথাই ভাবিতেছিল, বামিনীর সঙ্গে সে আজ এক।

বামিনী বোভশী, তাহার রূপ উছলিয়া পড়িতেছে; তাহার আরত নয়নের আর্দ্র পদ্মপংক্তি আরম্ভ গুণ্ডুলের উপর স্রবের পংক্তির মত নিবিড় ভাবে রহিয়াছে। সেও যেন চিন্তাভারনত। বতকণ তাহার গ্রামের ঘাট, পল্লীবাট, সূর্য্যকরু-বিত্ত বৃক্ষাশ্রয় ভাগ দেখা যায়, ততক্ষণ সে এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া ছিল। তার পীন বক্ষস্থল, নিরুদ্ধ ক্রন্দন বেগে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে, ছিল। হরিচরণ তাহার চোখের কোণ দিয়া মাঝে মাঝে একবার বামিনীকে দেখিয়া লইতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার যেমন তীরস্থিত বৃক্ষকূলের মধ্যে ক্রমশঃ কমাট বাধিতেছিল, সেও এই একটা অন্ধকারময় অভিসন্ধি হরিচরণের একপঞ্জরের মধ্যে ক্রমে বনীকৃত হইয়া আসিতে লাগিল।

হরিচরণ চিন্তার সমুদ্রে ভাবুড়ুর খাটতেছিল। বামিনীর রূপের নেপা হরিচরণকে যে আজ ঠাণ্ডা উদ্ভূত করিয়া তুলিল, তাহা নহে। বামিনীর ক্রমবিকশিত বৌবনের উচ্ছলিত লীলাভরণ তাকে অনেক দিন হইতে মোহিত করিয়াছিল। কিন্তু বামিনী কখনও তুলিয়াও হরিচরণের ঘনিষ্ঠতাকে প্রেমের দের মাটি, বরং সময়ে সময়ে নির্ধম ভাবে তাহার সে প্রবৃত্তিকে উল্লেবেই লালিত করিয়া দিয়াছে। আজ তাকে এমন ভাবে অসংগত অবস্থায় পাঠিয়া হরিচরণের মন বড়ো নৌকার মত অস্থির ও দিগ্‌বিদিক শূন্য হইয়া উঠিল। তাহার মন তাকে বুঝাইল যে এই সুরোগ। কিন্তু আশঙ্কা পাতে ব্যর্থ হয়। কারণ হরিচরণ জানিত যে বামিনী তাহার প্রতি পক্ষপাতী নহে। তাকে কোনল করিতে চাইবে। সে যদি এমন কোনও মন্ত্র জানিত, যাহার দ্বারা মন্ত্রাবের মন চট্‌ করিয়া বশ করা যায়, তাহা হইলে তাহার অমৌলি সাধনশক্তি সুবিধা চেষ্টা। বল প্রয়োগ অসম্ভব, কেন না মাঝিয়া জানিবে। মাঝি-দের যদি কোনও উপলক্ষে কোথায়ও কিছু সময়ের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে?—কিন্তু কি বলিও সে প্রস্তাব করা যায়? অর্থ দিয়া তান্মিগকে বশ করা বাইতেও পারে কিন্তু সে পরিমাণ প্রচুর অর্থ কোথায়? হরিচরণ ভাবিয়া কুল কিনারা পাঠিতেছিল না আর শব্দাকণ্টকগন্ত রোগীর স্নায়ু ক্রমাগত ছট্‌কট্‌ করিতেছিল।

রাত্রি বড়ই গভীর হইতে লাগিল। হরিচরণের লালসা ততই তীব্র হইয়া আসিল। অন্ধকার রাত্রি; চোটে নদীর মধ্য দিয়া নৌকা অগস গতিতে চলিয়াছে। মাঝিয়া দাঁড় ফেলার ভালে ভালে গুণ গুণ করিয়া গান গাথিতে-ছিল। কিঁঝির অবিরাম রবে সে গুজনগীতির সুরে সুর মিলাইতেছিল। আকাশের তারাগুলি অন্ধকারের মধ্যে যেন তার করে চাতিয়া ছিল। নদী ধারে চোটে বড় গাছের মধ্যে জোনাকীর মেলা বসিয়া গিয়া চল। দাঁড়ের শব্দে, কিঁঝির রবে, মাঝির গানে নদীর তরলতা ও তারার ক্ষীণ দীপ্তি বিপরীত এমন একটা নিত্যক

বিবর শান্তি আনয়ন দিতেছিল যে চোখের পাতা আননি বুঝায় আসে। কিন্তু চরিত্রের চোখে ঘুম নাই। তাঁহার বৃক্ক আত্ম যে দেবতা বাসা বাধিয়াছেন, তাঁহার বিলাস লীলার আজ তাঁহার শিরার শিরার বিদ্যাস্তরজ ছুটিতেছে। সে কেবলই এপাশ ওপাশ করিতেছিল, কখনও উঠিয়া বসিয়া নবীর জলের দিকে, তাঁহার তরুণাত্মক দিকে নিফল ব্যাকুলতার তাকাইয়া ছিল। সমস্ত মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া সে একটি বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না—কেমন করিয়া সে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে। মাঝিরা জানিতে না পারে, অথচ কার্য সিদ্ধি হয় এমন কোনও কৌশলই সে উদ্ভাবন করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না! কিন্তু উপায় বতই আশাসসাধা বলিয়া মনে হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কামনার উত্তেজনা বাঁধা গেল।

বামিনী কাদিয়া কাদিয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল নৌকার তিতার অন্ন পরিসর স্থান; সে বেখানে শুইয়া ছিল তাঁহারই অতি নিকটে হরিচরণের শরীর স্থান নির্দিষ্ট ছিল। ঘুমের ঘোরে কতবার যে বামিনীর পদযুগল হরিচরণের অঙ্গে লাগিয়া তড়িত সন্ধ্যা করিয়াছে তাহার অস্ত্র নাই। রূপসী ওরফীর এই সুমুগ্ধ স্পর্শে হরিচরণের ঘেটুকু চৈতন্য অবশিষ্ট ছিল। তাঁহাও লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল।

মাঝিরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর নৌকার সম্মুখে পাটাতনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নৌকা তীরে বাঁধা হইয়াছে পারের গ্রামগুলি অদূরে নিশ্চলতার মধ্য। গভীর নিশীথেও গভীর স্থিরতার নৌকার চুখারে নবীর জলের কল কল ছল ছল শব্দ আর মাঝিদের কর্ম্মক্রান্ত মুণ্ড দেহ মধ্য করিয়া যে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছিল, তাঁহার শব্দ ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ সে প্রদেশে ছিল না। স্রোতের উৎস হ্রদনীতে নৌকা থাকিয়া থাকিয়া ছলিয়া উঠিতেছিল। হরিচরণ বামিনীর কাছে বেশিগা শয়ন করিল। সেই অংকারেও তাঁহার সর্বা বয়বব সরল স্তম্ভ পরিপূর্ণতা হরিচরণকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। সে অতি সমুদ্রে বামিনীর একখানি হস্ত

নিজের উত্তর হস্তে লইয়া চাপিল। এক দিকে আশঙ্কা অন্য দিকে তীব্র লাগসা তাঁহাকে যেমন কেমন এক রকম করিয় ফেলিল।

বামিনী সেট মুহূর্ত্তস্পর্শেও চমকিয়া উঠিল এবং হরিচরণকে আপনার অতি নিকটে শরান দেখিয়া, হরি দা হরিদা বলিয়া ডাকিল। হরিচরণ প্রথমটা সাড়া দিল না। তখন বামিনী একেবারে উঠিয়া খাড়া হইয়া বসিল এবং হরিচরণের গায়ে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

হরিচরণ উঠিল না, কিন্তু পুনরায় বামিনীর হস্ত গ্রহণ করিব'র চেষ্টা করিল। এবারে বামিনী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সে প্রথমটা মনে করিয়াছিল যে করিদা বোধ হয় ঘুমের ঘোরে গড়াইতে গড়াইতে তাঁহার বিছানার আসিরা'ছ। বামিনীর নিজেরও ঘুমের ঘোর তখন ভাল করিয়া কাটে নাই। ঘুমের অবস্থায় সহসা কোনও বিপদ ঘটিলে অনেক সময়ে মতিবিলম্ব ঘটে ঘুমের প্রভাব বতই করিয়া বাইতে, লাগিল ততই সে হরিচরণের মনোভাব বুঝিতে পারিল। সে প্রবল বেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "একি হরি দা, তোমার এই বাবহার?"

হরিচরণ তাঁহাকে চাপা স্তরে ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর বলছি। নইলে ভাল হবে না।"

বামিনী অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল, "কেন, চুপ করবো? এই অন্ধ তোমরা হাকুর মাকে অসুতে দিলে না! এখন আমি তোমাদের মতলব বুঝতে পেরেছি। একুশ বছর তুমি উঠে গিয়ে না শোও তোমার বায়গার, তাহলে আমি চোখে মাঝিদের জাগিয়ে দেবো।"

"তা দে'না অ'মার ত তারি বয়ে বাবে। কলক হতে তোরাই হবে।"

বামিনী ভয় পাইল। সে কঁদে কঁদো স্তরে বলিল, "হরি দা, আমি তোমার বোন্। তোমার পায়ে পড়ি, উঠে ব'ও।"

হরিচরণ মনে করল বামিনী নরম হইয়াছে। তখন সে তাহাকে বুঝাইতে লাগিল—

“দেখ, বামিনী, অনেক দিন থেকে আমি এই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করছি। তোদের বাড়ীতে যে আমি এত দিন পড়ে আছি, আর বুটে মজুরের মত খাটছি সে কেবল তোঁর জন্যে। এখন তুমি যদি আমাকে এমন করে অপমান করিস ত তোঁর ভাল হবে না। আমি তা হলে তোঁর খণ্ডরবাড়ী বঁাওয়া বুট্টিরে দেবো। দেখ, আমি যদি এখন এই নৌকা থেকে নেমে যাই, তা হলে সাত মাসেও তোঁর খণ্ডরবাড়ী স্থান হবে না। লোকে বলবে মোছলমান মাঝির সঙ্গে গুর জাত গেছে।”

হরিচরণ অনর্গল বলিয়া গেল। বামিনী তাবিত্তে লাগিল, কোন অন্তত লগ্নে সে আজ পা বাড়াইয়াছে। আজ তাহার পিতার কথা মনে হইল। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে সাধ্য কি, কেহ এমন অপমান করে। তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। কিন্তু সে স্থির অবিকম্পিত ভাবে বলিল :—

“ভাগ্যে আমার যাই থাক, হবে। কিন্তু তুমি আমার যদি ও কথা আমার বলো, ত আমি এখনই জলে ডুবে মরবো।”

“বেশ। আমি যাচ্ছি, তুমি দেখে নিস্ কি হয়।”

বামিনী ভয় পাইল না। অসহ্যের যে সাহস, সেই সাহসে বুক বাঁধিয়া সে অটল রহিল; এবং যখন দেখিল যে হরিচরণ সত্য সত্যই নিঃশব্দে নৌকা হইতে নামিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, তখন সে যেন একটা দীর্ঘ দ্ব্যংগ হইতে পরজাগরণে শান্তি অনুভব করিল। বুঝিল না যে, তাহার অদৃষ্টাক্ষের কোণে ঝড়ের বেগ উঠিল।

বামিনী এক একবার মনে করিল যে হরিচরণ তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্যেই নামিয়া গিয়াছে; আবার হয়ত কিছুক্ষণ বাদে অমৃতপ্ত হইয়া কিরিয়া আসিবে। সে আগিয়া অবশিষ্ট রজনী গোহাইল; কিন্তু হরিচরণ আর কিরিয়া আসিল না। উষার বাতাসে সে সুমাইয়া পড়িল।

যখন সে চক্ষু খুলিল, তখন ভোর হইয়াছে। মাঝিরা ঘোর থাকিতে নৌকা খুলিয়াছিল। হরিচরণ যে নৌকার নাই, তাহা প্রাতঃকালে তাহারা লক্ষ্য করে

নাই। যখন লক্ষ্য করিল, তখন তাহার অনেক পথ আসিয়াছে। বামিনী উঠিতেই তাহারা পরস্পর সুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। তাহারা মনে করিল যে অন্ধকার থাকিতে বাবু হয়ত কোনও প্রয়োজনে কুলে নামিয়াছিলেন; তাহারা তাঁহাকে কেলিয়াই আসিয়াছে। নিতান্ত অপরাধীর মত তাহারা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু বামিনী যখন কোনই প্রশ্ন করিল না তখন মাঝি জিজ্ঞাসা করিল :—

“ঠারইন, আপনার ভাই গেল কোই ?”

বামিনী উত্তর করিল :

“কি জানি, বাবা ?”

মাঝি সত্যে কহিল :—

“নাও ফিরিয়া লইসু ?”

“তোমরা ঘোষণা চেন ?”

“চিনি যা ঠারইন। মুখন্ডাদের বারীতে বাইবা ত ?”

বামিনী “হাঁ” বলিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মাঝি তাহা দেখিল। হরিচরণ যে বেজার তাহাকে কেলিয়া গিয়াছে, এমন একটা সন্দেহ তাহার মনে হইল। কেন না, যদি তাহারাই ভুলক্রমে তাহাকে কেলিয়া আসিত, তাহা হইলে সে ত ডাঙ্গাপথে অনায়াসে তাহাদের ধরিয়া ফেলিতে পারিত। ইচ্ছা থাকিলে এখনও ত সে আসিতে পারে। মাঝি তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেলা যেমন বাড়িতে লাগিল, তাহার সে সন্দেহও বনীভূত হইল। বামিনী যে পুনঃ পুনঃ বসনে চক্ষু মুছিতেছে, তাহাতেও তাহার মনটা সেই সন্দেহের দিকেই কঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

সে বলিল :—

“যা ঠারইন, তোমার কোনও ভয় নেই। আমরা মুখন্ডাদের বারীত আপনাকে উঠায়া দিরা, তবে বাইসু।”

জোয়ারের জলে নৌকা ভর ভর করিয়া চলিল। অধ্যাহ্নে ঘোষণার ঘাটে গিয়া মাঝিরা যখন নৌকা

ভিড়াইল, তখন সেখানে অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ দ্বন্দ্ব করিতেছিল। তাহাদের সকলেরই দৃষ্টি প্রথমে নোকা ও পরে আরোহিনীর দিকে বক্রভাবে অর্পিত হইল। একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন হইল;—

“কোথাকার নোকা রে, মাঝি?”

“বনপুরের লাও, মুখুন্ডাদের কুটুম বারীতে আসছে।”

বামিনী দেখিল, দ্রাক্ষকমিগের মধ্যে বাহারী প্রবীণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার মুখ কিরাইরা উপবীত হস্তে উজ্জ্বল মুখে স্বর্যাপ্রণাম করিতে ব্যস্ত চইলেন। বধুগণ অবগুষ্ঠন আরও অবনমিত করিয়া তাহার অন্তরাল হইতে বামিনীকে দেখিতে লাগিল, বামিনী সে কটাক্ষ সহিতে না পারিয়া ঈষৎ সরিয়া বসিল। একজন মাঝি নোকা হইতে নামিতেছে দেখিয়া জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“কোথায় বাও, বাপু?”

মাঝি উত্তর করিল :—

“মুখুন্ডাবারী।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন :—

“তোমাদের নোকার ত দেখছি, একটি বউ এসেছে। আর সঙ্গে কেউ আসে নি?”

“আজ্ঞা, আসছিল ঠারইণের এক ভাই না কি জানি হয়। তা সে লাইমা গেছে পথে কোন্‌খানে টার পাই নেই।”

“নেমে গেছে, না রাজে তোমরা জোর করে তাকে নামিয়ে দিচ্ছে?”

“হেঁই কি কন্‌ করতা? আমরা বার বছর এই অঞ্চলে মাঝিগিরি কাম করতে আছি—আমরা কি এমন কাম করতে পারি, আজ্ঞা?”

“সে আমরা আজ সকাল সব শুনেছি। তেঁদের ও মেটেটিকে নিয়ে সেই গাঁয়ে কিরে বাও। তারা বা হয় ককত গে। রাখামাধব। রাখামাধব!”

মাঝি বুঝিল। চলিতে বেন তাহার পা সরিতেছিল না। তবুও সে আস্তে আস্তে প্রাণের পথ ধরিয়া চলিল।

বামিনী সকলগুলি কথা শুনি। মাঝির চলিবার ভঙ্গী হইতে সে বুঝিল যে সে বেচারীর মনে ভয় হইয়াছে। হরি দা আসিয়া এরি মধ্যে এতখানি কাণ্ড করিয়া বাইবে, ইহা সে তেমন ধারণা করিতে পারে নাই। তাহার বলিকা দ্বন্দ্ব চতুর্দিক হইতে ঘনায়মান নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও আশর রজনশাল আলিয়া মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চার করিয়া লইতেছিল। কিন্তু বাটে আসিয়া নোকা বাধিতেই তাহার সমস্ত আশা ভংগা লোপ পাইল; তাহার হস্তপদ ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণ ও মাঝিতে বধন কথাবার্তা হয়, তখন সে তাহার সকলোস্তর কর্ণে নিয়োজিত করিয়া তাহা শুনিতেছিল। ব্রাহ্মণের প্রতি বাক্য, প্রতি বর্ণটি যেন অগ্নিশিখার মত দগ্ধ করিয়া তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহার ক্ষুদ্র জীবনে এত তীব্র যন্ত্রণা কখনও তাহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। পিতৃহীনা হইয়াও সে এতদিন মাঝের বন্ধনীড়ে আদরে ঘেরে পালিত হইয়া ছিল, আজ তাহার অন্তরাত্মা নীড়ভ্রষ্ট পক্ষিশাবকেরই মত ছটফট করিয়া উঠিল।

গতরাত্রের ঘটনা ছঃঃপূর্ণের স্মৃতির মত পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। হরিচরণ বধন নিরুদ্ধ ক্রোধে তাহাকে ফেলিয়া নোকা হইতে চলিয়া যায়, তখন তাহার নিস্তরঙ্গ মৌন ক্রয় সৃষ্টি অন্ধকারেও বেন বিভী-বিকার মত দেখাইয়াছিল। সেই বিভীবিহার সৃষ্টি আরও শতগুণ বীভৎস রূপ ধারণ করিয়া এখন তাহার মনে আসিতেছিল। তাহার মনে পড়িতেছিল, সেই চাপা গলার তীব্র ভৎসনা “কুই দেখে নিস্, দেখে নিস্ কি হয়।” অদৃষ্টের অভিসম্পাতের মত সেই কথা কয়েকটি ঘুরিয়া কিরিয়া তাহার বক্ষপঙ্কজের প্রতি অহিতে নির্ভয় ভাবে আঘাত দিতেছিল। হরি দা তাহাকে সেই নির্ভয় প্রতিবাদের মধ্যে, নিতান্ত অগম্য অবস্থার অপরিচিত মাঝদের দয়ার উপর ফেলিয়া গিয়াও সবটাই হইতে পারে না—তাচার অন্তর বড়োতে আসিয়া মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাহার উত্তর কুণ্ডে কাটা দিগা ছাড়িয়াছে। যদি বস্ত্রবাকীতে তাহাকে না লয়, তাহাকে কেমন

ସାବିତ୍ରୀ ନିଜେ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରତିଧ୍ବନି କରି ବାଜିଲ :—

“কোথায় বাব, মা?”

“কেন বনের বাড়ী নেই কি বাছা? বাবুনের ঘরে ঘরতে জান না? এতক্ষণ পাঁজর তেড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পাঁয়ের অকল্যাণ না করে,” ঐ খান-টার ডুবে ঘরলে ত অজ্ঞান বেত গো! হিঃ হিঃ হিঃ বলে বাব কোথা? চুলোর বা, চুলোর বা।”

বলিতে বলিতে রমণী কলসীটি আছাড় মারিয়া ভাঙিলেন ও ক্ষতপদে নৌকা ত্যাগ করিলেন।

যামিনী অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। দৃষ্টি লক্ষ্যহীন, অলস। রমণী ঘাট হইতে অন-বরত বকিতে বকিতে যখন চলিয়া গেলেন, তখন সে ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাঝিকে বলিল নৌকা কুল হইতে একটু সরাইয়া রাখিতে, বাহাতে সহসা কেহ নৌকার না চড়িতে পারে। ঘাটে অনেক লোক আসিল, তাহার দিকে চাহিয়া কত কথাই কহিল, কত ইঙ্গিত বিজ্ঞপ্তি করিল, তার পরে গাত্র মার্জনা করিয়া জলের কলসী কক্ষে লইয়া দেহ দোলাইতে দোলাইতে চলিয়া গেল। শেষে যামিনী আর তাহাদের পানে চাহিল না। যে মাঝি গাঁয়ের মধ্যে গিয়াছে, তাহার প্রতীক্ষা কার্যতেও বিরত হইল। সে নৌকার জানালা দিয়া জলের দিকে আনমনে চাহিয়া রহিল। পরপারে চাষারা গরুবাছুর লইয়া নদী কিনারের পথ বাহিয়া চলিয়াছে, সে দিকে তাহার দৃষ্টিরশ্মি প্রসারিত হইল না। সে জলের খেলা দেখিতেছিল, কি চিত্তের দোলায় দোল খাইতেছিল, তাহা বুঝা গেল না। নৌকার যে দিকটায় সে বসিয়া ছিল, সে দিকে নৌকা জেবৎ হেলিয়া পড়িয়াছিল। মাঝি সেই ক্ষণ তাহার উলটা দিকটায় দিয়া বসিয়া নৌকার পাল্লা সমান করিয়া লইল।

দিক্চক্রবালের কিনারে রবির রশ্মি ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিয়াছিল, কালো জলে কালো অন্ধকার নিবিড় ঘন নীড় বসিতেছিল। ছোট ছোট ডেউগুলি চলৎ ছলৎ করিয়া নৌকার গারে খেলা করিতেছিল। যামিনী জলের দিকে চাহিয়াই আছে, কিন্তু কিছুই সে

দেখিতেছে না; তাবনার রাশি এলোমেলো হইয়া তাহার দ্বারে তাণ্ডব জুড়িয়া দিয়াছে। সে ত কখনও ভাবিতে শিখে নাই; আজ সহসা তাবনার অতিরিক্ত ভারে সে কাঠর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কপোল বহিয়া অবিরল-ধারে অশ্রু করিতেছিল। ভাবিতেছিল, এইখানটায় অ-খই জল। এখানে ডুবিলে বোধ হয় কেহ উঠিতে পারে না। এই কালো জল, এর ভিতরেও বোধ হয় খুব আঁধার। কিন্তু খুব ঠাণ্ডা বোধ হয়। সব জালা জুড়িয়ে যার একবার ডুবে পড়লে। কিন্তু ডোবা কি যার? বড় ভয় করে। এই জানালা 'ঘরে স্বচ্ছন্দে জলে নামতে পারা যায়; কিন্তু বঃ ভয় করে। আর বাবই বা কোথায়? মা! মা! সে মায়ের কথা মনে হইতেই “মা-মা” বলিয়া ডাকিয়া উঠিল।

“ভয় কি, যামিনী!”

যামিনী চমকিয়া উঠিল। এ কার স্বর? এ যে চেনা স্বর। ঐ ক’টি কথায় তাহার সমস্ত হৃদয়-ভরীতে কঁদার দিয়া উঠিল। সে মুখ জেবৎ বাহির করিয়া দেখিল, তাহারই স্বামী। নৌকার অপর দিকে লম্বু হস্তে নৌকার কাঠ অবলম্বন করিয়া তাহার স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিতেছে। সে বিবাহের সময়ে ও পিতৃগৃহে অবস্থিত কালে যে কতক দিন ‘বর’কে দেখিয়াছিল, তাহাতেই সে চিরসুন্দর মূর্তি তাহারই হৃদয়-পটে চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়াছিল। আজ সন্ধ্যার-মান সন্ধ্যার কালো জলে সেই মূর্তি দেখিয়া সে বিজ্ঞপ্তি নেন্দ্রে চাহিয়া রহিল।

আজ সমস্ত দিন এবং গত রজনীতে সে অলম্পর্শ করে নাই। কলকল্পানিতে তাহার বালিকা-হৃদয় অসহ হঃখ ও ব্যথার অরুণিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সব সে ভুলিয়া গেল। ভূষিতের মত আনন্দের নরনে সে তার স্বামীর দিকে শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার স্বামী সাঁতার কাটিয়া নিজের মস্তকটি কেবল জলের উপরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। নৌকার বিপরীত দিকে থাকার অপর কেহ তাহাকে দেখিতে

পাইল না। কিছুক্ষণ সেও জ্বর মুখপানে চাতিয়া রহিল। সে মুখে সে এমন কিছু খুঁজিতেছিল যাহাতে এই রহস্যের একটা সীমানা হয়। তাহার বয়স মাত্র উনিশ কি কুড়ি বৎসর হইবে। কুলীনের ছেলে, অন্নবয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহাকে বালকের মত দেখাইতেছিল না। সে বড়ই গভীর। সংগারে তাহার কথা কে শুনিবে? তাহার পিতার ব্যবহার দেখিয়া সে বুঝিয়া লইয়াছে যে বাঁমনীর পক্ষে তাহাদের গৃহের কবাট জন্মের মত বন্ধ। কিন্তু গোধ কার? এইটুকু শুধু সে বুঝিতে চাহে। অনেকের মুখে আজ বিকালে সে শুনিয়াছে যে চোখের জলে বধুর বুক ভাসিয়া বাইতেছে। আবার তাহার বিরুদ্ধে কত বিজ্ঞপও শুনিয়াছে। তাই একবার ঘাট অনুশুভ হইলে, দূর হইতে সাঁতার কাটিয়া, ডুব মাঝিয়া সে নৌকার অপর দিকে আসিয়া নৌকা অবলম্বন করিয়া ভাসিতেছিল। সেবে বালকের মত সে সরলভাবে চিন্তা করিল :—

“হরি না নৌকো থেকে নেমে গিছলো কেন?”

অল্প সময় হইলে বামিনী লজ্জার স্বামীর কথার জবাব দিতেই পারিত না। কিন্তু আজ তার সকল লজ্জা ছুটিয়া গিয়াছে। সে বলিল—

“হরিদার কথা শুনি বলি। তার মতলব……”

—আর সে কিছু বলিতে পারিল না, উঠেবসে কাঁদিয়া উঠিল।

মাঝি একটু কিম্বাইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “মা ঠা’রন কীদেন কেন; কীদেন না। হে আন্না!”

বামিনীর স্বামী বামিনীকে বলিল, “আ’ম আবার আসব। তুমি জেগে থেক।”

জলের একটু শব্দ হইল। আর তাহাকে দেখা গেল না।

৩

মাঝি যৈ কখন কিরিয়া আসিয়াছে তাহা বামিনী জানিতে পারে নাই। যে মাঝি নৌকার ছিল সে কখন

নৌকা কুলে তড়াইয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করে নাই। মাঝি মুখুয্যেদের বাড়ী হইতে শুধু প্রত্যাখ্যানের দ্রুত অগমানের বোকা মস্তকে লইয়া ফিরিয়াছে। তাহার কর্তব্যের একটু মাত্র শেষ রাখিয়া সে ফিরে নাই। কাকুতি মিনতি, হাতে পায়ে ধরা সে নিরক্ষর মাঝির শক্তিতে বহুদূর কুলার, তাহার ক্রটি সে করে নাই। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের শৈলসম মর্যাদা কি শুধু তাহাতে প্রবোধ মানে? সে প্রত্যাভরে শুধু শব্দ কথা শুনিয়া গালাগালি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে নিতান্ত নিরুপায় ভাবে বথন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

“অথন কি করবু, করতা?” এবং তাহার উত্তরে বথন শুনিল—

“বরে নিরে গিরে নিকা কর গে হারাম দা।”

তখন তাহার ধৈর্য আর টিকিল না। সে আপন মনে বকিতে বকিতে নৌকার ফিরিয়া আসিল। সমস্ত দিবসের ক্লা’স্তর পরে সে ভাল করিয়া একবার তামাক খাইল এবং সন্ধ্যাকে ডাকিয়া ভাত বড়িতে বলিল। তাহার চেষ্টার যে ফল হয় নাই, শুধু এই ধারণাটুকুতে তাহার মন কতকটা হালকা হইয়াছিল এবং নৌকার ফিরিয়া বথন সে কেণ্ডোসিনের কুপের আলোকে দেখিল যে মা ঠাকুরাণীর চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে—তখন সে মনে কিঞ্চিৎ বল পাইল। বলিল :—

“ভাত করডা খাইয়া লই, তার পরে নাও খুলিয়া দিবু ছাগে?”

বামিনীর যেন চমক ভাজিল। সে যে দ্রুত বিবাদের মধ্যেও একটু শান্তির স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহা যেন টুটিয়া গেল। সে অস্তব্যক্তভাবে বলিল :—

“না না মাঝি, আমি আজ রাজে কোথাও বাব না। কাল ভোর বেলা নৌকা খুলে দিও, বাবা।”

মাঝি অবাক হইল। তাবিল, বোধ হয় সে কাল সকালবেলা নিজে একবার উঠিয়া চেষ্টা করিবে কি না, তাহাতেছে। তা মন্ড কি? সে শুধু সন্ধ্যাকে বলিল, “লাও বার দে।”—অর্থাৎ বাহির জলে নৌকা রাখিতে বলিল।

মাঝিরা খাওয়া দাওয়া করিয়া, কাপড় মুচি দিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

জল স্থল সব নিস্তর। বাতাসের গতিও যেন রুদ্ধ হইয়াছে। মাঝে মাঝে তালে তালে দাঁড় কেলিয়া দুই একখানা নৌকা এদিকে ওদিকে বাইতেছে। বামিনী ঘুমা নাই। সে ভাবিতেছিল, এমন জনমানবশূন্য স্থানে, এই গভীর রাতে, তাহার স্বামী কি আসিবেন? বামিনীর বড় ভয় করিতেছিল। যদি তিনি না আসেন; তাহার বোধ হয় আসিতে ভয় করিবে। তবে তিনি ত আর তার মত অগহারা, অবলা নহেন; পুরুষ মানুষের বোধ হয় ভয় করে না। এইরূপ কত কথাই সে ভাবিতেছিল। পক্ষমীর চন্দ্র অস্ত্র বাইবার ভক্ত আকাশের গায়ে তাহারক্ষীণ দেখখানি হেলাইয়া দিয়াছেন। তারাপুলি যেন ভয়ে ভয়ে চেউয়ের সিঁড়ি বাগিয়া নদীর জলে নাটিতে নামিতেছে। বামিনী তীরের দিকে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতেছিল। কোনও কিছুই শব্দ হইলেই ভাবিতেছিল, এইবার তিনি আসিতেছেন। শব্দ না হইলেও মনে করিতেছে, বুঝি ঐ শব্দ পাওয়া বাইতেছে। আবার ভাবিতেছে, গুরুজন যদি আগিয়া থাকেন, তবে ত তিনি আসিতে পারিবেন না। বোধ হয় তাহার আসিতে কোন বাধা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তবে বলিয়া গেলেন কেন “মেগে থেকে আমি আবার আসবো।” ঐ কটি কথা সন্ধ্যা হইতে যে সে কতবার মনের মধ্যে দাক্ষণ আবেগে চাপিয়া ধরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার সংসৃত সত্তা যেন ঐ কয়েকটি কথার মধ্যে আজ সন্ধ্যাবেলা হইতে বাধা পড়িয়া গিয়াছে।

বামিনী তীরের দিকে খেজুর গাছের পুঞ্জের মধ্যে অন্ধকারময় পথে তাহার স্বামীর দেহছায়া খুঁজিতেছিল। কতক্ষণে এই পথে পদধ্বনি হইবে সে উৎকর্ণ হইয়া “তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। কেরোসিনের আলোকটি সে অনেকক্ষণ নিবাইয়া দিয়াছে, নৌকার আলোক থাকিলে বাহিরের জিনিস লক্ষ্য হয় না। তাহার উৎকণ্ঠিত হৃদয়েরই মত নৌকাখানি মাঝে মাঝে জুলিয়া

উঠিতেছিল। একবার মনে হইল যেন নৌকা এক দিকে কিছু হেলিয়া পড়িল। বামিনী নদীর দিকে ফিরিল। দেখিল জানালায় হাত দিয়া তাহার স্বামী। জল হইতে মাথা তুলিয়া সে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অন্ধকারে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি অভ্যস্ত হইয়াছিল বলিয়াই সে এত সহজে পারিল। তথাপি ভয়ে তাহার সর্বশরীর যেন হিম হইয়া গেল।

তাহার স্বামী জিজ্ঞাসিল, “ঘুমাও নি?”

বামিনী অতি কষ্টে বিকৃত কণ্ঠে বলিল “জলে কেন? অসুখ করবে যে! উঠে আসবে না?”

অগ্রহারণ মাসের রাত। রাত্রিতে যথেষ্ট ঠাণ্ডা বোধ হয়। এমন গভীর রাতে কি কেউ জলে থাকিতে পারে? তবে বুঝি নৌকার আসিতে বাধা আছে। সে যে কলকিনী, তাহার নৌকার উঠিলে পাছে জাতি বার বলিয়াই কি এই রিমের রজনীতে এত কষ্ট করিয়া দেখা দিতে আসা? বামিনীর মাথা ঘুরিতে লাগিল।

তাহার স্বামী বলিল, “কাল যশপুরে কখন পৌছবে?”

“কি জানি? যশপুর যাব না।”

“কেন? মাথের কাছে যাও। এখানে এরা তোমার নেবে না।”

“ওগো আমার অপরাধ কি?”—বামিনীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইল।

উত্তর হইল, “তা কি জানি?”

“না, বলো। তোমার ছুটা পায়ে পড়ি। আমি ত কার মন্দ করি নি।”

“তোমার জাত গেছে। মাঝিদের ভাত খেয়েছ—তাদের জাত দিয়েছ।”

“তুমি কি বিশ্বাস করো?”

“না।”

“তবে আমার এত কষ্ট দাও কেন? আমি যদি যে।”

“আমি কি করব, বল!” কণ্ঠবরে বিবাদের আভাস ছিল।

“এখন আমিই বা কি করি।”

হামিনী কাদিতেছিল। সে সরিয়া জানালার নিকট গিয়াছিল। তাহার গায়ে তাহার স্বামীর নিঃখাস অঙ্কিত হইতেছিল। বড় ইচ্ছা যে অকল দিয়া সে তাহার সিক্ত মুখখানি মুছাইয়া দেয়। ভাল করিয়া ত দেখিতে পাইতেছিল না। একটু স্পর্শের দ্বারা সে অতাব পূরণ করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু পাছে তাহার অপরিচিত স্পর্শে স্বামী সংকুচিত হন, এই ভয়ে সে পারিতেছিল না।

স্বামী বলিল, “তুমি তোমার মায়ের কাছেই যাও।”

হামিনী উত্তর করিল, “তিনিই কি আমার আর ঘরে নেবেন?”

“আমিও তাই ভাবছি।”

“ওগো বল, এখন আমি কি করব।”

“তুমি কিছু ভেবেছ?”

“হ্যাঁ।”

“কি ভেবেছ?”

“মরব।”

“পারবে?”

“কেন পারব না?”

“ভয় করবে না?”

“বাবুনের মধ্যে মরতে ভয় করবে? আমার যে কোনও কুলেই দাঁড়বার স্থান নেই।”

“দূর। মরতে নেই।”

“তবে কি করব? বল, তোমার পারের পড়ি। আমার গায়ে রাখ; আমার বাঁচাও।”

“আমি বা বলি পারবে?”

“হ্যাঁ পারবে।”

“ভয় করবে না?”

“না।”

“ঠিক বলছ।”

“হ্যাঁ ঠিক বলছি।”

“তবে নেমে এস আমার সঙ্গে। তোমার নিয়ে আমি এক বাগগার চলে যাব।”

“কোথায়?”

“সে অনেক দূর।”

“আমি যে সঁতার জানি নে।”

“আমি খুব ভাল জানি। এখনি পার হতে হবে; শীঘ্র এস। মাঝরা জাগলে আর হবে না। বুঝলে?”

হামিনী আর ভাবিল না। ভাবিয়া ভাবিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আর ভাবিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না। সে কাপড়খানি কোমরে শক্ত করিয়া জড়াইয়া লইল, পরে জানালা দিয়া পাশলাইয়া দিল। জলের শীতল স্পর্শে তাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর অনাবৃত দেহের আবির্ভাব সে নিজের দেহ সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া দিল। হামিনীর স্বামী তাহাকে পিঠের উপর তুলিয়া, নিজের গামছার দ্বারা উভয়ের কোমরে বেশ করিয়া জড়াইল। তার পরে তাহারা তারার আলোর মাঝখান দিয়া তাসিয়া চলিল।

• • •

পঞ্চদিন প্রভাতে কৃষকেরা দেখিল, চরের উপর দুইটি প্রাণী নিঃবক্ত আশ্রয়নে চিরশান্তিতে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

ঐশ্বৰ্য্যেন্দ্রনাথ ঐক্য।

উচ্চশিক্ষা ও মধ্যবিত্ত সমাজ

কয়েক বৎসর হইল আমাদের দেশে এক মত প্রবর্তিত হইয়াছে যে দেশে বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে তাহা সমাজের পক্ষে সাধারণ

ভাবে উপযোগী হইতেছে না। সুতরাং উচ্চশিক্ষা যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রশ্রয় করা মধ্যবিত্ত সমাজের লোকের কর্তব্য। এমন কি যে পুণ্যপাদ

আচার্য্য চিরকুমার-ব্রত গ্রহণ করতঃ প্রায় সমস্ত জীবন উচ্চশিক্ষা প্রচারে ও মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডার পরিপূষ্টি করলে অতিবাঞ্চিত করিয়াছেন তাঁহারও অভিমত এই যে, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সুবক উচ্চশিক্ষা পরিচ্যাগ করিয়া মাফোয়ারীদের ভায় বৈশ্রবৃত্তি অবলম্বন করুক। এই পৃথিবীতে যে সমস্ত জাতি আছে, তাহাদের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত জাতির প্রত্যেকটির মধ্যে আভিজাত্য, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ এই তিন সামাজিক স্তর বিদ্যমান। প্রচলিত ইংরাজী ভাষাতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সমাজের মেরুদণ্ডরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। মানুষ বার্বিকোর কত নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাহার মেরুদণ্ড পত্রীকা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মানবের মেরুদণ্ড সরল না থাকা যেমন তাহার দেহের ও স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, সেইরূপ দুর্বল মধ্যবিত্ত সমাজ সমস্ত জাতির পক্ষেই অন্ততচিহ্ন-বিজ্ঞাপক।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষত্ব এই যে, এই সম্প্রদায় সম্বন্ধীকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বে স্থান দিয়াছেন। ইংরাজীতে বাহাকে culture বলা হয়, তাহা এই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ান্তর্গত এক ব্রাহ্মণই তাঁহার পত্রীকে বলিয়াছিলেন যে, তিরিঙ্কী বৃক্ষের পত্র থাকিতে অর গ্রহণে কখনও বাজনের অভাব হইবে না এবং এই শ্রেণীই পতি-গরবে মহীরসী এক রমণীই কৃষ্ণনগরাধিপের মহিষীর নিকটে দরিদ্রতা-বাক্য স্বীয় লৌহ গাজাতরণের মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া কিবদন্তী আছে। অন্যদিক্খর ভাবে জীবনধারণ ও উচ্চ বিষয়ের আলোচনার (Plain living and high thinking) আদর্শ এই দেশে যে ভাবে অমুস্ত হইয়াছিল, অপর কোনও দেশে যে সে ভাবে হয় নাই তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। রাজা স্বদেশে পূজা পাইয়া থাকেন, কিন্তু বিদ্যানের পূজা সর্বত্র, এই ভাবের শ্রোক যে দেশের সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে, সে দেশের লোকের নিকট যে বিভা ও জ্ঞানের সম্মান ধনের অপেক্ষা অধিক ছিল

তাহা বিশেষ ভাবে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষা-সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা হয়, তাহাতে অনেক সময়ে মনে হয় যে আমরা শিক্ষা বিষয়ে আমাদের প্রাচীন আদর্শ হইতে অনেক দূরে চলিয়া বাইতেছি। যদি আমরা শিক্ষার উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া গিয়া অর্থোপার্জনকেই শিক্ষার সর্বপ্রধান সোপান বলিয়া মনে করি, তাহা জাতির ও দেশের পক্ষে অত্যন্ত অশ্রুজনক হইবে।

সংসারে থাকিতে হইলেই যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু বর্তমান সময়ে বোধ হয় আমাদের দেশে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা বাইতে পারে যে, অর্থোপার্জন ও জ্ঞানের অমু-দীপন এই দুইটির পৌরীপর্ষ্য কি ভাবে সূচিত হইবে? অর্থাৎ এই দুইটির মধ্যে কোনটির জন্য আমাদের শক্তি আমরা বিশেষভাবে নিয়োজিত করিব? যদি বাঙ্গালা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুবকসম্প্রদায়ের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় অধিকাংশ সুবকই অর্থোপার্জনকে জ্ঞানানুশীলনের পূর্বে স্থান দিবে। আমার এই অনুমান সত্য হইলে, ইহা যে অতীতের তর ও ভাবনার কথা তাহার সন্দেহ নাই।

বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের আধিক অবস্থা যে ক্রমশঃ অত্যন্ত মন্দ হইয়া বাইতেছে তাহাও ঠিক। রোগ ঠিক বটে, কিন্তু ইহার প্রতিগারের জন্য কোনও ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইলে রোগের নিদান ভাল করিয়া জানা কর্তব্য। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, সাধারণতঃ সমাজের এই অবস্থা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহাতে আলোচকগণ এইভাবে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে যে ভাবে শিক্ষা প্রচলিত হইতেছে, তাহা অর্থকরী নহে, সুতরাং এই শিক্ষা পরিচ্যাগ করিয়া আবাদিগকে ব্যবসার ও বাণিজ্য করিতে হইবে; এবং তাহা হইলেই আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর হইবে। এই মত সম্বন্ধ আমার বক্তব্য এই যে, বাহারা মনে

করেন যে বর্তমান শিক্ষা প্রণালী আমাদের দারিদ্র্যের কারণ, তাঁহাদের কথা আমি 'বলা আপত্তিতে ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমার মনে হয় যে, মধ্যবিত্ত সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে বিবিধ:—স্বভাৱ ও তুলনামূলক। এই কথাটি একটু বিশদভাবে বলা আবশ্যক।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে আজকাল সমাজের বৈরূপ অবস্থা হইতেছে তাহাতে অর্থোপার্জন করিয়া তৃপ্তবোধ করিতে হইলে বিশেষ তা'ব শিক্ষার আবশ্যক। ভোগের ও সুখের এত নতুন নতুন উপায় প্রত্যহ আবিষ্কৃত হইতেছে যে, যাহারা নিজ মনোবৃত্তি উপযুক্তরূপে দমন করিতে না পারে তাহাদের জীবন অত্যন্ত দুঃখময় হইয়া পড়ে। আমাদের দেশ খুব ধনী নহে। এই দেশে সংসারে প্রবেশ করিবার সময় যে অর্থের প্রয়োজন, সেট অর্থ অপর দেশের যুবকের প্রয়োজনীয় অর্থ অপেক্ষা যে কম তাহাতে কোনও সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু ইচ্ছাও অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত যুবক জ্ঞানের অমূল্যলীলকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রধানতঃ অর্থের অমূল্যলীলকে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছেন। এইরূপ অবস্থার কারণ কি? আমার বোধ হয় তুর্দমনীয় অর্থোপার্জন-স্বাহাই এই অবস্থার প্রধান কারণ। দেশে বাণিজ্য ও বাবসারের বৈরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে একদল ধনী সন্তানদের সৃষ্টি হইতেছে। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত যুবক এই সমস্ত ধনীকে তাঁহাদের আদর্শ বলিয়া মনে করেন, এবং সেই আদর্শের তুলনাতে, নিজদিকে আদর্শ হইতে অনেক দূরে দেখিয়া বিশেষ কষ্ট অনুভব করেন এবং সর্বদা উদ্গ্রীব ভাবে আদর্শের নিকটবর্তী হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। কোনও সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহা আঁকড়াইয়া ধরয়া পড়েন। তখন জ্ঞানামূল্যলীল পশ্চাতে পড়িয়া যায়, আত্মদারিদ্র্য ও লোকশিক্ষার কথা মনে থাকে না, কি তাহা নিজের ও পরিবারের আর্থিক উন্নতি হইবে তাহাই তাহাদের

বিষয় হইয়া পড়ে। আমার মতে, আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে তুলনামূলক যে দরিদ্রতা বর্তমান আছে ইহা তাহাই। এই প্রকার দারিদ্র্য ব্যতীত আমাদের সমাজে আরও একপ্রকার দরিদ্রতা দেখা দিয়াছে, যাহার জন্ত আমরা নিজেরাই দায়ী এবং যাহা দূর করিতে হইলে আমাদের সামাজিক সংস্কার বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। আমার বোধ হয় যে বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত সন্তানগণে যে অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তির বিবাহই তাহার মধ্যে প্রধান। পূর্বে যখন প্রতিবৎসর ৬০ কি ৭০ জন করিয়া এম-এ উপাধিধারী যুবক বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া বাহির হইতেন, তখন অর্থোপার্জনে তাঁহাদের যতখানি সুবিধা ছিল, বর্তমান সময়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকগণের ততখানি সুবিধা নাই তাহা ঠিক। কিন্তু এখনও দেশের এমন অবস্থা হয় নাই, বা বোধ হয় কোনও সময়ে এরূপ অবস্থা হইবে না, যাহাতে একজন শিক্ষিত যুবক নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পার যে, তাহার উপর এক পরিবারের ভার বহু রহিয়াছে। ইচ্ছাও সে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। আশা, উত্তম ও সাহস তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যায়। সে নিজের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া কোনও নতুন কার্যে প্রবর্তী হইতে পারে না। সমাজের এই অবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন সমাজ হইতে দারিদ্র্য দূর হইবে না। সুতরাং সমাজকে যদি শক্তিশালী ও কার্যপটু করিতে হয়, তাহা হইলে সমাজের এই সমস্ত মানি দূর করা কর্তব্য। সমস্ত মানি দূর হইলে সমাজে আবার সুখ ও শান্তির প্রাপ্তি হইবে। রোগের প্রকৃত কারণ না বুঝিয়া ব'দ যুবকদিককে উচ্চ শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থোপার্জনের জন্ত উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। আমাদের সমাজের যে অনেক দোষ আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই সমস্ত দোষ যাহাতে

সমাজ হইতে লোপ পায় সেই লজ্জা আমাদেরকে বন্ধ-
পরিষ্কার হইতে হইবে। দেশের আশা ও ভরসা স্থল
যুবকদিগকে শিক্ষিত ও চরিত্রশালী করিতে হইবে।
তাহাদিগকে জ্ঞানের অমূল্যলীল ও লোকহিতকর কার্যে

ব্রতী করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে শ্রমহীতে হইবে
যে—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাম্ বৎ সুখং শান্তচেতসাম্ ।

কুণ্ডলকনকানাম্ হৃৎশেতলং ধাবতাম্ ॥

ঐহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ।

সদাচার

কোন মার্কিন মনীষী বলেন—“স্বন্দর মুখ অপেক্ষা
স্বন্দর গঠন ভাল, আবার স্বন্দর গঠন অপেক্ষা স্বন্দর
আচার ব্যবহার ভাল। তাহদের খামিত স্বন্দর প্রতিমূর্তি
বা স্বন্দর ছবি দেখিলে মনে যে আনন্দ হয়, উহাতে
তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে।”
ইহা প্রাচীন হিন্দুরা বিলক্ষণ বুঝতেন। স্বর্ষাচন্দ্র-
সম্বিত্ত তারকাখচিত স্ববস্তৃত ও সমুজ্জল আকাশের
নারী তাঁহাদের শাস্ত্র সকলের সমক্ষে পড়িয়া আছে।
আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার পুণ্ডরিকময় আবর্জনা রাশির
মধ্যে পড়িয়া এক প্রকার অন্ধ হইয়া আছি। আমাদের
দেহ মন আত্মা কলুষিত হইয়াছে। পিতৃমাতৃ ভক্তি,
দাম্পত্যপ্রীতি, স্বজন-প্রীতি, বন্ধু-প্রীতি প্রভৃতি যে সব
সদাচারের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, আমরা সে সব একেবারেই ভুলিয়া
গিয়াছি; শুদ্ধ তাহা নহে—মন হইতে ঐ সকল ধূইয়া
মুছিয়া কেবল ক্ষুদ্রাঙ্গি ক্ষুদ্র “আমি” টুকু লইয়া
ক্ষিপ্ৰগতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা সদাচার-ভ্রষ্ট হইয়া লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি।
“দশ শ্রোত্রের অপেক্ষা এক আচার্য্য, দশ আচার্য্য
অপেক্ষা এক উপাধ্যায়, দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা এক
পিতা এবং দশ পিতা বা সমুদয় পুত্রবী অপেক্ষা
এক মাতা গুরুতর বশিষ্ঠ গণনীয় হন। মাতা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই।” (মহাভারত) আমরা আর
এখন আমাদের পিতা মাতাকে ঐরূপ চক্ষে দেখি না।

“পিতার সেবার ইচ্ছা, মাতার সেবার পরলোক
এবং অন্তান্ত গুরুজনের সেবার ব্রহ্মলোক পরগতি
করা যায়। * * * ঐহারা উহাদিগকে সমাদর
না করেন, তাহাদিগের সমস্ত কার্যই বিফল হয়;
এবং তাহারা কি ইচ্ছাকৃ কি পরলোক কোন স্থানেই
শ্রেয়োগোতে সমর্থ হন না।” (মহাভারত)—আমরা
এখন এ সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছি।

“তর্ঘ্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ্য্য কাম সাধন সময়ে এক-
মাত্র সহায়। ইহাকে তর্ঘ্যার তুলা পরমধন আর
কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকস্বাস্থ্য সম্পাদন
করিয়া থাকে। তর্ঘ্যার তুলা পরমবন্ধ আর কেহই
নাই। ধর্ম্ম সংগ্রহ বিষয়ে তর্ঘ্যাই পুরুষের অবতীর্ণ
সচায় হইয়া থাকে।” (মহাভারত)—আমরা আর
এখন আমাদের স্ত্রীকে ঐরূপ চক্ষে দেখি না।

“স্ত্রী জাতির বজ্র, শ্রাদ্ধ, উপবাস, কিছুই অনুষ্ঠান
করিতে হয় না। উহাদের দ্বায়িত্বক্রমাই পরম ধর্ম্ম।
তাহারা সেই ধর্ম্ম প্রভাবে বর্গলাভ করিতে পানেন।”
(মহাভারত) “যে নারী প্রিয়জনদিগের আদৃত্যজন
হইয়াও বিপদে স্বামিসেবার পরাশ্রয় হয়, সে ইচ্ছাকৃ
অসত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পিতা, মাতা
ও পুত্র পরিমিত বস্ত্রই দান করিয়া থাকেন, কিন্তু
অগতে স্বামী ভিন্ন অপারিবেশ পদার্থের দাতা আর
কেহই নাই। পতিই স্ত্রীর পরম দেবতা।” (রাമായণ)

—এখন জীবাতি আর বামীকে একত্রে দেখে না।

“এখন ধর্মু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন ধার্মিক বৃদ্ধ সভাসদগণ ধর্মকথা কহিতে আরম্ভ করিলে যুবকগণ তাঁহাদের প্রতি উপহাস ও ঈর্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট যুবকগণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে তাহার আর পূর্ববৎ অভ্যর্থনা, ও অভিবাদন দ্বারা তাঁহাদের সম্মান করে না। পিতা বর্তমান থাকিতে পুত্র প্রভু প্রদর্শন করিতেছে। অনেকে বেতন প্রাপ্ত দাসদ্বারা পূর্বক নিষেধ হইয়া আপনাদের নাম প্রকাশিত করিতেছে এবং ধর্মমত গহিত কার্যদ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে অতিশয়ী হইয়াছে। * * * পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করিতেছে। সকলই সম্মান পালনে পরাশ্রয় হইয়াছে। মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অতিথিগকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। ভিক্ষা প্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও গুরুদিগের সৎকার না করিয়া বরং ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাগাদিগের পাচকেরা সর্বদা অগ্ৰাহ হইয়া পাক করে। ও তাহার গুরুজনের নিবেদন না শুনিয়া শাস্ত্রনিষেধ ও অনাচ্ছাদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের ধাত্ত সমুদয় ইচ্ছাতঃ বিকীর্ণ ও হৃদয় অনাবৃত্ত হইয়া কাক ও মূষিকের উচ্ছষ্ট হইতেছে। তাহারও উচ্ছষ্ট হস্তে স্তম্ভ স্পর্শ করে। তাহাদের গৃহীণীগণ কুদ্বাগ, দাঙ্গ, পেটক, কাংস্তপাত্র ও অস্ত্রাস্ত্র গৃহোপকরণ সমুদয় চতুর্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও তৎসমুদয় উপেক্ষা করিয়া থাকে। প্রাচীর বা গৃহ ভগ্ন হইলেও কেহই আর তাহার সংস্কার করে না। সকলেই পণ্ডিতগকে বৃদ্ধ করিয়া তাগাদিগকে তৃণজল প্রদান করিতে পরাশ্রয় হয় এবং ভূতাবর্গ ও সমুদয় বালকদিগকে বাক্ত করিয়া ভিক্ষাবস্ত্র ভোজন করে। তাহার বৃথা মাংস ভক্ষণে নিরত এবং কেবল আপনাদের আহারের বিলম্বিত পায়স শিষ্টক প্রভৃতি পাক করাইয়া থাকে। স্বর্ঘ্যোদয়

হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে না। তাহাদের প্রতি গৃহে দিবারাত্র কলহ হইতেছে। উপবিষ্ট মাতা বাস্তিকে কেহই আর সম্মান করে না। * * * শৌচানুষ্ঠানে কাহারও আস্থানাই। সকলের মধ্যেই জাতি-সঙ্ঘের বিলক্ষণ প্রোচুর্ভাব হইতেছে। দাসীগণ হুর্জনাচারিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া হার বলদাদি বিবিধ আভরণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জীলোকেরা পুরুষ বেষণ ও পুরুষেরা স্ত্রীবেষণ ধারণ পূর্বক জৌড়া বিচারাধিতে মহা আক্লাপ প্রকাশ করিতেছে। কাহারও কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে, সে অতি বিশ্বাসের পাত্র, মিত্রের উপর সন্দেহান হইয়া তাহারে সেই দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেকে অতি অন্ন মাত্র ধনদ্বারা সমুদয়সমুদানে প্রবৃত্ত হইয়া মিত্রগণের অপরিমিত ধন অপহরণ করিতেছে। * * * শিশুরা গুরুসেবার পর অশ্রু হইয়াছে। গুরুগণ শিশুর সহিত সখ্যাব্যবহার করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা পুত্রের উপর প্রভু প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদের নিকট দীনভাবে আহার প্রার্থনা করিতেছেন। * * * কুলবধুরা স্বামী ও স্বস্ত্রের সমক্ষেই ভূত্যাগের শাসন ও বামীকে আহ্বান পূর্বক গর্জিত ভাবে তাগার সহিত কথোপকথন করে। পিতা অতি বয়স সহকারে পুত্রের মনোবৃত্তি করিতেছেন। অনেকে ক্রোধভরে ধন বিভাগ পূর্বক পুত্রগণকে প্রদান করিয়া বরং অতিক্রমে অবস্থান করিতেছেন। কোন ব্যক্তির ধন রাজা বা তদ্বৎ কর্তৃক অপহৃত বা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইলে তাহার বন্ধু বান্ধবগণও বিবেচ্য প্রত্যবে তাগার প্রতি উপহাস করে। বিশেষতঃ সমুদয় লোকই কৃত্রিম, মাতুল, পাপাঙ্গ, অভক্ষ্য ভক্ষণে অহুরক্ত, নিরম্ব বিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।” (মহাভারত)—লোকে এইরূপ অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে, ভগবতী লক্ষ্মী, পুরাণে দানবদিগকে যেমন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদিগকেও সেইরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং আমাদের বর্তমান অবস্থাও তদনুরূপ হইয়াছে। তাহা উপরেই বর্ণিত হইল।

অসাধু, চণ্ডাচার ও দুশ্রুৎ। সাধু ব্যক্তির শ্রীল ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। মানবগণ কেবল সদাচার বলেই দীর্ঘায়ু, ধনবান ও বশবী হয়। স্বীয় মঙ্গল কার্যনা করিতে চাইলে সদাচারী হওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। সদাচার পণ্ডের এবং সচরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ।

সদাচার মানব হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভূমির চাহা। সদাচার চরিত্র সৌন্দর্যের বিকাশ ও স্ফুর্তি। সদাচার আমাদের কর্মের ভূষণ। ইহা দ্বারা আমাদের অতি সামান্ত কার্যও অতি সন্মরুপে সংশোধিত হয়। ইহা আমাদের জীবনের কর্ম সকল নির্বিশেষে সুসম্পন্ন করিতে প্রচুর সহায়তা করে এবং আমাদের সামাজিক জীবন সুস্থিত করিয়া তুলে। ইহা আমাদেরকে জগতে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের পথে লইয়া যায়। অকপট, প্রীতিময়, কমনীয় ব্যবহার আমাদের অতীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে শ্রেষ্ঠতম সহায়। উহার অভাবে অনেকই জীবনে কোন বিষয়ে কোন প্রকার সাফল্য লাভ করিতে পারেন না। রুঢ় ও কর্কশ স্বভাব, মানব হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। সদয় ও সদ্যবোধে মানব হৃদয়ের অর্গল-বদ্ধ দ্বার সকল সময়েই খুলিয়া যায়। সে ব্যক্তি তখন, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলের হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়।

সদাচার মানুষের চরিত্র দেখাইয়া দেয়। উহা মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির বাহ্যিক নির্দেশক বৃত্তি। উহা তাঁহার রূচি, তাঁহার অমুভূতি, তাঁহার মনের গঠন ও তিনি কিরূপ সংসর্গে অভ্যস্ত তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়।

সদাচারের মাধুর্য ও কমরুনীতা মানব মনের ভাবাবেগ হইতেই অঙ্গুপ্রাণিত হয়। মার্জিত হৃদয় মানবের পক্ষে ভাবাবেগ প্রবণতা উপেক্ষার বিষয় নহে। উহা তাঁহার ধর্মশক্তি, বিশ্বাস বা জ্ঞানের দ্বারা সমান প্রয়োজনীয়। উহা তাঁহার রূচি ও চরিত্রের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করে।

সমাভূতি, অস্ত্রের হৃদয় খুলিয়া দেয়। ইহা মানবকে

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে। ইহা বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিরোভূষণ।

তত্ত্বতা, শিষ্টতা, সজদয়তা সদাচারের, অন্তর্ভুক্ত। অপরের প্রতি আমাদের আন্তরিক সম্মান অকপট ভাবে বাহিরে দেখানই তত্ত্বতা। অকৃত্রিম তত্ত্বতা সারল্য-ব্যঞ্জক। উহা হৃদয়োদ্ভূত না হইলে কাহারও চিত্তাকর্ষক হয় না।

প্রকৃত শিষ্টতা মানব হৃদয়ের সদয় ভাব। উহা অস্ত্রের হৃদয়ের সুখ বর্ধন করে। উহা প্রীতিকর ও মধুর বন্ধুভাবাপন্ন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা ধনী বা জ্ঞানী বা সমাধিক সমুন্নত ইহা কদাচ অপরকে দেখান না বা কোন প্রকার ভাণ করেন না। তাঁহার পদমর্যাদা, তাঁহার ভ্রম, বা তাঁহার ব্রহ্মদেশ লইয়া কোন প্রকার গর্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহার মত অনন্তদায়ে সুবিধা বা খ্যাতি পান নাই বলিয়া অপরকে কোন প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না; বা কথা কাহবার সময়েও তাঁহার কোন অবদান লইয়া কোন প্রকার দোষোক্তি করেন না। পক্ষান্তরে বাহা তিনি বলেন, বা করেন, তাহাতেই তিনি ধৃষ্টতা বা দাস্তিকতা-শূন্য ও বিনীত। অস্ত্রের অমুভূতির প্রতি অনাদর স্বার্থপরতার পরিচায়ক, ইহা নিতান্ত কঠোর ও রুঢ়—ইহা তিনি বিলক্ষণ জানেন।

সদাচার সম্পন্ন সাধু সত্যের আধার। আপনার কার্যে আপনাই সর্বেসর্বা। তিনি কোন ব্যক্তির, বা কাহারও মতামতের অধীন না হইয়া নিজের ব্যবহারেই আপনাকে প্রকাশ করেন। ঐ ব্যক্তিগত শক্তি ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আসিতেছে; আজও উহা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সংসারের চলন জনতার মধ্যেও সেই নির্ভীক সম্মান পুরুষকে সকলেই চিনিতে পারে; তিনিও তাঁহার প্রকৃত স্থানে গিয়া উঠিয়া বলেন। তিনি যেখানেই থাকেন, তথায় তাঁহার বিধি প্রচলিত হয়। বুদ্ধিশ্রমে কর্মপ্রবীণ, অভিজ্ঞ দেনাপনিকে অভ্যস্ত করেন। সমাজে বা

কর্মহলে বিনয় ও শিষ্টাচারে আধিক্যের প্রভা বিকীর্ণ করেন। তিনি বহুৎ সমালোচক সভা হইতে, দ্বিতীয় পর্য্যন্ত সকলেরই উৎকৃষ্ট সচর। তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। তিনি সকলেরই অন্তঃকরণে গুপ্ত ভাবে প্রবেশ করেন; তিনি কখনই চাতুরী খেলেন

না। সর্বদা অকপট ভাবে সৌজা পথে চলিয়া থাকেন।

শিষ্টাচার জীবন বাপনের বাধা বিশ্ব দূর করিয়া দেয়া তাহাকে সহজ করিয়া তুলে এবং মানবজন্মের নিঃশূল করিয়া তাহাকে উত্তমশীল করে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্বানুস্মৃতি)

একদা ঐশ্বর্য ও শৌর্যের লীলা-নিকেতন দিল্লীতে গিয়া পছাঁছলাম, কিন্তু আবাস স্থান খুঁজিয়া লওয়া এক দায় হওয়া ঠিল। ইংরাজী কেতার ভোটেল সে দিনেও অনেক করটি সংরে ছিল, কিন্তু নানা কারণে তথ্যর বাওয়া কেহই সম্মত বোধ করিলেন না। টেপনের কর্মচারীদের মধ্যে অনেককে জিজ্ঞাসা করলাম; অনেক হিন্দুস্থানী কর্মচারী আমাকে বাঙ্গালী দেখিয়া, দিল্লীর বাঙ্গালী ডাক্তার প্রসিদ্ধ হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়িতে যাইবার কথা বলিল। এলাহাবাদে একবার গুডম্যান কোম্পানীর বাবুদের অতিথি হইয়া “পর্যবেক্ষণ” করদিন কাটান গিয়াছিল। ব্যাকরণে পর্যবেক্ষণী ধাতু রূপ করার জ্ঞান ইলও সহজ বটে, কিন্তু সর্কনা এবং সর্কদা ইত্যাদি করণী কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাই হেমবাবুর পরগণায় হওয়া সম্মত মনে হইল না। একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম, টেপনের নিকটই মোর সরাই নামক একটি সরাইখানা এবং সেখানে ভদ্রলোক থাকিবার মত ব্যবস্থা আছে এবং নিজেরাই আহারাদির অন্নুষ্ঠান করিয়া নিজের পাচক দ্বারা বাস্তব প্রস্তুত করাইবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। স্পৃহাকর ঈশান এবং অন্নুচর নবীন বাহার সহায়, তাহার নিকট মোর সরাই ভীতিপ্রদ

হইবার কোন কারণ নাই, সুতরাং আমরা সেইখানেই গেলাম। কুলিদ্বারা জিনিষপত্র—হিন্দুস্থানীরা বাগাকে “সামান” বণে—সে সমুদয় সরাইয়ে লইয়া গিয়া, যথা-সম্ভব সহায়তার সহিত বাটার করান হইল। পশ্চিমের প্রায় সর্কজই তরী তরকারী ফল মূলের অসম্ভাব নাই, পর্যাপ্তই পাওয়া যায় এবং বাঙ্গালী দেশের ঐ সকল সামগ্রী অপেক্ষা পশ্চিমের ফল মূল, তরকারীর স্বাদও অপেক্ষাকৃত ভাল। নবীন ও ঈশান তাট বাজার করা এবং রন্ধন ব্যাপার সমাপ্ত করিল; আমরা স্নান শেষ করিয়া ঠাণ্ডা অগ্নি দেওয়ার তৃপ্তিহেতু, উদয়ের চোখানলে আত্মতা প্রদান করিয়া ভ্রমণার্থ সড়র প্রস্তুত হইয়া লইলাম।

আজ দিল্লী সড়রে ভদ্র মোটরকারের অভাব নাই, পর্যাপ্ত টেক্সির নিয়ত বিধাণ ধ্বনি লোককে ক্ষণে ক্ষণে চমকাইয়া তুলিতেছে, কিন্তু সে দিনে বন্ধ গাড়ী-বা কটে সংগৃহীত দুই একখান ভিক্টোরিয়া ছাড়া এবং সেই বহু পুরাতন সনামখ্যাত একা ব্যতীত আর কিছুই মিলিত না; আমরা কটে একখানি ভিক্টোরিয়া সংগ্রহ করিলাম। প্রাসাদ ভগ্ন, বা কেলা দেখিতে চলে “পাসের” প্রয়োজন হইত, এবং সেকালে পাস দিতে দিল্লীর শেষ বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের দূর-সম্পর্কিত একটি অভিজাত

মুসলমান তত্ত্বলোক। প্রাচীন মুসলমান সৌজন্য যে
কিছু ছিল তাহার কিছুই নিদর্শন আমি সেই
দিনে প্রথম পাঠরাভিলাষ। আমাদের শকটচালকই
আমাদের পথ-প্রদর্শক এবং সেই আমাদের পক্ষে
পাসের জন্য মুসলমান তত্ত্বলোকের বাটীতে লইয়া
গেল। সদর দরজার গাভী রাখিয়া ঘরপ্রান্ত
হইতে ভূতোর উদ্দেশে ডাকিতে লাগিলাম—“নওকর
কেই হার?” কিছুকাল পরে একটি তৃত্য আ'সরা
মুসলমানী কারদার অভিবাধন করিয়া দাঁড়াইল।
আমার উর্দুভাষার যে পরিমাণ অধিকার, তাহারই
সাক্ষ্যে কোন প্রকারে আমাদের আগমনের কারণ
তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম; সে পুনরায় অভিবাধন
করিয়া, অতি পরিষ্কার কণ্ঠে বিস্তৃত উচ্চারণে খাস
দিল্লীর উর্দুতে আমাকে গৃহপ্রবেশ করতে কহুঃপ্রাথ
করিয়া, বিনীত ভাবে অগ্রে অগ্রে পথ প্রদর্শন
করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল এবং বাড়িরের একটি
সজ্জিত কামরার আমাকে বসাইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া
গেল। লক্ষ্যে প্রভৃতি অপরাপর মুসলমান-প্রধান
স্থানের উর্দুর সহিত বহুল পরিমাণে কাণী শব্দ
মিশ্রিত থাকে এবং সেইজন্য ঐ সকল ভাষার ব্যুৎ-
পত্তিহীন বাঙ্গালীর পক্ষে উহা সময়ে সময়ে দুর্জয়
হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দেখিলাম দিল্লীর উর্দু তেমন
নহে, হিন্দী কথা এবং অনেক সময়ে সংস্কৃত ভাষার
অপভ্রংশ শব্দ অনেক উহাতে মিশ্রিত থাকায় সাধারণের
পক্ষে উহা দুর্জয় হয় না—দিল্লীর উর্দুর নাকি
ইহাই বৈশিষ্ট্য। একথা সত্য কিনা আমি জানি
না, আমার ইহা শুনা কথা। বাহারা কাণী ভাষার
ব্যুৎপন্ন এবং বহুবার দিল্লী লক্ষ্যে গিয়াছেন, তাঁহারা
ইহার সীমান্তার বোধ্য পাত্র। বাহা হউক, কিছু-
কাল অপেক্ষা করিতেই, একটি অসামান্য রূপবান
যুবক পুরুষ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সহাত্ত
বদনে আমাকে অভিবাধন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা
করিতে করিতে, আমার পার্শ্বে আর একখানি চৌকি
টানিয়া লইয়া বসিলেন। দেখিলাম যুবকের গণ্ডবর,

ললাট, চিবুক পদ্ম কিংবা গোলাপের আভা বিশিষ্ট,
করতল হইতে যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে,
এবং বর্ণ, বর্ণকেও পরাজিত করিয়াছে। পুরুষ এত
সুন্দর হইতে পারে পূর্বে আমার সে ধারণা একে-
বারেই ছিল না। তত্ত্বলোকের কথা কহিবার কি
সুন্দর তত্ত্ব, তাহার কি অবাধ লীলারিত গতি,
কর্তব্যেরই বা কি মিষ্টতা! খাস দিল্লীর উর্দুতে
তিনি কথা কহিতেছিলেন, আমার মনে হইতোছিল
যেন অতি মধুর সঙ্গীতধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ
করিতেছে। করাসী ভাষা আমি জানি না, অনিরাছি
করাসী দেশে তত্ত্বলোকের আলাপ শুনিলে শ্রোতার
মনে হয় যেন সে সঙ্গীত শুনিতেছে। আমি তাহা
শুনি নাই, কিন্তু অভিজাত বংশের মুসলমান তত্ত্ব-
লোকের মুখে দিল্লীর উর্দু বাহা শুনিলাম, সে ভাষা
হয়ত করাসী ভাষা অপেক্ষা নিকট না হইতে পারে।
তদবধি আজ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ও পাকিস্তান
অঞ্চলের অনেক তত্ত্বলোকের কথোপকথন শুনিয়াছি।
এই ত বার সাক্ষ্যে বিনয়, শিষ্টাচার, নম্রতা প্রভৃতি
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা যায়, আবার জ্যোষ প্রকাশ
করিতে হইলে কিংবা শ্রোতার মনে বীর-ভাবের
উদ্বোধন করাইতে হইলেও এতাবা অতুলনীয়; বোধ
করি ভারতবর্ষের অল্প কোন ভাষাই ঐরূপ
প্রয়োজনে ইহার সমকক্ষ নহে। আমি বহুকণ পর্যন্ত
মোঃ মুহম্মদ সার সেই সম্রাট মুসলমানের কথা শুনিতে-
ছিলাম, তাঁহাকে আমার আগমনের প্রয়োজন জানাইতে
প্রায় বিন্দুতই হইয়া গেলাম। আমার বধন কণ্ঠ
কহিবার সময় আসিল, তখন বেহারী ও পুরবিয়া বেহারার
নিকট হইতে শিক্ষা করা আমার হিন্দী তাঁহার সমক্ষে
বাহির করিতে বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছিল। কিন্তু উপায়
নাই। তিনি ইংরাজী জানিতেন না, বাঙ্গালা বুঝিবেন
না, সুতরাং অনভ্যোপায় হইয়া আমার কদম্বা ও ভ্রমপূর্ণ
এবং অশুদ্ধ উচ্চারণের হিন্দীই বলিতে হইল। না ছিল
তাঁহাতে শুদ্ধ শব্দপ্রয়োগ, না ছিল তাঁহাতে ব্যাকরণ,
কোন প্রকারে কতক বা কথার কতক বা সুখভঙ্গী এবং

হস্ত পদাধির চেটার মনের আত্মার তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম আনাইয়া কাগজে কি লিখিয়া দিলেন। বলিলেন, ইহা প্রাসাদ-দুর্গের দ্বারদেশে রক্ষা দিগাহীকে দিলেই সে বখাওকর্তব্য করিবে, আমাকে আর কোন বেগ পাইতে হইবে না। বিদায় কালে তিনি দ্বার পর্যন্ত আসিয়া আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন এবং দিল্লীতে যদি আর কিছু প্রয়োজন সাধন করিয়া দিতে পারেন তবে বড়ই আনন্দিত হইবেন, ইহা তাঁহার অনন্তকরুণ, অনিন্দ্য উর্দ্ধুতে এবং সহজাত শিষ্টতার সন্ধিত আমাকে বারংবার জানাইলেন। আমি অভিযান করিয়া বিদায় লইলাম। দুর্গসংস্থ সংযুক্ত পক্ষট আমাকে লইয়া দুর্গদ্বার অভিমুখে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, আমার কর্কটকরে শেষ নরপতি দ্বিতীয় বাগান্ধব শাটের বংশোদ্ভব সম্রাট সুবক্তার সুখোচ্চারিত দিল্লীর দেওয়ান খান রজমহলের অতি বিস্তৃত উর্দ্ধুর মধুর সঙ্গীত যেন তখন ধ্বনিত হইতেছিল।

প্রাসাদ দুর্গের দ্বারদেশে গাড়ী পহঁচিবার পূর্বেই চুড়িয়ার পারজামা ও আঁচকান পরিহিত একটি অর্দ্ধবয়স্ক মুসলমান, কোচমানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া ক্রতপদে আমার নিকট আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং ইংরাজীতে কিজাসা করিল "Want a guide, sir?" আমি দেখিলাম লোকটির মস্তকে শুভ্র পাগড়ী অতিমূল্যবান করিয়া বঁধা, সর্কাক শুভ্রবস্ত্রে আবৃত এবং তাহার শুভ্র শ্রবণ ও বহুল পরিমাণে শুভ্র চটাইতে; মুখ দেখিলে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়। আমি তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম "Yes, of course." সে অবিলম্বে গাড়ীর কোচবাক্সে উঠিয়া বসিল এবং পাশ খানি আমার নিকট হইতে চাহিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিল। বিনা আরাগে গাইড পাইয়া আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম, কারণ এই সকল বাদশাহী কোচার বিরাট পাবাণ ভূপের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইলে ঐ সকল স্থানের মোটামুটি ইতিহাস জানে এমন একজন পথপ্রদর্শক অতি আবশ্যিক, এ জ্ঞান আমার আগ্রহ এবং কতপূরে হইয়াছিল। বীর-বা গাইডকে না পাইলে আগ্রহ

প্রাসাদ দুর্গে, সেকেন্দরার এবং কতপূরে আমি নিঃসহায় অবস্থায় কিছুই ভাল করিয়া দেখিতে বা জানিতে পারিতাম না।

গাড়ী দুর্গদ্বারে পহঁচিলে দেখিলাম সসজ্জন আয়োজ্য স্বক্কে স্থাপন করিয়া গোরা সৈন্য বিশাল ভোরণ সম্মুখে সমর্পে পান্ডারণ করিতেছে। গাইড নামিয়া গিয়া তাহার হস্তে পানপানি দিল, সে হস্তের ইঙ্গিতে পানের একটি ক্ষুদ্র কামরা দেখাইয়া দিলে, গাইড সেই দিকে চলিয়া গেল; সেখানে একজন কেরানী গোছের মুসলমান ভক্তলোক বসিয়া ছিলেন, তিনি ঐ পাস লইয়া গাইডকে কি বলিলেন জানি না, গাইড কিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল "Come, sir." আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিশাল ভোরণদ্বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

দ্বিতীয় এট প্রাসাদ দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে মানসিংহ জয়সিংহ প্রভৃতি বংশধর রাজপুত নৃপতিব, দিল্লীর তাহার পত্নী চর্চর সেনাপতির স্বকম্পন উপস্থিত হইত। যে প্রবেশ পথে শিবাজীর ভার ভক্তপতি সম্রাটেরও পরক্ষণ মন্থর চটয়া পড়িত, খসক, খরম্ প্রভৃতি রাজকুমারগণ সতয়ে যে পথে প্রবেশ করিতে কল্পিত কলেবর হইত, কালবশে আজ সামান্য সৈনিক তাহার হস্তের ইঙ্গিতে ক্ষুদ্র বৃত্ত সর্ক প্রকার মন্থরকে অনাগ্রাসে তথায় প্রবেশাধিকার দিতেছে দেখিয়া আমার মনে তখন কি ভাবের উদয় হইয়াছিল তাতা কি পকাশ করিয়া বলা যায়? এই ভারতবর্ষে পৃথু অস্বরীয় মাকাতা, ববাকি, বৃথিষ্ঠির, জরাসন্ধ রত্ন, রামচন্দ্র, রাবণ প্রভৃতি বহু রাজকুমারগণ সাম্রাজ্যের পতন অভ্যাস সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। জগৎ সংসারের ইহাই অবশ্যজ্ঞাবী পরিণাম, এবং ভারতীয়গণের অন্তরে অন্তরে এ পরিণামের কথা পাবাণে অঙ্কিত লেখার ভার গভীর রূপে চিত্তবুজিত হইয়া রহিয়াছে। পুরাণ বর্ণিত এই সকল ঐতিহাসিক যুগের বহুভাষিপ-গণের কথা জাতিয়া দিলে, ঐতিহাসিক যুগের মোগল পাঠান বংশের দিল্লীধরগণের পতনের ভার পতন-বার্তার

উদাহরণ ইতিহাস খুঁজিয়া যেতীয় আর একটি পাওয়া যায় কি না সম্ভব। পাঠানের তিনশত বৎসরের সুদৃঢ় সিংহাসন বাবরের এক ফুৎকারে পাশিগণে কাটিয়া গেল। সেট বিজয়দুস্ত বাবরের পুত্র হুমায়ুন কতিপয় বৎসরের মধ্যেই বিতাড়িত হইয়া ভারতবাসীর বাহিরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আকবর শাহের প্রাণপণ চেষ্টায় যে বিশাল উত্তরাংশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, যে যোগলের গৌরব গরিমা যেন-খর্গ ও শৌর্য্য বীর্য্যর কথা উপভাসের কাচিনীর মত সমগ্র অগ্রে একদিন লুপ্ত হইয়াছিল, আকবর শাহের পরে শিশু পুরুষ বসন্ত হইতে না হইতেই বাহ্লিক হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য শুল্লি-সুদীর দ্বারা কোথায় উড়িয়া বাটতে লাগিল, এবং মনুর সিংহাসনে উপনিষ্ট দিল্লীখরগ-গণর বংশধরগণ আততায়ী শত্রু ও চণ্ড টংপাটিক-চক্ষু দৃষ্টিভীন হইয়া কিরূপ দীনভাবে দিব্যাপন করিতেছিলেন সে কথা ভাবিলে এমন ভারতবাসী নাই যে ক্রন্দন করিতে পারে। নামমাত্রাবশিষ্ট দিল্লীখরগ-গণর যে নামটুকু ছিল, কক্ষণের সিপাহী তাগমায় তাড়াও গেল; দৃষ্টিভীন বৃদ্ধ বাতান্ত্রের পলায়নপর কুমারদ্বয় সাম্রাজ্য সেনানীর চক্ষে প্রকাশ্য রাজপথে কুকুরের ন্যায় নিকত হইবার সময়ে তাহাদের হৃৎকাক্স দিল্লীর জনসভার মধ্যে একজনের একখানি হস্তে উঠিয়া না। অথচ একদিন ছিল, যখন এই হতভাগাদিগের পূর্বপুরুষগণের এক ইজিতে বহুলক্ষ তরবারি সূর্য্যকিরণে জ্বলিয়া উঠিত। কালচক্রের সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টচক্রের এক্রপ পরিবর্তনই সংঘটিত হয়। সেই অস্ত্র

“বহুপতে: ক গতা মধুগাপুরী

রঘুপতে: ক গতোত্তরকোশলা।

ইতি বিচিন্ত্য কুরূষ মন: স্থিরঃ

ন যদিদং জগদিত্যবধাং ॥”

ইহাদি মহাবাকাগুলি ভারতবাসীর অন্তরের ভিত্তরে গভীর রেখার অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। অতীতের অধোদ্যম ও অধোদ্যমী কাকী, অবসী ও বারাবতী

আজ কোথায়? সে দিনের রাজাধিরাজগণ এবং তাঁহাদের রাজ্যের সে ধন সম্পদ, গৌরব গরিমা, শৌর্য্য বীর্য্য ও ভ্রমবল আজ কাল-সাগরে জল বুদ্ধদের দ্বারা কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! আবার বর্তমান যুগের শিক শোভাগা সম্বন্ধিত জাতি সমূহের বিলয়ের ইতিহাস ভবিষ্যৎ কি ভাবে লিখিত হইবে, তাহা বিন সর্ক-লাগের, সর্কজনের ও সর্কবিষয়ের ইতিহাস নিরস্ত্রিত করিওঁকেন, তিনিই জানেন। মামুদের সুদূর কল্পনায়ও বাহা অতীত, তাহাই ঘটয়া থাকে। কি ক্ষম ক্ষম অবস্থানে একের অভ্যাস এবং অন্যের পতন ঘটতেছে বা ঘটবে তাহা কেহই পূর্বে বুঝিতে বা দেখিতে পার না। তরায়ণের বিস্তৃত ক্ষেত্র যে পৃথারায়ণের দেহর ও রাজ্যের অবসান হইবে তাহা স্থপাতীত ছিল; পাশিগণে বাবরের সোভাগোন্নয় ও সেটরূপে কল্পনাভীত ব্যাপার। পাঠানের দিল্লীনগর ও টোংলকাবাদ যে কীর্ণ ধ্বংসস্থানে পরিণত হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল? এবং শাহজাহানের হস্ত-পাষণ প্রাচীর-বেষ্টিত পাসাদ চর্গের মর্ম্মর নির্ম্মিত বিচিত্র কারু-খচিত সৌধাবলী যে সপ্তসাগর বেষ্টিত ধরণীর সর্ক প্রকার মানব মানবীর দর্শন-কৌতূহল রাজ্য নিবারণের জন্য কোন মতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাই বা কবে কে চিন্তা করিয়াছে?

এইরূপ নানা ভাব-তরঙ্গ যনের মধ্যে আসিয়া তোলপাড় করিতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে আমার গাইডের সঙ্গে কেজার অভ্যাসরহ সৌধাবলী দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগলাম। দিল্লী আশ্রয় প্রাসাদ দর্শনীর বস্ত্র প্রচুর রহিয়াছে। রক্ত পাষণ এবং শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত সৌধ সমূহের প্রত্যেক-টিই দেখিবার সামগ্রী। বর্তমানে বাহা আছে, তদপেক্ষা শুনিতে পাই আরও ছোট বড় অসংখ্য ইমারত ছিল। কাঠগলের সূতের সময়ে এবং নানির শাহের আক্রমণ কালে নাকি বহু সুন্দর সুন্দর সৌধ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। দিল্লীর দ্রুত গ্রীষ্মতাপ নিবারণের



দেওয়ান-ই-খাস, দিল্লী

অন্ত নাকি প্রাসাদ চক্রে এবং ঘরে ঘরে সওয়া লক্ষ
জলবহর (কোররা) ছিল, এককালে সেই সমস্ত
জলবহর হইতে উৎসারিত জলধারা তুলিয়াছি হুঃসহ
ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাঙ্গণে প্রবেশিত করিয়া প্রাসাদ দুর্গকে বাদশাহের
বাসভোগ্য করিয়া দিত। "শাওন ডাদো" (অর্থাৎ
প্রাঙ্গণ ভাঙ্গ) নামক একটি খেত-মন্দির নির্মিত

ঘর দেখিলাম, তাহার ছাদ তন্ত ও গুচ্ছতল সমস্তই
উৎকৃষ্ট মাকরাণা মন্দিরে প্রস্তুত। তুলিলাম নিম্নাঙ্গে
প্রাঙ্গণের ধারাপাতের পৈতা অমূল্যব করিবার জন্য
বহুমান জল কোণে গোবর্ধনে তুলিয়া, বহু সাহায্যে
বর্ষার ধারার ভাঙ গৃহের চতুর্দিক দিয়া তাহাকে
ফেগান হইত এবং ছাদের উপরে একরূপ কুটির



দেওদান ই-খাস ও ময়ূর সিংহাসন, দিল্লী

শব্দ হইবার বন্দোবস্ত ছিল, বাহা মেঘ ও জ্বলনের অধুৰূপ বলিয়া মনে হইত। যত্নেখর্যা এবং জনবলে সেকালে শারীরিক জ্বৰ সন্তোষ বংদুর কইতে পারিত, মোগল বাদশাহগণ তাহার চরম করিয়াই গিয়াছেন। 'দিল্লীর "দেওদানে খাস" ও "দেওদানে আম"-এর বহু বর্ণনা বহু স্থানে রহিয়াছে এবং ঐ দেওদানে খাস ও দেওদানে আম যখন সর্বাধিকবে সম্পূর্ণ ছিল তখন

বাহারা বচকে ঐ সকল দেখিয়াছেন, সেইরূপ ভ্রমণ-কারী এবং ভিন্ন দেশীয় রাজদূতগণের বর্ণনার বাহা আছে, তজ্জন বর্ণনা আজ অসম্ভব। সৌধদীর্ঘ সং-গ বর্ণনচিত্র রো:পার চিত্রাঙ্কণ, তাহাতে সুক্তার বাল্লর, বহুমূল্য প্রস্তর খচিত এবং বিবিধ কারুকার্যবৃত্ত খেও মর্শ্বেরের স্তম্ভের সারি এবং অপকর্ণ কারুসৌন্দর্য্য-সম্বিতগৃহ কুটীৰ, খেত মর্শ্বেরের উচ্চ বেদিকার

উপরে অগ্ন্যুৎসব এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের রূপ "তাকে ডাউন" তত্পরি বিচিত্র বেশভূষা-সম্বন্ধিত, ওমরাহ পরেষ্টিত, আর তর একাতপত্র অধীশ্বর দিল্লীপতি শাহানশাহ বাদশাহ সমালীন,—দেওয়ানে খাসের গৃহতলে বসিয়া সুত্রিত নেত্রে ধ্যানমগ্ন হইয়া মানস চক্রে এই দৃষ্ট কতকগুলি ধর্মীয় দেখিতেছিলাম তাহা আমার মনে নাই। গাইডের ডাকে আমার ধ্যানভঙ্গ হইল।

দিল্লী দুর্গের খেত-মর্শ্বের বিনির্মিত গৃহাবলী বাদশাহ শাহজাহানের কর্তৃ। অতি অল্পসংখ্যক ইমারতই আকবর বা জাহাঙ্গীরের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব বাদশাহ সৌন্দর্য্য এবং বিলাসের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়াই ইতিহাসে কথিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার সময়ে দিল্লীর দুর্গাভ্যন্তরস্থ এক "মোতি মসজিদ" বাতীত অত্র কোন খেত প্রস্তরের গৃহসৌন্দর্য্য, প্রকোষ্ঠ, কক্ষ, মিনার বা মসজিদ হয় নাই এবং দিল্লীর এই মোতি মসজিদও অপরতনে এবং সৌন্দর্য্যে আগ্রা দুর্গের মোতি মসজিদ অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। তুলনার হীন হইলেও, বাঁধার আগ্রার মর্শ্বের সৌধাবলী দেখেন নাই, তাঁহার দিল্লীর মোতি মসজিদ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মসজিদের তিনটি মাত্র গুহ্বর, কিন্তু এই গুহ্বরগুলির আরতন এবং গঠন সৌন্দর্য্য বড়ই মনোহর এবং এই গুহ্বরগুলির শোভাতেই সমগ্র মোতি মসজিদটিকে শোভাযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। চব্বরের পরে চব্বত, প্রকোষ্ঠের পরে প্রকোষ্ঠ, কক্ষের পরে কক্ষ, এমন কত চব্বর, কত প্রকোষ্ঠ এবং কত কক্ষ যে অদ্যাপি দুর্গের মধ্যে বর্তমান আছে তাহার অন্ত নাই। "দর্শন দরওয়াজা," "শীস মহল," "রজ মহল," এমন কত কি আরও দর্শকের চক্ষুকে বিভ্রান্ত এবং মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলে। যে "দর্শন দরওয়াজা"র "করোকার" সূর্যোদয় কালে শাহানশাহ বাদশাহ অপেক্ষের জন্য আবির্ভূত হইয়া, নিজে বসুনা তীরস্থিত প্রকৃতিপুঞ্জকে

দর্শন দিতেন, আজ আপামর সাধারণের সেখানে অব্যাহত গতিবিধি; অসুস্থ্যম্পত্তা বেগমগণের যে "রজমহলে" বায়ুধীর গতিতে প্রবেশ করিত, দিনেদেবতার রত্নমালা, নানা আবরণ ভেদ করিয়া মুহূর্ত্তাবে যে অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ, (তদা বার মকরকেতন মস্তক, হস্ত অনঙ্গ বলিয়াই, যেখানে অব্যাহত প্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলেন) সেই রাজাধিরাজ-গণের শুদ্ধান্তে আজ সকলেই নির্বিবাদে গতাগত করিতেছে এবং রাজাস্তঃপুরচারিণীগণের পান ভোজন ক্রীড়া শয়নের নির্দিষ্ট স্থানগুলির বৃত্তান্ত গাইডদিগের মুখে শুনিয়া, নিজ নিজ বিচার বিবেচনা অনুসারে নানা-বিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে তাহার বিধা বোধ করিতেছে না। "কালস্ত কুটীলা গতি।"

মুগলমান ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যোগল বাদশাহগণের রজমহলের যে বর্ণনা রচিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে ধর্মীয় বাহা কিছু হ্রস্ব, বাহা কিছু মনোহর, বাহা কিছু উপভোগ্য, তাহা সমগ্র পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দিল্লী আগ্রার প্রাসাদস্থ রজ মহলে আনা হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য এবং সম্ভোগ একত্রে একস্থানে কোথায় রক্ষিত, এ প্রশ্ন সেদিনে কেহ করিলে হয়ত সেকালের লোক বিধাহীন চিন্তে উত্তর দিত—"দিল্লীর বাদশাহের রজমহলে।"

শাহানশাহ শাহজাহান "দেওয়ানে আমের" ভিত্তি গাভের মর্শ্বেরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

আগর ফিরদাউস বরুই হমীন্ মস্ত

হমীন্ অন্ত, তরা হমীন্ অন্ত, তরা হমীন্ অন্ত।"

—এ পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে, তবে এখানে, তাহা এখানে, তাহা এখানে।

মনে হয় এক স্রোক কেবল দিল্লীর দেওয়ান খাসে নহে, যোগলের প্রাসাদদুর্গের অভ্যন্তরস্থ রজমহল এবং অপরাপর অনেক ইমারতের সম্বন্ধেই ইহা সঙ্গত ভাবে প্রযোজ্য।

রজমহলের গৃহ কুটীমে মর্শ্বের অলম্ব হইতে গোলাপের গন্ধবারি যে দিনে উৎসারিত হইয়া অধঃ-

পুরের মন্দির বাবুকে নিরন্তর তারাক্রান্ত করিয়া রাখিত, সুক-চেনার মদগন্ধে রক্তমহলের অধিবাসিনীগণের অন্তর যে 'দমনে মুহু' মত্ততার নিত্যের থাকিত, সাংকে এবং সেতারের নিকণ ও কলংকী গায়কীর বর্ধন এবং সুপুর 'শঙ্কনে' রক্ত মহল যে দিনে নিরন্তর মুখের চটরা উঠিত, সে দিনের রক্তমহল ত দেখি নাই; মহাতাপ জ্বালাইয়া তিত্তি সংলগ্ন লক্ষ মুকুরের যে শোভাটুক

দেখাচ্ছিলাম তাগাতেই মনে হতল, ভীষ্ম রক্তমহল না জানি কি সামগ্রী ছিল!

প্রাসাদ দুর্গে ঘুরাত ঘুরতে দেখিন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসল। সন্ধ্যার পূর্বেই দুর্গ ত্যাগ করবার নিয়ম, সুতরাং গাটডোর সঙ্গে বাহির হইয়া, অগমিণ্যাত জুয়া মসজিদের দিকে চলিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিস্রনাথ রায়।

জীবনসন্ধ্যায় লক্ষ্মীবাজী

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ ভারতেতিহাসের এক স্মরণীয় যুগ, —সে আমাদের বড় দুর্দিনই গিরাছে।

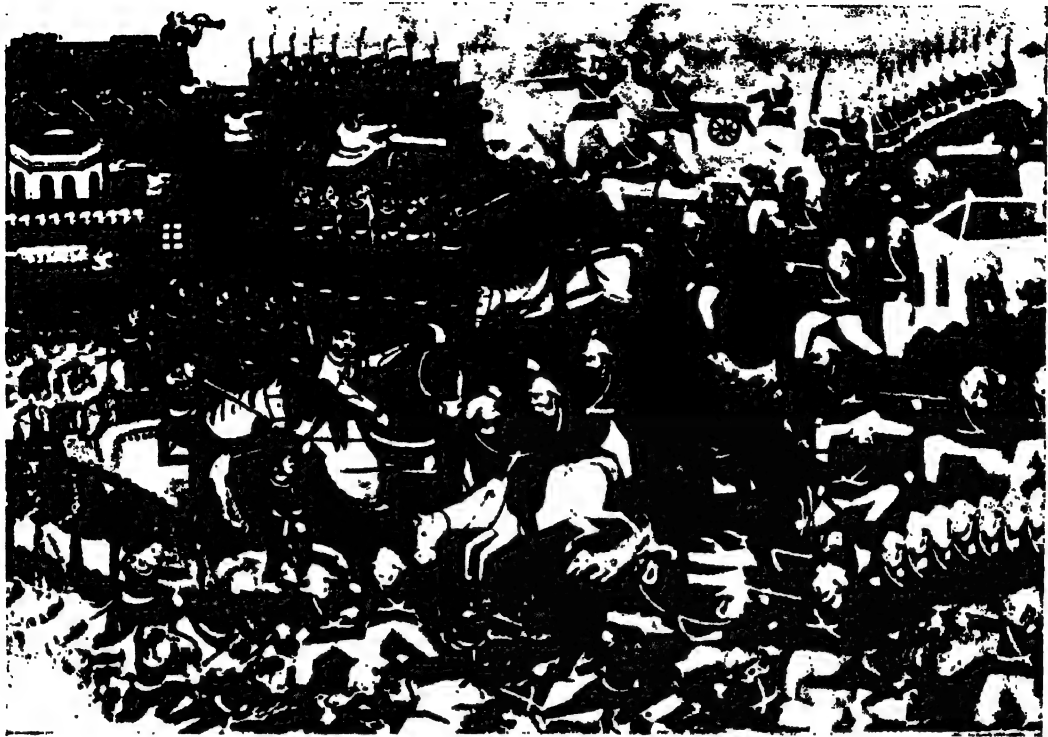
ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ খাসীর রাণী লক্ষ্মীবাজী'ক মারীদগ্ৰা, যেরে বোম্বেটে ইত্যাদি বলিষ্ঠাছেন। কিন্তু এই বীরবালার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মৎস্য অন্তঃকরণের পরিচয়ে আমরা বিস্ময়াবষ্ট হই। লক্ষ্মীবাজী ইংরাজের বিপক্ষে কেন অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, এক পক্ষে তিনি নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন;—“মী অর্দ্ধাঙ্গের তাম্বুলাচী ধনী, মজলা রাণ্ডুগুও সুবিধা ধর্ম সোড়ন হা উত্তোগ করত্যাচী কাঁহীলক্ষ্য নহতী। পরন্তু হিন্দুধর্মচা অভ্যমান ধরন ইয়া কর্মাস্ প্রবৃত্ত ঝালে, বইয়া-করিতা বিজ্যাচী, জীবিতাচী সর্বাচী আশা সোড়নী। আমচা পল্লরী পাতকচ ফার মহম্মদ আক্বাস্ জৈবর বণ দেত নাহী। চরণারীবর মোটি লড়াইঝালী, পরন্তু আক্বাস্ বণ আলো নাহী। কর্মীবরহী ইংগ্রজ চালুন এত আহে তেখে খোড়ক্যাস্ত জল কোইল, জে অষ্টাশ্ত লিহিলে অসেংতে কোইল।”—বিক্রোহী পেশবা মানা ধনুপত্তকে লিখিত রাণী লক্ষ্মীবাজীর কপ্পিকাশিত পত্রের একাংশ। (১)

১। পুনরায় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিস্রনাথ রায় মহাপ্রভের আদেশ ও অনুমোদন ক্রমে, ১৩২৮ সালে উত্তরভারতের মানা

অর্থাৎ—আধমের চালই আমরা অমূল্য সম্পত্তি, বিধবা-ধর্ম চাঁড়র অস্ত্র ধারণ ও যুদ্ধাভ্যাসে আমার কোন পরোক্ষনই ছিল না, কিন্তু ধর্মের দিকে চাঁহরা, উগা পালনে এ কার্যে প্রবৃত্ত হটরাচি এবং ইহার অস্ত্র হাফা, কাখীর স্বজন ও জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছ। অস্ত্রস্বরাজি পালের ফলে জৈবর আমার প্রতি বিশ্বাস। চরণারী যুদ্ধ প্রাণপণ চেষ্টা সবেও জয়লাভ করিতে পারিলাম না,—কালীতে আবার যুদ্ধ করিব, অমুটে বাহা আছে তাহা হইবে।

ইংরাজি ১৮৫৩ সালে খাসীরাজ গজাধর রাওয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন পুত্রাদি ছিল না; লক্ষ্মীবাজী হাঁহরই পত্নী। উই ইতিয়া কোম্পানীর সহিত গজাধর রাওয়ের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে পোয়্যপুত্র গ্রহণের অধিকার রাজা ও তাঁহার পত্নীর

হানে আদি ঐতিহাসিক লিপি পত্রাদি অনুসন্ধান করিতেছিলাম। সেই সময় কালী হইতে রাণী লক্ষ্মীবাজী লিখিত, মানা সাংঘেবর মাংষ করেক বাসি পত্র পাই এবং এই বৎসর মহাপুজার নিমন্ত্রিত হইয়া কাসি গিয়াছিলাম, সেখান হইতেও দিউটিনী সম্বন্ধে করেক বাসি মূল্যবান পত্র পাই। পত্রগুলি সমস্তই আমার নিকট আছে; বঁাহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেখিতে পারেন;—সেবক।



রণক্ষেত্রে লক্ষ্মীবাহী

ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া, তাহাকে রাজ্যাধিকার দিবার জন্য লক্ষ্মীবাহী বড় ডালহাউসীর নিকট আবেদন করিলেন। কিন্তু লর্ড ডালহাউসী রাণীকে সন্দেহ করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। তাঁহার স্বামী রাজ্য গ্রহণ করিয়া, মাত্র স্বামীর নগর রাণীর শাসনাধীনে রাখিলেন। কোম্পানী মাস কয়েক রাণীকে একটা বৃত্তি দিয়াছিলেন, পরে উণ বৎসর হইয়া যায়। এই অর্থদৈন্যে রাণী কর্মচারীগণের বেতন কমাইয়া দিতে বাধ্য হন। মহালক্ষ্মীদেবীর পূজার্কবাসির জন্য দুইখানি গ্রাম রাণী দেবের সম্পত্তি করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার কাতর অশ্রু নয় ও সনিকর্ষক অমৃতোষ সবেও, কোম্পানি এই গ্রাম দুখানি বাজেয়াপ্ত করিলেন। স্বামী রাজ্য পরিচালন করিবার জন্য কলিকাতার মন্ত্রণালয় হয়, সত্য উপস্থিত থাকি-

বার বিশেষ আশ্রয় সবেও কোম্পানীর দিক হইতে রাণীকে কোন সংবাদই দেওয়া হয় নাই। ইহাতে রাণী নিজেকে অপমানিত মনে করেন। কলিকাতায় স্বামী রাজদূত, কোম্পানীর স্বামী গ্রহণের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে আন্দোলন ও তীব্র মন্তব্য উপস্থিত করিবার অমুশ্রুতি চাচিয়া রাণীকে পত্র লেখেন। তুচ্ছ রাণী সে পত্রের উত্তর দেন নাই। বিধবা রাণী মন্তক মুণ্ডনের জন্য, কোম্পানীর নিকট প্রয়াগ বাইবার আদেশ চাচিয়াছিলেন, তাঁহার রাণীর এ প্রস্তাবও বিজ্রোহের বসবস্ত করিবার অছিল। বুঝিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীবাহী তখন বিজ্রোহের নিশান তুলিয়া ধরিলেন। তিনি স্বামীদুর্গ সংহার করিলেন, নৈমন্ত সংগ্রহ করিয়া বুকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন ভারত-ভাগ্যাকাশে এক মহা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে।



জয়াজী রাণী সিন্ধ্যা

কুতপূর্ব পেশবার পোস্তপুত্র, ধনুপত্ত তখন বিজ্রোহের
চেঁটা করিতেছেন। (২) লক্ষ্মী এবং দিল্লীতও

২। “মানসী” আখ্যায়িক, ১৩২৮, “আলীমুল্লাহ বী” এবং
ধনুপত্ত কেন বিজ্রোহী হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়াছি। যাস
করেক পূর্বে মেগালে ধনুপত্ত মারা গিয়াছেন, তাহার দেব
আবনের বৈচিত্র্য পূর্ণ ইতিহাস শীঘ্রই পাঠকগণকে উপহার
দিব।—লেখক

বীরে বীরে বিজ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িয়াছে।
ঠিক এই সময় রানী কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ
করিলেন, কাবেই সহযোগীর অভাব উপস্থিত হইল
না। দুর্ভাগ্যবশত বীর তাতিয়া টেপী রানীর সহিত
যোগ দিলেন, নানা ধনুপত্ত পক্ষে রানীকে উৎসাহ দিতে
লাগিলেন। এতদিন যে আগুন কেবল ধূম উৎপন্ন
করিতেছিল, সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া অস্বকুল বাতাসে
তাহা জলিয়া উঠিল। রানী, রানী প্রভৃতি স্থানে



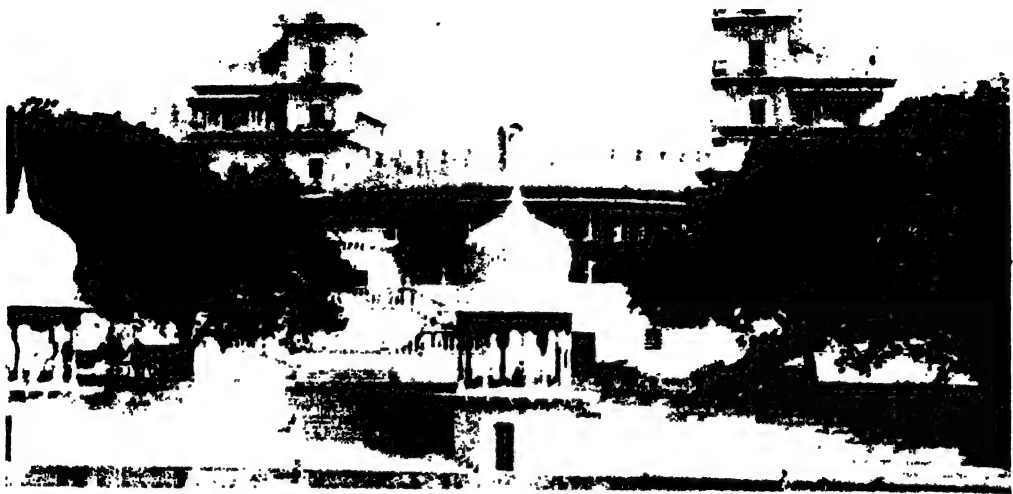
দিনকর রাও রাজবাড়ে (সিন্ধিয়া-মদ্রা)

রাণীর সহিত যে যুদ্ধ হইরাছিল, তাহার কলাকল ইতিহাস-পাঠক যাজেই অবগত আছেন।

২২শে মে, ১৮৫৮ সালে কান্ধীর যুদ্ধে সার হিউ রোজ কর্তৃক রাণী পরাজিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্তাধ্যক্ষ ছিলেন রাওসাহেব, বাদার নবাব প্রভৃতি। (৩) হতভঙ্গ

সৈন্তগণকে হইরা রাণী, তাঁতিরা টোপী প্রভৃতি গোয়ালিন্দর অতিবৃথে অগ্রসর হইলেন। ৩০শে মে সঙ্গার সময় সকলে দুরার নামক স্থানে আলিয়া উপস্থিত হন এবং আবার যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। গোয়ালিন্দর-অধীশ্বর জিরাণী, সিন্ধিয়ার নিকট রাণী চারি লক্ষ টাকা কিংবা যুদ্ধ, তইটির একটি চাহিয়াছিলেন। মন্ত্রী দিনকর রাও রাজবাড়ের পরামর্শে টাকা না দিয়া, সিন্ধিয়া-রাজ যুদ্ধে জয় প্রাপ্ত হইলেন। ১লা জুন দিনকর-রাও রাজ-

৩। "Here, Sir Hugh (Lord Strathnairn) again defeated a large force of about 12,000 under the Rani of Jhansi, Rao Sahab and the Nawab of Banda, who then fled to Gwalior."—Holme's Indian Mutiny.



গোরালিয়র—মোতিমহল রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদে রানী লক্ষ্মীবাই কয়েকদিন ছিলেন।

ব'ড়ের সতিত মহারাজ সৈন্যে ঘুর নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। রানী যুদ্ধের ভয় পান্ধত ছিলেন কিন্তু দিক্‌দিক দৈঃপণ রানীর শিবক্কে অনুব্রাণ করিতে সম্মত হইল না। এদিকে রানীর আদেশে বিদ্রোহীদল গোলাবর্ষণ আশ্বে করিল। দেওয়ান রাজবাড়ের স'নর্দক অগ্ন্যুদ্যে সবেও সিদ্ধিলাভে যুদ্ধ করিল না। তখন মহারাজ ও দেওয়ান খোড়া হইতে নামিয়া তোপ চালাইতে আশ্বে করিলেন। কিন্তু পূর্বেই তোপের রকে, কাহারো বাজরা তরিয়া দিয়াছিল, কাষেই তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। দেওয়ান সহ ভীত মহারাজ আগ্রা অ'তিমুখে পলাচন করিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রানী ও তাঁহার সহযোগীগণ গোরালিয়র অধিকার করিয়া, প্রদিক্‌ উদ্ভান ফুলবাগের মোতিমহলে থাকিবান ব'ন্দাবস্ত করিলেন। রাজধানীতে গুঠ তরাজ আরম্ভ হইল। পরদিন রানী আজার "মুক্তধার" অর্থাৎ ধুমংগের সতিত ব্রাহ্মণতোজন আরম্ভ হইল। এই ব্রাহ্মণ

জা'ন ও খ'ন্দোংসব একশক-াল সমভাবে চ'লচ'ল।

তাঁ'র টাপী হাতী খোড়া ম'হ'দ' ইত্যাদি যুদ্ধাশ্রয় সংগ্রা করিতেছিল। রানী ও কান্নীর বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রাচীন প'শ্র'ম স্তব 'হট' বোজ ১৬ই জুন মুরার হ'লে প'চ ম'ল দু' বাতাচরপুবে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। এটহানে 'ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মেন্‌দার সৈন্যে তাঁহার স'তত যোগ দেন। কালবিলম্ব না করিয়া যোজ বিদ্রোহী-দলকে আক্রমণ করিলেন। সেদিন যুদ্ধে কোন পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বিদ্রোহীদল অল্প দূর পিছনে সরিয়া আসিয়া এক গুচ্ছ জলজলাতীর মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। মারাঠা ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন সেদিন তরপরাণব অনিচ্ছিত থাকিয়া যায়; কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন, কোম্পানির সৈন্য এদিনেও বিদ্রোহীদলকে পরাজিত করিয়াছিল। পরদিন জুলাই (১৭ই জুন) ব্রিগেডিয়ার সিধ আঁতরী হইতে

সৈন্যের আশ্রয় বিজ্ঞানীদলকে পিছন দিক হইতে আক্রমণ করিলেন।

চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বিজ্ঞানীদল প্রথমে ভীত হইয়াছিল কিন্তু রাণী তাঁহারা টেপী প্রভৃতির উৎসাহে অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীতভাৱা হইয় হর এবং দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করিতে থাকে। বিগ্রহের পর্বাৎ বিজ্ঞানীদল প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে; এই সময়ের মধ্যে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। পরঃপণালীর মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে তাহাদের পদে পদে অস্থিবিধা হইতেছিল, তাহারা প্রাণপণে নালা হইতে বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের এ চেষ্টা প্রতিবারই ব্যর্থ হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে লোকক্ষয়ও হইতেছিল। রাণী লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত উৎসাহিতভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের প্রাণাত্য পরিশ্রম ব্যর্থ হইতে চলিল। ইংরাজ সৈন্য ধীরে ধীরে তাহাদের চাপিয়া ফেলতেছিল। অল্পক্ষণের জলপ্রণালীর মধ্যে থাকিয়া বিজ্ঞানীদল সাধামত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে অবশুষ্ঠ রাণী সাগরিন আশ্রয় বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি বুঝলেন এভাবে যুদ্ধ করিল ভয়ানক নাটক, অধিকন্তু মৃত্যু অনিবার্য। লক্ষ্মীবাই উদ্দেশ্যের মত যুদ্ধ করিতে করিতে নালা উপরে উঠিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী সৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিল। নালায় বাহিরে আসিয়া সৈন্যগণ সহ রাণী কোম্পানির সৈন্যের নীচে পড়িলেন। সৈন্যসহ রাওসাহেব ও তাঁহারা বাহিরে আসিলেন, পিছন দিক হইতে স্তর তিউরোজ সৈন্যে নালায় মধ্যে নামিয়া পড়িলেন। রোজ মনে করিয়াছিলেন, আবার জুইদিক হইতে আক্রমণে বিজ্ঞানীগণ বিধ্বস্ত হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। রাওসাহেব ও তাঁহারা সুরিয়া দীপ্তরা রোজকে আক্রমণ করিলেন আর সম্মুখে ব্রিগেডের প্রধান আক্রমণ করিলেন রাণী লক্ষ্মীবাই। অবশুষ্ঠ রাণী লক্ষ্মীবাই ক্রান্ত সম্মুখে ইংরেজ হইতেছিলেন, তাঁহার অগ্নি অন্তঃসমনোদ্রুত স্বাক্ষরপণে বর্ণনায় উঠিল, হাই-

লাগার সৈন্যদল রাণীর ক্রান্ত-চালিত তরবারি মুখে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, লেফটেন্যান্ট নীত সাংবাদিক আক্রান্ত হইলেন (৪) লক্ষ্মীবাই নিজগণে ব্রিটিশ-বাহিনী দলিত মর্ষিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। রাণীর শক্তি ও গতি বোধ করা অসম্ভব বুঝিয়া কোম্পানির সৈন্য তাঁহার বিনাশ চেষ্টায় উত্তীর্ণ পড়িয়া লাগিল, সমস্ত সৈন্যের লক্ষ্য হইলেন—রাণী লক্ষ্মীবাই।

রাণী যুদ্ধ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার বাম বাহুতে গুলি লাগিল, হাতের অগ্নি থামিয়া পড়িল (রাণী যুগল হস্তে তরবারি চালনা করিতেছিলেন)। তাঁহারা দূর হইতে রাণীকে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্যলেন। স্বর্গদেব ভখন রক্তচক্ষু দিক্চ-বালের আভ্যুত্থে ছুটিা চলিয়াছেন; আর কিছুক্ষণ এই ভাবে যুদ্ধ চলিলে আর অবশুষ্ঠ রাণী জানিয়া রাণী যুদ্ধ ভাঙিয়া হাটতে সীকৃত হইলেন না। এক হাতেই ক্রান্ত অগ্নি চালাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহসা পশ্চাদ্ধিক হইতে কর্ণেল কিক্সের অন্তর্কিত তরবারির আঘাত রাণীর দক্ষ অধ-পৃষ্ঠে সূঁটাইয়া পড়িল। (৫) নিমেষ মধ্যে সংঘর্ষক্রমে তাঁহারা রাণীর পাশে আসিলেন, চারিদিক হইতে মৃত্যু পথযাত্রীর রক্ষার্থে সকলে অগ্রসর হইল। কয়েকজন সাহায্যে রাণীর মৃতদেহ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে চলিল। (১৭ জুন ১৮৫৮, সঙ্গার সময় রাণীর মৃত্যু হয়।) এই বিশৃঙ্খলার পর যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, কাহাণী জরলাত করিয়াছিল, তাহা না লিখিলেও চলে। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক কিন্তু কর্ণেল কিক্সকে নির্দোষ বলিয়া, এক সাধারণ সৈন্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীবাইয়ের তত্যাগপাথ চাপাইয়াছেন।

৪। "Here they maintained a desperate hand to hand struggle with the British. The 71st Highlanders suffered severely. Lieutenant Neave, whilst leading them, falling mortally wounded."—Muller's Mutiny, 1896.

৫। "ইককে লড়াইত রাণীবালীসু বন্দুকীরা পেলী লাদলী তথ্যনি দানিলে নাই, তেওঁকিতে তরবারীয়া বাহ দাতা দাদনা।"—দোয়ালের এখীল বতীরা বোম্ব, ১৪ পৃঃ।

"When inch by inch the British troops pressed through the pass, and when reaching it's summit, Smith ordered the hussars to charge, the Rani of Jhansi boldly fronted the British horsemen. When her comrades failed her, her horse, in spite of her efforts, carried her along with the others. With them she might have escaped, but that her horse, crossing the canal near the cantonment, stumbled and fell. A hussar close upon her track, ignorant of her sex and her rank, cut her down. She fell to rise no more."—Sir Hugh Rose, by an Officer of the Bengal Staff Corps, 1866.

উপসংহারে ইহা প্রকাশ করা তরত অপ্রাসঙ্গিক

তইবে না যে, আমার পূজ্যপাদ মাঝামাঝি বর্গীয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার ভোক্তা ভ্রাতা মতেশচন্দ্র অনেকগুলি ইংরাজ পরিবারের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এবং গুপ্তভাবে তাঁহাদের নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইচ্ছা হইতে বিজ্ঞোতিগণ দুই ভ্রাতার জীবন নাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। দ্বাদশ মহাশয় প্রাণকয়ে গোরা-লিয়ার হইতে আগ্রা পলায়ন করেন এবং বড়দানামহাশয় (মতেশ বাবু) তাঁহার ভ্রাতা সামন্ত সর্দার বাবাসাহেব ঝিল্লীওয়ালার গৃহের পাঠকুরায় দিন কয়েক লুকাইয়া পাকিয়া প্রাণ বিচাটতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের না পাঠিয়া "কেষ্টা" নামে বাড়ীর ভৃত্যকে বিজ্ঞোতিগণ অকর্ম্মণ্য ও অসহ্য করিয়া গিয়াছিল। কেষ্টা বেচারী তাহার "মুলো" হাত পা আমার মা ও মাংসের দেখায়ে, বিজ্ঞোতিগণের সময়ে গোয়ালিয়রের ভীষণ অবস্থার কথা বর্ণন করিত।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

বিরহ

বিরহেরে শত্রু পরম কেমন করে' বলব ওরে ?
প্রাণে সে সেসে রাখে, বাঁধে নূতন নূতন ডোরে ।
পরিণয়ের অপূর্ণতা
হারান্নাক জীবন-লতা
নূতন নূতন গাঁহতে সে ফুটার কুসুম ভোড়ে জে'ড়ে ।
হুটী মাংস মাধ্য পায়ণ, দৌবনের এই গিরির গারে,
বন্ধুর পথ দাঁড় করে দেবদাক শালবনের ছায়ে ।

সুচারি দিবে উপলব্ধা
পাগলা বোরার উদ্যমতা
কতরীমর মনঃশিলার মিলায় পুন নূতন করে' ;
নিমেষ ক্ষুধা তাতের সুখায় করে আরো রোচন স্বাদ,
সুপ্ত প্রায়ে জাগবে তালি বাবধানের মোহন বাদ,—
প্রেমের জিঁজিহ্বা, মর্শ্বজালায়
গড়া, তাহার কর্ম্মশালায়
গাঁহছে সে যে নর্ম্মমাণার মিলনফুলে স্বেচ্ছের কোঁড়ে ।
শ্রীকালিদাস রায় ।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

[পূর্বপ্রকাশিত অংশের চূম্বক—

কলিকাতাবাসী হেমেন্দ্র কর ও কিশোরীমোহন নাগ দুই বন্ধু, উভয়েই অবিবাহিত। হেম কোনও ইংরাজ সঙ্গদাগরী অপিসর কেশিরার এক বিলাত-ফেরৎ সিবিলাসনের নিশ্চিৎ আত্মীয় এবং অত্যন্ত সাহেবী-ভাবাপন্ন। কিশোরী একজন কবি, তাঁহার মা বাপ নাই, দাদা পশ্চিম ঢাকার করেন, পৈতৃক কিছু সম্পত্তি আছে, তাঁহারই উপস্থিতি কিশোরী কলিকাতায় কাটায়। জুন মাসে, এক মাসের ছুটি লইয়া হেম দার্জিলিং যাত্রা করিলেন, কিশোরীও তাঁহার সঙ্গে লইল। হেমের উপদেশে সম্পূর্ণ সাহেব সাজিয়া, নিজ প্রিয় কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া, কিশোরীও বন্ধু সহ দার্জিলিং গিয়া স্ত্রানিটোরিয়মে বাসা করিল। হাটের ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টের পাসদ্য ব্যাংকটোর; তাঁহার জ্ঞাত, সত্যবালা বা সতী ও বণা নামী দুইট যুবতী কতক লইয়া দার্জিলিং গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গিত পূর্বাধিকই হেমের বন্ধু হেমের সহিত কিশোরী সঙ্গদা “ঘোষভলার” যাত্রাও করতে লাগল। সত্যবালাও একজন গোপন কবি; এই প্রকাণ্ড-কবি কিশোরীর সহিত অন্তর্ভুক্তই তাঁহার খুব মনে মনে চাইয়া গেল। ক্রমে ঘোষ সাহেব, তাঁহার বন্ধু যুবক সিভিলিয়ন মালিক সাহেবকে সঙ্গে লইয়া দার্জিলিং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের খুব হজা, মালিকের সঙ্গে সত্যবালা বিবাহ কর—মালিকও আশ্বয়ে ব্যগ্র। কিন্তু সত্যবালা কিছুতেই রাজী হইল না, এখন তাঁহার পিতা মাতা বাকিলেন, কিশোরীকেই সতী মনে মনে পাঠকপে কামনা করে; বুঝিয়া কিশোরীকে তাঁহার “বাঁচী বন্ধু” করিলেন। হেম বরফ চাইয়া কলিকাতার কিরীয়া আসিল, কিশোরী রাহল। “ইহার পর মাঝে মাঝে পথ ঘাটে সতীর সাহিত কিশোরীর সাক্ষাৎ হইত। ক্রমে তাহাদের পথ গভীর ভাব ধারণ করিল—তাঁহারা স্থির করিল, তিন আর্থন অল্পসারে তাঁহারা গোপনে বিবাহ করিয়া, তার পর বাড়িতে জানাইয়া, কলিকাতায় চলিয়া আসিবে। এদুপারে একদিন তাঁহারা রোজট্রারকে নোটিস দিয়া আসিল, তিন সপ্তাহ

পরে বিবাহ হইবে। মালিক ইতোমধ্যে কাছারি গিয়া সেই নোটিস দেখিতে পাইল এবং বাড়ীতে কিরীয়া সতীর মাঝে বলিয়া দিয়া খুব একটা গৎগোল বাধাইল। ফলে সতীর একা গাতির হজা, এবং কিশোরীর সহিত গোপন সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া গেল। কিশোরী একদিন সতীর সহিত দেখা করবার চেষ্টার ঘোষ ভলার গিয়া মালিক কর্তৃক অপমানিত হইল। বিবাহের তখন তিনদিন বাকী; সতী কিশোরীকে ডাকে চিঠি লিখিলে সে যেন রাতি ১২টার সময় ঘোষ ভলার পশ্চাত আসিয়া দাঁড়ায়; সতী সেখানে আসিয়া, তাঁহাদের বিবাহের বিষয় স্থির করিবে। কিশোরী গিয়াছিল, সতীর সঙ্গে দেখাও করিয়াছিল, কিন্তু পনের বাংলায় বাসকারী মালিক তাঁহাদের দেখিতে পারা। পরদিন কিশোরী রোজট্রারের সহিত দেখা করিয়া, বিবাহের স্থান ও সময় স্থির করে, রাতি ১২টার আবার ঐস্থান আসিয়া সতীকে বাংলা বাড়ীতে ছিল। এদিকে মালিক, ঐরাতি রাতেই উভাদের ঐরূপ গোপন মিলন কর মনে করিয়া, কিশোরীকে ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাসিয়া ছিল। যথা সময়ে কিশোরী আসিল, মালিক নিজে যাইতে সাহস না করিয়া, তাঁহার ভৃত্য মংলুক, ধরিবার জন্য পাঠাইল। মংলুর সহিত কিশোরীর ধস্তাধস্ততে, অবশেষে মংলু রাস্তা হইতে গড়াইয়া, “বাগের বাপ জান গিয়া” চীৎকার করতে করিতে, গভীর খদে গড়াইয়া পড়িল। একটা খুন চইয়া গেল, মালিক এগনি পুলিশ আনিয়া কিশোরীকে ধরাইয়া দবে, এবং বিচারে তাঁহার ফাঁস হইবে, এই আশঙ্কায় কিশোরী, দার্জিলিং ত্যাগ করা স্থির করিল। সেই রাতেই সতীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে এ কথা বলিল, এবং অনুরোধ করিল কাল সকালে সতী যেন স্ত্রানিটোরিয়মে গিয়া, গার হিসাব মিটাওয়া দিয়া, তার জিনিষপত্র ও কুকুরটিকে লইয়া আসে। কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়া থাকিরা, এ সব গোল-মাল মিটিয়া গেলে সে কিরীয়া আসিবে এবং তাঁহাদের বিবাহ চাইবে।

পার্কণ্য পথে উত্তরদিকে চলিয়া, পরদিন পূর্বাঙ্কে

কিশোরী বুঢ়া রাঙা সমা ভাড়াটয়া সিকম রাঙা
 প্রবেশ করিল। মিটোগাং গ্রাম হইতে তাবা-শিকক
 ও গাইড ফুটিংকে এবং কুলি সাইনকে সংগ্রহ
 করিয়া, লামা বেশে, তিন সপ্তাহ চলিয়া কাম্পাচেন
 গ্রামে আসিল। জর হইয়াছিল, গ্রামে আশ্রয় মিলিল
 না, গ্রাম হইতে কিছুদূরে এক পৌছমাঠে তিন জনে গিয়া
 আশ্রয় লইল। এই মাঠের লামা এখন মৃত, তাঁহার
 সপ্তদশবর্ষীয়া কুমারী কন্যা, তিব্বতীর বৌদ্ধশাস্ত্রে বচসী
 নিনা এখন মাঠের অধিকারিণী। নিনা সেবাশ্রমের
 কিশোরীকে আশ্রয় করিল, কিন্তু ঐ বালিকার
 মনে এই অভিযন্ত্রিত প্রেমসংকার হইল। সত্যাবলার
 প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইতে পারে না এই
 স্থির করিয়া, এক নিষ্ফল পেমের যন্ত্রণা হইতে
 নিনাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কিশোরী মঠ ত্যাগ
 করিতে প্রস্তুত হইল; বলিল, তিব্বতের তামিলংগু
 মাঠে গিয়া কিছুদিন সেখানে সে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন
 করবে। নিনা বলিল, আমায় তোমার সঙ্গে
 যাইব। কিশোরী মানা করিল, কিন্তু নিনা ত্যাগ
 ন। সাইন ও ফুটিংকে, তীর্থযাত্রাকল্প গ্রামান্তরে
 বোড়া কিনিতে পাঠাইয়া, গাভী ১০ টার সময় নিনা
 কিশোরীকে বলিল, এই মাঠের লামাগণের বংশানুক্রমে
 সংকট বহু ধনসম্পত্তি একস্থানে লুপ্ত হইত।
 আছে, এখন আমিই সেই সমস্ত ধনের অধিকারিণী;
 তীর্থগণে আমার বাদ মৃত্যু কর, আমার আর
 কেহ নাই, সে সমস্ত ধন তোমাকে আমি দিলাম
 তুমি আসিয়া লইবে, দেখবে চল। নিনা এই কথা
 বলিয়া, নিজ শরনককের পশ্চাত্ত্বিত গুহার মধ্যে
 কিশোরীকে লইয়া গিয়া, মেঝের উপর হইতে একখানা
 বড় পাথর তুলিয়া ফেলিয়া সিঁড়িযুক্ত একটা প্রকাণ্ড
 গহ্বর দেখাইল; এবং কিশোরীকে অমুসরণ করিতে
 বলিয়া প্রার্থী হস্তে সিঁড়ি নামিতে লাগিল।]

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গিরি-স্থরে।

কয়েক খাপ সিঁড়ি নামিবার পরেই, খানিকটা
 সমতলক্ষেত্র পায়। গেল—নিনার পশ্চাতে ওহুপরি
 নামিয়া দাঁড়াইয়া কিশোরী দেখিল, সমুখ ভাগে একটি
 অসদ চলিয়া গিয়াছে—কতদূর গিয়াছে, কিছুই

বোঝা গেল না। অজ্ঞে উর্দ্ধে ও প্রস্থ কোনও দিকে
 তিন ভাস্কর অধঃ হইবে না—প্রবেশ করিতে হইলে
 একটু 'গ'৬ মারিয়া' চলিতে হয়। নিনা বলিল, "এই
 অজ্ঞের মধ্য দিয়া এখন আমাদের বাইতে হইবে—
 তোমার ভয় করিবে না ত?"

কিশোরীর সত্যই ভয় করিতেছিল,—কিন্তু পুরুষ
 হইয়া, এই বালিকার সমক্ষে কোন লজ্জার সে তাহা
 স্বীকার করিবে? তাই সে বলিল, "না, ভয় করিবে
 কেন? কতদূর বাইতে হইবে?"

"বেশী দূর না—এস মাথাটি বেশ করিয়া নোয়াইয়া
 এস, যেন উপরের পাথরে ঝুঁকিয়া না যায়।"—বলিয়া
 প্রদীপ হস্তে নিনা অগ্রসর হইল। কিশোরী অবনত
 মস্তকে ধীরে ধীরে তাহার অমুসরণ করিল। পদনিম্নে
 প্রস্তরময় পথটি, এবং উত্তর দিকের ভাতিগাত্র অমৃৎপ,
 যেন বহু বয়ে বহু পরিভ্রমে সেগুলি টাটরা তুলিয়া
 তৈয়ারী করা হইয়াছে। কিন্তু উর্দ্ধভাগ সেরূপ নহে—
 বহুর পর্বত গাত্রেই মত আকার-বিশিষ্ট। কালো কালো
 ছোট বড় পাথরের চাঙা—দুই খণ্ডের সংযোগ স্থান
 কোথাও স্তম্ভিত, কোথাও বা যেন মুখবান্দন করিয়া
 রহিয়াছে। বাঁকরে এত বে দীপ্ত ছিল, এখানে
 তার কিছুই বুঝা বাইতেছে না। প্রথমে কিশোরীর
 ভাবনা হইতেছিল যে বোধ হয় ভিতরে গেলে, নিখাস
 লইবার মত পচুর বায়ু পাওয়া যাইবে না; কিন্তু
 দেখিল যে সে বিষয় কোনই বিষয় হইতেছে না।
 চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "অজ্ঞা 'নিনা, এই
 স্থানের যেখানে মূখ, তাহা ত বড়; এখানে বায়ু চলাচল
 করে কেমন করিয়া?"

নিনা বলিল, "আর খানিক অগ্রসর হইলেই তুমি
 দেখিতে পাইবে।"—বলিয়া সে চলিতে লাগিল।

অজ্ঞাটি সরল রেখার মত নহে; মাঝে মাঝে
 অঁকরা বাঁকরা গিয়াছে। একস্থানে আসিয়া নিনা
 বলিল, ঐ সমুখে উপরের দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ যে
 মস্ত কাটল দেখা বাইতেছে, উহা উর্দ্ধে উপর পর্যন্ত
 উঠিয়া গিয়াছে। ঐ স্থান দিয়া বায়ু প্রবেশ করিয়া

ধাকে। ঐ স্থানের নিম্নে আমি পৌঁছলে তুমি দেখিতে পাইবে, আমার হস্তের এই প্রদীপ-শিখাটি কীপিতে থাকিবে।”

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, “যদি নিবিয়া যায়?”

নিম্না বলিল, “আমি সঙ্গে আলো জ্বালবার উপকরণ আনিয়াছি। যখনই এই গহবরে প্রবেশ করি, তখনই এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকি।”—বলিয়া সে অগ্রসর হইল। সেই স্থানের নিম্নে পৌঁছিয়া কিশোরী দেখিল, দীপশিখা বর্ধিত কীপিতে লাগিল। নিম্না নিজ বস্ত্রাবরণে দীপটি সুরক্ষিত করিয়া, ক্ষিপ্রেচরণে সে স্থান অতিক্রম করিয়া গেল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, “যে পথ দিয়া বায়ু প্রবেশ করে, সে পথে সাপও ত নাশিয়া আসিতে পারে?”

নিম্না বলিল, “উপরে যেখানে মুখ, সেখানটার চতুর্দিকে এত প্রকার শুষ্ক বন জঙ্গল আছে। সে গাছের গন্ধ সাপেরা সহ্যেতে পারে না, তাই সাপ আসে না।”

কিশোরী ভাবিল, বাঙ্গালা দেশে বহু “ইবা” নামে খ্যাত—ঐ শুষ্ক বোধ হয় সেই জাতীয়; ইবার মূল ঘরে রাখিলে সাপ আসে না এই প্রবাদ সে শুনায়েছে বটে। হঠাৎ বহু শতাব্দী পূর্বে, যে লামা এই গহবরে তাঁহার ধনতত্ত্ব লকাইত রাখিবার প্রবন্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই বোধ হয় উপরের ঐ বন্ধুমুখের চতুর্দিকে ঐ শুষ্ক আবাস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয়ে নিনাকে সে কোনও প্রশ্ন করিল না; বলিল, “আর কতদূর বাইতে হইবে?”

নিম্না কিরিয়া দাঁড়াইল। হস্তস্থিত দীপালোকে কিশোরীর মুখ গানে চাহিয়া বলিল, “তুমি কি ক্লান্ত হইয়াছ? এখানে একটু বসবে কি? আর কিন্তু বেশী দূর নাই।”

কিশোরী বলিল, “বসিব না, চল।”

চলিতে চলিতে কিশোরী দেখিল, উত্তর দিকের ভিত্তিগাত্র আর পূর্বের ভায় মিশ্রণ নহে—বহুর প্রস্তর-গঠিত। কিশোরী নিনাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, সে বলিল, “বাবা বলিতেন এক এক লামা

তাঁহার জীবনকালে উত্তর দিকে দশ হাতের বেশী দেওয়াল বঁধিয়া বাইতে পারেন নাই। উদানী লামারা বোধ হয় আর সে কষ্ট স্বীকার করিতেন না, তাই এইখান পর্যন্ত হইয়া, আর হয় নাই।”

আর দুইটা দীক পার হইবার পর কিশোরী দেখিল, সুরঙ্গের আয়াতন ক্রমে বর্ধিত হইতেছে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া নিম্না বলিল, “এই আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। ঐ দেখ, সম্মুখে এই মঠের কোবাগার।”—বলিতে বলিতে নিম্না সেই স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইল।

কিশোরী দেখিল, স্থানটি দীর্ঘে প্রবেশ দশ বাগো হাত পরিমিত হইবে। ভিত্তি গাছের কাছ ঘেঁষিয়া চারিটি কালো কালো বড় বড় সিঁদুক এসান তড়িয়াছে। প্রত্যেকটিই তাল দিয়া বদ্ধ। দেওয়ালে এক স্থানে একটা কুলঙ্গীর মত খানকটা স্থান কাটা ছিল, নিম্না প্রদীপটি সেইখানে রাখিয়া, সিঁদুক খুলি দেখাইয়া বলিল, “এগুলির মধ্যেই আমার সমস্ত ধনতত্ত্ব রক্ষিত আছে।”

কিশোরী একটা সিঁদুকের কাছে গিয়া, ডালার উপরে আঙুলের গাঁঠের টোকা মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ সব কি লোহার নির্মিত?”

নিম্না বলিল, “না, লোহার নয়। পিত্তার নিকট শুনিয়াছি যে, এগুলি খুব পুরাতন ও পাকা নেপালী শাল কাঠের তৈরী—আর লোহার মতই মজবুদ। কতকাল এখানে এই ভাবে রাখিয়াছে, দেখ কোথাও একটু টসকার নাই। তবে, বাবা বলতেন, ভিতরে ইম্পাতের যে কল কজা প্রভৃতি আছে, তাহা মাঝে মাঝে বদলাইতে হয়—তাও, হুই তিন পুরুষ অন্তর একবার বদলাইলেই চলে।”

কিশোরী সন্মুখেরে বলিল, “হুই—তিন—পুরুষ অন্তর! আচ্ছা নিম্না, কতকাল এগুলি এখানে আছে তাহা কি তুমি জান?”

নিম্না অস্বু'ল নির্দেশ করিয়া বলিল, “ঐ দেখ—ঐ” সর্বশেষে যে সিঁদুকটি, উহার ভিতর প্রাচীন পুঁথি ও কাগজপত্র বোঝাই আছে। সেই সঙ্গে, যে লামা এই এই ধনভাণ্ডার সর্বপ্রথম স্থাপনা করেন, তাঁহার হস্ত-

লিখিত একটি পুঁথিও আছে। বাবা একদিন আমার সে পুঁথি দেখাইয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, সাত শত বৎসর পূর্বে উহা লিখিত হইয়াছিল; সেই সময় এই ধনভাগ্য হ্রাসিত হয়। ঐ পুঁথি আমি পড়িয়াও দেখিয়াছিলাম। তাহাতে লেখা আছে, প্রত্যেক লামা, তাঁহার বে শিশুকে মঠের উত্তরাধিকারী লামা নির্বাচিত করবেন। তাহাকে গোপনে এই ধনভাগ্য দেখাইয়া দিবেন; এবং বাগ্মা খাইবেন, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ঐ সকল ধনবৃত্তি যেন ব্যয় করা না হয় বখ-সাধ্য সঙ্করে ধনবৃত্তি করাই পূর্বপুরুষ লামাগণের আদেশ। আমার পিতা, নিজ উত্তরাধিকারী স্বরূপ কোনও শিশুকে লামা নির্বাচন না করিয়া, আমাকেই এ সমস্ত দান করিয়া গিয়াছেন; এবং তাঁহার স্বহস্ত লিখিত সেই দানপত্রও, ঐ সিদ্ধকটির মধ্যেই রক্ষিত আছে।”

সেই অতল গিরগল্লবের সমাহিত হইয়া, জগৎ-সংসার হইতে বহু—বহু দূরে—কিশোরী বিশ্ববিস্ফারিত মেঘে, নিজার সুখ-মুহুর্ত এই অপূর্ণ কান্না প্রবণ করিতেছিল। তাহার মনে ভইতেছিল; ইহা যেন বিংশ শতাব্দী নহে—ইংরাজ যেন ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছে না,—অশোক বা বিষ্ণুসার যেন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অবাস্ত।

নিনা বলিল, “রাত্রি বাড়িতেছে। বে কালের অন্ধ তোমার এখানে আনিয়াছি, তাহা শেষ করি। দেখ, প্রত্যেক সিদ্ধকটি ভাল দিয়া বন্ধ করা আছে। ভালার চাবিগুলিও এই কক্ষের নিকটেই লুকানো থাকে—মঠে তাহা লইয়া বাওয়া নিষিদ্ধ। চাবি কোথায় থাকে দেখবে এস।”—বলিয়া নিনা প্রদীপটি হাতে করিয়া, কক্ষ হইতে নির্গত হইল। বলিল, “তোমার ঘটি-পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে এস।”—বলিয়া নিনা আগে আগে চলিল। কিশোরী মনে মনে এক ছই করিয়া গণিতে গণিতে, তাহার পশ্চাৎকারী হইল। ক্রমে নিনা দাঁড়াইয়া, কিছু করিয়া বলিল, “এক, দুই, তিন—বৃস। তোমার ক’ পা হইয়াছে?” কিশোরী বলিল, “বাইশ।”

“আমার সাতাইশ হইয়াছে। আমি জীলোক, তাই, আমার পদবিক্ষেপের দূরত্ব-পরিমাণ কিছু অল্প, সেই তত্ত্ব তোমার চেয়ে বেশী হইয়াছে। তোমারও পদক্ষেপ লামাদের চেয়ে ছোট—কারণ পুঁথিতে লেখা আছে, কক্ষ প্রান্ত হইতে উনবিংশতি পদক্ষেপে যে স্থান আসিবে, উহাই চাবি লুকাইবার স্থান।”—বলিয়া কিশোরীর হাতে প্রদীপটি দিয়া নিনা সেইখানে বসিয়া পড়িল। দেওয়াল সংলগ্ন একটা পাথরের টুকরা চীনাটান করিতে, উহা খস ক’তরা খুলিয়া আসিল। নিনা ভিতরে হাত দিয়া, ধাতুনির্মিত একটি ছোট চৌকোণা বাক্স টানিয়া বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, “এই বাক্সের মধ্যে চাবি থাকে।” ডালাটি খুলিয়া, গুলি তুলির বলিল, “এই দেখ, চারটি রহিয়াছে এখন চল, সিদ্ধকগুলির ভিতর কি আছে তোমার দেখাইব।”

কক্ষ ফিরাইয়া আসিয়া প্রথম সিদ্ধকের সম্মুখে জাহ্নু পা তরা বসিয়া, সিদ্ধক খুলিয়া নিনা বলিল, “হাতে কেবল রূপার টাকা থাকে।” কিশোরী দেখিল, বাক্সটির প্রায় অর্দ্ধেক খাল। একটা টাকা তুলিয়া, প্রদীপের আলোকে সে পরীক্ষা করিতে লাগিল। নিনা বলিল, “বেশীর ভাগই ইংরাজী আর নেপালী টাকা। নীচের দিকে কিছু চীনা ও মুসলমানী টাকাও আছে। তোমার গাতের ওটা কি? ইংরাজি?”

“হাঁ।”—বলিয়া কিশোরী ঠং করিয়া টাকাটি গাধার কোলিয়া দিল।

“চীনা টাকা দেখিবে?”—বলিয়া নিনা মাঝখানে দুই হাত দিয়া টাকার গালা উত্তর পাশে সরাইতে লাগিল। সেই বন বন অণুৎকার শব্দে, কক্ষ কক্ষখানি ভরিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কিশোরী তাহার মস্তকের মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করিল। সে মস্তকস্থের মত সেই কুম্ভকুম শব্দ শুনিতে লাগিল। গাধার ভিতরে হাত প্রবেশ করাতরা, মুঠা মুঠা টাকা তুলিয়া নিনা বাছিতে লাগিল। ক্রমে একটি চীনা গোপ্য-মুঠা পাইয়া কিশোরীর হাতে দিয়া বলিল, “এই দেখ।”

কিশোরী টাকাটি দেখিয়া নিজের হাতে কে৩২ দিয়া বলিল, “আজ্ঞা, তুমি যে বলিয়াছিলে, এখন আমার নিকট টাকা নাই, কাল তোমার ৫০ শোধ দিব, এই সিন্দুক হইতেই তুমি টাকা লইয়া যাইতে ত?”

নিলা হাসিয়া বলিল, “নহিলে আর কোথায় পাইব? আমি ত লামা নই, ভিক্ষাও করি না, কোনও ভক্ত আসিয়া আমাকে প্রণামীও দিয়া যায় না;—এই টাকা লইয়াই ত আমি খাই পরি। বাবার মৃত্যুর সময় এ সিন্দুক একেবারে ভর্তি ছিল না বটে কিন্তু এমন আধখালিও ছিল না; আমিই ক্রমে ইহাকে খালি করিতেছি।”—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিশোরী বলিল, “সে, তুমি বেশ করিতেছ। তোমার টাকা, তুমি কেনই বা খরচ করিবে না? কিন্তু সেজন্য ও কথা তোমার ভিক্ষাসা করি নাই। তুমি আমার বলিয়াছিলে টাকা দিতে তোমার দুই চার দিন দেয়ও হইতে পারে। তোমার শয়ন ঘরের লাগাও এই টাকার রাশি রহিয়াছে, তবে দেয় হইবে বলিয়াছিলে কেন?”

এ প্রশ্ন শুনিয়া নিলার মুখের হাস্যভাষাটি নিবিয়া গেল—তাহার মুখখানি বেশ গভীর ভাব ধারণ করিল। একবার কিশোরীর পানে চাহিয়া, সে অবনত মুখী হইয়া, নিঃশব্দে বলিল, “তোমাকে আর দুই চার দিন এখানে আটকাইয়া রাখিবার জন্যই আমি এ কোশল অবলম্বন করিয়াছিলাম আর কেন?”

কিশোরী বলিল, “আমাকে আটকাইতে চাহিয়াছিলে কেন? তাতে তোমার লাভ?”

নিলা ভারি গলায়, “কি লাভ, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? বাও. ও সব কথার দরকার নাই। এখন, তোমার বা দেখাইতে আনিয়াছি, তাহা দেখিবে এস।”—বলিয়া সে পশ্চাৎ কিরিয়া দ্বিতীয় সিদ্ধকটির দিকে অগ্রসর হইল। সেই প্রদীপের সামান্য আলোকেই কিশোরী দেখিতে পাইল, নিজের চক্ষু দুইটি সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষ-চক্ষ করিতেছে।

কিশোরীকে প্রদীপ ধরিতে বলিয়া নিলা দ্বিতীয় সিদ্ধকটির সম্মুখে বলিল। খুলিয়া, ডালা তুলিয়া বলিল, “এতে সব সোণার টাকা।”

কিশোরী দেখিল, সিদ্ধকটের অর্দ্ধভাগের উপর স্বর্ণমুদ্রায় বোঝাই। এত সোণা একজি কিশোরী জীবনে কখনও দেখে নাই; সে অবাক হইয়া সেই বিপুল ধনরাশির পানে চাহিয়া রহিল। মুদ্রাগুলি সমান আকারের নহে, ছোট বড় মিশানো। নিলা বলিল, “ইংরাজের মোহর ইহার মধ্যে খুব কমই আছে। চীনা মোহর কিছু আছে আর বেশীর ভাগই মুসলমানী আমলের মোহর।”—বলিয়া সে দুই হাতে মোহরের গাদা দুই পাশে সরাইতে সরাইতে, কয়েকটি নির্বাচন করিয়া তুলিয়া কিশোরীর হাতে দিল। কিশোরী দেখিল, কতকগুলিতে কাঁচী অক্ষরে কি সব লেখা রহিয়াছে, —পড়িতে পারিল না; কতকগুলিতে, কি তাহার অক্ষর তাহাও নির্ণয় করিতে পারিল না। মোহরগুলি নিজের হাতে কিরাইয়া দিল। সেই সমুদায় স্বর্ণরাশির পানে লুক্কনজ্ঞে চাহিতে চাহিতে কিশোরী জাবিল, এ সমস্তই আমার হইতে পারে, যদি আমি এই নিনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হই; আমি তাহা হইলে অতুল ধনের অধীপতি হইতে পারি—চিরজীবনের জন্য আমার দারিদ্র্য শুদ্ধিয়া যায়।—কিশোরীর মাথার ভিতর বেন আঙনের হৃদ্য দিতে লাগিল।

সিন্দুক বন্ধ করিতে করিতে নিলা বলিল, “বাবার মৃত্যু সময়ে ইহাতে বতগুলি মোহর ছিল, এখনও তাহাই আছে। আমি ইহার একটিও খরচ করি নাই।”—কিন্তু কথাগুলি কিশোরীর কাণে গেল কি না সন্দেহ, তাহার মন তখন এতই উদ্ভ্রান্ত।

অতঃপর নিলা তৃতীয় সিদ্ধক উদঘাটন করিয়া বলিল, “এদিকের এগুলি রূপা, ওদিকের ওগুলি সোণা।”—কিশোরী দেখিল, স্বর্ণকারেরা যাকে “বাট” বলে, এগুলি তাহাই; রূপারগুলি প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে; সোণার গুলিও ময়লা পাড়িয়া ঔজ্জ্বল্য হারাইয়াছে। নীচে দিকের বাটগুলি মোটা এবং বড়;

উপরেরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট—কিন্তু সন্মুখের তলদেশ হইতে উপরের কিনারা অবধি ঠাসা। কত মন সোণা এভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে এবং প্রতিমণ সোণার স্ফাটই বা কত ইহা কিশোরী মনে মনে হিসাব করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার আন্তরিক-বস্ত্র তখন এমন বিকল হইয়া গিয়াছে যে, কোনও অনুমান করিতে সে সমর্থ হইল না। কেবল এই কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল, আমি যদি ইহাকে বিবাহ করি, তবে এ সমস্তই আমার—সমস্তই আমার। একটা স্বামীর ঐশ্বর্য্য—সমস্তই আমার হইতে পারে।

কিশোরীর চক্ষু দুইটি তখন রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দুটি বিব্রাঙ্ক সেই গোঁথেই তবুও সে দেখিতে পাইল, দুই থাকের মধ্যে খানিকটা ব্যাধান, তাহার মধ্যে একটি চন্দ্রকান্ত-নির্মিত বড় বাস বসানো রহিয়াছে। নিনা সেটি তুলিয়া খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, “এতে খালি পাপর। বাবা বলিতেন এগুলি খুব দামী পাথর।”—ছোট বড় নানা আকারের লাল, শাদা, নীল, পীত রত্নরাজি—হীরা মোতি, চুনি, পান্না, নীলা পোখরাজ কত কি! সেগুলি বেয়ঙ্গ গুচ্ছল্য-বিশিষ্ট, তাহাতে কিশোরীর স্পষ্টই ধারণা জন্মিল যে সেগুলি স্ফুটী নহে—পরন্তু মহা স্ফাটন। পেটকহিত সেই উজ্জ্বল রত্নরাজির প্রতি দুটি নিবদ্ধ করিয়া কিশোরীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তাহার নিশ্বাস বেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে খর খর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হাতের প্রদীপ পড়িয়া গিয়া সেই গরিগহ্বর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া গেল—কিশোরী সন্মুখে সেখানে পড়িয়া গেল।

নিনা চমকিত হইয়া আশ্বাসে কিশোরীর নিকটে আসিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিল, “কেন কেন নাড়ালো? তুমি পড়িয়া গেলে কেন?”

কিশোরী বলিল, “চল চল নিনা, এখন কইতে চল—বড় বাড়িতে আমার বড় কষ্ট চাইতেছে। এতটুকু—তাকো হাওয়া—উঃ!”—বলিতে বলিতে সে চলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। ইহা বুঝিয়া, নিনা তাহাকে

কাঁপাইয়া ধরিয়া কোল; বলিল, “বেশ ত—ওঠ—চল আমরা ঘরে ফিরিয়া যাই।”

কিশোরী কিন্তু কথা কাহন না। তাহার সংজ্ঞা তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শরৎ গুহার।

নিনা তাড়াতাড়ি চকমকি হুকুরা, গন্ধকের শলাকা আলোইয়া দেখিল, প্রদীপটি উল্টাইয়া পড়িয়াছে; আলো আলিবার উপায় নাই। সে তখন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। চল নাই যে রোগীর মুখে চোখে ছিটী দিবে; পাখা নাই যে ঝাটাস করিবে; জানালা নাই যে খুলিয়া দিয়া ঘরে তাকো ঝাটাস আমদানী করিবে। এখনই ইহাকে মঠে লইয়া যাওয়া আবশ্যক—সে কারো একা মানুষ সংসার পর্য্যন্ত নাই;—সুতরাং, সাইদা আজ মঠে থাকিলেও, তাহাদিগকে এ গুপ্ত ভাণ্ডারে লইয়া আসা চলিত না।

নিনা কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করিল। তাহার পর, সে নিজ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া লইল। চকমকি দীপশলাকা প্রভৃতি প্রথমে সাবধানে পেট-কাপড়ে বাধিয়া লইল। তার পর কিশোরীর সন্মুখে, নিজে পিছু ফিরিয়া বসিয়া, তাহার হাত দুটিতে নিজ গলদেশে বেঁধেন করিয়া ধরিয়া, আপন ওড়না দিয়া হাত দুটিকে শক্ত করিয়া বাঁধিল। তাহার পর, নিজ বাহ্যিক পশ্চাতে প্রসারিত করিয়া, কিশোরীর উরদেশে ঢাপিয়া ধরিয়া তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া বিপুল চেষ্টায় উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া, কিশোরীর পদবর আপন কোমরে জড়াইয়া সন্মুখে আনিয়া, উত্তর হস্তে ঢাপিয়া ধরিয়া, সেই কোমরের হইতে বাহির হইল। এবং ধীরপদক্ষেপে সুরক্ষ পথে ফিরিয়া চলিল। চাবির গুচ্ছ প্রত্যুত সব সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

যেই অন্ধকার। কিন্তু নিনা কিছুমাত্র ভীত হইল না। এ সুরক্ষ পথ তাহার পরিচিত—অত্যন্ত। তবে

মুছিল এই যে, পথটি আগাগোড়া সলেন না; মাঝে মাঝে মাঝে বাক আছে। প্রথম বাক আসিয়াই, পাথরে নিম্ন মাথা ঠুকিয়া গেল—কিন্তু তাহা সে গ্রাহ্য করিল না। সেই গুরুতর পৃষ্ঠে বহন করিয়া, বহু ক্লেশে, ক্রম সে নিজ শরন-গুহার আসিয়া পৌছিল। আশ্চর্য্যে আশ্চর্য্যে কিশোরীকে আপন শয্যায় শোয়াইয়া দিয়াই, শরনগুহা হইতে অপরকক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বাতিরের কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিল। অমনি হুহ করিয়া হিমালয়ের রানি রাশি ঠাণ্ডা তাজা হাওয়া ভিতরে ছুটিয়া আসিল।

নিম্ন অতঃপর অগ্নি উৎপাদনের উপকরণগুলির সাহায্যে প্রদীপ জালিয়া, কিশোরীর নিকট আসিয়া, তাহার নাসারন্ধ্রের নিকট অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখিল, নিশ্বাস বহিতেছে। তখন সে উন্মাদিনীর মত বলিয়া উঠিল—“হ্যাঁ সোল! হ্যাঁ সোল!”—দেবতাদের নিকট নিজ কৃতজ্ঞদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল; কারণ নানালান্না এতদূর বারি আছেন কি না, এ বিষয়ে তাঁহার মনে বিষম সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

এখন মুছিয়া তাকাত্তে হইবে। কলসী হইতে, বরকের মত কনকনে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া লইয়া, নিম্ন কিশোরীর মাথার খাণ্ডাইয়া দিতে লাগিল। সুখ ও কাল ছুটি জলসিক্ত করিয়া দিয়া, তাহার গুঠে গুঠে, সমস্তের কেশে, পাগলিনীর মত চুষন করিতে লাগিল। অক্ষুণ্ণ হয়ে বলিতে লাগিল “জাগ, জাগ প্রেরতম! তুমি চক্ষু মুছিয়া থাকিলে, আমার জগৎ বে অন্ধকার হইয়া যায়।” কিন্তু ইত্যন্তেও কিশোরীর চেতনা ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, অবশেষে তাহার আলখালা উন্মোচন করিয়া ভিতরের জামাগুলির বোতাম খুলিয়া দিয়া, গলা ও বুকের উপর নিম্ন জলের বাগ্‌টা দিতে লাগিল। চাতশাং ছিল না—ও ভিনিবের সেখানে প্রয়োজনই বা কি? তবে রাত্রিবার সময় আগুন ধরাইবার জন্য ডেরা বাঁশের একখানা চৌকা পাখা ছিল, তাহাই ইহা নিম্ন কিশোরীর মাথার সুখে বুকে ধীরে ধীরে হাওয়া করতে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইরূপে হাওয়া করিবার পর, কিশোরী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, পাশ ফিরিয়া গেল। নিম্ন তাকাত্তা চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া, তদ্রকৃষ্টে ডাকিল, “নানালান্না!”

“আঁ!?”—বলিয়া কিশোরী গোধ খুলিয়া, চিং হইয়া গেল, নিম্ন পানে কাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

নিম্ন বলিল, “এখন কেমন আছ নানালান্না? আর কোনও কষ্ট আছে কি?”

“হাঁ। আমার বড় শীত করিতেছে।”

নিম্ন উঠিয়া গিয়া বাহির কক্ষের দারট বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। নিজ বস্ত্রাকলে কিশোরীর মাথা মুখ ও বুকে সমস্তে মুচাইয়া দিয়া, অঙ্গবস্ত্রগুলি আবার আঁটিয়া দিল। কিশোরী কীণবরে বলিল, “বড় পিপাসা!”

নিম্ন জল আনিয়া দিল। পানান্তে কিশোরী কষ্টে বলিল, “আমি মুছিত হইয়াছিলাম, নয়?”

“হাঁ।”

“এখন মনে পড়িতেছে—তোমার সেই কোথাগারে আমার তরানক পরম বোধ হইতেছিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছিল। সেখান হইতে আমি আসিলাম কিরূপে?”

নিম্ন বলিল, “আমি তোমার পিঠে করিয়া আনিয়াছি।” কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, “আঁ! তুমি আমার বহিয়া আনিয়াছ?”—বলিয়াই তাহার স্বপ্ন হইল, পাগড়ী মেরের, কত বিষম ভারী ভারী জিনিষ পৃষ্ঠে বহন করিয়া স্বচ্ছন্দে পথ অতিক্রম করে; ইহা সে দার্কলিঙে দেখিয়াছে। নিম্নকে নীরব দেখিয়া বলিল, “জাভা, তোমার ত বড় কষ্ট হইয়াছে নিম্ন! কেন অত কষ্ট করিলে? সেইখানে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে বোধ হয় আমার আবার চেতনা ফিরিয়া আসিত।”

নিম্ন বলিল, “তুমি যে তাজা হাওয়া চাহিয়াছিলে; সেখানে তাহা আমি কেমন করিয়া যোগাইতাম?”

কিশোরী অগত্যা নীরব থাকিয়া বলিল, “ঠিক। তাজা হাওয়ার জন্য আমার প্রাণটা বড়ই হটকট করিয়া উঠিয়াছিল—তাহা বেশ স্বপ্ন হইতেছে। মনে হইতেছিল, আমার সমস্ত দেহের রক্ত বেন সোঁ

সেঁ। করিয়া মাথার উঠিতেছে।”

নিনা বলিল, “এখনও তোমার চোখ ছুট লাল রহিয়াছে। একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর না কেন?”

কিশোরী বলিল, “হাঁ ঠিক বলিয়াছ। আমি তোমার বিছানাটি দখল করিয়া, দিব্য আরামে গর করিতেছি—আমি এমনি স্বার্থপরই বটে। আমি তবে ও ঘরে গিয়া শুই; তুমি এবার বিশ্রাম কর।”—বলিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল।

নিনা বলিল, “না না, আজ তোমার ও ঘরে শুইয়া কাব নাট; আজ আমি তোমার একা ছাড়িয়া দিতে পারিবনা? যদি রাত্রে আবার অসুখ বাড়ে, তখন তোমার দেখিবে কে?”

কিশোরী বলিল, “কিন্তু নিনা, ভাবিয়া দেখ—”

“সে আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি।”

কিশোরী বলিল, “কোনও তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত নাই—”

নিনা বাধা দিয়া বলিল, “এই রাত্রে এখন আমি তৃতীয় ব্যক্তি কোথায় পাই বল? একটা গড়িব?”

কিশোরী বলিল, “লোকে যদি—”

নিনা বলিল, “লোক কোথায়? প্রতিবেশীর মধ্যে কতকগুলি চমরী হাংগে, আর নীল গাই—তা, এই অর্দ্ধরাত্রে, পংকুংসার উপকরণ খুঁজিতে তারা বাহির হইবে না—ঐ উপত্যকা মধ্যে নিজ নিজ গল্পের আরামে নিদ্রা যাইতেছে। তুমি বড় তর্কবাগীশ হইয়াছ। তর্ক কাল করও, আজ এখন ঘুমাও। আমি ঐ ঘরে গিয়া শুইতেছি।”—বলিয়া নিনা, গুচাপ্রাপ্ত হইতে কাঠাধার হইতে ধানকতক কয়ল বাহির করিয়া, অপর কক্ষে প্রবেশ করিল। তথায় নিজ শয্যা রচনা করিয়া, গুহামধ্য করিয়া আসিয়া, অস্ত্রাধার হইতে চক্চকে একখানা ছোঁচা এবং একটি বন্দুক বাহির করিয়া বন্দুকটি ভরিতে লাগিল। কিশোরী তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এত রাত্রে এসব কি হইতেছে?”

নিনা বলিল, “আমার বিছানার নিচে থাকিবে। এ কাছে না থাকিলে আমার ঘুম হয় না। অনেক

দিনের অভ্যাস বে।”—বন্দুক ভরা হইলে অস্ত্র দুইটি ও-ঘরে রাখিয়া নিনা আবার ফিরিয়া আসিল। প্রদীপের পলিতার আবশ্রুক মত সংস্কার করিয়া, একটি বাশের চোঙা হইতে তেল ঢালিয়া দিয়া বলিল, “সমস্ত রাত এই আলো এখানে জ্বলিবে। যদি আবার শরীর অসুখ বোধ কর, কিংবা কোনও জিনিষের তোমার আবশ্রুক হয়, তখনই আমার ডাকিতে যেন দ্বিধা করিও না। আর একটি কথা। আমার এই শরনগুহা মধ্যেও একটি রহ আছে—তাহা তোমার দেখাই নাই। এই দেখ।”—বলিয়া নিনা সরিয়া গিয়া, তিত্তিগাত্রেয় এক অংশ হইতে, পতলোম-রচিত একটি পর্দা তুলিয়া ধরিল। কিশোরী সবিস্ময় দেখিল, সেই কৃষ্ণ পর্দাণে একটি কুলুঙ্গি খোদিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে, প্রায় দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ খেত প্রস্তরনির্মিত একটি ধ্যানীমূর্ত্তি।

নিনা সেই স্থানের নিম্নে, হাঁটু গাঃয়া বসিয়া, সেই মূর্ত্তির পানে নিজ ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, করবোধে, কিশোরীর দুর্ল্লেখ্য ভাষায়, কি মন্ত্র অথবা স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা কিশোরী বুঝিল না। অল্পক্ষণেই তাহা শেষ হইল; নিনা দেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিল। প্রণামান্তে উঠিয়া, কিশোরীর নিঃট আসিয়া বলিল, “প্রভুর আচ্ছাদনখানি আজ আমি খুলিয়া রাখিলাম। আমি উঁহার নিকট তিত্তি মাগিয়াছি—আজ সারা রাত্তি তিনি তাঁহার সর্বভরহাটী দৃষ্টি তোমার প্রতি স্থাপিত রাখিবেন; দেবকি দানব, যক্ষ কি কিম্বর, ভূত কি মাহুয কেহই তোমার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। মাতৃবক্ষ শিশু যেমন নিদ্রা যায়, তগবান তথাগতের প্রসন্ন দৃষ্টিতে তুমিও তেমনি নিঃসঙ্কোচে নিদ্রা যাও। আমি এক্ষণে তোমার গুতরাজি জ্ঞাপন করিতেছি।”—বলিয়া সে অপর কক্ষমধ্যে অদৃষ্ট হইল।

কিশোরী, সেই বুদ্ধমূর্ত্তির পানে কিংকণ অনিমেষ নয়নে চাক্ষুঃ থাকিয়া, করপুটে তাঁতাকে প্রণাম করিয়া, কয়ল হুড়ি দিয়া নিজের চেষ্টা করিতে লাগিল।

ক্রমঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কাশীতে সরস্বতীপূজা

(বারানসী বিশ্বনাথ লাইব্রেরীর সারস্বত সন্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ)

শ্রীপকমী—১৩৩০, মাঘ।

কলিকাতা ছাড়িয়া যখন কাশী আসি তখন আর যাই কিছু মনে থাকে, নেশার কথাটা যে মনে ছিল না, এ কথা নিশ্চিত। যে দ্বারে পড়িয়া সে দিন বাংলা-মায়ের কাছে বিদায় নিয়াছিলাম, সে কথা তুলিয়া বাকুবজানকে আজ বেদনা দিব না, তবে সঙ্গে সঙ্গে তীর্থদর্শন বা স্বাস্থ্যলাভের গোঁড়ও যে কিছু মাত্র ছিল না, সত্যের খাতিরে সে কথাও বলিতে পারিব না। আসল কথা যাহা সেদিন মনের মধ্যে জাগিতেছিল, তাহা বারানসীর বিশ্বেশ্বর বা বিশ্বেশ্বরের বারানসী। শিবের সঙ্গে শান্তির সম্বন্ধ—সেই শান্তিই সেদিন এ দুর্ভাগ্যের পক্ষ কামা ছিল।

আসিয়া দেখিলাম, বিশ্বনাথ বৃগযুগান্তর ধরিয়া যেমন, তেমনি বিরাজমান। সর্বভূতসাক্ষী মহামহেশ্বর আগুঠোব দেশদেশান্তর-মিলিত তীর্থগত ভক্তের ভক্তির অর্থ্য তেমনি নিঃশেষই গ্রহণ করিতেছেন; পূর্বকীরে অটাবিহারিণী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মন্টাকিনী উত্তরবাহিনী রূপে নিখিল জনের দেহমনের তাপ-ক্লান্তি-মালিন্য ন্যশে চকল চরণে চিরব্যস্ত—অমৃতোপম ক্ষীরনীর পরিবেষণে মুক্তহস্ত। অরপূর্ণা তাঁহার অঙ্গের খালি বহিয়া মোক্ষ বৃত্তকুর ক্ষুদ্রবৃত্তিতৎপর।

কিন্তু মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা যে অস্ত নাই; অরপূর্ণার পরমায়োও তাঁহার সকল ক্ষুধা যেটে না। শঙ্করমৌলিনিবাসিনী অমৃতনঃস্রাবিনী মন্টাকিনীও বুদ্ধি তাঁহার নিখিল তৃষ্ণাহরণে অসমর্থ—মনের পেট তার এমনি বড়, আর এমনি বিচিত্র। আদি কেশব হইতে আরম্ভ করিয়া নরনারায়ণেশ্বর পর্য্যন্ত কত-না দেবতার চরণধূলা মাখার তুলিয়া লইলাম; বিশ্বেশ্বর

হইতে কেদাৰেশ্বর পর্য্যন্ত কত-না বিগ্রহেরই পাদে দধি পান করিলাম, কত দুর্গাবাড়ীর দুর্গা, কত মণিকর্ণকার আনন্দময়ীর মহাপ্রসাদই না গ্রহণ করিলাম, কিন্তু সরস্বতীর পদ্মবনের মধুমদিরার যে বিষম নেশা বাল্যকাল হইতে আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল, সেট নেশাটা মাঝে মাঝে চিন্তকে এমনি উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিত যে, এই শান্তিময় শিবপুরীতে মনটা থাকিয়া থাকিয়া তারি অশান্ত হইয়া উঠিত।

তিনিরাছি, বাদুশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধিভবতি তাদৃশী— তাই সেদিন যখন সন্ধ্যার পর গঙ্গাতীর হইতে দশাখ-মেধের পথে ঘরে ফিরিতেছি, সহসা দেখি, সেই চরাত্যস্ত নেশাটারই আধোজন লইয়া কয়েকটি দেশীয় বন্ধু তাঁহাদের রসের দোকানে পিপাসার্ত্তকে আহ্বান করিতেছেন। নেশাখোরকে নেশার আমন্ত্রণ—আর দেখে কে? নিমেষের মধ্যে দলে ভিড়িয়া পড়িলাম। তার পর বাঁধা বাটল, খোধ করি, তার আর সাক্ষ্য আবশ্যক করিবে না। জুদুর প্রবাসী এই অতি ক্ষুদ্র নগণ্য লেখক, আতিথ্যগৌরববলে আজ আপনাদের সম্মুখে যে আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছি, তাহা যেমন অসঙ্গত, সেমনি-বা অশোভন। কিন্তু নেশাখোরের যদি সেই কাণ্ডজ্ঞানই থাকিবে, তবে আর তাঁহাকে নেশা বলিবে কেন? দেশার ঘোরে সকলে মিলিয়া বাহাকে রাজাসন দিয়া ফেলিল, সে যে সভ্যকার রাজাল, তাহা দলের লোকে ত বিশ্বাস করিবেই না, আপনারাও বারা ইচ্ছার অনিচ্ছায় দলে বোগ দিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁরাও বোধ করি মানিয়া লইতে চাহিবেন না। তথ্যস্ত বর্ণিয়া তাই সেও সেই উচ্চাগনে উঠিয়া বসিল, অল্পোষ এড়াইতে পারিল না, কারণ দলের বিনি পাণ্ডা, তিনি

এমনি নাছোড়বান্দা যে বাধা দিতে গেলে হরত-বা
রক্তাক্ত হইয়া বাইত।

আজকার এই পুণ্যময়ী ত্রীপক্ষমৌর্তিবি সাহিত্য-রস-
পিপাসুর বড় আনন্দের দিন—একেবারে মহামহোৎসব।
বিখ্যাতাধা বীণাপাণির বরমন্দিরযাত্রী পথিক বৎসরান্তে
আজ তাঁহার দয়িতবারে সমাগত। সংসারের সকল
সার্থক পথ পরিহার পূর্বক তাহারই যে সুহৃৎপথ পথের
যাত্রিক, সেই হৃৎসর পথ তাহার দীর্ঘ ক্লেশাবসানে
তাঁগণের চিরকাল্য কর্মবান্ধবে আজ অধিষ্ঠিত করিয়া
দিয়াছে। সমুখে আজ যে দিব্যমূর্তি বিরাজিত,
তাঁহারই অমল-চরণ কমলগন্ধে চিত্ত-ভ্রমর তাঁগণের
চির উন্মুখ।

বা কুলেন্দু-ভূষার-হার-ধবলা বা শ্বেত-পদ্মাননা,
বা বীণা বরদণ্ড-মণ্ডিত-ভূজা বা শুভ্র-বস্ত্রাবৃত্তা,
বা ব্রহ্মচূড়শঙ্কর প্রভৃতিভির্দৈবৈঃ সদা বন্দিতা,
—সেই বিখ্যাতাধা বাগ্বেদী তাঁহার হৃৎকল তুচিশান্ত
মূর্তিবোধে ভক্তের আস্থানে আজ প্রাপপ্রতিষ্ঠিত।

‘বে জন গোরাঙ্গ ভজে, সেই আমার প্রাণ রে’—
ভেমনি ‘বেজন সারদা ভজে সেই আমার প্রাণ’—তাই
সেই অসীমতার মায়ের অখল ভক্তজন আজ
পরম্পরকে বন্ধে জড়াইয়া কৃতকৃতার্থ। বৎসরান্তে
মধুমিলন বজ্র এই সারবত সান্মিলন, সাহিত্য-সঙ্গীত-
সরস্বতীর পাদপদ্ম পূজার এই শুভ পুণ্যাহ তাঁগণের
বাণী সাধনার অন্ততম পরম পুরস্কার।

যুগযুগান্তর সংখ্যাধীত জনগণসেবিত মর্ত্তধামের
মধ্যমুহুটমণি মহাপবিত্র এই কান্দী; বিশ্বরাজ বিশ্বেশ্বরের
আনন্দলীলা-নিঃসৃত অনন্ত উদার এই বাগ্বেদী সকল
তীর্থের পরম তীর্থ, তীর্থদায়ঃ প্রকীর্ণিতঃ। সকল
জাতি সম্প্রদায়, সকল ধর্মপথ লোকমত, সকল
সাধনমার্গ ভজনপন্থা, ব্রহ্মাঙ্গীর এই শুভমঙ্গলে এই
পঞ্চপদার চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

কত চতুরানন মরি মরি বাঙত ন তুরা আদি অবসানা,
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাঙত সাগর লহরী সমানা।

ভেমনি কান্দীর এই পুণ্যপুত বন্ধে মর্ত্তধামের

বাহা-কছু শ্রেষ্ঠ বাহা-কছু পবিত্র, বাহা-কছু সৎ ও
বাহা-কছু মহৎ, সাগর লহরী সমান উদিত বুদ্ধিত
হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সীমাসংখ্যা নাই।
কান্দীখণ্ডের দেব দেবতা মুনিঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া
কত ব্যাস ভুলসী, কত বুদ্ধ চৈতন্য, কত ধ্রুব প্রহ্লাদ,
কত ‘দেবোদাস হরিশ্চন্দ্র, কত শঙ্করাচার্য্য প্রকাশানন্দ,
কত অহল্যা ভবানী, কত ভাস্করানন্দ বিবেকানন্দ, কত
রূপজিৎ প্রতাপাদিত্য চৈতন্যসিংহ উঠিয়াছে—ছুটিয়াছে—
টুটিয়াছে,—ন তুরা আদি অবসানা। নিত্যকাল সাক্ষী
মহাকালরূপী মহাদেবই তার একক ভ্রষ্টা। কত বজ্র
কত সমাধি, কত ভগ্নতা কত দান, কত সাধন। কত
জ্ঞান, কত তত্ত্ব কত ধ্যান, এই মগতীর্থের প্রত্যেক
ধূলিকণাকে পবিত্র করিয়া দিয়াছে, সেই পরম পুরুষ
বিশ্বনাথ ব্যতীত, তাহারই বা ইয়ত্তা করিবে
কে?

যেমন ধ্যানের ভেমনি জ্ঞানেরও পরম পীঠ এই
কান্দী। যিনি শিব, তিনিই সরস্বতী। শিবরূপাং
সরস্বতীঃ বৃদ্ধাং বৃহত্তবাহিনীং চিরসত্য শাস্ত্রবাক্য—তাই
জ্ঞান ও তাক্তমার্গের মহামলনভূমি এই বাগ্বেদী
বাগ্বেদীর বৃক্ষবেণী-সঙ্গম। যুগে যুগে কালে কালে
ইহা এমনি নিত্য প্রত্যক্ষ যে ভারতের অখিল জাতি
সম্প্রদায় চিরদিন ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

সনাতন ঈশ্বরধর্মের কথা ছাড়াই দিলেও, এই-
খানেই ত বিশ্বব্যাপ্ত বৌদ্ধধর্মের প্রথম অভ্যুদয়। কান্দীরই
নগরোপকণ্ঠে সারনাথের যুগকাননে জ্ঞানীবুদ্ধের প্রথম
ধর্ম প্রচারকার্য্য সমারম্ভ হইয়াছিল, অসংখ্য স্তূপে স্তূপে
তাঁহার প্রমাণ বিস্তারিত। বাগ্বেদ্যের নির্দিষ্ট পন্থাভ্যাস
অহিংসা মত্রে নিবাহিত হইয়াছিল। আবার এই ধানেই
জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য সেই জীবন-বিশ্রুত বৌদ্ধধর্মের
প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিয়া ‘সোহং শিবোহং’
অষ্টৈতবাদে বিশ্বের বিশ্বর উৎপাদন করিয়াছিলেন।
এইধানেই মহামনীষী প্রকাশানন্দ এফদিন ত্রীকূট
চৈতন্যদেবের দীপ্যলসী পাণ্ডিত্যের নিকট পরাজিত হইয়া
জ্ঞানমার্গ পরিহার পূর্বক তত্ত্বমার্গাধেয়ণে প্রবোধানন্দ

নামে তাঁহারই শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও কতদিনের কথা।

তারপর, অধুনাতনকালের নবধর্ম খ্রিস্টিয়ান হান-মাহাওয়া এইখানেই প্রসারলাভ করিয়াছিল। পরমহংস দেব রামকৃষ্ণের নরনারায়ণরূপী লোক-সেবার্থও এইখানেই বিশেষ করিয়া মহাসার্থকতা লাভে সমর্থ হইরাছে। নব অভ্যুদিত ভারতধর্ম-মহামণ্ডলেরও প্রতিষ্ঠা এই কালীতেই। তাই বলিতেছিলাম, সকল ধর্মমতের সমন্বয় ভূমি এই বারাগনী, তাই বলিতেছিলাম নিখিল ধর্মরাজ্য তোহে জনমি পুনঃ তোহে সংগত সাগর লহরী সমান। তাই বলিতেছিলাম, হে কালী, ন তুয়া আদি অবসান।

আজ যে হিন্দু'বিশ্ববিদ্যালয় এই কালী সীমান্তে সন্ন্যস্তী-সেবাকরে প্রতিষ্ঠিত হইরাছে, হানমাহাওয়া তাহা একদিন জ্ঞানগৌরবভূমি নামেই তাকশিলার শ্রেষ্ঠতর সংস্করণরূপে অখিল-বিশ্বামন্দির যাত্রীর অভিনব তীর্থ হইয়া উঠিবে, একথা আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি।

জাতীয় এই অভ্যুদান-দিনে চিরজ্ঞানগরীমানে পূণ্য-পীঠ এই বারাগনীতে বঙ্গবাসীর এই বাণীপূজা বিশেষ করিয়াই আমাদের আনন্দদান করিতেছে। আজ যাহারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা জানেন, কালীতে বাকালীর সংখ্যা কত অধিক। কি সহরে, কি সহরের বাহিরে হিন্দু'বিশ্ববিদ্যালয়ে—সর্বত্র বঙ্গবাসী আজ প্রসার লাভ করিয়াছে। সকলকে আহ্বান করিয়া বৃত্তকরে আমি আজ তাঁহাদের অমৃতোষ জানাইতেছি, যেন তাঁহারা যাতৃত্যবার চর্চার এই মহা অবসর ফেলিয়া না হারান। কেবলমাত্র সে আমি শুধু নিলেন “আবাদ করলে ফলবে গোরা” এ কথা নিশ্চিত।

যে কালী অখিল দেব দেবতার পূণ্যপীঠ, সেই কালীতে তাঁহাদের বঙ্গ-বাণী-জননী স্নেহোৎসব-বন্দী দিনে দিনে যেন প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠ। সে পূণ্য-মন্দির নির্মাণ যে আপনাদেরই হাতে, এ কথা যেন আপনারা ভুলিয়া না যান। এমন কোন বাণীসেবক

আছেন যিনি তাঁহার চিরকাল্য দেবতার পূণ্যমঞ্চ প্রতি-
ষ্ঠায় প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ-
মুগ্ধ না মানিবেন? এমন কি কেহ আছেন যিনি সেই
শুভচেষ্টাকে জীবনের পথ প্রার্থনীর বলিয়া মনে না
করিবেন? সে দিনও বিশ্বব্রহ্মে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ
আপনাদেরই আহ্বানে এইখানে আসিয়া বঙ্গবাণীর চরণে
তাঁহার অর্ঘ্য দিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতরাজ বাদবেন্দ্র
প্রমথনাথ প্রমথ বাগদেবীর বহু বরপুত্র আ-
নাদেরই আহ্বানে এই কালী-সন্ন্যস্তী সেবার আজ সমাগত;
আপনার তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া আজ কৃতার্থ।
প্রবাসজ্যোতি, বঙ্গসাহিত্য ও অলকা আজ মারের যে
জয় গান গাইতেছে, তাহা যেন তাঁহারই উপযুক্ত হয়
এই প্রার্থনা। আহুন আমরা সকলে মিলিয়া সেই বাণী-
বন্দনার যোগদান করি। আহুন, সেই ত্রিভুবন বরণ্যা
বাগদেবীর পূণ্যপূজার আজ আমরা অগ্রসর হই।
আহুন, সকলে সাম্মিলিত কণ্ঠে সারদাকে ডাকিয়া আজ
বলি—

বারাগনীতে বাণীপূজা

তব নামাঙ্কিত এই পূণ্যাসক্তি পঞ্চমীর দিনে,

তোমারি চরণাঙ্কুশে চেনে'

এসেছি তোমারি দ্বারে, অর্জুণারে, হে বাঘরী বাণি
ধ্বনির নুপুর-পরা ওই তব চরণ হ'খানি,

বহু ভাগ্য মানি;

শিবরূপা সন্ন্যস্তী লহ আজি তব্ধের আরতি
জননি ভারত!

বিশ্বাব্যাপী শক্তি আত্মা তুমি বাণি, প্রণব ওকার,
স্বপ্ননের প্রথম অঙ্কার!

তব সুরে সুর বাঁধি ভ্রাম্যমান স্বর্ঘ্য চন্দ্র তারি
নকশিব তরঙ্গত; সিদ্ধবন্দে তব ছন্দধারি

নাচে আশ্বহারি;

সপ্তস্বরী তব বীণে সপ্তলোক উঠে শিহরিয়া
আনন্দে তরিয়া।

কুলেন্দ্রতুয়ারশম্ম গুণচন্ড্র ৌকর্ষ্যেঃ রাণি,
 মূর্ত্তমাগ্নে টর বীণাপাণি ;
 সিভবাসা শ্রিতঙ্গাসা, স্বৈতশতদল শোভে পায়ে ;
 হাসে পঞ্চমীর শশী, নন্দনের চন্দন ছিটায়ে
 পরিজীর গায়ে ।
 গুঞ্জরে নিখিল বিস্তা! ভঙ্গসম ঘেরি দলে দলে
 পাদপদ্ম তলে ।

সগীতের মধুচ্ছন্দা, জ্ঞানের অমৃত নিঃস্রাবিনী
 প্রণমানি চরণে জননি,
 কি দিবে করিব পূজা, স্বৈতভূজা, কোন ছন্দডোরে,
 কোন্ শব্দ-পুষ্পে গাঁথি কোন মালা পরাইব তোরে
 শিখারে দে মোরে ।
 আঞ্জল্য কাঙাল আমি, প্রসাদ মা পূজাতী সম্মানে
 তব করগানে ।

কাঁদিছে তোমায়ে বেড়ি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী—
 হ'তে চার চরণ কিঙ্কণি ;
 জ্যোতির্ময় নীহারিকা বরকণ্ঠে বরমাণ্য দানে
 যুগ যুগ সুরে মরে শৃঙ্খোপরে স্বেযোগ-সজ্জান
 চাহি' সুখপানে ;
 বিজুহিত স্বর্ধ্যাকর, সেতারের তার রচিবারে
 ফিরে বারে বারে ।

ছন্দের ইঙ্গিতে তব পঞ্চমেতে গাহিল কোকিল,
 কুহবরে ভরির অখিল ;
 মধুগন্ধে মধুমাংস মাতে ওই মন্ম সমীরণে,
 প্রমত্ত মজরীমেলা মেলে অঁাধি মুগ্ধ আশ্রবনে

ধরণী প্রাঙ্গণে ;
 পলাশের কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জ গুঞ্জ অলঙ্কর রেখা
 তব জয়-লেখা ।

বহর খুরিরা গেল, দেখা তব পাই নাই দেবি,
 বড় সাধ ত্রিচরণ সেবি ;
 আজি এই গঙ্গাতীরে শিব-পুরে বহুভাগ্য কলে
 যদি বা মিলিল দেখা, লহ অর্ঘ্য পাদপদ্ম তলে
 নয়নের জলে ।
 যত ভুল, ফুল হয়ে আজি তব ফুটুক চরণে
 বরণে বরণে ।

এস দেবী, এস মাতা, এস বিজ্ঞা, এস মা কল্পনা
 এস বুদ্ধি বিবেক-বসনা ।
 এস মা কল্পণাময়ি, আবাহন করে ভক্তদল,
 ফুটাও এ চিত্তসরে সাধনার স্বৈত শতদল
 পাবজ নির্মল ।
 হে বাণি, তোমার বাণী সন্মাকার মন্ত্র হোক আজি
 কণ্ঠে কণ্ঠে বাজ ।

ফুকারি প্রাণের শম্ম সাধনার যুগ্ম করে ধরি'
 বরি তোমা ত্রিভুবনেধরি !
 পঞ্চযুগে পঞ্চযুগ মন্ত্র যার নিত্য জপ করে
 ত্রিকা যার বেদ বাক, 'বয়ু যারে পূজিছে অস্তরে,
 কোটি কল্প ধরে'—
 প্রণমি তাঁহারি পদে ; বঠাঙ্গের পূর্ণ সেই নতি
 লহ ভগবতি ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

অরুণিমা

কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত। ৭০ নং কলুটোলা স্ট্রীট, ধ্বংসরি প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নন্দী কর্তৃক বৈজ্ঞানিক বুক সমিতি হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেমি ১৩২ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ৬০।

পুস্তকখানি পাঠে আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ছন্দের লঘুগতিতে, ভাব ও ভাবার সৌন্দর্য্যে কবিতাগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 'কিরে পাওয়া' কবিতার শেষাংশ—

পর্য্যবে জমে ওঠে কত না হারাধন,—

কত না হারা গান

হারানো কলতান

হারানো পরিচয়, হারানো সে মিলন।"

— বেশ লাগিল। 'উত্তল বরষণে', 'বর্ষামিলন', 'নারী', 'নবাগতা', 'অজীত ভারত', 'সামর্য্য ও মহাভারত', 'ম', 'পাত্ত ও মাত্রী' প্রভৃতি কবিতাগুলিও খুব ভাল হইয়াছে।

কবি গোবিন্দদাস।

সচিব জীবনী। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। কলিকাতা মণিকাপ্রেসে মুদ্রিত, রংপুর হইতে শ্রীপরেমোহন হালদার কর্তৃক প্রকাশিত। ৩১৩ পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধা মূল্য ২০।

অল্পের সাগ্রহে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি, পড়িতে পড়িতে চোখের জল রাধিতে পারি নাই। দাস কবির দৈন্ত্যভরা, হৃৎকষর জীবনকথা উপভাস অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বাঙালী বাংলার এই উজ্জল রত্নটিকে যে কতখানি উপেক্ষা অনাদর করিয়াছে, তাঁহার প্রাণে কি আঘাত দিয়াছে, তাণ্ডা জানিয়া লজ্জার মাথা হেঁট করিতে হয়। বাংলা সাহিত্যকে আজ আমরা বিশ্বনাথভোর উচ্চ আসনে বসাইয়াছি, অথচ যে সব শিল্পী জগৎরক্তে সে সিংহাসনের বিনিময় লভিয়া তুলিয়াছিলেন, দেশবাসীর উপেক্ষার অস্বাভাব্যে আমাদেরই ঘরে নিত্যন্ত পরের মত তাঁহার মরণকে বরণ করিয়াছেন, একলজ্জ কালিদাস আমরা কেনন করিয়া

মুচিব? গোবিন্দদাস ছিলেন হৃৎকষর কবি, কল্পিয়াই তিনি হৃৎকষে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন; হৃৎকষের কোলেই আত্মজীবন প্রতিপালিত হইয়া তিনি মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। দীর্ঘ জীবনপথে চলিতে চলিতে হৃৎকষ-পীড়িত কবি, অশ্রুপূর্ণ কর্ণে দেশবাসীর ঘারে ঘারে নিজের দুরবস্থার কথা জানাই-
রাছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার চোখের জল মুছিয়া দেয় নাই। তাই বড় হৃৎকষে—অস্বাভাব্যে অর্দ্ধহারা জীবন্ত কবি লিখিয়াছিলেন, "ও তাই বঙ্গবাসী, আমি ম'লে তোমরা আমার চিতার দিবে মঠ?"—কিন্তু তাই বা কৈ? তাঁহার চিতার মঠও উঠে নাই—
তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটা সাধারণ সভাও হয় না! জীবনী লেখককে দাস কবি এক পক্ষে লিখিয়া-
ছিলেন, "ভাত খাইয়া বাঁচিতে পারি না, দুধ মাছ কি করিয়া খাইব? একদিন একটা কবিতা লিখিলে পাঁচদিন মাথা ঘোরে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই আমার এ চরিত্র হইয়াছে। বাতটক, একদিন মরিতে হইবেই, তাহার জন্য চিন্তা কি?" (১৭২ পৃষ্ঠা) কত হৃৎকষে যে তিনি এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। দৈন্ত্য কবির চরিত্রের ত ভিলই, তাহাও কিন্তু চরিত্রের চরম হয় নাই। যে জন্মভূমির বর্ণনার তিনি বলিয়াছিলেন,—

"শত বর্গ কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি,—

অই যে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার,

শত গলা ধ'রে তাই, পুণাতোরা ও চিলাই,

কতঘাট ওর তীরে মল্লিকার্ণব।

তাঁহাতে ভুলব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে—"

সেই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়ের জন্মভূমি হইতে, একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের চেষ্টায় কবি লিখা সত্বে হইয়াছিলেন, কাহার দোষে যে বলিবে?

গোবিন্দ দাস বাংলার কি ছিলেন, বাঙালীর কে ছিলেন, সাহিত্যে তিনি কি দিয়াছেন, বর্তমানে এখনও অনেক রাখেন না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের, মণিকোঠার সাহিত্যপ্রিয় অতিথির দল যে দিন তাহার সম্পত্তি দেখিবে আসিবে, সেদিন আমরা দাস কবির মণি-মাণিক্য গুলি সাগ্রহে সপক্ষে তাহাদের সামনে ধরিয়া দিব।

গোবন্দ দাস আজ নাট, কিন্তু এত সার্ভিস-শিল্পীর প্রতি কি আমাদের কোনও কর্তব্য নাট? মতভেদে স্থিতিপূজা করিয়া আজও কি বস্তুটা মনোবৈষম্য পরিচর দিতে কুণ্ঠিত হইবে? এই জীবনী রচনা করিয়া যেমতাব বঙ্গশাস্ত্রের উপকার করিয়াছেন। মিত্র মহাশয়ের ভূমিকাটিও বেশ উপযোগী হইয়াছে।

দাস কবির প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তির আচার ব্যবহার ও মনোভাবের বর্ণনার জীবনীখানি উপভাসের সেরেও জয়যাত্রী হয়েছেন। কয়েকখানি চবিত্ত পুস্তকের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছে। অর্থগার করিয়া বাহ্যে গল্প উপভাস অনেক পড়িয়া থাকেন, আমরা প্রত্যেক বক্তব্য ভাব্যকে এত বইখানি পড়িবার জন্য সর্বিজ্ঞ অনুরোধ করিতেছি।

মর্শ্ববাণী

কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত কালচাঁদ দালাল প্রণীত।

আমাদের কথা

আজ এই নববসন্তের শুভ প্রভাত, “মানসী ও মর্শ্ববাণী”র নববর্ষে, আমাদের গ্রাহক, পাঠক ও সহকারী লেখকবর্গকে আমাদের অভিবাদন জানাইতেছি।

কাগজের বাজার বখন খুব চড়িয়া গিয়াছিল, তখন আমরা, পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া, পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছু কমাইয়া দিয়াছিলাম। এখন কাগজের বাজার কিছু নামিয়াছে (বর্ষও শুভের পূর্বে বহা দর ছিল, এখনও তাহার প্রায় তিনগুণ আছে)। তাই আমরা এ বর্ষ হইতে এক ফর্মা বাড়াইয়া দিলাম—অর্থাৎ প্রতিমাসে ১০৪ পৃষ্ঠা পরিমাণ রচনা প্রকাশ করিব।

“কৃতি-স্মৃতি” অনেক দিন বন্ধ গিয়াছিল—তৎক্ষণৎ বহু গ্রাহক ও পাঠক আমাদেরিগলিক বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই সংখ্যা হইতে, কৃতিস্মৃতি পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল; এখন ইহা পূর্বের ভার প্রতিমাসেই প্রকাশিত হইবে। “কৃতিস্মৃতি” প্রথম

বীরভূম শাস্ত্রি নিকেতন প্রেসে মুদ্রিত ও শান্তপুর-মহীরা চট্টোপাধ্যায় দালাল কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন .৬ পেন্সি, ৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০।

প্রায় সব কবিতাই ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশ্যে লিখিত বর্ননা, খুব ভাল না হইলেও, চলনসই হইয়াছে।

কবির স্বপ্ন

আলোচনা গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস প্রণীত ও উত্তার দ্বারা পাবনা রজনীকান্ত পাঠশালা হইতে প্রকাশিত। ৩১ পৃষ্ঠা মূল্য ১০।

শেখর বসীজ্ঞাশয়ের “খেয়া” কাব্যের ভাব সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ছোট বইখানি অসংস্কৃত সৌন্দর্য্যে বেশ ভাল হইয়াছে। কাব্যরসপিপাসু-গণ পাঠ তৃপ্ত হইবেন।

“কৃতি।”

ভাগ গ্রাহ্যকারে প্রকাশ তত্ত্ব বহু হইয়াছে। আশা করি উহা বৈশাখ মাসেও মধোই প্রকাশিত হইবে।

চৈত্র সংখ্যায়, অন্ত্যস্ত রচনা মধ্যে, নিম্নলিখিত রচনাগুলি ছাপা হইতেছে—

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, প্রেমচাঁদ রাইচাঁদ স্বলার—“শিবাজী মহারাজের পটঙ্গীক অপবাদ।”

রাই শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বাহার—

“কুটালম্” (সংক্ষেপ ভ্রমণ)

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়—

“সুলাচনার ডায়েরি” (গল্প)

শ্রীযুক্ত শশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়—“প্রঃখের শেষ” (গল্প)

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—

“পোট মাষ্টার” (গল্প) ইত্যাদি

—তা ছাড়া ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনাগুলি ত থাকিবেই। কৃতিস্মৃতিতে চৈত্র দ্বিতী বর্ণনা শেষ হইবে।

কলিকাতা

১৪এ রামতনু বহুর লেন, “মানসী প্রেস” হইতে শ্রীশ্রীভগবত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



নামাশ্রয়।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত জেমস্‌ নীথ মজুমদারের সৌজন্যে।

মানসী

মর্ষবাণী

১৬শ বর্ষ }
১ম খণ্ড }

চৈত্র, ১৩৩০

{ ১ম খণ্ড
{ ২য় সংখ্যা

শিবাজী মহারাজের পটুগীজ অপবাদ

যুরোপীয় লেখকদিগের বিশ্বাস—সাহস, রণকৌশল এবং সামরিক প্রতিভা খেজুরাতরই একচেটিয়া। তাই ক্রমশঃ মধ্যযুগে কখনও কখনও এই সকল গুণ দৃষ্ট হইলে তাঁহারা বিস্মিত হইয়া কারণ নির্ণয়ে যত্নবান হন। এই প্রকার গবেষণার ফলে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হয় তাহা বাস্তবিকই অভিনব ও ‘চমকপ্রদ’ এবং তদুহা সত্যের হিসাবে যতই তুচ্ছ হউক না কেন, কল্পনার চমৎকার্যে বাস্তবিকই অতুলনীয়। শিবাজী সামন্ত অবস্থা হইতে সুবল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া এক বিরাট রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন; তাঁহার প্রত্যাপে সুবল সাম্রাজ্য কম্পিত হইয়াছিল, বিজাপুরের শক্তি চূর্ণ হইয়াছিল, দক্ষিণের ছোট ছোট সামন্ত নরপতিগণ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। শিবাজীর শক্তি বিশেষভাবে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিল যুরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের বনে। তাহারা আঁসিয়াছিল এই কল্পবৃক্ষের দেশে—তাঁহার শাখা নাড়িয়া অজস্র বর্ণ-মুদ্রা ফুড়াইয়া লইবার অভিজ্ঞতা। শিবাজীর উপদ্রবে

তাঁহাদের কেনাবেচা ব্যবসা বাণিজ্যের বড়ই ক্ষতি হইতে লাগিল। সুতরাং ইংরাজ, ডাচ এবং ফরাসী বণিকেরা বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তাঁহাদের অসন্তোষের ছায়া সেকালকার চিঠিপত্রে বিশেষ ভাবে পড়িয়াছিল। যুরোপীয় জাতিদের মধ্যে পটুগীজেরাই বাণিজ্য বাণদেশে সর্বপ্রথম এদেশে আসেন। তাঁহারা সর্বপ্রথম ছলে বলে কৌশলে ভারতের পশ্চিম উপকূলে এক সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন করেন। শিবাজীর অভিযানের সময়ে পটুগীজ শক্তির পতন আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে পটুগীজদিগের সহিত শিবাজীর সেনাপ্রের সামন্ত সংঘর্ষও হইয়াছিল। সেকালের ইংরাজ ও ফরাসী লেখকেরা শিবাজীর কথা তাঁহাদের গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। পটুগীজ ভাষাতেও শিবাজীর সমকালীন জীবনচরিত আছে। গ্রন্থকারের নাম কসমে ডা গার্ডা। তাঁহার নিবাস গোয়ার অন্তর্গত বোরমুগাও, তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল পটুগালের রাজধানী লিসবন নগরে, খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩০ সালে।

শিবাজীর সভাকবি ভূষণ, মনিবের শক্তির আবল্য কীৰ্ত্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, কিংসী অর্থাৎ পটুগীজেরা তাঁতার ভয়ে পর পর কম্পিত হইত। পটুগীজেরাও শিবাজীর শক্তিমত্তা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁতাদের সমস্যা—কৃষ্ণ দেহে এত বল কোথা হইতে আসিল? তাঁহার উত্তর গাড়া দিয়াছেন। তাঁতার মতে শিবাজী জন-সমাজে আদিদশাঘের সেনাপতি শাহজীর কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া পরিচিত হইলেও, তিনি আসলে বাসিন্দা পরিচিত ভ্রমার গ্রামের পটুগীজ জমিদার ডন ম্যানুয়েল ডি মেনিজিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। এই অসম্ভব কথা লইয়া পরবর্তী আর একজন পটুগীজ লেখক আরও মাথা বাঁধিয়াছেন। তিনি বলেন, যেনে'দস পরিবার নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান, তাঁতাদের বংশে বিশ্বাস্যর জন্ম অসম্ভব। মেনিজিসেরা পটুগালের রাজভক্ত প্রজা, তাঁতাদের বংশে বিদ্বেষের জন্ম হইবে কেন? কিন্তু শিবাজী যে সাহস ও বিক্রমের অধিকারী ছিলেন, তাঁতা মেনিজিস বংশেই সম্ভব। শেষোক্ত লেখকও গাড়ার মত সেকালের লোক, সুতরাং তাঁতার ভ্রমণা কল্পনাও না হয় কমা করা গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য বিষয় যে, একালের পটুগীজেরাও গাড়াবাসিন্দার ভায়ে শিবাজীকে তাঁতাদের ঘরের ছেল বলিয়া দাবী করিতেছেন। এ দাবী ইতিহাসের আদালতে প্রমাণ হইলে পটুগীজদের গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

ডাক্তার আরসন ডা কুন্স পটুগীজ-ভারতের লোক হইলেও বোম্বাই নগরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বাবসায়ে চিকিৎসক ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তাঁতার বিশেষ অসুযোগ ছিল। তিনি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার সভ্য ও অগ্রহম সহকারী সভাপতি ছিলেন। এই সভার ভিত্তি তিনি Origin of Bombay নামক এক বিরাট প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করেন। গাড়াব প্রচারিত কুৎসিত কাহিনীর বলে এই গ্রন্থে তিনি শিবাজীকে আপনার 'জাতভাই' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সেকালে কিংবদন্তির ভাষায়

লিখিত কোনও কথাবে শিবাজী মহারাজকে কি গালি দেওয়া হইল, মহারাজের লোকেরা তাহার খোঁজ রাখিত না; কিন্তু একালের ইংরাজী শিক্ষিত মহারাজবাসী রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার সহকারী সভাপতির সঙ্কলিত ইংরাজী গ্রন্থ উপেক্ষা করিতে পারেন না। মহারাজের বিখ্যাত ঐতিহাসিক বিশ্বনাথ কানীনাথ রাজবাড়ে, ডাক্তার জবাব একটু ভীরভাবেই সাতারার সরস্বতী মন্দিরে দিয়া ছিলেন।

তখন কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে, এই বিতণ্ডার এইখানেই শেষ হইবে, ইহার কারণ গাড়া শিবাজী সম্বন্ধে কিরূপ অজ্ঞ ছিলেন তাহা তাঁতার নিজের কথাতাই প্রমাণিত হয়। তিনি শিবাজী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—Dom Manoel de Menezes শিবাজীর পিতা ছিলেন, যদিও তিনি সাধারণ্যে আদিদশাঘের সেনাপতি শাহজীর ছাদশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত (Era senhoria desta Aldea Dom Manoel de Menezes e nao faltou quem dissesse era Sevagi seu filho, Valna a verdade. Mas foy sempre tido pelo menor de dez: filhos de Sagy, Capitao do Idalcao, que morreu de velho, governador dos Reynos de Madure etc.)

সকলেই জানেন ডাক্তারের গাড়া শাহজীর মাত্র ছয়টি পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁতার বিতর্কিত পত্নী তুকাবাইর গর্ভে মাত্র এক পুত্র জন্মিয়াছিল—ডাক্তারের রাজা একোজা বা ব্যাকাজা। তিনিও আবার বয়সে শিবাজী অপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং গাড়ার কথা একেবারেই অসিদ্ধ।

কিন্তু সম্প্রতি গোয়া নিবাসী ক্রোমোজোফিস ফ্রাগোসো নামক আর একজন পটুগীজ ডাক্তার আবার এই অসম্ভব আখ্যায়িকার পুনঃ প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি পটুগীজ ভাষায় শিবাজী সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ গোয়া নগরীতে প্রকাশিত

করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থের নাম "অবদুল খাঁ বিজেরা শিবাজী মহারাজ" (Sivaji Maharaja, vencedor de Abdul Khan!) এই গ্রন্থ তিনি গার্ডার মতের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ডাক্তার ফ্রাগোসোর মতে গার্ডার গ্রন্থে (উদ্ধৃত অংশে) *doze filhos de Sagy* (শাহজাহীর ষাদশ পুত্র) মুদ্রাকর প্রমাদ মাত্র। *Doze* (ষাদশ) এর স্থানে *dois* (দুই) হইবে।

ফ্রাগোসোর পটুগীজ ভাষার লিখিত গ্রন্থ বৃষ্টিপ ভারতে তেমন প্রচাৰিত হয় নাই। কিন্তু গোয়ার অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ্গ পিছুরলেকর মহাশয় একখানি ছোট (পটুগীজ) পুস্তক লিখিয়া ফ্রাগোসোর মত সমাক ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। ফ্রাগোসোর স্মৃতি-গুলি এমন অদ্ভুত যে, তাহার পুনরাবৃত্তি এখানে অনাবশ্যক। এখানে অধ্যাপক পিছুরলেকর গার্ডার সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব।

কাহারও সাক্ষ্য নিঃসন্দেহ গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি কে, কোথায় থাকিতেন, নিঃসন্দেহ লোক কি না, সভ্য নির্ণয়ের চক্ষু, সুবিধা এবং শক্তি তাহার ছিল কি না অসন্দেহান করার আবশ্যক। অধ্যাপক পিছুরলেকর বলেন, এসময় ডা গার্ডা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তাহার পুস্তকের মলাটে তাঁহাকে *natural de Marmugao* (মর্মুগাঁওর অধিবাসী) বলা হইয়াছে। সত্য, কিন্তু এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাহার গ্রন্থ যিনি সম্পাদন করিয়াছেন তিনি উৎসর্গে পত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে গ্রন্থকারের বিষয়ে তিনি কিছুই অগত নছেন; ইহাও গ্রন্থখানি তাহার হস্তগত হইরাছিল। *Bibliotheca Lusitana*

• *Diccionario Bibliographico Portuguez* অনুসারে গ্রন্থকারের অপর নাম *Cosme da Guarda* নহে—ইহা ছদ্মনাম মাত্র। (*O nome de Cosme da Guarda o affectado*) এবং পরলোপিত সুপরিচিত জে, এ. ইসনাইল গ্রাসিয়াগ মনে করিতেন যে গ্রন্থকার খাদৌ ভারতের লোক নহেন, তিনি খাস পটুগাল নিবাসী পটুগীজ হইবেন।

সুতরাং যাহার সম্বন্ধে বাস্তবিক কিছুই জানা যায় নাই, কেবল মুদ্রাকর প্রমাদের দোহাট দিয়া *doze* স্থানে *dois* পাঠান্তর ধরয়া, তাহারই মারফের বলে, মুসলমান ও মারাঠা ঐতিহাসিকদিগের বিকৃত-সাক্ষ্য সম্বন্ধে শিবাজীর জন্য সম্বন্ধে এই কুৎসিত কল্পিনী প্রচাৰের চেষ্টা একশ্রেণীর পটুগীজ লোকের মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছে মাত্র।

পটুগীজ ভাষার ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক মাল মসলা পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। পটুগীজেরা বাঙ্গালার উপকূল বহু উপদ্রব করিয়াছিল, বোম্বাইর উপকূলে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালী ও বোম্বাই নিবাসীর পক্ষে পটুগীজ ভাষা উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ বাঙ্গালী ভাষাতে বহু পটুগীজ শব্দ স্থায়ীভাবে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং কোন কোন পটুগীজ ঐতিহাসিক নিকট চিন্তাবৃত্তির পরিচয় দিলেও, বাঙ্গালী ছাত্রকে মুসলমান যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে চাইলে পারসী ইংরাজী ফারসী ভাষার ত্রাণ, পটুগীজ ভাষাও শিক্ষা করিতে হইবে।

শ্রী ব্রহ্মনাথ সেন।

বেদনার সুর

গৃহে গৃহে আর মনে মনে আজ
এ কি ক্রন্দন উঠিছে আগি'—
কক্ক-দহনে আছাঁড়' দ্বন্দ্ব
সুক কণ্ঠের রসনা মাগি' !
এ কি কলরোল ! মরণ-বিলাপ !
বিশ ছাপিয়া এ কি অ'তলাপ !
কোন জীবনের শত শত পাপ
রচি' মায়াগাল কিসের লাগি' ?

ভীত-দহনে অ'ফুট বাণী
কাতরে চাটিয়া দিবস বাপি'—
কবে তার সুক ভাবার শক্তি
প্রাণের কাদন উঠিবে কাপি' ?
কতদূর আর—কতদূর তার ?
বুক চাপা এ কি মহা হাহাকার,—
যুগনিগড়ের পাখানের তার
চঞ্চল-বাধা উঠিবে 'ছাপি' !

কবে কোন লোকে জানিবে তরুণ
নব জীবনের পরাণ গীতি—
পাখর ছাপিয়া ঝড়ার ধারা
উচ্ছলি' কবে আগিবে নিতি ?
কবে উন্মাদ দলিঃের প্রাণ,
জাগার আলোকে হ'বে লেলিহান,
নিঃশেষে পুড়ি' বাধা অপমান
অত্যাচারের আকুল ভীতি ?

প্রতিদিন তাই এ কি ক্রন্দন
চারিদিক হ'তে ছুটিয়া আসে ?
গন্ধের সম গগনে পবন
চঞ্চল করি' নিয়ত ভাসে !
শেন কাণ পেতে কোন তালে তালে —
বিলাপের শিশু নাচে পালে পালে !
কোন বেদনার সুর চিরকালে,
সঙ্গীত, হাসি সকলই গ্রাসে !
ঐসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

সুলোচনার ডায়েরী

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিরক্তি ।

ঐযুক্ত কুলদাচরণ মিত্র বি, এল,—আট বৎসর
কাল ডেপুটী মেকিষ্টার হওয়ার পর বর্তমান সদরে বদলি
হইয়াছিলেন । এখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল, বত্রিশ
বৎসর । এতদিন, দূর দূর অস্থ বধাজনক স্থানে কার্য্যে

নিযুক্ত থাকার, এবং পত্নী তরুণী থাকার, পত্নীকে বাসার
লইয়া বাইবার সুবিধা হয় নাই । কেবল ছুটিতে ছুটিতে
বাটা আসিয়া, পত্নীপ্রেম অল্প রক্ষিতেন । একদে
বর্তমানে তিন মাস কাল অবস্থতির পর, তিনি একদিন
হঠাৎ হিন্ন করিলেন যে, গৃহীপুত্র গৃহে আর বাস করা
চলে না ; পত্নীপ্রাণের বাটা হইতে সমস্ত গৃহীকে লইয়া
আসা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে ।

কুলদাবাবু বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবাশ্মিতেন পল্লীগ্রামে তাঁহার খুড়াখুড়ীর নিকটে। পুত্রকন্তাহীনা খুড়ী, বধূকে কত্তা নির্বিশেষে ভালবাসিতেন; এবং বিশেষ যত্ন তাহাকে গৃহদুর্গ ও স্বাস্থ্যসেবা শিক্ষা দিতেন; এবং মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে, কালক্রমে সে তাঁহারই মত স্বামী-সোহাগিনী হইবে।

কুলদাবাবু জীকে বাসায় পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়া খুড়াকে পত্র লিখিলেন। খুড়া ভ্রাতৃপুত্রের পত্র পাইয়া, বুদ্ধিমতী গৃহীণীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, বধূকে বর্জ্যমানে পাঠাইয়া দিলেন। এবং বধূমাতার রক্ষণাবেক্ষণ ভক্ত, তাহার সহিত একজন পুরাতন ও বৃদ্ধ দরবান পাঠাইলেন। এই বধূর নাম সুশোচনা। সুশোচনা সুন্দরী, এবং উনবিংশবর্ষীয়া সুবতী।

সুশোচনা বাসায় আসিয়া স্বামীকে গৃহস্থ করিল; শূন্যলাহীন সংসারে সুশৃঙ্খলা আনিল; শত অপব্যয় হইতে স্বামীর অর্থ রক্ষা করিল; ভালবাসায় সমস্ত সংসার পূর্ণ করিয়া দিল; প্রেমকণার স্বামীর কর্ণকূহর সুধাপূর্ণ করিল। এইরূপে বড় সুখেই কয়েক মাস সন্তোষাতি হইল।

তাঁহার পর হঠাৎ একদিন, কি জানি, কি কারণের প্রকোপে কুলদাবাবুর মনে মনে প্রতীতি জন্মিল যে, সুশোচনার সুবিবেচনা অতিশয় কম,—সে কোন কাৰ্যই বুদ্ধিপূর্বক করিতে পারে না; আরও কিছুদিন পরে তিনি বুঝিলেন যে, সে কর্তৃত্বংগরা নচে,—কাৰ্য করিতে হইলে তাঁহার হাত পা যেন জড় হইয়া যায়; আরও কিছুদিন পরে, তিনি স্বেদস্রব করিলেন যে, তাঁহার জীট ঘোটেই প্রেমময়ী নহে,—অজ্ঞানতার কায় তেমন রঞ্জিত, তেমন হাব-ভাব বিলাসময়ী নহে। এইরূপে কুলদাবাবু সুশোচনার নানা দোষ পুঞ্জিয়া বাতির করিলেন; এইরূপে আপন মানসকৃত অশান্তিতে তিনি মহাকাষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

মনের এই মহা অশান্তি লইয়া কুলদাবাবু একদিন প্রান্ত অবসর দেখে কাছারী হইতে বাটী প্রত্যাগমন

করিয়া দেলিলেন যে, হস্ত-পদাদি প্রাকালনের জল যথাস্থানে রক্ষিত হয় নাই; গামছাখানা উঠানের এককোণে আবর্জনা ফেলিয়া স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে; চাকর বেটা কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই; ডাকিয়া বামুন ঠাকুরের কোন সাড়া পাইলেন না; বিতখনও উঠানে বাসন মাজিতে বাস্ত। তাঁহার উপর, ক্রান্ত কুলদাবাবু উপরে উঠিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিয়া, তথায় বিরহিনী গৃহীণীকে, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় প্রেম-উৎফুল্ল নয়নে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার অদৃষ্ট বোধ হইল। তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন যে এই প্রেমহীনা, কণ্ডব্যজ্ঞানশূন্য পত্নীকে লইয়া জীবনে কোনও সুখই লাভ করিতে পারিবেন না। মহা অশান্তিতে তাঁহার স্বপ্ন পূর্ণ হইয়া গেল।

এই বিরক্তি ও অশান্তির ভার বহন করিয়া, তিনি সন্ধ্যা পুনরায় নিয়ন্তলে নামিয়া আসিলেন। তৈজস মার্জ্জনারী পরিচারিকাকে ক্রমশঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি, এরা সব গেল কোথায়?”

কি, ‘এরা সব’ এর অর্থ উপলব্ধি করিয়া কহিল, “না আপনার জন্তে রান্নাবরে জলখাবার গোছাচ্ছেন।”

বাস্তবিকই স্বামীর বাজারের জলখাবার পছন্দ হয় না বলিয়া, এবং তাহা তাঁহার অন্নযোগ্যপ্রাপ্ত উদরের অল্পপযোগী বলিয়া, সুশোচনা সারা দি প্রহর পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার অল্প উপাদেয় জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে স্বামীর গৃহ প্রত্যাগমনের চরণশব্দ তাঁহার সচকিত কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায়, সে সন্ধ্যার রান্নাবরে আসিয়া তাহা স্থানান্তরে সাজ্জত করিতেছিল। স্থানান্তরে সাজ্জত হইয়া বহিঃগত হইয়া, স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া, সে বিস্ময় মুখে জিজ্ঞাসা করিল—“স্বামীকে খুঁজ্ছিলে?”

কুলদাবাবু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “তোমাকে খুঁজিনি। সুখ খোঁবার জল খুঁজ্ছিলাম!”

স্বামীর বিরক্তি তীক্ষ্ণতার ছুরির ভার, সুশোচনার কোমল বক্ষে বিদ্ধ হইল। সে সেই মহা ব্যগ্রতা আপন বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। কেবল কলতরা ঘেঘের

মত মুখখানি মলিন করিয়া কহিল, “মুখ ঘোবার জল উপরে বারান্দার আছে ; তুমি যে বলেছিলে কাল থেকে উপরে জল রেখ।”

কুন্দাবাবুর বিরক্তি তখনও অপনীত হইল না। “কত বয়ে কহিলেন, “কিন্তু মুখ ধুয়ে মুখ মুচব কিসে ? গামছাখানা ত আন্তা’কুঁড়ে লুটপুট খাচ্ছে।”

স্বামীর কষ্টে বাক্যে সুলোচনার মলিন মুখ আরও মলিন হইয়া গেল ; সে স্নান মুখে কহিল, “ও গামছাখানা ছিঁড়ে গেছে তাই কেলে দিয়েছি। নতুন গামছা আনিবে কেচে উপরে মুন ঘোবার যাগোর রেখেছি।”

মাগুনের সভাব এই যে রাগের সময় কথার চারিরা গেলে তাগাতে তাহার রাগের উপশম হয় না। কুন্দাবাবুরও অপ্রসন্নতা সুলোচনার কথার বিদূরিত হইল না। উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি গম্ভীরভাবে পত্রীকে কর্ণকণে শ্রবণ করিলেন, “চাকর বামুন গেল কোথায় ?”

সুলোচনা বিবাদপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, “চাকর তোমার কস্তে তামাক সাজছে ; আর বামুনকে আমি ছ’পয়সার বরফ আনিতে পাঠিয়েছি।”

কুন্দাবাবু জ্বর বুদ্ধিহীনতার দৃক হইয়া বলিলেন, “একটু আগে এগুলো করিয়ে রাখলেই হ’ত।”

সুলোচনা ধীরে ধীরে উত্তর কালে, “তামাকে আগে আগুন দিলে তা পুড়ে যেত ; ছ’পয়সার বরফ আগে আনিলে তা গলে যেত।”

কুন্দাবাবু আর কথা কহিলেন না ;—বোধ হয় কতিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া নতুন গামছাতে মুখ মুছিলেন। সন্ধ্য প্রান্ত পরিপাটি জলখাবার খাইয়া স্নানওল বরফ জল পান করিলেন ; পরে স্নগদী তাপুল চর্ষণ করিতে করিতে ধুপান করিয়া তাহার দোরহমর ধূম উৎসারণ করিলেন। তাহাতে, বোধ হয় তাহার বিরক্তি সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল ; কিন্তু তিনি মুখে সে তাব প্রকাশ করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদায়।

কিছুদিন হইতে এইরূপ প্রায় নিত্যই ঘটিছিল। অতিবিক্ত পরিশ্রম করিয়া, কুন্দাবাবু কর্মস্থান হইতে বাজিতে ‘নতাই’ বিরক্তির ভার বহন করিয়া আনিতেন ; নিত্যই সুলোচনা সে ভারে নিপীড়িত হইয়াও উপায়ের আশারে, স্নানতল পানীয়ে, স্নানবেচনা-সমূহ যত্নে প্রণয়নীয় আদরে প্রিয়তমকে প্রসন্ন করিতে যত্ন করিত। কিন্তু স্বামীর অপ্রসন্নতার সে কখনও তাহার স্নানমুখে হাসি আনিতে পারিত না।

কিন্তু অস্তকার ঘটনার সুলোচনাকে একটু বেশী মাত্রায় ব্যথিত করিল। স্বামী ধূমপানে রত হইলে সে বাহিরে যাইয়া একবার চোখের জল মুছিল। আবার উৎসাহ জ্বলিয়া উঠে উঠে। জলভরা চক্ষে সে একবার ভাবিল যে, স্বামী যদি তাহার প্রত্যেক কায়ে এইরূপ বিরক্ত হন, তাহা হইলে তাহার বাসায় থাকিয়া লাভ কি ? স্বামীকে তুষ্ট করিতে না পারিলে, তাহার ত আর এখানে কোন কাইই নাই। সুলোচনা কথাতা মনোমধ্যে যতই অসন্তোষ করিতে লাগিল, ততই তাহার প্রতীতি জগ্মতে লাগিল যে, স্বামীর মনে শাস্তি আনিবার জন্য, আপাততঃ তাহার সে স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অভাগিনী যাইবে কোথায় ? কথাতা ভাবিতেও সুলোচনার স্নানকোমল কপোলতল অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। সেই অশ্রু-জলে স্নাত হইয়া সে দহর করিল, আর নিজের শত শত ক্রটি হইয়া সে স্বামীকে বিরক্ত করিবে না ; আবার পন্নোত্রায়ের বাটতে যাইয়া, গুড়খাতড়ীর নিকট কার্য শিক্ষা করিয়া, কয়েক মাস পরে আসিয়া দেখিবে সেবার স্বামীকে তুষ্ট করিতে পারে কি না।

সুলোচনা মনে মনে এই সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া লইল। এবং পরদিন কুন্দাবাবুকে আফিস পাঠাইয়া, প্রথমতঃ আত্মসম্মতিবিরহভয়ে কিয়ৎকাল কাঁদিল ; পরে চোখের জল মুছিয়া গুড়খাতড়া ঠাকুরাণীকে পত্র লিখিতে বসিল।

কিন্তু সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। লিখিতে বসিয়া কলম হাতে করিয়া, আবার স্বলোচনার নয়নপ্রাণে বস্ত্রার জ্বর জলপ্রবাহ প্রবাহিত হইল। কেবলই মনে হইতে লাগিল—এ যে তাহারই গৃহ, তাহারই পাতালি সংসার; এ গৃহ এ সংসার সে কিরূপে ত্যাগ করিয়া যাইবে? তিনি যে তাহার স্বামী, তাহার সর্ব্ব, তাহার যত্নের ধন, তাহার সকল আদরের একমাত্র আদর পাত্র; তাহাকে কিরূপে ছাড়িয়া যাইবে?

তথাপি সে বারবার নয়নপ্রাণ মার্জন করিতে করিতে, কোনমতে পত্রখানা লিখিয়া ফেলিল।

বর্দ্ধমান।

আষাঢ়, ১০—

প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন—

শুড়ীনা, এক বছর পরিয়া, এই বিদেশে তোমাদের ক'ছ ছাড়া পড়িয়া রহিয়াছি। তোমরা ত আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবার নামও কর না। কতদিন তোমাদের দেখি নাই। তোমাদের দেখিবার জন্য মন ছটফট করিতেছে। আমাকে শীঘ্র তোমাদের কাছে লইয়া যাইবে; যেন একটুও দেরী না হয়। কাকা মহাশয় ইংগকে পত্র লিখিলেই ইনি পাঠাইবেন। কিন্তু আমার এই পত্রের কথা যেন প্রকাশ করিও না। কাকা মহাশয়কে শীঘ্র পর লিখিতে বসিও। তোমরা কেমন আছ লিখিও। আমরা ভাল আছি। কাকা মহাশয়ের শ্রীচরণে আমার শত কোটী প্রণাম জানাইও। নিবেদন ইতি।

প্রণতা

স্বলোচনা।

স্বলোচনা বহুকষ্টে এই পত্রখানি সমাপ্ত করিয়া, খামের মধ্যে পুরিয়া শিরোনাম লিখিল; এবং বেশ হইতে আগত বুদ্ধ ষড়্রবান দ্বারা ডাকবন্দো পাঠাইয়া দিল। এই পত্রের কথা কাহারও নিবট প্রকাশ করিতে দ্বাবানকে নিষেধ করিল।

ইহার পর স্বলোচনা মনে করিল, সে যেন আপনার চিরনির্ব্বাসন বস্ত্রাজ্ঞা আপনিই প্রচারিত করিয়াছে; সে যেন আপনার ঋণে আপনিই কালকূট মিথাইয়া দিয়াছে; সে যেন আপন দমনায়ী আপনিই প্রজ্ঞালভ করিয়াছে।

সেই পঞ্চাশতাব্দীতে শুড়ীনার হস্তান্ত হইল। তিনি স্বলোচনার পত্রের উল্লেখমাত্র না করিয়া লিখিলেন যে, তাহাদের অনেকদিন তিনি দেখেন নাই; তাহাদের দেখিবার জন্য প্রাণ ছটফট করিতেছে, ইত্যাদি।

আরও দুইদিন পরে, তাহার ইচ্ছিত পাইয়া শুড়া মহাশয় কুলদাবাবুকে আশীর্বাদ পত্র লিখিলেন। তাহাতে আশীর্বাদ ও কুলদাদ প্রণের পর, শুড়া মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে কল্যাণীয়া শ্রীযতী বধূমাঠকে যেন একবার বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। লিখিয়াছেন, “বধূমাঠ নিত্যন্ত বালিকা; অনেক দিন বিদেশে রহিয়াছেন; বাটীতেও তাঁকে দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ হইয়াছেন; অতএব কোনও রকম অমত না করিয়া তাঁকে অবশ্য অবশ্য এ বাটীতে পাঠাইবে; তুমিও একবার ঐ সঙ্গে এ বাটীতে আসিতে পারিলে ভাল হয়; কিন্তু কাগজতিকে যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে এখন হইতে শোক পাঠাইয়া বধূমাঠকে লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিব। আগামী ৬৫ শ্রাবণ শুভদিন আছে; ঐ দিন বেলা দশটার পূর্বে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে।”

কুলদাবাবু গভীরভাবে গুলজাতের পত্রখানি পাঠ করিয়া, উহা স্বলোচনার হস্তে দিয়া পড়িতে বলিলেন। পাঠান্তে স্বলোচনা পত্রখানি কুলদাবাবুকে প্রত্যর্পণ করিলে, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি বল?”

স্বলোচনা সুপ্রখানি জান করিয়া কহিল, “আমি কি বলবো? তোমার যদি কোন অসুবিধা না হয়, তা হলে—”

কুলদাবাবু তাঁহার স্বাভাবিক বিরক্তির স্বরে কহিলেন, “আমার? আমার কি অসুবিধা হবে? তুমি এখানে থাকতেই বা আমার কোন অসুবিধা ভোগ-

করতে না হয়? কাছারী থেকে বাড়ী ফেরবার পর ত নিতাই একটা অশান্তি—নিতাই একটা কিচিমিচি।”

সুলোচনার চোখে জল আসিতেছিল; সে অমিত মানসিক বলে সেই অশ্রু প্রাণে রোপ করিয়া ‘দল’; বিষাদপূর্ণ মুখে গিয়ে গিয়ে কহিল, “তবে এ অশান্তি ভোগ করার চেয়ে, আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।”

কুলদাবাবু কি সুলোচনাকে ভালবাসিতেন না? হাঁ, বাসিতেন বই কি!—তখন সুনীলা, সুন্দরী, শান্তা পত্নীকে না ভালবাসিয়া কি পারিতেন তারা? তবে তাঁহার ভালবাসাটা, ককণ তগাচ্ছাদিত নারিকেল ফলের অশ্রু ও শতের জার, সর্বদা একটা বিরক্তির আ-রণ্যে ঢাকা থাকিত; তাহা বাতীরে কদাচিৎ বিকাশ পাইত; প্রকাশ পাইত কর্কশ, ক্রক অপ্রসন্নতা। এক্ষণে পত্নীর বিষাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তর ককণায় ভরিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার বাক্যের কর্কশতার সহিত তাঁহার মনোভাবের একটুও মিল রহিল না। তিনি পুরুষকেন্দ্রিত ককণতার সহিত কহিলেন, “আমি যে ত দেবী; এ অশান্তি আর সহ্য হয় না। আর কাঁকার বণার অশ্রু হওয়া চলবে না। কিন্তু এই বর্ণাশ্রম, পাড়গা, বঁদ মাগেরিয়া পরে, তখন আমাকেই মুক্তি দেও।”

সুলোচনা জগৎ তেজপূর্ণ বর্ষে কহিল, “সেই বারো বছর বয়সের সময় সেট বাড়ীতে এসেছি, তার পর থেকে এই একটা বছর ছাড়া বরাবরই সেই বাড়ীতে আছি। কৈ কখনও ত মাগেরিয়া হয়নি, আর কাউকেও ত কখনও মুক্ত করে নি।”

কুলদাবাবু গম্ভীরমুখে বলিলেন, “তবে যাও।”

অতঃপর ঠিক হইয়া গেল যে, আপাততঃ তিন মাসের অন্ত সুলোচনা গলীগ্রামের বাটীতে বাইরা বাস করিবে। তাহার পর, তাহাকে পুনরায় বাসার লইয়া আসা হইবে কি না, কুলদাবাবু পুজার ছুটিতে বাড়ী যাইয়া সে বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

নির্দিষ্ট শুভদিনের দুই একদিন পূর্বে, কুলদাবাবু ছুটি পাইবেন না বলিয়া, বাটী হইতে একজন গোমস্তা

ও একজন পরিচারিকা আসিয়া ছিল। সুলোচনা তাহা-দিগের সহিতই বাটী যাইবে। তাহার পুরাতন বিবাসী ও দল লোক; তাহাদের সহিত দুই তিন ঘণ্টার রাত্রা—পত্নীকে পাঠাইতে কুলদাবাবুর কোনও আপত্তি ছিল না।

কুলদাবাবু পত্নীকে পূর্ন হইতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, কাপড় চোপড় কিছু বেশ ভুল না হয়; সব ভাল কাপড় আর গহনা গুছাইয়া লইতে হইবে; আগামী পুজার সময় তাগা পরিবার আবশ্যক হইবে।

ছাই গহনা! ছাই কাপড়! সুলোচনা যে প্রাণাধিক রত্ন, বুদ্ধিমান ধন কেল্লা যাইতেছে, তাহার তুলনার যে রাজত্বাণীরও রত্ন অলঙ্কার ও রাজপরিচ্ছদ পথের ধুলার চেয়ে হেয়। আর, ভাল কাপড়ে বা অলঙ্কারে তাহার আবশ্যক কি? কাটার মনোবিনোদনার্থে সে উহা পরিধান করিবে? সুলোচনা কিছুই লইল না। গহনার বাক্স স্বামীর পোষাকের আলমারীতে তুলিয়া রাখিল; ভাল কাপড়ের বাক্স স্পর্শও করিল না। কেবল যাইবার দিন সকালে দুই চারি খানা মোটা কাপড় একটা ছোট ট্রফের মধ্যে পুরিয়া লইল।

এইরূপ সংক্ষেপে স্বেচ্ছাকৃত নির্দোষনের অয়োজন সমাধা করিয়া সুলোচনা স্বামীর নিকট বিদায় লইতে আসিল। অতি বিষাদে তাহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত স্নান হইয়া গিয়াছিল; সে স্বামীকে প্রণাম করিতে বাইরা উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগে কোন ক্রমে সংবরণ করিতে পারিল না; স্বামীর চরণপ্রান্তে অশ্রুপ্রাবিত করিল।

কুলদাবাবু পত্নীর স্নান মুখ দেখিলেন, সেই অশ্রু-পাত চরণপ্রান্তে উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার মনটা বড়ই করুণ হইয়া উঠিল। একবার মনে করিলেন, তাহাকে বন্ধে উঠাইয়া লইয়া, তাহার অশ্রুপ্রাবিত মুখ উত্তপ্ত চুখনের দ্বারা শুষ্ক করিয়া দেন। কিন্তু তাহা করিলেন না; তাহা হইলে তাঁহার পৌত্র-গর্ব খর্ব হইয়া যাইবে।

হৃদয়-ভারে অতিশয় পীড়িত হইয়া সুলোচনা স্বামীকে কোনও কথা বলিতে পারিল না। বাস্পবেগে তাহার বর্ষ বন্ধ হইয়াছিল। সে কেবল স্বামীর চিরাদৃত

মুখ সজল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল।

সকল উত্তোগই পূৰ্ণ হইতে হইয়া ছিল। এক্ষণে স্বলোচনা, চক্ৰবৰ্ত্তী মুছিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিনী বিজ্ঞা।

পল্লীগামে গিয়া আপনার চির-পরিচিত গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বলোচনা হৃদয়মধ্যে শান্তিলাভ করিল। খুল্লখুল ঠাকুরাণী তখন আহাঃস্বস্তে বিশ্রাম করিতে-ছিলেন; স্বলোচনা বিশ্রামাগারে যাইয়া তাঁহার পদে প্রণতা হইল।

তিনি উত্তীয়া বসিয়া বধূ চিবুক আদরে তুলিয়া ধরিলেন; এবং সেই সরল মুখের ভিতর দিয়া, তাহার বুকের সমস্ত সংবাদই পাইলেন। বলিলেন, “ছি, মা! স্বামী ইহকালের পরকালের পরম গুরু; মেয়েমানুষের পক্ষে দেবতার চেয়ে বেশী; তার সঙ্গে কি ঝগড়া করতে আছে?”

স্বলোচনা কাতর কণ্ঠে কহিল, “ঠিক, আমি ত ঝগড়া করিনি, খুড়ীমা। বরং তিনিই আমার উপর বিরক্ত হইলেন।”

খুড়ী অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “কেন? কুলদা কি পুরুষমানুষ নয়? তুমি কি মেয়ে-মানুষ নও? পুরুষমানুষ কি মেয়েমানুষের উপর বিরক্ত হ’তে পারে? মা, ভগবান মেয়েমানুষদের এমন করে তৈরী করেছেন, যাতে পুরুষমানুষের মত পুরুষ-মানুষ আমাদের উপর কখনই বিরক্ত হ’তে পারে না। তবে আমরা যদি মেয়েমানুষ হ’তে ভুলে যাই, যদি পুরুষের কাষ দেখে পুরুষ হ’তে চাই, তখনই পুরুষ-মানুষরা আমাদের উপর বিরক্ত হয়; আর আমরাও তখন আপনার মনের শান্তি আর স্বথ আপন ইচ্ছার হারাই; তখন ঝগড়া আর কাগা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায়ই থাকে না। কুলদা যাতে বিরক্ত

হয়, তুমি এমন দ্বারা অমেয়েমানুষের মত কাষ। কিছু করেছিলে, তাই সে বিরক্ত হ’য়েছে। তাকে বিরক্ত করে তোমার বাড়ী চলে আসা ভাল হয় নি।”

স্বলোচনা তেমনিই কাতর কণ্ঠে কহিল, “আমি ত চলে আসিনি খুড়ীমা, তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

খুড়ীমা আরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি চলে আসনি? তবে তুমি আমাদের চিঠি লিখতে বলেছিলে কেন?”

খুড়ীমার প্রশ্ন শুনিয়া স্বলোচনার মনে সন্দেহ জন্মিল। ভাবিল, স্বামীকে বিরক্ত করিয়া চলিয়া আসা বোধ হয় তাহার ভাল হয় নাই; বিরক্তির কারণ কি, তাহা আর একটু ভাব করিয়া দেখা তাহার উচিত ছিল। তথাপি যে আপনার মনকে প্রবেশ দিবার জন্ত কহিল, “তিনি ত আমাকে আসতে বাধ্য করেন নি।”

খুড়ীমা হাসিলেন; কহিলেন, “বটে, এটাই তার মস্ত অপরাধ!—তুমি যা’ করতে চেয়েছিলে, তাই, ভাল মানুসটার মত, তোমায় করতে দিয়েছে, বাধ্য করে নি।”

স্বলোচনার বিরহ-কাতর হৃদয়মধ্যে আর সন্দেহ রহিল না যে, তাহার বাতী আসাটা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। সে কীদকীদ স্ববে জিজ্ঞাসা করিল, “এখন আমি কি করবো খুড়ীমা?”

খুড়ীমা কহিলেন, “এখন এখানে যখন এসেছ, তখন এইখানেই দিন দশক থাক। তার পর কিছু আবার তোমাকে সেইখানেই যেতে হ’বে। সেই তোমার যারগা। স্বামীর পায়ে কাছ ছাড়া, সতী সাক্ষীর আর অস্ত্র কোন যারগা নেই। আর সেই যারগাই মা, স্বর্গের চেয়ে বড় যারগা। কেমন করে স্বামীর মন পেতে হয়? আমি এই ক’ দিনে ভাব করে তোমায় শিখিয়ে দেব।”

স্বলোচনা খুল্লখুল ঠাকুরাণীর উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। দুই চারি দিন পরে একদিন খুড়ীর সহিত স্বামী-প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তার, স্বামীর বিরক্ত হইবার কারণ

স্মরণোচনা শুভীকে শুনাইল—“যখন কোনও কারণ পান না, তখন একটা কারণ মন মনে গড়ে নিয়ে বিরক্ত হন।”

শুভীমা কহিলেন, “বাছা, এই ক’দিন তোমার কাছে বা’ শুনলাম তাতে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, কুলদা বিনা কারণে তোমার উপর বিরক্ত হয় নি; তুমি তাকে বিরক্ত করেছ তবে সে বিরক্ত হ’য়েছে।”

স্মরণোচনা বিস্মিত হইয়া কহিল, “আমি তাঁকে বিরক্ত করেছি? আমি ত তাঁর সেবার কোন ক্রটি করিনি।”

শুভীমা কহিলেন, “অমি কি বলছি যে তুমি তার সেবা বা যত্ন করনি? কিন্তু মা, পুরুষমানুষেরা শুধু সেবা যত্ন চায় না। তারা মোহিত হ’তেও চায়; এবং তা’ হ’তে খুব ভালবাসে; তাই ভগবান আমাদের মোহিনী করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বাড়ীতে এসে সে চায় কিছুকণ মোহাচ্ছন্ন হ’য়ে সব ভুলে যেতে; আর তখন তুমি যাও তাকে সেবা আর যত্ন দিতে। কা’য়ই সে বিরক্ত হ’য়ে পড়ে। মেয়েমানুষের সেবাও মর্ষ বটে, কিন্তু মোহিনী বিজ্ঞাটা সব আগে। একথাটা কখনও ভুলে যেও না।”

স্মরণোচনা বিজ্ঞাশা কলি, “তা তিনি যখন কাছারী থেকে ফিরে আসবেন, আমি তখন কেবল মোহিনী সেজে বসে থাকব, আর কোনও কায় করবো না?”

শুভীমা বলিলেন, “বাছা আমি কি তোমাকে কায় করতে বারণ করছি? কায় করবে, খুব কায় করবে, প্রাণপণে কায় করবে; কিন্তু মেয়েমানুষের মোহিনী বিজ্ঞা ভুলে যাবে না। কায় করবে, কিন্তু শরীরে কায়ের কোনও চিহ্ন থাকবে না, আর স্বামীর সমুখে কখনও কায় করবে না। স্বামীর সমুখে কেবল হাসি মুখে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকবে;—যেন কখনও কোন কায় করনি, যেন কোনও কায় করতে পার না, যেন এতটুকু কায় করতে গেলে তোমার কোমল অঙ্গ, বাসি জ্বলের পাপড়ির মত এগিয়ে পড়বে—বুঝেছ?”

স্মরণোচনা হাসিল; বলিল, “বুঝেছি।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহ।

পত্নীর বাটী গমনের পর, কুলদা বাবু একদিন আফিস হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, চ’কর বেটা তখনও ঘুমাইতেছে, বাবুন ঠাকুর রান্নাঘরের দরজার চৌকাঠের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছে, উচ্চিষ্ট তৈজস সকল অমার্জিত অবস্থায় উঠানের বক্ষ-শোভা বর্ধন করিতেছে।

প্রভুকে দেখিয়া বাবুন ঠাকুর গাভ্রোখান করিল না, তদবস্থায় বসিয়া বিজ্ঞাসা করিল, “রাজে কি রান্না হ’বে?”

কুলদা বাবু বাবুন ঠাকুরের অশিঃ ব্যবহারে কিছু কষ্ট হইলেন। কিন্তু সে জন্ত তাহাকে সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। যদি চলিয়া যার—স্মরণোচনা নাই—কে তাঁহাকে রাঁধিয়া দিবে? কেবল বলিলেন, “রাজের কথা পরে হ’বে, এখন জলখাবার নিয়ে এস।”

বাবুন ঠাকুর সেইরূপ বসিয়া অন্নান বদনে কহিল, “কি জল খাবার নিয়ে যাব?”

কুলদা বাবু কহিলেন, “বা তৈরী ক’রে রাখতে বলে গিয়েছিলাম;—লুচি, তরকারী, হালুয়া।”

বাবুন ঠাকুর অকাতর কণ্ঠে কহিল, “তা ত এখনও তৈরী হয়নি।”

কুলদাবাবুর তখন অঠরাগ্নি জলিতেছিল। বাবুন ঠাকুরের উত্তর শুনিয়া তাহার গণ্ডপ্রদেশে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত বসাইয়া দিবার অত্যন্ত বাসনা জন্মিল। কিন্তু তাহা পূর্বোক্ত কারণে করিতে পারিলেন না। রোববহিঃ ও অঠরাগ্নি নিবাইবার জন্ত একটি ঢোক গিলিয়া কহিলেন, “কেন?”

বাবুন ঠাকুর কহিল, “কি করে হ’বে? শুভী, হাতা, কড়া সব যে এখনও সজ্জি রয়েছে। ধি এসে আগে ওগুলো মেজে দিক, তবে ত আমি জলখাবার তৈরী করতে পারব।”

কুলদা বাবু কোন মতে মনের বিরক্তি দমন করিয়া কহিলেন, “ওগুলো চাকরকে দিয়ে মাজিয়ে নাওনি কেন?”

বামুন ঠাকুর কহিল, “তা কি আর না বলেছি, বাবু? কিন্তু সে বলে ও কাঁচ আমার নয়, খয়ের কাঁচ আমি করবো কেন?”

কুলদা বাবু বুঝিলেন, ইহাদের উপর বিরক্ত হইলে উপায় নাই, ইহারা সুলোচনা নয়; ইহারা রাগ করিতে জানে এং তাঁহাকে জয় করিবার জন্য অনায়াসে চাকুরী ত্যাগ করিতে পারে। অতএব তিনি বলিলেন, “আচ্ছা জলখাবার বাজার থেকে কিনে নিয়ে এস।” এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া, উপবিষ্ট পাচকের নিকট গিয়া, তাহার হস্তে প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, “বাও জল খাবার কিনে নিয়ে এস। চার পাঁচ আনার বা গরম গরম পান, তাই কিনে নিয়ে আসবে।”

অতঃপর তিনি উঠে উঠিয়া দেখিলেন যে, শূণ্য কক্ষ সকল, মহাশূণ্যের ভায় পতিত রহিয়াছে; তাহার মধ্য হইতে যেন একটা নীরব হাহাওয়ার উচ্চত হইতেছে। প্রভাত কালের হালকা শব্দ এখনও অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। কক্ষমধ্যে বৃষ্টিজল ঢুকিয়া মেঝের বতকট ভিজিয়া গিয়াছে। তাহাতে একখান ছিন্ন চিঠির টুকরা সকল পতিত হওয়ার, ঐ স্থানটা হাসি-কান্নার ঝীলা অভিনয়ের ভায় বোধ হইতেছে। মুখ ধুইবার স্থানে-খাইয়া দেখিলেন যে, তলের বালতিটা জলশূন্য অবস্থায়, দস্তবিহীন মুখের বিজ্রপের দ্বারি ভায় শোভা পাইতেছে। ঘণ্টাটা মাতালের মত জলপ্রণালীতে গড়াগড়ি দিতেছে। গামছাখানা চোয়ের ভায় কোথায় লুপাইয়া ছ।

কুলদা বাবু মুখ ধুইবার জল দিবার জন্য ভৃত্যকে উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করিলেন। ভৃত্য তখনও ঘুম-ঘরে অচেতন ছিল; সে উত্তর দিল না।

তখন কুঁজার তলে মুখ ধুইয়া হইবেন এই প্রত্যাশায় তিনি কুঁজার নিকট গিয়া দেখিলেন যে, উহা ভাবপ্র

বৈরাগীর ভায়, শূণ্যদেহে, ধূলার গড়াগড়ি দিতেছে। তিনি অন্ত্রোপায় হইয়া সেই অসংস্কৃত বিছানার বাইরা নীংবে বসিয়া, কুঁজার যন্ত্রণা অম্লতব করিতে লাগিলেন। হাত বুলাইয়া দেখিলেন যে মুক্ত বাতায়নের পথে বৃষ্টির ছোট আঁসিয়া শব্দ আর কিয়দংশ ভিজিয়া গিয়াছে। ভিজা অসংস্কৃত বিছানায় বসিয়া শ্রাবণ মাসের দীর্ঘ দিবা অতিবাহিত হইল। সাতটা বাজিয়া গেল। ক্রমে কক্ষকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। তথাপি বামুন ঠাকুর জলখাবার লইয়া ফিঁহিয়া আসিল না। তিনি কাহার উপর বিরক্ত হইবেন? সুলোচনা ত দেখেন নাই;—অনাদরে যে তাহাকে তিনি বিদায় করিয়া দিয়াছেন। বড় ভ্রুখে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

আত্ম ভ্রুখা নিবারণ জন্য তিনি গৃহমধ্যে একটু জল খুঁজিলেন কিন্তু কোথায় এক বিন্দুও দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলেন চাকর ঘুমাইয়া ছিল, কে জল ধরয়া রাখিবে? বামুন ঠাকুর?—জল ধরা ত তাহার কাঁচ নয়।

অবশেষে রাত্রি প্রায় আটটার সময় বামুন ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিল যে, সারা রাত্রিগঞ্জের বাজার খুঁজিয়া, এমন কি বড়বাজার পর্য্যন্ত খুঁজিয়া সে কোথাও কোনও রকম গরম খাদ্যদ্রব্য পাইল না। বামুন ঠাকুরের পর, ভৃত্য তামাকের কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ছঁকাটি কুলদা বাবুর হস্তে দিয়া সংবাদ দিল যে, এতক্ষণ সে ঝিকে ডাকিবার জন্য ঝির বাটীতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার চারখানা লেপ মুড় দিয়া আর আসিয়াছে, সে আসিতে পারিবেন না।

কুলদা বাবু হতনম্র কণ্ঠে, কহিলেন, “কাল আর কোনও ঠিকা ঝিকে ডেকে নিয়ে এস; আপাততঃ ভূঁম আলো গুলো জ্বলে দিয়ে আমাকে এক গেলাস খাবার জল দাও।”

ভৃত্য পার্শ্ববর্তী পুকুরিণী হইতে এক বালস জল আনিয়া তাহারই এক গ্লাস কুলদা বাবুকে দিল; এবং জিজ্ঞাসা করিল, “রাত্রের রায়ার কি হ’বে? রায়ার বাসন ত সব সফলি পড়ে য়েছে।”

কুলদা বাবু গুরুপ্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, “আজকার মত যদি তুমি ছুটির থানা মেজে দাও তাহলে আজ কোনও গাটিকে রান্না হয়। আর রান্না চলে শুধু যে আমার পেট ভাবে তা নয়; তোমরাও খেতে পাবে। একটু কষ্ট স্বীকার করতে পারলে আমাদের আর উপদ্রবী থাকতে হয় না।”

তৃত্য প্রভুর যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিল; এবং কতক বাসন মাজিয়া, রান্নার যোগাড় করিয়া দিল।

তখন কুলদাবাবু বামুন ঠাকুরকে আদেশ করিলেন, “এত রাতে আর কিছু রান্নার যোগাড় কোরো না; কেবল অল্প পটল বুম্‌ডো ভাজ, আর খিচুরী চড়ির দাও। একটু শীগগির শীগগির কর। ভলখাবার খাওয়া হয়নি, ফিদে পেয়েছে।”

তদন্তদ্রাবী বামুন ঠাকুর রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় অল্পক কিছুঁড় ও অল্পদধ ভাজা কুলদা বাবুকে আনিয়া দিল। পেটের আশা নিবারণ জন্ত তিনি তাহা আহার করিয়া, প্রভুরের জল পান করিয়া, বাতায়ের সাঁপ পাণ চর্নিগ করিতে করিতে শ্রমপাম করিলেন।

চার! কুলদা বাবুর জীন্মর শীতল বাতন, পিপাসার বরফ সংযুক্ত পানীয়, সুধার জলখাবার, বর্ষার খেচরান — তুমি কোথায় গেলেন? কুলদা বাবু ভিজা ও অপরিষ্কার বিছানায় শুইয়া তর্ক জাগ্রত অবস্থায় তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

বিরচটা কুলদা বাবুর কি বঠকর হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্ত আমরা কেবল একদিনের ঘটনা বিবৃত করিলাম। এইরূপ গোরই ঘটতেছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পোষ্ট অফিসের খাতা ও ডায়েরী।

পঞ্চদিন জন্মদিবসী ছুটি ছিল। কুলদাবাবু গৃহে বসিয়া অবিচ্ছিন্ন নিষ্কলিতা ভোগ করিতেছিলেন।

কিরূপে দিবসের দীর্ঘ দিবা অতিবাহিত করিবেন, তাহাই কাতর মুখে ভাবিতেছিলেন।

বর্ষাকালে জন্মদিবসী বৃষ্টি হয়, ইহা সন্তানুগের সনাতন নিয়ম। কিন্তু এই ঘোর কলিকালে সকলই উল্টা; তাই এই বর্ষাকালে, এই জন্মদিবসী দিনে, সূর্য্যদেব উত্তম ময়ূরমাণী বর্ষণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

সেই তপ্তরোদ্র দেখিয়া চঠাৎ কুলদাবাবুর মনে সেই দীর্ঘদিবা অতিবাহিত করিবার একটা সুবুদ্ধি জন্মিল। শীতকালের গরম কাপড়গুলিকে হোজে দিয়া, কীট দংশন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি তৃত্যকে সুখনিদ্রা হইতে উঠাইয়া, আলমারীর চাবী খুঁজিয়া, একে একে কাপড়গুলি বাহির করিয়া রোনে দিতে বলিলেন।

কাপড় বাহির করিতে করিতে কুলদাবাবু দেখিলেন যে, স্লোচনার গহনার বাস অলমারীর এক কোণে বস মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। ঐ বাসের একটা ড্রলিকেট (দোয়ারা) চাবি তাঁহার নিকট থাকিত। তিনি চাবির দ্বারা বাস খুলিয়া দেখিলেন যে, অলঙ্কার গুলি সমস্তই বাসের মধ্যে রহিয়াছে;—স্লোচনা তাহার একটিও সঙ্গে হইয়া যায় নাই। অলঙ্কার-প্রিয় অঙ্গনাগণের মধ্যে একজনের অলঙ্কারে এই অবজ্ঞা দেখিয়া কুলদা বাবু অশ্রু হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন যে, সে ভ্রমবশতঃ উহা ফেলিয়া যায় নাই। কারণ তিনি যাইবার পূর্নদিনও উহা লইয়া যাইবার কথা তাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন; আর স্লোচনা তাহার আদেশ ভুলিবার পাজী নহে; এবং ভুল হইলে উহা স্লোচনার বড় কাপড়ের বাসের মধ্যেই থায়া নিয়মে পড়িয়া থাকিত; কুলদা বাবুর পোষাকের আলমারীতে আসিত না। তিনি বুঝিলেন, ইহা ভুল নহে; ইচ্ছা পূর্ব্বক রাখ; ভুল হইলে, পরে বাটা যাইয়া, পত্র লিখিয়া একথা সে তাঁহাকে জানাইত।

কুলদাবাবুর ভাবনা হইল যে, পক্ষী মধ্যে কোথাও কোনও উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ হইলে, বা পূজার সময়, স্লোচনা আপন সুললিত অঙ্গ সাজাইবে কি দিয়া?

সুশোচনার বড় বাজের দোহারি চাষিও কুলদাবাবুর নিকট থাকিত। কোতুহল বশতঃ উহাও তিনি ঐ চাষির দ্বারা খুলিলেন। দেখিলেন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি কাগজ পত্রের নিম্নে, সুশোচনার যাবতীয় পোষাকী কাপড় রহিয়াছে; মূল্যবান কাপড়, জ্যাকেট, ব্লাউজ প্রভৃতি একটিও সে লইয়া যায় নাই। হায় হায়! সে পুত্রার সম্মুখ অথবা নিম্নগোপনকে কি পরিবে? তাহার কি কোনও সখ নাই?

কাপড়গুলি গুছাইয়া তুলিতে কুলদাবাবুর দৃষ্টি সহজেই উপরকার কাগজ পত্রের দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলেন, তাহার মধ্যে দুই খানি খাতা রহিয়াছে, তা ছাড়া একখানি পোষ্ট অফিস সার্ভিস ব্যাণ্ডের খাতা রহিয়াছে। প্রথম খাতাগুলি, কোনও হিসাবপত্রের খাতা মনে করি, প্রথমে ভাল করিয়া দেখিলেন না। ব্যাণ্ডের খাতা খানি খুলিয়া বিস্তৃত লোচনে অবলোকন করিলেন যে, এই এক বৎসরের ভিতর সুশোচনা প্রায় দেড় হাজার টাকা হারাইয়াছে। কেমন করিয়া এত টাকা জমিল, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। যখন তিনি একাকী বাসায় থা কতেন, চারি শত টাকা বেতনের ভিতর হইতে এক পয়সা বাঁচাইতে পারিতেন না; এখন বাসায় লোকবৃদ্ধি হইয়াছিল, তবু এত টাকা বাঁচিল কেমন করিয়া? সুশোচনা বাসায় আসিয়া গৃহিণীর পদ বইবার পর, তিনি আপন খুচরা খরচ জ্ঞাত পক্ষাশ টাকা রাখিয়া, মা'হনার বাকী টাকা সমস্তই সুশোচনার হাতে দিতেন; এবং তাহার কোনও হিসাব কখনও চাচি-তেন না। সেই টাকা হইতে, সুশোচনা স্বতক কতক আসবাব, এবং আবশ্যিক ঔষঙ্গসম্পদ, এবং তাঁহার জন্ত একটি ছোটক অঙ্গুরীয় ও পরিচ্ছদাদিতে হাজার টাকার উপর খরচ করিয়াও, এত টাকা বাঁচাইয়াছে!—করেক দিনের বিরহ যন্ত্রণায় তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, সুশোচনা বাতীত তাঁহার চলিবে না; এক্ষণে পোষ্ট অফিসের খাতা দেখিয়া, তিনি সন্দেহ করিলেন যে, অবজ্ঞানীরা সুশোচনা গৃহবর্ষে তাঁহার অপেক্ষা সুদক্ষ।

পেটক গর্তে, খনিগর্ত লুকাইত মূল্যবান বস্ত্র

কুলদাবাবু আর এক রহস্য লাভ করিলেন।—সেই খাতা দুই খানির মধ্যে এক খানিতে গোয়ালী, দরজী, পোন্ধার, বাড়ীওয়াল প্রভৃতির হিসাব লিখিত ছিল; আর একখানি রহস্যময় রহস্য,—সুশোচনার ডায়েরী; তাহাতে তাহার জন্মনির্দিষ্ট প্রেম, কঠোরজ্ঞান ও সুবিশেষ চিন্তা, মর্মান্বিত জ্ঞান প্রাণিত ছিল। তাহা কখনই নিরামৃত ভাবে লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাই পাঠ করিয়া কুলদাবাবু বুঝিলেন যে, তাঁহার সুশোচনার জ্ঞান পত্নী জগতে হ্রাস!—তখন পতিরতা, বুদ্ধিমত্তা দ্বীপে তিনি অকারণে ক্রোধ দিয়াছেন, অকারণ সেই ইন্দ্রিয় লোচনে জলধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

ডায়েরী ১০০০ সনের ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা সেই উনবিংশ বর্ষীয় যুবতীর কয়েক দিনের গোপন আত্মকাহিনী, আমাদের পাঠক পাঠিকার মনোবিনোদনার্থ, অবিকল উদ্ধৃত করিব।—

১লা বৈশাখ। উনি বলেন যে, দীর্ঘ দুপুর বেলাটা বাড়ীতে একলা কাটান বড় শক্ত কাথ। পত্নীকে এই শক্ত সংস্রা থেকে উদ্ধার করবার জন্তে উনি বোধ হয়, দোকলা যোটাতে রাজি নন। তাই বলেন, ডায়েরী লেখ। এ উপদেশটা অনেক দিন আগে দিয়েছিলেন; তাঁর বোধ হয়, একথা আর মনে নেই,—যে ভুলো! আমি কি শু ভুলি নি;—তাঁর কোন কথা জীবনে কখনও ত ভুলব না; জীবনের পরেও ভুলব কি না সন্দেহ।

২রা বৈশাখ। কাল বহরের প্রথম দিন গিরেছিল। তাই মনে করেছিলাম যে, কাল কাছারী যাবার সময়, আমার মুখে একটা চুম্বো খেয়ে যাবেন। আমি সেই আশায়, তিনি কাছারী যাবার আগে তাঁর কাছে গিরে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু কৈ খেলেন? খেলে, আমারও খাবার সুযোগ হত,—আমার নুতন বহরের জীবন সার্থক হত।—বাক্য রায়ে কিন্তু এর শেষ নিয়েছিলাম।

৩রা বৈশাখ। বাজারের জলখাবার কি ছাই; ওর রোজ তা খেয়ে অস্থল হয়। তাই আজ থেকে ঠিক করেছি, নিজে জলখাবার তৈরী করবো,—খুড়ীমার কাছে ত সব তৈরী করতে শিখেছি। সকালে ছানা

করবার ভক্তে বেশী ছুপ নিরেছি ; বি, মরদা বেশম সব
বাক্যর থেকে আনিরেছি ; কাঠের উননটা ঠিক করে
রেখেছি। আর ডায়েরী লিখে সময় নষ্ট করবো না।
যাই, জলখাবার তৈরী করিগে।

৪ঠা বৈশাখ। রবিবার। উনি বাড়ীতে আছেন।
খাওয়া দাওয়ার পর, বাতাস করতে করতে ঘুমিয়ে
পড়েছেন। আমার এখনও খাওয়া হয় নি।
যাই, তাড়াতাড়ি মাগার এক বটা জল ঢেলে, খেয়ে
নিইগে। তার পর জলখাবার তৈরী করতে হবে।
একটা বেজে গেছে, কখন যে হবে বলতে পারি নে।

৫ই বৈশাখ। কাল থেকে উনি অবল বোধ করেন
নি।

৬ই বৈশাখ। ৩'দিন লেখা হয় নি। ৩'দিন ছু'পর
বেলা একটু অবকাশ ছিল না ; পরে মস্তদের মেজ বো
বেড়াতে এসেছিল, তার উপর জলখাবার তৈরী ছিল।
কাল রসগোলার ২০টা এঁকে গিয়েছিল, আবার নুতন
করে ২০ তৈরী করতে হ'ল ; অনেকটা চিনি নষ্ট হ'ল।
তা'তোক্ত, এ মাসে আমি সাবান আর খোসুগো কিনব
না, তা হ'লেই পুঁথি যাবে।

৮ই বৈশাখ। রান্না খারাপ হ'য়েছিল বলে গুঁর ভাল
খাওয়া হয় নি, তাই আমা'ও আর খাবার ইচ্ছা রইল না।
তারি রাগ হ'য়েছিল। উনি কাছারীতে চলে যা'বার
পর, বামুনটাকে খুব বক'শ্যম। সে রাগে গম্ গম্ করে
চলে গেছে, বোধ হয়, আর আসবে না। না আসে ত
বেশ হয়। কেন, আমি কি এই ক'লনের ভাত তর-
কারী রাঁধতে পারি না ? পুড়ীমা বলতেন, যে মেয়েমানুষ
রাঁধতে পারে না, সে কিছুই করতে পারে না।

৯ই বৈশাখ। কাল আর বামুন আসে নি। আমি
জলখাবার তৈরীর পর রেখেছিলাম। বিকালে হিডের
কচুরী আর রসগোলা ; আর রাত্রে, ভাত, সুগের ডাল,
মাছের কালিরা, একটা ছাঁচড়ার তরকারী, আর আমের
অবল। উনি খুব ভাল করে খেলেন,— দেখে আমার
বড়ই তৃপ্তি হ'ল। কিন্তু সন্ধ্যা বেলাটা গুঁর কাছে না
থাকতে একটু রাগ করলেন।

১০ই বৈশাখ। ক'দিন লিখতে পারি নি। বড়
গরম পড়েছে। ছু'পর বেলাটা রেঁধে বেড়ে একটু ঘুমিয়ে
পড়ি। কিন্তু আনি বেশ আছি। রাঁধুনি এখনও পাওয়া
যায় নি। উনি বলেন, এই গরমে আগুন তাপে রোজ
রোজ রাঁধলে আমার অস্থখ হবে।—স্বামীকে রেখে
তৃপ্তি পূর্বক খাওয়ানতে, মেয়েমানুষের যে কত স্বখ,
তাতে উনি জানেন না। আমাদের জাত, স্বামীকে
ভুট্ট করবার ভক্তে অন্যরাসে আগুনের তিতর যেতে
পারে—আগুন তাপ ত অল্প কথা।

১১ই বৈশাখ। কাল রাঁধতে গিয়ে কাপড়ে একটু
তেল হলুদ লেগে গিয়েছিল। দেখে বচেন, কিগো
কির গায়ে হলুদ, তেল হলুদ মেখেছ কেন ? শুনে আমার
এমনই লজ্জা হ'ল। ছিছি !

১২ই বৈশাখ। কাল মাহিনার সব টাকা আমাকে
দিয়েছিলেন। শু' ভক্তে পঞ্চাশ টাকা, আর সংসার
খরচের ভক্তে গেল মাসের টাকা হাতে বা মজুত ছিল,
তার উপর আরও কিছু রেখে, ছশো টাকা পোষ্ট
অফিস জমা দিলাম। এই রকম করে পাঁচোজার টাকা
জমিয়ে শু'কে দিতে পারলে—কি মজা ! উনি অবাক
হ'য়ে যাবেন।

২০শ বৈশাখ। আজ আবার নুতন বামুন এসেছে।
এ শোকটা রাঁধে এক রকম মন্দ নয়। কিন্তু আমি
রাঁধুনি বামুন রাখতে শু'কে বারণ করেছিলাম। কোনও
মতে শুনলেন না। বলেন, এই গরমে একটা ব্যারাম
করে ফেলবে।—ব্যারাম না হাতী করে ফেলব।

২৬শ বৈশাখ। কাল বিকালে আকিস থেকে এ'ন
একটা ভুজ্জ করলে আবার আমার উপর বিরক্ত
হয়েছিলেন। বড় ছুঁধে মুখটা তার করে ছিগাম।
তাতেও বিরক্ত হয়ে বলছিলেন, কেদো হাঁড়ির মত
মুখ করে আছ কেন ? আমি কি করবো ? উনি
বিরক্ত হ'লে যে কিছুতেই আমার হাসিমুখ থাকে না।
আড়ালে গিয়ে একটু কঁদলাম।

২৯শ বৈশাখ। তিন দিন গুঁর মনটা বেশ ছিল।
আমিও হাসিমুখে কা'ব বর্ষ করতে পেরেছিলাম।

আজ আবার বিরক্ত হ'য়ে আ'ফিস থেকে ফিরেছিলেন। ঘর পরিষ্কার করতে করতে আমার কাগড়ে একটু কাঁচা লেগে গিয়েছিল। তাই দেখে একবারে রেগে আগুন হ'য়ে বলেন ও রকম নোঙরা কাগড় পরে আমাকে জলখাবার দিতে আসতে লজ্জা হল না? কথাটী শুনে আমি আড়ালে গিয়ে কত কার'ই কঁাদলাম।

৩রা বৈশাখ। মনের দুঃখে ক'দিন লেখা হয় নি। লেখবার মত কিছুই ছিল না। আজ তিনি আ'ফিস থেকে ফেরবার সময়, ঘরের ঝুল ঝাড়ছিলাম। ঝুল দেখলে তিনি বিরক্ত হ'ন তাই ঝাড়ছিলাম। তিনি আ'ফিস থেকে অসবার পূর্বে মুখ হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে তাঁর জলখাবার গুছ'র রাখছিলাম। তিনি বাড়ী এসে চাকরের উপর বিরক্ত হলেন। তার পর আমি জলখাবার নিয়ে তাঁহার কাছে যাবামাত্র তিনি আমার মাথার এক গোছা ঝুল দেখে বলেন ঝুল মেখে পেন্সী সেজেছে কেন? যাও পেন্সীর হাতের জলখাবার খেতে চাই নে। আমি সাধা সাধনা করলাম, পায়ে হাতে ধরলাম কিন্তু সেই ঝুলের একটু ছুতো ধরে কোন মতেই খেলেন না।

৪ঠা বৈশাখ। কাল থেকে আজ পর্যন্ত কেঁদেছিলাম। আজ কাছারী ঘাবার সময় আমার ডেকে, কি জানি কি ভেবে হাসিমুখে বলেন, আজ বিকালে সেদিনকার মত কাঁচা আমের চাটনি করো। এই ফরমাইস শুনে আমি বেন আহল'দে গলে গেলাম। তখনই চাকরকে একটা টাকা দিয়ে, ডালভাঙ্গা কাঁচা আম কিনতে পাঠালাম।

৫ই বৈশাখ। কাল কাঁচা আমের চাটনি গুঁর বড় পছন্দ হয়েছিল।

৬ই বৈশাখ। কাল আবার হিণ্ডের কচুরী করেছিলাম। উনি তৃপ্তিপূর্বক সবগুলি খেলেন। আমার জন্তে অল্প দিনকার মত একখানিও ফেলে রাখেন নি। তা না রাখুন, গুঁর তৃপ্তি দেখলেই যে আমার পেট ভরে যায়!

৮ই বৈশাখ। কাল আবার বিরক্ত হয়েছিলেন। কেন

এত বিরক্ত হ'ন? আমি কি করবো? কি করলে উনি প্রশ্রয় দিবেন? হয়ত আমার অনেক দোষ আছে কিন্তু সে দোষটা কি, আমি ত বুঝতে পারি নে! উনি বলে দেন না কেন?

৯ই বৈশাখ। মনে শান্তি ছিল না, তাই এতদিন লিখতেও ইচ্ছা হয় নি। কাল মাহিনা পেয়ে সব টাকা আমাকে দিয়েছিলেন। গত মাসের টাকা সব খরচ হ'য়ে গেছে কি না, একবার আমাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেন নি। কখনই করেন না। এদিকে এত বিশ্বাস, কিন্তু আমার কোনও কায পছন্দ করেন না।

২০শে বৈশাখ। এত বরে সব গুছ'য়ে রাখি, তবু উনি বিরক্ত হন কেন? আমি কি বড় কুৎসিত হয়ে গেছি? কায কর্ম সব ভুলে গেছি?

২৩শে বৈশাখ। বোজ এ অশান্তি আর সহ্য হয় না। সকল কাযে উনই যদি বিরক্ত হ'লেন; তবে আর এখন থেকে লাভ কি?

৩১শে বৈশাখ। মনে এতটুকু শান্তি পাইনে। মেয়েমানুষের জন্ম স্বামীর জন্তেই; সেই স্বামীকে যদি সুখী করতে না পারলাম, তবে বেঁচে লাভ কি? আমার কেবল মনে হয়, গুঁর অশান্তির কালী বুকের রক্ত দিয়ে ধু'র দিই।

৩রা আষাঢ়। সত্যিই কি আমি কায-কর্ম ঠিক মত করতে পারিনি? খুড়ীমা আমার কায শিখিয়ে-ছিলেন; তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হ'লে কাযটা কি রকম জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা যায়।

১৫ই আষাঢ়। কাল ভাতি বিরক্ত হয়ে বাড়ী এসে-ছিলেন; কিন্তু কথার ঠিক মত উত্তর পেয়ে শান্ত হ'য়েছেন।

১৬ই আষাঢ়। উনি কত আর অশান্তি ভোগ করবেন? আমি কত আর কাঁদা? তার চেয়ে কিছু দিন বাড়ী গিয়ে থাকাই ভাল। আবার কিছু দিন খুড়ীমার কাছে কায কর্ম শিখে ফিরে এসে দেখবো, মন যদি পাই।

ডায়েরীতে আর কিছু লিখিত ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিলন ।

কুলদাবাবু ডায়েরীর এই কয়টি পত্র বার বার পাঠ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আবার পত্নী-প্রেম উছলিয়া উঠিল। দীর্ঘ বয়সের শেষে শারদ-শশধর যেন তাঁহার হৃদয়াকাশে পূর্ণিমার কিরণধারা ঢালিয়া দিল।—হায়! যে তাঁহার বিরক্তি অপনয়নের জন্য আপন হৃদয়-রক্ত ঢালিয়া দিতে কাতর নহ, তিনি তাহারই উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন! যে তাঁহার জন্য জবরে অপর প্রেম বহন করিয়াছে, তিনি তাহা সেই সেই হৃদয়ে ব্যাথা দিয়াছেন! তিনি তেলার অপার্থিব রত্ন হারাতে বসিয়াছিলেন। ইহাব প্রতীকার করিতে হইবে। তিনি সন্ধ্যা বাটা বাইরা আদরে তাঁহার স্নানোচনাকে লইয়া আসিবেন; এবং পুনরায় তাহাকে গৃহীণীর সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নিজের অশেষ বিরহক্লেশ নিবারণ করিবেন।

এই স্থির করিয়া, তিনি ম্যাড্রিষ্টের নিকট পরবর্তী শনিবার ও রবিবারের দুটি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ম্যাড্রিষ্ট, বিরহ-কাতর ডেপুটির শুভ-সংকল্পের বিষয় অবগত হইতে না পারিয়া, তাঁহার দুটি মন্তব্য করিলেন না।

অগত্যা, যে শনিবারে তাঁহার বাটা বাইবার—এবং স্নানোচনার চির-ঈশ্বর প্রেম-ধারার অবগাহন করিয়া দারুণ বিরহ-জ্বালা-নিবারণ করিবার ইচ্ছা ছিল, সেই নিদ্রাক্ষণ দিনে, বিরহদগ্ধ হৃদয়ে অতি কষ্টে কুপক অন্ন উদরস্থ করিয়া, কুলদাবাবু কাছারী গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে কোন কাহ্নে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই।—তাঁহার হৃদয়ে যে বিবাদ-অশ্রু সর্বোবর জমিয়া ছিল, তাহাতে কেবলই স্নানোচনার কমল মুখ স্মৃতির উদ্ভিত ছিল।

বেলা পাঁচটার পর, অবসন্ন-শাদনিক্ষেপে তিনি গৃহাভিমুখে করিলেন। সে গৃহীণীহীন গৃহে কিরিতে যেন প্রতি বিক্ষেপে পদযুগল অর্ডাইয়া বাইতেছিল;—যেহ

যেন ছটরা পোরা বাগিশের মত তারি বোধ হইতেছিল। দেহের জড়তা ও তার লইয়া কষ্টে কোনও ক্রমে তিনি বাড়ী পৌঁছলেন

চাকরকে ডাকিবামাত্র তিনি বিব্রিত হইয়া গেলেন, সে আজ ঘুমায় নাই;—জাগ্রত-কণ্ঠে উত্তর দিল, ‘জাছে।’ এই অশ্রুত্যাগিত ব্যাপারে, তিনি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তিনি বাড়ী ঢুকিয়া আরও বিব্রিত হইলেন—গৃহ সকলের, ও গৃহ-সজ্জার শৃঙ্খলা, পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া। ভিতর বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, একজন নূতন ষি, চক্চক মাজা বাগনগুলি গুছাইয়া রাখিতেছে; তাঁহার বিষয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কিন্তু উপরে উঠিবামাত্র, তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের আর সীমা রহিল না।—আনন্দের বস্তার জায়, হস্ত-মুখী স্নানোচনা কক্ষ হইতে বাহিরে বারান্দার আসিয়া দাঁড়াইল; এই কয়েক দিন পল্লীবাসে তাঁহার স্বাস্থ্য ও রূপ যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তাহার উপর তাহার সজ্জারও কিছু পারিপাট্য ছিল। তাহা দেখিয়া, কুলদাবাবু আশ্চর্য হইয়া গেলেন; উচ্ছ্বসিত প্রেম-বেগে তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অতিপ্রায় বুঝিয়া, হাসিয়া, মোহিমৌবিত্তাগর্ভে তাঁহার দিকে কটাক্ষ-পাত করিয়া, স্নানোচনা কহিল, “এস।” এই বলিয়া স্বামীকে আহ্বান করিয়া, তিনি আলিঙ্গন করিবার পূর্বেই, তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া প্রণতা হইল।

কুলদাবাবু মহা আদরে পত্নীকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, এবং তাঁহার অভিনব সৌন্দর্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া কহিলেন,—“তুমি—তুমি—তুমি কোথা থেকে, কেমন করে এলে?”

স্নানোচনা স্বামীর বক্ষে মুখ রাখিয়া, মিত মুখে কহিল, “বাড়ী থেকে, গাড়ী চড়ে এলাম।”

কুলদাবাবু আলিঙ্গন আরও দৃঢ় করিয়া কহিলেন, “হঠাৎ চলে এলে যে?”

স্নানোচনা কহিল, “খুড়ীমা পাঠিয়ে দিলেন। বলেন,

তার বড় কষ্ট হচ্ছে, বাও। তাই এলাম।—সত্যি, তোমার কষ্ট হয়েছিল ?”

কুলদাবাবু কহিলেন, “সত্যিই আমার বড়ই কষ্ট হ’য়েছিল। এত বেশী কষ্ট হ’বে জানে, তোমাকে পাঠাতাম না।”

স্বলোচনা কহিল, “তুমি ত পাঠাও নি। তুমি কেবল বিরক্ত হতে বলে, আমিই তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।—কান্টা আমার ভাল হয়নি; এবারকার মত আমাকে কমা কর।”

কুলদাবাবু বললেন, “তোমাকে আমি কমা করবো, না, তুমি আমাকে কমা করবে ? আগে আমি বুঝতে না পেরে, তোমার উপর বিরক্ত হ’য়েছি। আর কখনও এমন হবে না। আমি তোমাকে এখন চিনেছি।

স্বলোচনা মনে মনে বলিল, “ছাই চিনেছি। খুড়ী-মার মোহিনীবিন্ধ্য সার্থক হ’য়েছে।” প্রকাশে ভিজ্ঞাসা করিল, “কেমন করে চিনলে ?”

কুলদাবাবু ডায়েরী দেখাইয়া তখনই জীর প্রবেশ উত্তর দিবেন বলিয়া, আনিবার ভক্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া বাজ খুলিতে বাইতেছিলেন; কিন্তু স্বলোচনা তাহাতে বাধা দিল। বলিল, “কান্টা নেই এখন আমার সে কথা শুনে। তুমি এখন পোষাক ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে আগে জলখাবার খেতে বস। তার পর ধীরে স্নেহে সে কথা বোলে।”

স্বলোচনা বাটী হইতে সকাল সকাল আহাৰ করিয়া, বেলা দশটার গাড়ীতে রওনানা হইয়াছিল; বেলা দুইটার পূর্বেই বর্ডমানে পৌছিগাছিল। দুইটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত এই তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অল্পান্ত পরিশ্রম করিয়া এবং ব্রাহ্মণ পরিচারক ও পরিচারিকা-

গণকে খাটাইয়া গৃহ ও গৃহসজ্জার সংস্থাপন করিয়াছিল; এবং বাজার হইতে আবশ্যিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া জলখাবা টৈ রান্না করিয়া রাখিয়াছিল।

এক্ষণে কুলদাবাবু প্রায়তমার উপদেশানুযায়ী বস্ত্র পরিবর্তন ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া সেই জলখাবার পরম-শান্তি ও পরিভূষণ সহিত আহাৰ করলেন। পরে বিছানার পত্নীর পশে বসিয়া, সুশাস্তি তাবুণ চক্ষণ করিতে করিতে ধূমপান করতে লাগিলেন। এবং ডায়েরী ও পোষ্টোপসের খাতা বাহির করিয়া, উহা পত্রীর হস্তে দিয়া কহিলেন, “এই দুটি রত্ন হতেই, আমার রত্নকে আমি চিনেছি। তোমার ভিতর যে এত স্নেহ বিবেচনা ও ভালবাসা আছে, তাতে আমি আগে বুঝতে পারি নি, তাই আগে বোকার মত, তোমার উপর কতই বিরক্ত হয়েছি। তুমি সে সব কথা এখন ভুলে যাও।”

স্বামীর মুখে আপন সুখ্যাতি শুনিয়া লজ্জার ও আত্মদোষ স্বলোচনার কপোলদেশ যেন কোকনদ আভার রঞ্জিত হইয়া উঠিল; বলা বাহুল্য যে সেই গণ্ড, স্বামীর পুরস্কার লাভ করিল। সে বুঝল, খুড়ীর নিকট যে মোহিনীবিন্ধ্য লাভ করিয়াছে তাহা সার্থক হইয়াছে। কুলদাবাবু মনে করিলেন, ডায়েরী হইতেও তিন তাঁহার জীর যথার্থ পরিচয় পাইলেন।

বস্তুতঃ খুড়ীর মোহিনীবিন্ধ্য, ডায়েরী অথবা পোষ্টো অফিসের খাতা,—যে কারণেই হউক—স্বলোচনার দীর্ঘ জীবন মধ্যে, কুলদাবাবু তাহার উপর আর কখনও বিরক্ত হন নাই। এবং সে পুত্র কন্যা ও পৌত্র পৌত্রী লইয়া পরম স্নেহে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়াছিল।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বাঁশীর সুর

এ বে গো আকুল প্রাণের ব্যাকুল

শেষের ব্যথার গগন ছার,

বেন এ নীরব প্রাণের গোপন

অপন অশ্রুর আবেশ তার ;

মধুর মধুর বিবশ বিধুর

গোপন সরস মঃমবধুর

অধারে খুজিয়া লুকানো হিমার

পৌরিত-মোহুর পরশ চার ।

সুরের বেন এ আকুল নিবর—

অরে করে পড়ে বরণা তার ;

পাখান কঠিন হৃদয় বাহির

বহিরা এনেছে এসের ধার—

কল কলোলে চলেছে জোয়ার

অমল মধুর পূণ্য-ভোয়ার,

ছলছলি এল মন্ডাকিনীর

নির্মল পুত অধার সার ।

রপিয়া রপিয়া মঞ্জীরধ্বনি

ঝঙ্কারি তোলে হৃদয় মন

কোন বিরহিনী কাঁকণ নিকর্ণে

কম্পিত করে কণ্ঠবন ।

তাই কণকণি কণুগুণ গান

বাহিত লাগি উদাস পরাণ

বাকিত হৃদি ক্রন্দনে তোলে

মৃদু বিলাপের গুঞ্জরণ ।

বুঝি এ রাগিণী মুন্সীনা তুলি

বিশ্ববাসীর বারতা কর,

কি যে ব্যথা লাগে মরমে মরমে

উঠে কোন সুরে অশ্রুর জর ।

কোটি মঃমের গোপন তিরাস

একটি গভীর দীর্ঘ নিশাস

ধোঁয়া রাণীর বক্ষ টুটিয়া

বাহিরিয়া এল কুবনমর ।

শ্রীভক্তিশ্রুধা হার ।

জৈন-সাহিত্যে রাম কথা

ভারতবর্ষে অনেকগুলি রাম-কথা বা রামায়ণ প্রচলিত আছে। আধুনিক নানা ভাষাতে (বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠি ইত্যাদি) কাব্যে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা ছাড়া প্রাচীন সংস্কৃতেই অনেকগুলি আখ্যান আছে। অনেকগুলি পুরাণে এবং মহাভারতে রামকথা সজ্জপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের মূল আখ্যান—রামের বনবাস, সীতাভরণ, রাবণ বধ ইত্যাদি—এক প্রকার হইলেও, বিস্তৃত

বর্ণনাতে যথেষ্ট পভেদ দেখা যায়। আধুনিক ভাষার কবিগণও আপন আপন ইচ্ছা ও ক্রটি মত নানা প্রকার গল্প ও চরিত্র বাড়াইয়াছেন বা কমাইয়াছেন। এই সকল উপাখ্যান মধ্যে বাস্তবিক রামায়ণই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রীতিলাভ করিয়াছে। বাস্তবিক মুনিকে বাংলা কবি কৃত্তিবাস রায়কর নামক [সম্ভবতঃ অনার্য্য] দস্যুর পরিণত অবস্থা বালরা পরিচিত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এ ঐতিহাসিক তথ্য কোথায়

পাইলেন তাঁরা বলেন নাই। বান্দ্রীকি রামের সম-
সাময়িক, সীতা শেষ-জীবন তাঁহার আশ্রমে কাটাইয়া-
ছিলেন, সেই সময়ে সুনি রামায়ণ রচনা করিয়া সীতার
পুত্রদ্বয়কে পান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনিই
সীতাকে সঙ্গে করিয়া রামের সভাতে লইয়া গিয়া-
ছিলেন; অতএব তিনি রামায়ণের আধ্যাত্মের সহিত
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কৃত্তিবাস বান্দ্রীকিকে অনার্য্য
দ্বন্দ্ব্য বলিলেও, তাঁহার অনার্য্যদের প্রতি যুগোক্তি পাঠ
করিলে তাঁহাকে আর্য্যকুলোদ্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার
অনার্য্য বর্ণনা যে সত্য হইতে পারে না তাঁহা পাঠককে
বলিয়া দিতে হয় না। রামায়ণে অনেকগুলি আর্য্য
ও অনার্য্য চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস
রাম আট আনা বিষ্ণু অবতার হইলেও, হনুমান অপেক্ষা
ঔৎকটিকতর চরিত্র একটিও নাই। হনুমান একাধারে
বলবান, বীৰ্য্যবান, সাহসী, বোদ্ধা, সর্কশাস্ত্র-বিশারদ,
বিদ্বান, বুদ্ধিমান, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী ও জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু
সকল গুণরাশির সহিত তিনি শাখামুগ, বিবসন বানর,
গ্নবন্দ্য, শতবোজন লক্ষ দিগ্না সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন;
তাঁহার দীর্ঘ লাঙ্গুল কাপড় জড়াইয়া তৈলানিল করিয়া
রাবণ পোড়াইয়া দিয়াছিল। বান্দ্রীকি-বর্ণিত বানর
কোন্ প্রেয়ীর জীব ঠিক বুঝিতে পারা যায় না; কেননা
ঐ বানর-বংশের রাগা বালীর শ্রোত্রে বৈদ্যক মন্ত্র পাঠ
করা হইয়াছিল, পিণ্ডদান, ব্রাহ্মণ বিদ্যায় কিছুই বাদ
যায় নাই। তাহাদের অস্ত্র রাজা সুগ্রীব, অভিবেকের
সময়ে বহুশূল্য বস্ত্র ও মূল্যবান পাছকা যুগল পরিধান
করিয়াছিলেন, ময়ূজ ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপূত হবি দ্বারা আহুতি
প্রদান করিয়াছিলেন, মহর্ষি-বিহিত শাস্ত্রবিধি অনুসারে
তীর্থসলিল দ্বারা অভিষেক করিয়াছিলেন। তবে,
এ ব্রাহ্মণেরা বানর-কুলোদ্ভব দীর্ঘলাঙ্গুল তট্টাচার্য্য,
অথবা খুঁত চাদর পরিহিত শিখা ও উপবীত শোভিত
মানব, সে কথা লেখা নাই।

রাম ব্রহ্মচার্য্য ধারণ করিয়া বনবাসী, কিন্তু অন্ধ
সীতা। সীতা হরণের পর দণ্ডকারণ্যে ও কিঙ্কর্য্যতে
শারদীয়া পূর্ণিমার বিঘল জ্যোৎস্না দর্শনে রামের সীতা

বিবহ আগয়া উঠিয়াছিল, ও “কাম পীড়িত” হইয়া
ছোট ভাইটির কাছে তিনি অনেক বিলাপ করিয়াছিলেন।
অথচ কিঙ্কর্য্য নগরে বানরী-সুন্দরীদের দর্শন করিলে
পাছে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় সেই ভয়ে নগরে প্রবেশ করেন
নাই। এই রূপ ও যৌবন ভরে গর্জ্জতা, মাণ্য ও ভূষণ দ্বারা
বিভূষিতা বানরী-সুন্দরীরা নৃপুং ও অলঙ্কার পরিভেন,
অতএব কখনই বিবসনা চইতে পারেন না; কিন্তু লাঙ্গুল
ধারিণী কিনা, তাহা কল্পনা-সাপেক্ষ। বানরদের সম্বন্ধে
যুক্তপ্রদেশের এক কবি বলিয়াছেন—“মানস্ ক্যাসে হাথ
পাঠ, মানস্ ক্যাসে কারা। আট মহিনা ক্যা কিয়া
ছগ্নর তি তো ন'ই ছায়া?” অর্থাৎ “হে বানর, তোমার
হাত, পা ও শরীর মানুষদের মত দেখিতেছি, তথাপি
তুমি আট মাসের মধ্যে [চার মাস বর্ষা কালের
আশ্রয়ের জন্ত] এক খানা চালাও ছাইতে পার
নাই?” কিন্তু এই কিঙ্কর্য্যার বানরেরা বড় বড়
কার্য্যকার্য্যময় ক্ষটিক-মণিময় পাচীর পারবেষ্টিত দ্বি-
গিরিগুহারূপ অট্টালিকাতে ও বিদ্য ও বৈদ্যগিরি সমূহ
প্রাসাদে বাস করে। তাহাদের বড় বড় সাজান
তদ্বীর্ণিত-সমাকীর্ণ মধুর ধ্বনি-প্লাবিত প্রেক্ষাগৃহে নানা
পকার পর্য্যক ও ঔৎকটিক আসন [বা লোফা চেয়ার
ইত্যাদি] পাতা। তাহারা সোপার চিত্রিত দৌলার
চড়িখা বেড়ায়।

আবার, ঐ বানরেরা অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া
হপ হপ ক'রয়া লক্ষ দেয়, “কিলকিলা” শব্দ করে,
মধুবনে প্রবেশ করিয়া মধুপান [তাড়ি পান ?] করিয়া
গাছ নষ্ট করে। তাহাদের রাজ-প্রাসাদের অঙ্গদ্বারী
প্রেক্ষাগৃহ লঙ্ঘনকে নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া [সম্ভবতঃ
অঙ্গভ্যাগ করিয়া] রহৎ পর্ব্বত শৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ
শাখায় আরোহণ করে। তাহাদের প্রধানেরা সময়
ক্ষেত্রে গাছ পাখর লইয়া যুদ্ধ করে, তখন নখ ও দশনই
তাহাদের আয়ুধ; তাহারা অস্ত্র অস্ত্র ধারণ করে না
বা করিতে জানে না। আবার, বানরেরা মাংস, স্নি-
শাস্ত্র মতে যে কয়েকটি পক্ষন্থের মাংস বিজ্ঞাতিয়া
খাইতে পারে, তাহার মধ্যে গণ্য নহে, ইহা জানিয়াও

গানের মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অধর্ম-শঙ্কশূন্য হইয়া বাণীকে মারিলেন কেন, তাহার কৈকিরং যে তলব করে। কোন কোন বানর অর্গ্য মানবাপেক্ষা উৎকৃষ্টর শিল্পী, পাঁকা ইঞ্জিনিয়ারে কাব করে, সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধে, আত্মকেন্দ্র অধ্যয়ন করে, ডাক্তারী করে, মন্ত্রিষ করে, রাজনীতির গুহু প্রত্নাবলীর বিচার করে।

—এক কথায় বাস্তবিক বর্ণিত অনার্থ্য চিত্রে ও চরিত্রে মোটে সামঞ্জস্য নাই।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্য ছাড়া, সংস্কৃতে জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের পুস্তক বড় অল্প নহে। অনেকের মত যে জৈন গ্রন্থগুলি বাছিয়া বাদ দিলে সংস্কৃতির গৌরব নষ্ট হইয়া যায়। জৈন সম্প্রদায়ে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে হেমচন্দ্র হারি (হেমচন্দ্রাচার্য্য, হেমাচার্য্য) একজন অধিতার বিদ্বান ছিলেন। তিনি শুজরাটের রাজা কুমার পালের গুরু ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, অংকার, জ্যোতিষ, ইতিহাস, জ্যোতিষ ইত্যাদি সকল বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার মধ্যে অতি অল্পই পাওয়া যায়, অধিক ভাগ নষ্ট চইয়াছে। তাঁহার একখানি গ্রন্থের নাম “ত্রয়টিশলাকা-পুঙ্খ-চরিত্র।” জৈনমতে প্রতি করে ২৪ জন তীর্থঙ্কর, ১২ জন চক্রবর্তী রাজা, ৯ জন বলদেব, ৯ জন বাহুদেব ও ৯ জন প্রতিবাহুদেব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই রূপে প্রতি করে ৬০ জন মণ্ডপুরুষের আবির্ভাব হয়। উপস্থিত করে যে ৬০ জন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবন চরিত এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। তীর্থঙ্কর বা ধর্মহাসক, চক্রবর্তী রাজারা বাহুদেবে বা আচ্ছা বলে সেই ধর্ম প্রচার করেন। বলদেবেরা আপন সময়ে আদর্শ চরিত্র দ্বারা ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করেন। বাহুদেবেরা হিন্দুদের অবতারের মত প্রতিবাহুদেবদের বয়সের প্রেরণ করিয়া ভূতার হরণ করেন। একজন বলদেব, বাহুদেব ও প্রতিবাহুদেব এই সময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

তীর্থঙ্করদের নাম—১ কুব্জ দেব, ২ অভিনন্দন,

৩ সন্তবনাথ, ৪ অভিনন্দন, ৫ সুবর্তিনাথ, ৬ পদ্মগ্রন্থ, ৭ সুপার্বনাথ, ৮, চন্দ্রগ্রন্থ, ৯ সুবিনিনাথ, ১০ শীতলনাথ, ১১ প্রেরাংশনাথ, ১২ বাহুপুত্র, ১৩ বিমলনাথ, ১৪ অনন্তনাথ, ১৫ ধর্মনাথ, ১৬ শান্তিনাথ, ১৭ কুহনাথ, ১৮ অরনাথ, ১৯ মল্লীনাথ, ২০ মুনিমুদ্রত, ২১ নমিনাথ, ২২ নেমিনাথ, ২৩ পার্বনাথ, ও ২৪ মহাবীর স্বামী।

চক্রবর্তী রাজাদের নাম—১ তরুত, ২ সগর, ৩ মধবা, ৪ সনৎ কুমার, ৫ শান্তিনাথ, ৬ কুহনাথ, ৭ অরনাথ, ৮ সুভূম, ৯ মণাপন্ন, ১০ হরিবেশ, ১১ জয় ও ১২ ব্রহ্মদত্ত।

বলদেবদের নাম—১, অচল, ২ বিজয়, ৩ তরু, ৪ সুগ্রন্থ, ৫ সুদর্শন, ৬ আনন্দ, ৭ নন্দন, ৮ রাম, ও ৯ বলভদ্র।

বাহুদেব—১ ত্রিগুট, ২ ত্রিগুট, ৩ স্বরত্ন, ৪ পুরুষোত্তম, ৫ পুরুষসিংহ, ৬ পুরুষপুত্রীক, ৭ দত্ত, ৮ গঙ্গক ও ৯ ত্রিকুট।

প্রতিবাহুদেব—১ অশ্রাব্য, ২ তায়ক, ৩ মেরক, ৪, মাধু, ৫ নিশঙ্ক, ৬ বলিষ্ঠ, ৭ প্রজ্ঞান, ৮ রাবণ, ও ৯ জরাসন্ধ।

ইহার অষ্টম বলভদ্র পদ্ম [অথবা রাম], বাহুদেব নারায়ণ [বা লক্ষ্মণ] ও প্রতিবাহুদেব দশমুখ [বা রাবণ] সমসাময়িক ছিলেন। প্রতিবাহুদেব দশমুখকে নিধন করিবার জন্য লক্ষ্মণ বা নারায়ণের জন্ম হইয়াছিল। পদ্ম বা রাম বাল্যাবধি সংসারে বিরক্ত ছিলেন, তিনি রাজ্যশাসন অপেক্ষা তপস্যা বেশ বিবেচনা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার পিতা দশমুখ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বনে বাইতে সঙ্কল্প করিলেন, তখন রাম রাজ্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তরুতকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তরুত, পিতার সহিত তপস্যা করিতে বাইতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তেওঁর বিজ্ঞানে রাজ্যগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তরুতকে যৌবরাজ্যে অতিবিক্ত করিবার জন্য রাম ১৪ বৎসর বনবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়া বনে প্রবেশ

করিলেন। লক্ষণ ও সীতা তাঁহার সঙ্গে চললেন। ভারত রামকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন, কিন্তু রাম তাঁহাকে বনেই অতিবিক্ত করিলেন। কাষে কাষেই ভারতকে ১৪ বৎসরের জন্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে হইল। ১৪ বৎসর অতীত হইলে রাম লক্ষণকে রাজ্যদান করিয়া স্বয়ং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন।

বাস্তবিকিতে চারি ভাই মধ্যে রামই প্রধান ব্যক্তি—বিক্রম আট আনা অংশ। ব্রহ্মাওপুত্রের অন্তর্গত অথায় রামায়ণ রাম পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। জৈন সাহিত্যে লক্ষণ প্রধান।

জৈন সাহিত্যে ধানর ও রাক্ষস শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু অস্ত্র অর্থে। উত্তর ভারত যেমন আর্ঘ্যদের দেশ, দেশের নাম আর্ঘ্যাবর্ত, সেটরূপ দক্ষিণ ভারত বিভাধর দেশ। লঙ্কাবাসী রাক্ষস ও কিকিদ্ধাবাসী বানরেরা সকলেই বিভাধর। আর্ঘ্যদের যেমন উল্ল ছিলেন, তাহাদেরও সেইরূপ এক ভীমেন্দ্র ছিলেন। তিনি মেঘবাহন নামক এক বিভাধরকে রাক্ষসদ্বীপ ও পাতাল লঙ্কা বাসার্থ দিয়াছিলেন এবং শত্রু হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ত ও শত্রুদের শাসনে রাখিবার জন্ত রাক্ষসবিজ্ঞা নামক এক গুপ্তবিজ্ঞা দান করিয়াছিলেন। মেঘবাহনের বংশধরদের এই গুপ্ত বিজ্ঞা আরম্ভ ছিল; তাঁহার মৃত্যুর সময়ে এই বিভাবলে শত্রুকে নির্দিষ্ট ভাবে দমন করিত বলিয়া লোকে তাহাদের রাক্ষস বলিতে কুপ্তিত হইত না। রাক্ষসদ্বীপবাসী বিভাধরেরা ভীষ হত্যার ঘোর বিরোধী, বীতরাগ ভক্ত শ্রাবক ছিল। অনেক রাক্ষসরাজা, বিশেষতঃ দশমুখ রাবণ, জৈনতীর্থে গমন করিয়া তীর্থঙ্করদের পবিত্র মূর্ত্তি বন্দনা করিয়াছিলেন। অস্ত্র বিভাধর রাজাদের মধ্যে অনেকেই পরিণতাবস্থার দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তপস্তা করিয়াছিলেন। রাবণের সমসাময়িক এক বিভাধর রাজা ব্রহ্মণ্ডের পরামর্শে পশু বলি দিয়া বজ্র করিতেছিলেন। পরম শ্রাবক রাবণের কাছে নারদ মুনি তৎসম্বন্ধে অভিযোগ করিলে, রাবণের আজ্ঞামত পশুবলি রহিত করা হইয়াছিল। এ জৈন রাক্ষসেরা নরনাশক হইতে পারে না।

দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম সমুদ্রতীরের সমান্তরাল যে পর্বত শ্রেণী আছে—আধুনিক পশ্চিম ঘাট—তাঁহাকে জৈন সাহিত্যে গৈতাচ্য পর্বত বলা হইয়াছে। এই পর্বতের সাহুদেশে অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী নগর ও বিভাধর রাজাদের রাজধানী ছিল। এইরূপ এক নগরে—রথমুপুরে—যে রাজা থাকিতেন, তিনিই বিভাধরদের সম্রাট বলিয়া সম্মানিত হইতেন। রথমুপুরকে অনেকটা বিভাধরদের দেশের দিল্লী বলা হাইতে পারে।

একাদশ তীর্থঙ্কর প্রেরাংশ শ্রবুর তীর্থে রাক্ষসদ্বীপের রাজধানী লঙ্কাপুরে মেঘবাহনের বংশধর কীর্তিধবল নামক বিভাধর রাজা ছিলেন। সেই সময়ে বৈতাচ্য পর্বতের সাহুদেশে মেঘপুরে অতীন্দ্র নামক এক বিভাধর রাজা ছিলেন। তাঁহার ঐকর্ষ নামক এক পুত্র ও দেবী নারী এক স্ত্রীকণী কর্তা ছিল। রথমুপুরের তাৎকালীন সম্রাট পুষ্পোত্তর, দেবীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া ঐ কর্তা আপনায় পুত্র পুষ্পোত্তরের জন্ত বাক্সা করিলেন। অতীন্দ্র সূত্র রাজা হইয়াও, সম্রাটের অহুরোধ রক্ষা করিলেন না তিনি পুষ্পোত্তরের প্রায় সমকক্ষ, রাক্ষসদ্বীপের রাজা কীর্তিধবলকে কর্তা দান করিলেন। এই ঘটনাতে রথমুপুর ও মেঘপুর দুই রাজবংশে মনোমালিন্য আরম্ভ হইল। ইহার কিছুকাল পরে পরম শ্রাবক ঐকর্ষ উত্তরভারতে তীর্থভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, ফিরবার সময়ে তিনি রথমুপুরে কয়েকদিবস বিশ্রাম করিতেছিলেন। একদিবস তিনি পুষ্পোত্তর রাজার কর্তা পদ্মাকে বনবিহারকালে দেখিতে পাইলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইলেন। ঐকর্ষ পদ্মাকে লইয়া পলাইলেন। কিন্তু রথমুপুরের সৈন্য, সংখ্যা ও বলে মেঘপুরের অনেক বেশী বলিয়া, তিনি পদ্মাকে লইয়া আপনায় ভগিনীপতি ও বন্ধু কীর্তিধবলের কাছে লঙ্কাপুরে পলাইয়া গেলেন। পুষ্পোত্তর রাজার সেনা তাঁহাকে তাড়া করিয়া লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইলে, কীর্তিধবল তাহাদের অপেক্ষা করিতে বলিলেন ও পুষ্পোত্তরের কাছে হুত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, “আপনি কি অস্ত্র

করিতেছেন ? ভারতের রাজকন্তারা চিরকাল স্বরম্বরা হইয়া থাকে, খটী খটীর মত কেহ তাঁহাদের দান করে না ; কোনও রাজা ঐরূপ দান গ্রহণও করে না। আপনার কস্তা পদ্মও স্বরম্বরা হইয়াছে, তবে আপনি সৈন্ত পাঠাইয়াছেন কেন ?”

এই দুইয়ের সুখে পদ্মও পিতাকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় স্বরম্বরা হইয়াছেন, কেহ তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। পুষ্পোত্তর এই সংবাদ পাইয়া আপনার সৈন্ত অত্যাচার করিলেন ও কস্তার বিবাহের যৌতুক পাঠাইয়া দিলেন।

কীৰ্ত্তিবল আপনার প্রেরণকৃত ও শ্রালককে মেঘপুরে বাইতে দিলেন না। বলিলেন, “আমার বিদ্যুত রাজ্যে বেখানে ইচ্ছা বাস কর।” লঙ্কাপুরের বায়ুকোণে তিন শত বোজন বিদ্যুত অতি রমণীয় বানর দ্বীপ আছে। ঐকিঞ্চ এই দ্বীপে কিঙ্কিরাগিরিশিখরে কিঙ্কিরা নামক এক গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেইখানে ও সাদা নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে কিঙ্কিরা একটি বড় নগর হইল। এই কিঙ্কিরা-শিখরে নানাজাতীর নানা ভদ্রীর বানর থাকিত। বীতরাগ ভক্ত প্রাণক ঐকিঞ্চ নগরের নানা স্থানে এতাদেশের আহারীয় ও পানীয় দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে এক এক বংশের কিঙ্কিরাবাসীরা, নিজ নিজ রথের পতাকা ও গৃহ প্রাচীরে এক এক প্রকার বানরের চিত্র অঙ্কন করিতে লাগিলেন,—ঐ বানর চিত্র দেখিয়া, কে কোন বংশে উৎপন্ন থাকিতে পারা বাইত। অত্র দেশের লোকেরা পূর্বাধি কিঙ্কিরাবাসীকে বানরের পর্বত বলিত, চিত্র অঙ্কনের পর কিঙ্কিরাবাসীকে বানর বলিতে লাগিল।

উপরিউক্ত ঘটনার বহুকাল পরে বিংশ তীর্থকর সুনি স্তম্ভের তীর্থে বানর দ্বীপে ঘনোদধি, রাক্ষসদ্বীপে তুড়িকেশ ও রথহুগুরে অশনিবেগ রাজ্যশাসন করিতেন। অশনিবেগের বিজয় ও বিজয়বেগ নামক দুই মহাবলপর্কিত পুত্র ছিল। এই সময়ে বিভাধরদেব দেশে আদিত্যপুর নগরে মন্দিরবাসী নামক এক সানাত

রাজা ছিলেন। মন্দিরবাসী আপন কস্তা শ্রীমালায় স্বরম্বরে দেশ দেশান্তরের রাজাদের নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীমালা বিজয়কে উপেক্ষা করিয়া, ঘনোদধির জ্যেষ্ঠপুত্র কিঙ্কিরা গলে মাণ্যদান করিলে, বিজয় কিঙ্কিরা কে মুক্তে আহ্বান করিলেন। তুড়িকেশের জ্যেষ্ঠপুত্র সুকেশ আপনার বন্ধু কিঙ্কিরা অণুলে মুক্ত করিতে লাগিলেন ; এই মুক্তে বিজয় নিহত হইলেন, কিঙ্কিরা সহিত শ্রীমালায় বিবাহ হইল। ইতঃপূর্বে দুই বন্ধু তুড়িকেশ ও ঘনোদধি এক সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তপস্তা করিতে বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অশনিবেগ পুত্র-হত্যাকে শাস্তি দিতে রাক্ষসদ্বীপ আক্রমণ করিলেন ; সুকেশ ও কিঙ্কিরা পরাজিত হইয়া উভয়ে পাতাল-লঙ্কাতে পলাইয়া গেলেন। উভয়ের রাজ্য অশনিবেগ অধিকার করিলেন। অশনিবেগ রাক্ষসদ্বীপ শাসন করিতে নির্ধাত নামক এক অহুগতকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু শ্রিয় পুত্রের অকাল নিধনের পর আর সংসারে থাকিতে পারিলেন না, স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বশাল রাজ্য তাঁহার পুত্র সহস্রার শাসন করতে লাগিলেন।

পাতাল লঙ্কাতে নির্কাসনকালে সুকেশের মালী, সুমালী ও মাণ্যবান নামক তিন পরাক্রমশালী পুত্র উৎপন্ন হইল। কিঙ্কিরা শ্রীমালা হইতে আদিত্যরাজা ও স্বকরজা নামক দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। কিঙ্কিরা মধুপর্বতে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সুকেশের পুত্রেরা লঙ্কা আক্রমণ করিয়া নির্ধাতকে বধ করিলেন। মালী রাক্ষসদ্বীপের সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হইলে তিনি কিঙ্কিরা কে কিঙ্কিরা রাজ্য গ্রহণ করিতে অহুরোধ করিলেন। কিঙ্কিরা মধুপর্বতের মত রমণীয় স্থান ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার অহুমতি লইয়া আদিত্যরাজা কিঙ্কিরা রাজ্য গ্রহণ করিলেন।

রথহুগুরের সম্রাট সহস্রাধের পুত্র ইন্দ্র অতি বলশালী ছিলেন। তিনি স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রের অহুকরণে আপনার নামকরণ করিয়াছিলেন। তিনি আপন রাজ্যে

চারিজন দিকপাল, সপ্তসেনা ও সেনাপতি, তিন প্রকার সজা, বজ্র আয়ুধ ও ঐরাবত হস্তী, রত্নাদি বারাননা, বৃহস্পতি উপাধিধারী মন্ত্রী, নৈগমেয়ী নামক পতি-সৈন্যকো-নায়েক [১ হস্তী, ১ রথ ও ৩ অশ্ব ও ৫ পদাতিতে এক পতি] ইত্যাদি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব দিকের দিকপালের উপাধি সোম, দক্ষিণের বম, পশ্চিমের বরুণ ও উত্তরের কুবের রাখিয়াছিলেন।

ইহু অঙ্গুগত সেবক নির্ধাতের প্রতিশোধ লইতে মালীকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। সু-লী ও মাল্যবান আবার রাজ্য চাড়াইয়া পাতাল লঙ্কাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। ইহু 'বশ্রবার পুত্র বৈশ্রমণকে লঙ্কারাজ্য শাসন করিতে নিযুক্ত করিলেন।

পাতাল লঙ্কাতে সুমালীর রত্নপ্রবাহ নামক একপুত্র উৎপন্ন হইল। রত্নপ্রবাহ কৈকসী নাম্নী এক সুন্দরীর সহিত বিবাহ হইল। কৈকসী বৈশ্রবণের মাতা কৌশিকার কনিষ্ঠ ভগিনী। কৈকসীর তিন পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্র দশমুখ রাবণ, দ্বিতীয় ভাস্কর্য বা কুম্ভকর্ণ, পরে কন্যা চন্দ্রনখা বা সূর্যনখা, ও সকলের ছোট বিভীষণ। দশমুখ রাবণ বাল্যাবধি ভৈরবী ও স্বাধীন প্রকৃতি ছিলেন। তিনি প্রথমে বংশগত গুপ্ত ব্রাহ্মণী বিজ্ঞা ও নানা বিজ্ঞা সাধন করিলেন। তিনি যোগ সাধন দ্বারা অমরত্ব লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সকল হইল নাই। দেবতার সন্মুখে হইয়া এই মন্ত্র বর দিরাছিলেন যে, তুমি প্রতি বায়ুদেব, একমাত্র বায়ুদেব ছাড়া আর কেহ তোমাকে মারিতে পারবে না। দশমুখ বৈশ্রমণকে নিহত করিয়া গৈতুক রাজ্য অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি কিছু কাল দ্বৈতমত উদ্দেশ্যে ভরতময় সুররা বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা কালে পর নামক এক বিজ্ঞাধর চন্দ্রনখাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রনখার দুই পুত্র শম্বুক ও সুন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল।

দশমুখ চর্যাবীপ অধিকার করিলে আদিত্যরাজ্য কিঞ্চিদ্বা অধিকার করিলেন। আদিত্যরাজ্য দুই

পুত্র বালী ও সুগ্রীব ও স্বর্গরাজ্য দুই পুত্র নল ও নীল উৎপন্ন হইয়াছিল। আদিত্যরাজ্য তপস্ভা করিতে বনে প্রবেশ করলে, বালী কিঞ্চিদ্বার রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

দশমুখ বালীর বীর্যের সুখ্যাতি সহ্য করিতে না পারিয়া বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন; কিন্তু বশবানু বালী দশমুখকে হুঙ্কিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চারিদিকে সুররা আসিলেন। দশমুখ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন কিন্তু বালী ভাবিতে লাগিলেন, দশমুখের মত বন্ধুও যুদ্ধ করিতে আসিলেন, তাহার একমাত্র কারণধন, বল, রাজ্য-অধিকার ইত্যাদি। অতএব এ কারণকে ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাণ্ড। তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া মুনিসম্মি গ্রহণ করিলেন ও অষ্টাপদ শিখরে [কৈলাসে] স্বাহুর মত তপস্ভা করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিদ্বা রাজ্য সুগ্রীব শাসন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব প্রীতিবদ্ধনের জন্য রাবণের সাহিত আপন ভগিনীর বিবাহ দিলেন।

চন্দ্রনখার পুত্র শম্বুক এক বিজ্ঞা [অথবা চন্দ্রহাস নামক খড়্গ] সাধন উদ্দেশ্যে এক বাণবাড় মধ্যে তপস্ভা করিতেছিল। ঠাণ্ডা সেই বনে লক্ষ্মণ প্রবেশ করিলেন ও চন্দ্রহাস খড়্গ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কেননা শম্বুক লতা পাতার ঢাকা পড়িয়াছিলেন। পরে খড়্গ লইয়া কোপে আঘাত করিতেই শম্বুকের ছিন্ন শির শম্বুখে আসিয়া পড়িল। অজ্ঞানে ও অসাবধানতা বশতঃ জীবচত্যা করিয়া লক্ষ্মণ বড় দুঃখিত হইলেন। এমন সময়ে চন্দ্রনখা পুত্রকে দেখিতে আসিল। চন্দ্রনখা লক্ষ্মণের বীরবপু দেখিয়া কামপীড়িতা হইয়া সোধন করিলে লক্ষ্মণ রামকে দেখাওয়া দিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে চন্দ্রনখা আপনায় স্বামী ধরকে, পুত্রহত্যাকে বধ করিতে পাঠাইল এবং অগ্রজ রাবণকে সীতা হরণ করিতে উত্তোজিত করিল। যখন ধরের সহিত লক্ষ্মণ যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন রাম লক্ষ্মণের কাতর আহ্বান শুনিতে পাইলেন, তিনি সীতাকে একা ছাড়িয়া লক্ষ্মণকে

সাহায্য করিতে গেলেন। এই অবসরে রাবণ সীতাকে ধরন করিলেন। এই যুদ্ধে ধর ও তাহার জ্যোতা দুবণ ও ত্রিশিরা নিহত হইল; চন্দ্রনখার দ্বীপ পুত্র স্তম্ভ লঙ্কাতে পলাইয়া গেল।

রাম কিক্ক্যাপতি রাজা সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। সুগ্রীব প্রীতিজ্ঞা করিলেন, তিনি বেক্ষে সম্ভব সীতাকে উদ্ধার করিবেন। রাবণের মত বলবান প্রাতিষোধীর সহিত যুদ্ধ কারবার পূর্বে একবার তাঁহাকে বুঝাইয়া কার্যোদ্ধার কারবার চেষ্টা করা উচিত বিবেচনা করিলেন। তাহিলেন, এমন এক দূত পাঠাইতে চাইবে যাহার পরমর্শ রাবণ অগ্রাহ্য করিতে সাক্ষ্য না করে। তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, বৈত্যাভ্যাস গিরির সাহুদেশে আদিত্যপুরের (১) রাজা প্রহ্লাদের পুত্র ও পরমেশ্বরের পুত্র হনুমানই ঐক্লপ ব্যক্তি। তিনি যদি স্বীকার করেন, তবেই বিনাযুদ্ধে কার্যোদ্ধার সম্ভব। হনুমানকে ডাকিয়া অমরোহ কহিতে তিনি দৌত্য স্বীকার করিলেন ও অল্প সৈন্য সঙ্গে লইয়া আগনার মাতামহ মহেন্দ্র পর্বতের রাজা মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই পথে লঙ্কা প্রবেশ করিলেন। ইতঃপূর্বে চন্দ্রনখা ও ধরের কস্তা অনঙ্গকুমার সহিত হনুমানের বিবাহ হইয়াছিল। সুগ্রীবের কস্তা পদ্মরাগা ও নলের কস্তা হরিমালিনীও হনুমানের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। অতএব হনুমান এক স্বত্বের অমরোহে অল্প এক মামুষত্বের কাছে সীতা তিচ্ছা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু রাবণ তাঁহার অমরোহ রক্ষা করিলেন না।

চন্দ্রনখা ও ধর পাভাল লঙ্কাতে যেখানে বাস করিত, সে নগরে কিক্ক্যাপতি আদিত্যপুরের এক পুত্র [সুগ্রীবের জ্যোতা] চন্দ্রনখার রাজ্য স্থাপন করিয়া বাস করিতেন। ৭২ চন্দ্রনখাকে বিবাহ করিবার পর চন্দ্রো-

ধরকে যারিরা রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। চন্দ্রোদয়ের বিধবা অমরোহা তখন গর্ভবতী ছিলেন; তিনি গৌপনে বনে বাস করিলেন ও বিবাহ নামক এক পুত্র প্রসব করিলেন। যখন ধর দুবণ ও ত্রিশিরা নিহত হইলেন তখন বিবাহ সৈন্ত সহিত লক্ষ্মণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুন্দর লঙ্কার পল্লবের পর লক্ষ্মণ বিবাহকে পাভাল-লঙ্কার রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ধরের প্রাসাদে ও বিবাহ সুন্দর পরিত্যক্ত প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন।

দুর্বোধনের সভাতে ত্রীকুণ্ডল উপদেশের মত, রাবণের সভাতে হনুমানের নীতি-উপদেশ বিফল হইল। প্রীতিজ্ঞা মত সুগ্রীব সৈন্তে রামকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। সুগ্রীবের শুরভাতপুত্র নল সমুদ্রের উপর সেতু বাধিলেন। সুগ্রীবের আহ্বানে তাঁহার প্রতিবেশী ও কুটুম্ব রাজারা আগন আগন সৈন্ত আনিলেন। লঙ্কা অবরোধ করা হইল। রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণ সীতাকে ভাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়া রাজ-সভাতে রাবণ কর্তৃক অপমানিত হইলেন। তিনি অগ্রজকে ত্যাগ করিয়া সুগ্রীবের কাছে আসিলেন ও রামের সহিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাম ও রাবণে ঘোর যুদ্ধ হইল। রাবণ সবংশে নিহত হইলেন। পরে রাম বিভীষণকে রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া দেশে কিরিয়া গেলেন। লঙ্কাতে বাইবার সময়ে সুগ্রীব ও অল্প রাজারা লক্ষ্মণকে কস্তাদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন লক্ষ্মণ গ্রহণ করেন নাই, এখন সেই সকল কস্তা সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ হইল।

অযোধ্যার প্রত্যাবর্তনের পর ত্বরিত বলিলেন, “আমি আর রাজ্য-শাসন করিতে পারি না, আমি আপনার অমরোহে ১৪ বৎসরের লজ্জা-শাসন ক্রান্তে বীকৃত হইয়াছিলাম, এখন আপনি আপনার রাজ্য গ্রহণ করুন, আমি তপস্তা করিব।” রাম স্বয়ংও বাল্যকাল হইতেই বিরানী ছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া রাজ্য-শাসন করিতে তিনি বাধ্য। তিনি লক্ষ্মণকে রাজ্যে অভিষিক্ত

(১) ভারতের পশ্চিম সমুদ্রতীরে অরুণিক পোতার (Goa) কাছে হনুমানের রাজধানী ছিল। হনুমানের পিতা এবং বাল্যকালে হনুমান অরুণ রাবণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

করিয়া স্বয়ং তপস্তা করিতে হিমালয়ের দিকে চলিয়া গেলেন। তিনি অতি শীঘ্রই মুনিপদ পাইলেন এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া লক্ষ্মণের রাজ্য-শাসন প্রণালী দেখিয়া বাইতেন।

জৈন-শাস্ত্রে রাম একজন “বলদেব।” তিনি পদ্ম নামে প্রসিদ্ধ। কোন কোন গ্রন্থে মতে পদ্মই তাঁহার প্রকৃত নাম, লোকে তাঁহাকে রামও বলিত। প্রাচীন কালে, এমন কি হেমচাঁদ্যের সময় পর্যন্ত এক এক রাজার ৫৭ বা আরও অধিক নাম পাওয়া যায়। ইতিহাসে গোলমাল হইয়া যায়। যাহা হউক, জৈন-সাহিত্যে যে পুস্তকে সবিস্তারে রামকথা আছে তাহাকে পদ্মপুরাণ বলা হইয়াছে। এ পদ্মপুরাণ হিন্দু দর পদ্মপুরাণ হইতে ভিন্ন; রামের পিতৃ-মাতৃ দত্ত নাম পদ্ম বলিয়া পুস্তকের নাম পদ্মপুরাণ।

কিষ্কিন্দ্যা আজিও তীর্থস্থান। প্রাচীন বালীও রাজধানী আধুনিক বেলারী (Bellary) মাদ্রাস প্রেসিডেন্সীর একটি বড় নগর। পম্পা সরোবর ইত্যাদি এখনও রাজাদের দেখান হয়। তবে ইহার সহিত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অবোধ্যাত্তে এখনও একখানি ইটের গাঁথুনি (বোধ হয় ৩০৪০ বৎসর অপেক্ষা পুরাতন নহে) ছোট ঘর—আন্দাজ ১০ x ১০ ফুট—পাণ্ডুরা রাজাদের দেখাইয়া

বলে ইহাই “সীতা রসোই” অর্থাৎ কোশল-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী ঐ ঘরে বসিয়া ডাল-কুট রাখিতেন ও এক কোণে প্রায় বর্গ একগজ চৌকাতে বসিয়া সম্রাট রামচন্দ্র ঐ ডাল কুটি, সম্ভবত একখানি আমের আচার দিয়া, খাইয়া তৃপ্ত হইতেন। রাম তৃপ্ত হউন বা না হউন, পাণ্ডুরা একটি পরসী পাইয়া তৃপ্ত হয়। সেইরূপ পম্পা সরোবরতে কোন্ পাখর খানার উপর রাম, কোন খানার উপর লক্ষ্মণ বসিয়াছিলেন পাণ্ডুরা নিভুলরূপে তাহাও দেখাইয়া দেয়। তুমুমানের রাজধানী পশ্চিম সমুদ্র তীরে গরসপ্পা (Gersappa Fall) জল-প্রপাতের কাছে ছিল। তিনি বড় রাজা ছিলেন না বটে, কিন্তু নিজের বাহুবল, বুদ্ধি ও সং-চরিত্র দ্বারা এমন সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে, রাবণকে যৌথক উপদেশ দিয়া সংপণে আনিবার মত লোক তিনি ছাড়া আর কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। এই কিষ্কিন্দ্যাবাসী ও কান্সমধীপবাসী বিজ্ঞাধরেরা বিজ্ঞা, বুদ্ধি, শিক্ষা, অস্ত্র চালনা, শিল্প ইত্যাদি কোন বিষয়েই উত্তর ভারতবাসী আৰ্য্যবংশীয়গণ অপেক্ষা হীন ছিল না। বরং স্থপতিবিজ্ঞায় তাহার আৰ্য্যদের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

শক্তি-তি

এস মা শ্রমশানকালী! বটে বটে হও ব্রহ্মকাশ।
এ শ্রমানে শুধু শিশু কুকুরেরা করিছে চীৎকার,
কাড়াকাড়ি করিতেছে দ্বিষ্ট তুচ্ছ পচা মাংস হাড়!
কান্ত কর হানাহানি ওনারে মা তীব্র অট্টহাস।
সহে না সচে না আর এ বীতবৎস আশ্র-অবিশ্বাস!
চতুর্দিকে ঘের মৃত নরনারী কাতারে কাঁদে,
ছুটছুটি করে তবু নিরা পূর্ব দুঃখ হাতাকার!
জিপুঙ্কর-প্রাণ সবে গভী মাঝে করে হা হতাপ!

মৃত সজীবনী স্থা পিরাও, মা, সম্মানে তোমার—
তড়ি শক্তির বলে আচম্বিতে বঁচাও সবায়!
চাক্ষুঃ দর্শন করি, আত্মশক্তি, চৈতন্য তোমার—
'মা, মা' হবে সমস্তের প্রকম্পিত কক্কর সংসার!
তুমি মা প্রকট হয়ে মহাজাগিৎ কর সংগঠন!
আর নাহি ভাল লাগে 'দেহে, দেহে' বৈষ্ণব ক্রন্দন!

শ্রীমতীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বাসিমালা

চলতে পথে কুড়িয়ে পেলাম ছিন্ন বকুল মালা,
ক্লিষ্ট তাকার অঙ্গানি কি সৌরভে ঢালা,
পরাগ পেলব কোমল তন্তু গাঁথা সত্যের সাথে
কোন সে নিষ্ঠুর করলে দলন কঠিন চরণপাতে !
কঠোর পদের পেগণ ভরে গুণগন্ধ তার স্নেহে—
মরণমুখীর ভয়বৃক্কে বটেছে আরো বেগে ।
কোন্ প্রভাতের চুই, গান্ধারী কাঁপিয়ে শাখাগুলি,
ঝরিয়ে দিলে দরায় তোদের—ছুঁইয়ে দরায় ধূল ?

ঝাকড়া মাথার কোঁকড়া অলক নাচিয়ে সখী দলে,
কোন্ কিশোরী ফুল কুড়াতে এল বকুল তলে
রাঙা চরণ ফেলে দ্রুত বনধরিতীর সমা ?
নীলাবতীর আঁচলে কে করলে তোদের জমা ?
যতন করে কাটার তরে সেই রূপসী বাণী,
চাপার কলি আড়ল দিয়ে গাঁথলে তোদের মালা ?

শ্রীরাধারানী দত্ত ।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্বানুস্মৃতি)

জগৎ হইতে জুয়া মসজিদ পর্যন্ত পথ অধিক নহে,
গাড়ীতে বাইতে আঁত অল্প সময়ই লাগে, সন্ধ্যার
কিছু পূর্বেই সেখানে পৌঁছলাম । সমস্ত দিবস
যুঁহুরা কিছু শ্রান্ত হইয়া প'ড়াপড়লাম আমার হাঁচা
ছিল, সরাসরি ফিরিয়া গিয়া আমার বিছানায় আলস্য
গ্রস্ত কবি, এমন শেষ হইলে জৈশানন্দ আমাকে
নিদ্রা হইতে উঠাইয়া প্রার্থনা 'চরাচর মা'ত মমতায়
ভোজন করাইবে । কিন্তু সে 'দবস শুক্রবার' ছিল,
গাইড্ আমাকে বলিল জুয়ার দনে জুয়া মসজিদে
বহু-লোকসমাগম হইয়া থাকে, সে দৃশ্য দিল্লীতে
আসিয়া না দেখা বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে । কথা
সত্য বুদ্ধি, আমি শ্রান্ত সন্তোষ প্রাপ্ত উপদেশ
মত মসজিদ গিয়া উপস্থিত হইলাম । বাইবার সময়ে
দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, মসজিদের প্রশস্ত
সোপানাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বত্র লোকে
লোকারণ্য এবং তখনও পিপাসিতা শ্রমীর কায়
অসংখ্য ন্যাক পথ দিয়া সেই দিকেই যাইতেছে ।
সে দিন কেবল মাত্র শুক্রবার নহে, কি একটি বিশেষ

পদ-দিনও ছিল, সেই জন্য এত অধিক লোকসমাগম
তথায় হইয়াছিল উল্লেখ্য হইয়া যাতা দেখিলাম
তাহাতে মনে হইল, শ্রান্ত জনিত আলস্যে সে দিবস
সেখানে না গেলে একটি অপূর্ণ দৃশ্য হইতে বঞ্চিত
হইতাম । জুয়া মসজিদ দিল্লীতে প্রিকালট থাকিলে
এবং আমিও তত অরুচি বহুবার 'দিল্লী আসিব,
কিন্তু বিশেষ পর উপলক্ষ্যে এই প্রকাণ্ড ধর্ম্মদ্বারে
যে জন-সমাগম হইয়া থাকে তাহা দেখিবার সুযোগ
আমার তত বা আর ঘটবে না । এই কথা ভাবিয়া
আমি গাইডকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলাম,
সে নীরবে স্বিতমুখে আমাকে একটি সেলাম করিয়া,
জুতা খুলিয়া সোপানে আরোহণ করিতে বলিল এবং
নিচে জুতা গুলিয়া আমার আগে আগে পথ দেখাইয়া
চলিল । সোপানের নীচে দেখিলাম, বহু সন্ত
জুতার খোঁড়া পড়িয়া বহিঃছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই দিল্লীর
নগ । জুতা—ছোট বড় ভাল মন্দ নতন পুরাতন
সর্ব প্রকারের জুতা রয়েছে ; কোন জুতার একটু
ভরী কাষ করা, কোনটা বা কেবল চামড়ার



ইসলামী দুর্গ—প্রবেশদ্বার

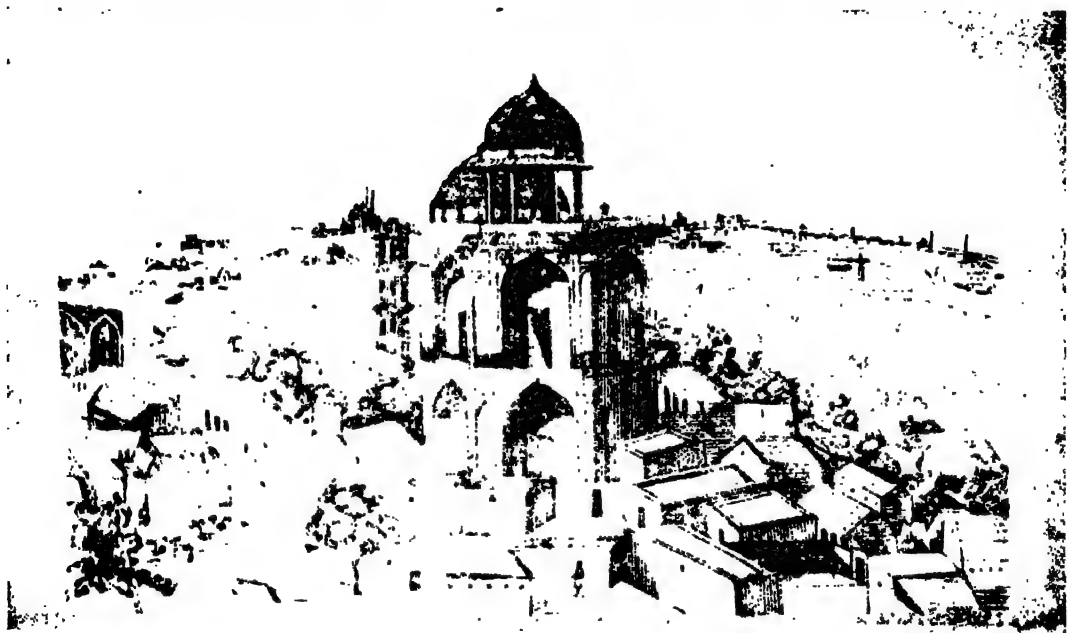
তৈয়ারী করি নাও, খুব অল্প সংখ্যক দেখিলাম চৌসয়ার-
পুরের জুতা, (যাহাও কলিকাতার আজ কাল পিণ্ডি
বা লগেটা বলে)—তদপেক্ষা কম ইংরাজী জুতা।

সোপানাবলী আরোহণ করিয়া যাচা দেখিলাম
সে এক অপূর্ণ দৃশ্য। আমি তৎপূর্বে কখনও এত
অধিক সংখ্যক মুসলমানকে একত্রে নমাজ করিতে
দেখি নাই। মসজিদেব ইমাম উচ্চ বেনিকার উপরে
নমাজ-নিরত, নিম্নে অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুস মান নমাজের
নিয়মানুসারে একত্রে উঠাবসা এবং প্রণাম রিতেছে।
সৈনিক বিভাগের লোক যেমন বহু সশস্ত্র বা বহু
লক্ষণ একত্রে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে
বা কুৎ কাওয়ারের নানা কোশল দেখাইবার সময়ে
তাহাদের অজপ্রত্যয়ের সর্ব্ব চেষ্টা একত্রে সম্পন্ন
করিতে কোন বাধা হয় না, মনে হয় যেন কলের
যান্ত্রিক কলে চলা ফেরা করিতেছে, নমাজ-নিরত নানা
শ্রেণীর এই বহু সহস্র মুসলমান তদ্রূপ একত্রে প্রণাম

উত্থান উপবেশন, নমস্তার প্রভৃতি নমাজের সময়ের
তদন্তীয় সমস্ত কার্য্য নিরাহ করিতেছিল আমি নিশ্চয়
নেত্রে অবাক হইয়া তাহাই দেখিতেছিলাম দিল্লীর
জুম্মা মসজিদ জগদ্বিখ্যাত, তদনিয়তি এই মসজিদেব
ভায় শ্রবণে মসজিদ পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ,
ভাংতে আর নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।
লক্ষ্মীয়েব ইমাম বাড়ীর চল বৃৎ বটে, এবং কড়ি বরগা-
বিনীন শ্রবণে ছাদ অপূর্ণ কোণেলে শতবর্ষ পরিমা অক্লান্ত
ভাবে রহিয়াছে; বিজাপুরের “বেলি গুহল” অতি
বৃৎ এবং স্থাপতির অপূর্ণ কোণেলে গুহলের এক-
গাত্র হইতে অক্ষুটবাক্য অপর প্রান্তে গুরু গভীর
রূবে প্রতিধ্বনিত হয়; ভারতের নানা স্থানে
আরও বহু ইমারত রহিয়াছে যথা আগার তাজ ও
ইংমাতকোলা, দিল্লীর জুম্মায়েব গোরহন প্রভৃতি,
যাহার গঠন সৌন্দর্য্য জগতের বিশ্বর হইয়া রহিয়াছে;
কতেপুর শিকরীর দুর্গাভ্যন্তরেব মকা মসজিদ কিংবা

আজমীরের খাজা মউত্তুদ্দীন িস্তির দরগা (যাচা মুসলমান জগতে দ্বিতীয় মক্কা সরিফ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে) সুন্দর ও সুগঠিত ভাৱে সন্নিবেশিত নাই; কিন্তু বাদশাহ শাজাহান নির্মিত দিল্লীর জুম্মা মসজিদ, তাহার সমুখস্থ প্রাঙ্গণ এবং অভ্যন্তরীণ মিনার-দ্বয় যখন সুবৃহৎ, তেমনি গঠন সৌন্দর্য্যে অপরাধিত। এবং এই মসজিদ ও তাহার সমুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যত লোক একত্রে নমাজ করিতে পারে, তুনিয়াহি এত লোকের একত্রে নমাজের স্থান হয় একরূপ

শেষ করিয়া বর্ষসমুহ সহব প্রাপ্ত হইয়া লই, দিল্লী এবং তাহার চতুর্দিকস্থ অস্তিত্ব দর্শনীয় পদার্থ দেখিবার জন্য বাহির হওয়া বাটবে; সমস্ত দিনে সে-গুলি শেষ করিয়া, তৎপর দিবস প্রভাতে পৃথিবীর পুরাতন কেলা এবং কুতব মিনার দেখিবার জন্য যাত্রা করা যাইবে, কেননা সেগুলি দিল্লী চইতে অনেক দূরে, প্রত্যাহা যাত্রা না করিলে সেগুলি দেখিয়া সেই দিবস সন্ধ্যার মধ্যে কিরিয়া আইসা কঠিন। গাইডের কথা মত সেই ব্যবস্থাই করা হইল।



ইসলাম চর্চের অভ্যন্তরভাগ (প্রাচীন চিত্র হইতে)

মসজিদ জগতে আর অতি অল্পই আছে, কেহ কেহ বলেন যে একরূপ দ্বিতীয় আর একটি কেথাও নাই।

নমাজ শেষ হইলে, সেই বিশাল জনসম্মেলন হইয়া নানাবিধে চলিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যা প্রাণীপ আলিয়া উঠিল, আমরাও দিল্লীর ট্রেন স্টেশন সহিত মোর লরাইরে গিয়া আসিয়া লইলাম। গাইড্ ব'লল, সে পর দিবস আহারাদি শেষ করিয়া বেলা নয়টা আনাজ সময়ে গাড়ী লইয়া হাজির হইবে, আমি যেন আহার

দৈশানচক্রে তাগাদা করিয়া রাজ্যের ভোজন সমাধা করলাম। বিছানার দেহ চালিয়া দেওয়া মাত্র পূর্ন রাজ্যের বেলা গাড়ীর আধ ঘুর আধ আগা এবং সমস্ত দিনের প্রান্তির বনে নিদ্রায় চকু আপনি বুজিয়া আসিল। এক ঘুমে রাজি প্রভাতে কাকরবের সঙ্গে সঙ্গে তাগাদা উঠিলাম।

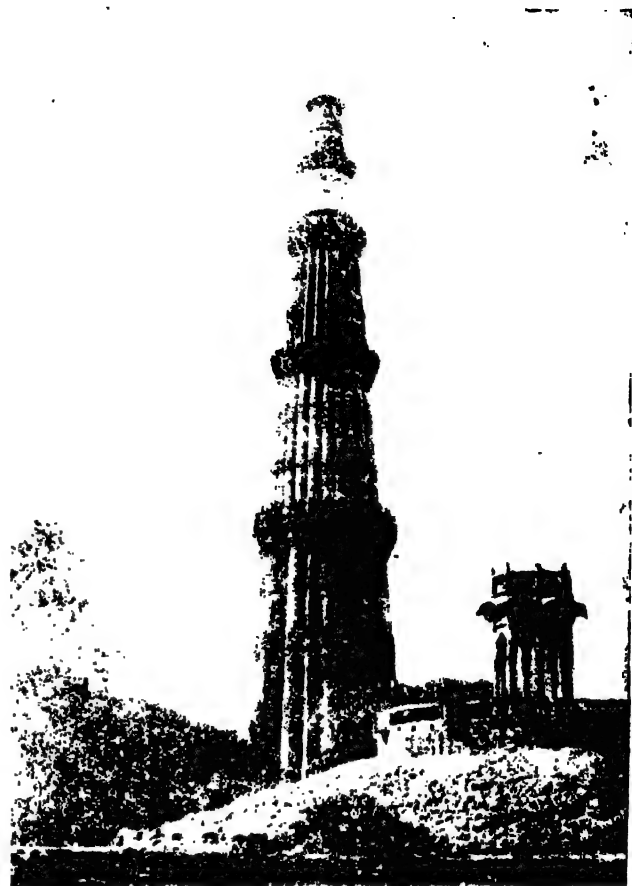
নির্দিষ্ট সময়ে শকটগৃহ গাইড হাজির হইল। আমার আহারাদি শেষ করিয়া বাহির হইবার জন্য

প্রস্তুত হইতে বেশী আশ্রয় দশটা বাজিয়া গেল। কীর্ণাধোজিত শকটে আরোহণ করিয়া রওনা হইলাম। গাইডকে জিজ্ঞাস করিয়া জানিলাম জমায়ূনের কবর পুণ্ড্রন ইন্দ্রপ্রস্থের জীর্ণস্তূপ, টোগলকাবাদের ভগ্ন-বশেষ, সফদরজঙ্গ, জাহানারা বেগমের গোর প্রভৃতি আজ শেষ করিতে হইবে। কোন স্থান কত দূর, কোথায় যাইতে কত সময় লাগিবে, সে সকল বিষয়ের কোন ধারণাই আমার ছিল না, সুতরাং পথ প্রদর্শক গাইডের পরামর্শই শিরোধার্য্য করা উচিত বিবেচনার আমি নীরবে পথ-দর্শকের দৃষ্ট দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম

পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থের জীর্ণস্তূপ যে স্থানে দেখাইল ঐ স্থানেই ভারতপ্রসিদ্ধ কুরুব্রজ-কুলের রাজধানী ছিল 'ক না কে জানে ? সে কথার সীমানা প্রত্নতাত্ত্বিকের কার্য্য, আমার জ্ঞান কেবল প্রত্নতত্ত্বের সর্ব্বত্র সংক্ষেপে জানকী অপ্রাপ্ত বিংশতাব্দী বালকের মনে ওরূপ কথা উদয়ই হয় না, হয়ও নাই; আমি কেবল শুদ্ধ হইয়া তাবিত লাগিলাম মহাভারত বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থের কথা—ময়দানব নিশ্চিত, বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত, অপূর্ণ

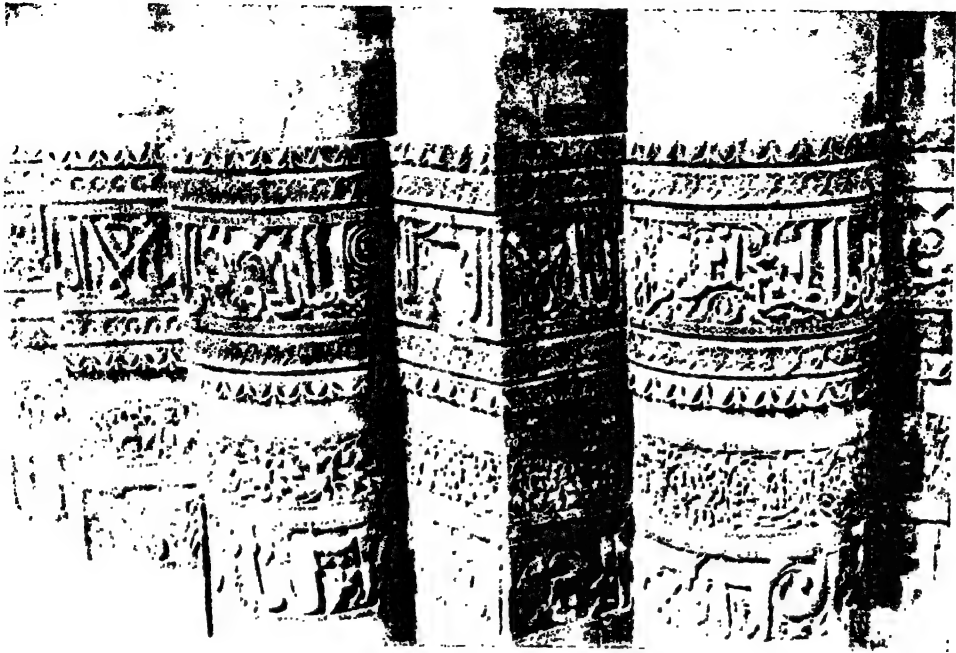
স্থাপত্য কোশলময় বুদ্ধিতির রাজস্থর যজ্ঞশালায় কথা— যেখানে সমগ্র ভারতের লক্ষ নরপতি করদ হইয়া যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, যে যজ্ঞশালায় অপরূপ নির্মাণ কোশলে দ্ব্যধোয়নের জ্ঞান চাকচক্যবস্ত্রের দৃষ্টি বিস্তর ঘটয়াছিল; তাবিত্ত্বিলাম অতুল ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অপার বীরস্বের নীলাশ্রনী সর্পগুণাবিত রাজ্যদিরাজ বুদ্ধিতির এবং জিলোকে অজয় বীরগ্রগণা তুর্কি জীয়ার্জ্জনের সর্ব্বসম্পদময়ী শ্রীসম্পন্ন রাজধানী সে দিনে কি ছিল, আর আজ কালবশে কি হইয়াছে!

টোগলকাবাদের সম্মুখে 'গয়া পাড়াইলাম, সেখানেও সেই অশানতস্বের স্থাপ। আমার গাইডের মনে মনে



কুতব মিনার

ধারণা সে মোগল পাঠানের ঐতিহাসে অসাধারণ পণ্ডিত। দর্শনীয় স্থানগুলির বর্ণন উপলক্ষ্য করিয়া সে ইতিহাস আড়াইতে আশ্রয় করিল এবং তাহাও আবার ইংরাজী ভাষায়। কতকগুলি বাধাবুলি মৃগস্থ করিয়া রাখিয়াছে, তদতিরিক্ত 'কছু বলতে চাইলে, কিংবা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার ইতিহাস ও ইংরাজী কিছুতেই কলাইয়া উঠে না, মহা বিপদ উপস্থিত হয়। আমি বারবার বলিলাম, মোগল কিংবা পাঠানের ইতিহাস আমার কিছু কিছু জানা আছে, তাহা কষ্ট করিয়া আমাকে সে সকল বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে ? তাহার বিশ্বাস ইংরাজীতে ইতিহাস বলিলে তাহার কথর



কুতবমিনারের প্রথম স্তর

বাড়িগে, এবং তাকা তইলেই তাহার বিদায়ের সময়ে পাশ্চি সাধারণ গাভ হইতে অধিক চইবে। তাহার ইচ্ছাশুসারে বাকা খুশী বলিয়া সে ইতিহাসের “একোদ্বিষ্ট” করতে লাগিল। আমি সেই ভয়ভূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া টোগলক্ বংশের সময়ের দিল্লীর সমৃদ্ধি এবং চৈতন্যের ধ্বংস লীলার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

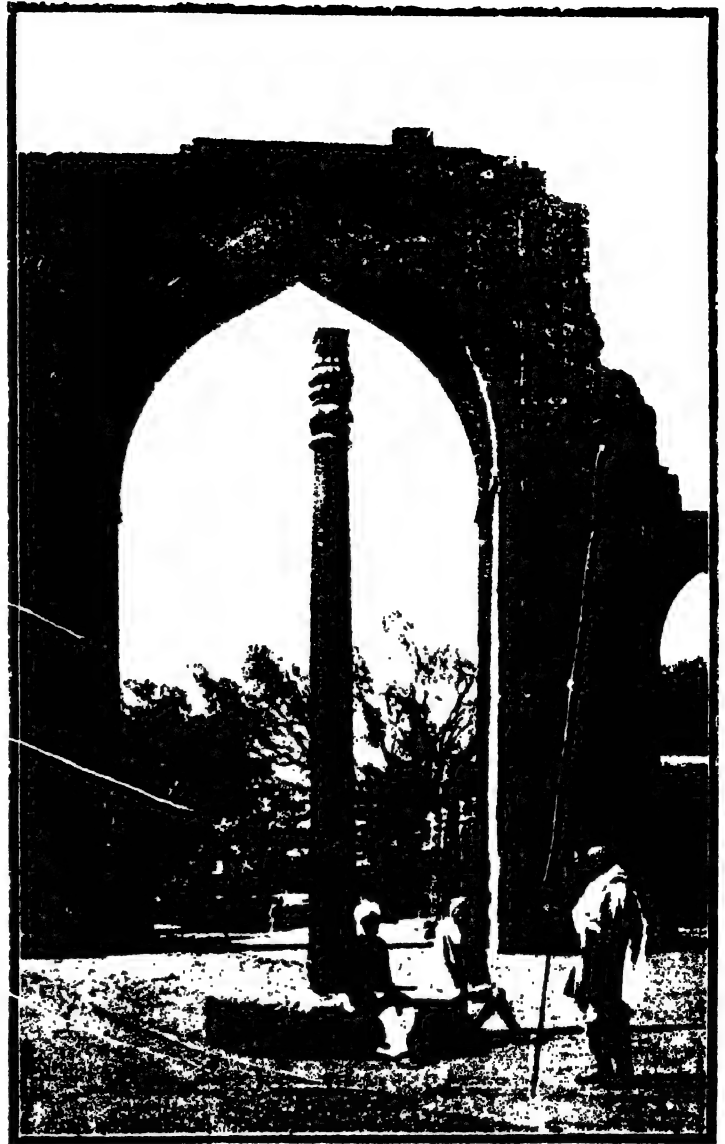
ইতিহাসে বর্ণিত লক্ষণারতবাসীর চৈতন্য কতক নিশ্চয় হয়। এবং টোগলক্ বাদশাহগণের ধনধান্য পরিপূর্ণা, সুখেখ্যালালিনী, সুন্দরী রাজনগরীও উদ্ভেদ-বিক্রম নিষ্ঠুর ধ্বংসের কথা আমার মনে আসিয়া অন্তর মনকে নিঃশব্দে পীড়িত করিতে লাগিল; আমি সেখানে অধিকক্ষণ আর দাঁড়াইতে পারিলাম না।

হুমায়ূনের সমাধিমন্দিরের দিকে যখন অগ্রসর হইতেছিলাম, দুই হাতে চঠাং দেখিয়া আমার তাক বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল—ভাবিলাম এ কি ব্যাপার, অকস্মাৎ আগার তাক মতল ‘দিল্লীতে এক ব্যক্তির মধ্যে কি ইজ্জতাল গভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল?

প্রবেশ ঘর হইতে সমাধি মন্দির পর্য্যন্ত যে পথ চাওয়া গিয়াছে, তাহা এবং পথপাথের উজান ও জলধর, সমাধি যে উচ্চ বেদিকার উপরে স্থাপিত সেই বেদিকা এবং তাহাতে উঠবার সোপান, সমাধির গুপ্ত এবং উত্তর পার্শ্বের মিনার এই সমস্ত একসঙ্গে দর্শকের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চঠাং তাহার মনে তাক বলিয়া প্রতীত জন্মাইয়া দেয়—তবে সে ভ্রম কণিকের মাত্র; পরক্ষণেই সে ভ্রম দূর হইয়া যায় এবং দাঁহার কল্পনার এই সমাধি মন্দিরের পরিপূর্ণ ছবি প্রথমে আঁসিয়াছিল তাহার ভূমণ্ডী প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। অন্তের মতের সহিত মিলবে কি না জানি না, তবে আমার মনে হয়, যদি ভারতবর্ষে তাক নিশ্চিত না হইত, তবে হুমায়ূন বাদশাহের এই সমাধি মন্দিরটো তাকের স্থান অধিকার করিত; এই সমাধি এবং আগার প্রান্তবাহিনী যমুনার পরপারস্থিত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিতা গৌরাসবেগের গোরেব উপরিস্থ মন্দির-ভবন, গঠন-সৌন্দর্য্যে জগতের স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে

উচ্চতম স্থান অধিকার করিত সন্দেহ নাই। হুমায়ূনের এই সমাধির সহিত বহু ছুৎকাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। বাদশাহ হুমায়ূনের জীবন কুশ্ল শয্যায় বাটে নাই; প্রথম জীবনে পিতা বাবরের সহিত তাঁহার দক্ষিণ বাহুর স্বরূপ হইয়া বহু যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছে; পরে যখন পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আয়োজন করিলেন, সে সুখ অধিক দিন সঞ্চল ন। শেষবার বাহুবলে এবং রণ-কৌশলে পরাজিত হইয়া সিংহাসন হারাইয়া প্রাণভয়ে ভারতসীমার বাহিরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কত কষ্ট সহ্য করিয়া অন্তঃসত্তা আকবর জননীর সহিত উল্লেখ্য মরুপ্রদেশ পার হইতে হইয়াছিল তাঁহা তিনি এবং তাঁহার মুষ্টিময় অমুচররাই জানিত। বৈদ্যজ্ঞের ভ্রাতার বৈদ্যতা সম্বন্ধে তাঁহারই হস্তে পত্নী এবং সম্ভ্রাজ্ঞা পুত্রের ভার দিয়া পারস্তে পলাইয়া যাইতে হয়, এবং পারস্ত সম্রাটের সাহায্য এবং সৈন্তবল না পাইলে ভারতের সিংহাসন পুনরাধিকার করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। শেষবার মৃত্যুর পরে সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু রাজ্যের বস্তুত এবং শৃঙ্খলা হইবার পূর্বেই তাঁহার অপমাত মৃত্যু সংঘটিত হইল। “আজান”ধ্বনি

তনয়া সফরতার সহিত নমাজার্থ “কেতাবগুচ” হইতে নামিয়ার সময়ে পদাশ্রয় কর এবং সেই সাংঘাতিক আঘাতেই করদিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে—মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র অপ্রাপ্তবয়ঃ বালক আকবর তখন লাহোরে। শেষ সময় পিতা পুত্রের



অশোক স্তম্ভ—দিল্লী

সাক্ষাৎ বাটতে পারে না। এই সমাধিস্থানে, অস্বাভাবিক মৃত্যুতে কাল-কবলিত মোগলবংশের বহু রাজকুমারগণ সমাধিত হইয়াছেন। প্রথমে বাদশাহ হুমায়ুন। তাঁহার পরে তাঁহারই বৃদ্ধ প্রপৌত্র ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দাদা সেকো, কনিষ্ঠ



মিনা-ই-মুদ্দন জামায়া, দিল্লী

আওরঙ্গজেব কর্তৃক নিষ্ঠুর ভাবে তত হইয়া বুদ্ধ প্রপিতা-
মহের পাশে ঐ মন্দিরেট চিরশয়ন লাভ করিয়াছেন।
সে দুইটিনার নানা'গক দেড়শ ও বৎসর পরে নামসকল
মোগল সম্রাট দিল্লীপতি বাহাদুর শাহের ছুইট পুত্র ইংরাজ
রাজ্যের সহিত দিপাকীগণের সংঘর্ষকালে ইংরাজ সেনানী
কর্তৃক প্রকাণ্ড প্রাকরণে বিপুল জনতার সমক্ষে পিস্তলের
জ্বলিতে অগ্ন্যাত মৃত্যু লাভ করিয়া, মোগলবংশের দ্বিতীয়

সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরেই সমাহিত হইয়াছে।
যটনা পরম্পরা চিন্তা করিলে মনে হয়, যেন কোন্ এক
একান্ত অন্তত সুস্থর্তে এষ্ট সমাধিভবনের প্রথম শিলা-
'বস্তাস হুঁটকা'ছিল এবং এই অগ্নিবিখ্যাত রাজকুলের
অস্বাভাবিক ভাবে কালকবলিত রাজা এবং রাজকুমার-
গণের শেষ শয়নের ভক্তই এই সুবৃহৎ এবং মন্দির সমাধির
স্বষ্টি হইয়াছে

সকলর মনও একটি সমাধি ভবন। অসামান্য যোগবল সম্পন্ন যুগলমান সাধুও মৃত দেহের উপর এই স্তম্ভর সমাধিভবন নির্মিত হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। ইহা আরতনে হুমান্বনের সমাধি, তাজ বা এতমাদের সমকক্ষ না হইলেও, গঠন সৌন্দর্য্য ইহার সামান্য নহে। ইহার শুভঙ্কের গঠন অপরাপর শুভঙ্ক অপেক্ষা একটু বিভিন্ন প্রকারের। এই সমাধি ভবনের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গনে রাজকুমারী জাহানারার গোর রহিয়াছে। এই গোরের একটু বিচ্ছিন্নতা আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যোগল পাঠান উভয় রাজকুলেরই রাজাধি-রাজগণের এবং তাঁহাদের কোনও কুমার কুমারীর সমাধি-ভবন সুবৃহৎ এবং বিচিত্র কারুকার্য্যে সমন্বিত হইয়া থাকে এবং বহু অর্থব্যয়ে ইহা সমাধা হয়। রাজ-কুমারী জাহানারার মনের গতি অল্প প্রকারের ছিল দেখা যায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আওরঙ্গজীব কর্তৃক বৃদ্ধ পিতা সম্রাট্ শাহজহান যখন আত্মা হুর্গের অশ্রমস্থত এক কক্ষে বন্দীরূপে আবদ্ধ হইলেন, রাজকুমারী জাহানার পিতার কারাজীবনের হুঃখের দিনে স্বীয় সেবা দ্বারা যদি কিয়ৎপরিমাণেও সে ক্লেশের লাঘব করা যায় সেই উদ্দেশ্যে যেচ্ছার স্বয়ং যক্ষ্মিনীর জীবন বরণ করিয়া লইয়া পিতার জীবন-কালের শেষতম নিবেদ্য পর্য্যন্ত কঠোর কৰ্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। যে মনোভাবে যেচ্ছার তিনি কারাক্ষ হইয়াছিলেন, সেই মনোভাবেই তাঁহার পার্শ্ব দেহাংশেবের উপর অত্রস্তদী মিনার শুভঙ্ক সমন্বিত কারুকার্য্যের সমাধি মন্দির প্রস্তুত করিতে নিবেদ্য করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, উদ্ভুক্ত আকাশ ওলে, ভূপাঙ্ছাধিত ভূমি খণ্ডের উপরে যেন তাঁহার সমাধি হয়, বাহাতে মেঘের বারিধারা এবং সূর্য্য চক্রেয় কিরণ তাঁহার সামান্য সমাধির প্রস্তর খণ্ডের উপর নিয়ত বর্ষিত হইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত জাহানারার সমাধি ঐ ভাবেই রহিয়াছে, কেবল তাহার চতুর্দিক বেটন করিয়া একটি মন্দিরমাণিক্য— বাহাতে শৃগাল কুহুর সমাধি-প্রস্তরের অসন্ধান না করিতে পারে। বিলাসের লীলাস্থনী দিল্লী প্রাঙ্গনে

হুমান্ব লইয়া এইরূপ মনোবৃত্তি লাভ করা অতীব বিচিত্র। জানি না আকবরের সময় হইতে যে হিন্দুশোণিত-ধারা যোগল রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের শিরায় প্রবাহিত হইতেছে ইহা তাঁহারই কল কি না।

এই ভূমি দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল, আমরা ফিরিয়া গিয়া সরাই খানার আশ্রয় লইলাম। দিল্লীর এই মোর সরাই সাধারণতঃ সরাই বলিলে বাহা বুঝায় বা ধর্ম্মশালা বলিলে পশ্চিমে যে অর্ধ সকলে বুঝেন, তাহা নহে। এখানে পশ্চিমের ধর্ম্মশালার মত প্রতি ঘরে ঘরে নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানাবিধ আচার ব্যবহারের লোক যথেষ্ট বাইরা রন্ধন বা পান ভোজনের ব্যবস্থা করিতে পারে না,—এখানে একটুখানি তদ্র ব্যবহারের তদ্রলোকদিগেরই থাকিবার ব্যবস্থা আছে। ঘরগুলি প্রশস্ত, পাকশালা প্রাঙ্গনের অপর প্রান্তে, ভূতাগণের থাকিবার স্থানও পৃথক, তদ্রগোছের হিন্দু হোটেলের মত সমস্ত ব্যবস্থা। জানি না এখন সে মোর সরাই আছে কি না; এ যে দিনের কথা, তাহার পরে বহু বৎসর গত হইয়াছে এবং দিল্লীর বহু পরিবর্তন হইয়াছে। ভারতের রাজধানী হইবার পর দিল্লীর এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, ইহার অনেক স্থান আর চিনিবারই উপায় নাই— হয়ত যে মোর সরাইয়ে আমরা ছিলাম তাহার স্থান দিল্লীর রেল ষ্টেশনের কুক্ষিগড় হইয়া তাহার উপর দিয়া লৌহবন্দ্য প্রবাহিত হইয়াছে।

পর দিন প্রত্যবে উঠিয়া স্থান করিয়া সামান্য কিছু আহার করিয়া লইলাম। আমার গাইড এবং গাফোরান পূর্বে দিবসের ব্যবস্থামত বধ্য সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। মধ্যপথে বোড়া বদল করিতে হইবে বলিয়া আর এক জুড়ি বোড়া সে রাজিতেই বধ্যস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিল; সাধারণতঃ একরূপ করে না, সে বেশের অন্বিনীকুমারগণ তাহাদের চিরাচরিত প্রথা মত যে ধীর মনঃ গতিতে অভ্যস্ত সেই গতিতেই সমস্ত পথ শকট টানিয়া লইয়া যায় এবং

পথে কোন এক স্থানে চাপক প্রবৃত্তি সৃষ্টিমের তৃণভূমি চর্চণ করিয়া সৃষ্টিভিত্তিক ভান করিয়া গর। আমার জন্ম এই ভিন্ন ব্যবস্থা বোধ করি গাইডের পরামর্শ মত করিয়া থাকিবে। এই সকল গাইডগণ বহু লোকের সংশ্রবে আসিয়া থাকে, সুতরাং কে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে খুসী হইবে তাগা বুঝিয়া লইতে ইহাদের ক্ষমতা বিদগ্ধ হয় না। লোকের প্রকৃতি এবং অভ্যাসাদি বুঝিয়া গাইডে ইহাদের ক্ষমতা অসাধারণ, যদিও ইহার সূর্য।

যথাকালে যাত্রা করিলাম। বহু পথ অতিবাহিত করিতে হইবে, কথাবার্তা কহিবার জন্ম আমার সঙ্গে ছিলেন ডাক্তার বাবু, তথাপি ছই একখানি পুস্তক লইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে মারের গাইড একখানি ছিল, ইহাতে বহু আবশ্যিক তথ্য পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, সিলোন এবং বর্মার মোটামুটি জ্যেষ্ঠ পদার্থের তালিকা এবং সুগ সুগ বর্ণনাও ইহাতে আছে। ঐ পুস্তক খানি ভ্রমণ কালে প্রতি বারেই আমার সঙ্গে থাকে এবং একখানি কেনের ইঞ্জিও আমার ভ্রমণ সময়ের চিরসঙ্গী। পথে যাইবার সময়ে আধুনিক দিল্লী বা শাহজাহানবাদ ছাড়াইলে পথের উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং ছই চারি মাইল অন্তর অন্তর বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রাস বংশের স্থাপিত পুরাতন দিল্লী নগরীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বৈচিত্র্যময় পুরাতন নগরীর ভগ্নাবশিষ্ট ভীর্ণ প্রান্তর ও সৃষ্টিকার তরুণ দেখিলে মনে হয় যেন দিল্লী একটি মহা স্রাবণ এবং এই বিরাট স্রাবণ ভূমিতে বহু হিন্দু এবং মুসলমান রাজবংশের এবং তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বিপুল রাজ্য ও রাজধানীর শেষ সংস্কার এখানে হইয়া গিয়াছে, তরুণ তরুণ যেন নির্বাসিত চিতারির শেষ ধূম মহাব্যোমে মিলাইবার অপেক্ষায় উর্দ্ধে উঠিতেছে। মহাভারতের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান সাম্রাজ্যের দিন পর্যন্ত পুরোঁপোঁতহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে দিল্লী যেন একটি অতিশয় এগরী। যে সম্রাটের সিংহাসনই এখানে পাতা

হইয়াছে, তাহাই অচিরকাল মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ষট্-ঈশ্বরী, বলবীর্ষ্য সমস্তই যেন কি এক মারামর্জ বলে গজভূক্ত কর্ণপথের ভায় অস্তঃসার শূন্য হইয়া নিমেষের মধ্যে অস্তহিত হইয়া গিয়াছে; স্রাবণাত সময়ের ক্রোধ-সৃষ্টিটুকু মাত্র ভারতবাসীর অন্তরে চির আগরুক হইয়া রহিয়াছে।

বহুকণ ধরিয়া গাড়ী চলিল। মধ্য পথে একবার ঘোড়া বদল হইল। ঘোড়ার দানা খাইবার “তোবড়া” এবং বসের আটি কোচমান তাহার পাগড়ানে তুলিয়া লইয়া পুনরায় যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইয়া আমাকে খবর দিল। আমি নিকটেই রাস্তার উপর পারচারি করিতে ছিলাম, গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, গাড়ী চলিতে লাগিল। কুতবের সম্মুখিত হইতেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ মিনার দেখা গেল; দূর হইতে তাহার উপরের ছই কি তিন তালা দেখা যায়, পাদমূল হইতে শীর্ষ পর্যন্ত সমগ্র মিনারটি নিকটে না গেলে দেখিতে পাওয়া যায় না। দূর হইতে মিনার চূড়া আমার দৃষ্টি পথে পড়িয়া মাত্র ক্ষণেকের মধ্যে এক বিচিত্র হর্ষবিষাদের ভাব আসিয়া উদ্ভূত হইল। দিল্লীর শেষ হিন্দু নরপতি পৃথ্বীরাজের রাজধানী যেখানে ছিল, হিন্দুর পক্ষ সেই তীর্থ মদুশ পুণ্য ভূমিতে যাইতেছি—বোধ করি হর্ষানুভবের ইহাই কারণ। আর বিবাদের হেতুর কি অন্য আছে? ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র বাহা গিয়াছে, তাহার জন্ম ক্রোধ, শোক, বিবাদ, পরিতাপে দগ্ধ না হয় এমন ভারতবাসী আছে বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। জরজরিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অচিরকাল মধ্যে সে নিজেই করিয়া গিয়াছে এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বিপুল জনসত্ত্ব সে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

পৃথ্বীরাজের পুরাতন কেজার ঘারে গিয়া আমাদের শকট দাঁড়াইল। আমরা গাইডের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সপ্তশত বৎসরের পুরাতন রাজ-প্রাসাদ সংস্কারের অভাবে অরাজকীয় হইয়া প্রায় সমস্তই ভূঁশ্বারী হইয়াছে, বহুস্থানে তাহার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমান রাজবংশের সময় হইতেই হিন্দুর

রাজপ্রাসাদ পরিত্যক্ত হইয়াই পড়িয়া ছিল, তাহার উপরে যোগল রাজত্বের অবসানে ইংরাজের প্রথম আমলে উত্তর কালের চূর্ণ, কোঠা, প্রাসাদ, মন্দির, মিনার সমস্তই বস্তুভাবে ধ্বংসের পথে বাইতে ছিল। বেঙল নিতান্তই বাইবার নহে, বাংলার স্মৃতি গঠন কালের ধ্বংসলীলাকে বহুকাল উপেক্ষা করিতে পারে, তাহারাই কোনমতে দায়মান ছিল; ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন সেই সকল পুরাতন স্মৃতিচিহ্নের রক্ষায় বৈধিবিধান এবং অর্থব্যয় না করিলে আজ পর্যন্ত কতটি অবশিষ্ট থাকিত কে জানে?

পৃথিবী প্রাসাদের সংস্রব যোগমহার মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় থাকিলেও, তাহারও দুর্দশার সীমা নাই। যদিও বঙ্গসম্রাট প্রাচীরের অকল্প ধারা-পাতের সময়ে “কুলওয়ার্লোঁকি সয়ের” বলিয়া সেখানে এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে, (যে মেলায় দিল্লী এবং বহু দূর হইতে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়) তথাপি মন্দির সংস্কার করে কোনও চেষ্টা করেন হয় কিংবা হইয়াছে কি না তাহা আমার জানা নাই। প্রসঙ্গক্রমে কথা উপস্থিত হইল তাই বলিতেছি, এই “কুলওয়ার্লোঁকি সয়ের” নামক মেলা এক অপূর্ণ সামগ্রী। লক্ষাধিঃ হিন্দু ও মুসলমান এই মেলায় সমবেত হয়। খুঁট, চামেলী প্রভৃতি সঙ্গমযুক্ত কুলের মালা এবং পাখা প্রস্তুত করিয়া হিন্দু যোগমহার মন্দিরে এবং মুসলমান কুতবেয় সন্নিহিত দরগায় ঐ সকল মালা ও পাখা চড়ায় এবং সমবেত হিন্দু মুসলমান প্রীতি-ভক্তে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, বৎসর ভরিয়া বত কিছু মনোমালিন্য বিবাহ বিসম্বাদের কারণ হইয়াছে সে সমস্তই বিস্মৃত হয়। গুলিরাছি বাদশাহী সময় হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে এবং সেই দিনে পরস্পরের হাত হইতে পান সরবত তামাক লইয়া খাইতে এবং পান করিতে কেহ বিধা মনে করে না—“পান পানিতে আরেব নাচ” এই প্রবাদবাক্যের বাখ্যার্থ্য সেই দিনে প্রমাণিত হয়। আজ সে বিধি আছে কি না জানি না, যেলাও এখন আর প্রতি বৎসর হয় কি না তাহাও আমি অবগত নহি; কিন্তু এখন এই মেলা আর প্রথমে দেখাছিলোঁ, সেই

দিন ইহার অভিনিহিত উদ্দেশ্য এক বছর নিকট হইতে গুলিয়া, এই মিলনমেলায় প্রবর্তক বাঁহারা, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রকার পুন্সঞ্জলি না দিয়া পারি নাই।

কালের আঘাতে আজও ধ্বংসপুরে ত্রয়াণের জন্ত অগ্রসর হয় নাই কেবল সে তল্লাহী কুতব মিনার। কেহ কেহ বলেন, মস্লেদ ঘোরীর প্রতিমি কুতব উদ্দীন ভারতবিজয় ব্যাপারকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত এই গগনভেদী মিনার অসম্ভব রূপে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; এবং পৃথিবীর রাজপ্রাসাদ ও দেবমন্দিরগুহিতে যে সকল কারুকার্যসমৃদ্ধ প্রস্তর ছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া এই অদ্বৈতের গঠনকার্যে লাগান হইয়াছিল। আবার কাঁধাও কাঁধাও মতে পৃথিবীর-মহৌ সমুজ্জ্বল দেবীর নিত্য পাতে যমুনা নদীর জন্ত ত্রিভুজ স্তম্ভ পূর্ব হইতেই ছিল, কুতবুদ্দীন তাহার উপরে আরও দুইটি তালি নির্মাণ করিয়া কুতব মিনার নাম দিয় ভারতবিজয়ের স্মৃতিস্মার উপায় করিয়া গিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালার-প্রস্তরগুলি একবর্ণের, চতুর্থ ও পঞ্চম তালি অস্তরঙের পাথরে গড়া। জানি না সেই জন্তই ইহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের প্রস্তুত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে কি না। সে সকল কথাই মৌমাংসা করা ঐতিহাসিকের কার্য; তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকারের স্থাপত্য কলার দিক দিয়া বিচার গবেষণা করিয়া হয়ত ইহার কাল এবং নির্মাতার নাম ধাম সমস্তই বাহির করিবেন বা করিয়াছেন; সে চেষ্টা করিবার মত ইচ্ছাসে বা প্রস্তুতস্ব্যে আমার অধিকার নাই। অজ্ঞাত মিনারের জায় ইহারও মূলদেশ স্থল এবং ক্রমে স্থল স্থানতর হইয়া ইহার শীর্ষদেশ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহার সর্ববোর্বের সম্মুখপাত বড়ই সুন্দর এবং অগ দৌড়বে ইহা ভারতের কোন মিনার অপেক্ষায় তুলনার মীন হইবেনা বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাহার চতুর্দিকে যে চারিটি মিনার রহিয়াছে, খেতমর্ষর নির্মিত সেই মিনার চারিটি গঠন-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় সম্ভব নাই, এবং তাহার পার্শ্বস্থান পাইবার যোগ্য করিয়াই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু খেত মর্ষর উহার শোভা অধিকতর

বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কুতব মিনার মর্দারে নির্মিত না হইয়াও, ইহার অবয়বের সম্যকপাত-সৌষ্ঠবে অপূর্ণ স্রীসম্পন্ন হইয়াছে। জুম্মা মসজিদের মিনার, ইতিমাতুল্লাহর মিনার, কিংবা তারদরবাদের "চারমিনার" যেহেতু কুতবকে গঠন সৌন্দর্য্যে পরাজিত করিতে পারিবে না; এত বৃহৎ অথচ এত সুন্দর দ্বিতীয় আর কিছু আছে কি না জানি না।

আমার সঙ্গের একজন গাইড এবং সেই স্থানের আর দুই একজন সুসন্মান অধীকারক বারবার মিনারের শীর্ষদেশে চড়িবার চেষ্টা অসুস্থ করিতে লাগিল। কিন্তু তৎপূর্বে এলাহাবাদের যেও হলের উপরে চড়িয়া নামিবার সময়ে আমার যে দুর্দশা হইয়াছিল সে কথা মনে পড়িল, আমি উহাদের সরিষার অসুস্থতা উপেক্ষা করিয়া ইহার পাদমূলে বসিয়া রহিলাম। আমাদের ডাক্তারবাবু উপরে চড়িতে লাগিলেন। এখন তুলিয়া গিয়াছি কয়শত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চড়িতে হয়। সোপান শ্রেণীও ক্রমে অপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কলতঃ ডাক্তার বাবুর আরোহণ এবং অবরোহণ বহু সময় লাগিল এবং তিনি যখন নীচে নামিয়া আসিলেন, দেখিলাম সেই দানবতুল্য বলশালী ডাক্তারবাবুও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছেন। ইহার অনেকদিন পরে, আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে দিল্লী প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন; আগ্রার তাজের মিনারের উপর অন্যায়সে চড়িয়া গেলেন, শ্রান্তি ভীতি কিছুই বোধ করেন নাই; আমা স্বীকার করিতেছি যে, নিজের অক্ষমতার লজ্জা বোধ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই মিনারে চড়িলাম না। মনে তাবিয়াছিলাম দিল্লীর কুতবে চড়িবার শক্তি তাঁহার হইবে না, কিন্তু সে আমার নিতান্তই ভ্রম। অন্যায়সে উষ্মগতীন চিত্তে তিনি সেই অজ্ঞানতার স্তম্ভে মূর্ছিতে কেবল বাঁম চরণ নহে, তাঁহার স্রীচরণের স্থাপন করিয়া, পরী বা অঙ্গুলি লেগেই কাছাকাছি গিয়া পহুছিলেন এবং উর্দ্ধলোক হইতে এই দুর্লবলিন ধরাপৃষ্ঠ শুকভাবে উপবিষ্ট তাঁহার এই মরম্বামীটিকে কত ক্ষুদ্র এবং নিজেকে কত উচ্চ বোধ করিতে ছিলেন সে কথা ভিজ্জালা করার আজ পর্যন্ত কোন

সঙ্কল্প পাই নাই। তিনি যে স্থানেই গিয়া ছন, শুধর মিনার তত্ত্ব কিছুই বাদ দেন নাই। উচ্চে উঠিবার সুযোগ পাইলেই সেখানে আরোহণ অনিবার্য, নিষেধ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। বোধ করি আমাদের এই ডানাকাটা মর্ত্তা পরীর দল তাঁহাদের ডানাকা সময়ের অভ্যন্তর আকাশ বিহার আজও ভাল করিয়া ভুলিতে পারেন নাই, তাই সুযোগ পাইলেই তাহার সম্মুখ হইয়া থাকেন। আমার আত্মীয়দের অনেক কলিকাতার মহুমেন্টে আরোহণ করিবার আরজি আমার নিকট পেণ করিয়াছেন, আমি রাজি হই নাই বলিয়া আমার প্রতি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হস্ত অসহ্য আছেন। কিন্তু কি করিব, যুগ্মা সিঁড়ির ভর আমার জীবনেও গেল না। আমি ত যুগ্মা সিঁড়ির কাছেও যাই না, অপরকে চড়িতে দেখিলেও আমার হৃৎকম্প ও সর্দাদের শিহরণ চেষ্টা করিয়াও নিবারণ করিতে পারি না। স্রীলোক, বিশেষতঃ নিজের স্ত্রী বাহা পারে, তাহা পারি না, ইহা স্বীকার করা নিদারুণ লজ্জার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু "সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদি যে শাস্ত্রেরই কথা।

কুতব মিনারের সরিষাকটে অর্থাৎ পৃথ্বীলোকের দুর্গের তত্ত্ব বিশেষর নিকটে একটা শৌহতস্ত আছে বাহা বথার্থই বিশ্বজনক পদার্থ। আজ কতকাল ধরিয়া অনাবৃত স্থানে মেঘ ও ঘৌড়ের সমস্ত উৎপাত শিরে বহন করিতেছে, তথাপি লোহের চাকচিক্য ও মন্থতা কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। ইহা যে সময়ের স্তম্ভ, সে কালে কোন পদার্থই কলে প্রস্তুত হইত না; এত বৃহৎ শৌহতস্ত বাহার আশ্রয় মতকে কোথাও কোন জোড়া নাই, তাহার উপযুক্ত "হাকর, হেভেন, হাফুডি" ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পদার্থই বা কত বড় ছিল এবং ঐক্লপ বৃহৎ যন্ত্রাতির সাহায্যে এই বৃহৎ স্তম্ভ সন্তত হইল কিরূপে ইহা বুঝিয়া উঠা একালের বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষেও নাকি তদ্বিহীন কঠিন ব্যাপার। এই শৌহতস্ত সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা অশোক স্তম্ভ; মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়ে

সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ নাকি কল্পনা করিতেন যে, পৃথ্বীরাজ প্রথম বারে ঘোরীকে পরাজিত করিয়া পরে বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ এই স্তম্ভ প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার রাজধানীতে প্রোথিত করাইয়াছিলেন। আবার শু'নরাছি, কেহ কেহ বলেন যে, অপর কোন ক্ষত্রিয়রাজা তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করিবার জন্য, বৈদিক কাল প্রসিদ্ধ এক মহাবজ্র করিয়া এই স্তম্ভ তিনি স্বয়ং বহুস্তে তাঁহার সামন্ত রাজগণের সাহায্যে বান্ধুকারি কণার উপরে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সেই কণিরাজের কণা কোথায় তাহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বেত্তা বেদবিদ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা গণনার হির করান হইয়াছিল। এইরূপ রহস্যকর কল্পনা গল্প করিবার সামগ্র্য, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য ইহার মধ্যে কতখানি আছে তাহা ইতিহাস-বেত্তা বাঁহারা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

আবার শুনিয়াছি যে এই স্তম্ভের গাজ্রে খোদিত লিপিতে বাহা লিখিত আছে, তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া নাকি জনা গিয়াছে যে, গাণ্ডবাল কিংবা অপর কোন রাজবংশের রাজগণের মধ্যে হস্ত নামক এক রাজার সময়ে এই স্তম্ভ নির্মিত হয়। যদি স্তম্ভগাজের লিপি পাঠে এই তথ্য আশ্চিত হইয়া থাকে, তবে সম্ভবতঃ উহাই সত্য, কিন্তু এক রাজার সময়ে নির্মিত স্তম্ভের গাজ্রে অপর রাজকর্তৃক লিপিও খোদিত হইতে পারে—যেমন এলাহাবাদের অশোক স্তম্ভ অশোকের অনুশাসন এবং গুপ্ত সম্রাটের অনুমেধ ব্যাপারের কথা উভয়ই খোদিত রহিয়াছে। তবে দিল্লীর লোহস্তম্ভে একাধিক লিপি খোদিত আছে কিনা জানি না। বাহাই হউক, ইহা কোন সময়ে কোন রাজা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল তাহা নির্ধারণ করা প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকের কার্য, উহা আমার জ্ঞান সাধারণ লোকের কর্তব্য-সীমার বাহিরে এবং সাধারণ অতীত। এই বিষয়কর বৃহৎ স্তম্ভ, ইহার উৎকৃষ্ট লোহ ও সূক্ষ্ম গঠন দেখিয়া নিশ্চিত ধারণা হয় যে, বহু পুংকাল হইতে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ শিল্পকলা প্রব

সামগ্রী প্রস্তুত হইত এবং এমন সকল অভূত বিষয়কর সামগ্রী এই ভারতে জন্মান্ত করিয়াছে বাহার নট্যবশেষ ছই একটি পদার্থ দেখিয়া বিশ্বাসে নির্ভীক হইয়া যাইতে হয়। বর্তমান যুগের সভ্যতার জন্য নিকেতন ইউরোপ বা মার্কণের বড় বড় বিদ্যান ইঞ্জিনিয়ারগণও বৃক্ষের উদ্ভিতে পারেন না যে, সে কালের বর্ষার ভারতবাসী এরূপ সভ্যতানোচিত অ্যাশ্চর্য্য, বিশ্বকর শিল্প সামগ্রীর জন্মান করিয়াছিল কেমন করিয়া। তাজমহলের সূক্ষ্ম এবং বিশাল উচ্চ মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি বৃহৎ প্রস্তর গোলক সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অত বড় মন্দিরের উচ্চ শীর্ষে তাদৃশ বৃহৎ গোলাকার পাথর কেমন করিয়া তুলিয়া দিয়াছে টহা বর্তমান কালের ইঞ্জিনিয়ারগণের জ্ঞানের বাহিরে, কারণ তাঁহারা মনে করেন, সে কালের সভ্যতাহীন ভারতবাসীর, গুলু তার উক্টে উঠাইবার জন্য ক্রমের মত কোন কৌশল থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তাই এই বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যে জাতির মস্তকে বেদ বেদান্তদর্শন, উপনিষৎ তন্ত্র মন্ত্র চিকিৎসা, চতুষ্টয় প্রকার কলাবিদ্যা ও পুরী প্রাচীর, নগর, বন্দর, মন্দির, মসজিদ নিৰ্ম্মাণের কৌশল প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ স্থান পাইয়াছে, তাহাদের পক্ষে গুলুতার উত্তোলনের ক্রমবৎ কোন কৌশল বা বৃহৎ লৌহস্তম্ভ নিৰ্ম্মাণ কিছু কঠিন কথা নহে।

পৃথ্বীরাজের পুরাতন প্রাঙ্গণের ভগ্নাবশেষে এবং তাহার চতুর্দিকস্থ ভীর্ণ পাবাণের তৃণ, কুতব মিনার প্রভৃতি দেখা এক দিনে শেষ করিতে পারি নাই। সেখানে একটি ডাকবাংলা ছিল,—এখন একাধিক হইয়াছে—আমি সেই ডাক বাঙ্গলার রাতি বাগান করলাম। রাত্রে আহারাদির ব্যবস্থা সেইখানেই একরূপ করিয়া লইলাম। ডাক বাঙ্গলার খাটরা ছিল কিন্তু বিছানার অভাব, সঙ্গে পাড়িতে ছই এক খানি রাগু বাহা ছিল তাহা দ্বারা কাঁচ ঢালাইয়া লওয়া গেল; কারণ সে বয়সে শীতে অধিক কাতর করিতে

পারিত না এবং নিভ্র। দেবীর অশুকম্পাও যথেষ্টই ছিল।

পর দিবস আর একবার চতুর্দিক ঘুরিয়া লইয়া গেই পাশের প্রাণন হইতে বিদায় লইলাম। পথে এক স্থানে কুপে রূপ প্রদান দেখিলাম। সে ব্যাপার আমার নিকট বড়ই তীতিপ্রদ এবং বিপজ্জনক বোধ হইল। চতুর্দিকে প্রাচীর, মধ্যস্থলে শূণ্যভীর কূপ, উচ্চ প্রাচীরের উপর আরোহণ করিয়া শূণ্যভীর কূপের মধ্যে রূপ প্রদান করিতেছে এবং পুনরায় প্রাচীরে আরোহণ করতঃ বিপরীত লক্ষের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। দৈবাৎ যদি কুপের পাশে বেঠেনে অল্প প্রাণের কোন অংশ আঁত ভয়, তবে মুহূর্ত্ত অনিবার্য। কিন্তু সামান্য অর্থপাতের আশায় এই কার্য্য করিতে কিছু মাত্র ভয় করে না। দশ বার বৎসরের বালক হইতে আরম্ভ করিয়া, পরিণত বয়স প্রৌঢ় পর্য্যন্ত এই কুপে রূপ প্রদান করিয়া দর্শকগণের নিকট হইতে অর্থপাত করিতেছে। সে অর্থ অধিক নহে, দুই চারি আনা পাইলেই এই প্রাণ সংশয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ নাই।

কুতবের পথ ব্যতীত আরও দুই এক স্থানে এই লক্ষ ব্যাপার দেখিয়াছি—কুতবের পিকরীর “বুলন্দ দরওয়াজার” নিকটে এই রূপ একটি বৃহৎ “বাউলী” আছে, তাহার মধ্যেও সেই স্থানের সুসম্মান বালক বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ়গণ কাঁপাইয়া পড়ে। এই ব্যাপার বিপদ-সমুদ্র বিবেচনার পুলিশ হইতে নিবেদন আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল শুনিয়াছি, কিন্তু দর্শক কেহ উপস্থিত হইলে গোপনে নিবেদন অবহেলা করিয়া ইহার বস্ত্রের জন্ত প্রস্তুত বর। দর্শকেরাও কোতুল বশতঃ, কিংবা নিবেদনজ্ঞার বিষয় না জানিয়া এত অজ্ঞত এবং অকরণীয় লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া থাকেন। আমার জী বখন দিল্লী, আগরা প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন, তখন তাহার সমুখে এই অসম-সাহসিক মুসলমানগণ কুপে কাঁপাইয়া পড়বার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রাচীরের উচ্চতা এবং গভীর কূপের অবস্থা দেখিয়া

ঐ লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখেন নাই; এবং সকল লোকদিগকে বিনা বস্ত্রে তাহাদের আশাতিরিক্ত অর্থ দান করিয়া বহু আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। বস্ত্রতঃ কোনও জীলোকের পক্ষে ঐ ভীষণ ব্যাপার দাঁড়াইয়া দেখা এবং তাহাতে আরোহণ বোধ করা, আমার মনে হয় কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। কোনও দেশের কোনও নারীর পক্ষে এই একান্ত অকরণীয় হুঃসাহসিক কার্য্য নৈতিক ভাবে দাঁড়াইয়া দেখা করবার অতীত। এই বর্করোচিত হুঃসাহসের কার্য্য নাকি বাদশাহী আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং বাহারা কার্য্য করে, তাহার নাকি, বাহারা পূর্বে করিত তাহাদের বংশধর, অর্থাৎ পুরুষাণুক্রমে ইংরাজ এই কার্য্য করিয়া আসিতেছে। বাল্যকাল হইতেই নাকি ইংরাজ এই বিষয়ের শিক্ষালাভ করে—বিচিত্র নহে! অতি প্রাচীন কালের গ্যাডিয়েটার দিগের হিংস্র পশুর সহিত যুদ্ধ ব্যাপার ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি এবং ইতিহাসেই লিখিত রহিয়াছে যে, সন্তে সমস্ত নরনারী এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিবার জন্ত বিজীর্ণ রক্তক্ষুণ্ণ হইয়া দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিয়া থাকিত। হিংস্র পশুর আঘাতে মদের মৃত্যু চক্ষুর উপরে ঘটিতে দেখিয়াও পুরুষ জীলোক কেহই এই লোমহর্ষণ তৌতুকজীড়া দেখিবার ইচ্ছা নিবারণ করিতে পারিত না।

স্পেন দেশে “বুল কাইট” নাকি আজিও হয় এবং দেশ দেশান্তর হইতে নর নারী এই নিশ্চয় বুল কাইট দেখিবার জন্ত স্পেনে একত্রিত হইয়া থাকে। বাদশাহী আমলে দিল্লী অঃপ্রায় হস্তবুদ্ধ—বাহাতে মাজতের মৃত্যু হইবার আশঙ্কা পদে পদে ছিল—শাশনশাহগণের নিত্য বর্ষের মধ্যে পরিগণিত বলিয়া ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে। এই সকল ব্যাপার বখন ঘটিতে পারিয়াছে তখন কুপে রূপ প্রদান ত সামান্য কথা। মানুষ সভ্যতার পথ যতই কেন অগ্রসর না হউক, বাহিরে মানুষ যতই কেন দেবতাবাদ দেখাইতে চেষ্টা না করুক, অন্তরের কোনও এক নিহৃত প্রদেশে পশুতাব কেন যে সুকাইত থাকে, তাহা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন,

সেই সর্বশক্তমানই জানেন । মাতৃবের স্বরক্ষণে পণ্ড যদি বিচরণ না করিত, তাহা হইলে যুগে যুগে কুকর্মেদের অতিনয় হইত না এবং এই ভ্রামা ধর্মীর বকের উপর দিয়া শোণিত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ খেলিত না ।

কুতবের চতুর্দিক হইতে দিবস ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটু শ্রান্তি বোধ করিতেছিলাম, সেই জন্ত আমি এক দিবস দিল্লীতে বিশ্রামার্থ রহিয়া গেলাম । দিল্লীর প্রসিদ্ধ “চাঁদনি চক্” দিবসে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, বহু খ্যাতি সম্পন্ন “হাম্বাম্” এ মান করিতে গিয়া নানিতের পদাঘাত সর্বদা লাভ করতঃ কুতাব

হইলাম, এবং চাঁদনি চকের প্রসিদ্ধ হস্তশিল্পের কিছু কিছু জিনিস এবং দিল্লীর এমব্রয়ডারি (Embroidery) কিছু ক্রয় করিতে অর্থ ব্যাপারে একরূপ রিক্তহস্ত হইয়া পড়িলাম । বাড়ী হইতে তারযোগে পুনরায় টাকা আনাহিঁতে আরও দুই দিবস বিদগ্ধ ঘটিয়া গেল । তাহার পরে, দিল্লীর লাড্ডু খাইতে না পাইয়া “পল্টাইতে পল্টাইতে” দিল্লী ত্যাগ করিয়া হানাত্তরে বাজা করিলাম ।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিশ্বনাথ রায় ।

কুটালম্

কুটালম্ তিনেভেলী জিগার প'চম-প্রান্তে, তেঙ্কাশী তালুক্কর অন্তর্গত একটি শৈল-বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রাম । ইহা একটি তীর্থস্থান ; কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যকর জল-বায়ুর জন্তই স্থানটি জীবদ্ভ-দেশে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে ।

তিনেভেলী হইতে ট্রেন ধরিয়া আমরা তেঙ্কাশী টেপনে আসিয়া পৌছিলাম । মাত্রাজ হইতে এই টেপনের দূরত্ব ৪৮৭ মাইল । তেঙ্কাশী চিডা নদীর তীরে অবস্থিত । এখানে তংশীলদার ও সাব ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী, সাবরেকর্ডারী আফিস, ডাক্তারখানা ইত্যাদি আছে । কিন্তু একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের জন্তই তেঙ্কাশী বিখ্যাত । এই মন্দির হইতেই স্থানের নাম হইয়াছে “তেঙ্কাশী” অর্থাৎ “দক্ষিণ কাশী ।” মন্দিরের একটি স্তম্ভে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—পাণ্ড্য বংশে অরিকেশরী-পরাক্রম নামক এক অশল'পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন । কাশীধামে ৮বিখ্যাত মন্দির সংস্কারভাবে বিনষ্ট হইয়া বাইতে-

ছিল, সেই জন্ত বহু বিখ্যাত নগ্রে রাজা অরিকেশরীকে আবেদন করেন যে, দক্ষিণ দেশে তাঁহার জন্ত নূতন মন্দির নির্মাণ করা চউক । সেই অনুপ্রা-দেপের ফল—তেঙ্কাশীর মন্দির । ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরে শিবপ্রতিষ্ঠা হয় । ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণকাণ্ড শেষ হয় এবং রাজা অরিকেশরীও ঐ বৎসর পরলোক গমন করেন :—মন্দিরের প্রাচীর-গায়ে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পাণ্ড্য রাজগণের অনেকগুলি অলুশাসন আছে ।

৮কাশীধামের তুল্য মহাশালাত করিতে না পারিলেও, তেঙ্কাশী এক সময়ে তীর্থ বলিয়া গণ্য হইত । ‘ভৈত্তল্লি-চরামৃত’ে লিখিত আছে, মহাপ্রভু পাণ্ড্য দেশে তীর্থভ্রমণ করিবার সময়

“ভিলকাণ্ডী আসি কৈল শিব দরশন ।”

‘জীবদ্ভ দেশে, ‘শিবকাণ্ডী’ ও ‘বিষ্ণুকাণ্ডী’ আছে, কিন্তু “ভিল-কাণ্ডী” নামক কোন তীর্থ নাই । সত্যতঃ

লিপিকর গ্রামে ‘তেন্-কাশী’ ‘তিলকাশী’ মূর্তি ধারণ করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

শিবমন্দিরের ‘গোপুরম্’ (তোরণ) নির্মাণ করিতে দশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। আর বেড়শত বৎসর পূর্বে এই অভূত গোপুরমের উর্দ্ধাংশ অগ্নি-সংযোগে বিনষ্ট হইয়াছে। উহা এখন ধ্বংসোদ্ভূত। সেই ভগ্ন বাহির হইতে মন্দিরটিকে পারিত্যক্ত ‘ভাঙা দেউল’ বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের বহিঃস্থ মণ্ডপের উত্তর পার্শ্বের প্রত্যেকটি স্তম্ভ এক একটি মূর্তির আকারে খোদিত। নৃত্যরত মহাদেব, মহাদেবী, মদন ও রতি প্রভৃতির বৃহৎ মূর্তি এক এক খণ্ড প্রস্তর হইতে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত খুদিয়া নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের হাতে পুষ্পধর পরিবর্তে সরস ইক্ষু দণ্ডের ধ্যু দেখা গেল। [ইহা বার্য্য সম্ভবতঃ এই তত্ত্ব প্রচলিত হইতেছে যে ভগ্নর জয়ের পক্ষে মিষ্ট রস একান্ত আবশ্যক!] এই মন্দিরের প্রস্তর মূর্তি সমূহের অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

মূল মন্দিরের পার্শ্ব ‘বসন্ত-মন্দির’ অর্থাৎ “বাগান বাড়ী।”—মহাদেব বসন্ত-বাগন করিবার জন্য এই মন্দিরে আসিয়া থাকেন। তাহার পাশে দেবী মন্দির। দেবীর নাম বিশালাক্ষী। রামেশ্বরের মন্দিরেও বিশ্বনাথের পার্শ্ব বিশালাক্ষী অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছি।

তেন্-কাশীর ৩০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, পশ্চিমঘাট পর্বতমাগার একটি শাখার পাদমূলে কুট্টালম্। তেন্-কাশী হইতে কুট্টালম্ পর্য্যন্ত তরুচ্ছায়ামণ্ডিত সুন্দর রাজ-পথ। কুট্টালম্ একটি উপত্যকা!—সমুদ্র সমতল হইতে ৫৫০ ফুট উচ্চ। এই স্থানে চিত্রা নদীর জল-প্রপাতের দৃষ্ট অতি রমণীয়। জল-প্রপাতের পার্শ্বই শিব-মন্দির। স্থানীয় কিম্বদন্তী অনুসারে, এই পর্বতের নাম ত্রিকুটাচম্ এবং শিবের নাম ত্রিকুটালেশ্বর। ত্রিকুটাচম্—“ত্রিকুটালম্” এবং পরে “কুট্টালম্” (ইংরাজীতে Courtallam) হইয়া পড়াইয়াছে।

আমি যে দিন কুট্টালমে গৌছিলাম, সে দিন সেখানে

বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। যাত্রীগণের বাসের জন্য মন্দিরের কর্তৃপক্ষ সারি সারি গৃহনির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, কয়েকটি হোটেল এবং সজ্ঞও আছে। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া ভিন্ন স্থানবাসী কয়েক জন ধনী ব্যক্তি এখানে বাস-গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। জিবাভূর মহারাজেরও এখানে একটি বাড়ী আছে। মন্দিরের অদূরে একজন ক্রমিদারের একটি বৃহৎ অট্টালিকা খালি পড়িয়া ছিল; আমি সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই গ্রামাঙ্গের দ্বিতলের বারান্দার বসিলে, সমুদ্রবর্তী পর্বত-শিখরে স্তম্ভ-মেঘের সঞ্চারণ এবং নিরন্তর চিত্রা নদীর প্রপাতের বিভিন্ন দৃষ্ট পরিষ্কার রূপে দেখা যায় এবং জলের কব্বার তান অবিরাম কাণে আসিতে থাকে।

কুট্টালম্ জলপ্রপাতের বিশেষত্ব এই যে, এখানে শৈল-মূলে বসিয়া ঝরণার জলে স্নান করিবার সুবিধা আছে। এইরূপ স্থানে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। শতাধিক বৎসর পূর্বে যুরোপীয়গণ এই ঝরণার জলে স্নানের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া স্বাস্থ্যশালাভের জন্য মাঝে মাঝে কুট্টালমে আসিতে আরম্ভ করেন। জুন হইতে অক্টোবর মাস এখানে বাস করিয়া স্নান করিবার উপযুক্ত সময়। এখনও জিবাভূর ও তিনেভেলী হইতে অনেক যুরোপীয় নরনারী প্রত্যবৎসর এই স্বাস্থ্যনিবাসে আসিয়া থাকেন। যুরোপীয়গণের স্নানের বস্ত্র সময় নির্দিষ্ট আছে।

পরদিন প্রাতে আমরা প্রথমেই প্রপাতের জলে স্নান করিতে গেলাম। পর্বতের শিখরদেশ হইতে জলধারা শিলার শিলার প্রতিধ্বত হইয়া, পর্বতমূলের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে সমুখে প্রসারিত একখণ্ড প্রশস্ত শিলার উপর আছাড়িয়া পড়িতেছে—এবং উৎক্লিষ্ট নীলরক্তা ছতাকারে সমুদ্র জলকূণ্ডে আসিয়া মিশিতেছে। ঐ শিলাখণ্ডের ঠিক নিম্নেই স্নান করিবার স্থান। একটি সেতু অতিক্রম করিয়া ঐখানে পৌছিতে হয়। জল প্রপাতের বেগ স্নানার্থীকে সহ্য করিতে হয় না—প্রকৃতি-রচিত “shower bath”-এর জলধারায় স্নান করা

৷। আনের স্থান লোহার
 রেংগ দিরা ঘেরা—উহার
 একদিকে জীলোকদিগের ভক্ত।
 নিকটেই বজ্র পরিবর্তনের ভক্ত
 একটি গৃহ আছে। পর্বতের
 গায়ে অগণ্য শিবলিঙ্গ খোদিত।
 শীকর ধারার স্নান করিয়া শতীর
 যেমন স্নিগ্ধ, মনও তেমনি
 প্রফুল্ল হইল। অগ্ধারা নিয়ে
 একটি অগভীর কুণ্ডে পড়িয়া
 যেইখান হইতে স্রোতস্বিনী
 আকারে পূর্বদিকে প্রবাহিত
 হইয়াছে। এই স্থানেই
 চিত্রানন্দীর যাত্রা আরম্ভ।
 স্নানকুণ্ডের উত্তর ধারে “তীর্থ-
 বারি মণ্ডপ”—পর্কোপলক্ষে
 তীর্থজলে স্নান করিবার ভক্ত
 দেবতা এই গৃহে আনীত হন।
 কুটালমের শিবমন্দির তেজ্
 কাশীর মন্দিরের প্রায় বড় নহে।
 মন্দির পূর্বদ্বারী, সমুখে প্রশস্ত
 মণ্ডপ—উহার মধ্য স্থলে ধ্বংসস্তম্ভ
 এই মণ্ডপ গৃহ মন্দিরের প্রায়
 প্রাচীন, নহে—অষ্টাদশ শত-



কীতে নির্মিত। যে ভূমিদার এই মণ্ডপ নির্মাণ
 করিয়াছিলেন, মণ্ডপের একধারে তাঁহার বৃহৎ প্রস্তর
 মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিম্বদন্তী অনুসারে,
 পুরাকালে এখানে একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল; অগত্য
 মূন্নির তপোবলে বিষ্ণুমূর্তি শিবলিঙ্গে রূপান্তরিত
 হয়। এই মন্দিরের প্রাচীরে পঞ্চদশ শতাব্দীর
 পাণ্ডুরাজপুত্রের অনুশাসনে উৎকীর্ণ আছে।

শিবমন্দিরের পার্শ্বেই দেবীমন্দির। পুরোহিত
 বলিলেন, দেবতার নাম কুটালম নামী এবং দেবীর
 নাম “বেণ-বাক-বাচিনী।” দেবী মন্দিরের সমুখত

কুটালম জলপ্রপাত

কুটালম-মণ্ডপে কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত মূর্তি রহিয়াছে।
 একদিকে মদন, অন্যদিকে রতি। অন্য দুইটি মূর্তি
 চিনিতে পারা গেল না। মন্দিরের অভ্যন্তরে, ছোট ছোট
 কক্ষে বহু শিবলিঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছে।

দক্ষিণদেশে, প্রায় প্রত্যেক দেব মন্দিরের সান্নিধ্যে
 একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়—উহার নাম
 “তেপাকুলম” অর্থাৎ “তেলা সরোবর।” পর্কোপলক্ষে
 দেবতাকে এই সরোবরে স্নান করিয়া স্নানজল
 তেলার উপর স্থাপন করা হয়। কুটালম মন্দিরের
 নিকটেও একটি “তেপাকুলম” আছে—উহার মধ্যস্থলে

উচ্চ গোপুরম্। এই শ্রাবণ মাসে পুষ্করিণী প্রায় জল-
শূন্য। পৌষ মাসে এসিকে বর্ষাকাল—তখন এই
পুষ্করিণী জলে পরিপূর্ণ হয় এবং কুটিলনাথের ‘ভেলা
উৎসব’ হইয়া থাকে।

সরোবরের পূর্ব তীরে ‘চিত্র-সভা’ নামক একটি
প্রাচীর বেষ্টিত গৃহ। এই গৃহের সমস্ত প্রাচীর দেব-
দেবীর চিত্রে মণ্ডিত। এখানেও মদন ও রত্নের চিত্র
দেখিলাম—মদনের বাহন শুক পক্ষী এবং রত্নের বাহন
হংস। লঙ্কাধিপতি রাবণ বীণাবাদক রূপে চিত্রিত।
এদেশে প্রবাদ, রাবণ বীণা সংযোগে সামবেদ গান
করিতেন।

অপরাজে, ভ্রমণ করিবার তত্ত্ব পরিতের শিখরদেশে
উঠিতে লাগিলাম। কুটিলম্ প্রপাতের নিকটে পাণ্ডুর
নিম্নদেশে “করেটে অকিস।” অনেক সময় গবর্ণমেণ্টের
কর্মচারিগণ কুটিলম্ আসিয়া এই অকিসেই বাস
করিয়া থাকেন। জলপ্রপাতের উর্দ্ধে একস্থানে
দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ নিরুত্তরের চঞ্চল নৃত্যলীলা
দেখিলাম।—

“নিরুত্তর করে উচ্চাস ভরে

বহুর শিলা সরণে।

ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি

পাষাণ ছদর হরণে।

কোমল কণ্ঠে কুলু কুলু স্বর

ছুটে অবিরল তরল মধুর,

সদা-শিখিত মণিক নুপুর

বীধা চঞ্চল চরণে।”

পেড় মাইল পথ হাটিয়া আমরা চিত্রান্দীর আর
একটি জলপ্রপাতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহার
নাম “শেখকা (চম্পকা ?) দেবী”—প্রপাত। জল
প্রপাতের এক পাশে, ক্ষুদ্র প্রস্তর মন্দির। মন্দিরের

দ্বার বন্ধ, শুনিলাম বিশেষ বিশেষ পরীক্ষণক্যে উহা
খোলা হয়, এবং সেই সময় দেবীর মূর্তি দর্শন করা
যাইতে পারে। মন্দিরের নিকটে একজন সত্তানী
বসিয়া আছেন—এই স্থানেই তাঁহার আশ্রম।
তীর্থ গর্জন করিয়া বরণার জল উপর হইতে পাথরের
উপর পড়িয়া চঞ্চল বেগে নীচের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।
এখন “নিরুত্তর মগ্ন ভঙ্গ”—এখনও সে চিত্রান্দীর
মূর্তি ধারণ করে নাই, কিন্তু তাহার দ্বারে প্রবল
আকাজকা জাগ্রা উঠিয়াছে—

আমি ডাকিব করুণা ধারা

আমি ডাকিব পাষণ-কাণ,

আমি জগৎ প্রাণিরা বেড়াব গাহিরা

আকুল পাগল-পারা।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব

ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,

হেসে খলখল গেয়ে কলকল

তালে তালে দিব তালি।

তটিনী হইয়া বাইব বহিরা

নব নব দেশে বারতা লইয়া

হৃদয়ের কথা বহিরা বহিরা

গাহিরা গাহিরা গান।

এই স্থান হইতে, দূরে নিম্ন ভূমিতে তেতু কাশীর
মন্দিরের উচ্চ গোপুরম্ দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম,
আরও দুই মাইল পথ উর্দ্ধ আর একটি জল-প্রপাত
আছে—উহার নাম “তেতু-মারিতি” অর্থাৎ দক্ষিণ
দিকের জল-প্রপাত। কিন্তু ততদূর উঠিতে আমার
উৎসাহ ছিল না। সুতরাং “শেখকা-দেবী” প্রপাত
দেখিরাই প্রত্যাবর্তন করিলাম।

শ্রীমণীমোহন ঘোষ।

ପ୍ରାଚୀନ ନୃତ୍ୟ

(୧୮୫୩ ଖ୍ରୀ: ପ୍ରକାଶିତ Read's Characteristic Dances all Nations ହସ୍ତେ)



ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ଶାମନୃତ୍ୟ



ହରି ମାଧବୀଙ୍କ ଛାତ୍ର

শিকার ও শিকারী

হাওদা শিকার।

(পূর্বানুস্মৃতি)

বাঘ অত্যন্ত সতর্ক জন্তু। কিন্তু একস্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। কোন কোন সময় গুরু ভোজনের পর, ইহাদের নিদ্রা এত গভীর হয় যে, সহজে জাগ্রত হয় না।

একবার আমাদের দেশে ভদ্রানীপুর নামক স্থানে ক্যাম্প করিয়া আমি ও রাজা জগৎকিশোর * শিকার করিতে যাই। ঐ স্থানের জঙ্গলে অনেক কঁটা বাঘ ও গারো বাদা থাকায়, হাতীদারা শিকার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। [আমাদের দেশে জঙ্গলে গারো আসিয়া স্থানে স্থানে 'জুম' করে। ইহাদিগকে লামদানী গারো বলে। পাছাড়ের নিম্নভূমিতে বসতি করে বলিয়া ইহাদের ঐ প্রকার নামকরণ হইয়াছে। ইহারা ৩৪ বৎসরের অধিক একস্থানে থাকে না। তাহারা চলিয়া গেলেই ঐসব স্থানে ভরানক কঁটা জঙ্গল জন্মে; উঠাকেই "গারো বাদা" বলে।] গারো বাদাতে হাতী প্রবেশ করা অসম্ভব। আমরা ২১শত প্রজা সংগ্রহ করিয়া, হাতীর সঙ্গে একত্রে জঙ্গল ভাঙাইতাম, কয়েক দিনের উপযুগির চেষ্টাতেও কোন ফল পাই নাই। কিন্তু এমন রাত্রি ছিল না যে বাঘের ডাক শোনা না গিয়াছে, অথবা মরি (kill) না করিয়াছে। আমরা

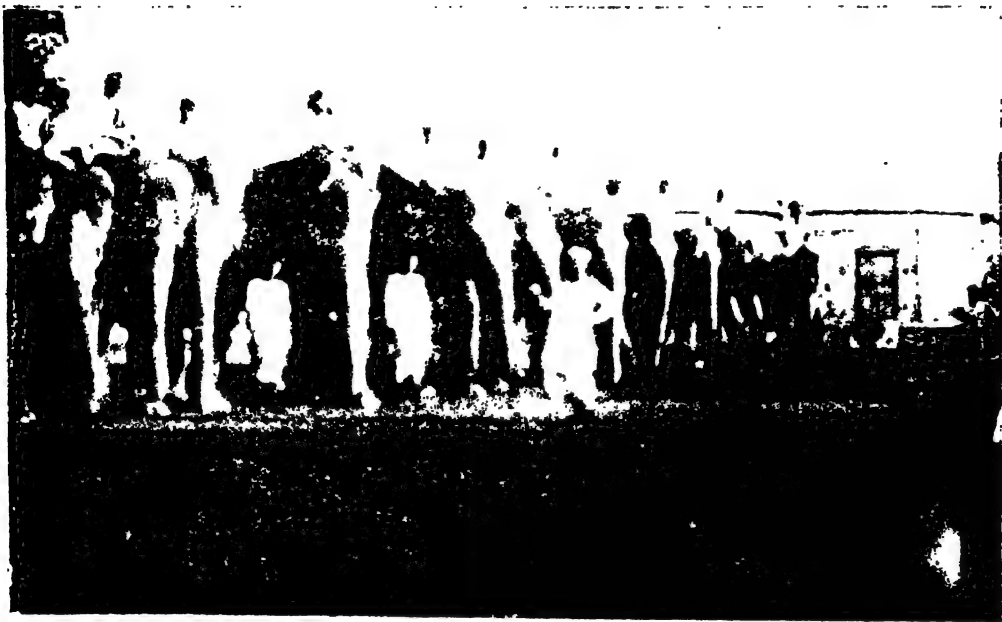
* বিপ্লব ফাল্গুন সংখ্যা পত্রিকায় এই প্রবন্ধের পূর্বানুস্মৃতি প্রকাশ করা বশতঃ জীবিত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের নামটি (পরলোকগত) রূপে বৃত্তি হইয়াছে। এই বাহাদুর প্রবন্ধের জন্য আমরা অতীত হৃদয়ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছি। রাজা জগৎকিশোর সুস্থ ও দিবাংর মধ্যে সুখী জীবন লাভ করুন ইহাই ভগবৎসমীপে আমাদের প্রার্থনা।

— বাঃ হঃ সম্পাদক।

যখন কয়েক দিনের ক্রমাগত চেষ্টাতেও অকৃতকাব্য হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিব মনে করিতেছিলাম, এমন সময় একদিন এক ককির আসিয়া মধ্য পড়িয়া বাঘ দেখাইবে বলিল। অক বিখ্যাসী প্রজাদের অগ্ন্যু-
রোধে একদিন সেই ককিরকে লইয়া শিকারে বাহির হইলাম। ককির হাতীতে উঠিয়াই, খানিক ধূলি চাতে লইয়া উড়াইয়া দিয়া এফদিকে আমাদিগকে যাইতে বলিল, আমরাও তাহাই করিলাম। প্রাতে ৮টা হইতে আশ্রয় করিয়া বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত অকৃত চেষ্টা করিয়া আমরা সকলেই এত পরিশ্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তখন ঐ ককিরকে যে পার পেছ মারে এই অবস্থা হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার গহ্বরের অধিক ছন্দা হইয়াছিল। তখন বুঝিতে পারি নাই যে মজতরা দুইটি করিয়াই তাহাকে এক বদ হাতীতে উঠাইয়া দিয়াছিল। খানিক পরে দেখা গেল এক মজত ককিরকে হাতী দিয়া কাড়াইয়া ফেলিয়া তাহার হৃদয় চূড়ান্ত করিয়াছে। বাগ হটক, ককিরের এই হৃদয়শার পর পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল যে আরও খানিক দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া হইবে। পরামর্শ হইল বটে, কিন্তু অত্যন্ত পরিশ্রম হওয়ার লাইনের প্রতি কাহারও তেমন মনোযোগ হইল না। খানিক দূর লাইন করিয়া যাওয়ার পর, এক স্থানে অত্যন্ত কঁটা ছিল বলিয়া লাইনের অগ্রভাগ হাতী ও লোকজনের অপেক্ষায় হাওদার হাতীগুলি দাঁড় করাইতে হইল। Beater হাতী ও লোকগুলি ৪-৫০ গজ পিছনে, ভরানক সোর-গোল করিয়া আসিতেছিল। কেহ বা হাতী দিয়া বাঘ ও গাছ ভাঙিতেছে, কেহ বা 'দা' দিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে আসিতেছে, এইরূপে অগ্রসর হইয়া আমাদের সহিত মিলিতে উহাদের প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল।

জলের তো এই অবস্থা। এখন বাণের ঘূমের কথা বলিতেছি। এইরূপ ভীষণ গোলযোগের মধ্যে আমরা দাঁড়াইয়া আছি; রাজ্য ভগ্নাবস্থার আমার ৩০১০ হাত দূরে, একাকী কাঁটা বাঁশের ঝোপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'দা' দিয়া বাঁশের 'খড়কে' তৈয়ার করা হইতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার চাণ্ডার পিছনের লোক চর্চাং তাঁহাকে বলিল, "তত্ত্বের বাঁশ ঝোপের মধ্যে একটা কি যেন দেখা যায়।" তিনি অনেক উকিঝুঁকি

Beater হাতী এবং লোকজনগুলিও আর আসিয়া পড়িয়াছিল। গুলির সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনী তরানক ডাক দিয়া 'ঝটাপট' করিয়া দৌড় দিল। ইহার পরই আমরা তাড়াতাড়ি বতদূর সম্ভব লাইন form করিয়া খানিকদূর বাইরা দেখি, বাঘিনীর পেটে গুলি লাগিয়া নাড়ি ভুড়ি বাহির হইয়া গছের মধ্যে একদিক্ আটকাইয়া গিয়াছে। বাঘিনী উঠা টানিয়া বড়শিতে মাছ গাঁথার মত ১০-১২ হাত দূরে গিয়া পড়িয়াছে।



আমাদের হাতী লাইন

দিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরন্তু ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে কথাবাত্তা চলিতেছিল। হাতী এদিক ওদিক নানা স্থানে সরাইয়া, একস্থানে যেন হলুদে সতরাণের মত কি একটা পড়িয়া আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তাৎপর্য আর কিছুকণ উকিঝুঁকি করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, সাদা কি একটা একটু একটু নড়িতেছে। বাস্তবিক উঠা বাঘিনীর পেটের সালা লোমগুলি তাঁর আর কিছু নহে। ঐ নড়া স্থান লক্ষ্য করিয়াই তিনি ১২ বোঁর রাইফেলের একগুলি করিলেন। তখন পিছনের

পরে আর এক গুলিতে উহাকে শেব করা গেল বাঘিনীটা মাণে ৯ ফিট ৩ ইঞ্চি ছিল।

বাঘিনীকে মারার পর ককিরের আফগানে মাছতেরা কিছু দমিয়া গেল। "ঝেড় বক মরিল ককিরেরও কেরামত বাড়িল", পূর্নদিন ফকির বতটুকু নাকাল হইয়াছিল, পরদিন মাছতদের 'দিল্লি' বাইরা তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়াও সমাদক লাভবান হইয়াছিল।

এই ঘটনা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, অনেক সময় বাঘেরা ঘূমে কৃত্তকর্ণকেও পরাস্ত করে। মৃত্যুর পূর্বে বহু চেষ্টার কালে অকালে কৃত্তকর্ণেরও নিশা-

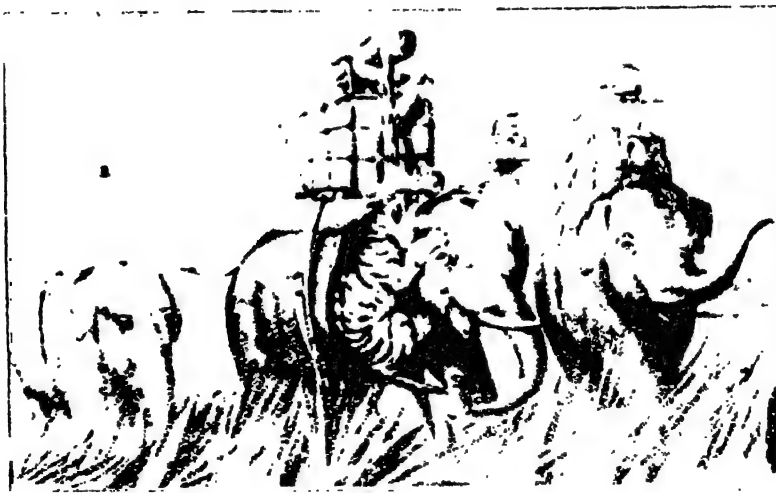
ভয় হইয়াছিল; কিন্তু ৫০টী হাতী ও বহু লোকজনের 'সোরগোলে'ও মৃত্যুর পূর্বে এই হতভাগ্য পশুর ঘুম ভাঙে নাই। ইহার পর আরও ২১০ স্থানে ঘুমন্ত বাঘ দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাদের নিদ্রা এত গভীর নহে—গোলমাল শুনিয়াই জাগিয়া পড়িয়াছে।

যে বাঘ মাহুঘের ত্রিসীমানাঃ আসিতে চায় না, তাহাদের আর একটি আশ্চর্য্য স্বভাব এই যে, খুব বেশী কুখার্ড হইলে অনেক সময় লোকজন গ্রাহ করেন না। নিম্নের ঘটনা দুইটী হইতে ইহাদের এইরূপ বিরুদ্ধ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একবার শিলেটের 'চন্দ্রপুর' ক্যাম্প হইতে আমরা কোন এক স্থানে শিকার করিতে গিয়া বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় রাস্তায় একজন লোক

যে বাঘ আসিয়াছে তাহা কেহ 'টের' পার নাই। ঐ স্থানটী আমাদের ক্যাম্পের অতি নিকটে ছিল। গোতে একটি বাছুও ধরিয়া নেওয়ার প্রথম বাঘের সন্ধান হয়। তখন কতকগুলি লোক সেট জঙ্গলে গিয়া বাছুবটাকে ছাড়াইয়া আনে। ইহার ঘণ্টাখানেক পরেই আবার কতকগুলি লোকের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বলদকে জখম করে। উহার বলদটাকেও বহু কষ্টে ছাড়াইয়া নেয়।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। এই সব হিংস্র জন্তুসমাকুল স্থানের লোকগুলি অত্যন্ত সাহসী হইয়া থাকে। ইহারা একাকী জঙ্গল দিয়া চলকেরা করিতে এবং এইরূপে বাঘের মুখ হইতে দক্ষ বাছুর ছাড়াইয়া আনিতে কিছুমাত্র ভয় পায় না। ইহাদের পরম



আমাদের হাওদা শিকার

উর্দ্ধ্বাঙ্গে নোড়াইয়া আসিয়া আমাদেরকে সংবাদ দিল, "জুহুর, বাঘ বাড়া।"—অর্থাৎ এক বাঘকে বেঁচ দিয়া খরিয়া রাখিয়া সে আমাদেরকে সংবাদ দিতে আসিয়াছে। শোকটা এত দ্রুত আসিয়াছিল যে, কিছুক্ষণ উহার মুখে কথাই সঠিতেছিল না। উহার নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিয়া সেখানে বাইরা দেখিলাম যে, কোন গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র নল-বনে (যেখানে বাঘ আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই) রাজে কোন সময়

দৌড়াগা এই যে ঐ সব জঙ্গলের বাঘ এ পর্য্যন্ত নরখাদক হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। নৱেৎ খাস-জঙ্গলে ইহাদের যে কি বিপদ ঘটতি তাহা বলাই বাহুগ্য।

বাঘটী অত্যন্ত কুখার্ড ছিল বলিয়াই বোধ হয় লোক জনের বাধা বিঘ্ন না মানিয়া ক্রমাগত গরু ধরিতেছিল; নৱেৎ সচরাচর প্রায় এরূপ করিতে দেখা যায় না।

আমরা আসিয়াই দেখিলাম ৪০৫০ জন লোক ও

৩৪টা হাতী বনটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। স্থানটি আমাদের ক্যাম্পের নিকট বর্তী বলিয়া, প্রথমতঃ ক্যাম্পে গিয়া যে করণী রুখ হাতী ছিল তাহার এবং ঠোকরনের সাতাষাে ঘিরিয়া রাখিয়া আমাদের অশেষ কষ্টেছে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আর শিকার করা চলে না বলিয়া অতঃপর কি করা হইবে তাহাই পরামর্শ চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন, “মরা গরুটাকে জঙ্গলে রাখিয়া দেওয়া উচিত। কাল আসিয়া শিকার করা যাইবে। মরা গরু লোভে বাঘ বনেই থাকিবে। যাইবে।” কাহারও মতে যে তাহা পাচার দেওয়া চলিতেছে, সমস্ত রাজি আলো জালিয়া রাখিয়া এইরূপ পাহারা দেওয়া চলুক। এইরূপ নানা উদ্ভট কল্পনার পর স্থির হইল যে, একটা বেটী (Lion) বাধা হইক। (বাঘের ‘মরিচ’ জন্ত যে জানোয়ারকে বাধা হয় তাহাকে bait বলে) পরামর্শের সীমিত ফিরিয়া গিয়া বেটী বাধার জন্ত একটা ঘোড়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ঘোড়াটিকে বনের নিকটেই কাঁকা দারগায় বাধা হইল। হাওদা-শিকারীদের সঙ্গে একটা অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, হাওদা শিকার করিতে চলিলে ২৪টা পোড়া বা মর্শ্বের বাচ্চা বেটী বাধার জন্ত সঙ্গে রাখা উচিত। অনেক সময় “মরিচ” খবর না পাওয়া গেলেও জঙ্গলে বাঘ আছে জানিতে পারিলে, মাছের চক্ক ‘চার’ ফেলার মত এই সব স্থানে বেটী বাধিতে হয়। জন্তার তাহাদের অগ্রগতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এই জন্ত বেটী সঙ্গে না থাকিলে অনেক সময় হাওদা শিকার ভাল হয় না। তখন স্থানে এইপ্রকার ‘মরিচ’ বাধাকে ‘গাড়া’ বাধা বলে।

বেটী বাধার নিয়ম এই—পুথ শব্দ সুরু হইয়া দিয়া লম্বা করিয়া ইহাদের পায়ে বাঁধা উচিত, গলার বাধা ঠিক নয়। যতদূর সম্ভব, বাঘকে ইহা বুঝিতে দেওয়া উচিত যে বেটী স্বাধীন ভাবে চলিতেছে।

বাগ হউক, পরদিন প্রাতে আমরা বাইরা দেখি ঘোড়াটি মরে নাই; কিন্তু উহার সর্বদ্য কত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। বাঘের একস্থানে চারিটা দাঁতের চিহ্নও রাখাছে।

প্রথমেই ঘোড়ার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া এত হুঃখ হইল যে তাহা বলিবার নহে। সে বেচারি কোন রকমে দাঁড়াইয়া ছিল মাত্র। স্থানের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, বাঘের সঙ্গে ঘোড়ার লড়াই হইয়াছিল। ঘোড়ার খুরের আঘাতে ঐস্থানে ঘাস ও মাটি খানিক খানিক উঠিয়া গিয়াছে। এক এক স্থানে মাটি ও জঙ্গল পাট হইয়া ধমির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমাদের সকলের ধারণা হইল যে, যখনই ঘোড়াটা আক্রান্ত হইয়াছে তখনই গিহ্ন কিরিয়া ক্রমাগত ‘পুতক’ খাড়া আশ্রয় করিয়াছে। হয়ত বাঘে কামড়াইবার সময় ঘোড়াটা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া বাঘটাকে ছাড়াইয়াছিল। ঘোড়াটা গাধীর ঘোড়া ছিল বলিয়া পায়ে নাল বাধা ও আরতাল বড় ছিল।

বাঘ হউক, জঙ্গলে ঢুকিতেই বাঘ পাওয়া গেল। প্রথমে মাছের উহাকে নিজস্ব অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পার। মনু বাঘের অবার্ষ সন্ধান পণ্ড-দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিবার সময় কিন্তু উহার গাধীর বীর্য দেখাইতে ছাড়ে নাই, যদিও তাহা ক্ষণিক। বাঘীটা মাপ ঢাকিটু হইক ছিল।

ইহার পরীক্ষা স্থানে স্থানে ফুসিয়া উঠিয়াছিল। দাঁতের গোড়ার ও খুরের অনেক স্থানে ঘোড়ার নালের চিহ্ন ছিল। ইহা দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছিল বলিয়াই বাঘটা এত বাধা বিয় সব্বো ছোট জঙ্গলে থাকিয়া ঘোড়ার সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল। কিন্তু ইহা জীবনে তাহার ক্ষুধার আর নিবৃত্তি হইল না।

আমার মনে হয় বাঘিনীটিকে না মারাই উচিত ছিল : জীবিত থাকিলে, অথ জাতির নিকট কিরূপ অশাস্ত হইয়াছিল তাহা জ্ঞাতি কুটুম্বের নিকট প্রচার করিত—হয়ত উহাতে তবিশ্যতে যেটুকু কুলের উপকারও হইতে পারিত।

ক্ষুধার জ্বালার অত্যন্ত অস্থির হইলে বাঘ লোকের ঘরে আসিয়া পড়িতে বিধা বোধ করে না। সে আশ্রয় ২০২৩ বৎসরের কথা, আমাদের বাড়ীর নিকট-বর্তী লাঙ্গুণীয়া গ্রাম হইতে একদিন একটা লেপার্ডের

সংবাদ পাইয়া শিকার করিতে বাই। সেদিন সঙ্গে হাতী বড় বেশী ছিল না, আমি একাই গিয়াছিলাম। আমার হাওদার ও অস্ত্রাস্ত্র হাতী সমেত সর্ব্ব ওজ ৪৫টা হাতী ছিল। হাওদার, আমার পশ্চাতে আমার পূজনীয় অগ্রঃ শ্রীযুক্ত সুধেন্দুনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ছিলেন। শিকারে আমার মত তাঁহার বাতিক না থাকিলেও, হাওদার পিছনে বসিবার বাতিক বড় কম ছিল না। বাড়ীর আশে পাশে শিকার হইলেই তিনি হাওদার পিছনে বসিয়া বাইতেন; এ ক্ষেত্রেও ছিলেন।

জঙ্গল বেশী থাকার সন্ধান পাইয়া ৪৫ ঘণ্টার অস্ত্রাস্ত্র চেষ্টার বাঘটী মারিতে পারি নাই। কেহ কেহ আব্দারার মত ৩.৪ বার বাঘটীকে দেখিয়াছিল।

সন্ধ্যা হয় দেখিয়া হতাশ হইয়া গ্রামের ভিতর এক বাড়ীর নিকট আসিলাম। তখন আমি সবে মাত্র নুতন শিকারী, তাহাতে আবার 'দেখা দিয়া স্তম কোথা লুফালে,' ইত্যাদি আমার মনের অস্থির বাহ্য হইয়াছিল তাগ সজ্জাই বুঝিতে পারা যায়। অগত্যা নিরাশ হইয়া বাড়ী আসিবার অস্ত্র হাওদা হইতে নামিয়া প্যাডে উঠিয়াছি, ঠিক সেই সময় নিকটেই বাঘের ডাক শোনা গেল। তখন মাহাদেবের মধ্যে কেহ কেহ আবার জঙ্গল Beat করা হউক, কেহ কেহ বা পরদিন আসিয়া শিকার করা গাইবে ইত্যাদি মানাক্স পরামর্শ দিতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সেদিন আর না ঘাটাইয়া, একটা ছাগল দিয়া বেটু বাধা স্থির করা হইল। তখনই গ্রাম হইতে একটা ছাগল কিনিয়া আনিয়া, বেদিকে বাঘের ডাক শোনা গিয়াছিল, তাহার নিকটেই কোন এক স্থানে ছাগলটাকে বাধা স্থির করিয়া, আমার হাওদার হাতীর মাহাদেব ছাগল লইয়া বাইতে আদেশ করিলাম। আর আমি হাওদার উঠিয়া, নিজেই হাতী চালাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বাইতে লাগিলাম; অস্ত্রাস্ত্র হাতীও আমার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। খানিক অগ্রণয় হওয়ার

পরই হতভাগ্য ছাগল তাঁা তাঁা করিয়া ডাকিয়া উঠিল; লোকটা সঙ্গে সঙ্গে "তজুর ছাগল নিলে, ছাগল নিলে" বলিয়া চোঁইয়া উঠিতেই চাহিয়া দেখি যে, বাঘটা হঠাৎ লাফাইয়া আসিয়া ছাগলের ঘ'ড়ে পড়িয়াছে। তখন আমরা সকলে একবেগে চোঁইয়া উঠিতে বাঘ ছাগল ছাড়িয়া অঙ্গলে ঢুকিল। এদিকে সেই সাহসী মাহাদেব একদোড়ে আসিয়া একটা হাতীর গুঁড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া বসিল। ছাগলট খুব জখম না হইলেও, পড়িয়াছিল। ইহার পর ১০ জন লোক, হাতী হইতে নামিয়া ইতাকে ধরাধরি করিয়া একটা বন বোঁপের নিকট বাঁধিল। বলা বাহুল্য, আমরা ছাগলটাকে সে বার হাতী দিয়া বিক্রিয়া লইয়া গেলাম।

ছাগল বাঁধিবার পর ১৫২০ হাত কিরিয়া আসিয়া কি জানি কেন আমার খেয়াল হইল, একটু দাঁড়াইয়া দেখা যক্ আবার আইসে কি না। মাত্র ২০ মিনিট দাঁড়াইবার পরই দেখিলাম বাঘটা 'মুড় মুড়' করিয়া অঙ্গলের মধ্য দিয়া বাইতেছে। ইহার একটু পরেই আবার ছাগলের উপর কাঁপাইয়া পড়িল। আমরা যে ৪৫টা হাতী লইয়া এত নিকটে দাঁড়াইয়া আছি তাহার দিকে ক্রমশঃ করিল না। যখন লাক্ দিয়া আসিয়া হু। 'কাত' করিয়া ছাগলটার গলা কামড়াইয়া ধরিল, তখন সে কি ভয়ানক দৃষ্ট! ছাগলটা প কাড়িতেছে আর গো গো শব্দ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও গোঁড়াইতেছে। ঠিক সেই সময়ে সকলেই সমন্বয়ে বলিতেছিল "তজুর গুলি বন্ধন, তজুর গুলি বন্ধন।" গুলি আর কি করিব, আমি যেন ভাবে বিস্তার হইয়া কেবলই তাবিতোছিলাম, ছাগলটা যেন গঁড়াইতে গোঁড়াইতে বলিতেছে— "It is play to you but death to me." বাহা হউক লোকগুলির কোলাহলে আমার চমক্ ভাবিবামাত্র নিশানা করিয়া এক গুলি করিলাম। গুলির সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মুখ হইতে ছাগলটা খসিয়া পড়িল। গুলি তাঁহার মাথার লাগার একটুও নড়িতে চড়িতে পারে নাই।

নানা রকম অবস্থার মধ্য দিয়া একটা মাত্র বাঘ

মারার কেবল যে খুনীট হইরাছিলাম তাহা নহে। ইহাতে ব্যাঘ্র চরিত্রেরও ২৩তী বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইরাছিলাম। এরূপ দৃষ্ট অনেক শিকারীর ভাগ্যেই ঘটে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে, ইহার মত নিলক্ষ বাঘ বুঝি বা ইহাদের সমাজে দ্বিতীয়টী নাই। ১৪ মিনিট অপেক্ষা করিলেই সম্ভবতঃ ইহার আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিত না। কিন্তু পোড়া পেটের আশা বড় জ্বালা!

কেবল ব্যাঘ্র কেন, মনুষ্য সমাজেও ইহা অপেক্ষা বীভৎস কাণ্ড সংঘটনও চোখে দেখা যায়। চুক্তিক প্রাপ্তি স্থানে কত বুদ্ধিগুণ মাতা সমর মায় আপন সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা করিয়া নিজের আহার্যের পরিচালন বুদ্ধি করে। কোন কোন সময় জলময় জাহাজের আরোহীরা ঘোটে ভাগিয়া বাটতে বাইতে, ক্রমে আর গা নিঃশেষ হইয়া আসিলে, নিজদের মধ্যে lottery করিয়া এক একজনকে নিহত হয়।

যখন সভ্য জগতই এরূপ ঘটনা বিরল নহে, তখন আর কুখ্যাত লোভী বাঘ আহারের জন্য জীবন দিবে, সে আর বেশী কথা কি?

হারানিধি।

আমার পাণ্ডুলিপি এই পূর্ণাব লেখার পর, 'হারানিধি' পাণ্ডার একটা পত্র বহিঃস্থি। যদিও ইহার সহিত মূল বিষয়ের কোন সংকলন, তথাপি অল্প পথে আমি কল্প 'নাকাল' হইয়াছিলাম তাহা পাঠক দিগকে না ভুলাইয়া থাকিতে পারিতেছি না। ইহাও আমার একটু উপকারও হইবে। অভিনয় করিতে করিতে যেমন মধ্য পথে Carpenter's scene এর আবশ্যক হয়, এই পত্রটিতে আমারও সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। ইহাতে ক্ষুদ্রের পার্শ্ব বৃহত্তর অবতাগো দোষ পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

সেদিন কোন বজুর বাজীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যাই। বজুবয়ের বিশেষ অনুষ্ঠানে এই পাণ্ডুলিপি খানিও তাঁহার বাজীতে লইয়া যাইতে বাধ্য হইরাছিলাম।

আহারান্তে বাড়ী ফিরিবার সময় ঘটনাক্রমে ২৩ বাঘ গাড়ী বদল করিতে হয়। রাজি প্রায় ১টার সময় বাড়ীর নিকট আসিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, গাড়ীতে পাণ্ডুলিপি খানি নাই। আমার তখনকার মনের ভাব সকলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রায় সমস্ত রাজি গাড়ীখানা লইয়া রাস্তার রাস্তার পূর্বে যে যে স্থানে গাড়ী বদল করিয়াছিলাম, সে সব স্থানে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলাম।

এত বড় কলিকাতা সহর তখন প্রায় নিস্তব্ধ। কেবল গাঙ্গের আলো ও স্থানে স্থানে পাহারাদালা ছাড়া কচিং ২৩ জন নিশাচর গাড়ীতে বা মোটরে যাতায়াত করিতেছিল। কোথাও বা স্ত্রী পান-দ্রব্যাণা বাগানদার অঙ্গ-কর্তৃ নিঃশব্দ অল্পটী সঙ্গীত শোনা যাইতেছিল। আমার সে সব দিকে কোনই লক্ষ্য ছিল না। আমার মনের এই ছব্বা 'History of the French Revolution' এর সুপ্রসিদ্ধ লেখক Carlyle তখন উপস্থিত থাকিলে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। Carlyle বহু শ্রম ও গবেষণার ফলে 'History of the French Revolution' নামক সুবিশ্বাস্য পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত John Stuart Mill এর নিকট দেখিতে দেন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় Mill এর দাসী উহা অকস্মাৎ কাগজ মনে করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। এই ঘটনার Carlyle এর মনে যে ভাব হইয়াছিল, আমার তাহা অপেক্ষা বড় কম হয় নাই। তাই Carlyle কে পরে বহু চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া আবার দীর্ঘ দিনে ঐ গ্রন্থ প্রদান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তগবান আমাকে সে দায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

সমস্ত রাজি বিকল চেষ্টার পর প্রত্যবে আবার বাহির হইয়া, বেলা ১২টা পর্যন্ত অক্লান্ত অধ্যয়ন করিয়া, এক আশ্রয়ল হইতে আমার এই হারানিধি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইরাছিলাম।

হাওবা শিকারে—হাওবা শিকারে কেন, সব শিকারেই,—মাথা অত্যন্ত ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। যে শিকারী যত

উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নিজের বিপদের এবং শিকার না পাইবার সম্ভাবনাও তত বেশী। একবার উত্তেজিত হইয়া বিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম তাহা লিখিতেছি।

প্রায় ২০:২২ বৎসর পূর্বে শিলেটের শ্রীপুর নামক স্থানে আমরা ক্যাম্প করিয়া মিঞাঝুরি গ্রামের জঙ্গল শিকার করিতে যাই। বাঘের সন্ধান উপযুক্তপরি কর-
দিন চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হওয়ার শেষে এক দশন একটা ঘোড়াকে বেট (bait) বঁধিয়া দেওয়া হয়। পর দিন প্রাতে দেখা গেল, ঘোড়াটাকে মারিয়া বনের মধ্যে অনেক দূর টানিয়া লইয়া গিয়াছে। সে বার আমাদের শিকার পার্টিতে—বাঘও ছিলেন। তিনি জঙ্গলে চুকিয়াই এত উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহার উপদ্রবে আর কাহারও শিকার করার উপায় থাকিত না। পাখী, গে-সাপ, বেজী প্রভৃতি বাহ্যিকই বন নাইতে দেখতেন, বাঘ এবং বলিয়া ক্রমাগত চোঁচাইতেন ও তাঁহার উপরই ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করিতেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াও বেশ সপ্রতিভই থাকিতেন। তিনি ইতিপূর্বে একবার আসামের কোন এক জঙ্গলে আমাদের সঙ্গে শিকার করিতে করিতে এই অভিনব প্রণালীতে বৈবাহিক এক প্রকাণ্ড বাঘ (tiger) মারিয়া ফেলিয়াছিলেন; সেই হইতেই তাঁহার ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যে, বন-নড়া দেখিয়া মারিলেই শিকার হয়—কানোয়ার দেখার আর আবশ্যক করে না। আরও একটু মজা এই যে, তিনি এইরূপ বহুচ্ছা (at random) গুলি করিতেন বলিয়া, যে কোন শিকার মায়া পড়িলে, তিনি মারিয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়া বসিতেন।

প্রতি দিনই বন নড়া দেখিয়া গুলি করিয়া সকলেই শিকারের অনুবিধা জন্মাইতেন বলিয়া সেদিন আমরাও তাঁর হইতে ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে সকলেই তাঁহার পছন্দ অবলম্বন করিব।

আমরা সেই বাঘের উদ্দেশে গিয়া অতি অসম্মানেই তাঁহার সন্ধান করিয়া ফেলিলাম। খোঁজ হইবামাত্রই

তিনিও তাঁহার যথাত্যস্ত 'ব্যাটারি' চালাইতে শুরু করিলেন। আমরা পূর্ব পরামর্শমত কার্য করিতে ইচ্ছা করিয়াও পরিয়া উঠিলাম না; কারণ আমরা এ ভাবে শিকার করিতে একবারেই অনভ্যস্ত।

বাঘও সন্ধান হইল, তিনিও তাঁহার পাছে পাছে জঙ্গলের মাথা নড়া দেখিয়া ক্রমাগত গুলি করিতে করিতে ছুটিলেন। তখন অস্ত্র শিকারীরা দৃষ্টিতে পড়িয়া রহিলেন। লাইন-স্ট হইয়া গেল, তাহা আর দেখে কে? তখন আমরা এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে তাহা আর বলিবার নহে। আমার বিরক্তির সঙ্গে ক্রোধের ও উত্তেজনার ভাবও হইয়াছিল। সফলে চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু আমি আমার হেড্ মার্শাল পুনঃ উল্লাসে জকুম করিলাম, "এ হাতীর সঙ্গে চাণাও।" সেদিন হাওদা আমার গিরি বিধাত হাতী মোহনগালের উপর ছিল। মোহনগাল যেমন একদিকে শিকারে শ্রেষ্ঠ ছিল তেমনই অস্ত্র হাতীকে সংযত কাঁপেও খুব মজবুত ছিল। আমিও তাঁহার হাতীর সান্নিধ্য প্রায় পাশাপাশি মিলিত হইয়া দোড়াইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু তখনও তিনি তাঁহার নিত্য কণ্ঠ ভুলেন নাই। যতই পিছন হইতে আক্রমণ হইতেছিল বাঘও ক্রমেই ততই দূরে সরিয়া বাইতেছিল। কিন্তু সৌভাগ্য এই যে আমার হাতী তাঁহার হাতীর সঙ্গে ভিড়িয়া পড়াতে, তাঁহার হাতী ভর পাইয়া পিছনে চটিয়া গেল। ইহাতে বরং একটু সুবিধাই হইল। আমি সম্মুখে পড়িয়া যাওয়াতে তিনি আর গুলি করিবার সুযোগ পাইলেন না। ইহাতেই আমি বাঘের খুব নিকটে বাইতে পারিয়াছিলাম।

জঙ্গল ঘন হইলেও খুব উজ্জ্বল ছিল না। একস্থানে যেন বন নাইতেই হঠাৎ নড়া খামিয়া গেল। বাস্তবিক সেই স্থানে একটা গর্ত ছিল। বাঘ সেই গর্তে নামিয়া বোধ হয় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আমার হাতীও গর্তের পারেরই দাঁড়াইয়াছিল। তখন তখন গর্ত আছে বলিয়া বুঝতে পারি নাই। পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি প্রায় আসিয়া পড়িলেন। পাছে

আবার সেই বিপ্লবের স্মৃতি হর মনে করিয়া, যে স্থান বন নকা শেষ হইয়াছে ঠিক সেই স্থানে হাতী বাড়াইতে আদেশ দিলাম। ইহার পর, সুহৃৎ ধোঁ কি যে হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হাতী একটু অগ্রসর হইয়াই উপর হইয়া পড়ি পড়িয়া গেল। আমার হাতে 500 express rifleটা হাওদার ডাঙার খাঁকা লাগার ডান্‌বল (right barrel) দম্ করিয়া আওয়াজ হইয়া গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উপর হই পড়িয়া গিয়া হাওদার তরানক খাঁকা খাইলাম, ওদিকে বয়েসের ডীসন ডাক শুনিলাম। এই ঘটনা ঘটতে বোধ হয় ১০-১৫ সেকেন্ডের অধিক সময় লাগে নাই।

যখন হাতী চারি পায়ে ভর করিয়া ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তখন হাওদার সম্মুখে কুঁচিয়া দেখি হেড্‌মাস্ত হাতীর কানের পাশ দিয়া কাত হইয়া পড়িয়াছে। হুল্লুতে পা আটকাইয়া তাহার মাথা নিচের দিকে তুলিতেছে। (হাতী ঢালাইবার জন্য তাহার গলার দুজ্জু জুতাকে হুল্লু বলে; মাস্ত উঠতে পা আটকাইয়া হাতী ঢালায়। ইহা ঘোড়ার রেকাবের মত কথ্য করে।) হাতী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বস তাহার মাথা কামড়াইয়া ধরিয়া সম্মুখের হুই পা দিয়া মাথার হুই

পর্শে ও পছনের পর্শ দিয়া তর্ক আড়াইয়া ধরিয়াছে। সে দৃষ্ট বিনি না দেখিয়াছেন তাহাকে বুঝানো অসম্ভব। তখনই আমার মনে হইল, হর বাবু মাস্তকে ধরিয়া ফেলিয়া দিচ্ছিলেন, অথবা আমার বন্দুকের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়াতে এই বিপদ ঘটয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ বন্দুকের বী নল (1.5 barrel) বাবের ঘড়ে প্রয়োগ করিলাম। আমার বিস্তৃত বন্দুকের অমেঘ শেল্‌ তৎক্ষণাৎ তাহাকে পার্শ্বের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিল।

টাইগাট্টো প্রকাণ্ড—মাঝে ৯০ ফিটের উপর ছিল।

ইহার পর যখন মাস্ত হাওদা ধরিয়া হাতীর উপর বসিল, তখন দেখিতে পাইলাম, তাহার মাথার পাগুড়ী পড়িয়া গিয়াছে, সে নিকটে নিজীব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সোজা যা কেমন রূপ জন্ম হয় নাই। যদি আমি এই ভাবে উত্তেজিত হইতাম আমার সহযোগীর সক্তি প্রতিযোগিতা না দেখাইতাম, তবে হয়ত এই বিপদ হইত না।

তবে ইহাও ঠিক যে, আমি এই ভাবে বিপদগ্রস্ত না হইলে বস্‌টী ক্রমাগত গুলির উৎপাতে হয়ত বাড়ী যাইয়া মরিত।

ক্রমশঃ

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ রায় আচার্য্য চৌধুরী।

বর্তমানের কথা

নারীর কথা, অকাল মৃত্যু, বাণবিবাহ, এই সব সামাজিক প্রসঙ্গ লইয়া বেশ আলোচন চলিতেছে। সমাজের পক্ষে এ আলোচন শুভ বলিয়াই মনে করি। আমাদের দেশে ছদ্মপ্রভাবিতার মোহ কিছু কম নয়, সে ক্ষেত্রে আলোচনা সুফল প্রসঙ্গ করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ঐশ্বরী অশ্রুপা দেবীর প্রবন্ধের উত্তরে অনেকেই লিখিয়াছেন দেখিতেছি, এবং মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে লেখিকাও দেখিলাম বাণবিবাহের সমর্থন-স্বর অনেকটা

বঙ্গাইয়া ফেলিয়াছেন। “মানসী” অগ্রগণ্য সংখ্যা বাণবিবাহ প্রবন্ধে আমি মনসী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছিলাম, তদ্বিবরে লেখিকা লিখিয়াছেন—“এ স্থলে পুরোচিত বলিতে কাহাদের বুঝাইতেছে? যদি আধুনিক “দেবশ্রী” স্বাক্ষরকারী সংস্কৃত ভাষা-ভীত “চালকলাজীবী” জীব বিশেষকে বুঝায়, তাহা হইলে স্বামিনীর কটুকি বড় তীব্র হয় আমি ততটু খুসী; কিন্তু সে কটুকি যদি মজ্জা বাজবকাদি মহর্ষিগণের বিরুদ্ধে করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে সবিনয়ে বলিব

“মুনীনাথ মহিষমর্ষিঃ”—একবার উত্তরে আমি বলি, মুনীনাথ মহিষমর্ষিঃ অতি সত্য কথা হইলেও ‘দাম্যদৃষ্টি’ সম্পন্ন বিবেকানন্দের দৃষ্টি এ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হয় নাই, এবং মনু, পরাশর, যজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মাযিগণও যে কালে যে দেশে যে যুগোপযোগী বিধি এ নীতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা খুব সম্ভব সময়োপযোগী ভাবে দীর্ঘকাল সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ এত শতাব্দী পরেও যে সেই বিধি সমাজের মঙ্গলকর ভাবে অমুণ্ডিত হইতে থাকিবে ইহার কোনও আশা নাই, বিশেষ করিয়া বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সভ্যতা প্রবর্তিত ভারত-বর্ষে। উন্নীতি, পূর্বে শাস্ত্রোক্ত ও শিক্ষাদান পন্থা পালনই ছিল ব্রাহ্মণের ব্রত। কেহ কি বলিতে পারেন আজকার দিনে ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই ব্রত পূর্ণাঙ্গি বশ্য রাখিয়া সাধারণ ধর্ম পালন করিতে সমর্থ? উন্নীতি, ব্রাহ্মণ শ্রেণীর দান গ্রহণ করিতেন না; আর আজকার দিনে রাজসরকারের সেবা না করিয়া করজন ব্রাহ্মণ জীবিকা সংস্থান করিতে সমর্থ?

সুতরাং যু ধর্মকে না মানিয়া অব্যাহতি কৈ? এক্ষণে আর একটি কথা হইতেছে, ‘সাহ্যাহানি ও অকালমৃত্যুর কথা। অকালমৃত্যু ও ‘সাহ্যাহানি’র মূলে সম্ভবতঃ একটি মাত্র কারণই বিদ্যমান নহে। তবে বর্তমান সভ্যতা যে ইহার অল্প কতকটা দারী ইহা অস্বীকার করা যায় না। যে কারণেই হউক, খাটি ভাল জিনিষ যাহা জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহা ক্রমেই দুস্তা প্য হইয়া উঠিতেছে, বিশেষ করিয়া সহর বাজারে, মানব দেহের ভিত্তি স্বরূপ শৈশবে ও বাল্যাবস্থার প্রচুর গোচর্য্য পান একেবারেই অসম্ভব। তাহার উপর কলিকাতা সহরের অসিন বাজারে অন্ন সংস্থানের অল্প Daily passenger গাড়ী গুলিতে শত শত্রেণে যে সকল আরোহণ নিত্য যাত্রাত করিয়া থাকেন, তাঁরা দগের রোক্ত-নাচা তানিলে বুকিতে পারা যায়, কি কঠিন শ্রম তাঁরাবিশেষ করিতে হয়। ট্রেন ধরবার ভয়, অনেককেই ভোর ছয়টার সময়েই নাকে মুখে তাত ভাঁজিয়া দৌড়িতে হয়। যে যে স্থানে কল কারখানা আছে, তথাকার শ্রমজীবীগণেরও এই অবস্থা।

সুতরাং এই কঠোর জীবন সংগ্রামের ফলে জনসমাজ ক্রমেই স্বাস্থ্য ও বল হারাইয়া অকালমৃত্যুর অধীন হইয়া পড়িতেছে এবং ইহাদের বংশধরগণও যে অসুস্থ ও রোগ হইবে তাহা কিছু অসম্ভব নয়।

এইবার নাতীর শিক্ষার সম্বন্ধ দুই একটি কথা বলিতে চাই। শিক্ষা নারী কি নর উৎকর্ষের পক্ষেই তুল্য ভাবে প্রয়োজন; তবে কয়েকখানা কেতাব পড়িয়া পাশ কাটাই যে শিক্ষা এমন কথা কেহই বুঝিবেন না। যে শিক্ষার মনুষ্যমনোচিত মনোবৃত্তি গুলির সম্যক বিকাশ হয়, কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়, দেশের ও দেশ-বাসীর প্রতি মমতা জন্মে শিক্ষা তাহাকেই বলি। অনেককেই যে শিক্ষিতা নারীর বিদ্যাসিতা বা বিবিধানীর প্রশংসা তুলিয়া শিক্ষিতা নারীর প্রতি সাধারণের একটা বিতৃষ্ণা আনিয়া চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তো বুদ্ধিমানের কাষ নয়! এ বিষয়ে নারী কেন, অনেক নরও তো কিছু নাজি পশ্চাৎগম্ব নহেন। বাপ মার যেমনই অবস্থা হোক, ঘরে অন্নের সংস্থান থাকুক বা না থাকুক, ছেলেটি সাজিয়া শুজরা বন্ধা পরিবার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, এ বিষয়ে শিক্ষার দোষ কি? অশিক্ষিতা সহরে মেয়েরাও তো সাজসজ্জার কিছুখান উদাসীন নয় দেখিতে পাই। অবশ্য অমরা সাজসজ্জার এই যুগ আড়ম্বরকে কেহই প্রজ্ঞা বা সম্মানের চাক দেখি না বা দেখিতে পারি না। বিলাতী দিকের শাড়ী সেমিজ ও লেস বালর, চিকনের আড়ম্বরপূর্ণ ফ্রক ব্রাউজের ঘটা অবশ্যই আমাদের দৃষ্টিকে পীড়া দেয়, এবং এই সব পোষাক-পরা মেয়েদের দেখিবামাত্র মন আমাদের বাথর জঁরসা উঠে। ইহার প্রতিকার অবশ্য মেয়েদেরই হাতে, কিন্তু পুরুষরাও যে কতকটা এ জন্ত-দারী নহেন তাহাও বলিতে পারি না। তাহার প্রহসনসারে স্বচ্ছন্দে নিজেদের অনেক আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু স্ত্রী, কস্তা প্রভৃতির সাজ সজ্জার এই বিদেশীয় উপকরণগুলি যোগাইবার বেলা তো বেশ নিকাক? আসল কথা, শিক্ষার তেমন বহুল প্রচার হইয়াছে কৈ? দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বন্দ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং সত্যকার শিক্ষিতা

স্বদেশ প্রেমিকা নারীগণ ধরে ধরে কষ্ট ও অনস্বীপণকে
শ্রমিকা দিবার ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন, তবেই যদি
শিকার প্রচার হয়; নতুবা বিবাহের বাজারে কাটুতি
করিবার অন্ত সন্দের খাতিরে মেয়েদের খানিকটা লেখা
পড়া শেখানো, স্নেহের ভাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুগ কলেজের ইন্সপেক্টরেন্স তো তর খাঁটি ইংরাজ
মহিলা—নয় নকল মেম সাহেব। তিনি আদিয়া মেয়েদের
বিভিন্ন পরীক্ষা যত না করুন, কার করটা সেফটিপিন্
আঁটা হইয়াছে, কে কেমন খুঁটাইয়া শাড়ীখানি পরিয়াছে
তাহারাই দিকে দৃষ্টি রাখেন। সুতরাং মেয়েগুলি যে এ সব
বিষয়ে একটু বেশী আগ্রহের হইবে তাহাতে আর সন্দেহ
কি ?

ভারতের মেয়েদের স্বাধীন জীবিকা উপার্জন সম্বন্ধেও
কিছু বলা প্রয়োজন। সমাজ চিত্তেই কোনও ব্যক্তিরই
নারীর এই স্বাধীন উপার্জন সম্বন্ধে সমস্ত হইয়া উঠিবার
প্রয়োজন নাই। চাকুরীপ্রার্থী পুরুষদের ভিত্তি ঠেলিয়া
নারীর যে কোনও দিন পণ করিতে পারিবে তাহা তো
মনে হয় না। তবে আশ্রয় প্রদানের গলগ্রহ হইয়া থাকা
অপেক্ষা নিজের আশ্রয়স্থানের অন্ত বা অপোগণ্ড পুত্র
কর্তার অন্ত যে তাহাদের ছন্দটাকা উপার্জন করা
বিধের এ কথা বেশ বোকা যায়। মনোজীবী কেবল
না হইয়াও এ দিকে গীহার্য্য সুবিধা করিতে পারিবেন।
যে স্থানে প্রবিশিষ্টের বিনিময়ে নারীগণ বীর জীবিকা
উপার্জন করিতে সমর্থ হইবেন, কর্ম্মপ্রার্থিনী নারীর
সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেই সকল স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান
গড়িয়া উঠিতে বিলম্ব হইবে না। মোট কথা অতীতে আমা-
দিগের শাস্ত্রে বা সমাজে কোন্ বিধি নিষেধের ছাপ আঁকা
ছিল তাহা বোঝাযুক্তির অন্ত উঠিয়া পড়িয়া না লাগিয়া,
বর্তমান সময়ে সমাজে কোন্ কোন্ বিধি বাবস্থা জীবন
ধারণের অস্বকুল, সম্ভব চিত্তশীল নরনারীগণ তাহাই

ভাবিয়া বেধুন এবং শুধু বাক্যে নয়, সাধাযত কার্য্যেও
সেই ব্রত প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করুন—তবেই
যদি দীর্ঘকালের অবসাদগ্রস্ত এ জাতির কল্যাণ
হয়।

অগতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল। সুতরাং “এই
ভারতে একদিন সত্যদাহ প্রথা ভারতের সত্য নারীকে
অগতের বিষয়ের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে” এই
গৌরবপূর্ণ বচন আঙড়াইয়া যে আজও বালিকা ও ছদ্ম-
পোশ্য শিশু বিধবা গুলিকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী
রাখিতে হইবে এবং বিধবা বিবাহের নামে আতঙ্কে
শিহরিয়া উঠিয়া ধর্ম্ম হানির ভয়ে চমকিত হইতে হইবে
এমন কি বলা আছে ? অবশ্য জোরামের স্রোতকে কেহই
ঠেকাইতে পারে না, পরিবর্তনের স্রোত আপনা হইতেই
সমাজকে নূতন পথে ঠেলিয়া লইতেছে। মানুষের ক্রীণ
দৃষ্টি ইহার ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিলেও, মহাকালের
হস্ত ইহাকে ধ্বংসের মুখে না লইয়া নূতন সৃষ্টির
মুখেই অগ্রসর করিয়া দিবে।

বিধাতার নব নব বিধানের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ
ব্যক্তিগণ এই কথাই মনিয়া লইবেন।

গতানুগতিকতা ও ছন্দানুগতিকতার মোহ, সত্যপন্থী
কোনও নর নারীকেই অর মুক্ত করিয়া রাখিতে পারিবে
না। বর্তমান সভ্যতার প্রাবনের মধ্যে দোষ, ত্রুটি, বিলাস,
ব্যসন প্রভৃতি যত কিছু আবর্জনা আদিয়াছে আনু-
ইহারই মধ্যে যে পলি মাটি ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া
পরিয়াছে, মহাপ্রাণ নর নারীর মঙ্গল কর্ম্ম চেষ্টার বীজ
তাহার মধ্যে উল্ল হইয়া দেখকে যে অদূর ভবিষ্যতে
নানারূপে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে—আশা করি ইহা আমার
ব্রাহ্মবিশ্বাস নহে।

ত্রীসরসীবালা বসু ।

আত্মসংযম

মানুষ য'য প্রকৃতির অধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ও গুণত্রয়ে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। স্বা, রজঃ ও তম এই তিন গুণ ইঞ্জির আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে। স্বা গুণ হইতে গ্রহণ, প্রীতি, আনন্দ ও প্রশান্ত চিত্ততা; রজোগুণ হইতে অসন্তোষ, পরিতাপ, কাম, ক্রোধ, শোক, লোভ ও অক্ষমা; এবং তমোগুণ হইতে অপমান, মোহ, প্রমাদ, মগ্ন, তন্দ্রা, সমুপস্থিত হইয়া থাকে। এই গুণত্রয়ই প্রকৃতি সত্ত্ব। কর্ম প্রকৃতির গুণের পরিণাম। কর্ম সকল, প্রকৃতির গুণ ইঞ্জিরগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। জ্ঞান আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। মন জ্ঞানের ধর্ম। ইঞ্জির সকল বিষয় গ্রহণ, মন তাৎক্ষণিক সংশয় উৎপাদন, বুদ্ধি বিষয়ের যথার্থ নির্ণয় করিয়া থাকে। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই বিষয় বুদ্ধির আদির্ভাব হইয়া থাকে। তম প্রকৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধি পাঁচ ইঞ্জিয়, পঞ্চভূত ও মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া থাকে। বুদ্ধিপ্রভাবেই নেত্র দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা স্রবণ, রসনা দ্বারা আত্মাধন, ত্বক দ্বারা স্পর্শজ্ঞান ও মন দ্বারা চিন্তা জন্মে। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইঞ্জিরগণ, কেবল বুদ্ধির বিষয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। স্রগ দেখাদি হইতে ইঞ্জির শ্রেষ্ঠ, ইঞ্জির হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মন শ্রেষ্ঠ তিনই আত্মা, তিনিই পুরুষ। মনসংকল্পাশ্রয়, ত্বক্ নিশ্চরাস্রয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া সংসারে নিজ নিজ প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম করিতে করিতে ইঞ্জির, মন ও বুদ্ধি নিঃশেষিত করিতে পারা যায়। প্রথমে ইঞ্জির জয়; পরে সহজেই মন ও বুদ্ধি জয় করা যায়। মন ও বুদ্ধি বশীভূত হইলে আত্মাকে সংযত করা যায়। ইহাই আত্মসংযম। ইহা লাভ করা অত্যন্ত সুকঠিন। জীবনের পরগণন হইয়া সংসারে কর্ম করিতে করিতে অভ্যাসবলে একাধি শক্তি জন্মিলে উহা লাভ করা যায়। ক্রমে ক্রমে আত্মার সংযুক্তি

গুলির পরিপূর্ণি ও কু বৃত্তি গুলির বিনাশ হয়। মহর্ষিগণ বীর বীর বিজ্ঞান বলে নানা প্রকার ধর্ম নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে ইঞ্জির সংযমই তাঁহাদের সকলের মতে সর্বপ্রধান। (মহাত্মার) শাস্ত্রকারেরা উহাকে দমগুণ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। এবং বলেন—“দমগুণ দান, বহু, শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দম গুণের তুলা প'বত্র আর কিছুই নাই।...দমগুণই ক্ষমা ধৃতি অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইঞ্জির পরাজয়, দক্ষতা, মুহুতা, বজ্র, হিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অনন্দ, গুরুপূজা-প্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির কারণ। দম-গুণ দ্বিত মহাত্মার কদাচ ক্রুর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অন্তের অপমান, উপাসনা বা নিন্দা করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মপ্রাণা, জেহা ও বিষয়াহরণ, এক কালে পরিচ্যাগ করিয়া থাকেন।...দমগুণ প্রভাবেই জুগুপ্স-নিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মদ পাইয়া যায়।” (মহাত্মার)

আত্মসংযম অমুখ্যকে পণ্ড হইতে পৃথক করিয়াছে, অসত্য জাতি অপেক্ষা সত্য জাতিতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। যিনি মনের স্বাভাবিক উত্তেজনার বাধা দিতে পারেন, তিনিই পশুজীবনের উর্দ্ধ থাকিয়া নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন। আত্মসংযম সকল ধর্মের মূল। অমুখ্য যখনই চিত্তকোষ বা কামাদি রিপুকে রপ্তি দ্বারা সংযত করিতে সমর্থ হইবেন, তখনই তাঁহার নৈতিক স্বাধীনতা আশ্রয় পড়বে। এই ক্ষমতা মানবের বহু ও ঐ-তিক জীবনের বিচিত্রতা স্থাপন করে এবং উহাই ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রধান ও প্রধান ভিত্তি।

যিনি মানসিক প্রকৃষ্টিকে নিজের শাসনাধীনে আনিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ বলবান; নগর-বিদ্বান তাঁহার নিকট হীনপদ বাচ্য। এই বলবান পুরুষ, বীর নিরমায়বর্তিতা গুণে, তাঁহার চিত্ত,

উঁহা'র বাক্য ও কার্যের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। যে সকল গরিল ব'জা নিরন্তর সমাজকে অবনত করিতেছে, তাহার প্রপ্রয়ে শত শত পাপ তাকে কলুষিত করিতেছে, বীরোচিত 'আত্মশাসনাধীনতা', আত্ম মর্যাদা ও আত্মসংযমের সমুপে, সুযোগের কৃতকৃতিকার ভায়, প্রভাবতীন হইয়া অচিরেই অস্তিত্ব হইয়া যায়। ঐ সকল গুণের অবহিত নিম্নোগ মানবের জ্ঞান ও মনের পরিবর্তন কল্পনা করার এবং মানব চরিত্রকে বিমুক্ত, ধর্মপ্রবণ ও শাস্ত করিয়া তুলে।

নিরমাত্মগুণিতা চরিত্র গঠনের পক্ষে বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে। এতদ্ব্যতীত আমাদের জীবনকে বিধিবদ্ধ করিবার উৎসৃষ্ট পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা আর কিছুই নাই। ইহার উপরেই আত্মমর্যাদা-বোধের উৎসর্গ সাধন, বজ্রতা অভ্যাসের সুশিক্ষা ও কর্তব্য জ্ঞানের ক্রমোন্নতি নির্ভর করে। আত্মনির্ভরশীল, আত্মশাসনকর্ম মানব সর্বদা নিরমাত্মগুণিতার অধীন হইয়া চলেন। যতই এই নিরমাত্মগুণিতা পূর্ণতা লাভ করিবে, ততই মানবের নৈতিক অবস্থা উচ্চ হইয়া উঠিবে। তাঁহার বাগনাঙ্ককে নিরমাত্মগুণিতার হইবে, তাহাদ্বিগকে তাঁহার প্রকৃতিগত ক্ষমতায় বেশ আনিতে হইবে। উহা যেন তাঁহার উপদেষ্টা-বিরেকের আদেশ বাক্য সর্বদা পালন করে। শুধু উহা তাঁহার প্রবৃত্তির দাস, তাঁহার অনুভূতি ও উদ্দেশ্যের ক্রীড়াসঙ্গী হইয়া পড়িবে।

যেখিতে পাওয়া যায়, আত্মসংযমের অভাবে অনেককে নিজস্ব গুণ ও সম্বলের সীমিত আধাধীন মুক্ত করিতে হয়; তাহারা জীবনে কোন কার্যেই সম্যকতা লাভ করিতে পারে না। অগত তাহাদের অপেক্ষাধীন-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক, কেবল মাত্র বৈধা, আত্মসংযম ও মনের সমভাবে লইয়া, জীবন পথে সহজে প্রবেশ করিয়া, জীবনের সকল কার্যে সাক্ষ্য লাভ করে।

কোন ইংরেজ ভাষাশী আত্মসংযমের সর্বোচ্চতা উল্লেখ করিয়া বলেন—“ভাবপ্রবণ না হওয়া—নব নব

আকাজক দ্বারা চালিত না হওয়া—আত্মসংযম ও আত্ম-সাম্যতা-বাগন হওয়া—সমবেত অনুভূতি সমূহের সম্মুখা সম্মুখ, খোঁনে প্রত্যেক কার্যে সম্যক আলোচিত ও ধীরভাবে অবধারণিত হইবে, সমবার নিম্নত-শাসিত হওয়া—এই সকল, আমাদের 'শক্তি', অন্ততঃ নৈতিক শক্তি', উৎপাদন করিতে প্রয়াস পায়।”

মুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য, কেবল মাত্র কার্যে নহে, বাক্যেও মানবের সংযত হওয়া নিত্য আবশ্যক। অনেক সময়ে বাক্য, প্রচার অপেক্ষা কঠিনতর রূপে আঘাত করে; হস্তে ছুঁকি ব্যবহার না করিলে অনেক সময়ে তাহা ছুঁরকার কার্য করে। অনেক সময়ে বাক্য তীক্ষ্ণ সূত্রের দ্বারা অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বিষম ফল প্রদান করে। অনেক সময়ে বাক্য সুতীক্ষ্ণ তরবারের দ্বারা অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। বিজ্ঞ ও ধূতমান ব্যক্তি, পাছে অস্ত্রের দ্বারা আঘাত লাগে, এই ভাবিয়া তীব্র ও বস্তিন বাক্য প্রয়োগের বাসনাকে সর্বদা সংযত রাখে। যিনি নিরোোধ, তিনি বহা ভাবে, বখাচিত বিবেচনা না করিয়া তাহা বলিয়া ফেলেন; হয়ত তাঁহার ঐ প্রকার বিজ্ঞাপন বন্ধকে তাই হইয়া বসেন। বিজ্ঞের মুখ, তাঁহার অস্ত্র-চরণে; নিরোোধের অস্ত্র-চরণ তাহার মুখে।

কতকগুলি লোক আছেন, তাহারা নিরোোধ নহেন; অগত সাক্ষ্য ও আত্মসংযম না থাকায় তাহাদের কথায় ও কার্যে নিত্য অবিরোধের ভাব, প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাদের উত্তরনকম অসাধারণ ঘোষণা, প্রকৃতিগত কি প্রচীনা ও তীক্ষ্ণধারে বক্তৃতা সময়ে সময়ে তীব্র বিজ্ঞাপক বাণ্য উদ্গিরণ করিয়া অশেষ ক্ষতি সম্পাদন করে। কত রজনীতিক ব্যক্তি এইরূপে অমূল্য বক্তৃতা হারাইয়াছেন; এমন কি অনেক সময়ে রাজ্যে বিপর্যয় ঘটাইয়াছেন। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন, সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, অপ্রিয় সত্য বলিবে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

মিলন-পথে

(উপন্যাস)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অশোক সকাল বেলা বেড়াইয়া আসিয়া উমাকে ডাকাইয়া বলিল, “জেনে এসাম, আমাদের বাড়ীর আশে পাশে চার পাঁচ জনের বসন্ত হয়েছে।”

উমার ছেলে মেয়ে দু’টি বারান্দায় খেলা করিতেছিল, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই উমার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে শুক-কণ্ঠে বলিল, “তবে কি হবে দাদা? গায়ের লোক যা, তাতো আমি জানি। তাহাদের দোষে শীগগিরই বসন্ত গী-ময় ছড়িয়ে পড়বে। কি হবে দাদা?”

অশোক একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “তোমাকে অ’র এখানে রাখতে আমার ভরসা হচ্ছে না দিদি। আজই তোমাদের চান্দপুরে পাঠিয়ে দেব।”

“তা যেন হলো, কিন্তু তুমি?”

“আমার তো আজই যাওয়া হ’তে পারে না উমা।”

“না, না, সে আমি ভুলব না। তোমাকেও যেতেই হবে।” বলিয়া উমা ছুটিয়া আসিয়া অশোকের হাত চাপিয়া ধরিল। তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অশোক বলিল, “তোকে তো আজ পাঠাই। বাড়ীর একটা বন্দোবস্ত ক’রে আমি না হয় ছ’চার দিন পরে বন্ধুকে নিয়ে কলকাতা চলে যাব। সেখানে একটু কাঁচও আছে।”

উমা প্রথমে একথাই কিছুতেই সম্মত হইল না। অশোক ও বন্ধু মিলিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া বলায় অবশেষে ছেলে মেয়ে দু’টির কপা ভাণিয়া অশোককে ছ’দিনের জন্য ফেলিয়া যাইতে রাজি হইল।

অশোকের অনুরোধে সে তখনি যাওয়ার উত্তোষ করিতে লাগিল। কিন্তু অশোক যে আজই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না, তাহারও যাইতে মন সরিতেছিল না। বৈকালে অশোক বাইরা উমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ীতে উঠিয়াও উমা সজল-নয়নে অশোকের হাত ধরিয়া আর

একবার মাথার দিবা দিয়া তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া গেল।

উমাকে রওনা করিয়া দিয়া অশোক অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরবার পথ ধরিল। চর্নিতে চলিতে সে গোবিন্দ দাসের গৃহ-লগ্ন পথটিতে আসিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মাধবীদের বাড়ীর অতি নিকটেই এক জনের বসন্ত হইয়াছে। তাহার ও মাধবী একই পুকুর ব্যবহার করে। দিনের আলোকে প্রকাশে না পারিলেও রাত্রির অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে রোগীর কাপড় ও খাওয়ার বাসন যে সেই পুকুরে ধোওয়া হয়, তাহাতে অশোকের কোন সন্দেহ ছিল না। বাঙ্গালীরা স্বাস্থ্যনীতি পালনে যে কতখানি অলস ও অজ্ঞ, তাহা অশোক উত্তম রূপেই জানিত।

অশোক পথে দাঁড়াইয়া একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে বসিয়া ঠাকুন্দা বোধ হয় জপ করিতেছিলেন, মাধবী তাঁহারই কাছে চুল করিয়া বসিয়া ছিল। সে দাওয়ায় উঠিয়া ডাকিল, “মাধবী, মাধু!”

মাধবী আজ মোটে ইচ্ছা আশা করিতে পারে নাই। সে অত্যন্ত চমকিয়া উঠিয়া দাওয়ায় আসিয়া বলিল, “কি?”

অশোক বলিল, “ঘরের মধ্যে ঠাকুন্দা বোধ হয় জপ করছেন? আচ্ছা, এই খানেই একটা আলো নিয়ে এস, বড় অন্ধকার।”

মাধবী একটা আলো লইয়া আসিল। গৃহ আলোকেও অশোক দেখিল, এই পাঁচ ছ’দিনের মধ্যেই মাধবীর চুল চলে মুখখানি শুক ও স্নান হইয়া উঠিয়াছে। সে উদ্ভত নিশ্বাস চাপিয়া বলিল, “বাড়ীর পাশে বসন্ত, এখানে তো তোমার থাকি হ’তে পারে না। কালই এখান থেকে চলে যেতে হবে। তৈরী হয়ে থেক।, মোহনগঞ্জের নদীর ওপারে

আমাদের একটা বাড়ী আছে জান। ঠাকুর্দাকে নিয়ে সেখানে গিয়ে কিছু দিন থাক। আমিও পরন্তু কলকাতা যাচ্ছি।”

মাধবী সব কথা শ্রিত হইয়া শুনিয়া, নিশ্চিন্ত উদাসীন ভাবে বলিল, “ও বাড়ীর বসন্ত আমার কি করবে? আর ওখানে গেলেই বা কি? মোহনগঞ্জের ওপারে কি কম যেতে পারবে না? পলাইতে পল নাই যম আছে পিছে।”

এই তব্বন্ধা শুনিয়া অশোকের হাসি পাইল। বলিল, “ছেলেমানুষী এখন রাখ। কাল বন্ধু ভোরে এসে তোমাদের ওখানে রেখে আসবে।”

“না, সে হতে পারে না অশোক দা।”

মাধবীর স্বরে দৃঢ়তার স্পষ্ট পরিচয় পাইয়া অশোক জিজ্ঞাসা করিল, “কেন হতে পারে না মাদু?”

মাধবা জবাব দিল না, দৃষ্টি নত করিয়া লুপ্তিত অঞ্চল লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। অশোক কিছু আন্দাজ করিয়া ভীত-কটিন-কণ্ঠে বলিল, “এ অনর্থক ভয় তোমার। আমার পয়সায় কেনা বাড়ীতে এই সময়ে থাকলে কেশব কিছু মনে করত না। তাকে আমি জানি।”

মাধবী তথাপি মৌন হইয়াই রহিল। মাধবীর মতের পরিবর্তন করা অসাধ্য বুঝিয়া অশোক চলিয়া গেল।

অশোক বাড়ী গিয়া আসিয়া জামা ছুতা না খুলিয়াই হতাশ ভাবে একটা আরাম চৌকির উপর শুইয়া পড়িল। উমার অভাব ওতাহাকে পীড়িত করিয়াছে অল্পমান করিয়া বন্ধু তাহা দেখিয়াও কিছু বলিল না। ঘণ্টা অনেক পরে অশোক নিজেই উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া দ্বন্দ্ব খাইতে বসিল, তখন বন্ধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “পরন্তুই তো আপনি কলকাতা রওনা করেন। আপনার সঙ্গে—”

অশোক বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, “আমি কোথাও যেতে পারব না, এইখানেই থাকতে হবে আমাকে। তোমরা সব চলো যাও।”

মনিবের স্বরে রাগের পরিচয় পাইয়া বন্ধু আশ্চর্য হইয়া তখনকার মত নীচে চলিয়া গেল।

সাত আট দিনের মধ্যেই উমার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল, গ্রামময় ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটিল। বসন্ত যেন সূঁচ মহামারী হইয়াই গ্রামে দেখা দিল। যাহারা সুস্থ ছিল, এবং পৈতৃক প্রাণের মতো অস্তুর প্রাণের মাথার চেয়ে কম

মনে করিতে পারিল না, তাহারা সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। কোন কোন বাড়ী বা একেবারে শূন্য পড়িয়া খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল, আর কোন কোন বাড়ীতে বা অন্তঃগতি পিতামাতা অথবা স্ত্রী, রোগাক্রান্ত সন্তান বা স্বামী লইয়া পড়িয়া রহিল। যে ছ’একজন বাড়ীর মারা ছাড়িতে না পারিয়া রহিয়া গেল, তাহারাও ভয়ে বাড়ীর বাহির হইতে পারিত না।

রোগের আশ্রয়াদ এম নৃতের আশ্রয়ের বিলাপ ছাড়া গ্রামে প্রায় শব্দ শুনা যাইত না। এই রোগটাকে পল্লী-বাসীরা যে পরিমাণ ভয় করিত, ঠিক সেই পরিমাণে যদি রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাওয়ার এবং রোগীর সতর্ক সাবধান শুদ্ধতার উপায় জানিত, তাহা হইলে গ্রামটা বোধ হয় এমন অসহায় হইয়া পড়িত না। যে মরিতে লাগিল, সে প্রায় অচিকিৎসায়, অনশ্রুয়; আর যে বাঁচিয়া উঠিল সে পিতৃপুণ্যের জোর ছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারিল না। রাস্তা প্রায় জন-শূন্য হইয়া পড়িল, হাট বাজার বন্ধ হইয়া গেল।

অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করিয়া মাধবীর বুকও ভয়ে শুকাইয়া উঠিল। সে নিজের অপরিণামদর্শিতাকে শত দিক্কার দিয়া, একদিন অশোকের কাছে গেল। ছপুত বেলা অশোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাধবা তাহাকে তেলাতেলি করিয়া জাগাইয়া দিল। উমা যাইবার পর মাধবী আর আসে নাই। অশোক বেশ একটু বিরক্ত স্বরেই বলিল, “কাঁচা থুমে জাগালে কেন? হয়তো মাথা ধরবে।”

মাধবা বলিল, “তা ধরে ধরবে। তুমি উঠে এসে আমার কথা শোন।”

অশোক অনিচ্ছুক ভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল, “বল।”

“চল, আজ আমরা কলকাতা যাই।”

ইচ্ছা হ’লে তুমি যেতে পার, তার ভয়ে আমাকে জাগাবার কি দরকার ছিল?

“বাঃ! আমি একলা যাব নাকি?”

“একলা যাবে কেন? তোমার বাহন ঠাকুর্দা তো আছেনই; দরকার হ’লে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। তা হলে আমিও নিশ্চিন্ত হই। সবাইকে বিদায় করেছি, ওকে কিছুতে পারলাম না।”

“তুমি যাবে না?”

অশোক শক্ত হইয়া বলিল, “না।”

মাধবী ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “না কেন?”

অশোক বলিল, “আমার ইচ্ছা।”

তারপর একখানা বই খুলিয়া লইয়া পড়িবার উত্তোপ্ত করিল। মাধবী টান মারিয়া বইখানা মেঝেয় ফেলিয়া দিয়া বলিল, “তুমি এই সময়ে আমার ওপর সব রকম শোষণ করবে নাকি ভেবেছ?”

“শোষণ আবার কি?” বলিয়া অশোক বইখানা তুলিয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

এই একেবারে নতুন কটিন ভাবটা দেখিয়া আজ মাধবী রাগ করিতে ভরসা করিল না। সে অশোকের পা জড়াইয়া ধরিয়া আন্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “আমাকে এই একটু বারের জন্যে মাপ কর।”

অশোক ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, “অচ্ছা, করলাম; কিন্তু এ শুধু বন্ধুত্ব আর ঠাকুদার ভাষা, ভেদে নেবে।”

মাধবী উঠিয়া মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল, “হা আমি জানিগো জানি। তোমার সঙ্গে কি কি জিনিস দাবে, ঠিক করিগে। আর তো বেশী সময় নেই।”

ছয় মাস পূর্বের মত মাধবী আজ আবার এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া ঘুরিয়া অশোকের পদাঙ্গের দাবকাটা জিনিসগুলি গুছাইয়া দিক করিয়া রাখিল। তারপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, “বিধুঠাকুরগো তো গ্রাম ছাড়া, এক দিন কি খেলে তোমরা?”

বন্ধু হুংস করিয়া বলিল, “সে আর কি বলব দিদি? কত গুঁজলীম, রান্নার লোক তো পেলামই না। আমি তো নিজেই রোধে বাউ। কিন্তু বাবর অবস্থা দেখলে কান্না আসে। কোনমতে ছুটো ভাতে ভাত রোধে নেন, তা কোন দিন বা গাঁলে ফেনের সঙ্গে মিশে যায়, কোনদিন বা আধ সেক হয়। রাত্তিরের খাবার তো ত'একটা ফল টল, একটু খানি চুধ। কত বল্লম কত সাধলাম, কোনমতেই বাড়ী ছাড়তে রাজি হলেন না।”

কোনমতে অশ্রু দমন করিয়া মাধবী বাড়ী গেল, কিন্তু গিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ঘণ্টা দুই পরে অশোক দেখিল, মাধবী একখানা ঢাকা দেওয়া রেকাবী লইয়া ঘরে ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিল, “ওকি মাধু?”

মাধবী রেকাবীখানা সমস্ত সাবধানে রাখিতে রাখিতে বলিল, “খানকতক লুচি আর একটুখানি মোহন ভোগ। রাত্তির ন'টায় তো গাড়ী, কিছু খেয়ে তো উঠতে হবে।”

অশোক বলিল, “তোমার হাতে খেলে আমার ভাত খাবে না?”

মাধবী বলিল, “না, তা খাবে না। দোকানীর হাতেও চেয়েও আমার ভাত খারাপ নাকি? গোপনে ভাত খেলেও তো তোমাদের ভাত যায় না।” বলিয়া মাধবী হাসিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অশোক উঠানে পাইচারি করিতে করিতে দাঁক করিল, মাধবীকে কলিকাতায় রাখিয়া সে ফরিদপুরে যাইয়া তাহার বন্ধুগৃহে বেড়াইয়া আসিবে। কলিকাতা যাত্রার তখন সমস্ত আয়োজন হইয়া গিয়াছিল, বন্ধু গাড়ী ডাকিবার জন্য প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে একটি শ্রীলোক দ্রুতপদে আসিয়া অশোকের পায়ের কাছে কোন মতে আপনাকে ফেলিয়া দিয়া, বুক ফাটা কণ্ঠে চাবকার করিয়া উঠিল, “বাবু আমার ছেলেটিকে রক্ষা কর।”

অশোক চিনিল, সে তাহার প্রজা রামধনের স্ত্রী। শ্রীলোকটির দেহ কাপড়ে ঢাকা থাকিলেও মুখ দেখিয়া বসিতে বিনম্র হইল না যে তাহারও দেহে বসন্ত আশ্রয় লইয়াছে। অশোক সভয়ে পিছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার ছেলেরও কি বসন্ত—”

“না, না, বাবু, আমার অল্পগ্রন্থ ছয় নি তার। কিন্তু তার বাপের এমন অবস্থা যে আর কোন আশা নেই। তার ভায়ে ভয় কি? আমাদেরও হুজু, একসঙ্গে যেতে পারব। কিন্তু আমার গোপালের কি হবে? কাল থেকে দোরে দোরে গুরেঁচ, কত কঁদেঁচি, কেউ তাকে একটু ঠাই দিতে চাইলে না। তুমি তাকে রক্ষা কর বাবু।”—বলিয়াই সেই শ্রীলোকটি ঘাসের উপর পড়িয়া এমন ছট ফট করিতে লাগিল যে, ছেলের আশ্রয়ের জন্য সে এখনি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। শুধু মাথের প্রাণ বলিয়াই সে এতখানি ছুটিয়া আসিতে পারিয়াছে। সম্মান সর্বস্ব মাতৃ-হৃদয়ের এট মর্দিনী বাকুলতা অশোককে বিকল করিয়া তুলিল। স্বামী প্রঃ হুজন দুই বিধানায় পড়িয়া, সেবা করিবার কেহ নাই, আশ্রয় দিবার কেহ নাই; মমতার শীতল

স্পর্শ কাহারও গায় হাত বুলাইয়া দেয় না। ছেলের চিন্তা রোগান্ত পিতামাতার রোগময়ণা দশগুণ বাড়াইয়া দিয়া মরণ নিকটতর করিয়া দিতেছে। অশোক শিঙরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল “তুমি যাও, ভয় নেই, আমি তোমার ছেলের ভার নিলাম।”

এই অভয় বারিা প্রলোকটিকে মৃত্যুর কি আনন্দময় অভয় মর্ত্তিই দেখাইল! তাহার চক্ষু দেখিয়া অশোক তাড়া হতুমান করিতে পারিল। তাহার ক্রন্দন থামিয়া গেল। সে বৃহত্তর অশোকের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, অশোক যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইখানে দুলি গইয়া বকে কপালে ও মাথায় দিয়া আবার তেমনি দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কিছুকাল পরে অশোক যখন একজন চিকিৎসক ও একজন শুষ্কসাকারি লইয়া রামধনের বাড়ী পৌঁছিল তখন দেখিল, রামধনের প্রাণ তাহার বকের উপর হাত রাখিয়া বলিতেছে “আর ভয় কি? গোপালকে বাড়ির ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। এস, আমরা নিশ্চিন্দ হয়ে আশ্রয় মত গুমিয়ে থাকি।”

রামধন অনেক ছোট্ট করিয়া কম্পিত শিথিল ভাবখানা স্বীয় গলার উপর রাখিয়া ভুক্তিৎ ক্ষণ কষ্টে কি বলিল বুঝা গেল না, কিন্তু তাহার শীর্ণ গুণ বহিয়া জল পড়িল তাড়া দেখা গেল। এই কক্ষণ মনঃশলী দৃষ্ট দেখিয়া অশোক বলকের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

অশোক যখন রামধন ও তাহার স্বামী চিকিৎসক ও শুষ্ক-সাকারি বান্ধা করিতেছিল, তখন অত্যন্ত উৎকর্ষিত হইয়া মাদবী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বন্ধু, এ কি কাণ্ড তোমাদের? এখনো গাড়ীর খোঁজ নেই? ডেপুটি থরবে কি করে? বাব কৈ?”

উত্তরে বন্ধু যাড়া বলিল তাড়া শুনিয়া ক্ষুধার মত মাদবী মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল।

মোড়শ পরিচ্ছেদ

অশোক মাদবীর ভুলটিত মস্তকের উপর হাত রাখিয়া বলিল, “শুয়ে থাকলে তো এখন আর চলবে না মাধু, ভয়কে ভয় করলেই সে বেশী চেপে ধরে। ওঠ।”

অশোকের স্পর্শ ও কথা মাদবীর নিঃসংজ্ঞ দেহ মনে সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিল। সে অশ্রুজল কণ্ঠে বলিল “তুমি কি শুধু আমাকে সাজা দিবার জন্তেই—”

কথাটা আর সে শেষ করিতে পারিল না, কিন্তু অসমাপ্ত কথাটা বুঝিতে অশোককে বেগ পাইতে হইল না। সে বলিল, “এমন কথা কেন বলছ? রামধনের কারা যদি দেখতে আর তার কথা যদি শুনতে, তবে তুমিই উত্তোষ করে আমাকে তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে। কি অবস্থা ই দেখলাম তাদের! রামধন আজ রাত কাটায় কি না সন্দেহ; তার স্বীয় জীবনেরও কোন আশা নেই। দেখ, এখন তাদের ভেলোটিকে বাঁচাতে পারি কি না। আমি তার মাকে আশ্বাস দিয়েছি। আট বছরের ছেলে, বোঝে সব, সে কি বাপ মাকে ছেড়ে আসতে চায়! বন্ধুর ঘরে বসে কি রকম কাঁদছে সে! দেখতে পারলাম না তাই চলে এলাম।”

মাদবী উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মজিয়া বলিল, “গোপালকে আমার ওখানে নিয়ে যাব?”

অশোক একটু ভাবিয়া বলিল, “না, ঠাকুর্দা আছেন! ওর বসন্ত হবারই ত ঘোল আনা সম্ভাবনা।”

মাদবী হাসিল। বলিল, “শুধু আমি বাড়ী থাকলে আপত্তি করতে না, কেমন? আমার প্রাণের একটুও দরদ নেই তোমার।”

অশোক স্মিতমুখে মাদবীর পাশে কণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, “না।”

“এতবড় মিথ্যা কথাটা বলতে একটুও বাধল না?”

“মিথ্যা কি করে বুঝলে? কিন্তু ভয়ে যে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে দেখছি। রামধনের ওখানে যাওয়ার সময়ে আমি যে তোমার সাহসের ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছিলাম।”

“এখনো তা করতে পারি”—বলিয়া মাদবী উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর অনেকক্ষণ বসিয়া গোপালকে শান্ত করিয়া, তাহাকে খাওয়া বিছানা করিয়া শোওয়াইয়া বাড়ী চলিল। বন্ধু আলো লইয়া সঙ্গে গেল।

এত রাত্রি হইল, তবু মাদবী আসিল না। ঠাকুর্দা উদ্ভিন্ন ভাবে উঠানে দুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ন’টার ট্রেপে কলিকাতা যাওয়ার কথা। অগতঃ ন’টার মধ্যে মাদবীর দেখা নাই।

মাধবী তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, “ঠাকুর্দা, তুমি আমার জন্যে খুব ভাবছিলে বোধ হয়?”

ঠাকুর্দা মাধবীকে স্তম্ভ দেখিয়া নিশ্চিন্ত মুখে বলিলেন, “হাঁ দিদি।”

“তা হ’লে তোমার কিসের বৈরাগ্য?”

“মায়াযমীর কাছে বৈরাগ্য কি টিকতে পারে?”

“আমি তোমাকে বৈরাগ্য ভ্রষ্ট করছি, তাই বল।”

“না দিদি, তা তুমি পার না। বৈরাগ্য আমার ছিল না, চাইও নি।”

“আজ আর আমাদের কলকাতা যাওয়া চল না।”

“তাতো দেখছি, কিন্তু কেন দিদি?”

“বলছি। বন্ধু, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে কেন?”

বন্ধুকে বিদায় দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ঠাকুর্দাকে সব কথা বলিল। শুনিয়া ঠাকুর্দা গভীর মুখে বলিলেন, “অশোক বাবু এখনো থাকলে যে এককম একটা কিছু ক’রে বসবেন, তা জানতাম। তিনি তো এমন প্রার্থনা বিলম্ব করিতে পারেন না।”

কথাটা মাধবীর বৃকে ঘাইয়া ঝিলিল। সে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছিল ঠাকুর্দাকে খাওয়াইয়া নিজে কিছু খাইয়া গাড়াগাড়া হইয়া পড়িল।

পরদিন সে অশোকের বাড়ী গাইয়া শুনিয়া, রাতেই রামধন ও তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। হিন্দু, কাদেই ছেলের কাছে মৃত্যু সংবাদ গোপন করা যায় নাই, শোকাট ছেনেটিন ছটফটান দেখিয়া দর্শক মাতের চক্ষুই শিক হইয়া উঠিল।

পরবর্তী পাচ সাত দিন মাধবী গোপালকে লইয়া এমন বিব্রত হইয়া পড়িল যে, তাহার ভয় করিবারও অবসর রহিল না। কিন্তু সে অল্প ভয় দূরে থাকিল না, অশোকের গায়ে বসন্ত দেখা দিল। এবার অশোক চাঞ্চিয়া দেখিল, অশ্রান্ত সেবার্তা মাধবীর মুখে ভয়ের লেশও নাই।

মাধবীর ভার লণ্ করিবার জন্য ঠাকুর্দাও মানে মানে অশোকের শয্যার অপর পার্শ্বে আসিয়া বসিতে লাগিলেন দেখিয়া অশোক অত্যন্ত ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। অশোকের পীড়ার প্রথম দিন হইতেই মাধবী নিজ বাড়ী ছাড়িয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর্দা আসিয়াও অশোকের গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন। মাধবী বলিয়াছিল, “ঠাকুর্দা, তুমি এখন আধকায়ে যাও।”

ঠাকুর্দা জবাব দিয়াছিলেন, “ক’ষ কি দিদি? এখানে তবু তুমি আমাকে একটু দেখবে, সেখানে কে দেখবে?”

মাধবী বলিয়াছিল, “কেন, তোমার ঠাকুর।”

ঠাকুর্দা উত্তর দিয়াছিলেন, “তিনি এখন এখানেই জেগে আছেন।”

মাধবী আর কিছু বলিল না, ঠাকুর্দা রহিয়া গেলেন।

সেদিন বোধ হয় অশোকের রোগ যদুগা খুব বাড়িয়াছিল। সে চক্ষু বজিয়া চুপ করিয়াই পড়িয়া ছিল। মাধবী তাহার বিধানার উপর বসিয়া নিশিমেয়ে তাহার মুখ পানে চাহিয়া ছিল। অদূরে ঠাকুর্দা বসিয়া ছিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, “আজ কি খুব যাতনা বোধ করছ?”

তাহার উদ্বেগ, আশঙ্কা ও বেদনা অল্পভব করিয়া অশোক গুচ কণ্ঠে বলিল, “না।”

তারপর একটু থামিয়া নিম্নলিখিত নৈবেদ্যেই বলিল, “যাতনা তো कुछ কথা, মরণও যদি আসে আজ, সে আমার জন্যে আনন্দ ও অভয় নিয়েই আসবে। মাধু, তুমি কোন হুখ ক’রো না, উমাকে ও ভাব করতে বাধণ ক’রো।”

মাধবী মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মর্জিতে লাগিল, ঠাকুর্দা উঠিয়া গঠিরে চলিয়া গেলেন। মাধবী নত হইয়া অশোকের মুখের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “উমাকে খবর দেব?”

“না, দরকার নেই। ছোঁখোচে রোগ, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। শুধু তুমি আমার কাছে থাক।”—বলিয়াই হাত তুলিয়া অশোক মাধবীর মাথাটা বকের উপর চাপিয়া দিল। মাধবী বস্ত কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত রোদন সম্বরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল। অশোক বলিল, “আলো আড়াল ক’রে রেখেছ কেন? আমি তো তোমার মুখ খানি ভাল ক’রে দেখতে পাচ্ছি। আলোটা আমার কাছে আন।”

অশোককে চুপ করিয়া চক্ষু বজিয়া থাকিতে দেখিয়া মাধবী আলোটা নামাইয়া আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। উঠিয়া আড়াল সরাইয়া আলোটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। উজ্জ্বল আলোক ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। অশোক তাহার আলোক দীপ্ত মুখ পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল, “মোটামোটো তো কোনদিনই ছিলে না, এখন আরো কত রোগা হয়ে গেছ। কিন্তু তবু কি সুন্দর হয়েছ দেখতে!”

এই অবস্থায়ও মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। অশোক

হুই চকু ভরিয়া সেই অরুণাভা পান করিতে করিতে বলিল, “যাও, এখন একটু গড়িয়ে নাও গে। বন্ধুকে ডেকে দিয়ে যাও। না দিলেও পার, আমি তো এখন ভালই আছি।”

মাধবী বড়ির দিকে চাতিয়া দেখিয়া, অশোককে ঈষদখাওয়াইয়া সমস্ত সাবধানে তাহার মুখ মুছাইয়া দিল। তার পর পায়ের কাছে বসিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “ভাল যদি থাক, একটু ঘুমোও দেখি; কথা বলো না।”

অশোকের ঘুমাইতে চেষ্টা করিতেছিল না। কথা বলিবার ও শুনিবার লোভ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল; কিন্তু মাধবা তাহাকে বেশী কথা বলিতে দিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিল। তার সে সুশীল বালকের মত চকু বুজিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, “আচ্ছা, চেষ্টা করছি।”

কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে সে নিজের অজ্ঞাকারের কথা ভুলিয়া ডাকিল, “মামু!” মাধবা তাহার নখের কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ডাকছ, কি চাই?”

অশোক বলিল, “একটা কথা বলতে চাই। আচ্ছা, সব মাথামের মধ্যেই কি এমন কিছু আছে, যা মরণ ভয়ে এমন ভুলে ক’রে পুক হুণিয়ে চ’লে যেতে পারে?”

মাধবীর বুক উদ্বোলিত হইয়া উঠিল। সে কণকাল মৌন থাকিয়া শাসনের স্বরে বলিয়া উঠিল, “আবার কথা!”

“এই পুন্মুজি” বলিয়া অশোক তাহার শিথিল হাত ছ’খানা মাধবীর কোলের উপর রাখিয়া চকু বুজিল।

এমনি করিয়া কয়েক দিন কাটিল। চিকিৎসা এবং শুষ্কতার অবলম্বনে অশোক তিন সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ রোগমুক্ত হইয়া উঠিল। রোগের আক্রমণ যেমন পবন হয় নাই, কিন্তু এল তাহার জ্ঞান তিনটি প্রাণীর আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। তাহাকে রোগমুক্ত দেখিয়া মাধবী নিজের গৃহে ফিরিয়া যাইতে উত্তত হইয়াছিল। হৃৎকলতার দোতাই দিয়া অশোক তাহাকে আরও ছ’চার দিন থাকিয়া যাইবার জ্ঞান সকাঠের মিনাতি জানাইল। মাধবী তাহা উপেক্ষা করিতে পারিল না।

প্রায় এক মাসের মধ্যে মাধবী চলে তৈল ও চিকণী স্পর্শ করাইবার অবসর পায় নাই। আজ ছপূর বেল সন্ধ্যার খাওয়া দাওয়া চুকিয়া গেল সে তৈল ও চিকণী লইয়া চুল ঠিক করিতে লাগিল। দেওয়ালে বৃহৎ পিণ্ড, মাধবী তাহারই

সম্মুখে দাঁড়াইয়া তৈলসিক্ত চুল আঁচড়াইতেছিল। খানিক পরে দর্পণ মধ্যে অশোকের প্রতিবিম্ব পড়ায় মাধবী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “শুয়ে ছিলে, উঠে এলে কেন আবার?”

কক্ষ-এলে একটা মাদুর পাতা ছিল। অশোক তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, “ঘুম এলো না, তাই গল্প করতে এলাম।”

“আমার এখন কাঁদ আছে, শুয়ে থাকগে।”

“গল্প করতে করতেও ও-কানটা চলতে পারে। আচ্ছা, আমার মুখের দাগগুলি কি যাবে না?”

“বেশী তো হয় নি, যাবে বৈকি। কিছু মাখলে টাখলেই যাবে বোধ হয়। কিন্তু তোমার না যাওয়াই উচিত। এত দিন পাত্রা দেখে দেখে ব’লে এসেছ, ‘পছন্দ হলো না। এবার তারা পাণ্টে বলতে পারবে, ‘বর পছন্দ হলো না।’ তা হ’লেই তোমার উচিত শাস্তি হয়।”

সে পক্ষে তোমারও কিছু হুবিদে দেখতিনে। তুমি যে আমার অসুখ হয়ে অবাধ এখনে পড়ে আছ, তা কেশব শোনেনি ভেবেছ নাকি?”

“শুনলেই বা কি? আমি বোষ্টমের মেয়ে, আমার কিছু না ছুটলে ভিগা তো ছুটবে। কিন্তু তোমার কি গতি হবে, তাই ভাবছি।”

“ভাবনা কি? অগতির গতি যিনি তিনি একটা গতি করবেনই। আর ভেবেছ নাকি যে তোমরা ভেলা না হ’লে আমরা সংসার-নদী পার হতে পারিনে?”

“বেশী কথায় কথায় কি, তার প্রমাণ তো সমস্ত সম্বই পেয়েছ তু?”

“তুমি কাছে না থাকলেও আমি সেরে উঠলাম। ঠাকুন্দা আর বন্ধু তো ছিল।”

“এই রকম করে কথা বাড়িয়ে আমায় কাঁদ করতে দেবে না দেখছি।”

“আচ্ছা, এখন আমি উঠছি। দশ মিনিটের মধ্যে আমায় ঘরে যেও কিন্তু, বই পড়ে শোনাতে হবে।” বলিয়া অশোক চলিয়া গেল।

মাধবী চুল আঁচড়ান শেষ করিয়াও সেইখানে মাদুরের উপর চকু বুজিয়া শুইয়া রহিল! বড়ি দেখিয়া নির্দিষ্ট সময়ের পরে অশোক যে সেই ঘরে আসিয়া ফিরিয়া গেল, তাহা

সে জানিতে পারিয়াও চোখ মেলিল না! এই সম্বলোভ-টাকে সে আর প্রার্থনা দিতে সাহস করিতেছিল না।

সন্ধ্যার পরে মাধবী একটা ছোট কোটা হাতে করিয়া অশোকের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “এই নাও অশুভ। ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে আনিয়াছি। এটা মুখে মাখলেই দাগগুলি উঠে যাবে।”

অশোক বলিল, “না, ও আমি চাইনে।”

বিস্মিত হইয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, রাগ নাকি?”

গাঢ় স্বরে অশোক জবাব দিল, “না মাধু, রাগ নয়। অশুভে পড়ে আমি যা পেয়েছি, জগতে বাকি তার তুলনা নেই। আমার প্রাপ্তির স্বত্তি-চিহ্ন স্বরূপ এই দাগগুলি থাকতে দাও।”

মাধবী নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাগে আহারাদি করিয়া অশোক শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলে মাধবীও সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল, “কাল আমি বাড়ী যেতে চাই।”

অশোক সকল দিক ভাবিয়া বলিল, “আচ্ছা, তাই যেও।”

এত সহজে নিরুত্তি পাইবে, মাধবী তাহা আশা করিতে পারে নাই। সে একটু আশ্চর্য হইল। বলিল, “তুমি এখন দিন কতক উমাদিদির কাছে গিয়ে থাক না।”

“সেজ কাকাকে কথা দিয়েছিলাম, তাঁর শালায় মেয়েকে দেখতে যাব। অশুভের জন্তে দেবী হয়ে গেল, এখন তো যেতে হবে।”

“পছন্দ যখন হবে না তখন এ কম্বোভাগ কেন?”

“এখানেও পছন্দ হবে না, তা কি ক’রে জানলে?”

“তা আমি জানি। বিয়ে যখন করবার ইচ্ছা হবে, তখন ক’রো। এখন অনিচ্ছায় অস্তুর অশুরোধে ছল করতে যেও না।”

অশোকের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, “তোমার কথাই ঠিক। সত্যিই তো আমি ছল করতে যাই। আর যাব না।”

মাধবী পিছন ফিরিয়া খোলা জানালাগুলি বন্ধ করিতে করিতে বলিল, “কিন্তু মনটা স্থির ক’রে যদি বিয়ে করতে পারতে, তা হ’লে সুখী হতাম।”

“সত্যি বলছ, সুখী হ’তে?”

এমনি সুরে অশোক কথাটা বলিল যে, মাধবী সহসা জবাব দিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে জানালাগুলি বন্ধ করিয়া অশোকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর স্থির শাস্ত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, “হ্যাঁ সত্যিই বলছি।”

মুহূর্ত্তে সন্ধ্যার মৌন বেদনায় অশোকের মুখ কালো হইয়া গেল। মাধবী সে দিকে দৃঢ়পাতি না করিয়া বলিল, “শুয়ে পড় এখন; এই শরীরে রাত জাগা সহ্যে না।”

অশোক তৎক্ষণাৎ শয়ন করিল। মাধবী মশারি ফেলিয়া, দারগুলি ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্ত

চেতন ও অচেতন বাদ

প্রাচীন কালের ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানীগণ মনঃসত্তাকেই (mind-substance) এই স্থূল জগতের নিষ্কাশ উপদান বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা পুঙ্খ অণুকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। “মনঃ সৃষ্টিং বিকৃতে” — মনই বিকার ও পরিণাম লাভ করিয়া সৃষ্টিকে উৎপন্ন করিতেছে, ইহাই হইতেছে আমাদের প্রাচীন সিদ্ধান্ত। এবং এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রিক তত্ত্ব ও কল্পে ভ্রমতঃ ও বিচারতঃ পথ দেখা গাঠিত হইতে না। সেই ভ্রমটি দর্শনবাদের নাম

প্রতিপন্ন হইবার দাবি করিয়াছিল তাহারও কণ্ঠিকায় আভাস যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে।

মনঃসত্তাকে একরূপে জ্ঞান কারণ বলিয়া নির্দেশ করাতে আমরা বর্তমান যুগের দুইটি পরস্পর-বিরোধী দর্শন তত্ত্বের এতই প্রত্যাসন্ন প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি যে, সেই দুইটি নব্য দর্শনবাদকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের অগ্রসর হইবার পথ দেখা গাঠিত হইতে না। সেই ভ্রমটি দর্শনবাদের নাম

হইতেছে spiritualism (কিংবা idealism) ও materialism । আমাদের বিবেচনায় এই দুইটি পাশ্চাত্য-বাদকে যথাক্রমে “চেতনবাদ” ও “অচেতনবাদ” বলিয়া অনুবাদ করা অসঙ্গত হয় না । অতএব এটি পদকে আমাদের দেখিতে হইবে, আমাদের পুরাতন দর্শনের জীর্ণ তত্ত্বকে, দক্ষিণাবর্তে অবস্থিত অচেতনবাদের সূক্ষ্মল এবং বামাবর্তে অবস্থিত চেতনবাদের উজ্জ্বল পামাণের মধ্যবর্তী কোনও সংকীর্ণ পথ দিয়া চালানো সম্ভব কি না । সেই ভিত্তি এই দুইটি পরিচিত দর্শনবাদের অবগারণা করা হইতেছে । এবং তাহার দ্বারা আরও একটু বেশী লাভের আশাও আমরা করিয়া থাকি । এতদ্ব্যতীত ইহাও আমরা দেখিয়া লইতে চাই আমাদের সেই যে পূর্বগোঁসোনা,—তাঁহা বর্তমান যুগের চেতন ও অচেতন বাদের বিভিন্ন নিকটে যথার্থই খাঁচী জিনিস বলিয়া প্রাপ্তপন্ন হয়, না তাঁহা কোন এক অবৈজ্ঞানিক যুগের গিন্টি করা মেকী বলিয়া প্রমাণিত হয় ? এই প্রশ্নে প্রথমে অচেতনবাদ বা materialism এর কথাই উপস্থাপন করিতেছি, আশা করি দৈর্ঘ্যমূল পাঠক, দেশীয় দর্শনের ধানভানা প্রসঙ্গে, যৎকিঞ্চিৎ বৈদেশিক শিবের গান বরদাস্ত করিবেন ।

অচেতন-বাদ :

Materialism এর নাম শুনিতেই অনেক দম্প্রাণ সাধুজন আতঙ্কে শিহরিত হইয়া উঠেন । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে শিহরণের বিষয় কিছুই নাই । অথবা ইহা কোনই সভ্যদলের প্রাণ-ঘাতী সংক্রামক ব্যাধি নহে । ইহা বর্তমান যুগের উন্নত বিজ্ঞানের আলোকে, ভগ্নভেদ চরম সত্য নির্ধারণের এক অকুণ্ঠিত ও উপরোধ বিহীন চেষ্টা মাত্র । সেই চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া, বাহ্যিক নিষেধের সুকামল ধর্ম-প্রাণকে এক অস্বাভাবিক স্তম্ভিতার মধ্যে রক্ষা করিতে যত্নমূল, তাহাদের সেই স্তম্ভিতাই কোনও দিন সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হইবার সমধিক সম্ভাবনা । কারণ উদার আকাশ-গণবাহী সবিতৃদেবের চরাচরবাসী মুক্ত রশ্মি-ধারা যেখানেই ব্যাহত বা নিরুদ্ধ হয়, সেইখানেই জীবনাত্তকারী রোগের জীবাণু সকল তাহাদের স্বতিকাগুণের ভিত্তি-পত্তন করিয়া থাকে । কিন্তু সূত্রের বিষয় এই যে, পরমবিগণ-বিহিত আমাদের পুরাতন ও বজ্ঞান এমন কোনই ব্যাধিত

কোমল-প্রাণ তত্ত্বজ্ঞান নহে । তাহার উন্নত প্রশ্ন ললাটে, ও বিস্তৃত বক্ষের উপর নবযুগের সমস্ত তাৎ বাতাই অনায়াসে সম্মত হইয়া থাকে ।

এ যুগের অচেতনবাদের উৎপত্তি হইতেছে বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক বিচার যন্ত্রপাতি হইতে । বর্তমান কালের বিশ্ব-বিস্তৃত বিজ্ঞানচাঞ্চাল্যে অবিসম্বাদী প্রমাণ ও পরীক্ষা বলে সাবাস্ত্য করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ (normally) মনের যে কোন অতিচেষ্টা সম্ভব, তাহা সমস্তই জীবের সর্কার্যব ব্যাপী শিরা বিভান ও মেরু ও মস্তিষ্কগত শিরাতন্তু ও ঝিল্লী-কূপ সঙ্কলন (nerve cells) কোন না কোনরূপ রাসায়নিক বৈজ্ঞানিক, বা অজ্ঞবিধ জড়-ক্রিয়া বাতিরেকে সম্ভব নহে । সে ক্রিয়া, সিক মত ক্রিয়াক্রিয়া তাহা হয়তো আজও সম্পূর্ণ রূপে জানা যায় নাই, কিন্তু তাহা যে অবশ্যই কোন না কোন প্রকারের জড়-ক্রিয়া তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । অতএব, আমাদের ইচ্ছাধৈম্যক প্রবৃত্তি বলুন, কিংবা রূপ-রসাদির বোধই বলুন, অথবা সূত্র সূত্রের অমুভূতিই বলুন, এ সমস্তই আমাদের শিরা ও মস্তিষ্ক-বিধানের (nervous system) বিশেষ বিশেষ কক্ষ ও অবস্থার সহিত সংযুক্ত ও সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ।

মস্তিষ্ক বিধানের কক্ষ হইতে মনো-বিধানের কক্ষ ক্রিয়াক্রমে নিঃসৃত হইতে পারে, এই হইতেছে অচেতনবাদের বিচার্য ও সম্মত । এবং এই সমস্তার বিচার প্রসঙ্গে অচেতনবাদি-গণ আমাদের একাধিক আমাংসা দান করিয়া থাকেন । এই বিচারের প্রারম্ভসূত্রে, আমরা দেখিতে পাই, অচেতন-বাদী নবান মস্তিষ্ক বিচার অসংযত আবেগে বলিয়াছিলেন —“The Brain secretes thought, just as the Liver secretes bile.” কিন্তু উত্তর-কালীন বিচারে তাহার এ প্রতিজ্ঞা ত্রিভিত্তে পারে নাই । কারণ,—চিত্ত-রস ও পিত্ত-রস, এই দুই রসকে যখন রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল, তখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া গেল, এই দুই রস কোনই সম-জাতীয় রস নহে,—তাহারা পরস্পর “অ-স্ব-বস ।” কেন,—ইহার উত্তরে মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের জ্যেষ্ঠ রসায়ন-বিৎ Wilhelm Wundt বলিয়াছেন —“We can prove that the bile arises in the liver by a chemical process, which in part at least,

we can follow in detail. But cerebral process gives us no shadow of indication as to how our mental life comes into being.... No system of cosmic mechanics can make it plain to us how a motion in the brain can pass over into a sensation or feeling."

অগত্যা চিন্তা-রসকে মস্তিষ্ক-রস বলিয়া ব্যাখ্যা করা আর চলিল না। এবং অচৈতন-বাদের বড় বড় শ্রী বীরকেও মানিতে হইল, মস্তিষ্কতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে কোনটো সংযোগের পরিদৃশ্যমান সেতুবন্ধ নাই। অগাচ উভয় তত্ত্বের মধ্যে এক অবিসম্বাদী সম্বন্ধও অব্যবহার করিবার উপায় নাই। তখন অচৈতন-বাদ, সেই সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব হইয়াছে ইহা ব্যাখ্যাইবার জন্য "পিওরি" উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম "পিওরি" করিলেন তাঁহার নাম "Theory of Psycho-neural parallelism."

এই পিওরি কথারা দরিয়া কটিলেন যে জীব হইতেছে এক স্বয়ং চলমান (automaton) যন্ত্র স্বরূপ। এবং অন্তঃসারে তাঁহাদের স্ফীকৃত হইল এই যে, জীবের তাৎকালিক মস্তিষ্ক-বিধান হইতে স্বতঃ (automatically) নিষ্পন্ন হইতেছে। তাহার জ্ঞান (consciousness) কোনই অবশ্যস্বত্ব প্রয়োজন নাই। জীবের সমস্ত কৰ্মই যে জ্ঞান-নিরপেক্ষ ভাবে মেক ও মস্তিষ্ক-বিধান হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ইহার নিম্ন-লিখিত পরীক্ষা (Experiment) দেখাইয়া থাকেন। একটি জীবিত ভেকের শিরশ্ছেদ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে জীবটি ৩২ক্ষণাৎ মরিয়া যায় না,—কিন্তু এককালীন তাহার চৈতন্য (consciousness) লুপ্ত হয়। সেই সময় যদি এ চতুষ্পদ স্তরীমূপের অঙ্গে এক ফোঁটা আসিড্ ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় "জ্ঞান বাতিরকেও ও জন্তুটি, তাহার একটি পা দিয়া ঐ আসিড্ ফোঁটাটি মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। আবার সে পাটি পরিয়া ফেলিলে, সে যেন বিবেচনা পূর্বক অল্প পা দিয়া ঐরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। চিরশীর্ণ স্তরীমূপের এই যে জ্ঞান-ব্যাতিরিক্ত কৰ্ম, ইহা তাহার মেক্ষত শিরা-বিধান হইতে স্বতঃ যন্ত্রবৎ নির্গত হইয়া থাকে। ইহা হইতে অচৈতন-বাদী এইরূপ

বিচার করিয়া থাকেন। এখানে ভেকের তলাকবি "জ্ঞানক্রিয়া" সম্বন্ধে জ্ঞানের 'ব্যাতিরিক্ত' দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু বাউটের" মুণ্ড যখন বজায় ছিল তখন অবিকল কিয়া সম্বন্ধেই জ্ঞানের "অব্যয়" দৃষ্ট হইয়াছিল। অতএব ক্ষেত্রে, আনন্দের নৈসর্গিকত্বের সুপরিচিত "অব্যয় ব্যতিরিক্ত জ্ঞান" অন্তঃসারে তাঁহার বলাই, জ্ঞান মস্তিষ্ক কক্ষের কোন নিত্য সহযোগী (concomitant) হইতেছে না। এ জ্ঞান ব্যতিরিক্তেও জীব কৰ্ম করিয়া থাকে। অতঃ তাহাদের মতে জ্ঞান ও মস্তিষ্ক কক্ষের মধ্যে কোনই পরস্পর কৰ্ম-নির্কাতক (inter-acting) সম্বন্ধ নাই। তবে কে সম্বন্ধ আছে? সে সম্বন্ধ হইতেছে পরস্পর হইতে নিষ্টি এক "Parallelism" বা সমান্তরাল-বর্ত্তিতার সম্বন্ধ, এ সেই সম্বন্ধবশে জ্ঞানের যদি অন্তঃসার হইত, তাহা হইত জীবের জীবন-যাত্রার কোন বিশেষ ভাগ হইত না। কা জ্ঞান দিগ্ভ্রমণ থাকিয়াও, তাহা মস্তিষ্ক-বিধানের সহিত নিষ্টি সমান্তরালে অবস্থিত থাকায়,—তাহার দ্বারা মস্তিষ্ক-কক্ষ কোনই সমাধিত হয় না।

এই অদ্ভুত "পিওরি" যে অনেকেরই মনঃপূত হয় ন সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ এই মতে, জ্ঞান যদি স্ব ও নীরক প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ দখিল, এবং মগ্জের আবরণে মগ্জের মগ্জকক্ষ ঢাকা থাকিল,—তবে তাহাদের ম কাগ্য-কারণের অতীত এক "Parallelism" সম্বন্ধই সম্ভব হইল কিরূপে? অর্থাৎ আমাদের পরিচিত উপা ভাসায়, আপত্তি এই দাড়াইল যে,—বৈজ্ঞানিকের মবি পিঞ্জরে আবদ্ধ কাক যদি ঐ পিঞ্জরের মধ্যে বসিয়াই কটন ফল ভগণ করিল, তবে ঐ কাকের সমান্তরালে অবস্থি বহিস্ত জ্ঞান রূপা বকের চক্ষুপটে আঠা লাগিল কিরূপে অতএব এই Parallelism তত্ত্বের অল্প কোন ব্যাখ্য প্রয়োজন হইল, এবং সেই ব্যাখ্যার নাম হইল "Theory Psycho-physical parallelism." এই পিওরি নানান ভেদ আছে, কিন্তু Herbert Spencer প্রবর্তি পিওরি এখানে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

তাঁহার বলাই মস্তিষ্ক-বিধানের কৰ্ম ও মনোবিধাণে কৰ্ম যে "parallelism" মাত্র, ইহা অবশ্যই আমায় বাক্য নিম্নের দাবণা ও অন্তঃসারের দাবণার দিক্ হটা

অস্বীকার করা যায় না, কারণ মস্তিষ্কের স্পন্দন ও কম্পনকে কখনই মনের সুখ দুঃখের ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। অগত্যা তাহারা যে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-বিহীন তাহাও বলা যাইতে পারে না। অতএব মস্তিষ্ক-বিধানের বাহ্য অচেতন গুণ ও কর্ম সকল মনো-বিধানের সুখ দুঃখাদি ভাবের সহিত অবশ্যই কোন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত ভূমিতে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা স্বীকার করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব ইহার সিদ্ধান্ত করেন, ভগৎ-সত্য হইতেছে এক অজ্ঞেয় ও অচিন্ত্য সত্য। এবং সেই সত্য, সমান্তরাল ব্যবহৃত দুই বিভিন্ন আকারে (Appearance) আমাদের নিকট সর্বদাই প্রতীত হইয়া থাকে। সেই অচিন্ত্য সত্য-বস্তুর এক দিকে পদার্থ-সকলের যোগ ও গতি, তাহাদের সংযোগ ও বিয়োগ, তাহাদের কম্পন ও স্পন্দনের, পদার্থ-বিখ্যাপ্ত (Physical) বর্ণমালা আমরা পাঠ করিয়া থাকি। এবং তাহার সমান্তরাল-বস্তী অস্ত্র পৃষ্ঠায় আমাদের চৈতন মনোবিধানের ইচ্ছা দেখ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের (Psychological) অঙ্গ পরিচয় হইয়া থাকে। ইহাই হইতেছে তাহাদের “Theory of Psycho-physical parallelism.”

“লিওনার্” হিসাবে ইহাকে মন্দ উদ্ভাবনা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু “অজ্ঞেয় সত্য”, ভূতযোনির ত্রায় সর্বদাই সন্দিক্ত ও অপ্রমাণ্য বিষয় নালয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হইয়া থাকে। সেই জন্ত এই অজ্ঞেয় ভগৎ-বাদ বৈজ্ঞানিক মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইতে পারে নাই, ইহা বলাই নাভলা। অতএব, এই সমান্তরালবত্তী দ্বৈত তত্ত্ব (dualism) কোনও জ্ঞেয় একত্বের (monism) মধ্যে সমঞ্জস্য লাভ করিতে পারে কিনা, ইহা হইতেছে আধুনিক এম যুগের অচেতন-বাদের বিচার্য্য সমস্যা।

এই যুগের অগ্রণী অচেতনবাদী হইতেছেন—Ernst Haeckel। হেকেলেব নাম বৈজ্ঞানিক অগতে সুপরিচিত। জীবতত্ত্ব শাস্ত্রের (biology) তিনি একজন শ্রেষ্ঠতম আচার্য্য, এবং ডার্বিন তত্ত্বের বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিত। হেকেল দেখাইয়াছেন জড় ও চেতনের মধ্যে কোনই জাতান্তর ব্যবধান নাই। চৈতন্য হইতেছে জড়েরই গুণ, এবং প্রত্যেক জড় পরমাণু হইতেছে চৈতন্য-গুণ-বিশিষ্ট। কারণ জড়ের মধ্যেও ইচ্ছা দেখ প্রভৃতি চেতন গুণের আভাস পাওয়া যায়। যেমন,—যখন আমরা বলি রাসায়নিক সংশ্লেষণে দুইটি পরমাণু

পরস্পরকে আকর্ষণ করে, কিংবা রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাহারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, তখন আমরা অবশ্যই পরমাণু দ্বয়ের মধ্যে ইচ্ছা দেখ স্বীকার করিয়া থাকি। তাহা না করিলে আমরা অস্ত্র কি বলিয়া অণুদ্বয়ের ঐ আকর্ষণ ও বিকর্ষণকে বুঝাইতে পারি? সেই জন্ত হেকেল প্রত্যেক পরমাণুর এক নাম দিয়াছিলেন—“Atom soul”। পাশ্চাত্যদর্শনবিৎ পাঠক, হেকেলের এই Atom soul এবং Leibnitzএর “Monad”কে একই জিনিস বিবেচনা করিবেন না। কারণ Leibnitzএর monad হইতেছে এক চৈতন্য পরমাণু মাত্র, কিন্তু Haeckelএর Atom-soul হইতেছে atom রূপ পদার্থের (massএর) চৈতন্য-রূপ শক্তি (energy)। হেকেলের মতে পরমাণু সকলের ইচ্ছা দেখ অবশ্যই তাহাদের অজ্ঞাত (unconscious) ইচ্ছা দেখ বা অচেতন ইচ্ছা দেখ। কিন্তু তিনি বলেন, চেতন ও অচেতন কোনই অত্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগী বিষয় নহে। যাহাকে আমরা অচেতন বলি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অতীব ক্ষীণমাত্রার চেতন! এবং সেই প্রক্ষীণ চৈতন্যই বিবৃদ্ধ মাত্রার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র চৈতন্য হইয়া থাকে। যে সকল পরমাণুর মধ্যে চৈতন্য শক্তি প্রকট হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে হেকেল তাহাদের নাম দিয়াছেন—“psycho-plasm”। এবং বলিয়াছেন জীবের দেহ ও শিরাবিধান-গত psycho-plasm সকল ক্রিয়াশীল হইয়া চেতন জ্ঞানকে নিশ্পন্ন করিতেছে।

হেকেলের এই চৈতন্য-শক্তি-বাদকে জর্মানির বিখ্যাত রসায়ন-বিৎ Wilhelm Ostwald তাহার চরম পরিণামে উপনীত করিয়াছেন। Ostwald দেখাইয়াছেন পদার্থ বা ভ্রবা (—Mass) একটি স্বীকার্য্যতত্ত্ব (postulate) মাত্র, এবং শক্তিই (energy) হইতেছে তাহার চরম সত্যরূপ। অতএব চৈতন্য হইতেছে শিরাবিধান সংক্রান্ত শক্তি (—nerve energy) মাত্র। এবং সেই energyই হইতেছে চেতন মন।

চেতন-বাদ।

এই অচেতন-বাদের বিরুদ্ধে, চেতন-বাদ (spiritualism) চারি দিক হইতেই আপত্তির অগ্নি সমুদিত করিয়াছেন। এবং সেই আপত্তিকে অচেতনবাদ সর্বথা সম্পূর্ণরূপে যে নিরস্ত করিতে পারিয়াছেন এ কথা কেহই

বলিতে পারেন না। ইহার ছ'একটি উদাহরণ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

অচেতন-বাদ প্রথমে বলিয়াছেন, কোন এক অচিন্ত্য জগৎ-সত্য, জড় ও চেতন দুই বিভিন্নরূপে সর্বদা প্রতীক্ষমান হইয়া থাকে। এবং অচেতন-বাদ শেষে বলিয়াছেন জড় ও চেতন, একমাত্র বহির্জগতের energyর মধ্যেই সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে দুই স্থলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি জড়-বাদী ঠাা স্বীকার করিতেছেন, বহির্জগৎ বলিয়াও অবশ্য কোন বস্তু আছে। এবং বহির্জগতের আলোচনা দ্বারা সিদ্ধ, কোনরূপ energy, কিংবা তত্ত্ব অজ্ঞেয় অস্ত্র কিছু দ্বারাই চৈতন্ত্য ব্যাখ্যা লাভ করিতেছে। ইহার উত্তরে চেতন-বাদী বলেন, অচেতন বাদী এখানে বিচারতঃ প্রমাণ-বিপর্যয় ("begging the whole question") ঘটাইয়াছেন। তাঁহার প্রমেয় বিষয় হইতেছে চৈতন্ত্য ও মন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন চৈতন্ত্য ও মন অস্ত্র কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অস্ত্র পদার্থ তাঁহার মতে হইতেছে, বহির্জগৎ। কিন্তু বহির্জগৎ কি?—ইহার উত্তর দিবার পূর্বে, বৈজ্ঞানিক তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিকে নিজের মধ্যে যদি মুহূর্তের জন্ত সংযত করেন, তবে অবশ্যই তিনি দেখিতে পাইবেন, যাহাকে তিনি বহির্জগৎ বলিতেছেন স্বরূপতঃ তাহা তাঁহার মনো জগৎ মাত্র। যাহাকে তিনি বহিঃস্থ বিশ্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা তাঁহার মনোরূপ মাত্র। অবশ্য এ কথা সত্য যে তাঁহার সেই মনোময় জগৎ সম্বন্ধে এক বহিঃ-প্রত্যয় হয় বলিয়াই তিনি তাহাকে অন্তর্জগৎ না বলিয়া বহির্জগৎ বলিয়া থাকেন।

কিন্তু সে বহিঃ প্রত্যয়ও তাঁহার মনেরইরচনা মাত্র—হইতে পারে শুধুই কল্পনা মাত্র। অতএব তিনি কোন ক্রমেই, তাঁহার চেতন মনু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং স্বাধীন বহির্জগৎ তত্ত্বতঃ পাঠিতে পারেন না,—কল্পনা বা প্রত্যয় মাত্র পাঠিতে পারেন। অতএব অচেতন-বাদী যখন মনের আদিম প্রস্রবণ বহির্জগতের মধ্যে দেখিয়াছিলেন, তখন প্রকৃষ্ট পক্ষে তিনি মনের মধ্যে মনের উৎপত্তি সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। যাহা তাঁহার প্রমেয় ছিল, তাহাই তাঁহার প্রমাণ বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছিল, যাহাকে তিনি কল্পা বলিতে চাহিয়াছিলেন বিচারতঃ তাহা কল্পা বলিয়া

প্রমাণিত না হইয়া,—তাহা কল্পার কল্প বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছিল।

অতএব চেতনবাদী বলেন, এই যে মন, যাহার বিরচিত র হইতেছে এই বিশ্বরূপ, যাহার অবধারিত Idea হইতেছে তথা কথিত বহির্জগৎ সম্বন্ধে energy আদি চরম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সেই মনকে বহির্জগতের তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করি যাওয়া, এবং ঘোড়াকে গাড়ীর পিছনে যুতিয়া গাড়ী চালাইব চেষ্টা করা, একই কথা।

ইহা Ostwaldএর শক্তি-বাদ পর্যালোচনা করিতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। Ostwald বলিতেছেন চেতন হইতেছে মস্তিষ্ক শক্তি মাত্র। কিন্তু শক্তি (Energy) বলিতে কি বুঝায়? এবং শক্তির ধারণা আমরা কোন্ চরম বিষয় হইতে প্রাপ্ত হই? ইহার উত্তর Ostwald নিজে দিতেছেন:—"To gain an idea of the concept of Energy we must start with the fact that we are able through our Will, to call forth occurrences in the external world."

ইহাই যদি শক্তির নিদান তত্ত্ব হয় তবে Ostwaldএর প্রতিজ্ঞা—*"The mind is a form of physical Energy"*—কিরূপে দাঁড়াইতে পারে? অষ্টওয়াল্ডের প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হয় না, তাঁহার নিদানরূপ অস্ত্রসারে চেতনবাদী Arthur Schopenhauerএর প্রতিজ্ঞাই প্রমাণিত হয়—*"The world is will and idea only"*। এইরূপে চেতন বাদের যুক্তি তত্ত্ব শুধু অচেতন বাদকে নিরস্ত করিয়া পর্য্যবসান লাভ করে নাই। তাহা শুধুই ভাঙে না অবশ্য কিছু গড়িয়াও তুলিয়াছে। তাহারও অবশ্য জায় যুক্তি অনুরোধী একটা অন্বর্কীয় তত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্ব কি তাহা সংক্ষেপের মধ্যে নির্দেশ করা অসম্ভব। বি বর্ধমান-যুগের Berkeley হইতে Hegel পর্য্যন্ত চেতন বাদিগণের Idealism তত্ত্বের একটা সাধারণ লক্ষণ আ যাহা সংক্ষেপের মধ্যেও অনায়াসে নির্দেশ করা যাইতে পারে সে লক্ষণটি হইতেছে এই। শক্তির সাক্ষ্য প্রমাণেও উ নির্ভর করিয়া আমরা প্রতিজ্ঞা ব্যবহারতঃ যে এক বহির্জগৎ পৃথক-অস্ত্র-স্বাধীন বিষয় বলিয়া মানিতেছি, সেই সা প্রমাণকে ইহার সন্মুখেই অস্ত্র বিস্তর সন্দেহ করিয়াছে

এইজন্ম ইত্যাদির অনেকের মতে, চেতন ইহাতে অতিরিক্ত কোন অচেতন বহির্ভাগ্য নাই। এবং সেইজন্ম ইত্যাদির চরম সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইয়াছে যে এক ও অদ্বৈত চেতন মন (সেই মনকে ইংলীশ নাম দেন Spirit বা Ego বলিয়া), চেতন ও অচেতন দুই বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় চেতন ও অচেতনবাদ।

এই পাশ্চাত্য চেতন ও অচেতন-বাদের সহিত আমাদের প্রাচীন বাদকে তুলনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, এই দুইটি পাশ্চাত্য বাদ সমগ্রতঃ আমাদের দর্শন, উপনিষৎ বা শাস্ত্রের মতো কোথাও গৃহীত হয় নাই। এবং তাহা গৃহীত না হওয়ার কারণ ইহা নহে যে, বর্তমান যুগের যুক্তি-তত্ত্ব প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দের সাধারণ অর্থে ভিন্ন। কেন না আধুনিক কালের Idealismই বলুন, কিংবা Materialismই বলুন, তাহা নব্য ইউরোপের পক্ষে এক অভিনব ব্যাপার হইতে পারে, কিন্তু পুরাতন ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা কোনই অভিনব বা অপরিচিত দর্শনবাদ ছিল না। কারণ, আমরা সকলেই জানি Ostwald কিংবা Hechel জগৎগ্রহণ করিবার বহু শতাব্দী পূর্বে, অতি প্রাচীন বুদ্ধস্মৃতির অযোগ্য শিষ্য চার্লস অবিবকন তাহাদেরই তানময়ে গাহিয়াছিলেন—“চতুর্ভাঃ যথু তৃত্তভাঃ চেতনমুপভাষতে”

শরীরস্থ প্লাম্বাদি চতুর্ভূত ইত্যেহ চেতন্ত্ব উৎপন্ন হইতেছে। এবং সেই শরীরস্থ চতুর্ভূতের হেইকল যদি বিশেষ নাম দিয়া থাকেন—Psycho-plasm, কিংবা অর্থেয়াল্ড নাম দিয়া থাকেন “Nerve Energy”—এবে তাহাতে স্মৃগ সিদ্ধান্তের যে কিছু মাত্র ক্ষতি হয় নাই, এ কথা না বলিলেও চলিবে। এবং Idealism ও এদেশের কোনই অপরিচিত দর্শন-বাদ নহে। Berkeley সাহেবের বক্ত, বহুকাল পূর্বে এ দেশের “বিজ্ঞান-বাদী” ও নৌক শূত্র বাদীরা বলিয়াছিলেন এ জগতে “বিজ্ঞান” (= Idea) ছাড়া অন্য কিছুই নাই। এবং ইহাপূর্বে ইহাও আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে চার্লসের জায় প্রাচীন ভারতের জড়বাদী, কিংবা বৌদ্ধের জায় “আইডিয়া-বাদী”র যুক্তি ওক অনেকটা বর্তমান যুগের চেতন ও অচেতন বাদীর যুক্তি তকেরই জায় ছিল। অতএব শাস্ত্র যদি এই চেতন ও

অচেতন-বাদ গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তবে সেই গ্রহণ-না-করা কোনও “আদিম বর্করতা” বা “চিত্তাশক্তির জড়তা” প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা জ্ঞানতঃ ও বিচারতঃ প্রাতিখ্যান করাই হইয়াছিল।

বর্তমান চেতন ও অচেতন-বাদের সহিত আমাদের দর্শন-বাদের বিরোধের কেন্দ্রস্থান ইহাতেছে চেতন ও অচেতনের ধারণা নইয়া। বর্তমান কালের দর্শন, চেতন বা আত্মা (spirit) বলিতে মনকেই (mind) বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা চৈতন্ত্য বা আত্মা বলিতে মনকে বুঝি না, মনের অতিরিক্ত এক জাত-শক্তি বা চিত্ত-শক্তিকেই বুঝিয়া থাকি। এবং সেই জন্ত আমাদের মতে মন ইহাতেছে এক জেয় ও অচেতন সত্তা, তাহা বহি-বিশ্বের উচ্চ-কাঠ-শ্রেণীর এক সত্তা। কিন্তু পাশ্চাত্য মতে জেয় মনই ইহাতেছে জাত চৈতন্ত্য, এবং সেই মনই ইহাতেছে চেতন আত্মা, অহং বা spirit।

মনের অতিরিক্ত এক জাত-শক্তিকে আত্মা বলিয়া বিনেচনা করার স্বপক্ষে আমাদের যে যুক্তি আছে, তাহার আলোচনা অন্তঃ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং এখানে তাহার পুনরুৎপন্ন করার কোনই প্রয়োজন নাই। এবং এতৎ-পক্ষে আমরা আশা করিয়া থাকি, আমাদের সেই শাস্ত্রীয় যুক্তির সত্য মনকে যে দিন ইউরোপ সম্পূর্ণরূপে জদদ্বন্দ্ব করিবেন, সে দিন পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে। কিন্তু উপস্থিত আমরা এই মাত্র বলিতে চাই, মনের অতিরিক্ত কোন এক জাত-শক্তিকেই আমরা আত্মা (soul, or spirit) বলিয়া স্বীকার করায়, এবং মন্য-সত্তা ও জগৎ-সত্তা উভয়কেই অনাত্ম ও অচেতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করায়, আমরা দুইটি বিষয়ে মহৎ পরিজ্ঞান পাইয়াছি। প্রথমতঃ আমাদের দর্শন-বাদে কুত্রাপি জড় ও চৈতন্ত্যের পৃথক মর্যাদা সঙ্কচিত কিংবা কুজিত না হইয়াও, আমাদের মনস্তত্ত্ববাদে অচেতন জগৎ-শক্তির সহিত অচেতন মনঃশক্তির এক সহজ সামঞ্জস্য হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দর্শনের খিড়ির বিকল্প এক গুরু বাবহারিক কর্পটচার ইহাতে আমরা সহজে পরিজ্ঞান লাভ করিয়াছি। এই দুইটি পরিজ্ঞান-তত্ত্ব একটু খেলসা করিয়া বলা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ দেখুন, পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের মধ্যে গ্রাহ্য সকলেই বলিতেছেন, মনো-বিধান (psychical system) ও জগৎ-বিধান (physical system) ইহাতেছে দুইটি

পূর্ণক ও স্বতন্ত্র বিধান, কারণ মনো-বিধান ইহাতেছে চেতন-বিধান এবং জগৎ-বিধান ইহাতেছে এক অচেতন বিধান। এবং তাঁহারা বলিতেছেন জড় ও চেতনের মধ্যে কোনই সংযোজক সেতু না থাকায়, উভয় বিধানের মধ্যে কোনই কার্যাকারণাত্মক স্পর্শ-যোগ থাকিতে পারে না। কিংবা তাঁহাদের মতে, এক স্বতন্ত্র বিধানের কার্যপ্রণালী, অথবা স্বতন্ত্র বিধানের কার্য-প্রণালীর সূচক হইবে, এমন কোন সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত্যে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু তথাপি,— মস্তিষ্কের জড়-ক্রিয়া এবং মনের তথাকথিত চেতন-ক্রিয়া, প্রত্যক্ষ ভাবে যে কার্য-কারণ সূত্রে প্রণীত, — ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ স্থানে মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক যে এক বিসম দায়ে তৈরিকিয়াছেন তদ্বিনয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। মনস্তত্ত্বা সধকে তাঁহার অস্বীকৃত প্রতিজ্ঞা ইহাতেছে — তাহা চেতন সত্ত্ব। এবং সে অস্বীকার বজায় রাখিয়া, এই কার্য-কারণের কঠিন বটিকা তাঁহার গলাধঃকরণেরও উপায় নাই। অতএব এক অপার্থিত “parallelism” এর আনরণে আরত করিয়া, সে বটিকাকে তাঁহার বৈজ্ঞানিক ভূতরে কথঞ্চিৎ পরিপাক করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে তাঁহাদের “থিওরি” অমুসারে বহিজগৎ ও অন্তর্জগৎ দুইটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে নীরক্ষভাবে আবদ্ধ। প্রত্যেক অবস্থাই একের দ্বারা অথকে স্পর্শ করে না, একের প্রতি অস্তুর মধ্যে নিগদিত ও নিবারণিত হয়। কিন্তু তিনি যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (Experience) অবলম্বনে তাঁহার মনো-বিজ্ঞা (Psychology) কিংবা পদার্থ-বিজ্ঞা (Physics) অনুশীলন করেন, তখন তাঁহার বিচার-প্রণালীর মধ্যে, বহিজগৎ ও মনোজগতের তরতিক্রমা পর্য্যক-ভেদে গণ্য মাত্রও রক্ষিত হয় না; তিনি অন্তর্জগতের মধ্যে নিরুদ্ধ পতি পড়াইবার সময়, বহিজগতের Force, Relativity, Intensity, Reflex motion প্রভৃতি বাহ্য অচেতন তত্ত্বের উপর পদে পদে “ওভার” রাউন্ড পড়িতে বাধ্য হইয়েন। এবং অন্তর্জগৎ ও বহিজগতের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সাদৃশ্য ও সমান-জাতীয় কার্য-বিদিকে, কোন এক “অপ্রাকৃত উপমা-জ্ঞান” বলিয়া বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার অল্প দিকে বৈজ্ঞানিকও ইক্রমে সত্তত বিপন্নগ্রস্ত। তাঁহার মতে বাহ্য-কক্ষের অতীত কোনই মনোদ্রব্য নাই, এবং মনোজগৎ হইতেছে বহিজগতের

অটলিকার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহার মতে পদার্থতত্ত্বের একটি ক্ষুদ্রতম মনের ইচ্ছাধীন ব্যতিরেকে বহিঃকারণ উপায় নাই। বলেন মনের সংকল্পাত্মক প্রযত্নের সাদৃশ্য দ্বারা ই বৈজ্ঞানিক চরম-তত্ত্ব Energy-র অর্থ বোধ হইয়া তাঁহার পদার্থ-বিজ্ঞা সর্বদাই মনো-বিজ্ঞার উপর পড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তবুও সেই মনকে তিনি বলিয়া স্বীকার করায় — তাহাকেও কঠিন Parallel বাদের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বা দৃষ্টান্তে চেতন অচেতনের পার্থক্য স্বীকার করিতে হইতেছে।

কিন্তু আমাদের দেশের বিশেষ প্রকারের আশ্রয় অনাস্ব-বাদকে আশ্রয় করিলে, “থিওরি”র সঙ্গে অভিজ্ঞতার (Experience) এই নিত্য-বিরোধ সমাধিকৃত না হইয়া থাকে!

অতঃপর, “থিওরি”র সত্য বাবচারণের কপটতা যে তাহা দেখা যায়, এবং তাহা দেখিবার ক্ষমতা ছুরবপাত তত্ত্ব অবগাহন করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু “থিওরি”র পাশ্বে, তাঁহার সহজ-সদৃশ “থিওরি” দাড় করাটয়া দিলেহ তাহা পরিষ্কার ভাবে দেখিতে যায়। যেমন দমন, অচেতন-বাদী Materialist কর্তৃক পরিচালিত, চেতন তিনি অল্প কিছুই নহেন, হইতেছেন psychoplasma-র শক্তি, কিংবা শিরানি শক্তি মাত্র। কিন্তু যখন সেও বৈজ্ঞানিক তিনি নি বলিয়া ধর করণায় প্রবৃত্ত হইয়েন, কিংবা টেনে বলিয়া খান, তখন কার্যতঃ তিনি যে Psychoplasma শক্তি মাত্র এ কথা কখনই বিবেচনা করেন আবার অল্পদিকে চেতনবাদীর Idealism কথা স্মরণ তিনি পূর্ণির পর পূর্ণি লিখিয়া প্রমাণ করিতে পারেন না। তাহা তবুও হইতেছে তাঁহার Idea মাত্র, কিন্তু কল্পনের মধ্যে সত্ত্বিক Idea হইতে পত্তন সত্ত্ব বাহ্য আছে, সেইটুকু না এ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার কর তাঁহার এক দণ্ডেরও ধর করণা চলিতে পারে না।

বাবচারণঃ এমন অসদৃশ প্রতিলিপিঃ আমাদের কখনই আমাদেরকে উপনীত করে নাই। আমরা ও অনাস্বকে তাহাদের সহজ বাবচারণ-সিদ্ধ অধিকার বিচারতঃ বিকৃত করি নাই। আমরা তৎকালে

অপ্রাকৃত দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চম্পোলোক (moon shine) স্বপ্নন করিতে চাহি নাই। আমরা ব্যবহার-সিদ্ধ প্রত্যাহিত্তার বনিয়াদের উপর যে দর্শন-বাদ বিরচন করিয়াছিলাম, তাহারই সহজ ও সম্ভব পরিণাম বশে এক ব্যবহারাতীত ও লোকাতীত মুক্তি জীবের চরম গতি রূপে বিচিত্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎক্ষণ্ণ আমাদেরকে গোড়া হইতেই অগৎ-ব্যবহারের নিকট দার্শনিক রণ-যাত্রা করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

কেন এবং কি প্রকৃত শাস্ত্রীয় বাদের সহিত পাশ্চাত্য বাদের এই মৌলিক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে, ইহার তথ্যস্বাক্ষর কোতুলক জনক। কিন্তু সে অস্বাক্ষরিতের জন্য আমাদের আধুনিক মাপাকে ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্র নিজেই তাহার মীমাংসা কারয়াছেন। আধুনিক মতবাদের অস্বরূপ তাত্‌কালীন বিরুদ্ধ মতবাদের সহিত শাস্ত্রীয় বাদের প্রভেদ কেন দাঁড়াইয়াছিল, শাস্ত্রকার নিজেই তাহার নিদান নিরূপণ করিয়াছিলেন। এবং সেই নিদানতত্ত্ব বর্তমান বোগেও সর্বথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাতঞ্জল শাস্ত্রের শেষ অধ্যায়ের একটি সূত্রের ২৩ বাস ভাষ্যে এই নিদানতত্ত্ব যেরূপে নিরূপিত হইয়াছিল তাহার অবিকল মর্ম নিয়ে প্রদান করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করি-
তছি।

মনকে ক্ষটিক বা মণির স্থায় এক শুদ্ধ স্বচ্ছ সহ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাহা বিষয়ী (subject) স্রষ্টা চৈতন্যের বিষয় (object)। বিষয় স্বরূপ সেই মনের স্তব্ধা অর্থ হইতেছে অচেতন বাহ্য বিষয়, ও চেতন আত্মা। ইন সেই স্তব্ধা অচেতন ও চেতন অর্থের দ্বারা উপরক্ত হইয়া

তদাকারে নির্ভাসমান হইতেছে। এই জন্য বিষয়ী বা স্রষ্টা চৈতন্যের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া, বিষয় 'object' হইয়াও চিত্ত, বিষয়ী 'subject' রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এবং বাহ্য বস্তু উপরাগে চিত্তই বাহ্য বস্তু-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অর্থাৎ চিত্ত, চেতন ও অচেতন দুই রূপেরই সহিত সমান রূপতা প্রাপ্ত হইতেছে। চেতন ও অচেতন উভয়বিধ রূপের সহিত সাক্ষ্য প্রাপ্ত চিত্তের দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া কেহ বলিতেছেন চিত্তই চেতন, কেহ বলিতেছেন এই গবাদি ও ঘটাদি লোক বিশিষ্ট বহির্জগৎ হইতেছে চিত্ত-মাত্র। ইহার ভ্রান্ত ও অস্বাক্ষরিত। এবং ইহাদের ভ্রান্তিবীজ হইতেছে এই। তাহার ইহা বস্তুতেছেন না, চিত্ত সে চেতন ও অচেতন আকারে নির্ভাসমান হইতেছে সেই চেতন অচেতন আকার চিত্তের নিজ রূপ মতে, তাহা চিত্ত হইতে অল্প পদার্থের রূপ। যোগিগণ যখন সমাধি-প্রজ্ঞা লাভ করেন (তাহাতে যোগিগণ যথা-বস্তু দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন) তখন তাহার স্পষ্টই দেখিতে পান, প্রজ্ঞায় অর্থ হইতেছে প্রতিবিশীভূত চিত্ত। যোগীর এই সত্য দর্শন হইতে অনায়াসে বস্তুতে পারা যায়, যাহা প্রতিবিশীভূত, তাহার অবশ্যই অল্প আলম্বন আছে। কারণ বিষ বাতিরেকে কখনই প্রতিবিশ অসম্ভব হইতে পারে না। অতএব চিত্তে যে চেতন ও অচেতনের প্রতিবিশ পড়িতেছে সেই চেতন ও অচেতন, তদাকারে পরিণত চিত্ত হইতে অল্প। এবং সমাধি প্রজ্ঞাতে যিনি প্রজ্ঞায় স্বার্থকে প্রতিবিশীভূত চিত্ত বলিয়া অবধারণ করিতেছেন তিনিই হইতেছেন জ্ঞাতা ও পুরুষ।”

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

দুঃখের শেষ

(গল্প)

বাকীর মধ্যে আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিলাম—“এস।”

স্ত্রী মেঝের উপর শুভ্র স্ন্যকোমল শয্যা রচনা করিয়া ধপেধা করিতেছিলেন, কিন্তু আমি আসিতেই তিনি টেবলের উপর চলিয়া গেলেন। বলিলেন—“থাক্. ও সব আমার কায় নেই।”

অনেক মিষ্ট কথা বলিয়া তবে তাঁহাকে নীচে নামাইলাম।

সন্ধ্যার সাহিত্যের আসর ভাঙিতে আজ একটু বেশী দেরী হইয়াছিল সে জন্য স্ত্রীর এই অভিমান।

Tolstoiএর Three Questions পড়িয়া স্ত্রীকে কীংলা করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। ছদ্মনেই মুগ্ধ হইলাম।

শ্রী বইখানি একবার হাতে লইয়া, ঘননিবন্ধ অক্ষরগুলির উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া ফিরাইয়া দিয়া একটা মূহু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন; তাহা অনেকটা অসুযোগের মত আমার কাণে শুনাইল।

সে অনেক দিনের কথা। বাংলা সাহিত্য চচ্চার অবসরে যখন ইংরাজীসাহিত্যের সুন্দর সুন্দর কবিতা ও গল্প বাছিয়া শ্রীকে অসুবিধী করিয়া শুনাইতাম সেই সময়ে তাঁহার মনে ইংরাজী শিখিবার সাধ হয়। কখন একখানি ইংরাজী First Book আনাইয়া তাহার অক্ষরগুলি শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি জানিতে পারিয়া প্রথমে তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিয়াছিলাম, মনে মনে একটু আনন্দও পাইয়াছিলাম; কিন্তু পরে তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তঠাৎ একদিন দেখিলাম বইখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলা হইয়াছে। কে ছিড়িয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে শ্রী বলিয়াছিলেন, “বালাই গিয়েছে; কি হবে?”

এখন সে সব হুথের ঘা মিলাইয়া গিয়াছে, শুধু এক আধটা দাগ রহিয়া গিয়াছে।

পাশের ঘরে ছেলেমেয়েদের পড়ার কলরব শুনা যাইতে ছিল। তখন আর পুরাণো কথা মনে করিয়া নিশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করিবার উপায় ছিল না।

নূতন একটা গল্প লিখিয়াছিলাম সেটি শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় একটি ব্যাঘাত ঘটিল।

“হতজ্ঞাড়া মিন্বেয় আলায় আর সংসার হয় না।”—পিছনের দুয়ার খোলার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলি কাণে আসিল।

চাহিয়া দেখিলাম যিনি কথাগুলি বলিয়াছিলেন তিনি আমাদের সম্মুখেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। খুব বেশীবার এবং ভাল করিয়া দেখা না হইলেও চাহিতেই বুঝিতে পারিলাম ইনি উপেন বাবুর শ্রী; কারণ ঐ দীর্ঘ গঠন, গৌর বর্ণ ও মুখের ভাবে কেমন একটা বিরক্তি উপেন বাবুর বাড়ী হইতে আসিতে কয়েকবার আমি দেখিয়াছি। কিন্তু কপালে রক্তের দাগ কেন?

সে সব কথা বসিয়া বসিয়া কিন্তু ভাবিবার সময় ছিল না। আমি যে সেখানে বসিয়া ছিলাম তিনি তাহা প্রথমে জানিতে পারেন নাই। সেখানে বসিতেই আমার দিকে দৃষ্টি পড়িয়া-

মাত্র তিনি ঘোমটা টানিয়া উঠিবার উত্তোগ কা দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম “বহুন, আমি বাইরে যাচ্ছি।”

একেবারে বাহিরের বারান্দায় চলিয়া আঁচি ভাবিতে লাগিলাম—ইহার মধ্যে কি ব্যাপার ঘটিল? তো উপেনবাবু এখান হইতে উঠিয়া গেলেন—এখনও ঘন্টার বেশী হয় নাই।

একটু পরেই শ্রী দুয়ারের কাছ হইতে আমাকে হ বলিলেন, “উপেনবাবু নেশা করে মার ধোর করেছেন। বাইরে গিয়ে বস। যদি তিনি আসেন তাঁকে রেখো।”

আমি নিশ্চিত হইয়া বলিলাম, “তিনি এই যে বেশ অবস্থায় এখান থেকে গেলেন! এর মধ্যে নেশা করলেন কখন, আর—”

শ্রী বাধা দিয়া বলিলেন, “তোমরা কখন যে ভাব কখন যে মন্দ থাক বোঝা শক্ত। একটা পেকে একটায় যেতে এক মিনিটও দেরী হয় না। তিনি আজ এখানেই থাকবেন সেইটে কেবল বলে পাঠাতে।

বলিয়া শ্রী তাড়াতাড়ি দুয়ারটা বন্ধ করিয়া শি তাঁহার বোধ হয় ভয় হইতেছিল উপেনবাবু তাঁহার লইয়া যাইবার ভয় এখনি বুঝি টলিতে টলিতে ও উপস্থিত হইবেন।

বাহিরে একখানা বেঞ্চি পাতা ছিল। নিজের ব ঘরে না গিয়া সেখানেই সেই বেঞ্চিখানার উপর পড়িলাম।

আমি রাজকার্যো মতিভারী হইতে পদলি হইয়া বৎ এখানে আসিয়াছি। বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠতা এক কেবল ই সঙ্গে ঘটিয়াছে—যদিও অনেককে বলিতে শুনিয়াছি ম সঙ্গে নেশামিশি বা ঘনিষ্ঠতা করা নাকি আমাদের। জাতির পক্ষে বিশেষ গতিত কার্য। উপেন বাবু উ শুনিয়াছি তাঁহার স্বস্তরও উপলব্ধ ছিলেন—তাঁহারই ইনি অনেক পরিমাণে পাইয়াছেন। তার উপর, তাঁ সঙ্গে তো সর্কদাই পরিভাষ্য। আমিও লোকাচার করিবার পাত্র ছিলাম না। কিন্তু কোন্‌খানে হুজনের মিল ছিল সেই স্ত্রে সকলকে বর্জন করিয়াও, কেবল উপেনবাবুর সহিতই আমার প্রাণের টান জন্মিয়া গিয়া

সমস্তদিন কোঠে উকিলের আফালন, আমলাদের গুঞ্জন, বাধী প্রতিবাদী সাক্ষী ইত্যাদির পূজীভূত কলভাবণ শুনিয়া শুনিয়া এবং আইনের বেড়াছালে ও সত্যপ্রিয় সাক্ষীদের গুণে নিপুণ হলিল পত্রাদির জোরে প্রায়ই জানিয়া শুনিয়া রাবের জিনিষ গ্রামকে এবং গ্রামের জিনিষ রামকে দিয়া যখন বিচাররূপ দর্শকার্থী নিকট করিয়া বাসায় ফিরিতাম, তখন ছীবনটাকে নিংড়াইয়াও একবিল, রস বাহির করিতে পারিতাম না। কেবল সন্ধ্যায় যখন ছুজনে বাহিরের ঘরটায় আসিয়া চাত্র-জীবনের ১১টা গল্প করিয়া ধীরে ধীরে সান্ত্বিত্যের মৃত সজীবন রাস্তায় প্রবেশ করিতাম, তখন মনে হইত, ইহা মরণ সমুদ্রেও পূর্জিতে পারিলে সুধার তৈলা মিলিয়া যায়।

সেই বাল্যকালের পড়া কাব্যমুত রসাস্বাদ যে সংসাররূপ-বিসম্বন্ধের অজ্ঞাতম নমুর ফল এই মৃত্যু সমস্ত প্রাণে দিয়া অমৃত-ভব করি।

কিন্তু উপেন বাব আজ এক করিলেন? মাঝে মাঝে দীর সঠিত একটু আঁধাটু অমিল হয় এই পর্যন্ত আমি জানি-
তাম; আজ ইত্যেত এতখানি কি করিয়া হইল? রাত্রি ১১টার পর তিনি যে একটু নেশা করিতেন তাহাও আমার জানা ছিল। কদাচিত্ত এক আধদিন সকালেও হাঁহাকে কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থও দেখা বাইত; কিন্তু নেশার ঝাঁকে কোন প্রকাশ অজ্ঞাচরণ করিতে কখনও শুনি
বাই।

আলও খানিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া দেখিলাম উপেন বাব আসিলেন না। বাড়ীর ভিতরের দিকে কাণ রাখিয়া শুনিলাম, ভেলেমেয়েদের পড়ার কলরব বন্ধ হইয়া গিয়াছে; মাঝে মাঝে আমার জীর ও উপেন বাবর জীর ফণাবাক্তর শব্দ আসিতে লাগিল—বোধ হইল তাহারা মাজিকার বাপারেরই আলোচনা করিতেছিলেন, ভেলে-মেয়েরাও পড়া ভুলিয়া সেই মুখরোচক গল্প শুনিতেছে।

ওখন ধীরে ধীরে উপেন বাবুর বাসার দিকে অগসর হইলাম। আমার বাসার সীমা পার হইলেই পুরুদিকেই উপেন বাবুর বাসা। মাঝখানে কেবল একটি প্রাচীর। প্রাচীরের দক্ষিণ দিকের খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই পরিবারের ষাণ্ডায়াঙের সুবিধা হইত বলিয়া সেখানটা আর গাঁপা হয় নাই—খোলা ছয়ারের কাঠের জড়ই তাহাকে ই অবস্থাতেই রাখা হইয়াছিল।

হয়ত সদর দরজা এতক্ষণ বন্ধ করা হইয়াছে ইহা অনুমান করিয়া আমিও সেই ভয় প্রাচীরের পথ ধরিলাম।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। কার্তিক মাস, কিঞ্চিৎ শীতও পড়িয়াছিল। কিন্তু মনের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়ায় মোটেই শীত বোধ হইতেছিল না। উপেনবাবুর কলকূলের বাগানটা জ্যোৎস্নায় যেন ভিজিয়া গিয়াছিল। বড় একটা জাম গাছের পত্রাস্তর দিয়া জ্যোৎস্না করিয়া পড়িতেছিল। মেঘদেশীন আকাশ চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল। এমন সুন্দর রাত্রে এমনি একটা অসুন্দর বিষয়ের মধ্যে গাইতেছি ভাবিয়া মনে শাস্তি পাইলাম না। এমন মধুর রাত্রি, এই শুভ জ্যোৎস্না শাস্ত নীরবতা কি এই সব বিরোধ ও অশান্তির জন্ত সৃষ্টি হইয়াছিল?

ভাবিতে ভাবিতে বরান্দায় আসিয়া উঠিলাম। ভিতর হইতে ছুয়ার ভাবনা সব বন্ধ করা ছিল। মনে হইল যেন বাহিরের সকল শাস্তি ও সৌন্দর্য্য হইতে এই হতভাগা গৃহখানি বঞ্চিত হইয়া আছে।

উপেন বাবকে ডাক দিলাম। প্রথম বারে কোন উত্তর আসিল না। দ্বিতীয় বার ডাকিয়া একটু অপেক্ষা করিতে সাড়া পাইলাম। বলিলাম—আমি গোল, ছুয়ার গুলন।

ছুয়ার গুলিয়া উপেনবাব অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—
“আজ্ঞা না।”

আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

আমি ভিতরে আসিবার পূর্বেই ঘরের ছুইট জানালাই গুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমি একটু ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিলাম কোণাও বোতল গেলাসের চিহ্ন আছে কি না। উপেনবাবুর জৈয়ৎ লাল চোখ দুটি ছাড়া আর তাহার কোন নিদর্শনই পাইলাম না। আশ্চর্য হইয়া বসিলাম।

খানিকক্ষণ ছুজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। উপেনবাব প্রথমে কথা কহিলেন—“আপনি বোধ হয় কিছু বলতে এসেছেন। আমার আজকার ব্যবহার লক্ষ্যে?”

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—“ঠিক কিছু বলতে নয়। আপনার সুখ-অসুখ নিতে এসেছি, আপনার স্ত্রী আজ আমার জীর কাছে থাকবেন।”

“বেশ, সে আর বেশী কথা কি?—কিন্তু আমি

কোথায় থাকি অর্থাৎ কোথায় বাই বলুন দেখি গৌর বাবু ?—বলিয়া উপেন বাবু ঠিক অসহায়ের মত আমার পাশে চাহিলেন।

প্রথম সংকোচটা কাটিয়া গিয়াছিল তাই বলিতে পারিলাম—“এর অস্ত্রে আগনি মন খারাপ করবেন না ; ক্ষমাও পাবেন না। এমন একটু মন কবাকবি কাদের না হয় বলুন ?”

“সকলেরই হয়, সেই বা একটু আশার কথা। আচ্ছা আপনাদেরও হয় ?” বলিয়াই উপেন বাবু হঠাৎ একবার উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

কিন্তু সেটা হাসি কি কারা তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—“তা কখন কখন হয় বৈকি।”

“তবে এতটা হয় না—নয় ? একেবারে রক্তা-রক্তি।”

আমি এবার আর উত্তর দিলাম না। মনটা একটু বিক্লমও হইল। একেবারে ইতরের মত গায়ে হাত তোলা কি করিয়া ইঁদার দ্বারা সম্ভব হইল ? অথচ বীকারও তো করিলেন।

উপেন বাবুই পুনরায় কথা কহিলেন—“আমারই দোষ, গৌর বাবু। সহ্য করতে পারিনি, থাকা নিষে-হিলাম। তাই টেবিলে লেগে কপালটা কেটে গিগেছিল। কিন্তু আমি মারবার অস্ত্রে প্রস্তুত তিলাম না। তিনি যদি না চলে যেতেন তাহলেও কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না।”

এবার কিন্তু সুখ হইতে বাহির হইয়া গেল—“এটা কিন্তু আপনার কাছ থেকে আশা করি নি।”

“না—কিছুতেই করেন ননি, আমিও করি নি। কিন্তু কি করি ?”

বলিয়া উপেন বাবু হাত দুইখানা অসহায়ের মত রক্তাধিতে লাগিলেন। মুখে অপরিণীত লজ্জা ও হুংখ ফুটিয়া উঠিল।

এবার আমারও হুংখ হইল। বলিলাম—“ওর অস্ত্রে

আর মন খারাপ করিবেন না ; এ সব ছদ্দিনেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। দাম্পত্য কলহে বহুবারে লজ্জাক্রিয়া এ তো আছেই।”

“ক্রিয়া তো ক্রমশঃই ওরু হচ্ছে—বার কল নিভেরা তো পাচ্ছিই, আপনাদেরও পেতে হচ্ছে এই যে আরও হুংখের কথা। কিন্তু কি করে এর হাত থেকে পরিজ্ঞাপ পাই ?”

অত্যন্ত চিন্তিত মুখে উপেন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমাকে বলিতে হইল—“একদিন দৈবাৎ একটা অস্ত্রায় হয়ে গেছে বলে অত দুঃখে পড়া ভাল নয়।”

উপেন বাবু বলিলেন—“একদিন তো নয় ; এ হচ্ছে অনেক বছর থেকে, আপনারা আজ একদিন দেখতে পেরেছেন—তাও অতি সামান্য অংশ।”

আমি দিচ্ছাসা করিলাম, “আচ্ছা কেন এমন হচ্ছে দিচ্ছাসা করতে পারি ?”

“সেই কথাই তো বলা শক্ত”—বলিয়া উপেন বাবু একবার পাশের ঘরে গিয়া সাবধানে দুরার বন্ধ করিলেন। আবার মিনিট ৩.৪ এর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “দেখুন গৌর বাবু, যদি আমাকে এ রকম কাব করতে আর কোন দিন দেখেন, তাহলে আমার খুঁড়ীমাকে খবর দেবেন টেলিগ্রামে। শুধু বলবেন উল্টান তার খুঁড়ীমাকে দেখতে চার।”

বলিয়া হাত দুইখানি যুক্ত করিয়া একবার মাথার স্পর্শ করিয়া, ঠিক জীবনের নাম উচ্চারণ করিবার মত তক্তিতরে ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন—“খুঁড়ীমা ! খুঁড়ীমা !” পরক্ষণে হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া কে'লেন। আঙ্গুরের কাঁক দিয়া কিছুক্ষণ চোখের জল পড়িতে লাগিল।

আমি বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া তাবিত্তে লাগিলাম—
উপেন বাবুর এত হুংখ কিণের ?

৩

সে রাখে উপেন বাবুকে অশ্রুজল, লজ্জা, হুংখ ও

নেশার ঘোরের মধ্যে রাখিল। আসিয়াছিল। পরদিন তাঁহার জী সন্ধ্যায় উঠিয়াই আপনাদের বঁসার চলিয়া গেলেন। আমার জীৱ সুখে শুনিলাম বাইবার সময়ে একটু সুখ তার করিয়াই গিয়াছিলেন; অথচ আমার জী বর আদর ও সহানুভূতি কোনটারই ক্ষতি করেন নাই।

রাত্রে যে সহানুভূতিটুকু ভাল লাগিয়াছিল প্রভাতে তাহারই স্মৃতি হয়ত তাঁহার মনকে বিক্লম করিয়া দিয়াছিল।

ইহাই হয়ত জীচরিত্র।

সেদিন সন্ধ্যায় উপেন বাবু আমাদের সাহিত্যের আসরে আসিলেন না। ভাবিলাম হয়ত ইহা কালিকার দাম্পত্য কলহের মধুর পরিণাম। কিংবা হয়ত কাল রাত্রে বেশী নেশা করিয়াছিলেন তাহার ফলে উঠিতে পারেন নাই। এইটাই বেশী সম্ভব মনে হইল। কারণ আজ ইনি কোর্টেও যান নাই সে সংবাদ জানিতাম।

উপেন বাবু আসিলেন না দেখিয়া আমি বাড়ীর ভিতর বাইব ভাবিতেছি, এমন সময় উপেন বাবুর ভৃত্য এক প্রকার ছুটিতে আসিয়া ছুটিতে আমার বলিল, “বাবু একবার শীজ আসুন—নাইলে একটা খুনোখুনি হয়ে বাবে।”

জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন, কি হয়েছে?”

সে বলিল—“হুজনেই তরানক রেগেছেন। আগনি আসুন।”

আমি তখনই সেই দিকেই ছুটিলাম। বারান্দার উঠিয়া দেখিলাম উপেন বাবুর ঘরের দরজা খোলা। একবার গলার সাড়া দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই শুভিত হইয়া গেলাম। উপেন বাবু মেঝের উপর সুখ শুজিয়া পড়িয়া আছেন; পাশের ঘরে বাইবার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। বুঝিলাম যেখান হইতে উপেন বাবুকে তেলিয়া দিয়া তাঁহার জী দরজা বন্ধ করিয়াছেন।

সুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—“এই অবস্থার এঁকে ঠেলে কেলে উনি দরজা বন্ধ করেছেন?”

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে ভীক ঘরে উত্তর আসিল “ঠেলে কেলে না তো দরজার খুলে রেখে বাতালের হাতে মার খাব নাকি? আমার তখন বঁদ খুন কর্ত্তা কোঁকের মাথার, কে ঠেকাত?”

আমি নির্বাক হইয়া গেলাম। বাবীর সম্বন্ধে জীৱ কি উত্তর! কিছ সত্যই যদি প্রাণের আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে তো ইহার কত দোষ দেওয়া যায় না! আমি তখন ভূত্যর সাহায্যে উপেন বাবুকে ভূমিশয়া হইতে উঠাইয়া পার্শ্বের শয্যার শয়ন করাইয়া দিলাম। মনে হইল বাবিরে বাইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদে সম্বিত হইয়া কোথায় বসিতেছিলেন, এমন সময় এই জর্যোগ। বালিশে মাথাটা তুলিয়া দিই দেখিলাম কপালের উপরিভাগে খানিকটা অংশ ফুলিয়া রহিয়াছে। জুতা মোজা আর উপরকার বড় কোটট খুলিয়া দিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“ক বোতল খেয়েছেন জান?”

সে বলিল—“হ বোতল।”

“কে এনে দিরেছিল?”

মাথা নীচু করিয়া ভূত্য উত্তর দিল—“আমি।”

বুঝিলাম এতখানি নেশার উপর থাকা থাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। নাচী দেখিলাম। একটা উত্তেজনা ছাড়া আর কোন চিহ্ন পাইলাম না।

বিছুরণ প্রস্থানে দাঁড়াইয়া উপেন বাবুর সুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। এমন গভীর জ্ঞান, এত বিভ্রামুগ, এমন মধুর স্বভাব সম্বন্ধে কেমন করিয়া এই লোকের ঘরে এমন সব নীচ কার্য্য ঘটিতেছে তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।

তার পর, বাহার হাত হইতে আশ্রয়কার লভ আপন জীকেও শারীরিক বলের সাহায্য লইতে হইয়াছিল, সেই লোককে নিতান্ত অগম্য শক্তিহীন ও সংজ্ঞাহীন অবস্থার পরের অজ্ঞানের উপর হুকুম দিয়া তারাক্রান্ত জ্বরে করিয়া আসিলাম।

সেই রাত্রেই উপেন বাবুর পুড়িধাকে আনিবার লভ বেশে টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম।

৪

ব্যাপারটা বাহা মনে করিয়াছিলাম তাহার চেয়ে আরও অনেকদূর গড়াইয়াছিল। পরদিন সকালে উপেনবাবু উঠিতে গিয়া মাথার ভিতর একটা বস্তু বোধ করেন ও পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া বান। ডাক্তার আসিয়া অনেক চেষ্টার ফলে প্রায় অপরাহ্নের দিকে চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু বাঙ্গালী। আমাকে বলিয়া গিয়াছেন ব্রেন এবং হার্ট দুইয়েরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। উপেন বাবুর জ্ঞান হওয়ার পর আমি ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার সহিত দেখা করি নাই। শুধু আগ্রহের সহিত তাঁহার খুড়িমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমার জীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম তাঁহার জীকে একটু শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে—এ অবস্থায় তিনি যেন কোন উত্তেজনার সৃষ্টি না করিয়া বসেন।

আমার জী আদিয়া যে সংবাদ দিলেন তাহার মাথায়ও তো আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। জী বলিলেন—বোটা কাল হইতে খার নাই, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—কাল হইতে ওরা আমাকে ও ঘরে বাইতে দেয় নাই। তোমার স্বামীকে দিয়া ডাক্তারের মত করিয়া দাও আমাকে যেন বাইতে দেয়; নহিলে আমি পাগল হইয়া বাইব।

সে রাত্রি ও তাহার পরের সকালে তরে তরে কাটিল। অপরাহ্ন কোর্ট হইতে আসিয়া শুনিলাম উপেন বাবুর খুড়িমা আসিয়াছেন। বুক হইতে একটা বোকা নামিয়া গেল।

কোর্টের পোষাক পরিবর্তন না করিয়া হাত মুখ না ধুইয়াই তাহাদের সহিত দেখা করিবার ভ্রম ছুটিলাম।

বাগন্দার গিয়া পাড়াইতেই কক্ষের ভিতরকার নিয়মিত কথাবার্তা শুনিতে পাইলাম :—

“উপী, গোপাল আমার, এমন শরীর হয়ে গেছে তা আমাকে কিছু দিন আগে কেন খবর দিসনি?”

“কোন মুখে তোমাকে আর খবর দেব খুড়িমা?”

খবরই যদি দেব তো তোমার কাছ থেকে চলে আসব কেন?”

“চলে এসেছিস্ তার জন্তে এত ব্যস্ত কেন বাবা? লোকের ছেলে কি বিশেষে কায় করে না?”

“আমি তোমাদের বৃকে কত বড় ব্যথা দিয়ে এসেছি। কেন যে এসেছি সে কথাটাও যে বলে আসতে পারি নি। লিখিয়ে পড়িয়ে, পেটে না খেয়ে আমাকে মাতুষ করেছিলে, আর আমি বুড়ো বয়সে তোমাদের একলা কেলে চলে এলাম!”

“ছিঃ উপী, ছেলের মূঃঃ মত কাঁদনা। তোর কাঁকা তখন আমাকে বলেছিলেন—তুমি দুঃখ কোরো না, আমাদের কোন একটা বড় দুঃখ থেকে বাঁচবার জন্তেই ও চলে গেল; নইলে ও কি সেই ছেলে।”

“তাই সত্যি খুড়িমা। কিন্তু পারলাম না তো। আবার তো তোমাকে এই সবে মধ্য টেনে আনলাম। ও কি বলেছিল জান খুড়িমা? আমি যদি মতিহারা না বাই তো তোমাকে আমার সামনে ও অপমান করবে। করতও তাই। ও তো বুঝতো না যে ওকে তুমি আমার চেয়ে ভালবাস; তুমিই ওকে পছন্দ করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলে। ওর হৃদ্যবহারে তোমার বুক একবারে ভেঙ্গে বাবে, তাই খুড়িমা তরে হৃদয় দুঃখে আমি চলে এলাম। এ দুঃখটা তোমাকে দিতে হল—বড় হয়ে আমি জী নিয়ে আলাম। থাকতে চাই এই ভাণ করে চলে এলাম।”

“আমি তো তাতে কোন দুঃখ পাইনি বাবা। তুমি কোনও দিন নিজের সুখ দেখিসনি। নিজে যদি এতে সত্যিই একটু সুখ পায় একটু আনন্দ পায় এই ভেবে আমরা যে সুখীই হয়েছিলাম।”

“তাই সুখী হয়েছিলাম খুড়িমা। কোনও দিন তোমাক চুকট পর্য্যন্ত খাই নি, জান ত? আর আগ এসে তো সব দেখতে পেরেছ। আমি আর তোমার কাছে সুখ দেখাবার যোগ্য নই।”

“এ যে আমার আত্মজনার মত উপী, বেড়ে

কেলে দিলেই সাক হয়ে বাবে। তুই ভাল হয়ে ওঠ, সব ঠিক হবে। এ কি, কপালে কিসের দাগ উপী ? বল, চুপ করে রইলি কেন ?”

“খুড়িমা, ওটা বিজ্ঞান কর না।”

“আচ্ছা, বলতে লজ্জা হয় তো বলিসনে।”

“না খুড়িমা, বলি। তোমার কাছে কিছু লুকোব না। সেদিন তোমাকে অকারণে একটা কটকটি করে বলে তোমরা টাকার লোভী তাই আমার উপর দরদ দেখাও। আমি বললাম ঠাণ্ডের নামে তুমি কোন মন্দ কথা বোলো না, ওটা আমি সহ্য করব না। বলে বেশ করব বলব কি করবে কর। মারবে ? না মার তো তোমার খুড়িমার দিবি।—বলে সামনে এসে দাঁড়াল। আর সহ্য হ’ল না। সামনে থেকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে টেবিলে তার কপালটা লেগে একটু কেটে গেল। তখন ও নীচে থেকে তাক! কাঠি ফুলে নিয়ে, এইখানটার—ওঃ ছিঃ ছিঃ খুড়িমা—এও আমার অদৃষ্টে ছিল।”

“ওঃ বাছা আমার ! কি কষ্টই পেরেছিস্ উপী ! কেন তুই অত গুলো করে টাকা আমাদের পাঠাতিস ? আমাদের ছকনের বা দরকার তাই পাঠালেই তো হ’ত বাবা। তাহলে ঘোমারও আক্রোশ হ’ত না।”

“খুড়িমা !”

“কি বাবা।”

“আর আমাকে ছেড়ে বাবে না।”

“না বাবা।”

“কাকা আসবেন ?”

“আসবেন বৈ কি—তোকে যে তিনি নিজে হাতে তৈরি করেছেন। তুই যে তাঁর কত আদরের দিবিষ তা কি জানিস নে ?”

“ও যদি অপমান করে তাহলেও চলে বাবে না ?”

“তা হলেও বাব না। কিন্তু ঐ খানেই তোর ভুল হয়েছিল বাবা। ওর সাধ্য কি বাবা ও আমাকে অপমান করে ? আমি অপমান মনে না করে

আমাকে কে অপমান করে বাবা ? তুই চুপ করে এখন যুঝো। অনেক বকেছিস্।

“খুড়িমা।”

“বাবা ?”

“আমার মাথায় একটু হাত দাও।”

আমার হুই চক্ষু মলে তরির। আসিরাছিল। তখন আর আমি উইাদের বিরক্ত না করিয়া কিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর শুনিলাম উপেন বাবুর অবস্থা তেমন সুবিধা নয়। তাড়াতাড়ি তাঁহার বাড়ীর দিকে চলিলাম। বাহির হইতে খবর দিতে, ভিতর হইতে দরজা খুলিবার শব্দ শুনিলাম, আমি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

উপেনবাবু শুইয়া আছেন। তাঁহার কাছে বিনি বসিয়া আছেন তাঁহাকে দেখিলাম। বুকিলাম উনি খুড়িমা।

তাঁহাকে প্রণাম করিতে তিনি মাথার হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—“আমি তোমার কথা উপীর মুখে সব শুনেছি। বল বাবা।”

কি মিষ্ট স্বর ! মাতৃস্বরের এত মধুর কথা আমি আর কখনও শুনি নাই।

উপেন বাবু আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—“পৌর বাবু, আর তাবনা নেই, আমার খুড়িমা এসেছেন।” বলিয়া চক্ষু বদ্ধ করিলেন। খানিক পরে চমকিয়া উঠিয়া আমার চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, “পৌর বাবু, আর আমাকে কখনও অস্ত্র কাব করতে শুনবেন না। খুড়িমা আমার কাছে থাকবেন।” তারপর, খুড়িমার কোলের উপর অগৌরব নির্ভরের সহিত আগনার হাত রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কিন্তু সে ঘুম আর তাদিল না। শুধু খুড়িমার এতদিনকার সঞ্চিত অশ্রুরল বরিয়া বরিয়া এই দুর্ভাগ্য সন্তানকে ধৌত ও ধস্ত করিতে লাগিলেন।

ঐশ্ব্যিক তত্ত্বাবধায়।

দৈনিক নিদ্রা দীর্ঘনিদ্রা ও যোগনিদ্রা

১

আমরা প্রতি দিনই কিছু কালের নিমিত্ত নিদ্রিত হই। ইহাকেই দৈনিক নিদ্রা বলিতেছি। দীর্ঘ নিদ্রা শব্দে আমি মৃত্যুকে লক্ষ্য করিতেছি না। বিবিধ প্রাণিগণ, কেহবা শীতকালে কেহবা গ্রীষ্মকালে নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং সমস্ত ঋতুকাল এই অবস্থাতেই থাকে। ইহারা পরবর্তী ঋতুতে জাগরিত হয়। ঋতুকাল ব্যাপী এই নিদ্রাকে আমি দীর্ঘ নিদ্রা বলিতেছি। যোগ নিদ্রা বলিতে যোগাবস্থাকে নির্দেশ করিতেছি। এই জীবিত অবস্থা অর্থাৎ দৈনিক নিদ্রার অবস্থা, ঋতুকালব্যাপী নিদ্রার অবস্থা এবং যোগাবস্থা পরস্পরের সহিত তুলনীয়। আমি ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে “নব্যভারত” পত্রে লিখিয়াছিলাম যে “দৈনিক নিদ্রা, দীর্ঘনিদ্রা এবং যোগনিদ্রা যেন এক স্রুজেই প্রযুক্ত। ইহারা কি এক হইতে অন্তে ক্রম-বিকশিত? লক্ষণের সমতা, মাজাজদের সমতা এবং একটি হইতে অন্তরীক ক্রমিক বৃদ্ধি—এই সকল দেখিয়া ক্রম বিকাশ অনুমান করা নিতান্ত অসম্ভব হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও নিশ্চয় মত হওয়ার সম্ভব নহে।” আমি যে সকল কারণে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম তাহা নব্যভারতে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলাম, সে আমি প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা। এই কাল মধ্যে শারীর বিজ্ঞান অনেক অভিনব তথ্য প্রচার করিয়াছে। এতদ্দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজনীতি সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছেন—তাহারা সে সকল তথ্য অবগত হইবার সময় পাইতেছেন না। বাহা হউক, এই সকল অভিনব তথ্য মধ্যে যেহের গণ্ড (gland) সকলের কর্তব্য ও বল অতি বিস্ময়কর। শারীর বিজ্ঞান গণ্ড বিষয়ক আশ্চর্যজনক তথ্য সকল আবিষ্কার করিয়া মানব সমাজকে তত্ত্বিত করিতেছে—

সে সকলের প্রচার করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নহে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য জীবিত নিদ্রার সম্বন্ধে এই সকল তথ্য হইতে যে মত প্রতিপন্ন হয়, তাহাই আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

গণ্ড মাজেই কোষগুচ্ছ। পিটুটারি গণ্ড (Pituitary gland) নামক একটি গণ্ড মস্তিষ্কের নিম্নভাগে ঠিক নাসামূলের কিছু পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত। উহার আকার একটি মটরের ভায় এবং বর্ণ শ্বেত ও পীত মিশ্রিত। উহা দুই খণ্ড, যেন দুইটি গণ্ড একত্রে সংযুক্ত। এক খণ্ডকে পূর্বাংশ ও অল্প খণ্ডকে পরাংশ বলা হইতে পারে। পিটুটারি গণ্ডের পরাংশ হইতে যে রসক্ষরণ হয়, তাহা বিশ্লেষণ করতঃ রসায়নিক উপায়ে পিটুটিন্ নামক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পদার্থ দেহ মধ্যে ইন্ডেক্সন দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিলে দেখা যায় যে, রক্তের বেগ ও চাপ বাড়িয়াই যায় এবং কিছুক্ষণ বাড়িয়াই থাকে; সূত্রগণ্ড (kidney) হইতে সূত্রক্ষরণ এবং তলগণ্ড হইতে সূত্রক্ষরণও বাড়িয়া যায়। সূত্রাধার ও তলার পিটুটিনের ক্রিয়াবশতঃ পুনঃ পুনঃ সঞ্চিত হয়; এবং সম্ভবতঃ রক্তের মধ্যস্থ লবণের ভাগও নিরসিত হইয়া থাকে। * * * পিটুটারি গণ্ডের পূর্বাংশ হইতে কতিপয় গোব অস্ত্রদ্বারা কাটা গাইলে অর্থাৎ উহার আরম্ভন ছোট করিয়া দিলে দেখা যায় যে, দেহের অস্থির বৃদ্ধি হ্রাস হইয়া যায়; দেহে মেদ বৃদ্ধি হয়, নিদ্রা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, দেহের কেশ সকল খসিয়া পড়ে, মনোবৃত্তিও নুনোখিক শুষ্ক হইয়া যায়।

পিটুটারি গণ্ডের পূর্বাংশ কাটা গেলিলে দেহের মেদবৃদ্ধি ও নিদ্রাবৃদ্ধি হওয়া বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন। দেহ মধ্যে পিটুটিনের ভাগ (ইন্ডেক্সন দ্বারা) বাড়াইয়া দিলে রক্তের বেগ ও চাপ এবং সূত্রক্ষরণ বৃদ্ধি হওয়াতে

অনার্যসেই বুঝা বাইতে পারে যে, পরাংশের কতকভাগ কাটিয়া কেলিয়া দিলে রক্তের বেগ ও চাপ এবং মূলধরন অভ্যন্তর ক্রিয়া বাইবে। প্রকৃত পক্ষে হয়ত তাহাই পিটুটারি গণ্ডের ক্রিয়া—বিশেষতঃ রসধারণ ক্রিয়া, সময় বৃদ্ধি পায় সময়ে হ্রাস হয়; যেমন জীবাতির রসধারণ সময়ে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে তদ্রূপ; কিংবা পুরুষের অণ্ডের রসধারণ ক্রিয়াও সময়ে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ।

একশ্রেণী উপরের নিখিত জীবিত নিদ্রার লক্ষণগুলি স্মরণ করা আবশ্যিক। দৈনিক গাঢ় নিদ্রার অবস্থার রক্তের বেগ ও চাপ কমিয়া যায়, দেহের তাপ কমে, (১) আহার ও মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ হয়, (২) মনোবৃত্তি স্তব্ধ হয় বাহ্যিক্রিয় তত্ত্বিত হয়। হৃদযন্ত্রগত, স্নায়ুগত মস্তিষ্ক দুর্বল হয়, পেশীগুলি ক্রিয়াক্ষমতা হারা করে। আর, নিদ্রান্তর হইলে পূর্বস্থিতি কিরিয়া আসে। এ সকল লক্ষণ পিটুটারি গণ্ডের পূর্বাংশ কতক কাটিয়া কেলিলে এবং পরাংশ কতকভাগ কাটিয়া কেলিলে বেরূপ হয় প্রায় তদ্রূপ।

দীর্ঘনিদ্রার লক্ষণ প্রধানতঃ আটটি। (১) রক্তের গতি কমিয়া যায়; (২) দেহের তাপ চতুর্দ্বিগু তাপের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিন্তু সম অল্পপাতে নহে; (৩) হৃদযন্ত্রগত স্নায়ুগত মস্তিষ্ক কিছু দুর্বল হয়, (৪) পেশী সকল বিশেষতঃ ডাইন মস্তিষ্ক জংগিওর পেশী উত্তেজিত হয়; (৫) আহার ও মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ হয়; (৬) ইন্দ্রিয়গণ তত্ত্বিত হয়; (৭) মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ অথবা প্রায় সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়। (৮) শ্বাস প্রশ্বাস সম্পূর্ণ অথবা প্রায় সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়। —এ সকল লক্ষণও পিটুটারি গণ্ডের পূর্বাংশ ও পরাংশ

কতক কাটিয়া কেলিবার মত। দীর্ঘ নিদ্রাতেও নিদ্রা তদ্রূপ হইলে জীবগণ পুনরায় পূর্বস্থিতি লাভ করে।

বোগনিদ্রার লক্ষণও প্রায় পূর্ববৎ। ১ শ্বাস রোধ; ২ দেহতাপের ও রক্তের বেগ ও চাপের বর্ধতা; ৩ ইন্দ্রিয় তত্ত্বন; ৪ মনোবৃত্তি নিরোধ; ৫ আহার ও মলমূত্র নিরোধ; ৬ বোগ তত্ত্ব পূর্বস্থিতির পুনরাবর্তন। বোগের আধ্যাত্মিক কল আছে; সে কল ছাড়িয়া দিলে কেবলমাত্র দৈহিক লক্ষণ এং মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বাহ্যিক বিকাশ ভূগনা করিলে দীর্ঘ নিদ্রার সহিত বোগনিদ্রার সাদৃশ্য বীকার করিতেই হয়। বোগনিদ্রার লক্ষণগুলিও পিটুটারি গণ্ডের পূর্বাংশের এবং পরাংশের কতকভাগ কাটিয়া কেলিবার মত; অর্থাৎ পিটুটারি গণ্ডের রসধারণ কমিয়া গেলে বেরূপ হয় তদ্রূপ।

দীর্ঘনিদ্রাগত অন্তর পিটুটারি গণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে দীর্ঘনিদ্রিত অবস্থার ঐ গণ্ডের রসধারণ ক্রিয়া অনেক কমিয়া গিয়াছে, অথবা নাই। স্নায়ুগত দৈনিক নিদ্রার এবং বোগনিদ্রার ঐ গণ্ডের ক্রিয়ার হ্রাস হইবে অথবা প্রায় থাকিবে না ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া ডাক্তার বারম্যান মীমাংসা করেন যে, দীর্ঘনিদ্রা (Hibernation), বিশেষতঃ শীত ঋতুর দীর্ঘনিদ্রা (বাহ্যিক্রিয় তত্ত্বিত পায়) তাহা দৈনিক নিদ্রারই বর্ধিত অবস্থা। (১) আমি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বেই (১৩১৪) কতিপয় পরীক্ষা দ্বারা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে দৈনিক নিদ্রা, দীর্ঘনিদ্রা এবং বোগ নিদ্রা বোধ হয় ক্রম-বিবর্তন দ্বারা সংযুক্ত। আবার এখনও মনে হয় যে, একপ্রকার নিদ্রা অল্প প্রকার নিদ্রার বর্ধিত অবস্থা নহে, ক্রম-বিবর্তিত অবস্থা। একথা বীকার করিতে হয় যে এই জীবিত নিদ্রার স্থায়িত্বের তারতম্য আছে, গাঢ়ত্বও আছে। দৈনিক নিদ্রা অল্পকাল স্থায়ী এবং কম গাঢ়; দীর্ঘনিদ্রা অপেক্ষা-

১। এ স্থলে বলা আবশ্যিক যে আবাদিগণের রক্তের তাপ চতুর্দ্বিগু তাপ অপেক্ষা সর্বকালে সর্বদেশেই অধিক থাকে। সর্গীশগণের তদ্রূপ নহে। অনেক জীবে তদ্রূপ নহে। তাহারাই শীত অথবা গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ নিদ্রাগত হয়।

২। কদাচিতঃ কখনও নিদ্রাবস্থার মলমূত্র ত্যাগ হইতেও দেখা যায়।

১। I Winter sleep may be looked upon as an exaggeration of ordinary night sleep.

Hibernation p-65. (1922)

কৃত অধিক কাল স্থায়ী এবং অধিক গাঢ়. বোগনিজ্জা তদপেক্ষাও অধিককাল স্থায়ী এবং ততোধিক গাঢ়। ইহা সম্ভবতঃ পিটুটারি গণ্ডের নানাবিধ রসক্ষরণের ফল। বাহ্য হটক তুলন-মূলক অনুশীলন করিতে গেলে সাম্য এবং অসাম্য দুইই দেখিতে হয়। দৈনিক নিজ্জার স্থান গ্রন্থাগ চলে, কিন্তু দীর্ঘনিজ্জার ও বোগনিজ্জার স্থান গ্রন্থাগ নিকট হয়। এ স্থলে গুরুতর অসাম্য। আবার, দৈনিক নিজ্জার গাঢ় নিজ্জিত হইবার পূর্বে চক্ষু সুদৃষ্টি থাকিলেও নানাবিধ বিষ্ময়কর ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থা উত্তর স্থলেই সমান। আর, জীবিত নিজ্জাতেই রক্তের বেগ ও চাপের হ্রাস, দেহের তাপের হ্রাস, দাহনশক্তি হ্রাস, মস্তিষ্কের দৌর্জলা, আহার ও মলমূত্রের নিরোধ, ইন্দ্রিয়গণের শুভ্রতা, মনো-বৃত্তি এবং বৃত্তিবৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। যদিও রাজ্যভেদ আছে তথাপি ওসকল লক্ষণ জীবিত নিজ্জাতেই দেখা যায়। এ সকল বিষয়ে লক্ষণের সমতা, কিন্তু রাজ্যভেদ। দৈনিক নিজ্জার স্থান গ্রন্থাগ চলিতে থাকে সত্য, কিন্তু তাহার বেগ ও সংখ্যা কমিয়া যায়। হ্রাস হওয়া এবং বন্ধ হওয়ারকেন্দ্র রাজ্যভেদ বলিতে পারি।

দীর্ঘনিজ্জিত হইবার পূর্বে দেহে যেন বৃদ্ধি হয়। দীর্ঘনিজ্জিত অবস্থার অনাহার সময়ে ঐ বেদ দ্বারা শরীর গোষণ হইয়া থাকে। এ লক্ষণ পিটুটারি গণ্ডের পূর্বাংশের কতক ভাগ কাটিয়া কেঁদেবার মত।

সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে জীবিত নিজ্জার ক্রম বিবর্তন অনুমান করা অসম্ভব হয় না।

এখানে বোগের আধ্যাত্মিক কালের কথা এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, উহা পূর্ব সংস্কারের অনুরূপ

হওয়াই সম্ভব বোধ হয়। একথা বোগ শাস্ত্রের অন্তর্গত; অনধিকারীর এ বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব নহে।

বাহ্য হটক, দেহ লক্ষণের আলোচনা হইতে আমরা এ সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছি যে, বোগাবস্থার যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা আদিগণের দীর্ঘ নিজ্জাবস্থার লক্ষণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রবীর নহে। দৈনিক নিজ্জার অবস্থা হইতে যদিও (বোগ গ্রন্থাগ সন্দেহ) বোগাবস্থা এবং দীর্ঘ নিজ্জাবস্থা গুরুতররূপে বিভিন্ন, তথাপি ভিন্ন শ্রেণীর নহে।

ক্রম বিবর্তনে উত্তরোত্তর যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার প্রথমটী হইতে শেষটি অর্থাৎ নিত্যকাল অনুরূপ হইতে অত্যন্ততীর মধ্যে গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু মধ্যবর্তী লক্ষণ সকলের সহিত প্রথমের ও শেষের তাদৃশ পার্থক্য থাকে না। কীট হইতে মানুষ কত বিভিন্ন। সরীসৃগ হইতে মানুষ বিভিন্ন হইলেও তাদৃশ নহে। এই নিয়ম অনুসরণ করিলে সহজেই প্রতীতমান হইবে যে, দীর্ঘনিজ্জার লক্ষণ ও হেতু সম্যক প্রকারে জ্ঞানসম্মত হইলেই দৈনিক নিজ্জার হেতুও কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে; কারণ দীর্ঘনিজ্জার অবস্থাকে অপর দুই নিজ্জার মধ্যবর্তী অবস্থা বিবেচনা করা যায়।

আমরা বারম্বার দীর্ঘনিজ্জার হেতু নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। আশা করি তাহাতে বোগনিজ্জাও কিছু কিছু বুঝিতে পারিব। তাহার পারমাধিক্য কল যদিও সম্যক বুঝিতে না পারি; কিন্তু এ কথা উপলব্ধি করিতে পারিব যে উহা পূর্ব সংস্কারের এবং বিশ্বাসের উপর কতক পরিমাণে নির্ভর করে।

শ্রীশশধর রায়।

পোষ্ট মাষ্টার

গল্প

থকে ছাওয়া গ্রামা পোষ্ট আপিসের ভিতরে, নড়বড়ে টেবিলের সামনে, হাত তাক। চেয়ারের উপর, খেঁচনী রঙের আলোয়ান গায়ে ঐ যে দুবকটি বসিয়া কাব করিতেছে, ওই এখানকার পোষ্টমাষ্টার বা ডাক বাবু বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেই, বাহিরে কন্ কন্ শব্দ শুনা গেল; ‘রাণার’ ডাক লইয়া আসিয়াছে। ‘রাণার’ প্রবেশ করিয়া ডাকের ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল; বাবুকে প্রণাম করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। ডাকবাবু ব্যাগের শীলমোহর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। রাণার তখন ‘ডানুক’ থাইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

আগিস গৃহ এখন জনশূণ্য। পিরনেরা রান্না খাওয়া সারিয়া লইতেছে—খানিক পরেই আসিয়া জুটবে, এবং নিজ নিজ বীটের চিঠি, মনি অর্ডার, রেজিষ্টারি প্রভৃতি বুঝিয়া লইবে। ব্যাগটি কাটরা বিমল উহা টেবিলের উপর উলুড় করিয়া ধরিল। চিঠিপত্র পার্শ্বল প্রভৃতির সঙ্গে, একটা এসিদ্ধ মাসিক পত্রের পাঁচ ছয়টা বিভিন্ন প্যাকেটও বাহির হইল। একটা প্যাকেট লইয়া বিমল তাহার দেয়ালের মধ্যে রাখিল। (‘ইহা সে বাসার লইয়া বাইবে এবং আহারাদির পর শয়ন করিয়া, খুন্সিয়া গল্প ও প্রেমের কবিতাগুলির রসাবানন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে।’) তার পর, চিঠির গান্না পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হইতেও ৪৫ খানি বাছিয়া লইয়া, দেয়ালের মধ্যে লুকাইল। এগুলি সমস্তই খামের চিঠি এবং পুরুষের হস্তাক্ষর, স্ত্রীলোকের নামে ঠিকানা লেখা। এগুলিও সে বাসার লইয়া গিয়া, জল দিয়া থুলিয়া পাঠ করিবে;—তথু প্রেমের গল্প কবিতা নয়, প্রেমের চিঠি পড়িতেও বিমল অত্যন্ত ভালবাসে। এটা সে একটা নির্দোষ আন্দোলন বলিয়াই মনে করে; কারণ, চিঠিগুলি সে মঠ করে না, আবার জুড়িয়া, পরদিন ছাপ মোহর

লাগাইয়া, বিলির এক পিরনের দিয়া থাকে। ছয় মাসের অধিক কাল বিমল এখানে আদিয়াছে—প্রত্যহই এইরূপ চিঠি অপভরণ করে;—এটা তাহার একটা মেসার মত ঠাঁড়াইয়া গিয়াছে।

সাতঃ ঘণ্টা বাজিল; পিরনেরা একে একে আসিয়া টেবিলের উভয় পার্শ্বে বসিয়া গেল। বিমল তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামের পত্রাদি বন্টন করিয়া দিতে লাগিল; এই অবসরে, আমরা এই মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ পূর্ব পরিচয় দিয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি।

২

বিমলের নিবাস বশোর জেলার কোনও এক গঙগামে। তাহার একটি হাইস্কুল আছে—সেই স্কুলের উপরের ক্লাসগুলির প্রত্যেকটিতে দুই তিন বৎসর করিয়া কাটাঁইয়া, বিমল যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে উদ্ভত হইল, তখন তাহার গৌঃকদাড়ি বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং বয়স হইয়াছে ২২ বৎসর। গ্রামের লোকে সে সময় বলিয়াছিল, “বিমল যে দিন পাস হবে, সেদিন পূর্বের সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠবে।” এইরূপ মন্তব্যের যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। গ্রামের বড় বড়রাটে হোকরাই ছিল বিমলের বন্ধু; সখের ঘিরেটর দলের সেই ছিল প্রধান পাণ্ডা; এবং গজিকা সেবন ত অনেকদিন হইতেই চর্গতেছিল, ইদানীং ঘিরেটরের রিহাসাঁলে যে বোতলও গোপনে আবদানী হইত, তাহারও বিশ্বাসজনক প্রমাণ আছে।

কিন্তু যে ঘটনা অভাবনীয়, তাহাই ঘটয়া গেল; সেজেট বাহির হইলে দেখা গেল, বিমল কৃত্রিম বিভাগে পাস হইয়াছে,—অথচ সূর্য্যদেব গ্রামের লোকের তলিহাণীর কোনও খাতিরই করিলেন না।

বিমল ছোট টি দেখিত বেশ সুপুরুষ, কিন্তু তাহার মনস্বতাব কত আঁজও বিবাহ হয় নাই। সংসারে তাহার মা ও কেরাইয়া (উভয়েই বিধবা), একটি ছোট ভাই, একটি বিধবা ভগিনী এবং দুইটি কোঠাকুতো ভাই বর্তমান। বড়টি স্থানীয় কনিদারী কাছারিতে সামান্য বেতনে সুমারনীং কর্ষ করে—ছোট ভাই ছোট ফুলে পড়ে। বিমলেরও এখন অর্ধোপার্জন করা আবশ্যিক হইয়া পড়িল,—সামান্য বাহা জোৎসমা আছে তাহাতে সংসার চলে না। তাহার এক মামাশুভ্রের সঙ্গে, ২৪ পরগণার পোষ্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবুর বিশেষ দ্বন্দ্বতা ছিল; তাহারই সুপারিশে সে ডাক-বিভাগে কর্ষ পায়। আলিপুরের চেড আপিসে ২২সর খানেক শিকানবিশী ও একটিনি করিয়া, আজ ভর মাস হইল সে এই মহেশপুর ডাকঘরের সাব পোষ্ট মাস্টার হইয়া আসিয়াছে।

চেড আপিসে খাণ্ডিতে পঁচজন উপরওয়ালার অধীনস্থ হইয়া কর্ষ করিতে বিমলের মোটেই ভাল লাগিত না; এখানে আসিয়া সে স্বাধীন হইয়াছে। সরকারী বাসাটি ভাল, পিরনেবা আজ্ঞাকারী, খাদ্য জব্যাদি সুলভ; এমন কি, পল্লীগ্ৰাম হইলেও এখানে “বিলাতী” পাওয়া যায়—তবে গোড়া পাওয়া যায় না, জল বিশাইয়া খাইতে হয়, এই বা একটু অসুবিধা। সুতরাং মোটের উপর বিমল এখানে ভালই আছে বলিতে হইবে।

৩

পিরনগণ স্ব স্ব বাস ভরিয়া পত্রাদি লইয়া রওনা হইয়া গেলে, বিমল অগস্ত্য মাসিকপত্র খানি ও চিঠিগুলি হাতে করিয়া আপিস ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাতে তাল বন্ধ করিল। বাসায় প্রবেশ করিয়া উঠান হইতে বলিল, “বামুন মা, রান্নার কত দূর?”

“একজন বর্ষারসী ব্রাহ্মণ বিধবা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, “রান্না আমার শেষ হয়েচে, তুমি চান করে’ এস বাবা।”—ইহার বাণী এই পাঠাতেই, বড়

গরীব, মাত্র চারটি টাকা বেতনে বিমলকে দুই বেলা রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যান।

বিমল নিজ ঘরে গিয়া, চিঠি গুলি ও মাসিক-পত্র খানি বালিসের নীচে ভাঁজিয়া, কোট প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়া, একটা শিশি হইতে কিঞ্চিৎ তেল ঢালিয়া মাথায় দিয়া, সাবান গামছা ও ২২ লইয়া নিকটস্থ পুকুরীতে স্নান করিতে গেল। স্নান করিয়া আসিয়া, ভিজা কাপড়খানি শুকাইতে দিয়া, জামা পরিয়া, আসি’ চিকুণী ও বুকব লইয়া পরিপাটি স্নানে নিজ কেশসংস্কার করিল। তারপর রান্না ঘরের বারান্দার বিছানো আসন খানির উপর বসিয়া তোবনে প্রবৃত্ত হইল।

বিমলকে খাওয়াইয়া ‘বামুন মা’ যখন চলিয়া গেলেন তখন বেলা প্রায় ১২টা। বিমল পাণ চিবাইতে চিবাইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া, পরন ঘরে প্রবেশ করিল। এক সেলাস জল ও একখানি ছুরী লইয়া, শয্যাপার্শ্ব (সরকারী) ছোট টেবিল খানির উপর রাখিয়া, বিছানার বল্লা, বালিসের তলা হইতে মাসিক পত্র ও চিঠিগুলি বাহির করিল। জলে আঙুল ভিজাইয়া, প্রত্যেক চিঠির সুখে বেশ করিয়া ঘুলাইয়া, সেগুলি সারিবন্দি টেবিলের উপর রাখিয়া, মাসিক পত্রখানির মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিল। পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কোনও চিঠির সুখের জল শুক হইয়াছে কি না। মাঝে মাঝে সেগুলির সুখ আবার ভিজাইয়া দিতে লাগিল। যখন বুঝিল এইবার সময় হইয়াছে, তখন মাসিক পত্রখানি রাখিয়া, ছুরির কলা চিঠির সুখে ঢুকাইয়া উন্টানিকের চাপ দিয়া একে একে চিঠি গুলি খুলিয়া ফেলিল।

প্রথম চিঠিখানি বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সহিত একখানি দশ টাকার নোট। বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল, “বাঃ, আজ বটনি হল মন্দ নয়!” নোট খানি বালিসের তলার ভাঁজিয়া রাখিয়া, চিঠির তাঁল খুলিল। প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন। বিমল সাগ্রহে

চিঠিখানি পড়তে লাগিল। কলিকাতা-প্রবাসী বিরহী স্বামী স্বীর বিরহ বহুপার অনেক বর্ণনা করিয়াছে ; শিখিয়াছে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া, তাহার হৃদয়েখরীকে হৃদয়ে ধরিয়া, সকল আলা নির্মাণ করিতে পারিবে—সে অল্প দিন-গণনা করিতেছে। প্রথম মাসের সাহিনা পাইয়া, খোকার হৃদ খরচের অল্প ১০টি টাকা পাঠাইতেছে। এ ব্যক্তির আশংক্যের কথা নিম্নে ইতিপূর্বে বিমল পাঠ করিয়াছিল—সে জানিত, লোকটি কলিকাতার চাকরির অল্প উমেদারী করিতেছিল।

এ পত্রখানি রাধিরা, বিমল দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিল। “পূজনীয়া পিসিয়া!” সম্বোধন দেখিয়া—“ধুতোর” বলিয়া সঙ্ক্ষেপে চিঠিখানি বিছানার উপর ফেলিয়া, তৃতীয় পত্রখানি উন্মোচন করিল।

এই লোকের চিঠিও মাঝে মাঝে বিমল পড়িয়াছে—তাহা হইতে ইহাদের পূর্বকথা কিছু কিছু সে অবগত ছিল। মেয়েটির নাম চাকরীনা—সে বিধবা, বেধ হয় বালবিধবা। এই মহেশপুত্র প্রাণের দক্ষিণে রতুলপুরে তাহার বসতি—খুব সম্ভব ঐ স্থান তাহার শ্বশুরালয়। তাহার পিত্রালয় কলিকাতার;—কলিকাতা নিবাসী এই পত্রলেখকের সহিত তাহার প্রথম সংঘটিত হয়। পত্র লেখককে পত্রলেখক কখনও নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছে বলিয়া বিমলের স্বরণ হয় না—সে সহি করে—“তোমার প্রেমাকাজক্ষী”, “তোমার ভালবাসা,”—“তোমার সে,”—এইরূপ সব মাথাযুগ। বিগত ৩৪ মাস হইতে ইহাদের মধ্যে এইরূপ প্রেমপত্র চলিতেছে—তবে, মেয়েটির লেখা চিঠি বিমল কখনও দেখিবার সুযোগ পায় নাই,—নাম না জানাতে, রওরানা চিঠি গুলির মধ্যে হইতে সেখানি বাছিয়া বাহির করা শক্ত বলিয়াও বটে ; এবং সময় পাওয়া যায় না বলিয়াও বটে,—কারণ বিভিন্ন প্রাণের ডাক বাক্স হইতে পিরনেন্না চিঠি বাড়িয়া আনিবার সময় ডাকঘরে অনেক লোকজন থাকে, ছাপ ঘোঁর দিয়া ব্যাগ ভর্তি করিবার খুব পড়িয়া যায়।

বিমল সাগ্রহে পত্রখানি পাঠ করিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

কলিকাতা

২২শে অক্টোবর।

আমার হৃদয়েখরী

গতকাল্য তোমার একখানি পত্র শিখিয়াছি—তাহা তুমি পাইয়া থাকিবে। তাহাতে শিখিয়াছিলুম, আমি আগামী শনিবার দিন গিয়া তোমার লইয়া আসিব। কিন্তু শনিবারে বাঙালার সুবিধা করিতে পারিলাম না। পরদিন—অর্থাৎ রবিবার দিন আমি নিশ্চয় বাইব তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তুমি পূর্ব পরামর্শ মত, রাজি ঠিক ১২টার সময়, তোমাদের বাড়ীর পশ্চিমে সেই শিব মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে—আমি পূর্ব হইতে মন্দিরের পার্শ্বস্থ সেই বটবৃক্ষের ছায়ার লুকাইয়া থাকিব ; এবং তুমি আসামাত্র তোমাকে সন্দেশ করিয়া কলিকাতার লইয়া আসিব। বান বাহনাদির কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিব তাহা এখন বলিতে পারি না—হয়ত হাঁটরাই উত্তরে টেশনে গিয়া ট্রেনে উঠিব। বিভাগাগর মহাশয়ের আইন অনুসারে আমাদের বিবাহের সমস্ত আয়োজন আমি করিয়া রাখিয়াছি—পুরোহিতও স্থির হইয়াছে—সোমবার দিন আমি বখাণাজ্ঞ তোমার পাণিগ্রহণ করিব। এ সম্বন্ধে আমি উকীল ব্যারিষ্টার গণের পরামর্শও লইয়াছি। তাহারা বলেন, বদ তোমার স্বত্বস্বত্বের কেহ, এই লইয়া আমার উপর মাফলা মোকদ্দমা করিতে উক্তত হয়, তবে, তোমার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক হইয়াছে এবং তুমি স্বৈরাচার আমার সঙ্গে আসিয়াছিলে, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই কেহই আর আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে। সেইজন্য আমি, জন্ম মৃত্যু রেজেষ্টারি আপিস হইতে, তোমার জন্মদিনের সার্টিফিকেটের নকল পর্যন্ত আদায় করিয়া আনিয়াছি। সুতরাং সকল দিকেই আটবাট বাধা রহিল। রবিবার সন্ধ্যার ট্রেনে আমি রওরানা হইয়া, টেশনে নামিয়া, রাজি

দশটার মধ্যেই তোমাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিব।
তপবানের নাম স্মরণ করিয়া, গৃহের বাহির হইও
—আশা করি তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমার মিলনের
পথ হইতে সকল বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইবে।

অধিক আর কি লিখিব। আমার শ্রুত গৃহে আসিয়া
তুমি লক্ষীৰূপে অবতীর্ণ হও—আমার শ্রুত স্বদরে বসিয়া
আমাকে চরমুখী কর। ইতি

তোমার (মন) চোর।

এই পত্রখানি পড়িয়া বিমল আপন মনে বলিয়া
উঠিল—কি চমৎকার! এ যে রীতিমত একটা
নভেলী ব্যাপার! বাঃ—বাঃ—ক্যা মজাদার! ক্যা
তোকা! বাহবা চাক্ষুশীলা—ব্রাতো! জিতা রও
বাধা—খুচিরাস কহু চাক্ষুশীলা। বেশ—বেশ করবে
তুমি বাবে—মাইকেল ত খিানই দিগে গেছে—“বে
বাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে”—ব্রাক্স
কাথ দেখ! গড্ ব্রেস্ দি ছাপি পেন্সার—তোমাদের
বিয়েরে আমার নেমকর করবে না বাবা? হুচি খেরে
আসতাম।

অতঃপর বিমল বাকী পত্র দুইখানি পড়িয়া দেখিল;
এ দুখানিই মানুষ-বানীর মানুষি প্রেমের চিঠি—তাতাতে
প্রেমের ঢেয়ে বরকরার কথাই বেশী—কোনও বিশেষ
নাই। বিমল এই ছয় মাসের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ
সহস্রাধিক প্রেমপত্র পড়িয়াছে, সে জানে বৈধ প্রেমের
চিঠি অশ্লীল, অবৈধ প্রেমের চিঠিতেই “মজা” বেশী
থাকে। পত্রগুলি আবার জুড়িয়া রাখিয়া বিমল
মাসিকপত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে
পড়িতে ক্রমে উহা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল;
সে তখন পাশ করিয়া, পাশের বালিসে পা দিয়া আরামে
খুঁমাইতে লাগিল।

- ৪

অপরাত্নকালে বিভিন্ন গ্রাম হইতে পিনেরা করিয়া
আসিলে বিমল তাহাদের নিকট হইয়া বসি অর্ডার
রেজিষ্টার প্রকৃতির রসিদ বুঝিয়া লইয়া, খাতা পত্র

লিখিতে আরম্ভ করিল। কার্যশেষ হইলে, ভৃত্যকে
বলিল, “ওরে, যা দেখি, হরেন সার দোকান থেকে
এক বোতল বিয়াইব নিয়ে আর। চানরের ভিতর
বেশ করে’ জুকিয়ে নিয়ে আসবি—বুকেছিস? আগ,
করিমদিকে আমার কাছে ডেকে দিয়ে যাস।”—
বলিয়া বিমল, সরকারী তহবিল হইতে ভৃত্যের হস্তে
ছয়টি টাকা দিল।

কিরতক্ষণ পরে, পিন্নন করিমদি সেখ আসিয়া বলিল,
“হজুর ডেকেছেন?”

বিমল বলিল, “হ্যাঁ। আজ একটা কাউলের কারি
বানিয়ে দিতে পারবে হে শেখের পো?”

করিম বলিল, “কেন পারবো না হজুর?”

“আচ্ছা—এই টাকা নাও। বেশ মোটা তাজা
মেখে একটা সুতগী কিনে এন। বেশ করে’ লড়াইটা
নিও—আমরা বাদশাহ মাহুব, কালটা কিছু বেশী
খাই।”—বলিয়া বিমল কাশ হইতে তাহাকেও একটা
টাকা দিল।

কাবকর্ষ শেষ হইলে, কাশ হইতে আর তিনটি
টাকা লইয়া, বিপ্রহরে লব্ধ সেই দশ টাকার নোটখানি
কাশে রাখিয়া কাশ পূরণ করিল। কাশ মিলাইয়া
তাহা লেহাংর সিন্দুকে বন্ধ করিয়া, আগিসঘরে ঢাவி
দিয়া বিমল বাসায় গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।
বাহুল মাকে দেখিয়া বলিল, “মা, আজ শরীরটে কেমন
মাজ্ মাজ্ করছে, আজ রাজে ভাতটা আর খাবনা,
খান কতক পরোটা ভেজে রেখে দেও। সরকারী
করকারী-বেশী কিছু দরকার নেই—খানকতক আলুতাজা
হলেই চলবে।”—বলিয়া সে সুখহাত ধুইতে চলিয়া গেল।
(মাঝে মাঝে—বিশেষ, বেতন পাইবার পর ২৪ দিন
বিমলের একগুণ গা মাজ মাজ করিয়া থাকে—এবং
রাজে ভাতের পরিবর্তে লুচী বা পরোটা করমাস করে।)
সুখহাত ধুইয়া আসিয়া, বিমল এক পেয়লা চা পান
করিয়া, পাশ বুধে দিয়া ঘোষেঘের বৈঠকখানার পাশা
খেলিতে গেল—প্রত্যহই এইরূপ ব্যয়।

রাজি ৮টা বাজিতেই বাহুল মা পরোটা ও আলুতাজা

বিমলের শরন ঘরে ঢাকিয়া রাখিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে, বিমল বাসার আসিয়া রানচরণ ভৃত্যকে ডিঙাস করিল, “কি মজা এসেছিল?”

রানচরণ বলিল, “কাজে ইঁা। ঐ যেখে গেছে।”—“বল দেখিল, একটি এনায়েলের বড় বাটীতে তাহার আকাঙ্ক্ষিত কাউল কারি ঢাকা বহিরাছে।

বিমল তখন ভৃত্যকে রাজের মত বিদায় দিয়া, সমর মন্ডলা বন্ধ করিয়া, শরনঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেওয়ালে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল—তাহার আলো বাড়াইয়া দিয়া, বথান্নান হইতে বোতল, গ্লাস এবং কাকইডু বাহির করিয়া, শয্যাপার্শ্ব (সরকারী) টেবিলের উপর রাখিল; জুতা মোকা ত্যাগ করিয়া, বিছানার ধারে বসিয়া বোতলট খুলিয়া ফেলিল।

এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালাটি পাড়িয়া তাহাতে ছ’দ গিতে লাগিল। একটা পং বাকাইয়া আর এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালা বথান্নান রাখিয়া তাবিল, সেই মজার চিঠিখানা আর একবার পড়িতে হইবে। বেওয়ার্থ আলমারি খুলিয়া, চিঠিগুলি বাহির করিয়া, চাক্ষুশীল খানি বাছিয়া লইয়া বলিল—“এঃ, জুড়ে কেলেছি বে দেখছি। কুহ পরোয়া নেই—কের খুলবো।”—বলিয়া টালিতে টালিতে বিছানার আসিয়া বসিল। চিঠিখানিকে সাংনে ধরিয়া বলিল, “কি টাদ, জল খাবে? না ত্রাণ্ডি?”—বলিয়া পেলালে খানিক ত্রাণ্ডি ঢালিয়া, আঙুলে একটু লইয়া চিঠির মুখ ভজাইয়া বলিল, “বা বেটা, তোর চিঠিজন্য সার্থক হয়ে গেল।” পরে ত্রাণ্ডিটুকু পান করিতে করিতে, চিঠিখানি খুলিতে চেষ্টা করিতেই উহার মুখ ছিঁড়িয়া গেল। চিঠিখানি উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, “ছিঁড়ে গেলি? কাল্ বিলি হবি কি করে রে শালা?”—বলিয়া খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া, খামখানা ছিঁড়িয়া মেঝের উপর ফেলিয়া বলিল—“জগারামে বাও।” চিঠি খুলিয়া, পড়িল—“আমার জগরামণী।” চিঠি রাখিয়া নিজ বক্ষে তাত দিয়া, চকু বুজিয়া অভ্যন্তর ভাবিতে বলিতে লাগিল—“জগরামণী!—জগর বলে গেল,—পুড়ে গেল,—খাচ্ হয়ে

গেল। একটু খাই”—বাক্য চকু খুলিয়া, গ্লাসের বাকীটুকু পান করিয়া, পত্রখানি কুড়ইয়া লইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জহা তখন তাহার জড়ইয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া, নেমা হইলে, সে আর ‘ন’ উচ্চারণ করিতে পারিত না—স’ স্থানে ‘ছ’ বলিত। একটি একটি কথার জোর দিয়া পড়িতে লাগিল—

“কিন্তু—ছনিবারে,—বাওয়ার—ছুখিা করিতে—পারিলাম না। পরদিন—অর্থাৎ রবিবারে—আমি নিজের বাইব তাহাতে কোন ছন্দেহ নাই। তুমি—পূর্ব পরামর্হ মত—রাত্রি ঠিক ১২টার সময়—তোমাদের বাড়ীর পচ্চিমে ছেই ছিবমনিরের ছমুখে আছা দাঁড়াইবে।”

চিঠি রাখিয়া, আর কিঞ্চিৎ পান করিয়া, গভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিল। অর্দ্ধ মূর্তিত ০-জো, মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল—“এ চিঠি ত তুমি পাবে না মণি! খাম খাণাই বে চিঁড়ে কেলেছি। পূর্ব চিঠি মত—তুমি ছনিবারে রাত ১২টার এছে ছিবমনিরের কাছে দাঁড়াবে। তার আছাপথ চেয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—অবছেছে ক্রান্ত হয়ে বছে পড়বে—বছে বছে ক্রমে ছুরে পড়বে। কিন্তু ছে ত আছবে না। অলুগাইট—আমি বাব। আমি গিরে তোমার বলুণো—

উঠ উঠ হে ছন্দরী,

তব পদছপছ যোগ্য নহে এ ধরী।

তুমি কেন খুলায় পাতত?

তুমি চল—আমার ছলে চল। চল ছবি, তুমি আমার জগরামণী হবে। জগরের ছরী—না ছুরি? জগরের ছুর গোঁরো না ঘোহাই বাবা ছাতঘোহাই তোমার।”—বলিয়া চকু খুলিয়া, আপন রাসিকতার মুগ্ধ হইয়া বিমল একটু হাসিল। গ্লাসের বাকীটুকু পান করিয়া ফেলিয়া, আবার চিঠিখানি লইয়া পড়িতে বসিল। পড়িল—

“আমার ছুত গৃহে আছিয়া, তুমি মন্দাবনে অবতীর্ণ হও। আমার ছুত জগরে বহিয়া আমার চিরছুরী

কর। ভগবানের নাম হ'লে করিয়া গৃহের বাহির হইও—আছা করি তাঁহার আত্মীকানে, আমাদের মিলনের পথ হইতে ছকল বাধাবিহীন অপছাড়িত হইবে।”

চিঠি রাখিয়া বিমল বলিতে লাগিল—উত্তম কথা।—

কিন্তু মামা, তোমারই জন্ম কি চুত? আমারও বে তাই। আমার ছুত চুত ছব চুত। আমার জন্ম ছুত—শ্রেম নেই; গৃহ চুত ইছ—খিরী নেই—বাক্ছো চুত, টাকা নেই। আমার ছব চুত—মহাবোম—বোম তোলানীথ—ছনিবার রাত ১২ টার আমি বাব—তোমার মন্দিরের কাছে বটগাছের নীচে আমি লুকিয়ে থাকবো—চাক্ছিলাকে নিয়ে এছে, আমার চুত গৃহ চুত জন্ম পূর্ণ করবো। জুনি হচ্ছ বিয় বিনাছনের বাপ—তাকে ছাবধান করে দিও—বদি কোনও বাধা বিয় বটে—তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এর সঙ্গে রেচ্পান-ছিবিগ হতে হবে—এই ছাপ্ কথা আমি বলে রাখলাম।”

বলিয়া বিমল বীররসের সহিত বিছানার এক দুটোয়াত করিয়, চকু খুলিল। আর থানিকটা সুবা চালিয়া, অল মিশাইয়া পান করিয়া হাত নাড়িয়া বক্তৃতার সুরে বলিতে লাগিল “লোডজ্ এও জেনেলমেন, তোমরা তাবছো—মাতালছা নানা ভদি—এখন এ বেটা মদের খেরালে এই ছব বগছে—কাল এছব কিছুই মনে থাক্বে না। তা নয় তা নয়—হাম বারেক্স—আলবৎ বারেক্স।—সুখ ঢ়েক বারেক্স—আমার চিন্তে পারবে না। তার পর এই বাছার এনে থাকে বিন্দিনী। আদরে বহু বিচ্টি কথার ইচ্ছার লোককে বহীকৃত করতে কতজন?—আর আমার এ চেহারাটাও কি কোনও বাবে লাগবে না?—এখন একটু ছোয়া বাক্।” বলিয়া মতাল বিছানার দেহ লুগাইয়া দিয়া, নিজা ঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল। কোথায় রহিল তার পরোটা—আর কোথায় রহিল তার সাথের কাটলকারি।

৫

খামের উপর স্রীমতী চাক্ছীলা দাসী ঠিকানা লেখা থাকিলেও, এই রত্নলপ্তর গ্রামে বখাৰ্খই একজন চাক্ছীলা

দাসী থাকিলেও পত্রখান তাহার তত্ত্ব উদ্ভট নহে। তাহার মনেই পত্র আসে বটে, কিন্তু পত্র না খুলিয়াই, চাক্ছীলা সেখান কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া “পাশের বাড়ীতে তাহার প্রিয়সখী বনলতাকে দিয়া আসে। ইহাই গো ন বঝাবত্ত। সব কথা খুলিয়াই বলি।

বনলতা, বনে ভ্রমগ্রহণ করে নাই—খাস কলিকাতা সহরে, তাহার মাক্ছলপরে জন্মিয়াছিল। বাঁকালেই পিতৃবাড়ীতে হইয়া, বনলতা মামার বাড়ীতেই মাতৃগৃহ হইতে থাকে। মামা বড়লোক ছিলেন; নিজের মেয়েদের সঙ্গে বনলতাকেও ভালরূপ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বভাবের একটি সুবক, কলিকাতার মেলে থাকিয়া কলেজে পড়িত—তাঁহার সহিত বনলতার বিবাহ নিশাছিলেন; কিন্তু মাস কয়েক পরেই সেই হতভাগ্য সুবক কাগ-কবলিত হয়। বনলতার মামা, অভাগিনী ভাগিনীকে আরও লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। গত বৎসর উইল করিয়া তাহাকে বিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিয়া, ইচ্ছাম হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

যে লোকটি “তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষা” “তোমার মনচোর” ইত্যাদি বলিয়া চিঠি সহি করে, তাহার নাম নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল—ইহাদেরই জাতি। সে লোকটিও স্থানান্তরিত এবং উদারমতাবলম্বী। ব্রহ্মদেশে সেজন্য কাঠের তাহার বিকৃত কারবার আছে—কলিকাতার তাহার ত্র্যাক আছে। বনলতার মামার দ্বারা উপলক্ষেই বন্দী হইতে নরেন্দ্র কলিকাতার আসে এবং বিধবা বনলতার সহিত পরিচিত হয়। তাহাদের বাড়ী দিগ হইলেও, প্রত্যহই এ বাড়ীতে সে আসিতে লাগিল এবং এসে কয়েক ঘাঘা হয়—প্রথমে অর্ধখি মজিল, তার পর মন মজিল। ব্যাপার অবগত হইয়া বনলতার মামাতো তাইয়ের, নরেন্দ্রের সহিত তাহার বিধবা-বিবাহ দিতেও কৃতসংকল্প হইলেন।

এই ধরনের কাঞ্চনুখে রত্নলপ্তর গ্রামেও আসিয়া পৌছিল। উইলের সংবাদও পূর্বে পৌছিয়াছিল। বনলতার স্বপ্নের কলিকাতার গিন্না, বনলতার

মাথাভে ভাইদের উপর উকীলের চিঠি দিয়া, মহা হাঙ্গামা করিয়া, বিধবা পুত্রবধূকে "উদ্ধার" করিয়া আনেন।

রত্নলপ্তরে আসিয়া বনলতা প্রথমে অত্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। মাস খানেক পরে, পাশের বাড়ীর সম-বয়সী চাকরীদার সহিত তাহার সখীত্ব জন্মে। চাকর, তার স্বামীর অতিমাত্ত, বনলতার সহিত তাহার হস্তাকাকরী পত্রবিনিময়ে এইভাবে সহায়তা করিতে সম্মত হয়।

অশ্রুত পত্র খানিতে লেখা ছিল, "গত কল্য তোমার পত্র লিখিয়াছি যে, শনিবার রাত্রে গিয়া তোমার লইয়া আসিব।" সে পত্রখানি বখাশমের চাকর হস্তগত হয়, এবং বখাশমের বনলতাকে সেখানি সে দিয়াও আসে। অত্যন্ত পত্র, বনলতা পড়িয়া, ছিঁড়িয়া কেঁপিত। কিন্তু এ পত্রখানিতে সময় তারিখ ইত্যাদি লেখা ছিল বলিয়া, বাক্সে লুকাইয়া রাখে। বনলতার খাণ্ডড়ী তাহাকে অত্যন্ত সম্বন্ধের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। তাহার অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে তিনি তাহার এক্স পেটরা গোপনে খানাতল্লাসীও করিয়াছেন—কিন্তু এপর্যন্ত "দেঃবজ্রনক" কিছুই পান নাই। এই পত্রখানি পৌছিবাবার পর দিন, বিপ্রহরঃ বনলতা চাকর-শীলাদের বাড়ী গিয়াছিল—সেই সুযোগে তাহার খাণ্ডড়ী অস্ত্র চাৰি দিয়া তাহার বাক্স খুলিয়া, পত্র খান্টি পাঠ করেন এবং স্বামীকে দেখান। স্বামী বলিল, "আচ্ছ, আশ্রুক না পালি, তাকে উচিত মত শিক্কা দেওয়া যবে।"

শনিবার দিন বনলতার খণ্ডর তাঁহার দুইজন বন্ধুকে রাত্রে আহারের জন্ত নিমন্ত্রণ করেন। খাণ্ডড়ী, নানা অছিলায়, রাগা-বান্ধায় বিলম্ব করিলেন। অতিথি-দ্বয়ের আহার বন্ধন শেষ হইল, রাত তখন ১১টা।

অস্ত্র দিন রাত্রি ১০টা না বাজিতেই বাড়ীর সকলে সুখাইয়া পড়ে। আজ বনলতা ছটকট করিতেছে, কিন্তু বাড়ীর সকলে আগিয়া; খাণ্ডড়ী-ননদেরা তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছেন। ওদিকে বৈঠকখানার, ১২টার কিঞ্চিৎ পূর্বে, বনলতার খণ্ডর, তাঁহার বন্ধুদের সহ, লাঠি ও

দড়ি সঙ্গে হইয়া, শিব-বন্দিরের পশ্চাতে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই, ওতারকোটি গারে, মাথার মুখে বন্দুটার জড়ানো, বিংশ ধীরে ধীরে আসিয়া বটবুকের অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়াইল। ক্ষণপরেই তথাৎ তিন জন লোক আসিয়া তাহার মাথার, পার্শ্বে, বুকে, পদদ্বয়ে লাঠি, কিল, চড়, ঘুসি ও লাথি মারিতে মারিতে তাহাকে মাটিতে পাড়িয়া ফেলিল। প্রহারে চোটে তৎপূর্বেই বিমলসংজ্ঞাহীন হইরাছিল।

লোক তিনজন তখন অচেতন বিমলের হস্তগত উত্তমরূপে বন্ধুবদ্ধ করিল। এক ব্যক্তি কহিল, "বেটা বেঁচে আছে ত? না মরেছে?"

অপর ব্যক্তি তাহার নাকের কাছে হাত দিয়া বলিল, "না—নিশ্বাস ত বেশ পড়ছে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "এখন, একে কি করা যায় বল দেখ? এইখানেই কি পড়ে থাকবে?"

"না না—আমাদের বাড়ীর কাছে কেন? শেষ কালে কি কোনও বিপদে প য়ে?"

"তবে চল, বেটাকে নিয়ে খানিক দূরে কোথাও ফেলে রেখে আসা যাক।"

"দেশলাইটে জাল ত, লোকটা কে, দেখি।"

এক ব্যক্তি দেশলাই জালিল। তিন জনেই তখন বলিয়া উঠিল, "এ কি! এ যে পেট মাটার।"

দেশলাই পুড়িয়া গেল। আবার যেমন অন্ধকার তেমনিই অন্ধকার।

তখন তিন জনে কিস্ কিস্ করিয়া পরস্পর চলিতে লাগিল। "এ বেটাই বা এখানে এল কেন? যে বেটার আসবার কথা সেই বা ল না কেন?"

"সে বা হোক তা হোক—এখন চল একে মহেশপুরে পোষ্ট আপিসের বারান্দার তইয়ে দিয়ে আসা যাক।"

তিনজনে তখন অচেতন বিমলের দেহ বহন করিয়া লইয়া চলিল। পল্লীগ্রামের পথ—রাত্রি 'বিপ্রহর'—রাস্তার আলো নাই—জনমানবের সন্ধান নাই।

শীতে, খোলা বারান্দার পড়িয়া থাকিয়া, ঘণ্টা দুই পরেই বিমলের জ্ঞান কিরিয়! আসিল। সে সেই আবহ অংশের পড়িয়া, নানারূপ উপায় কল্পি চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্রমে ভোর হইল। একজন পিরনকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া, বিমল কণকণ্ঠে তাহাকে ডাকিল।

পিরন আসিয়া বলিল, “বাবু, ব্যাপার কি?”

বিমল ‘চ’চি’ করিয়া বলিল “ডাকাতি রে, ডাকাতি! আগে আমার ঐশটা বাঁচা।”

সে ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া অস্ত্রাস্ত্র পিরনকে ডাকিয়া আনিল। সকলে মিলিয়া বিমলের বহন রজ্জু খুলিয়া দিল।

বিমল বলিল, “আমার বুক পকেট থেকে চাবি নে। ডাকঘর খেল, খুলে, মেঝের উপর আমার শুইয়ে দিবে খানার খবর দিগে বা।”

পিরনেরা তাহাই করিল। বিমল কাৎরাইতে কাৎরাইতে বলিল—“সব পিরন বা। দারোগা প্রথমে তোদেরই জবানবন্দি নেবে কিনা।”

তাহারা ভিজাসা করিল, “কি বলবো হুজুর?”

“বা আনিস—বা দেখেছিস—সবই বলাব।”

পিরনগণ বহন চলিয়া গেল, তখন বেশ কসাঁ হইয়াছে। বিমল টালিতে টালিতে উঠিয়া, সরকারী লোহার সিঁদুক খুলিল। তাহার মধ্যে নোট, টাকার ৫৪২, ছিল—সেগুলি সমস্ত বাহির করিয়া, ক্রমালে বাধিয়া, বাসার গিরা নিজ ট্রাকে লুকাইয়া রাখিয়া—আনিয়া ডাকঘরের মেঝেতে পূর্ববৎ শুইয়া রহিল।

৭

হুইদিন পরে, কলিকাতার কাগজে কাগজে ছাপা হইল—

ভীষণ ডাকাতি

পোষ্ট আফিস লুট।

বিগত শনিবার রাত্রে, ২৩ পরগণার অন্তর্গত বহেগপুর গ্রামের পোষ্ট আফিসে একটি ভয়ানক ডাকাতি হইয়া

গিয়াছে। পোষ্ট মাস্টার, বাবু বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাত্রি ১১টার সময় ডাকঘরে বসিয়া হিসাব মলাইতে ছিলেন, পিরনেরা তৎপূর্বেই চলিয়া গিয়াছিল, সেখানে আর কেহ ছিল না। ৫৮জন যুবক হঠাৎ ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রুতলবায় বাহির করিয়া বলে— “খবদার চীৎকার করিও না, গুলি করিব। লোহার সিঁদুকের চাবি দাও।” ইহাতে পোষ্ট মাস্টার বলেন, “তা কখনই দিব না—প্রাণ দিব তবু সরকারের টাকা দিব না।” একজন যুবক তৎক্ষণাৎ পিস্তলের বাট দিয়া বিমলবাবুর মস্তকে সজোরে প্রহার করে। অপর যুবকগণ তাঁহাকে আগটাইয়া ধরিয়া মাটিতে কেলিয়া, তাঁহার বুকে বসিয়া মুখে কাপড় জড়িয়া মুখ বাধিয়া ফেলে। তার পর হস্তশস্ত্রাদি রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া চাবি খুঁজিতে থাকে। চাবি পাইয়া লোহার সিঁদুক খুলিয়া, পূর্ব দিনের ক্যাশ ৫৪২ লইয়া, সিঁদুক বদ্ধ করণস্তর পোষ্ট মাস্টারকে বাহিরের বারান্দায় আনিয়া, গোরাই দেয়। আফিস ঘরে তালা বদ্ধ করিয়া, চাবির গোছা পোষ্ট মাস্টারের পকেটেই তরিয়া দিয়া তাহারা পলায়ন করে। প্রকাশ, ডাকাতিগণের মুখে কালো মুখস, গারে কালো কোট, গারে বুটজুতা ছিল, এবং তাহারা পরস্পর মধ্যে কর্খাবর্ত্তার মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল। এই ডাকাতি সম্পর্কে গত কল্যা কলিকাতার কয়েকটি ছাত্রাবাসে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে—এবং পুলিশ, তিনজন যুবককে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।”

* * *

শেষ পর্যন্ত ডাকাতির কেহই ধরা পড়ে নাই।

আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া বিমল সরকারের টাকা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল এই বিখ্যাসে সদাশয় গভর্ণমেন্ট বিমলকে ইন্স্পেক্টর পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

রবিবার রাত্রে নরেন বখাছানে আসিয়া, বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কলিকাতার কিরিয়া যায়। বনলতা পত্র এখানকার সমস্ত ঘটনা তাহাকে জানাইয়াছিল

মান খানেক পরে এক জন দিবা দ্বন্দ্বোত্তে, বনলতা পণ্ডিত
করিয়া, পদতলে গেল। ট্রেনের গিরা নগরেনের সঙ্গে
মিলিত হয় এবং উত্তরে কলিকাতার চিহ্না যায়। তার
খণ্ড কলিকাতার গিরা খানার এবং উকীল বাড়িতে

এক টুটাছুটি করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুই করিতে
পারেন নাই। নগরেনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া
গিয়াছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কৈলাস পর্বত মান সরোবর দর্শন

(পূর্বামুহুর্তি)

সন ১৩৩০ সালের ২৪ মে বৈশাখ আমার সাংসারিক
জীবনের একটি প্রধান দিন। আমার কোঠা করা দুর্গ-
ময়ীর বিবাহ হইয়া গেল। মংগের বিবাহের পর মা
নিজের খণ্ডবাকী চলিয়া গেলেন। আমিও শ্রীশ্রী
ময়ীর আগল খণ্ডবাকী শ্রীকৈলাস ধাম দর্শনে যাত্রার
ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম।

আমার বাড়ী বর্ধমানের ধু। সন্নিকট—বর্ধমান
ষ্টেশন হইতে এককোশ উত্তরে রাস্তা গায়ে। ৬ই ফেব্রু
৩ত পক্ষী ভিধিতে আমি গৃহ হইতে যাত্রা করিলাম।
বর্ধমান হইতে সোজা একখানি কানীর টিকিট গ্রহণ
করিলাম। এলপেস ট্রেন ধরিয়া তৎকালের নাম স্মরণ
করিতে করিতে বঙ্গ দেশ অতিক্রম করিতে লাগিলাম।
নীজই রাণীগঞ্জ পার হইয়া মধুপুর ও বাবার কাছে
পৌছিয়া শান্তকথিত বারখণ্ড দেশের মধ্য দিয়া রেল
লাইন বাইতে লাগিল। দু'ঘণ্টাই ছোট পাগড়, সামান্ত
সামান্ত জল, বেন জিমান পর্বতের ছায়া। নীজই
বৈষ্ণবধর্মের কাঁচাকাছি পৌছিয়া। উত্তর মুখ হইয়া
সহানিবন্ধ মনে মনে নমস্কার করিলাম।

ট্রেন নিজে গতিতে চলিয়াছে। পাগড় পর্বত সমুদ্র
পার হইয়া বেচারের বড় বড় মাঠ দিয়া বাইতে লাগিলাম।

এখনও জোৎস্না ন তাই কিছু কিছু দেখিতে
পাইতাম। নানারকম চিত্রা করিতে করিতে
শেষে দুইটি পড়িলাম।

কানী পৌছবার পূর্বে রাত্রে রাণীগঞ্জ কুণ্ডে ঘান

করিয়া বাইব ইচ্ছা করিয়াছিলাম। বক্তারপুত্র ট্রেন
হইতে একটি ছোট লাইন, বক্তারপুত্র বেহার লাইন
রেলওয়ে স্টেশন কুণ্ড পর্যন্ত গিয়াছে। বক্তারপুত্র
রেলওয়ে স্টেশনে নামিয়া ছোট লাইন ধরিয়া অতি প্রত্যুবে
রাণীগঞ্জ কুণ্ড পৌছলাম। রাণীগঞ্জ কুণ্ড হিন্দুদিগের একটি
ঐশ্বর্য ভীষণ, এখানে অনেক বাড়ী আগিয়া থাকে।
এবংসর চান্দ্রমাস অক্টোবরে একটি অধিক মাস পড়িয়াছে,
সেই কারণে অনেক হিন্দুহানী বাজীর সমাগম হইয়াছে।

রাণীগঞ্জ কুণ্ডে ছয়ট বড় বড় তপ্ত কুণ্ড ও একটি
বড় ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্ম কুণ্ডের জল বড়ই তপ্ত। ইহা একটি
মত বড় কুণ্ডের মত। নিকটে করাট দেব দেবীর
মন্দির। তপ্ত কুণ্ডে গুলিতে মাংসি করিয়া মন্দির
গুলিতে দেবার্জনা করিতে হয়। এই স্থানে পুরাকালে
একটি বৃহৎ নগর ছিল। কলিকাতার বেমন বিশ্ব-
বিদ্যালয় আছে, সেই ব্রহ্ম পুরাকালের ইতিবৃত্তে
বর্ণিত নগর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই স্থানের পর্বত
গুলিতে জৈনদিগের অনেক মন্দির ও ভীষণ-
দিগের বোগাশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে
পশ্চিমাঞ্চ পর্যন্ত যে সকল গিরিমালা বিস্তৃত, সমস্তগুলি
জৈন সন্ন্যাসদিগের ভীষণ।

দিন দুইরক রাণীগঞ্জ থাকিয়া আমার বক্তারপুত্রে
করিয়া আসিয়া শ্রীশ্রী কানীধান পৌছলাম। বাবা
বিশ্বাধর্মের নগরীতে দুই চারি দিন থাকিয়া গঙ্গাধাম ও
বাবার আশ্রিত দর্শন করিলাম। অক্টোবর এসাদ

পাইয়া জরোদখীতে বেলা ১১ টার সময় লক্ষ্মী এর এক খানি টিকিট কিনিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনে অযোধ্যাপুৰী হইয়া লক্ষ্মী পৌছিলাম। ছেলেবেলায় লক্ষ্মীয়ে থাকিতাম এবং এইখানেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম। একবার আসিয়া পুরাতন বন্ধু বান্ধবদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লইলাম। লক্ষ্মী হইতে পশ্চিম উত্তরাভিমুখে একটি ছোট লাইন সীতাপুর হইয়া কাঠগড় নাম পর্যন্ত গিয়াছে। এখানে বড় লাইন ভাঙিয়া সেই ছোট লাইন ধরিয়া আমাকে বাইতে হইবে। ২২শে মে সন্ধ্যার সময় ছোট লাইনের গাড়ীতে রওনা হইয়া বোহিন-খণ্ড কুমারী রেলওয়ের মেন লাইনের উপর সিলিভিত টেশনে ৩০শে তারিখ প্রাতে পৌছিলাম। সিলিভিতে গাড়ী বদল করিতে হইবে। নতুন লাইন ধরিয়া টনকপুর বাইতে হইবে। টনকপুর রেল পথের শেষ সীমা, এইখান চাইতেই পদব্রজে হিমালয়ে বাজা করিতে হইবে।

দশ বৎসর পূর্বে যখন টনকপুর ত্রাণ ছিল না, তখন সিলিভিত হইতেই হাঁটা পথ আরম্ভ হইত। সিলিভিত একটি জেলা সহর। সিলিভিতে দুই একদিন থাকিব স্থির করিলাম, কারণ এখানে রাস্তার অনেকটা সজ্জন পাওয়া বাইতে পারে। টেশনের কাছে একটি ধর্মশালা আছে, সেইখানে বাইয়া উঠিলাম। ধর্মশালাটি অতি সুন্দর। দিভল পাকা বাণী বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উপর তালিতে একটি ঘরে থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল। ধর্মশালায় ম্যানেজার বৃদ্ধ পণ্ডিত কানাইলাল বড় ভাল লোক। আমি যে পথে বাইব সেই পথে তিনি পিথোরাগড় পর্যন্ত গিয়াছিলেন, সেখান পর্যন্ত পথের খবর তাঁহার কাছে ভাল করিয়া জানিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন, যদিও পিথোরাগড় পর্যন্ত পথ, পার্বত্য হইবার কারণ বড়ই কষ্টকর, কিন্তু পথে থাকিবার কোনই কষ্ট হইবে না। কারণ, স্থানে স্থানে সরকারি ডাকবাঙ্গলা আছে ও সরকারের তরফ হইতে খাদ্যবাস্তুরি দোকানও আছে। পথে বাইবার জন্য ঘোড়া ও কুপি পাওয়া বাইতে

পারিবে। পিথোরাগড়ে তিনি তাঁহার কোনও বন্ধকে একখানি চিঠি লিখিয়া আমার হস্তে দিলেন, ডাকে পাঠাইলে পাছে দেরি হইয়া যায়।

বহুদূরই গাঁক করিয়া, দ্বিপ্রহরে আগরাতে বিশ্রাম করিলাম। সন্ধ্যার সময় একবার সহর বাজার ঘুরিয়া আসিলাম। রাস্তাগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দোকান গুলিও বেশ ভাল, আর বাৎসা বাজিও বেশ চলিতেছে। মদগাপাতির দোকান খুব বড় বড় আছে, কারণ এ সমস্ত জিনিষ এইখান হইতেই পাঠাইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। এখানে কাঠের কাব খুব ভাল হয়। কাককাঠা খঁচত খঁচত অতি সুন্দর। রজিন খাটের পায়, বাজ ও নানা রকম দ্রব্য পাওয়া যায়।

ধর্মশালায় কিরিয়া আসিয়া সাধীর জন্ত খোঁজ করিতে লাগিলাম কিন্তু কিছুই হইল না। পণ্ডিত কানাইলালও বলিলেন, টনকপুরে গেলেই কেহ না কেহ একজন জুটিয়া বাইবে, সেইখানে একদিন অপেক্ষা করাই প্রের। খানিকটা রাস্তার কথা জানিতেই পারিয়াছিলাম; রাস্তার কি দরকাব হইবে তাহারও একটা মোটামুটি আভাস পাইয়াছিলাম। আমার সহিত অনেক বেশি কাপড় চোপড় ছিল, সেই জন্ত ইংরাজি স্টুট ইত্যাদি এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে এইরূপ সমস্ত দ্রব্য এইখানেই রাখিয়া যাওয়া স্থির করিলাম।

৩১শে মে খুব সকালে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া জিনিষ-পত্র গোহাইয়া ফেলিলাম। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি লইয়া, থাকি সমস্ত একটি ট্রাকে ও হোল্ডেলে ভরিয়া পণ্ডিত জীব কাছে রাখিয়া দিলাম। সঙ্গে এই কয়েকটি দ্রব্য লইলাম—খুব মোটা নেপাল দেশীয় দুইখানা তোট কবল, একখানি খুব গরম কিন্তু ছোট আলোরান, সময়ে এইখানি পাতিবার বিছানা হইবে ও অল্প সময়ে গারে দেওয়াও চলিতে পারিবে; কবল চাইখানি গারে দিবার জন্য। একটি টুপি ও একটি কফটার গুলিও নেপাল দেশীয় বিত্তপূর্ণ পশমের সেই কারণ খুব গরম; গারে দিবার জন্য দুটি কামিজ, একটা ওয়েস্ট-

কোট, একটি গরম সোয়েটার, একটি নেপালী চৌবন্ধি, একটি গরম কোট। নেপালী পোষাকে চৌবন্ধির উপর ইংরাজি ক্যাসানের কোট পরা হয়। দুইখানি খুতি, ও নেপালী ক্যাসানের একটি গরম পাকামা, এক মোটা মোটর সোল জুতা, গরম মোজা, ও কাপড়ের জুতার নত এক মোজা খুব পাতলা চামড়ার জুতা (যাহা জুতার ভিতর পরা বাইতে পারে) অলপাঙ্গের অস্ত্র কানী হইতে একটি কমণ্ডলু কিনির-ছিলাম, একটি গেলস ও ছোট বাটি বা তাহার ভিতর ধরিতে পারে, ও একটি ছোট রেকাবি বাহার দ্বারা কমণ্ডলুর অল ঢাকিতে পারা যায়।

ছুত জুতা ছুরি ও কাগজ পেন্সিল কাপড় কাচা সাবান ও দ্বান করিবার সাবান লইলাম। পাহাড়ে উঠিবার জন্য একটি লাঠিও লইতে হয়; কিন্তু লাঠিতে আমার জুখি হয় না সেই কারণে লইলাম না।

ভাড়াভাড়ি কমণ্ডলু-ই তাত ও আলুভাতে চড়াইয়া বিলাম। রাত্রি ১১টা হইয়া সকালে ৯ টার সময় ট্রেন ধরিলাম। ট্রেনে খুবই তিড় হইল, কোন রকমে বসিবার একটু স্থান পাইলাম। টিকট খার্ড ক্লাসের কেনা হইয়াছিল, কারণ গাড়ীতেই লোকদের কাছে রাস্তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব। আমি বে-গাড়ীতে ছিলাম অনেকগুলি পাহাড়ী সেই গাড়ীতেই ছিল, তাহাদের কাছে পাহাড়ের অনেক সন্ধান পাইলাম। অলপ ও ছোট ছোট পর্বতমালা অভিক্রম করিতে করিতে, দূরে হিমালয়ের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিন ঘণ্টার মাত্র ৪০ মাইল পথ অভিক্রম করিলাম।

টনকপুর ট্রেনে নামিয়া জিনিসগুলি লইয়া ট্রেনের বাহিরে দাঁড়াইলাম। বাহিরে দাঁড়াইতেই একটি নেপালী ভ্রমণলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা করিয়া জানিতে পারিলাম তিনি আজ দুইদিন হইল টনকপুর আসিয়াছেন এবং পিথোরগড় বাওবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইহার নাম রাধাকৃষ্ণ নেওয়ার—ইনি নেপাল সরকারে কর্ম করিতেন, কাঠমান্ডু হইতে বাহাল পত্র পাইয়া এখন

কাঠমান্ডু হইতে গোরখপুর হইয়া এখানে আসিয়াছেন। পিথোরগড় হইতে গোরখপুর হইয়া কুলবাট দিরা তিনি নেপালের পশ্চিমাংশে বাটারি মোকামে বাইবেন—সেখানকার তিনি ভিঠা নিযুক্ত হইয়াছেন। নেপালের পরিচিত বহুদিগের নাম করিতে তিনি আমার বিশেষ খাতির করিতে লাগিলেন। যখন বলিলাম আমিও ঐ রাস্তার বাইব তখন বড়ই খুশী হইলেন। জিনিসপত্র লইয়া তাঁহাদের বাসায় পৌঁছলাম। তাঁহাদের বাসার বাইরা আর আর সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁর পিতা, ভগিনী-পতি, স্ত্রী, ভগিনীও তাঁহার সঙ্গে বাইতেছেন, একটি চাকরও সঙ্গে আছে।

পত্র লিখিবার জন্য পোষ্টাগিসে গেলাম। আমি কৈলাস দর্শনের জন্য তিব্বতে বাইতেছি এ কথা বাড়ীতে কাহাকেও বলিয়া আমি নাই। “পাহাড়ে বাইব” ও আরও কিছু আত্মগোপন কেবল আমার কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে দিরাছিলাম। এখন হিমালয়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি ও হিমালয় দর্শনে যাত্রা করিতেছি এই কথাই বাড়ীতে পত্র লিখিলাম—বাকিটা এখনও পরিষ্কার করিলাম না। তাহার অস্ত্র কোন কারণ ছিল না—মনে এখনও কিছু সন্দেহ ছিল, কঠিন পথে যাত্রা, কিছুই পর্বতে না বাইলে এবং পথের সমস্ত কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে সাহসে তুলাইবে কি না ও ভগবানের কৃপা হইবে—কি না বলিতে পারি না। পোষ্ট আফিসে বসিয়াই ঘোড়ার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অনেকগুলি ঘোড়াওয়ালা আসিল, কিন্তু কিছুই ঠিক হইল না। কাছেই একটি কুলি এজেন্সি আছে, সেখানে গেলাম। কিন্তু কুলি-এজেন্টকে দেখতে না পাইয়া বাসার দিকে করিতেছি, দেখিলাম, একটি ছোকরা, পরিধানে খুতি কোরতা কিন্তু মাথার হাট দিরা চলিয়াছে। মনে করিলাম, ছোকরাটি লেখাপড়া অবশ্যই জানে। তাহার সঙ্গে কথা করিয়া বাজারের আরও বিবরণ জানিতে পারিলাম—ঘোড়াওয়ালাদের আড্ডার সন্ধান পাইলাম। দুইটি ঘোড়া ঠিক করিয়া ফেলিলাম। লোহা বাট পর্যন্ত প্রতি ঘোড়ার ১০০ টাকা

করিয়া তাক। বাগারের গিছনে একটি ছোট শিব মন্দির আছে, তাহার সংলগ্ন একটি বড় বাগান ও একটি ছোট গাছশালা আছে, একটি পাতকরা ধাকার জলের খুব সুবিধা আছে। একজন গোরখপন্থী সাধু এই স্থানের মালিক। তাঁর ‘কুম্ভমতি লইয়া’, এইখানেই ত্রি-বাস স্থির করিলাম। জিনিস পত্র ও নেওয়ার মহাশরদের এইখানে লইয়া আসিলাম। টনকপুর একটি মণ্ডি বা বড় বাজার, এখানে শীতকালে খুব ব্যবসা বাণিজ্য হইয়া থাকে। ভূট্টারীয়া তিব্বত দেশ হইতে গম ও সোহাগা আনিয়া এইখানে বিক্রয় করিয়া কাপড়, অস্ত্রাস্ত্র পণ্যস্রব্য খাদ্যস্রব্য প্রভৃতি তিব্বতে বিক্রয় করিবার জন্ত কিনিয়া লইয়া যায়। অনেক বড় ব্যবসাদার, কলিকাতা বোম্বাই পর্যন্ত বাইরা তেজারতি মাল আসবাব লইয়া আসে। কিন্তু টনকপুরই তাহাদের একটি প্রধান বাজার। শীতকালে যদিও এখানে অনেক লোক থাকে, কিন্তু এ সময়ে বাজারটি প্রায় শূন্য। মাজ দুই তিনটি দোকান আছে, বাকি বড় বড় দোতারা একতারা দোকানগুলি এখন তালাবদ্ধ। সহরের দৃশ্য অতি মনোরম। চতুর্দিকেই বন জঙ্গল, উত্তরে হিমালয়ের পর্বতমালা, পূর্বে দক্ষিণে সারদা নদী। এই সারদা নদী এইখানে ভারত ও নেপালের সীমাননির্দেশ করিতেছে। এখানটি পাণ্ডুর তরাইরে অবস্থিত, সেই কারণ বড়ই গরম।

রোডে ট্রেনে আসিয়া ও দ্বিপ্রহরের রোডে বেড়াইয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছে। মনে করিলাম, একবার নদীতে স্নান করিয়া আসিলে শরীর একটু শীতল হইবে। পোষ্ট আফিসে বাইরা পোষ্ট মাষ্টারকে সন্দি করিয়া লইলাম। আরও দুই একটি হোকরা ও পূর্বে কথিত হাটধারী নব্য বুক সকলে মিলিয়া স্নানে বাহির হইলাম। নদী খুব স্নিকট। বর্ষাকালে যদিও নদী খুব বড় ও ভীষণ বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু এ সময়ে খুব ছোট—কুল কুল রবে বহিয়া চলিয়াছে। নদীর গর্ভেও সর্বত্রই বড় বড় পাথর। গর্ভের ভিতর প্রায় আধ মাইল দাঁতিতে

হইল। জলের মধ্যেও বড় বড় পাথর। জলে নামিয়াই বুঝিতে পারা গেল, এখনও জলের স্রোত এত বেশী যে সাঁতার দিলেই বেগে তাসিয়া বাইতে হইবে। অতএব বেশী দূর না বাইরাই স্নান করিতে হইল।—কেহ কেহ, সাঁতার দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। মল অতি শীতল ও পরিষ্কার। সমস্ত দিনের উত্তাপ ভোগের পর শীতল জলে স্নান করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলাম। সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই রাজিবাসের নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। তৎপরে কুপার আম সমস্তই ঠিক মত চলিয়াছে,—সদী ভূট্টা আছে, তার লইবার বোড়া ঠিক হইয়া গিয়াছে, পথের খবরও জানিতে পারিয়াছি। মনের শান্তিতে তৎপরে চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি আনন্দ! কাল হইতে হিমালয় মর্শন ও পরিভ্রমণ আরম্ভ হইবে। সুখে নিদ্রা বাইলাম।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১লা জুন। আজ সুপ্রভাত। খুব প্রভাতে—তখনও সামান্য অন্ধকার আছে,—বোড়াগুলো আসিয়া আমাদিগকে আগাইল। জিনিস গুলি গুছাইয়া ভাল করিয়া বাধিয়া একটি বোড়ার উপর বোঝা দেওয়া গেল। কিছু জিনিস আমার নেপালী বন্ধুদের চাকরটি লইবে। বাকি একটি বোড়া সওয়ারীর জন্ত খালি রাখা হইল। আমার কবল দুই খানি এবং দুই এক খানি কাপড় তার গিঠের উপর পালান স্বরূপ বাধিয়া দেওয়া হইল। আমার বাকি জিনিস ও কাপড় গুলি নেপালী বন্ধু দিগের বাগুলের ভিতর দিলাম। মধ্যপথে যখন কেহ বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, সেই সময় একটু সওয়ারি করিয়া শ্রান্তি অপনোদন জন্ত অপর বোড়াটি সওয়ারির জন্ত রাখা হইল। সমস্ত ঠিক করিতেই বেশ সকাল হইয়া গেল—আমরাও দুর্গা গ্রীহরি বলিয়া, কৈলাসপতিকে নমস্কার করিয়া বাজা করিলাম।

বাজারের বাহিরেই জঙ্গল। তাহার মধ্য দিয়া উত্তর পশ্চিমাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথ বেশ সমতল, হুথারেই বন জঙ্গল। এটি খয়ের গাছের জঙ্গল। খাল ও অন্যান্য গাছও আছে, কিন্তু খয়ের গাছই বেশী।

জঙ্গলের শোভা অতি মনোহর। গ্রীষ্ম কালের সকাল বেলাটা বেশ শীতল বোধ হইতেছে। পাখীগুলি ভগবানের গুণগান করিতেছে। সূর্য্যদেবের আভাসও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া বাইতেছে, রক্তবর্ণ হইয়া তিনি মানবকে সতর্ক করিতেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আমরা চলিয়াছি। চারি মাইল পথ চলিয়া হাখীখোড়ের পর্ব্বতের নীচে পৌঁছলাম। এই খান হইতেই হিমালয় আরম্ভ হইবে এবং খুব চড়াই চলিবে। পর্ব্বতের পদপ্রান্তেই একটি ছোট নদী খুর খুর করিয়া বহিতেছে; বড়ই পরিষ্কার শীতল জল। এই স্থানে সকলেই মুখ হাত ধুইলাম। আমিন্দানাদিও করিলাম। পড়িয়ার জলে অনেক গুলি ছোট ছোট মাছ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। বড় বড় পাথর আছে, ধরিবার চেষ্টা করিলেই তার তলার লুকাইতেছে। চাকরটি গিছাইয়া পড়িয়াছিল, আমি ও রাখাক্ষ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; অপর সকলেই অগ্রসর হইলেন। চাকরটি পৌঁছিলে আমরা রওনা হইলাম।

একটু অগ্রসর হইয়াই পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিলাম। আরম্ভেই খুব চড়াই। রাস্তাটি ক্রমাগত আঁকাবাঁকা হইয়া চলিয়াছে। পথটি বড়ই খারাপ—বড় পাথুরে। একটু চড়িয়াই ধর্ম্মাজ কলবর হইতে লাগিলাম। দেখি আমার বন্ধুর জী ও তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতি, (ইহাকে আমি এখন হইতে ভামাই বাবু বলিব) ক্লাস্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। রাখাক্ষের পিতা অজ অম্বর ও ঘোড়াগুলি অগ্রসর হইয়াছে। মিনিট কয়েক বিশ্রাম করিয়া সকলেই আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দূর বাইরা আবার সকলে বসিয়া পড়িলাম। এবার অনেকটা উপরে আসিয়াছি। একবার টনকপুরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—কি সুন্দর দৃশ্য! টনকপুরটি যেন জঙ্গলের মধ্যে একটি গৃহ, জঙ্গলগুলি যেন বাগান, পার্শ্বস্থিত সারদা নদী দূরে যেন একটি সাধা রেখার মত দেখা বাইতেছে; রেলের লাইনটি যেন একটি কালো রেখা।

আজ প্রথম দিন—তাই সকলের উৎসাহ খুব বেশি

আছে। কিছু অনভ্যাসের জন্য শীতল পীত্বই ক্লাস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আরও কিছু দূর বাইরা আঁকাবাঁকা পথ সোজা হইল, রাস্তাটি বেশ ভাল হইল—কিছু বরাবর চড়াই চলিয়াছে। সূর্য্যদেবও একটু উপরে উঠছেন, বেশ উত্তাপও আরম্ভ হইয়াছে। চাকরটি মুক হইতেই পিছনে পড়িতেছে; আবার সে আমাদের সব ছাড়া হইয়াছে। আমি নিজেও একটু ক্লাস্ত হইয়া পড়িতেছি। সকলেই বড় পিপাসা পাইয়াছে। আরও দুই তিন মাইল উপরে না বাইলে জল পাওয়া বাইবে না, আমি তাই অপর সকলকে অগ্রসর হইতে বলিলাম। টনকপুর হইতে হাখীখোড়ের নদী প্রায় ৪ মাইল আসিয়াছি। সেখান হইতে হাখীখোড়ের চড়াই ৯ মাইল উঠিয়া সুবীভাদের নীচে না পৌঁছিলে এই সাড়ে চার কোশ পথের মধ্যে কোথাও একটি জলাশয় নাই। একটি ধর্ম্মায়া ব্যক্তি এই পথের মধ্যে আমি খরক বা আমাপোরা নামক স্থানে একটি জলসত্র দিচ্ছিলেন। দুই কোশ দূর হইতে জল আনিয়া এই জলসত্রে রাখা হয়, আমরা পোরা না পৌঁছলে কাহারও জল পাইবার আশা নাই।

পশ্চিম দিগের পর্ব্বতটি খুব উচ্চ ও পূর্ব দিকে নীচু হইয়া গিয়াছে। সমস্তটাই খুব ঘন জঙ্গল, দেবদারু ও শালগাছ। ভোজ প্রথর হওয়াতে আমরা আরও কষ্ট পাইতে লাগিলাম। এতক্ষণে আমারও খুব পিপাসা বোধ হইল; আমি বড়ই ক্লাস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

আরও কিছু উঠিয়া আমাপোরা পৌঁছলাম। বসিয়া মুখ হাত ধুইয়া একটু জল খাইলাম। দেখিলাম, যে লোকটি জল খাওয়াইতেছে সে নিজের রক্ষণ কার্য্য করিতেছে। আনিতে পারিলাম, লোকটি ব্রাহ্মণ। বলিলাম, “বাবা, বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি, কিছু খাওয়াইলে ভাল হয়।” পরসূ দিতে চাহিলাম, তাহা লইতে সে অনিচ্ছা প্রকাশ না করিয়া বলিল, “ভায়া এই মোটা কটি ও ভাল আছে, ইহা যদি আপনার খাইতে ইচ্ছা হয় তবে গ্রহণ করুন।” দুই জনেই ভাল কটি খাইলাম,

খাইয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলাম। বোধ করি নানা রকমের ব্যঞ্জনাদি দিয়া ভোজন করিলে কোনমতে এরূপ তৃপ্তি হইত না। পর্বতের এমন স্থানে ভোজনের প্রবন্ধ হওয়া যেন যাই অসম্ভব। আত্মরাজ্যে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম করিয়া, ভোজনদাতা ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম।

ইতিমধ্যে চাকরটি আসিয়া জুটিয়াছিল। শীতলা আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। এখনও খুব যোজ্ঞ আছে সেই জন্ত বিশ্রাম করিতে করিতে চলিতে বাধ্য হইলাম। আর বেশী চড়াই নাই, কিন্তু বরাবরই উপরে উঠিতেছি। সম্মুখে আরও বড় বড় উচ্চ পাহাড় দেখা বাইতেছে। সর্বত্রই ঘন জঙ্গল, কোথাও মনুষ্যের বসবাস দেখিতে পাওয়া বাইতেছে না। এই সমস্ত জঙ্গলে নানা রকম বস্ত্র পত্র ও ব্যাজাদি হিংস্র জন্তু থাকে। পর্বতটীর নাম হাথীখোড় বলা হইয়াছে, কারণ ইহার পার্শ্ব ঘন জঙ্গলে বস্ত্র হস্তীও আছে। পর্বতের পারদ্রুত যে নদীতে আগ্র সকালে আমরা মুখ ধুইয়াছিলাম, বস্ত্র হস্তীরা তথায় জল খাইতে আসে; সেই জন্ত ইহার নাম হাথীখোড়। আরও কিছু দূর উঠিয়া হাথীখোড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ—ইহার নাম তোলিয়া বাট বা সুখী ডাং। সুখী ডাং পর্বতের উপর একটি ডাক বাড়লা আছে। এই স্থানটি টেনকপুর হইতে ১২ মাইল। ভোট দেশীর নেকড়াই চতীর গঙ্গা বাহা পড়িয়াছিল, এই স্থানে পৌছিয়া সর্বপ্রথমে তাঁহা দেখিতে পাইলাম। পথের পার্শ্বে একটি গাছের শাখাগুলিতে নানা রকম রঙের কাপড়ের টুকরা ঝুলিতেছে দেখিতে পাইলাম। পার্শ্বটীর পথিক যে কেহ এই দিক দিয়া যায়, সুবিধামত একটু কাপড় ছেঁড়া পার্শ্বটীর ভূত প্রেতাদির প্রীত্যর্থে গাছে বাঁধিয়া দিয়া যায়। আমিও এই গাছে এক টুকরা কাপড় বাঁধিয়া দিলাম। আমাদের বন্ধবেশে কোথাও নেওড়াই চতী আছেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু কাটোয়ার দক্ষিণে কুংচি গ্রামের সন্নিকটে এক ঢেগাই চতী আছেন জানি। কোনও পথিক সেই

রাস্তায় বাইলে ঢেগাই চতীকে চেনা দিয়া যান।

এইখান হইতেই এগার চল্লি নদী পর্য্যন্ত উৎসাহ। একটু দূর নামিয়াই একটি জলের বরণা আছে। সেই খানে আমার বন্ধুদিগের কাছে বাইয়া পৌছিলাম। তাঁহারা এই স্থানে রন্ধনাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটু বসিয়া বিশ্রাম করিয়া আমি বলিলাম, আমি অগ্রসর হইতেছি আপনারা আগুন। চাকরটি আবার পিছনে পড়িয়াছিল।

এবার উৎসাহ—খুব গড় গড় করিয়া বাটতে লাগিলাম। শীতলা চল্লির তীরে পৌছিলাম। চল্লি নদী যদিও খুব বড়, কিন্তু এই প্রৌঢ়ের সময় শুকাইয়া খুব ছোট হইয়াছে। বর্ষাকালে ইহা তরানক হইয়া থাকে। পাগাপারের সুবিধা না থাকায় রাস্তাটি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। চল্লি নদীর উপর একটি বেশ বড় পুল ছিল, কিন্তু নদী এমনই হৃদ্যন্ত যে তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। এখন প্রায় দুই মাইল উপরিভাগে একটি খোলা পুল নির্মিত হইয়াছে। বর্ষাকালে উহার উপর দিয়া মনুষ্যাদি যাতায়াত করে, কিন্তু বোড়া ও অজ্ঞাত বড় জন্তু পার হইতে পারে না। এ সময়ে দুইখানি মোটা কাঠ রাখিয়া প্রায়বাসীরা পুল করিয়া দিয়াছে তাই পারাপারের বৈশিষ্ট্যই আছে। চল্লির উপরিভাগে গিঘিয়া ও গিঘিয়া—শাব্দে গগুকা নামে অভিহিত হইয়াছেন। গগুকাতে স্থান করিলাম। পরিষ্কার শীতল জলে স্নান করিয়া সমস্ত দিনের বস্ত্রাঙ্ক কলেবর বেশ পরিষ্কার হইল, তাহাতে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এখনও অনেকটা দিন ছিল, কাপড়গুলিকে বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইতে দিলাম। কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে আমার নেপালী বন্ধুরা আসিয়া মিলিত হইলেন।

এইবার আমার সম্মুখে দিউরি পাহাড়ের চড়াই। পৌজের উৎসাপ কম হইয়া গিয়াছে, স্নান করিয়া ক্লান্তি দূর হইয়াছে, এইবার তাঁহার তাঁহার আবার চলিতে লাগিলাম। প্রথম যদিও চড়াই খুব বেশী নয়, কিন্তু কিছু দূরে বাইয়া বড়ই কঠিন চড়াই, আবার সেই সকালের মত আকাশ বাকা রাস্তা। কিছু দূর উঠিয়াই আবার

সকাল বেলায় মত অবস্থা হইতে লাগিল। জ্বালোকেরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পুরুষেরাও তটধবচ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু দিউরি এখনও অনেকটা পথ। সন্ধ্যার সময় পার্শ্বতীর দৃষ্ট অতি সুন্দর। স্বর্ষ্য-দেবের লাল ছটা যেন পর্কঃভয় কোলে একটি রান্না ছবি দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। চলিবার আর কয়টা নাই। ঘোড়া ওরাগারা আগেই চলি। গিয়াছে, আজ খালি ঘোড়াটির কোন ব্যবহার করা গেল না। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। স্বর্ষ্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিকে একটি অগ্নি দেখা দিয়াছিল। এটা মাঝাঝি কি ভীষণ! আমাদের দেখিতে দেখিতে একটি জল পুড়িয়া গেল। অনেকটা দূরে, বোধ হইতেছিল, কেহ যেন একটি হালের উপর লাল কালি বুলাইয়া দিল। আমাদের

চলৎপক্তিও বহিঃ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু না চলিলে উপায় নাই সেই কারণে চকিতেছি। ডিঠা রাখাক্ষক বলিয়া পড়িলেন, তাঁহার নাক দিগা ভয়ানক রক্তস্রাব হইতে লাগিল। বিষয় সঙ্কট—একবিন্দু জলও নাই যে তাঁহাকে খোঁড়ান বাইবে। অল্পে অল্প বলিবার পর তিনি একটু সুস্থ হইলেন। ধীরে ধীরে চলিয়া রাজি নরটার পর আমরা দিউরি পৌছলাম। সমস্তল জমীর উপর হই একটি দোকান ও একটি ডাক বাংগালা। এই স্থানেই আজ বিশ্রাম। আজ ১৮ মাইল পথ আসিয়াছি। কখন পাতিয়া যেমন শোয়া তেমন নিদ্রার অভিজ্ঞত হইয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়।

সত্যবান্দা (উপন্যাস)

নবম পরিচ্ছেদ

এস নিনা।

কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী গভীর নিদ্রার পর কিশোরী বখন কিয়ৎ পরিমাণে সচেতন হইল, তখন হঠাৎ সে স্বরণ করিতে পারিল না এখন সে কোথায়, কি অবস্থায় রহিয়াছে। চক্ষু খুলিয়া, প্রদোষের সৌখ্য-শোকে চারিদিকের গুণাগুণ দেখিয়া কতক কথা ভাবার মনে পড়িয়া গেল—“ঠিক। আমি ত সুদূর সিন্ধিমে বৌদ্ধমঠ রহিয়াছি।” তদ্রূপেই ‘আবার ভাবার চক্ষু হঠাৎ মুদ্রা আসিল। আধ তদ্রূপ আধ ভাগরূপের অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, সহসা ব্যক্তির পার্শ্বত্যাগ পক্ষিপক্ষের কল স্বরায়ের সঙ্গে সে সম্পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠিল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল—গুণাগুণের কাটলের ভিতর দিয়া অতি সুস্থ প্রত্যাতালোক

প্রবেশ করিতেছে—ঘরের মেঝেতে দীপাধারের উপর প্রদীপটি নির্ঝল-গার। তখন গুণাগুণের সকল কথা একে একে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমটা ভাবার মনে সন্দেহ জন্মিল, এ সমস্ত বাস্তবিকই কি ঘটয়াছিল? অতঃপর—জগন্নাথ টাকা, মোণার টাকা, সোণা জগন্নাথ বাট, হীরা মোড়—এসব কি বাস্তবিকই আমি দেখিয়াছি? না, স্বপ্ন মাত্র? মনের এই অবস্থায়, ইত্যন্তঃ চক্ষু সঞ্চালন করিতে করিতে গুণাগুণে স্থাপিত, যেত প্রস্তরের সেই ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তর পানে দৃষ্টি পড়িতে ভাবার দ্রব কাটিয়া গেল—সে কৃতনিশ্চয় হইল যে সমস্তই বর্ষাৎ ঘটয়া গিয়াছে—স্বপ্ন নহে। অপর কক্ষ হইতে নিখাস প্রদোষের গভীর শব্দ শুনিতে পাইয়া ভাবার ইচ্ছা মনে পড়িয়া গেল যে, নিনা ঐ কক্ষে একাকিনী শয়ন করিয়া আছে।

কিশোরী তখন মধ্যাহ্নে বসিয়া, ধ্যানীভুত্বে
প্রণাম করিল। অশ্রুটরয়ে বলিল—“উঃ—আচ্ছা
খুশিরেছি বা গোঁক!” বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল
—নিম্ন বিপুল ধনরাশির চিন্তাতেই তাহার মন ছাড়া
গেল। সে ভাবিল—“কত বালিকা ঐ নিনা! আর,
আমার উপরে তার এত বিশ্বাস! তার ঐ ধনভাণ্ডার
কোথায় আছে, সেখানে কি আছে,—তা সে ছাড়া অন্য
কোনও জীবিত প্রাণী পানে না, আমার অসঙ্কোচে
সমস্তই সে দেখিয়ে দিলে। অথচ আমি তার জাত
নই, তার ধর্মের লোক নই, আচার ব্যবহার ভিন্ন
—এমন কি ভাষা পর্যন্ত ভিন্ন। এ সমস্তই সেই
দেবতার কারসাজ, মহাদেব চোখের আশ্রমে থাকে
তত্ত্ব করেও, আমার জীবন দিয়েছিলেন! আমি
কি করি! নিনাকে বিবাহ করে’ এই বিপুল ঐশ্বর্য
আমি পেলে—আমি ত একটা রাজা—একটা মহারাজা!
বংশাবলীক্রমে আমার দারিদ্র্য বুটে যার।
এ যে বিষম প্রলোভন! আমি কি করি?
আমি যে অস্ত্রের! আল কোথায় আমার সেই
সত্যবাণী! এতদিন তারা দারিদ্র্যভোগে আছে কি
কলকাতার ফিরে গেছে কে জানে! এতক্ষণ কি
তার ঘর ভেঙেছে? বোধ হয় ভাঙনি—তারা
সাহেব লোক, একটু বেলাতেই ওঠে। কিন্তু আমার
সতীর ভিতর সাহেবদারের ত লেশ মাত্র নেই।
আমারই আশার—আমারই পথ চেয়ে সে জীবন
ধারণ করে আছে। তাকে বলে এসেছি, বছর
খানেক পরে, এ ঘরের গোলমাগটা কেটে গেলেই,
আমি ফিরে আসবো—তখন আমার মিলন হবে।
কিন্তু বছর খানেক মধ্যে, সে গোলমাগ মিটেবে কি?
সম্ভবতঃ, আমার ধরবার” ভ্রমে, চারিদিকে স্থির
হয়ে গেছে। আমি ফিরে গেলে, যদি পুলিশে ক্যাক
করে আমার ঘরে কেলে? মল্লিক নিজে সাক্ষী দেবে—
স্বচক্ষে সে দেখেছে। তার আর কোনও চাকর থাকর
সে ঘটনা দেখেছিল কিনা তাই বা কে জানে!
ক’স বোধ হয় আমার দেবে না—ইচ্ছা করে ত

আমি করিনি। বাবাজীবন সাপান্ত, কিংবা ঘর
বহি মশ বছর তেলই হয়, তখন কে সত্যবাণীকে
বিরে করবে? তখন মাথার গোলমাগে, ‘এক বছর
পরে ফিরে আসবো’—এ কথা তাকে বলে এসেছি
বটে;—কিন্তু—এক বছর পরে আমার কেবাই কি
নিরাপদ হবে? কি কুক্ষেণে আমাদের দেখা
হয়েছিল! কেন আমরা পরস্পরকে ভাল বেলে-
ছিলাম!”

কিশোরী নিজের চিন্তাতেই ব্যাপ্ত ছিল, অপর
কক্ষে নিনার ঘাস প্রবাসের শব্দ যে আর তেমন
গতীর নাই, তাই লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ তাহার
চিন্তামুগ্ধ ছিন্ন হইয়া গেল, অপর কক্ষে নিনার
কণ্ঠের কড়ত হইল “নাকালামা! নাকালামা! তুমি
কি জাগিয়াছ?”—এই কথাগুলি নিনা তিব্বতীয়
ভাষাতেই বলিয়াছিল; এটুকু বুঝিবার মত ভাষাজ্ঞান
কিশোরীর এখন জন্মিয়াছে—সুতরাং সেও
তিব্বতীয় ভাষার উত্তর করিল, “হাঁ নিনা, আমি
জাগিয়াছি।”

“আমি তোমার ঘরে বাইব কি?”

“এস, নিনা।”

কিশোরীর মনে হইল, নিনার কণ্ঠের কি মিষ্ট!
আর, তার কথা বলিবার ধরণটিও কি সুন্দর। “তোমার
ঘরে বাইব কি?”—এটা যেন আমারই ঘর! আমি যেন
উহার নিকট আশ্রয়প্রার্থী, একজন ভিখারী মাত্র নই।

পরক্ষণেই বাহির দ্বার খোলার শব্দ হইল। সঙ্গে
সঙ্গে একরাশি আলো ও ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া
কিশোরীর শরনগৃহ প্রাণিত করিয়া দিল। বাহিরে
জল-পড়িবার শব্দ হইল, নিনা বোধ হয় হস্তমুখাদি
প্রক্ষালন করিতেছে। তারপর নিনা শরন গৃহের মধ্যে
আসিয়া প্রথমে শুভাগাধর বুদ্ধমূর্তিকে প্রণাম
করিয়া, করবোড়ে কি বসিতে লাগিল। আবার
প্রণাম করিয়া, আচ্ছাদন বস্ত্রটি টানিয়া নামাইয়া
দিয়া, কিশোরীর নিকট আসিয়া সহাত মুখে বিজ্ঞাপনা
করিল, “তুমি কেমন আছ নাকালামা?”

“ভালই আছি, নিনা।”

“ভাল সুখ হইয়াছিল ত? রাতে তুমি কি উঠিয়াছিলে?”

“না, এক ঘুমের রাত কাটার।”

“তবে এখন ওঠ, সুখ হাত ধুইয়া নাও। আমি ততক্ষণ তোমার জন্য চা তৈরি করি।”

কিশোরী বলিল, “তা উঠিতেছি। আচ্ছা নিনা তুমি কেন যোজ যোজ কষ্ট করিবে? কোথায় কি আছে দেখাইয়া দাও না—আমি উনন আগিয়া জল চড়াইয়া দিয়া, সুখ হাত ধুইতে বাই।”

নিনা এ কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, “আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে এখন। আগে তুমি উঠিয়া, সুখ হাত ধোও ত। আমি বা বলি তা শোন।”

তর্ক নিষ্ফল বুঝিয়া কিশোরী গাভোখান করিল। নিনা বলিল, “ঝরণার বাইতেছ? ঐ কলসীটা হাতে করিয়া লইয়া বাইও, উহাতে জল ভরিয়া আনিও। আর জল আর বেশী নাই।”

কিশোরী তোমার কলসী হাতে ঝুলাইয়া, বহির্গত হইল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে কিশোরী করিয়া আসিল। নিনা ইংকপিত হইয়া মঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল; কিশোরীকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—“খুব লাক তুমি বা হোক! এত দেরী!”

কিশোরী জলের খড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল, “দান করিয়া লইলাম। অ-ক দিন দান হয় নাই। এই আদ পড়িয়া ঝরণার জল দেখিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।”

“তা বেশ করিয়াছ—কিন্তু আমি যে এদিকে বিয়া মরি। পাথরে পা পিছলাইয়া পড়িয়াই গেলে; কি হইল। আর একটু দেখিয়া আমি তোমার জিতে বাহির হইতাম। তোমার পকেটে ও কিছু হইয়া রহিয়াছে?”

কিশোরী তাহার আলখাটার পকেট হইতে কয়ট কড়াইজুটি বাহির করিয়া দেখাইল। বলিল,

“ঝরণার পশ্চিম দিকে খানিক দূরিতা দেখিলাম, সেখানে কড়াই লতার বন জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। তাই কতক গুলি তুলিয়া আনিলাম—চারের সঙ্গে খাওয়া বাইবে।”—বলিয়া কিশোরী উভয় পকেট হইতে মুঠা মুঠা অল্পট কড়াইজুটি বাহির করিয়া পাথরের উপর জমা করিতে লাগিল।

নিনা বলিল, “তোমার খুব সুখা পাইয়াছে, নয়?”

কিশোরী হাসিয়া বলিল, “তা স্বীকার করিতেছি।”

“এগুলি আশ্বনে একটু সেকিয় লইব কি?”

“ই সেই বেশ হইবে।”

নিনার উনন জলিতেছিল। কিছুকাল হইতে, হুটি গুলির খোসা ছাড়াইয়া কেলিয়া, স্বত লবণ ও মরীচের শুঁড়া সহযোগে সেগুলি শে সেকিতে দিয়া, চা ঢালিতে বসিল।

চা পান শেষ হইলে নিনা বলিল, “আজ কোনও সময় সাইদা ও ফুরচিং বোড়া কিনিয়া করিয়া আসিবে। তাহার জাগিয়া পৌছিবার পূর্বেই, চল আমরা ধন ভাণ্ডারে গিয়া, সমস্ত গোছগাছ করিয়া রাখিয়া আসি। কাল রাতে তুমি মুছাই গেলে পর, অন্ধকারে হাতড়াইয়া, তোমার পিঠে করিয়া আমি চলিয়া আসিয়াছিলাম। প্রদীপটা সেখানেই পড়িয়া আছে, চাবির গোছাও পড়িয়া আছে, সিঁজুক গুলিও খোলা পড়িয়া আছে বোধ হয়। এস আমরা দ্বার বন্ধ করিয়া, প্রদীপ আলিয়া লইয়া আবার সেখানে বাই, সব ঠিকঠাক করিয়া, চাবির বাক্স বখান্ধানে লুকাইয়া রাখিয়া আসি। আর একটা কথা। আমরা যে তানি-লংপু বাইব, আমাদের বাইবার আসিবার খরচের টাকা কড়ি কি আজই বাহির করিয়া আনিব? ধর, আজ যদি বোড়া আসে, তাহা হইলে কবে বাজা করা তোমার ইচ্ছা?”

কিশোরী বলিল, “বোড়া আসুক ত, সে তখন দেখা বাইবে। এখন চল, কাব বা আছে-তা সারিয়া আসি।”

কিশোরীর সুখে এই কথা শুনিয়া, তানি-লংপু

বাইবার জন্ত আর ডাড়া নাই জানিয়া, নিজের মুখ
খানি হর্ষোৎক্লেশ হইয়া উঠিল। সে অন্তঃকরণে গান
গাহিতে গাহিতে, গৃহকর্ম সারিতে লাগিল। কিয়ৎকণ
পরে, কিশোরীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,
“এইবার তবে আর বন্ধ করি?”

“কর।”

নিজা দ্বারটি ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ
জালিয়া লইয়া, শরল গুহার বিছানা সরাইয়া পাথর
তুলিয়া, কিশোরীর সহিত সেই গহ্বর মধ্যে অবতরণ
করিল। তার প্রণয়াল্পদ, পলাইবার জন্ত এখন আর
ব্যস্ত নয় জানিয়া, নিজের মনটি আজ বেশ প্রকৃত।
সেই সুরঙ্গ পথে চলিতে চলিতেও, ক্রমে ক্রমে
তাঁহার কণ্ঠে গীতোচ্ছ্বাস হইতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ

হাটবার।

দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে নিজা হঠাৎ
বলিল—“বঃ, তুমি ত বেশ।”

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, “কেন? কি
করলাম?”

“আজ কি আর বল দেখি? আজ যে শনিবার—
হাটবার—সে কথা আমার মনে করাইয়া দিতে হয়
না? আজ জিনিষপত্র কিনিয়া না আনিলে, এক
সপ্তাহ আমার খাইব কি? এ কি তোমার দার্জিলিঙ
যে এখন ইচ্ছা বাজারে গিয়া বাহা ইচ্ছা কিনিয়া আনা
যায়।”

কিশোরীর স্মরণ হইল, প্রতি শনিবারেই নিজাকে
সে হাটে বাইতে দেখিয়াছে বটে—এমন কি যেদিন
সন্ধ্যায় সে সদলমলে আসিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ
করে, সেদিনও শনিবার ছিল, নিজা তখন মঠ উপস্থিত
ছিল না, হাটে গিয়াছিল। সে মনে মনে হিসাব
করিয়া দেখিল, আজ তিনটি সপ্তাহ পূর্ণ হইয়াছে—
তিন সপ্তাহ নিজার আতিথ্য ও সেবা ভোগ করা
হইয়াছে। কিশোরী বলিল, “আমার সে কথা মনেই

ছিল না। আজ্ঞা নিনা, আমি তোমার সঙ্গে হাটে
বাইব কি?”

নিজা বলিল, “না, তোমার গিন্না কাঁদে নাই।
সেখানে নানান্নানের নানা লোক আসিয়া জমা
হইবে; তোমাকে দেখিয়া তাহাদের মনে কোনও
প্রকার সন্দেহ হইতে পারে। কাঁহার মনে কি
আছে বলা যায় কি? তুমি ঘরে থাক। আমি আজ
হাটে বেশী দেড়ী করিব না—জিনিষপত্র শুনি
তাড়াতাড়ি কিনিয়া সুটরা দিয়া বহাইয়া আনিব।”

কিশোরী বলিল, “নিজা, একটা কথা তোমার
বলিব মনে করিতেছি, বর্দ রাগ না কর ত বল।”

নিজা কতকটা বিষয়ে, কতকটা শঙ্কার জিজ্ঞাসা
করিল, “কি কথা নালালাম?”

কিশোরী বলিল, “কথা এই যে—এতদিন
হইয়া গেল আমরা এখানে রহিয়াছি, খরচপত্র বাহা
কিছু সমস্তই তুমি করিতেছ—কিন্তু আমারও কাছে
ত টাকা রহিয়াছে; তোমার যদিও অগাধ টাকা—”

নিজা বাধা দিয়া বলিল, “চুপ্।”—তারপর কাছে
গরিয়া আসিয়া, চুপি চুপি বলিল, “এত জোরে
জোরে এই সব কথা কি বলিতে হয়? কোথায়
কে শুনিবে—তখন বিপদে পড়িতে হইবে যে।”

কিশোরী এত কথার একটু অপ্রতিভ হইয়া
গেল দেখিয়া নিজা চুপি চুপি বলিল, “আমার
কথার তুমি মনে কিছু দ্বন্দ্ব করিও না। দেখ,
এই জনমানব-শূন্য স্থানে থাকিতে হয়; টাকার সন্ধান
কেহ জানে না বলিয়াই রক্ষা—জানিলে, এতদিন চোর
ডাকাত আসিয়া আমার মারিয়া কেলিয়া, সমস্তই
লুটয়া লইত। তারপর, তুমি কি বলিতেছিলে, বল।”

কিশোরী বলিল, “আজ যদি তুমি আমার টাকা
লইয়া হাটে বাও, তাহা হইলে আমি সুখী হই।”

“এই কথা? তা বেশ ত—টাকা দাও।”

“ক’টাকা দিব বল।”

“অতদিন আমি ছই টাকা লইয়া হাটে বাই,
আজ পাঁচ টাকা দাও।”

কিশোরী উঠিয়া, ঘরের কোণে রক্ষিত তাহার হাত ব্যাগটি খুলিয়া, পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া আনিয়া নিনার হাতে দিল।

নিনা টাকা গুলি বস্ত্র মধ্যে ঝুঁজিতে ঝুঁজিতে বলিল, “আচ্ছা, তবে তুমি মঠে থাক, আমি হাটে বাই। যদি ঘুমাইতে ইচ্ছা হয়, তবে তিতর হইতে ঘর বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া, তবে শুইও, আমি আনিয়া ডাকিলে ঘর খুলিয়া দিও।”

এই কথা বলিয়া, নিনা গ্রন্থান করিল। ছুপনের মধ্যে এই যে সমস্ত কথা বার্তা হইতেছিল, তাহা নিনার ঘরে বলিয়াই। অপর ঘর খানি, বাহাতে কিশোরী, ফুরটিং ও সাইদা পূর্বে শয়ন ভোজন উপবেশন করিত, সে ঘরখানি গতকল্য হইতেই তালাবদ্ধ।

নিনা চলিয়া গেলে, ঘরের তিতর বসিয়া থাকিতে কিশোরীর ভাল লাগিল না—সে একখানা কবল টানিয়া, মঠের সম্মুখস্থ চত্বরে বিছাইল। ফুরটিং তাহাকে তিস্ততীর তাহার ছই খানি বহি দিয়াছিল—একখানি বর্ণপরিচয়, অপর খানি শিশুপাঠ্য বুদ্ধজীবনী। পথে আসিতে আসিতে বর্ণপরিচয় শিকা তাহার শেষ হইয়াছিল; বুদ্ধজীবনীর কিছু অংশও পড়া হইয়াছিল। কিশোরী সেই বহি ছইখানি ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া, ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া দিল। কবলের উপর বসিয়া, বুদ্ধজীবনীখানি কষ্টে কষ্টে পড়িতে লাগিল—কিন্তু বেশীদূর তাহাতে মন বসিল না। বহি বন্ধ করিয়া, দূরস্থিত পর্বত চূড়া গুলির প্রতি চাহিয়া, সে নানা চিন্তার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

এখন চিন্তা, নিম্ন অদৃষ্টের কথা। “হিলাম কোথায় কলিকাতাবাসী স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন বাঙালী যুবক—আর, হইলাম এই সূদূর সিকিম প্রান্তে ছদ্মবেশধারী লামা! লামা,—অথচ না জানি তিস্ততীর ভাবা—না জানি বৌদ্ধ ধর্মপ্রাঙ্গের কথা!”—

ভারপর হেদের কথা, সত্যবালার কথা, মল্লিকের কথা মনে হইল। সত্যবালার কথা মনে হওয়াতে

কিশোরীর চক্ষে জল আসিল। সে মনে মনে বলিল—“মতী! তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্যই আমি তোমার জীবন পথে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতেই তোমার কত কষ্ট, কত অপমান, কত লাজনা ভোগ করিতে হইয়াছে। যদি উভয়ের আকাঙ্ক্ষিত মিলন সংঘটিত হইত, তবে সে সকল দুঃখকষ্টের ক্ষতিপূরণ হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও হইল না। ভবিষ্যতে যে কখনও হইবে, তাহারই বা আশা কোথায়? কে আমাকে এখানে আসিয়া নিশ্চিত রূপে বলিবে যে সে সমস্ত গোলমাল এখন চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে—এখন তুমি নির্ভয়ে বেশে কিরিয়া বাইতে পার। সুতরাং বেশে ফেরা, ইহজীবনে বোধ হয় আর হইল না। তবে, অনেক বৎসর পরে, ছদ্মবেশে ছদ্মনামে যদি বাই—তাহাতেই বা সুখ কোথায়? সুখ আর আমার অদৃষ্টে নাই।”

বসিয়া বসিয়াও ভাল লাগে না। কিশোরী উঠিয়া, এ দিক ওদিক একটু বেড়াইতে লাগিল। গিরি পৃষ্ঠের প্রান্তভাগে গিয়া সহসা কিশোরী দেখিতে পাইল, নিম্নে—অনেক নিম্নে তিনজন ভূটিয়া দক্ষিণপূর্ব দিকের উপত্যকা ভূমি হইতে উঠিয়া আসিতেছে—প্রত্যেকের পৃষ্ঠে একটা করিয়া শাদা প্যাংকিং বাল্ল, অপরদ্বয়ের স্ত্রীকিরণে বকুমক করিতেছে। সে নিরবধি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিল। ক্রমে দেখিতে পাইল, আরও আর ৭১৮ জন কুলি, পৃষ্ঠে রোখা ও হস্তে পাহাড়ী লাঠি লইয়া উঠিয়া আসিতেছে। আরও নিম্নে, কয়েকটা তারবাহী অখতর—তাংর আরও নিম্নে, শাদা ছাট মাথার কয়েকজন অখারোহী। সকলে নিরতুমি হইতে উঠিয়া আসিতেছে—সম্ভবত এই পথ ধরিয়াই তাহারা তাহাদের অতীপ্ত স্থানে গমন করিবে।

কিশোরী সবিস্ময়ে তাবিত্তে লাগিল—“কারা ইহারা? ইহারা কি ইংরাজ পুলিশ বিভাগের লোক, আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে? পাইলে, গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়া কাঁদি দিবে?” কিন্তু

এ আশঙ্কা অধিকক্ষণ কিশোরীর মনে স্থান পাইল না। সে তাবিল “তারি ত আমি একটা লোক। আমাকে ধরিবার জন্য ইংরাজ গবর্নমেন্ট এত কাণ্ড করিবে?”

কিশোরী তাহার কবলের উপর কিরিয়া আসিয়া, তিব্বতীয় বহি খুলিয়া বলিল—কিন্তু পড়ার মন দিতে পারিল না। আবার পূর্বস্থানে গিয়া, নিম্নে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহারা উঠিয়া আসিতেছে বটে—কিন্তু এখনও ত অনেক দূর। পার্শ্বত্যা পথারোহণে কত সময় লাগে তাহার ধারণা কিশোরীর অন্তরাছিল—সে অনুমান করিল, উহার এখানে আসিয়া পৌছিতে এখনও অন্ততঃ দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। “কে উহার? কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিতেছে? উহার কি কোনও যুরোপীয় আবিষ্কারক অথবা ভ্রমণকারীর দল? যুরোপীয় গণ মাঝে মাঝে এইরূপে আসে বটে। অনেক লোকজন তাহা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, দুর্গম স্থান গুলিতে গমন করিয়া, ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া থাকে। কিন্তু আমার ধরিবার জন্য উহার যে পুলিশ-বাহিনী নহে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? মল্লিক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী—আমার পরম শত্রু। সে চীক্সেজেক্টারি বা লাট সাহেবকে বলিয়া কহিয়া, আমার ধরিবার জন্য পুলিশের একটা সার্জ প্যাট্রি পাঠায় নাই একথা কে বলিল? আমার নিকট যদি একটা দূরবীণ থাকিত, দেখিতাম উহার। কে। উহারের নিকট দূরবীণ নিশ্চয় আছে; এই যে আমি এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, হয়ত উহার দূরবীণ কবির। আমার দেখিতেছে। যদি উহার ইংরাজ পুলিশের দলই হয়, আমার খুঁজিবার জন্যই বাহির হইয়া থাকে, তবে ত এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি নিতান্ত বোকামির কার্য্য করিতেছি।”

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কিশোরী পুনরায় স্থানে কিরিয়া আসিল। এদিকে বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের প্রান্তে মেঘ জমিয়া উঠিতে লাগিল।

নিনা বলিয়া গিয়াছে, আজ তাহার কিরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না—তবে এখনও সে আসিয়া পৌছিল না কেন? সে কিরিবার পূর্বেই যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবেই ত বিপদ! ঘরের দার বন্ধ করিয়া, কাংগাচেনের পথে খানিক দূর গিয়া দেখিলে হয় না, সে আসিতেছে কি না?—কিশোরী স্থির করিল, একাকী বসিয়া ছটকট করায় চেয়ে, সেই ভাল হইবে।

সে তখন কবল ও বহি ঘরের মধ্যে রাখিয়া, দ্বারে তাণা বন্ধ করিয়া পথে বাহির হইল। একবার গেই উপত্যকা পানে চাহিয়া দেখিল;—সকলে একত্র হইয়াছে—তীব্র পড়িতেছে। কিশোরী তাবিল, বোধ হয় বেলা নাই দেখিয়া এবং আকাশে মেঘ দেখিয়াই, উহার এখানেই আজ রাজিবাস করিতেছে। বাক্—আজ আর উহার আসিবে না এটা স্থির।

কিশোরী পথ চলিতেছে, আর আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। মেঘাভ্রমর ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু অধিক দূর কিশোরীকে বাইতে হইল না। কাংগাচেন গ্রাম দৃষ্টিপথে পড়িবার পূর্বেই কিশোরী দেখিল, একটি যুবতী নিম্ন পাহাড় হইতে উঠিয়া আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে একজন তারবাহী। নিনাকে দেখিতে পাইয়া কিশোরী দাঁড়াইল; নিনাও তাহাকে দেখিয়া হত সঙ্কেতে অত্যাশ্চর্য্য করিল।

নিকটে পৌছিয়া নিনা জিজ্ঞাসা করিল, “একি নালালামা, তুমি কোথায় বাইতেছিলে?”

“তোমার খুঁজিতে।”

“কেন, আমি কি হারাইয়া বাইব?”

“আকাশের পানে চাহিয়া দেখ নিনা—মেঘের ষটা দেখিয়া আমার ভয় হইল, যদি বৃষ্টি বৃষ্টি নামে তবে পথে তোমার কি হইবে? তাই আমি আর থাকিতে পারিলাম না—তোমার খুঁজিতে বাহির হইয়াছি।”

নিনা বাক্যে কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মুখে একটা সুখের একটা আনন্দের ভাতি দেখিয়া গেল। সে কিশোরীর হাতুখানি নিজ হাতে ধরিয়া

বলিল, “কেমন জন্ম করিয়াছি তোমার? সকাল বেলা ঘেরী করিয়া তুমি আমার ভাবিয়াছিলে; এবেলা আমি তোমার ভাবাইলাম।”—মুটিয়া কিছুদূর পশ্চাতে ছিল; এত কথাই কিছুই তাহার কর্ণগোচর হইল না।

হাতে হাত দিতেই কিশোরী দেখিতে পাইয়াছিল, নিনার উত্তর একোষ্ঠে এক গাছি করিয়া নীলবর্ণ বেলোয়ারি চুড়ি রহিয়াছে—তাহার উত্তর দিকে ছই গাছি করিয়া পুঁতির মালা। কিশোরী বলিল, “এগুলি তুমি কোথায় পাইলে নিনা?”

নিনা একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, “একজন আমার দিয়াছে।”

“কে? তোমার কোনও সখী—না সখা?—এ অকালে তোমার কোনও সখা সখী আছে তাহা তো আমার বল নাই।”

নিনা বলিল, “আমার একজন সখা আছে সেই দিয়াছে।”

কিশোরীর মুখখানি গভীর হইল। সে, ধরা গলার বলিল, “তোমার সে সখাটি কে? নাম শুনিতে পাই না?”

“শুনিবে এখন—মঠে চল।”—বলিয়া নিনা অগ্রসর হইল। পার্শ্বত্যা পথে ছইজন পাশাপাশি চলা সম্ভব নহে;—কিশোরী গভীর মুখে নিনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু তাহার পা বেন চলিতেছিল না—তাই সে একটু পিছাইয়া গড়িল। কিয়দূর পশ্চাতে সেই তারবাহী আসিতেছে।

মঠের নিকটবর্তী হইতেই, ছই চারি কোঁটা বল নিনার গায়ে পড়িল। সে পশ্চাৎ কিরিয়া, কিশোরীকে বলিল, “বুড়ি আনিল—শীঘ্র এস।”—বলিয়া দাঁড়াইয়া, কিশোরীর গভীর মুখের পানে চাহিয়া, চাপা হাসি হাসিতে লাগিল।

মঠে পৌছিয়া, তারবাহীকে বিদায় দিয়া, দ্বিবিষ পত্রগুলি শুছাইতে শুছাইতে নিনা বলিল, “ঠেক, আমার সে সখার কথা আর তুমি জিজ্ঞাসা করিলে না?”

কিশোরী বলিল, “আমার অবশ্য শুনিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহার বরস কত?”

“এই—তোমার বরসৌই হইবে।”

“কতদিন তার সঙ্গে তোমার—বন্ধুত্ব?”

“বেশী দিন না।”

“আচ্ছা নিনা—”

“কি?”

“না থাক—আমি ভাবিয়া দেখিলাম সে কথা তোমার জিজ্ঞাসা করিবার আমার কোনও অধিকার নাই। তবে অল্প একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি। তোমার সে সখা, কৈ, এখানে কোনও দিন আসে না ত?”

নিনা বলিল, “আসে ত। তুমি তাকে দেখিতে চাও?”

“বেশ, আমি থাকিতে থাকিতে যদি কোনও দিন সে আসে, তাহাকে দেখাইও।”

“এখনি তোমার দেখাইতে পারি”—বলিয়া নিনা তাহার বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি নুতন টিনের আর্গি বাহির করিয়া, কিশোরীর মুখের সামনে ধরিয়া, “ইহার ভিতর দেখ” বলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

কিশোরী সবিস্ময়ে নিনার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিনা বলিল, “তুমি যে আমার পাঁচটি টাকা দিয়াছিলে, তাহাতে আমি এই চুড়ি, পুঁতির মালা, এই আদি, আর একখানি চিক্কণী কিনিয়া আনিয়াছি। তোমার টাকা দিয়া কিনিয়াছি, স্মরণ্য এ সকল, তোমারই ত দেওয়া হইল।” বলিয়া বস্ত্র মধ্যে হইতে মহিব শূনের এক খানি মোটা চিক্কণীও বাহির করিয়া দেখাইল।

এতক্ষণে কিশোরীর মুখ হইতে যেখ কাটিয়া গিয়া, সেখানে হাসির কিরণ খেলিতে লাগিল। সে বলিল “দেখ নিনা, এতদিন মাঝে মাঝে আমার মনে হইয়াছে বটে যে, তুমি জীলোক,—অথচ না আছে তোমার কোনও অস্বাভাবিক সখা, না কোনও প্রসাধনের স্পৃহা।”

নিলা বলিল, “সত্যই ত, ও সব সব কোনও দিনই ত আমার ছিল না।”

“তবে, এখন হঠাৎ?”

“কে জানে! ওগো শীত বাও, তরলিক বড় আসিতেছে—দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া এস।”

কিশোরী ছুটিয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। শুধু

বড় মর—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়াছিল—জলের ঝাপটার কিশোরীর বস্ত্রও কিয়দংশ তিলিয়া গেল।

নিলা তাড়াতাড়ি প্রদীপ জালিয়া ফেলিয়া বলিল, “কুর’চং সাইন’ আজ আর আসিল না দেখিতেছি।”

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

একুশ-সমালোচনা

পোলাও

কবিতা এক। জীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী প্রণীত
মূল্য—১/-

সীতার তিন প্রকার আহারের কথা বলা হইয়াছে—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তাহার মধ্যে “পোলাও” কোন শ্রেণীর আহার? শান্তিপুত্রের অদ্বৈত প্রভুর বংশাবতংস জীবন্ত বেনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় যে “পোলাও” রাধিয়া সংপ্রতি বজীর পাঠক পাঠিকা দিগকে পরিবেষণ করিয়াছেন আমি সেই পোলাওয়ের কথা বলিতেছি।

গোস্বামী মহাশয়ের পোলাও নিশ্চয়ই সাত্বিক আহার নহে। সাত্বিক আহার “স্বথপ্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ—যেমন বিজ্ঞপ (humour)। রাজসিক আহার কাঁজাল (ভীক্ ক্লক্ বিদাহিনঃ)—যেমন শ্লেষ (satire); আর তামসিক আহার গচা পুত্তিগন্ধমর (পুত্তিপৰ্য্যুযিতং)—যেমন কুৎসা (slander)। গোস্বামী মহাশয় তাহার নাচুনি ছন্দে ইলবজ মিশ্রিত ভাবার বৈঠকী খোসগন্ধের অস্বচ্ছ প্রণালীতে সৰ্বশ্রেণীর স্ববিমহারবিগণকে লক্ষ্য করিয়া, সমান সাহিত্য ও রাজনীতির প্রসঙ্গ লইয়া যে সকল চোখা চোখা পরনিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই তাহাদের স্বথ-প্রীতি বিবর্দ্ধন করিবে না। কেহ কেহ হয়ত মজলিসি তজ্জতা রক্ষার জন্য কবির সঙ্গে সঙ্গে কিকিৎ দাঁত বাহির করিয়া হাসিবেন, “কিন্তু অন্তরে অন্তরে নিশ্চয়ই খোঁচার জালা অনুভব করিবেন। তবে সাধারণ পাঠক পাঠিকার নিকট পোলাও যে খুব উপায়ে হইয়াছে তাহা বলাই নিম্নোক্ত। দোষের মধ্যে কতকগুলি আন্ত পৌরুষ মাথা খাড়া করিয়া বিজাতীয় গন্ধ বিস্তার করিতেছে—আমি ইংরাজী বুকনির কথা বলিতেছি। সেগুলি হজম করা অনেকের পক্ষে কঠিন

হইবে। গোস্বামী মহাশয় বদেশীর প্রচারক হইয়া কেন এই ইংরাজি ভাবার মোহ কাটাতে পারেন নাই একথা আমরা বুঝিতে পারি না। বাহা হউক এই দোষ সত্ত্বেও তাঁহার পোলাও অনেকেরই মুখ-রোচক হইবে। আজকালকার দিনে সাত্বিক হবিষ্যার করতলে পছন্দ করে? আর সেই শুদ্ধ সাত্বিক বিজ্ঞপ সৃষ্টির ক্ষমতাও বোধ হয় অক্ষরশ্রেণে বিজ্ঞপ্তালোর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গনাশিত্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। অবশ্য ইচ্ছনাথ ছিলেন সৰ্ব্বপ্রকার শ্লেষ বিজ্ঞপের রাজা। স্বর্গীর কাব্যবিশারদ বাহা ছাপাইয়া জেলে গিয়াছিলেন এবং সংপ্রতি-পরলোকগত পাঁচকড়ি দাদা তাঁহার নারকের পৃষ্ঠে যে গুলির সৃষ্টি করিতেন তাহা ঐ তৃতীর শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ তামসিক; এই জন্য আরও দাবার নামে মানহানির মোকদ্দমা হইত।

এই ক্ষুদ্র ভূমিকা করিয়া এখন গোস্বামী মহাশয়ের তাঁখা পোলায়ের কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিব। তিনি এগার হাঁড়ী পোলাও রাধিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে দুই একটা চাকিয়া দেখিলেই সকলে তাহার স্বাদ বুঝিতে পারিবেন।

সারা বঙ্গদেশ সম্প্রতি ভোটের ব্যাপার লইয়া ব্যতি-বাস্ত এবং রাজনৈতিক নেতার জন্যে সমস্ত ছিল। এই সকল নেতাদের সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার একটা হাঁড়ী, হাটে এইরূপ ভাঙ্গিয়াছেন—

আগছে বেশে মণ্টেও দান এবার হইব ধন্য;

ক্ষমতা এবার করিয়া জাহির,

ধরণীতে হত গণ্য।

লুটিয়া ভোট, হইয়া সত্য, ধরিব গগন টাখা;

সিংহ চর্মে সাজি বাহিরিব কেহ ভাবিবে না গুণা।

Sinha সাহেব Baron হলেন, Earl হ’বেন বোস্।

সর্কে জাতি উঠবে কেঁপে, হাসবে মতি ঘোষ।

বধ করিয়া শত পঁঠা কাঁপ কাঁচ ঘোব,
এই সমাজের নেতা এখন Attorneyদের বোস।
হারিদ বরের পাখাল টাকা উড়ে চলে যায়,
বোসের বরের গল্প টাকা করে হার হার।।

সুতোবাচ—

গুন বৎস একবার কর অবধান,
কি কি শুনে নেতা হয় করিব বাধান।
বার্ষিক হবে বটে,—বার্ষিকতার
সুকারে রাখিবে বঙ্গে মনের গুহার।
পরদৃষ্টিে অশ্রদ্ধ করিবে বর্ষণ,
করিবে না কতু অর্থ পরে বিতরণ।
প্রথম শ্রেণীর তও যদি হতে পার,
উত্তরিবে Politics ভীম পারাবার।
ভাবা-মধ্যে সাহসতা থাক বা না থাক,
Choice word গুলির বসাইবে থাক।
ম্যাটিনির ইতিবৃত্ত আগের ভাবার,
হাত নেড়ে মুখ নেড়ে বলিবে সভার।
বক্তৃতার সভা বেন উঠে বিকল্পিয়ে,
পরের ছেলেয়ে দিবে বিপদে ঠালিয়ে।
সুত কর্মে তরে চাঁদা করিতে চর,
আজ্ঞাতরে “সিংহ অংশ” করিবে গ্রহণ,
দৈনিকে আপন কীর্তি করিবে বাহির
তাবক রাখিবে গুণ করিতে জাতির।

আজ দেশে যে Nation গঠনের ধুম পড়িয়া গিয়াছে
সে সবকিছু গোঁসাইজী বলেন—

Ladyর জুতা কিনে এনে পরাও ললনার;
(আর) গলার দিগে tieটা বাছ পুরাতন বাগনার।
যুঁই শেকালি উপর বেলা উঠিয়ে ফেলে দিগে
বাগান কর মনের মত ম্যাগনোলিয়া নিগে।

ঘোঁসটা ঘোঁচাও সিঁড়র মুখাও
বাধীন তাবে প্রেম কর;
Nation যদি হতে চাও
কিরিদি এ নাম ধর।

পে পড়ে সমাজটা যে হয়ে পড়ছে চাপটা;
এখন) মাথার মাঝে ভাজতে হচ্ছে ছাটটা কিংবা ক্যাপটা।
সাহিত্যক্ষেত্রেও এই বিলাতী বিব বাধীন প্রেমের
যে কি প্রকারে কামানলে ইচ্ছন বোঁগাইতেছে
বণ ককন,—

এরা) চাঁদ-চুমান রূপ বাধান চুম-প্রাণা বাগার,
রিকা করিয়ে কামেরই অনলে বজ্রস্নিগে আলার।

বলোয়ার সেই গোলাপ বজ্জ, চুমার রেখাটা টেনে,
উচ্চ হইতে স্তম্ভ মস্ত্রে পাতালেতে বান নেমে।
শৃঙ্খলার তার, সংবনের ভোর ছিঁড়িছে প্রেমের উচ্ছ্বাসে,
অবাধেতে প্রেম লোকে রূপরাশি তীত্র মনেরই উল্লাসে।
প্রেম কেন বলি, শুধু ব্যক্তিগত জাতীয়তা পেল ঘুরে,
সমাজের ছিল শাসাল কল্লে ক্রমশ পড়ছে ঘুরে।
রোগটারে ভাই পার যদি তবে আঁতুড়েই কর কাৎ,
একটুখানি বাড়লে পরেই করে বসবে বাজিমাৎ।
কিন্তু বাহারি এই রোগকে “শাত্তিক বরে”ই মারিতে
চান, কবি তাঁহাদিগকেও ছই কথা শুনাইয়া দিতে
ছাড়েন নাই, বধ—

সাহিত্যের বাহ্যিকতা করিবার তরে
ঐ প্রবাসীর নেতা ধীরোদাত্ত রায়
করিছেন ধীরভাবে গভীর ক্রোশন;
ওর শিষ্ট হ’তে চাও করি না নিবেশ
So-called morals নিয়ে ককক বসতি,
সাহিত্য যা ইহাদের কোলে টেনে লবে।

ইহাদের কাহাদের? না

শরতের কিক রাণী, রবির বিনোদা
জগতের কাব্য বনে যুগল মন্দার।
উত্তরের তুলি যেন কোন মন্ত্র বলে
বিধাতার বর্ণনা করিয়া পরশ,
আঁকিয়াছে তই জনে যুগল রতন।

কবি আবার একথাও বলেন,

“গ্রাম যদি ভেঙ্গে যায় ভেঙ্গে থাক গ্রাম,
নায়েগরা জলেৎগব তথাপি স্মরণ।”

ইহার গন্ত অমুবাদ হইতেছে Art for art’s sake—
আর্টের জন্যই আর্ট সেবনীয়, সমাজ তাহাতে থাক
বা থাক কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বলাগুহল্য
গোঁসাইজী এখানে আর্টের উপাসক কবির দ্বারাই কথা
বলিতেছেন,—কিছুকাল পূর্বে যিনি সমাজ সংস্কারক
রূপে দেখা দিয়াছিলেন, তিনি এখন গা ঢাকা দিয়াছেন।
কিন্তু অস্ত্রজ আবার তিনি সংস্কারক রূপে উদিত
হইয়া কি বলিতেছেন শুনুন,

যে সভ্যতা যুগেকর-বোবনের ডেকে
চুপি চুপি বলে দেয় বিলাসের কথা,
পরোক্ষার মধু লুটে, দরিত্রের ভাল
লিখে দিগে cuckold, নন্দগণা মনে
হরবের প্রেমোচ্ছ্বাস করে বিচরন;
যে সভ্যতা প্রাণমাকে ভোগসুখা স্মৃতি
পর বেদনার শক্তি লয়েছে কাড়িয়া।

যে সভ্যতা প্রমোদার প্রকল্প কপোলে
 শিখরেছে নিশিদিন, হারয়ে কপাল,
 আঁকিতে মরন চিত্র রমণী তুলিতে ।
 রমণীক সংবনের নির্বিড় বন্ধন
 বৈদেশিক সভ্যতার তীক্ষ্ণ ছুরিকার
 ছিন্ন করি করিয়াছে রমণী রতনে,—
 করিয়াছে দেবতার ক্ষুদ্র প্রতিমার,—
 করিয়াছে সাবিত্রীর অমূল্যবর্তিনীর,—
 ভিখারিণী, কানালিনী, নরক পিশাচী ।

এখানে দেখিতেছি কবির আর্টের বোহ কাটিয়াছে,
 তিনি আবার সমাজের বাহ্যরক্ষা করিবার জন্ত ব্যাকুল ।
 কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থে কবির সমাজপ্রীতি অপেক্ষা
 বৈদেশপ্রীতিই অধিকতর উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে ।
 তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্য বৈদেশগত প্রাণ নৃপেন্দ্র-
 নাথ পুস্তকের ত্বন্দ্রিকার চিহ্নিরাছেন, গোলাও পড়িতে
 পড়িতে তাঁহার (নৃপেন্দ্রবাবুর) অশ্রু মণিত চক্ষুর
 সম্মুখে বাধীন ভারতের বাগ্‌দেবী রক্তপদ্মে পাণ্ডুর
 উপর চপে স্থাপন করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন ।
 কবি এই স্বাধীনতা যন্ত্রের বর্তমান পুরোহিত মহাত্মা
 গান্ধীর কিরণ বীরোদ্ভাত বরে জতিগান করিয়াছেন
 দেখুন,

“প্রাক্যম্যের প্রতিমূর্ত্তি গান্ধী মহারাজ
 ভালবাসা দিবে বিশ্ব করিবেন স্নাত ।
 চেরে দেখে চেরে দেখে আকাশের পানে
 অখ্যাত শক্তি আজ পত্তবিক্রমেরে
 করিতেছে পরিমান মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,
 প্রতিবিৎসনা, দানবের অব্যর্থ আত্মা,—
 ভালবাসা দেবতার অমৃত নিছনি ।

জ্যেষ্ঠের জয়ন্তে তীর্থস্নানলে
 ভালবাসা চলে দিবে শুদ্ধের নির্জর
 করিবেন শান্তিরাজ্য জগতে স্থাপিত ।
 জড়বাদ জড়তার তাদি কারাগার
 চিন্ময়ের প্রেমে প্রাণ করিবেন শীতল ।

গোবিন্দী মহাশয় বাগাণার ছোট বড় সাহিত্যিক-
 দিগকে লইয়া ছই চারি লাটনে যে রক্তরস করিয়াছেন
 তাহা “গোলাও” পাঠ করিয়া উপভোগ করার
 ক্রিয়ার—এখানে অল্প বস্তু উদ্ধৃত করিয়া তাহার রসভঙ্গ
 করিব না ।

গোবিন্দী মহাশয় কৌতুক রহস্তে আপনাকে আবৃত
 করিবার চেষ্টা করিলে কি হয়, স্থানে স্থানে সেই
 কঠোর প্রভুর শোণিত-প্রসূত বৈক্য ভাব অতি
 পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে বলা,—

আমিই ছিলাম মনে পড়ে স্বাধীন প্রেমের প্রচারক
 ফিরে এলাম তরুচিত্তে বধন হলোম অপারগ ।
 চক্ষুচী twin রূপ রাধারে বাধতে চার,
 সৃষ্টি করি বৃন্দাবন হৃদয়ে বসি হিন্দোলার ।
 ভেলে দাঁও এই জগৎ মাঝারে স্থখ দুঃখের বন্দ,
 আমারে করহ গোলোকবিহারী, তোমার গীতির হৃদ ।
 নিরাকার ভাবে চাহিনা তোমার, দিয়া সুরতি ধরি
 শূন্য জগৎ পূর্ণ করিয়া দাঁও হে ত্রয়ের হরি ।
 আমি হীন আমি হইব বধন, বুচে বাবে অহমিকা,
 আমি-হীন আমি প্রকৃতি সুরতি তুলে ধর বনিকা ।
 ভগবান এই সরলপ্রাণ অহমিকা-শূন্য প্রবীণ বৈক্য
 কবির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ।

সাহিত্য-সমাচার

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

আগামী ৬ই ও ৭ই বৈশাখ (১৩৩১) ১৯ এ ও ২০ এ
 এপ্রিল শনি ও রবিবার খানাকুল কলকাতার সমাজের
 আস্থানে বঙ্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের
 জন্মস্থান জগন্নাথ জেলায় অন্তর্গত রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য
 সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হইবে । শ্রীযুক্ত ধরনী-
 মোহন রায় কবিবার মহোদয় পৃষ্ঠপোষক ; মাননীয়
 শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ বিএল মহাশয় অধ্যক্ষনা
 সমিতির সভাপতি ; কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন

গুপ্ত এম্ এ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ,
 কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন । সাধারণ সভাপতি—
 মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই,
 ই, এম্ এ, এক আর এম্ ; সাহিত্য শাখার সভাপতি
 রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ইতিহাস শাখার
 সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ্র বি-এ ; বর্ণনশাখার
 সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ ;
 বিজ্ঞান শাখার সভাপতি—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল
 চৌধুরী ডি, এস্ সি, বিএ ।

এবং লেখকগণ গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া ২৮শে চৈত্রের মধ্যে তাঁহাদের প্রবন্ধ ও তাহার চূড়ক অত্যাধিক সমিতির সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঞ্চন্দ্র এম্ এ, মহাশয়ের নিকট ৭৪১ হরিষোষ দ্বীপে টিকানায় পাঠাইয়া বাহিত করিবেন। টাকাকড়ি বিনি বাহা পাঠাইবেন অত্যাধিক সমিতির সম্পাদকের নিকট কলিকাতার ৭৪১ নং হরিষোষের দ্বীপে অথবা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয়ের নিকট ১৪২ নং বলরাম ঘোষ দ্বীপে পাঠাইবেন।

গ্রাহিকার পত্র

এতজন গ্রাহিকার নিকট হইতে আমরা যে পত্র খানি পাইয়াছি তাহা নিয়ে অবিকল মুদ্রিত করিলাম। ইনি গত বৎসর "মানসী" ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এ বৎসর আবার গ্রহণ করিয়াছেন।
ওগো মানসী!

অনেক দিন তোমার কোন খোঁজ খবর রাখি নি। দীর্ঘ এক বৎসর কাল তোমার দেখা না পেয়ে যে আমি কি ভাবে কাটিয়েছি—তা আমিই জানি। মানসী, তুমি যে আমার অতি আদরের অতি আত্মার সান্নিধ্য;—তুমি আমার মেয়ে হ'স না কেন—তবু যে তোমার আমি চিরদিন ভালবাসি। তুমি কলিকাতা মহানগরীতে জন্মেছিস্ কলিকাতা পাঠিত হচ্ছিস্—তবু আমরা সুদূর পল্লীবাসী, বাংলার নিঃপল্লীবাসী—চাই তোকে—তুমি আমার মেরেকে—তোমার রাজধানীর বুক থেকে টেনে এনে—তোমার তোমার বিশাল অট্টালিকার মাক থেকে খেঁচু করে এনে—আমাদের—আমাদের এই নিঃপল্লীবাসীর চির-সঙ্গিনী কর্তে। মানসী! ফকলা, চপলা, অটল, বোড়লী, রূপসী মানসী—তোমার মুখ ভরা হাসি, বুক ভরা ভালবাসা যে তোকে মোটেই ভুলতে দেয় না—তাই তবু করে এসেই আবার তে রূপের নিতে বাস হই!

মানসী! অনেক ছোট থেকে তোকে চোদ বছরেণী পর্যন্ত দেখেছিলাম—তারপর তোমার পনের'র বছরটা কি ভাবে কাটিয়া গেলো! কি ভাবে গেলো না! বাক্,

মানসী, তুমি জীবিত না যে তোকে একবারেই ভুলে গিয়েছিলেম্ সত্যি। মানসী! এই একট বছর তোমার অবশ্বনে বড়ই বাতনার কাটিয়েছি। আমি সেদিন 'কর্তা'র নিকট তোমার পাড়ী ডাডায় টাকা চারিটি পাঠিয়ে দিয়েছি। কর্তাকেও লিখে দিয়েছি, যেন তিনি টাকা পাওয়া মাত্রই তোকে লক্ষ্য পাঠিয়ে দেন। তোমার অবশ্বনে বাস্তবিকই বড় ব্যাভুল হ'য়ে পড়েছি। মানসী! কেবলি ভাবছি ভাই—একে ত তুমি আমার মেয়ে—তাতে রূপসী—তার উপর আবার বোড়লী হলি! না জানি এখন তুমি কেমনটী হয়েছিস্!

মানসী! এক বছর ভুলে ছিলাম বলে যেন রাগ করে—অজ্ঞান করে বলে থাকিস্ নে—শীগ'গির চলে আসিস্। অনেক বাজে বকুলাম মনে কিছু করিস্ নে।

ইতি—:হারই—"লীলা"

(গ্রাহিকা নং ৬২৯৮)

আমাদের কথা

আমাদের ছাপাখানা, পূর্ব টিকানা হইতে, ১৬১৪ বিদ্যন দ্বীপে স্থানান্তরিত হওয়াতে তুমি সপ্তাহের অধিক কাল ছাপাখানার কার্যবন্দ বন্ধ ছিল। এই কারণে, এ সংখ্যা প্রকাশিত হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছে, ওজ্জ্বল আমাদের গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বৈশাখ সংখ্যার শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন উপভাষা "নগবালা" আরম্ভ হইবে। তাহা ছাড়া, শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষদাসী, শ্রীযুক্ত কবির-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির গদ্য শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন সিংহ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রভৃতির প্রবন্ধাদি থাকিবে। "দারার হরহুট", "প্রতি-বৃত্তি" প্রভৃতিও মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত স্বর্গদত্ত রক্ষোপাধ্যায়-বি-এল এম্ এ নূতন উপভাষা "স্বর্গদত্ত" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২/-

কলিকাতা

১৬:১এ বিদ্যন দ্বীপে হইতে শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



অন্ধ-ভিগারী

মানসী ও মন্মথবাণী

১৬শ বর্ষ }
: অশ্বিন }

বৈশাখ, ১৩৩১

{ ১ম অঙ্ক:
{ ২য় সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র

বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের স্থান নির্দিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে। জীবনে যে প্রশংসা ও সন্মান যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়াছিল, মৃত্যুর পরও সেই তরঙ্গ অনেক দিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। কালক্রমে ব্যক্তিগত বিষয়, বারবোঝ-সংস্কট রক্তালয় সম্পর্কবশতঃ সম্প্রদায় বিশেষের ঘৃণা প্রভৃতি এখন আর প্রবল নহে। সাহিত্যের আদর্শ দিয়াই এখন গিরিশচন্দ্রের বিচার হইবে। তাঁহার অভুলনীর নটজীবন, এখন আর সাধারণের উপভোগের বিষয় নহে, রক্তালয়ের ইতিহাসে তাহা স্থান পাইবে। কিন্তু তাঁহার নাট্যকাব্যী আভিও বহুলাংশে সাহিত্যানুগমনের আভি ও শিক্ষার উপাদান হইয়া রহিয়াছে, বঙ্গসাহিত্য বর্তমান বর্তমান থাকিবে ততদিন তাহাদের প্রভাব এই তাহেই থাকিবে।

প্রথমই আলোচনা করা যাক, গিরিশচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য কি? যে সকল বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের নাটক অত্যন্ত সমস্ত বাঙ্গলা নাটক হইতে পৃথক, তাহার মধ্যে

প্রথমটি এই। গিরিশচন্দ্রের প্রধান নাটকগুলি ধর্ম-প্রবণ, হিন্দুধর্মের অতি উচ্চ তত্ত্বগুলি অতীব সুকৌশলে এই নাটকগুলির মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই কারণে গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি শুধু যে ধর্ম-জ্ঞাপন সাধারণ পাঠকের নিকট আদরবীর তাহা নহে, সংসারত্যাগী সাধুগণও এগুলি সাগ্রহে আলোচনা করিতেন। * 'বিশ্ববন্ধন' পাঠে বিবেকানন্দ বলিয়া-ছিলেন, "আমি একরূপ উচ্চতাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।"

* "We noticed in him. (i.e. Swami Atmananda) a special fascination for the religious dramas of Girish Babu (the well known dramatist of Bengal), He would have regular classes on 'Kalapahar', 'Purna-elandra' and other dramas... Even here at Benares, I observed that one or two boys used to go to him to read from those books and get in that connection many a salutary counsel from him."—The late Srimat Swami Atmananda—Prabuddha Bharat, November 1923.

গিরিশচন্দ্রের রচনার এ ধর্মতাব আশিবার হেতু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাব। পরমহংসদেবের প্রভাব আসিয়া পড়িবার পূর্বে গিরিশচন্দ্রের ধর্মবিষয়ে মানসিক অবস্থার কথা, তাঁহার কথ্যেই বর্ণিত হইতেছে :—

“আমাদের পঠদণ্ডার বাঁহারা ‘ইয়ং বেঙ্গল’ নামে অভিহিত হইতেন তাঁহারা ই সমাজে মাত্র গণ্য ও বিদ্যান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাঙলার ইংরাজী শিক্ষার তাঁহারা ই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে জনেকেই জড়বাদী, জড় সংখ্যক ক্রিষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও বলা যায়। সমাজে বাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ। শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে এবং বৈষ্ণব সমাজ এমন নানা প্রেীতে বিভক্ত যে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অজ্ঞাত মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক-ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক বাক্য-ব্রাহ্মণ জটিলার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া প্রাক্ক করান, যেটে দেওয়ানে পাইখানার ঘটি হইতে জল দিয়া গঙ্গাসুতিকার কোঁটা ধারণ করেন। তাহার উপর ইংরাজীও দু’পাতা পড়িয়াছি, কালাপাহাড় অগরাথ তালিয়াছে প্রভৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি বিতর্ক সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। জৈবর না মানা বিতার পরিচয়। এ অবস্থার ধর্মধর্মের প্রতি আস্থা কিছু মাত্র রহিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে জৈবর লইয়া সরবরহ বন্ধুর সহিত তর্ক বিতর্কও চলে। আদি-সমাজেও কখনও কখনও বাঙরা আসা করি। একটি ব্রাহ্মণমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে বাই। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। জৈবর আছেন কি না সম্ভেহ। যদি থাকেন, কোন্ ধর্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না। ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম ‘ভগবান, যদি থাকো, আমার পথ-

নির্দেশ করিয়া দাও।’ ইহার কিছু দিন পরেই দান্তিকতা আসিল। ভাবিলাম, জল, বায়ু, আলো—ইহা জীবনের বাঁহা প্রয়োজন তাহা অর্জন করিয়াছে; তবে ধর্ম, বাঁহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা। জড়বাদীরা বিদ্যান, বিজ্ঞ, তাঁহারা যে কথা বলেন, সেই কথাই ঠিক। ভাবিলাম, ধর্মের আন্দোলন যুগ। এইরূপ তমসাক্ষর হইয়া চতুর্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল।”

[‘ভগবান ঐশ্বরামকৃষ্ণ দেব’—জন্মভূমি, ১৭শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৬]

গিরিশচন্দ্রের নিজ মনের এই অবস্থা তাঁহার ‘কালাপাহাড়’ নাটকে নারক কালাপাহাড়ের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। কালাপাহাড় বলিতেছে :—

“অতীব কুটিল—

মন মম—সংসার আগার, হর্ষিবার
সন্দেহ তাড়নে মতিভ্রমে। কহ সত্য,
করহ প্রমাণ—শাক্ত বাক্য অস্বলক
নহে, বাহে নিরঞ্জন পাই দরশন।.....

অশ্রুতল চকল প্রবল

সন্দেহ-প্রবাহ-পাকে; নিবিড় আঁধার
আবরিল জলাগার, হাহাকার নিশি-
বিবা; সত্য তত্ত্ব কিবা কহ মহাশয়!...
সত্য কি জৈবর? কেহ কতু কেরে তাঁরে?”

[১ম অঙ্ক, ১ম গর্তক]

আবার—

“শাক্ত ছটা বাধ্যা ঘটা, বাক্যের বিভাস
হঠাশে ছতাশে করে মানবে নিকেশ।
ক্ষুদ্র নর, শমনের গুর নিরন্তর
হবে জাগে, আকুল এ অকুল পাখারে
সন্দেহ-সাগরে হলে দ্রবত হিমালয়ে।
এই আশ, তখনি নিরাশ, মহাজাগে
ভাগে জীবকুল। রে মনের ধার বহে
অনিবার, কে রাখিবে দারুণ সবটে?”

কোথা কোথা দয়াল জেবর ! জীবের কৃপা
কই ত'র ? অকুল এ দুঃস্বপ্ন পাখার !"

[১ম অ, ১ম প]

"বিষমকল ঠাকুরে" গিরিশচন্দ্র এই ভাবের কথাই
লোমগিরির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—

"এ সংসার সন্দেহ-আগার

বিভূ নহে ইন্দ্র-গোচর

জেবর লইয়া

তর্ক বৃক্তি করে অমুখান।

বত করে হির

সন্দেহ-ভিষি ততই আচ্ছন্ন করে।

ঈশলুঙ্গ প্রাণ ব্যাকুলিত জানিবে সন্ধান

কি উপারে পুরাইবে মন-মাণ ?"

[৩য় অ, ৩১ প]

এই চিন্তা ক্রমশঃ অনন্ত হইয়া উঠে—

"কোথার স্থানের সীমা ? কতই বিস্তার

দশ দিশি ! কালের অনন্ত কোথা ? কোথা

কালের গমন হির ? নিবিড় ভিমির !

নিবিড় ভিমির ! কঙ্করাস বুধা ধানে

হতাশ চিন্তার ! দেহ কিবা, মৃত্যু কিবা,

কিবা এ সংসার ! কার অধিকার এই

বিপুল ব্যাগার ! দিনকর, শশধর,

তারকামণ্ডল নিত্য অগ্নে নতশূলে,

কিবা অভিপ্রায়, ধার অধিরাম গতি ?

অনন্ত অশান্ত কালপ্রোত ! এই নাপ,

বিকাশ আবার ! অন্ধকার, অন্ধকার !

এ রহস্য গোচর কাহার ? কোথা কেবা

কে কবে আমারে ? সত্য কিবা মিথ্যা নানি

"করিতে নির্ণয়। প্রান্ত, প্রান্ত শাস্ত্রাকার,

অভিপ্রায়-হীন এ সংসার ; অকস্মৎ—

অট্টাহীন—সংযোগ বিরোধ বিশ্বকালে

অনিশ্চিত অনিশ্চিত ! বুদ্ধি পরামর

নির্ণয় না হয়—কে আহ কোথার ?"

[কালাপাহাড়—১ম অ, ৩য় প]

অড়বাদীদের বৃক্তি তর্কও তখন আলোচনার বিষয়
হইয়া পড়ে :—

"আমি" সত্য—'আমি' কিবা না হয় নির্ণয়।

এ কি পঞ্চভৌতিক সংযোগ ? চূর্ণ বধা

সলিল-সংযোগে করে উত্তাপ উত্ত্ব,

জ্বত-সন্নিগনে এ কি চৈতন্ত-বিকাশ ?

অড় হ'তে চৈতন্ত উদয়, অড়ে ছিল

চৈতন্ত নিহিত, অড় বৃক্ষে তবে কেন

না কলে চেনন ? জীবন্তি হেরি মাত্র

জীবের সংযোগে। কিবা অড় ? চৈতন্ত বা

কিবা ? কিবা বস্তু ? কিবা তাগরণ ? চক্ষু

কর্ণ আমি ইন্দ্রিয় সকল কিবা ? দেখি

বাহ্য। কেন সত্য মানি ? ইন্দ্রিয়ে প্রত্যয়

কি কারণে ? চক্ষু কর্ণে, জ্ঞানে, আবাদনে,

স্পর্শে শ্রম হেরি পদে পদে। তবে কিসে

ইন্দ্রিয়ে বিবাণ ? পঞ্চেন্দ্রিয় তোলে, পাঁচে

মিলি শ্রমে নাহি বলে, কোন্ বৃক্তিবলে

সত্য মানি ইন্দ্রিয়-বচন ? কিসে করি

সত্য-নিরূপণ ? কোথা সত্য, এস হৃদি-

মবে ! এস, এস দেখা দাত অতাগার।"

[কালাপাহাড়—১ম অ, ৩য় প]

"শঙ্করাচার্য্য" নাটকেও সন্দেহ এই ভাবের কথা
শঙ্করাচার্য্যকে বলিতেছেন :—

"বুদ্ধিশক্তিহীন এই মীন-দাস তব

সন্দেহ-বাটকা করে আলোড়িত হৃদি।

শাস্ত্রতর্ক হৈল তব ব্যাসদেব সনে,

তাঁহে মম অগ্ন্যছে ধারণা,

মীমাংসা সম্ভব নহে তর্কবলে কভু।

শাস্ত্রজ্ঞান লাভ তবে কিবা প্রয়োজন ?

প্রত্যেক দর্শন শাস্ত্র স্বয়ং বিরচিত,
কিন্তু দর্শন বিরোধী পরস্পর;
এ বিরোধে আকুল অহরহঃসম।
যদিও চর্যাপ্রিত সত্যান তোমাং,
তথাপি সন্দেহ মনে হয় নিরন্তর
ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন কিরূপে হ'বে সম?
প্রত্যেক কিরূপে হ'বে সত্যের সূচীত ?

[৩য় অ, ৪র্থ গ]

‘শঙ্করাচার্য’ গিরিশচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা।
গিরিশচন্দ্র পূর্বে রচিত আত্মোপাস্ত নাটক জুড়িতে
বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন মত আছে বলিয়া যে সংশয়ের
উল্লেখ করিয়াছেন, ‘শঙ্করাচার্য’ তাহার সম্বন্ধেই চেষ্টা
পাইয়াছেন। কতটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা
এখানে সে সম্বন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বাহ্যিক
বলেন, “যখন ‘নাসৌ সুনির্ভর মতং ন তিস্ম’ এই শাস্ত্রের
অবস্থা, তখন শাস্ত্রচর্চা বা দর্শন আলোচনা নিষ্ফল ও
নিশ্চরোজন”, তাঁহার গিরিশচন্দ্রের এই সম্বন্ধ-পাঠে
বুঝিবেন, শাস্ত্র বা দর্শন আলোচনা নিশ্চরোজনীয়
নহে। শঙ্করাচার্য সনন্দনের উপরি-উদ্ধৃত বাক্যের
উত্তরে বলিতেছেন :—

“বৎস, হিরণ্যিভে করই শ্রবণ,
‘তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য-নিরূপণে’—

তর্কে তাহা হয় নিরূপিত ;

তর্ক বুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন।

তখন বৎস,

যে কারণে হইয়াছে দর্শন রচনা।

মানব-কল্যাণ হেতু মহা শ্রমগণ

যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,

করেছেন উপযোগী দর্শন-রচনা।

বেদমর্ম্ম বর্জিত কুতর্ক রত ওন

নিরাশ কারণ, দর্শনের প্রয়োজন।

নির্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়,

সত্যযুক্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন।”

[৩য় অ, ৪র্থ গ]

বিজ্ঞান ভিন্ন বাহ্যিক কিছুই মানেন না, তাঁহাদের
চরিত্র গিরিশচন্দ্র ‘চৈতন্যলীলা’র নিবেদন যুগে
নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

“কতদূর গিয়ে দেখি বসে একজন

চিন্তায় মগন,

তাকিয়ে কিয়, যিগু করি জয়,

ভাবে মনে মানবের হিত।

চিন্তা নিরন্তর, কিসে জুখী হবে নয় ?

কিন্তু হায়, চিন্ত তার ঘোর অন্ধকার।

ভাবে বিজ্ঞান কেবল মানবের বল ;

একমন করিছে কৌশল ;

তড়িৎ-কিছরী সদা আজ্ঞাকারী

দেশে দেশে বার্তা বহে তার ;

লগ্নে বাস্পধান তুচ্ছ করে স্থান,

সাগর-স্থল দলিত করিয়া যায়।

বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, নাহি অন্ধ জ্ঞান,

ভাবে নয় ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ;

লিখে দস্ততরে

ঈশজ্ঞান অনর্থের হেতু—

মহাতরে ক্রত আইহু পগারে।”

[১ম অ, ২য় গ]

এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁহার ‘প্রাণ না সত্য?’
শীর্ষক প্রবন্ধে (উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ১লা অগ্রহায়ণ
১৩১০ সাল) আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে
আছে—“ঈশ্বর-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত দেহের প্রয়োজন,
ঈশ্বর-জ্ঞান হইলে দেহের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু
মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রথম ইঞ্জিরের দ্বারা আমাদের
বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। আবার দেখা যায়, সেই ইঞ্জিরেই
প্রলোভিত করিয়া মনকে ঈশ্বর পথ হইতে অন্তর করে।
ইঞ্জির-প্রলোভনে মন অথ আশে ব্যাকুল হয়, অন্তিত্য
বস্তুতে আসক্তি জন্মে। উচ্চাশ্রয় ব্যক্তির সাধারণের
ভার ইঞ্জির-প্রলোভনে জুখী না হোন, নানাবিধ তত্ত্ব
অহঙ্গদান করেন। কিন্তু যতই তত্ত্ব অহঙ্গদান করুন,

বয়স দ্বারা ইঞ্জির বিস্তারণ পূর্বক বতই অল্প সময়ের জ্ঞানলাভ করুন, মানসিক চিকিৎসা দ্বারা বতই মনোবিজ্ঞানের উন্নতি করুন, স্থির চিত্তাধীশ্বরিতে পারেন, যে জ্ঞান তাঁহার অধিগত, তাহা আপেক্ষিক জ্ঞান। নিশ্চিত জ্ঞান তাঁহার আদৌ অগ্ৰে নাই।

“স্ববোধ তাবুক তখন বুঝিতে পারেন ‘দ্ব্যমকো যো জানা নৈব, সো জানা হ্যাহু কেয়া য়ে?’ সারতৎ লাভের বতই চেষ্টা করুন, পুনঃ পুনঃ অগার আপেক্ষিক জ্ঞানে বিভ্রান্ত হন। কিছুই নিশ্চিত হয় না, অথচ শোনেন ঈশ্বর আছেন, পুনর্জন্ম আছে, দেহের মৃত্যুতে জীবের মৃত্যু হয় না। শোনেন মাত্র, স্থিরনিষ্ঠর করিতে অক্ষম হন। তিনি তখন বোঝেন যে, অপর কোন দৃষ্টি ব্যতীত, অপর কোন ইঞ্জির প্রস্ফুটিত না হইলে নিরপেক্ষ জ্ঞানলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি বিজ্ঞাতিমান পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হন, ব্যাকুল হন কোথায় কি উপায়ে সেই নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। কেহ বা নিরাশ হইয়া, বৃথা চেষ্টা বিবেচনার নিরন্তর থাকেন।

“কিন্তু যে পুরুষের সেই জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, যজ্ঞায় আকুল হন, নানা প্রকারে উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা পান। শাস্ত্র পাঠে ডুবিরা-ছেন, প্রার্থনা করিতে হয়। চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছেন, টেক, সে নিরপেক্ষ জ্ঞান ত অধিগত না। কি করিব? কোথায় বাব? কে পথ বলিয়া দিবে? নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া দেখেন, এ একথা বলে; সে সে কথা বলে। শাস্ত্রপাঠে যে গুণগোল দেখিয়াছিলেন, সে গুণগোল আর ঘোচে না। কি শোনেন? মায়ুষ নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করে। বিস্তার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাইরাছেন। লোকের মুখেও শোনেন। কখনো বলেন মিথ্যা, কখনো সন্দেহ অড়িত হইয়া বলেন, টেক দেখিলাম না তো। তবে, যাক, আর ও কথার কাজ নাই। কিন্তু, সম্মুখে মৃত্যু। তবে, হায়, চোক বাঁধা বলদের মত ঘুরিলাম, কিছুই জানি না। কোথায় কে আমার উপায় বলিয়া

দিবে? প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা ও’ তিনি করিয়াছেন।”

এ অবস্থা সাধারণের প্রায়ই ঘটয়া থাকে। কেহ সংশয় হইতে কোন নির্ণয়ের উপায় না পাইয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া বাবজীবন আপাত মনোরম সাংসারিক ভোগ সুখে রত হইয়া সাংসারিক জনমুলত সুখ চুখে দিন অতি-বাহিত করিয়া থাকেন। কেহ বা ভাগ্য বশে সঙ্গুৎকর কুপা লাভে ঈশ-জ্ঞানের অধিকারী হন। নিশ্চেষ্ট হইয়া বলিয়া থাকিবারই বা উপায় কৈ? অতি ঘোর নাস্তি-কেরও বিপদ কালে এমন একটা অবলম্বন দরকার হইয়া পড়ে বা সংসারে পাওয়া যায় না। এইরূপ বিপদে পড়িলে আর নিশ্চিত হইয়া থাকা চলে না। গিরিশচন্দ্র চতুর্দশবর্ষ ধর্ম জীবনে নিশ্চেষ্ট ভাবে বাপন করিয়া এই প্রকার সাংসারিক মহা বিপদে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার দাস্তকতা আর রহিল না।

আগে তিনি বলিতেন ঈশ্বর নাই। ঈশ্বরের প্রমাণ করিতে বলিলে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার উদাহরণ লোকে দেয়, কিন্তু হিউম বলিয়াছেন :—

“It is more probable that men should lie, than miracles should be true.”

গিরিশচন্দ্র বিশ্বটিকা গ্রস্ত হইলেন। রোগ শয্যায় অস্থতব করিলেন, তাঁহার পরলোকগতা জননী আসিয়া মুখে মহাপ্রসাদ দিলেন। চেতনাবস্থা লাভ করিলেও জিজ্ঞাস্য সেই প্রলাদের আশ্বাদন গিরিশচন্দ্র অস্থতব কারণে। তখন হিউমের কথার আর সেরূপ আস্থা রহিল না। নীরোগ শরীরে বিভা বুদ্ধির অহঙ্কারে তাহাকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, রোগে; বিপদে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইল। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “বন্ধু-বান্ধব-হীন, চারিদিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শত্রু সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে; এবং আমারই কার্য্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। উপায়ন্তর না দেখিয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর কি আছেন? তাহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রার্থনা করিলাম যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক, এ অকূলে কুল দাও। গীতার ভগবান বলিয়াছেন, কেহ

কেহ আর্জ হইয়া আমার ডাকে, তাহাকেও আমি আশ্রয় দিই। যেখানকার গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বেরূপ দূর হয়, অচিরে আশা-সূর্য্য উদয় হইয়া জ্বরাকার দূর করিল, বিপদ-সাগর কুল পাইলাম।” [অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত “গিরিশচন্দ্র,” ১৮৬ পৃষ্ঠা]

এই অবস্থাই অতীত গিরিশচন্দ্র এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

“পরে হুর্দ্দিন আলিরা ঠিক নিশ্চিত থাকিতে দিল না। হুর্দ্দিনের তাড়নার চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া তাবিতে লাগিলাম, বিপদ হুর্দ্দিত হইবার কোনও উপায় আছে কি? দেখিরাছি, অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। আমারও ত কঠিন বিপদ, একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য। এ সময়ে তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই চেষ্টাই সকল হইল, বিপদালা অচিরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় ধারণা অক্ষয়, দেবতা-মিথ্যা নয়।

“বিপদ হইতে ত মুক্ত হইলাম কিন্তু আমার পর-কালের উপায় কি? আমার মনোমধ্যে ঘোর ঘৃণ। কোন্ পথ অবলম্বন করি? তারকনাথের মহিমা দেখিরাছি, তারকনাথকেই ডাকি। ক্রমে দেব দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বলে যে গুরু ব্যতীত উপায় নাই। তাবিলাম, কেন উপায় নাই? এই ত জৈবের নাম রহিয়াছে, জৈবকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? কিন্তু সকলেই বলে, গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করিব? তনিতে পাই, গুরুকে জৈব জ্ঞান করিতে হয়; কিন্তু আমার জ্ঞান মনুষ্যকে জৈব জ্ঞান কিরূপে করি? মন অতি অশান্তি পূর্ণ হইল। মনুষ্যকে গুরু করিতে পারি না।

‘গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুয়েব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।’

এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সাধারণ মানুষকে দেখিয়া তত্ত্বানি কিরূপে করিব? জৈবের নিকট একপট দ্বয়ের প্রয়োজন। গুরু সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাহাকে পাইব? বাক, আমার গুরু হইবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করিয়া গুরু হোন। শুনিরাছিলাম, নরবেশ ধরিয়া কখনো কখনো মহাদেব যত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার একরূপ কৃপা হয়, তবেই। নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু তারকনাথের ত কৈ দেখা পাই না, তবে আর কি করিব? প্রাতে একবার জৈবের নাম করিব তাঁর পর যা হয় হইবে।.....

“যে কারণে মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা একরূপ বলিয়া ছা। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, আমার মনের প্রবল দম্ব থাকায় আমি গুরু করতে চাহি নাই। তাবিতাম, এত কেন? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, গুরুর নিকট যে ডাহাত করিয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে, তিনি যখন বাহা বলিবেন, তাহা যোগাইবে, এ একটা আপদ ঘোটান মাত্র।”

(“ভগবান শ্রীজীৱানককদেব”।)

গুরু সম্বন্ধে এই ধারণা গিরিশচন্দ্র কালাপাধ্যায়ের সুখ দিয়াও বলাইয়াছেন—

“কেবা গুরু? কোথা তাঁর স্থান? মম সম মানবে প্রত্যয় হার কেমনে করিব?
কেমনে জানিব বাক্য মিথ্যা নহে তাঁর?
[১ম অ, ১ম প]

“বাহে বিশ্বব্যাপী কহে, নর-
কলেবরে বিরাজিত মানিব কেমনে?
গুরু গুরু, কেবা গুরু, কোথায়, কোথায়?
কি প্রত্যয় কথায় তাঁহার?
মম সম সূত্র নর, আবদ্ধ এ দেহের গিঞ্জরে,
জন্ম-মৃত্যু মাঝে, হৃৎপন্থে দোলে কর
দিন, কীণ তরু পলে পলে ভীষনের

ভাপ হবে লীন, ভবে চিকমাক নাহি
রবে আর, সীমান্ত বিস্তার বিস্তার
বিশ্ব সংসার, লক্ষ্যশূন্য পন্থাহারা
কাহারে বিশ্বাস। চিন্তা, চিন্তা, ওহা
করু হয় খাঁস, বোর জাগ বিনাশ সমুখে।”

[১ম অ, ৩য় গ]

যে দান্তিকতার গিরিশচন্দ্রে গুরু মানিত চান নাই,
তাহা মাৎসর্য্য-সৃষ্ট। চৈতন্তলীলার মাৎসর্য্য বলি-
তেছে—

“একা আমি করি সমুদর
অভিহীন শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনার ;
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ পরাজয়
বুদ্ধিবলে অনায়াসে হয়,
সেই বুদ্ধি কিছর আমার ;
বুদ্ধি ভায়ে বলে,
ভ্রমভুলে ধার্মিক স্মরণ সেই।
গুরু কেবা ? কিবা উপদেশ দিবে ?”

[১ম অ, ১ম গ]

ধর্ম্মজীবনে এইরূপ মানসিক অবস্থার সময় রামকৃষ্ণ
পরমহংসদেবের সহিত গিরিশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। এক-
দিন বাগবাজার বহুপাড়ার নীনাথ বহুর বাড়ীতে পরম-
হংসদেব আগমন করেন। গিরিশচন্দ্র এই পাড়ার বাস
করিতেন। তিনি পরমহংসদেবের আগমনবার্তা শুনিয়া
কৌতুহল বশতঃ দেখিতে গেলেন। ইহার পূর্বে গিরিশ-
চন্দ্র ইণ্ডিয়ান মিরর নামক সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলেন যে,
দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন এবং কেশবচন্দ্র
সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণ তথায় বাতায়ত করিয়া থাকেন।
ইহা পাঠে গিরিশচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে হিন্দুশাস্ত্রে
বাহ্যকে পরমহংস বলে, ইনি সেক্ষণ পরমহংস নছেন।
বাহ্য হউক, নীনাথ বহুর বাড়ীতে গিয়া গিরিশচন্দ্র দেখি-
লেন যে, পরমহংসদেব উপদেশ দিতেছেন ও কেশবচন্দ্র
সেন প্রভৃতি উপস্থিত সকলে তাহা শুনিতেছেন। সন্ধ্যা

হওয়ার একজন আলোক আলিয়া আনিয়া পরমহংস
দেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংসদেব পুনঃ পুনঃ
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন “সন্ধ্যা হইয়াছে ?” ইহাতে
গিরিশচন্দ্রের মনে হইল “সন্ধ্যা হইয়াছে, সমুখে আলোক
জলিতেছে, অথচ ইনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে
সন্ধ্যা হইয়াছে কি না ? এ আর কি দেখিব ?” এই
তাবিরা পরমহংসদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া তিনি বাড়ী
চলিয়া গেলেন।

এই প্রথম দর্শনের কয়েক বৎসর পরে একদিন
৬বলরাম বহু গিরিশচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেন। পরমহংস
দেব রামকান্ত বহু দ্বীটে ৬বলরাম বহুর বাড়ীতে আসি-
বেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্যই এই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।
গিরিশচন্দ্র গিয়া দেখিলেন, পরমহংসদেব অতি দীনভাবে
ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া বার বার নমস্কার করিতেছেন।
একজন কীর্তন গায়িকা কীর্তন গাহিবার জন্য উপস্থিত
ছিল। গিরিশচন্দ্রের এক বহু তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া
পরমহংসদেবের প্রতি বাদ্য করিল। “এই সময় অমৃত
বাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ কোর
করিয়া গিরিশচন্দ্রকে নিজে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসি-
লেন।

এই দর্শনের পর, হোর থিয়েটার বখন বীড়ন দ্বীটে
ছিল এবং গিরিশচন্দ্রের রচিত চৈতন্তলীলা বখন সেই
থিয়েটারে অভিনীত হইতোছিল, তখন একদিন পরমহংস-
দেব ঐ থিয়েটার দেখিতে যান। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে
অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলে পরমহংসদেব অগ্রেই
গিরিশচন্দ্রকে নমস্কার করিলেন। গিরিশচন্দ্র তখন
নমস্কার করিলে, পরমহংসদেব আবার গিরিশচন্দ্রকে
নমস্কার করিলেন। গিরিশচন্দ্র আবার নমস্কার করিলে
পরমহংসদেব আবার নমস্কার করিলেন। তখন গিরিশচন্দ্র
মনে মনে পরমহংসদেবকে নমস্কার করিয়া, তাঁহাকে
থিয়েটারে বসাইয়া, নিজের শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বাড়ী
চলিয়া যান।

এই নমস্কারের ঘটনার গিরিশচন্দ্রের মনে ব্যাঘাৎ
হইল যে পরমহংসদেব নিরবস্থার। গুরুর নিকট শিষ্য

সর্বদা বোড়হাত করিয়া থাকিবে কেন, এইরূপ যে দৃষ্ট তাঁহার যে ছিল, তাহা পরমহংসদেবের ব্যবহারে আর রহিল না। ইহার পর একদিন গিরিশচন্দ্র নিজ বাড়ীর রন্ধে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন যে পরমহংসদেব হাইতেছেন। গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবের দিকে চাহিবামাত্র পরমহংসদেব তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে প্রতিদম্ভার করিলেন। পরমহংসদেব চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে একজন আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলিল যে পরমহংসদেব তাঁহাকে ডাকিতেছেন। গিরিশচন্দ্র বলরাম বসুর বাড়ীতে পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে পূর্ব হইতেই গুরু-বিষয়ক যে প্রশ্ন আসিতেছিল, তাহা তিনি এইবার প্রকাশ্যেই পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, “গুরু কি?” পরমহংসদেব বলিলেন, “গুরু কি জান, যেমন দুই—জুটিয়ে দেয়।” এই বলিয়া বলিলেন, “তোমার গুরু হয়ে গেছে।” এই কথা গিরিশচন্দ্রের মনের অস্থিরতা দূর হইল। তাবিলেন “আর কি? আমার গুরু ত হয়ে গেছে।” *

* ‘কালাপাহাড়’ নাটকে গিরিশচন্দ্র এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—

কালাপাহাড়। মহাশয় গুরু কেনন তিনি?

চিন্তামণি। ঘটক যে ঘটক, জুটিয়ে দেয়।

[১ম অঙ্ক, ৩য় গর্তাঙ্ক]

“তগবান শ্রীশ্রীমহাকৃষ্ণদেব” এবং গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

গিরিশচন্দ্রের প্রথম বিশ্বাস ছিল, জলবায়ুর ভার ধর্ম মানবের প্রয়োজনীয় হইলে ঈশ্বর অবশ্যই তাহা সহন-লভ্য করিয়া দিতেন। পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ লাভে তাঁহার বিশ্বাস হইল, সত্যই ধর্ম অতি সহনলভ্য—নহিলে থিয়েটারে পরম হংসদেব তাঁহাকে দর্শন দিবেন কেন?

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় বিশ্বাস ছিল, আমারই মত মানুষকে গুরু করিয়া তাঁহার পদলুপ্তিত হইব কেন? পরমহংসদেবের নিরতিমানতার ও দীন ব্যবহারে তাঁহার সে দাম্ভিকতা চূর্ণ হইয়া গেল। পরমহংসদেবের এই ব্যবহার গিরিশচন্দ্র “শ্রীশ্রীমহাকৃষ্ণ” নামক কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন—

“নিঠৈরুখ্যা আসিয়াছ মাধুর্য্য লইয়ে

প্রেমে অঁধি করে,

মানব, মানব-মাঝে পরশিতে হিরে

অমিশ্রিত মাধুর্য্য অথরে;

পাছে নর নাহি আপে ডরে,

দীনবেশে ডাক সকাঁতরে;

হরিবারে মন-প্রাণ কর নাথ আশ্রয়ান,

সংসার ভূলাও কর্তব্যরে,

নয়ন মাধুরী হেরি অভিমান হয়ে।”

শ্রীশচন্দ্র ঘোষাল।

“আনি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি। তিনি এই অর্থে অত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন।”

তীর্থযাত্রীর পত্র

[পূর্বানুস্মৃতি]

৬ই জুন ১৯২৩—বর্ষশালার অধ্যক্ষ এবং অস্ত্রাভ্যাসীদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, অপরাহ্ন ছই-ঘটিকার সময় দিল্লী উদ্দেশে বাজা করিলাম। এই অসহ পরমে কেহই পদতলে ঠেপনে আসিতে সম্মত

হইলেন না—শরীরকে অকারণ কষ্ট দিলে তগবান অসন্তুষ্ট হইবেন সকলেই এই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি-পত্র ঠেলা গাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া আমরা মোটরে হাঁড়ার ঠেশনে আসিলাম।

এই ক্ষেত্রে আমরা কবিবলেন গাভীকে হস্তিয়ার
টেনন হইতেই ছাড়ে। গাভী টেননেই ছিল, আমরা
কখনো গাভীতে উঠিয়া হস্তিয়ার প্রতীকার রহিত।

যদি আর নয় ঘটকরি সবার গাভী সাহায্যপূর
পৌছিল। এখানে আউন ও রেইলসও
রেলওয়ে ত্যাগ করিয়া আনানিককে মর্ব তরোঁপ
রেলওয়ের গাভীতে উঠিতে হইবে। আমরা গাভী
হইতে অবতরণ করিলাম। দিল্লীগামী গাভী এই
টেনন হইতেই ছাড়ে কিন্তু গাভী তখনও প্রাটকরবে
আইসে নাই; কুলী বলিল প্রাটকরবে অবস্থান
করা যাইবে না, আনানিককে সুসাক্ষরখানার বাইতে
হইবে এবং গাভী হস্তিয়ার অন্ন পূর্বে এখানে আসিতে
হইবে।

রাজিকালে মাল-পত্র ও দ্রৌলোকবিগকে লইয়া
পুলের উপর দিয়া একবার বাতরা, আরার আসা এ
অস্থিবিধা হইতে বহি অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহার
উপায় করিবার জন্য টিকেট কালেক্টরের সঙ্গে আলোচ
করিলাম এবং তাহার অস্থিবিধা গ্রহণ করিয়া প্রাটকরবেই
রহিলাম।

অস্থিবিধা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রাটকরবে
রহিলাম বটে, কিন্তু বিপদ এক "হুল্লু" হুল্ল অবলম্বন
করিয়া আনানের নিকট উপস্থিত হইল। খাত জব্য
জর করিবার জন্য প্রাটকরবের অপর দিকে বাইবার
সবর বীশে প্রাটকরবের নীচে ড্রুপে পড়িয়া গেল।
হানটা অশেফাকৃত অন্ধকার। একজন রেলওয়ে
খালসীর নিকট হইতেই একটা গঠন আনিয়া বীশেফকে
লক্ষ্য হইতে তুলিলাম। ভগবানের আশীর্বাদে আঘাত
ভুক্ত হইল। বীশেফকে প্রাটকরবে রাখিয়া নিজেই
"বিকর কর্তার চেটার" বাহির হইলাম।

যদি সবার দিল্লীগামী গাভী ডাকিয়া দিল। সব পথ
রাজিতে অতিক্রম করার পথের এই বিকর দৃশ্য কিছুই
যেখিত পাই নাই। টেননের মধ্যে বীজাট হাউনী
টেননে গাভী অনেকজন ছিল। বর্তমান বীজাটই নাকি
একজন হস্তিয়ার—হস্তিয়ারের সাহায্য।

এই স্থান—এইতে বাতরার গাভী দিল্লী পৌছিল।
দিল্লী সূর্যককে (আনার ভাসিনের) টেননে জেনিতে
পাইব আনা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বহিঃস্থ
হইল না। টেননে হইতেই জেনিতে পারিলাম
করিয়া আনিতে পারিলাম রানবন কলেক্টর এখানে হইতে
আর ৩ মাইল দূর—পাহাড়ের উপরে। হই খানা
টোকা ভাঙা করিয়া কলেক্টর অতিদ্রুতে রাজ্য করিলাম
কলেক্টর পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলে
কলেক্টর অপর একজন অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ
হইল। তাহার নিকট আনিতে পারিলাম ভাসিনের
বাবাণী আনানিককে আনিবার জন্য টেননে গিয়াছেন।

অধ্যাপক বাবুর সঙ্গে তাহার পাচক সাক্ষাৎ ছিল
এবং তাহার নিকটেই আনানের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের
চাবী ছিল। সে কুলী ডাকিয়া বালগজ বাগার আনিলাম।
আমরা বাগার আসিবার অন্ন পরে সূর্যক ও বাগার
আনিলাম। আনানের গাভী নির্দিষ্ট সূর্যক না আসিতে
নির্দিষ্ট প্রাটকরবে আনানী অবতরণ করি নাই সেই জন্য
দিল্লীর সঙ্গে টেননে আনানের সাক্ষাৎ হয় নাই।

যে পাহাড়ের উপর কলেক্টর স্থাপিত সে পাহাড়টি
তুণ-ওয়াহি বর্জিত। সকালে ১০টা হইতে অপর ১০টা
পর্যন্ত ঘরের বাহির হওয়া অসম্ভব—ঘরের মধ্যে থাকা
অতীব কষ্টকর। হানটা কিন্তু খুব বাস্তবিক—একজন
কার দিল্লীর ভীষণ প্রেণের উপস্থিতি এই পাহাড়ে প্রেণ
সংক্রান্ত হয় নাই। পাহাড়ের উপর সর্গাশেকা
অস্থিবিধা, ভূত্যাভাব এক অসামান্য।

কলেক্টর ও কলেক্টর সংলগ্ন অধ্যাপক ও ছাত্র-আনানে
সাধারণতঃ গাঢ়াণালীয়াই ভূতের কাব করিয়া থাকে।
দ্রৌলুকালে গাঢ়াণালীয়া পথ সব করিতে পারে না,
যেখানে চলিয়া যায়। তখন অতিরিক্ত বেতন দিয়া স্থানীয়
লোক নিযুক্ত করিতে হয় এবং তাহারও মধ্যে সংলগ্ন
পাওয়া যায় না। পাহাড়ের উপর একটি স্থান আছে
কিন্তু তাহার অন্ন দূর। রজন এক পানের অন্ন
আর অল্প মাইল দূরবর্তী অন্ন স্থান হইতে আনিতে
হয়।

আমরা যে করবিন দিল্লীতে ছিলাম সেই করবিন নাম আবাদিনকে জল সরবরাহ করিবার জন্য জীবনকে ভিসময় অতিরিক্ত তৃত্য নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

অত বৈকালে আমি ভিন্ন অভ্যাস সকলে সুকুমার সঙ্গে সহর দেখিরা আসিল।

১৫ই হইতে ১৩ই জুন পর্যন্ত দিল্লীতে ছিলাম। মধ্যে ৯ই জুন অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় দিল্লী ত্যাগ করিরা মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলাম। ১০ই জুন কুরুক্ষেত্রে ও ধানেশ্বর দর্শন করিরা সেইদিনই অপরাহ্নে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করি।

কুরুক্ষেত্রে ঠেশনের নিকটেই কলিকাতার কোন রাজিক বাগুনের ধর্মশালা আছে। আমরা রাজিশেষে কুরুক্ষেত্রে ঠেশনে উপস্থিত হইয়া অবশিষ্ট রাত্রি সেই ধর্মশালার অভিবাহন করি। প্রত্যুষে টোকা ত্যাগ করিরা কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হই। রেলওয়ে ঠেশন হইতে তীর্থক্ষেত্র অস্থান হই নাইল হইবে।

এখানকার ভীষণ কৃত্য বৈপারন হুয়ে মান। যে জলাশয়ে আমরা দান করিলাম, পাণ্ডা বলিল ইহাই বৈপারন হুয়। কুরুক্ষেত্র হুয় শেষে ছর্ঘোধান এই হুয়-জল মধ্যে সুকারিত ছিলেন। কালবশে হুয় এখন পুষ্করীতে পরিণত হইরাছে। দানের পর অপর একটা স্থান দেখাইরা পাণ্ডা বলিল, এইখানে পৃথিবী কর্ণের রথক্ষে প্রাণ করিরাছিলেন। আধুনিক কালের তাহার কর্ণের রথের ঢাকা এখানে মাটিতে ডাবিরা গিয়াছিল। হুয়ের নিকটে বয়েকটি আশ্রম আছে এবং কোথাও পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ও ঐক্ককের মূর্তি আছে।

অনেক হুয়ে বাপগদা নামে একটা স্রোত আছে পাণ্ডা এরূপ বলিল। শরণ্যার পারিত তীর্থদেবের কৃপা শান্তি জন্ত অর্জুন পৃথিবী বিদীর্ণ করিরা পাণ্ডাল হইতে ভোগবতী পলাকে আনয়ন করিরাছিলেন। সেই স্রোতই বাপগদা নামে পরিচিত। স্থানটি অনেক হুয়ে, আমরা দেখি নাই।

সমস্ত মাঠটি ৮৪ বোহন বিস্তৃত। জম্বা শেব করিতে প্রায় বাসাবিক সময় লাগে। পাণ্ডা বলিল

কুরুপাণ্ডব হুয়ের অনেক নিদর্শন এখনও এ মাঠে দেখিতে পাওয়া যায়।

পাণ্ডার কথার সত্যতা নির্ধারণের ভার ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রতি রাখিরা, আমরা ধানেশ্বরের কালীবাড়ী দর্শন করিরা পুনরায় ধর্মশালার আশ্রয়ন এবং বৈকালের পাড়ীতে দিল্লী পৌছিলাম। পথে রেল পাড়ী হইতে পানিপথের মাঠ দৃষ্ট হইল।

১৯১২ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে দিল্লীকে প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা বাইত। এখন আধুনিক দিল্লী বলিতে অত এক অংশ বুঝাইরা থাকে। এই অত্যাধুনিক দিল্লীর নির্মাণকার্য এখনও শেষ হয় নাই।

(১) প্রাচীন দিল্লী—অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ। বর্তমান স্থানীয় নাম পুরাণা কিল্লা। ইহাই পাণ্ডবদের রাজধানী ছিল। কিল্লার মধ্যে একটি শিব মন্দির আছে; ইহা কুতীদেবীর স্থাপিত বলিরা কথিত। পূর্বে কিল্লার মধ্যে লোক বসতি হইরাছিল—লর্ড কর্জনের সময় তাহাদিগকে উঠাইরা বেঙরা হইরাছে।

(২) আধুনিক দিল্লী অনেক স্থান বিস্তৃত। প্রথমতঃ পাঠান দিল্লী ও মোগল দিল্লী এই দুই সাধারণ নামে আধুনিক দিল্লীকে বিভক্ত করা বাইতে পারে। পাঠান দিল্লীও অনেকগুলি। দাসরায জ্যেষ্ঠী (Slave dynasty) হইতে লোহী বংশ পর্যন্ত প্রত্যেক পাঠান রাজবংশ এবং শেরশাহ এক একটা স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করিরাছিলেন। এ সমস্ত ঐতিহাসিক কথা লিখিতে হইলে ইংরেজ লিখিত পুস্তকের তর্জমা করিতে হয়, সুতরাং নিম্নরোজন।

আমরা দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—কুতব মিনার, লৌহস্তম্ভ, আলতামশের সমাধি, রিজিয়া বেগমের প্রার্থনা গৃহ (নবাব পড়িয়ার ঘর), লক্ষন কুপ (অতি উচ্চস্থান হইতে লক্ষ্মণদান পূর্বক কুপজলে পড়িত হইয়া দর্শককে ভাবনাগা দেখান হয়), আলাউদ্দীন খিলজির সমাধি, সুলতান জাহাঙ্গীরের সমাধি, (অথবা তৈমুরের কন্যার সমাধি) শাহজাহানের

হুর্প, জুনা কস্জিহ্, (বে কস্জিহ্ হইতে নাটির শাহ্ দিল্লী-বাসীদিগকে হত্যার হুকুম দিয়াছিল) এবং বে হত্যার পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল সেই রাত্তা দর্শন করিলাম। একদিন কান্দীর তোরণ দেখিয়া আসিলাম।

একমাত্র শাহজাহানের হুর্প দেখিতে পরয়া দিয়া টিকিট কিনিতে হয়, অতঃ কোথাও টিকিট কিনিতে হয় না, তবে পরয়া বে ব্যয় করিতে হয় না তাহা নহে।

দিল্লীতে সর্কাপেকা একটা নতুন জিমি দেখিলাম বা তুলিলাম “পৃথীরাভের তোপখানা।” বে ব্যক্তি গাইড্ হইয়া আমাদিগকে পাঠান দিল্লী দেখাইতেছিল, সে কুতব মিনারের পূর্বে একটা ভাল হাটান দেখাইয়া বলিল, “এটা ছিল পৃথীরাভের তোপখানা।”

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর সর্কপ্রথম তোপ ব্যবহার করেন ইহাই ইতিহাসের কথা। বৈদিক যুগেও ভারতবর্ষে বাহুকাপ, কিনারটোপাক্ প্রভৃতি ছিল ইহা দ্বারা সকলকে বিশ্বাস করিতে বলেন, তাঁহাদের মতে একারী, শতরী বাণ প্রভৃতি Long Tom machine gun প্রভৃতিরই জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমার গাইড, রাম রাবণের ও মোগল-পাঠানের যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের আরম্ভ কালেও তোপের ব্যবহার ছিল বলিয়া প্রকাশ করিল।

বে “দিল্লীর লাডু”র আমাদের দেশে এত খ্যাতি, দিল্লীতে তাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত। “দিল্লীকা লাডু” বলিয়া বে একটা ভানাসূত্র কথা আছে দিল্লীবাসিগণ তাহা জানেও না।

১৩ই জুন—রায়ে দিল্লী ত্যাগ করিয়া বুন্দাবন যাত্রা করি। দিবাভাগেই আমরা কলেজের নিকটবর্তী একটা ছোট রেলস্টেশনে পাড়ী ধরিয়া, দিল্লী সহরে ট্রেনের নিকট এক হোটেলে আসিয়া থাকি। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মুকুন্দ হোটেল হইতে সকলকে ট্রেনে লইয়া গিয়া রেল পাড়ীতে উঠাইয়া দেয়।

১৪ই জুন—সকালে নখুরা গৌছিলাম। এখান হইতে পাড়ী-যতন করিয়া বুন্দাবন আসিলাম।

নখুরা ট্রেনেই বুন্দাবনের পাড়ার সম্বন্ধ পরিচয় হয়। বুন্দাবনে গোবিন্দের পাড়ার দুইলীকর হরক-তানের ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

বাগ্যকালে একটি সতীতে তুলিয়াছিলাম—

“যত মানি জনন, হেরিলাম বুন্দাবন

সকল হ’লো জীবন, জুড়াইলাম।”

আমরা বুন্দাবনে ছই সপ্তাহ বিশ্রাম করিয়া “জুড়াইব” ঠিক করিলাম। সতীর পাণ্ডবর দীপেশ ও কৃত্যক সজে লইয়া বাজার দেখাইয়া আসিল। পাণ্ডার প্রথম উপদেশ, কখনও ঘরের কপাট খোলা না রাখা। এখানে বানরের উপদ্রব অত্যন্ত বেশী, একটু ছবিগা পাইলেই খাভ দ্রব্য এমন কি কাপড় বাগন প্রভৃতিও বানরে লইয়া যায়।

বুন্দাবনেও জলকষ্ট কম নহে। এক বুন্দাবনে কোথাও কুপজল বিদ্যাব-লবণাক্ত, আবার কোথাও কুপজল স্বাদ্। আমাদের ধর্মশালায় কুপটির জল লবণাক্ত। পানের এবং রন্ধনের জল ধর্মশালা হইতে পাওয়া যায়। বাজীদিগকে জল আনিয়া দিবার জন্য ধর্মশালায় তরক হইতে একজন “চৌবেজী” নিযুক্ত আছে।

এখানে প্রবাদ, গোবিন্দজীর চরণে সযুজ বাস করেন, তাই গোবিন্দজীর জমিদারী মধ্যে বত কুপ সমস্তই লবণাক্ত জলপূর্ণ; গোবিন্দজীর জমিদারীর বহির্ভুক্ত স্থানের কুপজল স্বাদ্।

নির্দিষ্ট হারে প্রণামী না দিলে বিগ্রহ দর্শন করিতে পারা বাইবে না, বৈকুণ্ঠ তীর্থক্ষেত্রে ঐপাট বুন্দাবন নামেই তাহা প্রথম তুলিলাম।

রূপ গোখারী স্থাপিত গোবিন্দজী, সনাতন গোখারী স্থাপিত নরনামোহন এবং ঐজীব গোখারী স্থাপিত গোপীনাথ—তেটা অর্থাৎ নির্দিষ্টহারে প্রণামী না দিলে দর্শন করা যায় না। অতঃ অনেক দেবালয় আছে যেখানে তেটা না দিলেও বিগ্রহ দর্শন করা যায়।

শেখোক্ত শ্রেণীর দেবালয় মধ্যে লালাবাবুর ঠাকুর বাড়ী, শেঠজীর মন্দির, লক্ষ্মীর শেঠজীর মন্দির, গোরা-

লিঙ্গ মহারাজের ঠাকুর বাড়ী, বহুবিকারীর মন্দির, হেতনপুরের বান্ধুবেড়, অষ্ট নবীর মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইহার কোন কোন মন্দির হইতে রাজীবিরগকে প্রসাদও “বিকরণ” করা হয়। তবে পূর্ব দিন বৈকালে অধ্যক্ষের নিকট হইতে টিকিট কিনিয়া আনিতে হয় নতুবা প্রসাদ পাওয়া যায় না। গোদামী স্থাপিত বিগ্রহের প্রসাদও ক্রয় করিতে হয়।

বুন্দাবনে গোবিন্দদেবীই প্রতিপত্তিশালী। গোবিন্দদেবীর পূজার্তন মন্দিরটী নাকি রাজা নানসিংহ কর্তৃক নির্মিত। মন্দিরটী এত উচ্চ ছিল যে আগ্রার দুর্গ হইতে এই মন্দিরের প্রদীপ হুট হুট হইত এবং এই অপরূপে বামশাখ আওরঙ্গজেব মন্দিরটীর চূড়া ভাঙ্গিয়া দেন। বর্তমান মন্দিরটী কোনও বাঙ্গালী ধনী কর্তৃক নির্মিত।

শেঠকীর ঠাকুর বাড়ীতে বিখ্যাত সোণার (অনেকের মতে শিতলের উপর গিল্টি করা) তালগাহ বর্তমান। অরপুর মহারাজের ঠাকুর বাড়ী এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এতদ্ব্যতীত নিধুগন, নিকুজবন, কালীর দমন ঘাট, বজ্রহরণ ঘাট, বংশীঘট প্রভৃতি ঐক্যের যৌবন লীলার স্থিতি-বিজড়িত অনেক ঐষ্ট্যস্থান আছে।

লালা বাবুর ঠাকুর বাড়ীর একটু দক্ষিণে চৌবাটী মোহান্তের সমাধি। একজন বাঙ্গালী বুঝ বৈষ্ণব এই সমাধি রক্ষা করিতেছেন। দর্শকের খেজারুত দানের উপরই বুঝকের নির্ভর। এখানে একটা গাছ ঐক্যের সহস্ররোপিত গাছ বলিয়া দেখান হয়। চৌবাটী মোহান্তের সমাধি কেন্দ্রে সনাতন গোদামীর এক সমাধি এবং মদনমোহনের বাড়ীর নিকট তাঁহার অপর একটা সমাধি দেখান হয়। কোনটী যে প্রকৃত বলা যায় না।

চৌবাটী মোহান্তের সমাধি কেন্দ্রের নিকট মাকোরারী পুকাইতি। সকালে এবং বৈকালে তিনবার্ণাপন সববেত হইয়া “রাধা কুক” নাম গান করিলে তাহারগিকে চাউল

দেওয়া হয়। বুন্দাবনে এখন বাধুকীর পরিবর্তে এই তিনকা দ্বারা অনেক জীবন ধারণ করিতেছে—নাধুকরী এখন হুত্যাগ্য।

১৫ই হইতে ২০শ জুন পর্যন্ত বুন্দাবনে ছিলাম হুই টাকা হারে তেটা দিরা গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন এবং কাত্যারনী দর্শন করিতে হইল। এক নামে একাধিক বিগ্রহ স্থাপনের ব্যবসায়ও এখানে আছে। কাত্যারনীর বাড়ীতে বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, “শায়ে উক্ত, ব্রজে কাত্যারনী পরা। এই সেই কাত্যারনীর বাড়ী, প্রত্যারকের কথার অস্ত্রজ বাইবেল না।” কাত্যারনী বৈষ্ণব বিগ্রহ নহেন, শাক্তদের পীঠ।

যে কয়দিন বুন্দাবনে ছিলাম, ঐষ্ট্যস্থান তলি সমস্তই দেখিলাম। তারাকিশোর বাবুর (মোহান্ত সন্তানসজী) স্থাপিত নিষার্কীশ্রমে হুইমিন গিরাছিল। আমার মুক্তিলাভ বাজার সজী রাধাকান্তদেবী এখনও বদরিকাক্স হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই। আশ্রমস্থিত হুই একজন বৈষ্ণবের সঙ্গে আলাপে জানিতে পারিলাম, আমি যখন হরিদ্বারে ছিলাম, রাধাকান্তদেবী তখনই হরিদ্বার হইতে বদরিকাক্স অতিমুখে বাজা করিয়াছেন; আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় নাই। তারাকিশোর বাবু বুন্দাবনের অসহ্য গরমে কলিকাতার আছেন, কুলনের কিছু পূর্বে প্রত্যাগমন করিবেন।

বুন্দাবনে অবস্থান কালে “কুক চৈতন্তদাল বাবাঙ্গী” নামে একজন বৈষ্ণবের সহিত পরিচয় হয়। ইহার পূর্বনাম (রায় সাহেব) কৈলাসচন্দ্র দাস। ইনি আসাম গবর্ণমেন্টের অধীনে চিকিৎসা বিভাগে কার্য করিতেন। সেজন্য লইয়া বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই অবধি এখানেই আছেন। কুলন পর্যন্ত বুন্দাবনে থাকিতে তিনি আমাবিরগকে অহরোধ করিলেন; কিন্তু শেষে আমরা তাঁহার অহরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।

১৮ই জুন প্রাতে কেশীঘাটে নান করিয়া হাতা-ঠাকুরাণী ও আমি পঞ্চকোণী প্রদক্ষিণ করিতে বাহির

হই। বেলা প্রায় ১১ টার সময় পুনরায় কেশীনাটে আসি। বুলসের সময় অনেক লোক পরিক্রমণ করে, তখন পথও বেশ পরিষ্কার করা হয়। এখন পথ তত পরিষ্কার নহে এবং পরিক্রমণকারীর সংখ্যাও খুব বেশী নাই। দুই চারি জন ভক্তের সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহারা যুকে হাঁটুরা পরিক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন।

২৫শে জুন। অস্ত্র প্রত্যয়ে ভ্রামকুণ্ড রাধাকুণ্ড দর্শন কর্ত্তা রাজা করি। বৃন্দাবন হইতে বাতারাভের কর্ত্তা একখানা গাড়ী ভাড়া করিলাম। ভাড়া ৭ টাকা। বেলা প্রায় ১০ টার ভ্রামকুণ্ড রাধাকুণ্ড উপস্থিত হইলাম। পরস্পর আর সংলগ্ন দুইটা পুষ্করিণী ভ্রামকুণ্ড রাধাকুণ্ড নামে খ্যাত। বহুদিন পড়োড়ার না হওয়ার পুষ্করিণীর জল বিবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে। পুষ্করিণীতে স্নান ও করেকটা দেওয়ালে বিগ্রহ দর্শন করিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে বাজা করিলাম।

পথে সিরি গোবর্দ্ধন। এখানেও স্থাপিত বিগ্রহ আছে। গাড়ী থামাইয়া বিগ্রহ দর্শন করিলাম। আমি বিষয়কক মহাশয়কে চিনি কিনা এখানকার একজন ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাধাকুণ্ড ভ্রামকুণ্ড হইতে মথুরার পথে উঠি সওয়ার দেখিলাম। ঘোড়ার বেল্লপ গিঠে দিন মুখে লাগাম দিয়া সওয়ার উঠে, সেইরূপ উটেরও গিঠে দিন মুখে লাগাম পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মথুরা হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে আমাদের গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। অস্ত্র কোম বান বাহন এখানে সংগ্রহ করা অসম্ভব, সকলকেই পদব্রজে রওনাই হইতে হইল। তীর্থ যাত্রীরা বেল্লপ ডাহাদের দ্রব্য সামগ্রী মোট বাধিয়া মাথার বহিয়া লয়, সেইরূপ একটা মোট মাথার করিয়া চলিতে আমার কন্ডার বড় সাধ হইল। আমরা প্রত্যেকে একখানা করিয়া অতিরিক্ত কাপড় এবং গামছা আনিয়াছিলাম, তাহাই একত্র করিয়া একটা বোচুকা বানাইয়া দিলাম। কন্ডা বোচুকা মাথার করিয়া আনন্দে চলিতে আরম্ভ করিল। আমি

ও আমার কন্ডা অগ্রে, অস্ত্রান্ত সকল পশ্চাতে। মথুরা হইতে এক মাইল দূরে থাকিতে কন্ডা জিজ্ঞাসা করিল “বাবা, আর কত দূর? ঐ যে মোকটী আসিতেছে উৎসাহে জিজ্ঞাসা করুন।” কালিকার কর্ত্তব্যর অতি কল্পণ, বুঝিলাম তাহার আনন্দ ও উৎসাহ আর নাই, পথপ্রাপ্তি কর্ত্তা অবলাস আসিয়াছে।

ক্রমে মথুরা সহরে আসিলাম এবং পথপ্রাপ্তি বিজ্ঞানার্ঘ উপবেশন করিলাম। অস্ত্রান্ত সকলে আসিয়া পৌঁছিলে, সেখান হইতে আরও এক মাইল হাঁটুরা আসিয়া বৃন্দাবন গামী একখানা গাড়ী পাইয়া সেখান ভাড়া করিলাম।

পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি। অনেক রাজী বৃন্দাবন অভিমুখে পদব্রজে রাজা করিয়াছে। বৈশাখ শোভা বহুই সুন্দর। আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বতস্বর উপভোগ করা সম্ভব, ততদূর উপভোগ করিতে করিতে, প্রায় রাত্রি দশটার বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম।

২৬শে তারিখে বিশ্রাম করিয়া ২৭শে তারিখে আমরা গোকুল দর্শনার্থ বাজা করিলাম।

অস্ত্র বাতারাভের গাড়ী ভাড়া না করিয়া টোকার মথুরা পর্য্যন্ত আসিলাম।

মথুরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। বৃন্দাবন তদু বৈকব ধর্মের স্থতি লইয়া বর্ত্তমান। মথুরা, ইতিহাস ও বৌদ্ধ ধর্মের স্থতি বিলুপ্ত। তারিতে বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতিকালে মথুরা একটা বিখ্যাত স্থান ছিল। এখনও তীর্থযাত্রী দিগকে বৈকব বিগ্রহের সহিত একটি বৌদ্ধমন্দির এখানে দেখান হয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের স্মৃতি কনু কিত্তা (রাণা কংসের হর্ন) নামক একটা উচ্চস্থান দেখান হয়। কংসের এক রাণী কংসের সহিত অহুসৃত হইয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি-চিহ্নরূপ বহুনা-কূলে একটা ঝঠ দর্শককে দেখান হয়।

আমরা প্রথমতঃ বহুনার দান সম্পন্ন করিয়া, নৌকার পাণ্ডার বাড়ী আসিলাম। অতিরিক্ত বস্ত্রাদি এখানে রাখিয়া বিগ্রহ দর্শনে বাহির হইলাম।

কুন্ডানাথ, মথুরানাথ দর্শন করিয়া আমরা দ্বারকা-

নাথের বাড়ী আসিলাম। বৃন্দাবনে যেমন গোবিন্দদী,
মথুরার তত্ত্ব গায়কানাথদী বিতরণালী বিগ্রহ। গায়কানাথের বাড়ীতে বড়ই ছন্দ। মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড
মাটি মন্দির। যখন আমরা দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম
তখন ভোগের সময়, মন্দিরের কপাট বন্ধ, বহু লোক
বিগ্রহ দর্শনের আশায় মাটি মন্দিরে অবস্থান করিতেছে।
এক স্থানে একজন পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করিতেছেন।
অন্য গায়ক ও বাদক বহু ব্যক্তি সহ অপেক্ষা করিতেছে।
সকলেরই চক্ষু মন্দিরের দিকে—কখন বার উন্মুক্ত
হইবে।

কিছুকণ পরে মন্দির বার উন্মুক্ত হইল। সমবেত
কণ্ঠ হইতে “অন্ন গায়কানাথ জীকি অন্ন” শব্দে আনন্দ
ধারা প্রবাহিত হইল। ভাগবত পাঠক তাঁহার পাঠ
বন্ধ করিলেন, বাদক পাখোয়াজে বা দিল এবং গায়ক
ভানুপুরার স্বাক্ষর দিল্লীক্ষণদ্বয় মণিগীতে গান ধরিল—

“গল্পত্রয় পরমেশ্বর।

পুরুষোত্তম, পরমানন্দ, নন্দনন্দন, আনন্দ কন্দ,
বিশোদানন্দ, ত্রীগোবিন্দ।

দীননাথ, দুঃখ ভঞ্জন, তত্ত্ববৎসল, জগবন্দন,
জগজীবন, জগদ্রাধ কাট মোহ কাঁদ।

মধুহরন, মদনোদয়ন সুরতি, মুরলীধর,
সর্বমোহন, মেঘস্তায়ন সুরত, মন ভাওন, মাধব, মুকুন্দ ॥
কল্পলক্ষ্মী, সন-চচারন, পূরণ কর্তা, বিশোর,
গুণনিধি, গোকুল চন্দ।

হরিশরণ, বাধাবর, গোবর্ধন করণর ধারণ,
মুখিনাথ, হর্ষিকেশ (হরীকেশ) গায় গুণ
ভার আনন্দ ॥

তবে গরীব, বশুলাগ্রহে অন্তর্ভুক্ত,
বাসুদেব, বনমালী, ব্রজপতি, দীনবন্দ্য ॥

সমস্ত লোক মনোমগ্ন হইয়া, সঙ্গীত শ্রবণ করিল
“অথবা বিগ্রহ দর্শন করিল বৃত্তিতে পারিলাম না।
সকলেরই মন তখন অল্প রাজ্য হইতে কোন্ উন্নত-তর
রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। তাহারি যেন শ্রবণ ও
দর্শনের অতীত শুধু মনসেই বস ছিল।

কিন্তু প্রভুর নির্ধিত গায়কানাথদীর সৃষ্টি অতীব
সুন্দর। তাহাকে আবার এরূপ সুকৃতির সহিত পূর্ণদলে
সুসজ্জিত করিয়াছে যে বিগ্রহ হইতে চক্ষু আর কিরাইতে
ইচ্ছা করে না। এখানে পূজারী কি প্রার্থীর “মেহি
মেহি” শব্দ নাই। সকলেই মনের আনন্দে বিগ্রহ দর্শন
করিতেছে। আমরাও অনেককণ পর্যন্ত দেবালয়ে
থাকিয়া বিগ্রহ দর্শন করিলাম।

হরিদ্বারে অবস্থান সময় হইল “মথুরা বাসিন্দী”র
সহিত পরিচয় হইরাছিল। গায়কানাথদীর বাড়ীতে
তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার, অত্যন্ত সকলে তাঁহাদের
বাড়ীতে গেলেন, আমি পাণ্ডুর বাড়ী আসিলাম।

সকলে পাণ্ডুর বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিলে জল
বোগাঙে গোকুল দর্শনে বাজা করিলাম। টোকাতে
সময় অধিক লাগিলে, আমরা একখানা গাড়ী ভাড়া
করিলাম।

বনুনার পুল পার হইয়া গাড়ী দক্ষিণ দিকে চলিল।
রাস্তার দুই দিকে কেবল উত্তর দিক—জন মানব
বসতির চিহ্ন নাই। রাস্তার পার্শ্বে পথিক বিপের জল
পানের জন্য, কুপ আছে, কোথাও বা জলস্রব আছে।

অনেক দূর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া আমাদের
গাড়ী পূর্বদিকে চলিল। অপর একখানা গাড়ী কয়েক
জন রাজাজী বাজী গইরা দক্ষিণ দিকেই গেল। পাচক
জিভালা করার আনিতে পারিলাম, আমরাই “একুত”
গোকুলে বাইতেছি। কয়েক শত বৎসর হইল রাজাজী
বৈকুণ্ঠের একটা স্তম্ভ গোকুল স্থাপন অথবা আবিষ্কার
করিয়াছেন, রাজাজী বাজীরাই সেখানে বাইরা থাকে—
অন্ত কেহ বার না।

কবি হোমর এবং কাগিনাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে
যখন ভিন্ন ভিন্ন নগর এবং বিভিন্ন প্রদেশ নিজ নিজ
দাবী উপস্থিত করিতেছে, তখন অন্ন ভগবানের জন্ম
স্থান (বাল্যলীলা স্থলী) বলিয়া হইট প্রাচ্যের পক্ষে,
নিজ নিজ দাবী উপস্থিত করা আশ্চর্যের বিষয় নহে।
নবদ্বীপের নিকটবর্তী তিনটি বিভিন্ন স্থান মহাপ্রভুর
জন্ম স্থানের অধিকার দাবী করিতেছে। অল্পে গোঁড়ুলে

উপনীত হইলাম। নন্দালয় দর্শন না করিয়া আমরা
প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড ঘাট দর্শন করতে গেলাম। এই
স্থানে নন্দরাজের সব লক্ষণ প্রাপ্তি জলপান করিত। অত্যন্ত
রাখাল বালকগণের সহিত ক্রীড়া উপলক্ষে অত্রিক
স্থিত। তখন করিমাছেন সংবার পাইয়া না বশোমতী
এই ঘাটে আসিয়া ক্রককে হাঁ করিতে বলেন, ক্রক
স্থখ ব্যাধান করিলে নন্দরাজী ক্রকের উদরে ব্রহ্মাণ্ড
দর্শন করিয়াছিলেন, এই আখ্যায়িকা অবলম্বনে ঘাটের
নাম “ব্রহ্মাণ্ড ঘাট” হইয়াছে।

স্থানটি এখন আর ঠিক বসুনার তীরে অবস্থিত
নহে—বসুনা অনেকটা সরিয়া গিয়াছে। স্থানটি খুব
নির্মল। এখানে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম আছে। একজন
ধনী ঘাটটির জীর্ণসংস্কার করিয়া দিয়াছেন এবং
মথুরার কোনও কালেক্টর সাহেব ঘাট পর্য্যন্ত সরকারী
রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বৃন্দাবনের মাখন
মাটার উৎপত্তি নাকি এই ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে।

ঐরাধিকার পিজালর বর্ষাণ গ্রাম এখান হইতে
আর এক মাইল দূরে; সমরভাণ্ডে বাওয়া হইল না।

ব্রহ্মাণ্ড ঘাট দর্শনান্তর আমরা নন্দালয়ে আসিলাম।
নন্দরাজার বাড়ী একটি অতি উচ্চ স্থানে—কোনও
পুরাতন দ্বর্গের ধ্বংসাবশেষ হওয়া অসম্ভব নহে।
আরোহণের পথে প্রথমেই পূর্ণ মূর্তির একটি মূর্তি।
উচ্চস্থানের অধিত্যকার একটি মন্দির। এই মন্দিরে
একটি দোলনার বালগোপাল স্থাপিত। দোলনা সংলগ্ন
পিতলের শিকল টানিয়া গোপালকে দোল দেওয়াই
এখানকার তীর্থ-কৃত্য। গোপালকে দোল দেওয়ার
সময় আমার বা ও স্ত্রী হঠাৎ উচ্চস্বরে ক্রন্দন
করিয়া উঠিলেন। আমি প্রথমে কোন কারণ বুঝিতে
পারিলাম না। পরে মনে হইল, আরোহণ বৎসর পূর্বে
আমার এক বৎসর বয়স এক মাত্র শিশু পুত্রের
মৃত্যুশোক তাঁহাদের মূর্তিপথে উদ্ভিত হইয়াছে।

মন্দিরের পুহারী হুং করিয়া বলিলেন, যে সমস্ত
ধনী ব্যক্তি তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া থাকেন তাঁহারা
যেন পথের নিকটবর্তী মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিয়াই

যেনে প্রত্যাগমন করেন; পথকষ্ট স্বীকার
করিয়া কেহই প্রকুর বাগ্যলীলাস্থলী দর্শন করিতে
আইসেন না। মন্দিরের কোন আর নাই—দৈনিক
ভোগরাগ সম্পন্ন হওয়াই কঠিন।

মন্দির হইতে নন্দরাজের বাড়ীতে গেলাম। প্রকুর
মৃত্যুকাণ্ড (যদিও তগবান মথুরার কংস কারাগারে
জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন), দধি ময়নের স্থান, উল্লঙ্ঘনে
বন্ধনের স্থান এবং আরও অনেক স্থান পাণ্ডা দেখাইল;
ছায়ে একটা স্থান দেখাইয়া পাণ্ডা বলিল তাঁহার
নাম “খেলনটান”। অত্রিককে দর্শন করিবার জন্য
একদিন মহাদেব নন্দালয়ে আসিয়াছিলেন। চন্দ্রচূড়ের
চুড়চুড় দর্শন করিয়া তখন একটি চন্দ্র প্রাণ্ডির
জন্ত অত্রিক না বশোমতীর নিকট আশ্রয় ধরিলেন।
না বশোমতী একখানা দর্শন ছায়ে সংলগ্ন করিয়া
দিলেন; অত্রিক দর্শনে আগুন মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া
চন্দ্র প্রাণ্ডির আনন্দ অতিক্রম করিলেন।

নন্দালয়ে প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। বালক
বালিকাগণ “মাইজী একটা পরমা” “শেঠজী একটা
পরমা” করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাহার উপর
আবার “ভেটী”।

রাজা নন্দ ছিলেন মহা কৃপণ। নতুবা বয়ঃ তগবানকে
পুত্ররূপে লাভ করিয়া তাঁহাকে রাখালের কার্যে
নিযুক্ত করিবেন কেন? হুই একজন চাকর রাখিয়া
হিলেই চলিত—বিশেষতঃ সেই পুরাকালে কৃত্যের
বেতনও তত অধিক ছিল না। তগবানকে কষ্ট
দেওয়ার অপরাধে মহা কৃপণ রাজা নন্দের কংসধরগণ
এখন ভিক্তক হইয়াছে।

এমন যে মথুরা নন্দালয়, এই প্রার্থীর দল তাহাকে
বিরক্তজনক করিয়া তুলিয়াছে। কতক্কে এখান হইতে
বাইতে পারিব এখন সেই চিন্তা। না বশোমতীর
বাংসলা, ব্রহ্ম রাখালগণের সখ্য, কিছুই একটু
নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিবার অবসর পাওয়া
গেল না।

ব্রহ্মাবান ভ্যাগ করিয়া যাবে মথুরাতে প্রত্যাগমন

করিলান এবং সেখান হইতে টোলা ভাঙা করিয়া সেই স্নানার্থে ব্রাহ্মণ পৌছিলান।

২৮শে জুন। অত পুরীতে জগন্নাথদেবের দান বাজা। ব্রাহ্মণেরা অনেক বিগ্রহের জল বাজা হয়। মন্দিরে লতা পাতা বেড়িত কুড় প্রভৃতি করিয়া তাহাতে বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। চতুর্দিকে কৃত্রিম কোয়ারা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং কোয়ারা হইতে জলরাশি বিগ্রহ গায়ে এবং দর্শক দিগের গায়ে পড়িত হয়। অপরাহ্নে জলবাজা সম্পন্ন হয়।

প্রথমতঃ গোবিন্দজীর বাড়ীতে জলবাজা দর্শন করিয়া, অন্তান্ত অনেক দেবালয়ে জলবাজা দর্শন করিলাম। সন্ধ্যার পের্তজীর ঠাকুর বাড়ীর বন্দোবস্ত আমার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট মনে হইল। বহিঃ অনেক লোক জলবাজা দর্শনে আসিয়াছিল, তথাপি কাহারও কোনই অসুবিধা হয় নাই।

জলবাজাদর্শন করিয়া সকলেই সন্ধ্যার পর আর্জি প্রসঙ্গ-ধর্মশালায় প্রত্যাগমন করিলাম।

২৯শে জুলাই—অত বৈকালে ব্রাহ্মণ ত্যাগের কথা। বিগ্রহের পাণ্ডার বাড়ী “মাধুকরী” (তোজনের নিয়ন্ত্রণ) ছিল। সন্ধ্যাবেলা রাত্রি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম।

মাতাঠাকুরাণী ব্যতীত আমরা সকলেই মাধুকরী সম্পন্ন করিয়া আসিলাম এবং বিশ্রামান্তে টেনসন অতিবৃত্তে সজা করিলাম।

অত্যন্ত তীর্থ হ্রদের তুলনার এখানে পাণ্ডা দিগকে অনেক বেশী দিতে হইলেও, আমি এখানেও পাণ্ডার “উপলব্ধি” উপলব্ধি করি নাই। আমাদের হইল পাণ্ডা ছিল। একজন না হয় অপর জন প্রায় সর্বদাই ধর্মশালায় উপস্থিত থাকিয়া আমাদের প্রয়োজন সম্পন্ন করিত।

ব্রাহ্মণেরা চৌদ্দ দিন অবস্থিতিতে আমার কথা এখন আর আমি ভিন্ন অত কাহাকেও সম্পর্কিত

উপস্থিতিতে সন্ধান করে না। “স্নান, স্নান” বলিয়া সন্ধান করিয়া তাহার বক্তব্য প্রকাশ করে।

ব্রাহ্মণ টেনসন হইতে আমরা সকলে একই গাড়ীতে উঠিলাম। মথুরা ও হাভরাসে গাড়ী বদল করিয়া পরদিন (৩০শে জুন) বিগ্রহের সন্ধ্যা এলাহাবাদ টেনসনে পৌছিয়া নিকবর্তী এক ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অপরাহ্নে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্তান্ত কয়েকটি স্থান দেখিয়া আসিলাম।

১লা জুলাই—অতি প্রত্যুষে মথুরাভীরে আসিলাম। এখান হইতে নৌকার জিবেণী সন্ধ্যা উপস্থিত হইলাম। সুতন ও জিবেণী দান সম্পন্ন করিয়া অল্পর বট দর্শন করিলাম। কেয়ার মধ্যে পাণ্ডাদের বাওরা নিবেদ, আমার পাণ্ডা বাহিরে অপেক্ষা করিল। প্রত্যাবর্তনের পথে নৌকার না-আসিয়া টোকার আসিলাম। বৈশাখ্য দর্শনান্তর ধর্মশালায় পৌছিলাম। মাতাঠাকুরাণী পূর্বে একবার এখানে আসিয়াছিলেন। তীর্থহীন হিসাবে উভয় স্থানগুলি তাঁহার কিছু কিছু জানা আছে। তিনি পূর্ব্ববারে যে সমস্ত স্থান দেখিয়াছিলেন আমরাও এবার তাহাই দর্শন করিলাম। এখানেও বৈশাখ্য নামে দুই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। আমরা মাতাঠাকুরাণীর পূর্ব্বদৃষ্ট বিগ্রহই দর্শন করিলাম।

অপরাহ্নে ধর্মশালায় নিকটবর্তী ধর্মশালা দর্শন করিলাম। এখন আর ইহার “বাগ”ও বিশেষ কিছুই নাই, গবর্ণমেন্ট হইতে দান বিক্রয় করা হইয়া থাকে। সমাধি মন্দির কয়টি এবং বতটুকু বাগান আছে তাহা দেখিলাম।

এলাহাবাদ টেনসন হইতে মোগল সরহইয়ের পথে না আসিয়া আমরা “ছোট লাইসে” (B. N. W. R.) কাশী বাতরা হ্রি করিয়া, এলাহাবাদ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী একটা ক্ষুদ্র টেনসনে আসিলাম। রাত্রি দশটার পাড়ীতে উঠিয়া তৎপর দিন বেলা ৮টার কাশী পৌছিলাম।

মথুরা

প্রশান্তপ্রভা আচার্য্য।

নগবালা

(উপস্থাপন)

প্রথম ভাগ—পাশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রামপ্রাণবাবুর আশা।

আশী টাকা মাসিক বেতনে চাকুরী করিয়া, কলিকাতায় থাকিয়া, এই ঘোর কলিকালে, একটি পুত্রকে এম-এ, বি-এল, পড়ান কত কঠিনাদপি কঠিন কাৰ্য, তাহা ভুক্তভোগী মাজেই অবগত আছেন। আমাদের শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ সুখোপাধ্যায় এই কঠিন কাৰ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নিজে বিপন্ন হইয়াও, পুত্রকে এম-এ, বি-এল পড়াইয়াছিলেন; বুদ্ধিমান পুত্র শ্রীমান জ্যোতিঃপ্রকাশ এই দুই পরীক্ষাতে বিশেষ ভাবে কৃতকার্য হইয়াছিল।

পুত্র বধন গেটেস্ট লেদারের লগেটা পরিয়া, বেলদার পাঞ্জাবী গারে দিয়া, ফরাসিভাষার কালো কিতা পাড় ধুতি পরিয়া, বুকে রেশম রচিত স্মৃঙ্গি রুমাল উড়াইয়া, সিগারেটের ধূমপান-করিতে করিতে কলেজে বাইত, তখন রামপ্রাণ বাবু ছুটিতে আধগেটা খাইয়া, বর্ণগন্ধাঘ্রিত ময়লা চাপকান পরিয়া, শততালিবিশিষ্ট প্রাচীন জুতাটি পরে দিয়া আকিসে ছুটিতেন; এবং সকালে দশটা হইতে বিকালে পাঁচটা পর্যন্ত, প্রাণপণ শক্তিতে আপন কর্তব্য-কার্য সম্পন্ন করিয়া, অফিসের বড় সাহেবকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। পুত্রের বিদ্যালভের ব্যয় মির্জাহ জন্ত, রোগ হইলে, তিনি ঔষধ খাইতেন না; বলিতেন, ঔষধের টাকাটা বাঁচিলে, শ্রীমানের জন্ত আর একখানা আইন পুস্তক ক্রয় করিতে পারা বাইবে। হুর্দে দেহে বল পাইবেন বলিয়া, পাড়ার আলানী নন্দডাক্তার একবার তাঁহাকে নিম্নমিত হৃদয় পান করিতে বলিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, কলিকাতার হৃদয় মহানু-

সামগ্রী; একমাসের হৃদয় টাকা বাঁচিলে, বাবাকীর আর এক বোড়া কলেজ বাইবার জুতা হইবে। গৃহীণী তাঁহার অকালমৃত্যু দেখে বলাধান করিবার জন্ত, পিজানর হইতে কিছু গব্যমৃত সংগ্রহ করিয়া আনিলে, তিনি বলিতেন, আমার কেরানীগিরি কাৰ্য, মাথা বামাইতে হয় না,—আমার বি খাইবার দরকার কি? জ্যোতিঃ শক্ত শক্ত পুস্তক পাঠ করে, বিটা বরং তাহাকে খাইতে দিও; তাহার মাথার মগজে জোর হইবে। এইরূপে তিনি না খাইয়া, না পরিয়া, আপনাকে সকল সুখভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া, এবং অশেষ শারীরিক ক্লেশ সহ করিয়া পুত্রকে মাহু করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার আশা ছিল। পুত্র বধন বি-এ পরীক্ষার সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইল, আশার ও আনন্দের তাহার বহঃস্থল স্মৃতি হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, আর দুই তিন বৎসর একটু বস্তু করিতে পারিলেই—বাস। পুত্র হাইকোর্টের উকিল হইয়া মাসে মাসে পাঁচ ছয় শত টাকা উপার্জন করিয়া তাঁহার হাতে আনিয়া দিবে; তিনি সেই টাকা হইতে পৈতৃক ভদ্রাসনটি স্বপ্নমুক্ত করিবেন; গৃহীণীর এ-প্ৰকৃত কোন সাধই মিটাইতে পারেন নাট,—তাঁহার বরদেহ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবেন, এবং নিজের জন্ত একটি মৌর্যমণ্ড হাঁকা প্রস্তুত করাইবেন। তাহার পর, বধন শ্রীমান জ্যোতিঃপ্রকাশ, মা লক্ষ্মীর কৃপার, আরও অধিক উপার্জন করিতে পারিবে, (তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হাইকোর্টের অনেক উকীল মাসিক চারি পাঁচ সহস্র মুদ্রা উপার্জন করিয়া থাকেন,) তখন তিনি এই বাটা ভাড়া দিয়া, ভবানীপুর অঞ্চলে নূতন ত্রিতল বাটা প্রস্তুত করাইবেন, তাহার কক সৰ্বদা বৈদ্যাসিক আলোকে আলোকিত করিবেন, তাহা পছন্দ মত আসবাব দ্বারা সজ্জিত করিবেন, গাড়ী ঘোড়া কিনিবেন, এবং রূপার একটি কর্ণী

কিনারা, তাহাতে আলবোলায় নল লাগাইয়া অধুরী
তামাকের ধূমপান করিবেন। আর, আর.....

কিন্তু রামপ্রাণবাবুর সকল আশার কথা লিপিবদ্ধ
করিতে গেলে, আমাদের কালী ও কাগল সব ফুরাইয়া
বাইবে, লেখনীর লৌহ-স্থূষ তোতা হইয়া বাইবে—এজন্য
আমরা সে চেষ্টায় বিরত হইলাম।

একশে তাঁহার এই সকল আশা ফলবতী হইতে
বিলম্ব নাই। জ্যোতিঃপ্রকাশ এম এ, ও বি-এল দুই
পরীক্ষাতেই পাশ হইয়া, ইউনিভার্সিটির জরগল্প
পাইয়াছে। এখন কেবল ওকালতির ফীটা জমা দিতে
পারিলেই একবারে পুরাদস্তুর উকীল হইয়া সামলা
মাখায় দিয়া হাইকোর্টে বাইতে পারিবে।

কিন্তু কী যে অনেক টাকা! তাহা দরিদ্র সর্বস্বান্ত
রামপ্রাণবাবু কিরূপে সংগ্রহ করিবেন? তিনি অনেক
ভাবিলেন, কিন্তু এই বিষয় সমস্তায় কোন উপায়
দেখিতে পাইলেন না। হার হার! ছুতর ইউনিভার্সিটি
সাগর পার হইয়া, শেষে কি তাঁহার আশার
তরঙ্গী কুলে আসিয়া ডুবিবে? রামপ্রাণবাবুর বুদ্ধি,
হিমালয়শীর্ষে তুষারের স্তায়, একবারে জমাট বাঁধিয়া
গেল।

জ্যোতিঃপ্রকাশ বিভাগের হইতে প্রচুর বুদ্ধিলাভ
করিয়া অতিশয় বুদ্ধিমান হইয়াছিল। সে পিতাকে
বুদ্ধি দিল; কহিল প্রথমে একটা চাকরী করিয়া, কিছু
অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে; বহর দুই পরে ওকালতি
আরম্ভ করিলেই চলিবে। সে পিতাকে বুঝাইয়া দিল
যে, ওকালতি করিতে হইলে যাত্রা ফীরের টাকা সংগ্রহ
করিলেই চলিবে না; আরও অন্ত্যস্ত অনেক খরচ আছে।
কতকগুলি আইনের পুস্তক কিনিতে হইবে; তাহা
সম্বলিত করিয়া রাখিবার জন্য দুইটা আলমারী আবশ্যক;
একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও পাঁচ ছয় থানা চেয়ারও
কেনা দরকার হইবে। বলা বাহুল্য, ঐ সকল মূল্যবান
গৃহসজ্জার তিতর একটিকে, আশী টাকা বেতনের
কেরানীর গৃহশোভা বর্ধন করিত না; ঐ মজুর আর হইতে
তাহা ক্রয় করাও সম্ভবপর ছিল না। তাহার উপর,

রামপ্রাণ বাবু ভাবিয়া দেখিলেন যে, এই সকল গৃহসজ্জার
যাত্রা তাঁহার বাহিরের ব্যয়টি সম্বলিত করিবার আগে,
উহার উত্তমরূপ সংস্কার হওয়া আবশ্যক এবং তাহাতেও
অর্থব্যয় আছে।

অতএব পুত্রের অধিক বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া, তিনি
সেই সুবুদ্ধিই গ্রহণ করিলেন। ছিন্ন হইল, প্রথমে
চাকরী গ্রহণ করাই সুবুদ্ধি। তিনি সুবুদ্ধি পুত্রের উপযুক্ত
চাকরীর অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এসময়ে
তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন, তাহার আকিসের বড়
সাথের।

ইত্যবসরে সুবুদ্ধি পুত্রও নিশ্চেষ্ট ছিল না। সে
আকিসে আকিসে চাকরীর সন্ধানে ফিরিল; সংবাদপত্রে
বিজ্ঞাপন দেখিয়া, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও প্রোফেসর
গণের বিশেষ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া, তাহার নকল
সহ, নানা স্থানে দরখাস্ত করিল; তা ছাড়া প্রতিযোগিতায়
পরীক্ষা দিয়া উচ্চ বেতনের সরকারী চাকরী পাইবার
চেষ্টাতেও রহিল।

রামপ্রাণবাবু ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, তাঁহার
তেমন পুত্রের চেষ্টা যেন সকল হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভূতদর্শন।

যখন চাকরীর চেষ্টা চলিতেছিল, সেই সময় একদিন
বায়ুসেবন ও সিগারেটের ধূম উদ্গিরণ করিবার
অন্ত, জ্যোতিঃপ্রকাশ, কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত,
‘ইডেন গার্ডেনে’ বেড়াইতে গিয়াছিল।

তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে একটি যুবকের নাম রমেশ-
চন্দ্র মজুমদার। আমরা রমেশের এতটুকু বিশেষ পরিচয়
দিতে চাই। রমেশের কাপড় বা জামায় জ্যোতিঃ-
প্রকাশের মত পারিপাট্য ছিল না, বিস্তার তেমন
দোড় ছিল না, এবং এসেলেও তেমন সৌরভ
ছিল না; অধিক কি, এসেলে যাত্রা সম্বলিত করিবার
অন্ত তাহার পকেটে ক্রমালই ছিল না। সার্টিফিকেট

পৰ্য্যন্ত সে জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত একসঙ্গে পড়িয়াছিল। ইহার পর রমেশের শিক্তিবিয়োগ হয়; কাৰ্য্যেই জ্যোতিঃপ্রকাশ বন্ধ উচ্চ শিক্ষার প্রাথমিক পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল, রমেশ তখন না সন্তোষীয় কৃপার বঞ্চিত হইয়া, তাহার নিকট বিদ্যার লইয়া, এক দালালের আফিসে একটি জিশ টাকা বেতনের মুছরীর কার্য্য লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ছুইজনের পক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল—অর্থাৎ একজন উচ্চ শিক্ষার মার্জিত মার্গ এবং অল্পজন সংসার প্রতিপালনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কর্দমবর পথ অবলম্বন করিয়াছিল। আমাদের মার্জিত রুচি জ্যোতিঃপ্রকাশের সাবান চর্চিত জুমাঙ্কিত দেহ কোমল; রমেশের অমার্জিত দেহ কিছু কর্কশ, কিন্তু তাহার প্রশস্ত বসে এবং পেঙ্গি-বহুল বাহুতে সে বিলক্ষণ বল ধারণ করিত। সুগন্ধি-উৎসমিত জ্যোতিঃপ্রকাশের কেশ-কলাপ আধুনিক রুচি অনুযায়ী কর্তিত হইয়া, সদাই বুদ্ধব-চিকণী-আদির ক্ষয়কারী টেরির ঘাঃ সুশোভিত থাকিত, রমেশের অসংস্কৃত কেশগুচ্ছ কখনও টেরির শোভার শোভিত হইবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু ছুইজনের শিক্ষা ও রুচি সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও, উভয়ের একই পাকার বাস বলিয়া, উভয়ের বাল্যের বন্ধুত্ব অক্ষুর ছিল। তাই অবকাশ পাইলেই, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন রমেশচন্দ্রে সুশিক্ষিত ও সুশোভিত জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত ‘ইডেন গার্ডেন’ প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে বাইত।

বাগানে প্রবেশ করিয়া, অপর বন্ধুসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল; কেবল রমেশ ও জ্যোতিঃপ্রকাশ একত্র রহিল। বাগানের ভিতরে এক পথের ধারে, একখানা লোহাসন খালি পাইয়া, তাহাতে তাহারা উপবেশন করিল। জ্যোতিঃপ্রকাশ সিগারেট খাইতে লাগিল; রমেশ ও রসে বঞ্চিত, সে সেই পথগত কোন কোনও পথিকের পরিচয় দিতে লাগিল।

দালালী ব্যবসার সংলিপ্ত থাকার, রমেশ-চন্দ্রের সহিত, জ্যোতিঃপ্রকাশের অপরিচিত, অনেক

লোকের আলাপ হইয়াছিল। সে এইরূপ লোকেরই পরিচয় দিতেছিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত সেই লোহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, রমেশচন্দ্রে প্রাথমিক এক অপরিচিত যুবককে দেখিল। যুবক একাকী ছিল না। তাহার সহিত-এক অষ্টাদশ বর্ষীয়া, সালকারা, সৌখীন পরিচ্ছন্ন-মণ্ডিতা ও সত্যা স্ত্রী বিচরণ করিতেছিল। রমেশ সেই যুবককে তাহাদের বেকের নিকট সমাগত দেখিয়া তাহাকে নমস্কার করিল। যুবকও ঈষৎ হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিল। কিন্তু কেহ কোনও বাক্যবিনিময় করিল না;—রমেশ জানিত, কোন অপরিচিতা মহিলা সঙ্গে থাকিলে, পরিচিত লোকের সহিত তখন বাক্যালাপ করা, সত্যতাবিরুদ্ধ কার্য্য।

যুবক, যুবতীর সহিত, পথ অভিক্রম করিয়া, প্রাণ পথের বাহিরে চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, “লোকটা কে হে?”

রমেশচন্দ্রে বলিল, “দামাদের দালাল বাবুর সঙ্গে আলাপ আছে;—ওর নাম, কৃষ্ণকমল রায়।”

জ্যোতিঃপ্রকাশ কর্ণধর ঈষৎ নিঃস্বাস করিয়া কহিল, “সঙ্গে মেরেটি কে?”

রমেশ বলিল, “তুনেছি, ও কৃষ্ণকমলের কি রকম বোন হয়;—ওর নাম জ্যোতির্ময়ী।”

জ্যোতিঃপ্রকাশ সেই তরুণীর দিকে একবার বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, জ্যোতির্ময়ীই বটে!—যেন গমনশীলা দীপশিখা উদ্ভানপথ আলো করিয়া চলিয়াছে, যেন চন্দ্রদীপ্তি বজ্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, মর্ত্যভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে, যেন বিজ্ঞান বলে ভড়িৎ-আলোকে মানবপ্রতিমা গঠন করা সম্ভবপর হইয়াছে! জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্ময়ীর রূপ-জ্যোতিতে আত্মহারা হইয়া গেল।

রমেশ বলিয়া বাইতে লাগিল, “ও বেথুন কলেজে পড়ে। গেল বছরে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাস হয়ে বৃত্তি পেয়েছে। ও কৃষ্ণকমলের বাড়ীতে থাকে না, ওদের আলাদা ভেতলা বাড়ী বাড়ী

আছে; ও সেইখানে ওর মায় সঙ্গে থাকে।”

জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্শরীর উজ্জল রূপ চিত্তা করিতে করিতে, প্রথম সূর্য্যের দিকে তাকাইলে মাহুব যেমন তিমিতনেত্র হইয়া যায়, তেমনই তিমিত নেত্র হইয়া গিয়াছিল। সে তিমিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, “ওর বাপ কি করেন?”

রমেশ বলিল, “ওর বাপ নেই; অনেক দিন আগে মারা গেছেন। ওনেছি, তিনি অনেক টাকার কোম্পানির কাগজ বেখে গেছেন; তাতেই ওদের বেশ স্বচ্ছলে সংসার চলে।”

জ্যোতিঃপ্রকাশ বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার বুঝি ওদের সঙ্গে খুব আলাপ আছে?”

রমেশ বলিল, “মোটাই আলাপ নেই।”

জ্যোতিঃপ্রকাশ তেমনই তিমিত নেত্রে ও বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি ওদের এত খবর জানলে কি করে?”

রমেশ বলিল, “কিছুদিন আগে কৃষ্ণকমলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তারপর, চার পাঁচ দিন আমি মেয়েটিকে কৃষ্ণকমলের সঙ্গে বেড়াতে দেখি। প্রথমে মনে করেছিলাম, উভয়ে ঃগরী প্রণয়িনী কিম্বা নব-বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ। তারপর, বুঝলাম সেটা আমার ভুল। একদিন কৃষ্ণকমল আপনা হ’তে আমাকে মেয়েটির সকল পরিচয়ই দিলে; তখন বুঝলাম মেয়েটি কৃষ্ণকমলের ভগিনী। কৃষ্ণকমল মেয়েটির বাড়ীর ঠিকানা বলে দেওয়ার, আমি একদিন রামবাগানে গিয়ে, বাইরে থেকে, ওদের বাড়ী দেখে এসেছি;— চন্দ্রকার বাড়ী! দরজার দ্বারবান আছে।”

জ্যোতিঃপ্রকাশ তেমনই বিজড়িত কণ্ঠে ও তিমিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, “দ্বারবান কেন?”

রমেশ বলিল, “বাড়ীতে কেবল ছটি মেয়ে মাহুব থাকে; পুরুষ কেউ নেই। তাই বোধ হয়, চোর তাকাতের ভয়ে দ্বারবান রেখেছে।”

জ্যোতিঃপ্রকাশ আর কোনও প্রশ্ন করিল না। তিমিত নেত্রে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

রমণীর রূপাধির তেজে বধন তোমাদের লোনে নিশ্চয় হইয়া বাইবে, তখন তোমরা সত্যক হইও—কেন না, সেই নিস্তেজ নরন পথেই অনেক সময় পাপ আশাদের দোহাত্যন্তরে প্রবেশ করে। এই জন্তই সাধকপ্রবর বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর আজগের তোপবিলাস লালসা বিসর্জন দিয়া ভগবানের পদে শরণ লইবার আগে, আপন অসংবত লোচনদ্বয়ে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া অন্ধ হইয়া-ছিলেন। আমাদের দুর্জলচিত্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ সময়ে আপন চিত্ত দমন করিতে পারিল না। তাহার সেই অসত্যক লোনে পথে—পদ প্রকালনের ক্রটি অবলম্বন করিয়া, ক্রুর শনি দেবতা যেমন নিশাপ নলরাজের ঘেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—তেমনই জ্যোতিঃপ্রকাশের সাখান জ্বালিত শরীরাত্যন্তরে পাপ প্রবেশ করিল।

কিন্তু আমরা করিতেছি কি? একটি তিমিত নেত্র ও বিজড়িত কণ্ঠ, পাপপ্রসূ যুবকের কথা, এবং তাহার সহিত একজন অর্দ্ধশিক্ষিত দালালের সুহৃদীর উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের উপভাসের আত্মশকে কৃষ্ণ মেঘ-সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছি। আমরা তুলিয়া গিয়াছি যে, উপভাসের প্রধান উপাদান যুবক যুবতী, মধুর প্রেমকথা, এবং ততোধিক মধুর, আলিঙ্গন ও চুম্বন। আমরা এ সকলের অবতারণা করিতে পারি নাই। তথাপি আমাদের আশা আছে; যেখ বদি উদিল, তবে তাহাতে বিদ্যাদ্বিতা বিকশিত হইবার আশা আছে। এই দামিনী বিভার বিকাশ দেখিবার জন্ত, এস আমরা জ্যোতির্শরীর ও কৃষ্ণকমলের অনুসরণ করি। তোমাদের নাসারুদ্ধে, তাহাদের বসনাজলিগু অঙ্গদ্বি ত্রব্যের সৌরভ প্রবাহিত হউক, তোমাদের কর্ণে সুন্দরী, যুবতী ও বিদ্বতী জ্যোতির্শরীর বিভূত ও ললিত বাগ্যাবলী, নিদ্রাস্তপ্ত ধরণীর গাজে, বর্ষার প্রথম দৃষ্টিপাতের ভার, বর্ষিত হউক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রেমলীলা।

মধুর সন্ধ্যাকালে, ইডেন উদ্যানে বৈহিতিক আলোক

মালা অসিরা উঠিয়াছিল; মলয় যাক্ত গঙ্গার জীবৎ উদ্ভীলানন্দ বক্ষ্য ল্পর্শ করিয়া শীতল হইয়া বহিতেছিল। তথায় অসংখ্য পোত সকল একে একে আলোকমালায় ভূষিত হওয়ার, গঙ্গাবক তাসমান নগরীর ভায় প্রতীতমান হইতেছিল; উভানে আলোকিত বাস্তবকে ইংরাজি বাস্তবনি ইংরাজি শিক্ষিত বঙ্গবাসীর কর্ণে, জিহ্বিব সংগীতের ভায়, বহুত হইতেছিল; উভান, নানাবর্ণ পুষ্পতরে বেন হাসিয়া, লুটাইয়া পড়িতেছিল; অবস্তার আকাশে চাঁদ উঠে নাই; কিন্তু তারাদল আকাশদানে হেলিয়া ছলিয়া জড় হইয়া বড় হাসি হাসিতেছিল,—পুরুষ অতিভাবকের অগোচরে উৎসবোৎসাহ সীমন্তিনীপণ, বোধ হয়, এমনি হাসি হাসিয়া থাকে; উভানই প্রস্থানদায়ে সৌরভ ছিল না, কেবল রঙের বাহার; কিন্তু উভান-সমাগত নরনারীগণের গাভ্রবসন হইতে, বসনলিপ্ত স্নগন্ধি জব্যের সৌরভে উভান বেন উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই আলোক মালা, এই শীতল পবন, এই সজীবোচ্ছ্বাস, এই শোভা, এই সৌরভ সকলই যুবক যুবতীগণের প্রেমবর্দ্ধনের উপকরণ। এই উপকরণ বেষ্টিত হইয়া জ্যোতির্পরী উভানস্থিত এক নিভৃত বেকে বসিয়া ছিল; যুবক কৃষ্ণকমল তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিল। প্রেমবর্দ্ধনের উপকরণের মধ্যে থাকার, জ্বরমধ্যে প্রেম বর্দ্ধিত হইতেছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু উভারেই নীরব। সেই প্রেমরাজ্যে তাহার একা রাজা রাণী; জন কোলাহল সেই নিভৃত প্রদেশে আসিয়া শান্ত হইয়া বাইতেছিল; আলোকরাশি তথায় প্রতা বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার কথা কহিলে তাহা কেহ শুনিতে না; তাহাদের প্রেমলীলা সেই নিম্প্রভ আলোকে কাহারও নরনগোচর হইত না। তবে তাহার নীরব কেন? এ নীরবতার অবস্তাই কোনও কারণ থাকিবে। আমরা শুনিয়াছি, যুবক যুবতী বধন একত্রে নিভৃত বসিয়া বাক্য-কথনে বিরত থাকে, তখন তাহাদের প্রাণে প্রাণে, প্রাণের কথার বিনিময় হয়,—কল্প-ঠাকুর তাহাদের কাণে কাণে

যে মধুর কথাগুলি কহিয়া থাকেন, তাই তাহার নীরবে বসিয়া বসিয়া শুনে।

কৃষ্ণকমল রম্যকে মিথ্যা বলিয়াছিল। সে ভগিনী বলিয়া, জ্যোতির্পরীর পরিচয় প্রদান করিলেও, এবং জ্যোতির্পরী তাহাকে “কৃষ্ণকমল দাদা” বলিয়া সম্বোধন করিলেও, প্রকৃত পক্ষে, উভরে উভরের কেহ নহে; তাহাদের কোনও শোণিতসম্পর্কই ছিল না। কেবল তাহার বাল্যকাল হইতে পরস্পরের পরিচিত ছিল। এক্ষণে যৌবন সমাগত হওয়ার, পরিচয়টা ক্রমে ধনীভূত হইয়া প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল জ্যোতির্পরীকে কেবল মাত্র প্রেম সম্বোধন করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না; পরন্তু তাহাকে বিবাহ করিবার ভ্রমও ব্যর্থ ছিল। জ্যোতির্পরীও তাহার কৃষ্ণকমল “দাদা”র গলে বরমালা দিবার ভ্রমও ভ্রান্ত ছিল।

তবে তাহাদের বিবাহ হইল না কেন? তাহাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য ছিল কিনা, আমরা তাহা অবগত নহি। কিন্তু তাহার ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন, কেবল মাত্র জাতিগত পার্থক্য তাহাদের বিবাহের পথে অন্তরায় হয় নাই। জ্যোতির্পরীর মাতাই এ বিবাহের প্রধান বির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কি আমি কেন, তাহার সত্যতা-আলোকে আলোকিত মর্মমধ্যে একটা কুসংস্কার থাকিয়া দিয়াছিল; তিনি বলিতেন, উচ্চ শ্রেণীর অখট সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক পাইলে, তিনি তাহারই সহিত কস্তা জ্যোতির্পরীর বিবাহ দিবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত সেইরূপ বিবাহকারী কোন ব্রাহ্মণ না পাওয়ার, কস্তার বিবাহ দিতে পারেন নাই। ইত্যবসরে কৃষ্ণকমল ও জ্যোতির্পরী এবং তাহাদের প্রেমও অলস ছিল না; প্রেম তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। এবং তাহারাও গোপনে বিবাহ করিবার ভ্রম প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু গোপন বিবাহের শুভ সংবাদটা অকালে প্রকাশ হইয়া পড়িল। মাতাঠাকুরাণী স্পষ্ট তাহার দৃঢ়বরে বলিলেন যে, জ্যোতির্পরী যদি তাহার অমতে গোপনে কৃষ্ণকমলকে বিবাহ করে, তবে সে তাহার সমুদয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে; তিনি

লেখা-পড়া করিয়া তাঁহার সম্পত্তি হীসপাতালে দান করিয়া বাইবেন। জ্যোতির্শ্রী মাতার স্পষ্ট কথা বুঝিত; সে কৃষ্ণকমলের সমস্ত প্রেমের জন্ত, এই ত্যাগ স্বীকার করিতে রাজি ছিল না। কৃষ্ণকমলের প্রেমটাও জ্যোতির্শ্রী অপেক্ষা জ্যোতির্শ্রীর সম্পত্তির প্রতিই অধিক ছিল, সুতরাং সেও আর ক্রোধান্বিত করিল না। এইরূপ অবস্থায় জ্যোতির্শ্রী, মাতার অগোচরে কৃষ্ণকমলের সহিত উত্তান ভ্রমণে আসিয়াছিল।

অমানিশার অন্ধকারঘরী সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া জ্যোতির্শ্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিল; মৌনব্রত অথবা প্রেমের বশ তল করিয়া কৃষ্ণকমলকে কহিল, “চল, সন্ধ্যা হ’য়ে গেল, বাড়ী কিরে বাই।”

কৃষ্ণকমল মিনতির স্বরে বলিল, “আর একটু বস; এই ত সাতটা বাজল।”

জ্যোতির্শ্রী শঙ্কিতা হইয়া কহিল, “না, না, এখনই আমাকে কিরতে হ’বে। একেই ত সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা, মা মোটেই পছন্দ করেন না; তার পর, যদি জানতে পারেন যে, তোমার সঙ্গে বাগানে বেড়াতে এসেছি, তাহলে একবারে অনর্থ করবেন। আগেই ত বলেছি যে, তিনি অমাবস্তার কালীঘাটে কালীর আরাতি দেখতে গেছেন; তাই ক’ক পেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছি।”

কৃষ্ণকমল কহিল, “কালীর আরাতি এখনও শেষ হ’তে দেয়ী আছে। আর একটু বসলে, কিছু হবে না। তোমার মা দেখছি, পৌত্তলিকতা মানে।”

জ্যোতির্শ্রী একটু হাসিয়া বলিল, “মা সুবিধা মত সবই মানেন,—কালীঘাটেও পূজা দেন, ব্রাহ্ম সমাজেও টাকা দেন; যেরকম জীসাবীনতা খেদান, আর তার বিয়ের বেলা কুলীন বাহন খোঁজেন। কিন্তু আমি আর বসব না; বড় দেয়ী হয়ে গেছে।”

কৃষ্ণকমল অগত্যা উত্তীর্ণা দাঁড়াইয়া, জ্যোতির্শ্রীর কোমল অলঙ্কৃত হস্ত ধারণ করিল। জ্যোতির্শ্রী কৃষ্ণকমলের দিকে, তড়িত আলোকের চেয়ে উজ্জল,

কটাক্ষপাত করিয়া জীবৎ হাসিল; এবং উত্তীর্ণা দাঁড়াইল।

জ্যোতির্শ্রীদের একথানা সুদৃষ্ট ল্যাণ্ডো ও একটা কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ বোড়া ছিল। কিন্তু তাহা লইয়া, তাহার মাতা কালীঘাটে আরাতি দেখিতে গিয়াছিলেন। এজন্য সে একথানা ট্যান্ডি ভাড়া করিয়া কৃষ্ণকমলকে লইয়া বাগানে আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ট্যান্ডিতে আসার, কৃষ্ণকমলের সহিত একজনে পরিভ্রমণের বিবরণ গোপন রাখা সম্ভবপর হইয়াছিল।

বাগানের পেটের বাহিরে অনেক ট্যান্ডি দাঁড়াইয়া ছিল। তথায় আসিবার জন্ত উত্তরে পাশাপাশি ভ্রমণ করিয়া, তাহার উত্তানপথ অতিক্রম করিতে লাগিল। কৃষ্ণকমল বলিতেছিল, “তালবাসলে, তুমি তোমার মার কথা শুনতে না; জোর করে’ আমাকে বিয়ে করতে।”

জ্যোতির্শ্রী মিষ্ট কথার বুঝাইয়া বলিল, “তাহলে মার কোম্পানির কাগজগুলো আমাদের হাতছাড়া হ’য়ে যেত। সেটা বুঝির কাব হত না। আমাকে তুমি খাওয়াতে কি? তোমার নিজেরই খরচ চলত কিসে? তুমি বেশ করে বুকে দেখ, মা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন, তালই হ’ক আর মন্দই হ’ক তাঁর অমতে আমাদের কোন কাব করা, কিছুতেই চলবে না; আর তাঁকে না চাট্টিয়ে তাঁর মতে চলাই আমাদের সুবিধা-জনক। তার পর টাকাগুলো একবার হাতে পেল, তখন তুমিও রইলে আর আমিও রইলাম, আর আমাদের তালবাসাও রইল; তখন আর কেউ আমাদের ছাড়াছাড়ি কর্তে পারবে না। তখন নির্ঝিড়ে তুমি আমার হবে, আর আমিও তোমার হবে।”

কৃষ্ণকমল মুগ্ধ হইয়া বলিয়া ফেলিল, “আর, তোমার টাকাও আমার টাকা হবে।”

জ্যোতির্শ্রী বলিল, “হবে বই কি! আমিই এখন তোমার হ’ব, তখন আমার টাকাকড়ি বর বাড়ী সবই তোমার হ’বে।”

কৃষ্ণকমল কহিল, “বুড়ী এখন শীত মরলে হয়।

শরীরের যে তোমার, তাতে কখনও যে মরে তা'ত মনে হয় না।”

জ্যোতির্শ্রী শঙ্কিত নরনে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, “ধবরদার! ও কথা আর বুখে এনো না। না যদি যুগান্তের জানতে পারেন, তা’লে তোমার আর আমার একেবারে সর্বনাশ; না কি রকম তরানক লোক তা ত ভুনি জান না।”

কুককমল কহিল, “জানতে চাইনা। Eat drink and be merry;—তোমাকে আর তোমার টাকা জলোকে পেলেই হ’ল। ভাল কথা মনে হয়ে গেল, আমার টাকার কিছু টানাটানি পড়েছে। আমাকে গোটা দশেক টাকা ধার দিতে পার?”

জ্যোতির্শ্রী জানিত কুককমলের এমন টানাটানি প্রায়ই পড়িয়া থাকে; এবং ঋণ বলিয়া বাহা সে গ্রহণ করে তাহা পরিশোধ করিতে কখনই তাহার মনে থাকে না। তথাপি সে বলিল, “দশটা টাকা ত সঙ্গে আনিনি। বোধ হয় সাত আট টাকা ব্যাগে আছে।”

কুককমল তাকাভাঙি বলিল, “বা আছে তাই বাও।”

জ্যোতির্শ্রী ব্যাগের সবুহর অর্ধ কুককমলের অঙ্গলিতে চালিয়া দিল।

কুককমল আনন্ডিত হইয়া তাহা আপন পকেটে পুরিয়া, প্রণয়িনীর কৃত ধরিয়া ট্যান্ডিগুলির দিগে অগ্রসর হইল। এবং একখানির নিকটস্থ হইয়া, অগ্রে জ্যোতির্শ্রীকে উঠাইয়া দিল; পরে নিজে উঠিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, তাহার সুকোমল গায়ে স্পর্শরূপ অমৃতব করিতে লাগিল।

ট্যান্ডি ছুটল। পশ্চিমার্শ্বে এক স্থানে কুককমলকে নামাইয়া দিয়া জ্যোতির্শ্রী অদূরবর্তী আপন আলয়দ্বারে উপস্থিত হইল। তখন সে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমেই অহুসন্ধান লইয়া জানিল যে, মাতা তখনও ফিরেন নাই। পরে সে দৃষ্ট পাদবিক্ষেপে সত্তর উপরে উঠিয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিল; এবং বাস্ত্র খুলিয়া টাকা লইয়া, ভূতা হস্তে ট্যান্ডি-তাক্কা পাঠাইয়া দিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

দর্শন

(রাধানগরে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ১৫শ অধিবেশনে দর্শন-শাখা-সভাপতির অভিভাষণ)

জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই মানুষ সত্যের সন্ধানে কিরিতেছে। মানুষের চেষ্টা কোনও অনির্দিষ্ট প্রেরণার কলে সর্বদাই সত্যকে ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমরা বাহা জানি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করি; বাহা জানি, তাহাও ভাল করিয়া জানিবার জন্য ব্যগ্র হই। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ প্রতিনিয়ত আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে এবং প্রতিনিয়ত আমরা কিছু না কিছু জানিতে পারিতেছি। এই সকলের সন্নিবর্তন হইতে যে

জ্ঞান-লাভ হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। চক্ষুর দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই শুধু প্রত্যক্ষ নহে; শ্রোত্রিয়ের দ্বারা, শ্রবণ, জিহ্বা ও ঘ্রকের দ্বারা যে জ্ঞান অগ্রে তাহাকেও প্রত্যক্ষ বলা হয়; বসিও তাহাতে আক্ষি বা চক্ষুর ব্যাপার কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার প্রায় দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ চক্ষুর সাধ্য। শুধু তাহাই নহে, চক্ষু বটত জ্ঞান অন্যান্য ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুস্পষ্ট, সুদূরব্যাপী ও বিশ্বস্ত। সাধারণ দৃষ্টিতে

অজ্ঞানান্যের তুলনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষাকৃত অবিসংবাদিত, সেই জন্যই ইজির-গোচর জ্ঞান যাকেই প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজিতেও observation শব্দটি ইজির-প্রাক জ্ঞান নামে প্রযুক্ত হয়।

‘দর্শন’ শব্দের অর্থও জ্ঞান লাভ করা। সত্যের সাক্ষাৎকারের নাম দর্শন। সে সত্যের স্বরূপ বাহাই হটক না, যে জানে তাহা প্রতিকলিত হয় তাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সত্যের প্রকাশ কবিকল্পনার বিষয় নহে, তর্কজালের দ্বারা রচিত কোনও মতবাদ মাত্র নহে। সত্য বখন কাহারও চিত্তপটে প্রতিকলিত হয়, তখন তাহা সমস্ত আশঙ্কা-সংশয়ের অন্ধকারগাশি বিনাশ করিয়া আলোকের মত, জ্যোতির মত, সূর্যের মত প্রকাশিত হয়।

এব সপ্তসাদোহ্মাৎ শরীরং সুখার পরং জ্যোতি-
রূপম্পন্নং যেন রূপেণ অভিনিপ্ততে।—ছান্দোগ্য।
ওচ্ছত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।—মুণ্ডক।

সেই জন্য ঐশ্বর্য সত্যের উপলব্ধি করিতেন তাঁহাদিগকে এদেশে ঋষি বা মন্ত্রের দ্রষ্টা বলা হইত; ইয়ুরোপে বলিত “Seer.” সেই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধিকে ‘দর্শন’ বলা হয়।

Philosophy অর্থে ‘দর্শন’ শব্দটি আমাদের দেশে খুব প্রাচীন নহে। কিন্তু সত্যের সাক্ষাৎকার যে প্রাকৃত দৃষ্টিরই মত, ইহা আর্ধ্যদিগের অতি প্রাচীন ধারণা। তত্ত্বজ্ঞান ইজিরসাধ্য নহে, তাই উপনিষদ্ বলেন আত্মা দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন।

মনোহস্ত দিব্যং চক্ষুঃ

ইহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় জ্ঞানযোগী মহাশেখের তৃতীয় নয়ন কল্পিত হইরাছিল। সেই জ্ঞান-নয়নের জ্যোতিঃ অগ্নিঅগনের ন্যায় মদনকে ভস্ম করিয়াছিল। জ্ঞান বিনা কামকে ভস্ম করিতে পারে এরূপ সাধ্য আর কিছুই নাই।

তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে দর্শন শব্দের প্রয়োগ আমরা ক্রটিতে দেখিতে পাই :

‘আত্মা’ বারে দ্রষ্টব্যো শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যম্।

আত্মাকে দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, ধারণা করিতে হইবে এবং ধ্যান করিতে হইবে।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ মন্তব্যঃ চোপপত্তিভিঃ।

যথা চ সততং ধ্যেয়ং এতে দর্শনহেতবঃ।

উপরিউক্ত প্রাচীন ক্রটি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, দর্শন শব্দের ভৌতনা প্রাচীন কাল হইতেই কোন্ দিকে রহিয়াছে। উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ হইতেও আমরা এই অর্থই প্রাপ্ত হই। আত্মা চিত্তবৃত্তাব বা চৈতন্তময়। চৈতন্ত্যের দ্বারা চৈতন্ত্যের উপলব্ধি এসিদ্ধ। চক্ষু শরীরের অংশ মাত্র সুতরাং জড়ের দর্শনবিধিষ্ট। সুতরাং চক্ষুর ব্যাগার যে দর্শন, তাহা আত্মাতে প্রযুক্ত হইবে কি প্রকারে? আত্মদর্শন একটি অসাধারণ ব্যাগার হইলেও, তারতীয় আর্ধ্যগণের নিকট ইহাই পরম সত্য বলিয়া উপগম্য হইয়াছিল।

প্রাচীন কালে তত্ত্ব জ্ঞানকে ‘বিজ্ঞা’ বলিয়া উল্লেখ করা হইত। বিদ্ বাতুর অর্থ জ্ঞান। আমরা এখনও তত্ত্ববিজ্ঞা, খনিজ বিজ্ঞা, ধর্মবিজ্ঞা অধ্যাপ্যবিজ্ঞা প্রভৃতি শব্দ কখনও কখনও ব্যবহার করিয়া থাকি। জ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা আছে যথা আত্মবিকী, দণ্ডনীতি ইত্যাদি। জ্ঞানের মূল কাণ্ডের নাম বেদ। বাগ্মতে পরম তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাই বেদ। আধুনিক ভাবার পারিতোষিকভাবে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, সত্যজ্ঞান প্রভৃতি শব্দের প্রচলনের চেষ্টাও দেখিতে পাওয়া যায়।

দর্শন ও PHILOSOPHY

Philosophy শব্দটি আমাদের অনেকের নিকট অপরিচিত। ইহার মূল অবস্ত্র গ্রীস দেশে। হিরোডোটস লিখিয়াছেন যে ক্রিসাস্ (Croesus) এবং সোলন (Solon) এর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ক্রিসাস্ বলিতেছেন যে তিনি পূর্বে হইতেই সোলনের নাম

জ্ঞাত আছেন। গোলন যে, জ্ঞানের লোভে (Philosophising) নানা দেশ পর্যটন করিয়াছেন তাহাও তিনি স্মরণাছেন। লোভে দেশ পর্যটন করিতে যায় ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে, অর্থের অথবা চাকরীর চেষ্টায়। সুতরাং কেহ যখন শুধু জ্ঞানার্জনের জন্ত বিদেশ পর্যটনে যায়, তখন তাহাকে নিঃস্বার্থ বা অর্থহীন জ্ঞান-লিপ্সাগ্রণোদিত বলিতে হয়। ইহাই পাশ্চাত্য জগতে কিলজকি কথার মূল। কথিত আছে, গাইথোগোরস আপনাকে কিলজকিস্ অর্থাৎ জ্ঞানানুরাগী বলিতেন, 'জ্ঞানী' এ কথা বলিতেন না। এই কথাটির মধ্যে একটু তাৎপর্য আছে—তত্ত্বজ্ঞান যে নিঃস্বার্থতা-প্রণোদিত, ইহাই ঐ পারিতোষিক শব্দটির ইতিহাসে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের 'দর্শন' শাস্ত্র ঠিক নিঃস্বার্থতা হইতে ভিন্নগত করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ প্রচলিত দর্শনগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায়শঃ তাহাদের জন্ত পরমার্থ-চিন্তন হইতে। পূর্ব য়োনাংসা ব্যতীত অন্য দর্শন গুলির উদ্দেশ্য যে মোক্ষ-লাভ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। মোক্ষকেই প্রাচীন ধর্মগণ পরম পুরুষার্থ বা 'নিঃশ্রেয়স্' (অর্থাৎ বাহ্য অপেক্ষা আর কিছু শ্রেয়ঃ নাই (summum bonum) এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ একটি পারমার্থিক বা পারলৌকিক প্রয়োজন থাকার অন্তর্দেখে দর্শন শাস্ত্র ধর্মতত্ত্বের বা theolgyর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে ইউরোপের-মধ্যযুগে যেরূপ তুচ্ছদর্শনীয় দার্শনিক বিজ্ঞা ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া Church-এর কবলে পড়িয়াছিল, আমাদের দেশেও সেইরূপ ভাবে দর্শন শাস্ত্রের স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা ধর্মমতের দ্বারা ধর্ম হইয়াছিল। এই জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে আমাদের দেশের দর্শনকে কিলজকি পদের ব্যোপ্য মনে করেন না। পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিক চিন্তা অব্যাহতবৈয়গতি। ভগবৎতত্ত্ব, পরলোকবাদ, জ্ঞান স্বতির দ্বারা তাহার প্রণালী সীমাবদ্ধ নহে।

আমাদের দেশে দার্শনিক বিজ্ঞার যে স্বাধীনতা ছিল না, তাহা আমি স্বীকার করি না। লোকায়ত, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তত্তৎকালের মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, যে সকল দার্শনিক মত আমরা সর্বদর্শন সংগ্রহে প্রাপ্ত হই, তাহা বহুকালের প্ৰবেষণের ফল। তাহাদের ক্রম-বিবর্তন অল্প দিনে হয় নাই। ঐ সকল মত গঠিত হইবার জন্য শুধু যে দীর্ঘ কালের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা নহে; সমাজ দোষ, রাষ্ট্রনীতিতে ও ধর্মজগতেও যে নানা ভাববিপর্যয় ঘটিয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ।

বাহাই হউক, জ্ঞানের জন্ত জ্ঞানলাভ করিবার যে চেষ্টা, সত্যের জন্ত সত্য উদ্ধার করিবার যে সংকল্প, তাহা সর্বতোভাবে প্রশংসার্হ। পাশ্চাত্য জগতের তত্ত্ববিজ্ঞার আলোচনার এই যে নিঃস্বার্থতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অশেষ কল্যাণের আকর হইয়াছিল। ইহার ফলে সে দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের অবাধ প্রোত প্রবাহিত হইয়া মানব মনকে উন্নতির পথে বহুদূর লইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের যে মোক্ষবাদ, ইহারও অমূল্যে বলিবার অনেক কথা আছে। আমরা সুখে বাহাই বলি না কেন, আদর্শ হিসাবে বেরূপই সিদ্ধান্ত করি না কেন, কার্য্যক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত যে, জ্ঞানলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার অন্তরালে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রত্যেক কার্য্যই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত। জ্ঞানলাভ ক্রিয়ারও একটি উদ্দেশ্য থাকিবেই। অর্থোপার্জনই হউক, আর ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠাদিই হউক, কোনও না কোনও উদ্দেশ্য বর্তমান থাকিবেই। বেকন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে জ্ঞানই শক্তি। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা জগতের উপর কর্তৃত্ব করিবার শক্তি ভাঙে। সেই শক্তির ফলে আজ মানব নিত্য নূতন জ্ঞানের আহারে নিযুক্ত আছে এবং এই জ্ঞানের দ্বারা

সে প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে সংহত, নিয়ত করিয়া নিজের কার্যে লাগাইতেছে। বিদ্যাকে দিয়া সে কল চালাইতেছে, পাখা ঘুরাইতেছে, বাতি জ্বলাইতেছে, দূর দূরান্তরে সংবাদ বহন করিতেছে। জল বায়ু পৃথিবী মহন করিয়া নব নব নিয়মের আবিষ্কার দ্বারা সে জগতের উপর আগনার প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আর্য্য ঋষিগণ এই সকল আগতিক ব্যাপার হইতে তত্ত্বজ্ঞানকে বিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য কোনও হীন, তুচ্ছ, সংকীর্ণ স্বার্থ-প্রাপ্তি নহে। মানব জীবনের চরম কল্যাণ, আত্মার পরম প্রয়োজনের চেষ্টায় তাঁহারা 'দর্শন'কে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলেন। পার্থিব আকাজকে তুচ্ছ করিয়া যে তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তা প্রণালী পরম পুরুষার্থে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাও কম নিঃস্বার্থতার পরিচায়ক নহে।

একপে দেখা বাউক, তাঁহারা মোক্ষ বা মুক্তি বলিতে কি বুঝিতেন। হিন্দুদিগের মুখ্য বস্তু দর্শন পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা একত পক্ষে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। নীমাংসা, জ্ঞান বৈশেষিক ও সাংখ্য যোগ। নীমাংসা দর্শন পূর্ব্ব এবং উত্তর অথবা কর্ম্মনীমাংসা এবং তত্ত্বনীমাংসা এই দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্ম নীমাংসার আশ্রিত্যের উপদেশ পাওয়া যায় না। স্বর্গ প্রাপ্তির জন্ত কি প্রকারে বাগবদ্ধ করিতে হয়, তাহারই উপদেশ জৈমিনির ধর্ম্ম নীমাংসা বা কর্ম্ম নীমাংসার দেখিতে পাওয়া যায়। জৈমিনির মতে কর্ম্মই কল প্রদানে সমর্থ। ইহার জন্ত জীবনের অতিশয় যত্ন করার দ্বিবার প্রয়োজন হয় না।* এই পূর্ব্ব নীমাংসা তিন সকল দার্শনিক তত্ত্বের লক্ষ্য—মোক্ষ, মুক্তি বা অপবর্গ।

* যদিও নীমাংসিক ভাস্কর পূর্ব্ব নীমাংসার সংগ্ৰহে বলেন—

ঈশ্বরার্ণবদ্ব্য ক্রিয়মানস্ত নিঃশ্রেয়সবেভ্যঃ

অর্থাৎ ঈশ্বরার্ণব বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে, তাহাই নিঃশ্রেয়স—অর্থাৎ মোক্ষের কারণ হয়।

বাক্যই বলায়—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিভ্যজ্য মোক্ষধর্ম্মং সমাপ্রয়েৎ।

সর্ব্বৈ ধর্ম্মাঃ সদোবাঃ স্য্যঃ পুনরাবৃত্তিকারকাঃ ॥

জ্ঞান মতে—

অথ শাস্ত্রস্ত পরমং প্রয়োজনমপবর্গঃ।

মোক্ষই পরম প্রয়োজন।

কণাদ বলেনঃ—

যতোহিত্যদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।

ইহার ব্যাখ্যার শব্দর মিশ্র বলেন—

"নিঃশ্রেয়সমাত্যক্তিকী হঃখনিবৃত্তিঃ"

বিবৃত্তিকার বলেন—

নিঃশ্রেয়সং মোক্ষঃ"

সাংখ্য বলেন

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বং প্রধানবিনিবৃত্তৌ

ঐকান্তিকমাত্যক্তিকমুত্তরং কৈবল্যমাপ্রোতি।

কৈবল্য অর্থে—মোক্ষ। মোক্ষই পুরুষার্থ।

পুরুষার্থী মোক্ষত্বমর্থং জ্ঞানমিদং গুহ্যং মহত্ত্বং

ঐকপিলর্ষিণা সমাখ্যাতং (গৌড়পদ ভাষ্য)

যোগ দর্শনের লক্ষ্যও মোক্ষ বা কৈবল্য। অভ্যাসের দ্বারা দৃষ্টান্তশ্রবিক বিষয়ে অর্থাৎ ধন, ইচ্ছা জীপরিজন এবং স্বর্গাদি কাম্য বিষয়ে বিভূক্ত ব্যক্তি পুরুষ-দর্শন অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞান প্রসাদে পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন। তখন সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-শূন্য গুণের প্রলয় হইয়া আত্মা কেবল মাত্র চিত্ত শক্তিকে নিয়ত আধীন করেন।

পুরুষার্থ-শূন্যতায় গুণানাম্ প্রতিগ্রসবঃ কৈবল্যং

বরুণ প্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্তিরিতি (যোগসূত্র—কৈবল্য পাদ)

তুকাব্দর অনিত সুখের নিকট পার্থিব কোন ও সুখই দাঁড়াইতে পারে না।

বচ কামসুখং লোকে বচ দিব্যং মহৎ সুখম্।

তুকাব্দরসুখতৈতে মার্হতঃ বোড়শীং কলাম্।

সুত্তরং তুকাব্দর অনিত বৈরাগ্য লাভ করিতে

পারিলে, লোক ভীষ্মযুক্ত হইতে পারে। ঋতিও বলেন—“ভীষ্মের বিধান সুতো ক্রবতি।”

বেদান্ত আত্মকে মোক্ষ ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তদ্বিষ্ণুত্বমোক্ষোপদেশঃ (বেদান্ত সূত্র ১ম পাদ ৭ম সূত্র)

তদ্ব্যমসি যেহকেতো এই রূপ ঋতি হইতে আত্মার চিত্তস্বরূপতা ও অখ সংপৎস্তে ইত্যাদি হইতে প্রারম্ভ করানন্তর মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়।

অতএব আমাদের প্রধান আর্হদর্শন গুলিকে মোক্ষদর্শন বলিলেও অসত্য হয় না। বৌদ্ধ দর্শনে যে নির্কারণের আদর্শ আছে তাহাও এই মোক্ষেরই নামান্তর বলিয়া আমি মনে করি। অনাদিবাসনা-সন্তান নিবৃত্ত হইলে নির্কারণ লাভ হয়

রাগাদিজন্যসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্ভবা।

চতুর্নামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেবা প্রকীর্ষিতাঃ ॥

(সর্বদর্শন)

আর্হত দর্শনেও মোক্ষবার্ণ উপনিষ্ট হইরাছে। সকল প্রকার কর্ম নিঃশেষে কর প্রাপ্ত হইলে আত্মা নির্কারণ প্রাপ্ত হয়। কর্ম হইতেই বাবতীর ক্রেশ, কর্ম হইতেই সংসার; অম্মমুহুরা ক্রেশের নামান্তর। জ্ঞানের দ্বারা কর্ম ভঙ্গসাং হইলে আত্মা স্বাভির্ভুক্ত হোমানলশিখার ন্যায় উজ্জ্বল প্রদীপ করে।

সংসারের অনিত্যতা।

একদা এই বে তারতীর দর্শনের একান্ত কামনার বিষয় মুক্তি বা মোক্ষ, ইহার স্বরূপ কি? দর্শন গুলির মধ্যে অসংখ্য বিষয়ে যতই মতভেদ থাক, একটি বিষয়ে বেশ সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়,—সংসারের অনিত্যতা। এই অনিত্যতা-বুদ্ধি পাশ্চাত্য দর্শনেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটো ইহার একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁহার মতে এই দৃষ্টমান জগৎ মিথ্যা, অসার, ছায়াবাজী মাঝ। সত্যলোক জগতের পর

পারে কোথাও আছে। এই মরজগতে বলিয়া আমরা কখনও কখনও সেই অবলোকের কিছু কিছু আশা পাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় প্রাচ্যে এই অনিত্যতাবাদ এবং হুঃখান্বিততাবাদ বেক্রপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, পাশ্চাত্য দেশে সেক্রপ নহে। এ দেশের কাব্যে, দর্শনে, পুরাণে ইতিহাসে সর্বত্র এই অসারত্ব-বাদ প্রসার লাভ করিয়াছে। তাই মোক্ষের জন্ত এত আগ্রহ, এত ব্যাকুলতা।

আমরা মুক্তির প্রয়াসী। কিন্তু মুক্তি চায় কে, না, যে পরাধীন। আমরা এমন কোন পরাধীনতা ক্রেশ সহ্য করিতেছি, বাহা হইতে ছুটা পাইবার জন্ত এক্রপ হুঃখমণীর আকাঙ্ক্ষা। সাংখ্য বলিবেন, জগতের হুঃখরাশি আমাদেরকে অভিতুত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা ত্রিবিধ হুঃখের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পাইতে চাই। এমনভাবে পরিজ্ঞান চাই যে আর কখনও সে হুঃখ আমাদেরকে গ্রাস করিতে না পারে। হুঃখই বন্ধের হেতু।

পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞো হি ইষ্টাপূর্তকারী

কামোপহতমনা বধ্যতে। (তত্ত্ববোধিনী)

কামোহকামো চ কর্মণি হুঃখাং হুঃখং ভবতি।

(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

বাহা আমরা হুঃখ বলিয়া মনে করি, তাহাও হুঃখ। হুঃখভোগোহপি হুঃখভোগ এব। স্তবরাং হুঃখ হইতে বাহাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাই চিত্তনীর। এই হুঃখ-নিবৃত্তি-বাদ সাংখ্যও যোগ দর্শনের মূল কথা।

গৈন দার্শনিকেরাও বলেন—

কর্মণা নিরসনাদাত্যন্তিক কর্মমোক্ষণং মোক্ষঃ।

(সর্বদর্শন)

কর্ম ত্যাগ করিতে করিতে যখন আত্মাত্মিক কর্মক্ষয় হয়, তখন তাহাকে মোক্ষ বলে। কারণ কর্ম করিলেই অবশ্য তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

অবশ্যম্বেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম ভুতভুতম্।

কর্মের দ্বারা অর্জিত সকলই কর্মশীল। ঋতি: বলেন

বোধে কর্মচিন্তা লোক কীর্ত্তে অবশ্যবাহুত্ব
পুণ্যচিন্তা লোক কীর্ত্তে ।

সাংখ্য ও জৈন দর্শন হইতে আমরা কর্ম সম্বন্ধে
একটি জটিল দার্শনিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হই। অম্মমুহূর্ত্ত
সকলই কর্মের অধীন। কর্ম হইতেই চতুঃসুতরাং
কর্মের বিনাশ সাধন করাই দর্শনের প্রতিপাদ্য। ভাষ্য
দর্শনও বলেন—ন পুরুষকর্মাভাবে কলানিম্পত্তেঃ ।

কর্ম না থাকিলে কলও থাকে না। বৈদ্যগণ
বলেন যে কর্মের গতিক আত্মাতে এক প্রকার
শক্তি জন্মে; বাহার কলে আত্মা এই সংসারে
পুনঃ পুনঃ গেই সেই কর্মাক্রিয়ায় শরীর ধারণ করিয়া
প্রত্যাবৃত্ত হয়। আর্হত চিহ্নগণ সেই জন্ত সর্বতো-
ভাবে কর্ম পরিহার করাই চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ
করিয়াছিলেন।

কিন্তু কর্ম কেবল বাহিরের ব্যাপার। শরীরের বা
মাংসপেশীর কতকগুলি বিক্লেপের নাম কর্ম বহিত নয়।
সেই বিক্লেপের মূলে যে আভ্যন্তর ব্যাপার আছে,
তাহার বিনাশ না হইলে শুধু কর্মের বিনাশে কি হইবে?
জৈনেরা সেই জন্ত বলেন, চিন্তাওদ্ধি করিতে হইবে।
কর্মের বীজমাত্রও যেন না থাকিতে পারে, এমন করিতে
হইবে। এতদ্ব্যবস্ত্রে তাঁহারা তিনটি সাধনের নাম
করিলেন, তাহাদিগকে ত্রিবিধ বলে।

সমাগদর্শনজ্ঞানচারিভাষি বোদ্ধমার্গঃ

(সর্বদর্শন)

অর্থাৎ মোক্ষের তিনটি পন্থা সম্যক দর্শন, জ্ঞান এবং
সম্ভবিত্ব। সম্যক দর্শন ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য অনেক।
বুদ্ধি ও বোধির মধ্যে যে প্রভেদ, জৈনদের মতে সম্যক
দর্শন ও জ্ঞানের মধ্যে সেই প্রভেদ। একটি Intuition
অপরটি knowledge উভয়ই সাধন সাপেক্ষ। একটির
দ্বারা মনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্বের ক্ষুরণ হয়, অপরটি বুদ্ধি
ভর্য আণোচনার দ্বারা সিদ্ধ হয়।

বৌদ্ধেরা কর্ম অপেক্ষা বাসনার উচ্ছেদ সাধনে
বিস্ময়ান্বিত হইলেন। বাসনাই কর্মের মূল। কর্ম
সংসারের মূল। বাবতীর কর্ম পদম্পর্শের মধ্য দিয়া একটি

বাসনার সূত্র লব্ধিত রহিয়াছে। সেই বাসনার সূত্র
বতদিন বিনষ্ট না হইবে, ততদিন পুনঃ পুনঃ সংসারে
আসিতে হইবে। নিও-প্লেটনিক দার্শনিকগণের মধ্যেও
এইরূপ একটি তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; অপরিতুষ্ট
বাসনাই সমস্ত পৃথিবীর মূল কারণঃ—

“The whole world that we know arose
and took its shapes from desire.—Plotinus
সুতরাং বাসনাকে বর্জন করিলেই ভবোচ্ছেদ
হইবে বা নির্দোষ লাভ হইবে, ইহাই বৌদ্ধদিগের
অভিপ্রায়। শঙ্কর বলেন,

সংবল্পং বর্জয়েৎ তন্মাৎ সর্সানর্থকারণম্ ।

—বিবেক চূড়ামণি।

এই আদর্শ বতই অসম্ভব হটক না কেন, প্রাকৃত
জগতে ইহা অতি কঠিন ব্যাপার। জীবনের প্রতি
মুহূর্ত্তে মানব কোনও না কোন কর্ম করিতেছে। সর্ব
প্রকার ক্রিয়াহীনতার নামই মুহূর্ত্ত। সুতরাং কর্ম বা
বাসনার অতীত হওয়া আবশ্যিক সম্ভবপর কি না, তাহাই
সন্দেহ। এই জন্ত ত্রিমূর্ত্তগবদগীতা সম্বন্ধ করিলেন—
কর্মকলের আকাজকা করিও না। কর্ম করিতে
হইবে; কর্ম না করিলে চলিবে কেন? কর্মের দ্বারা
যে জগৎসংসার চলিতেছে। তোমার নিজের জন্ত
যদি কর্মের আবশ্যিকতা নাও থাকে, তাহা হইলে
লোক শিকার জন্ত তোমাকে কর্ম করিতে হইবে।
কারণ—

বদ্বদাচরতি শ্রেষ্ঠতত্ত্বদেবেতরে জনাঃ ।

কর্মকলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিতে হইবে,
ইহা পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।
কান্ট বলিলেন আসক্তি মুক্ত না হইতে পারিলে কর্তব্য
নিষ্ঠার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করা যায় না। মমতা, স্নেহ, প্রণয়,
স্বার্থ প্রভৃতির প্ররোচনার বে কর্ম করা যায়, তাহা হীন
কর্ম। সুতরাং এ সকল বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল
কর্তব্য বুদ্ধি হইতেই কর্ম করিলে তাহারই চান্ত্রিকনৈতিক
উৎকর্ষ বীকৃত হইবে। গীতা কিন্তু এরূপ অনাসক্তির
কথা বলেন নাই। কর্ম করিব অথচ দয়া প্রদান সম-

বেদনা প্রভৃতি-স্বপ্নের উচ্চবৃত্তিগুলি বাহ্য কর্তব্যসাধনের প্রেরণা জন্মায়; তাহাদিগকে বর্জন করিব, ইহা সম্ভব নহে।

বিষয়েষরতিজ্ঞেয়কর্তৃমৌ লভা বধা (বোগবাপিষ্ঠ)
গীতা কিন্তু কলে অস্ফুটাই উপদেশ করিয়াছেন।
কর্ণণোবাধিকারন্তে মা কলেবু কদাচন। কর্ণকলে বে
আগতি, তাহাই বাগনার বীজ। আমার বাহাতে
অতিক্রি, আমার বাহাতে আবেশ, আমার বাহাতে
স্বপ্ন, এমন কিছু করিবার জন্মই প্রত্যেক ব্যক্তির
আকাঙ্ক্ষা। সেই জন্ম ভগবান বলিলেন—

যৎকরোষি যৎশাসি যজ্ঞহোষি দদাসি যৎ

যৎ তপস্বসি কোন্তের তৎকৃৎস্ব মদর্পণম্।

কলের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিজেই বিবৃত করিতে
হইলে সমস্ত জৈবের অর্পণ করিতে হইবে। বাহ্য কিছু
করিলান, তাহা সমস্তই জীবিকুচরণে সমপিতমন্ত এই
বুদ্ধি লইয়া করিতে হইবে। আমি স্বর্ণ চাইনা, ধন
জন পুত্র কলত্র চাই না, ইন্দ্রিয় স্বপ্ন চাই না, সংসারের
কোনও বস্ততেই আমার কামনা নাই, শুধু “তোমারই
ইচ্ছা হউক পূর্ণ করণাময় স্বামী।” আমি যেমন অবস্থার
ধাকি না কেন, সুখে থাকি বা দুঃখেই থাকি, পশুপক্ষী
কীটপতঙ্গ যে বোমিতেই আমার জন্ম হউক না, শুধু
কামনা এইঃ—

“মতি রহ তুয়া পরসঙ্গে” (বিদ্যাপতি)

তোমার প্রসঙ্গে যেন মতি থাকে। জীলকবিরাজ
গোবামী বলিলেন যতদিন কোনও পার্থিব কামনা
লইয়া ভগবানকে ভজনা করিবে, সে ভজনা কাম নামে
অতিহিত হইবার যোগ্য। কেবল তাঁহারই প্রীতির
জন্ম তাঁহাকে ভজনা করার নাম প্রেম।

আত্মজের প্রীতি-ইচ্ছা তাহা কহি কাম।

কৃষ্ণজের প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

যতদিন ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি থাকে, ততদিন
প্রেম অক্ষুরিত হইতে পারে না। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি
এক চাক্ষুণ্য-সম্বীত ভারতীয় সকল দর্শন শাস্ত্র

কর্তৃক নিশ্চিত হইয়াছে। মাতৃবের স্বাভাবিক জ্ঞানে
ও সহজাত সংস্কার বলে দেহতেই আত্মাতিমান হয়।
অস্থিমাংস বগার সমষ্টি নানা স্থপচঃখব্যাধিগরার
আকর। যত কাল এই শরীর আত্ম-পদবাচ্য হয়,
যত কাল ইন্দ্রিয়বিষয়ে ‘আমার’ এই অভিমান দুরীভূত
না হয়, তত কাল জ্ঞানের আলোক দ্বারে প্রতিকলিত
হয় না। তত কাল বুদ্ধি হয় না—জ্ঞান বিনা মোক্ষ
প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? সেই জন্ম বেদান্ত শাস্ত্র
অবিভা দূর করিয়া দিবার উপদেশ করিয়াছেন। অবিভা
দূর হইলে আর কিরিয়া আসিতে হয় না।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। (ব্রহ্ম সূত্র)

অবিভার-ধর্ম।

অবিভা কাহাকে বলে?

অজ্ঞানমবিভাহম্ভতিরিত্যমরঃ। অমর কোষে অবিভার
পর্ধ্যায় অজ্ঞান এবং অংশুতি। অংশুতির অর্থ বাহ্য
আত্মা নহে, তাহাতে আত্মবুদ্ধি;

“জীহমিত্যন্ত মননমংশুতিরিত্যজ্ঞানাত্মানানং।”
এই যে অনাত্মবিষয়ে আত্মজ্ঞান রূপ জ্ঞান বা অবিভা
ইহা বুদ্ধির ধর্ম।

বিপর্যায়োহজ্ঞানমবিভা সা বুদ্ধিধর্মঃ। (তত্ত্ব কোমুদী)

এই বিপর্যায় বা জ্ঞানের বৈপরীত্য হইতে আত্মার
বন্ধন হয়।

বিপর্যায়াদিত্যজ্ঞানাদিশ্যতে বন্ধঃ (তত্ত্ব কোমুদী)
জ্ঞানসূত্রবৃত্তি বিপর্যায়ের অপর পর্ধ্যায় দিয়াছেন
মিথ্যাজ্ঞান; অবিভা শুধু জ্ঞানের অভাব নহে; পরন্তু
অবধার্ম-নিশ্চয়তা রূপ মিথ্যাজ্ঞান।

“বিপর্যায়ো মিথ্যাজ্ঞানাপরপর্ধ্যায়োহবধার্মনিশ্চয়ঃ।”
অবিভা যে বিভাবিরোধিজ্ঞানান্তরম্ একথা বোগশাস্ত্রের
ব্যাস ভাষ্য ও স্বীকার করেন।

জৈনেনাও বলেন—

মিথ্যাজ্ঞানাবিরতি কথারাঃ বদ্ধহেতবঃ (বাচস্পাচার্য্য)
মিথ্যাজ্ঞান, অবিরতি বা আসক্তি এবং পাপ লোকের
বন্ধনহেতু হয়।

এ হলে খ্রীষ্টানদিগের মুক্তিবাদ সম্বন্ধেও ছুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কারণ খ্রীষ্টানেরাও মোক্ষবাদী। পাপবশে আত্মার অধঃপতন ঘটরাছে। মানবের আদির অবস্থা হইতেই এই পাপ আশ্রয় করিয়াছে। সেই পাপের ফলে মানবাত্মার বর্ণচ্যুতি হইরাছে। সুতরাং পাপ হইতে মুক্ত হওয়াই আত্মার বাতাবিক আকাজকা। খ্রীষ্টানদিগের এই সুসুখের সহিত হিন্দুদিগের সুসুখের আংশিক সামঞ্জস্য থাকিলেও পার্থক্য ঘটে। খ্রীষ্টানের মুক্তিবাদ আগন্তুক এক পাণোৎপত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কোনও দার্শনিক ভিত্তির উপর গোথিত নহে। গ্রীস দেশের এক রহস্যবাদে (Orphic mysteries) আত্মার পতনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ রহস্যবাদ হইতেই এই মৌলিক পাপের ব্রহ্মনা জ্ঞানিয়া থাকিবে। বাহ্য হঠক, খ্রীষ্টানেরা মনে করেন যে মৃত্যুর পর আত্মা কিছু কাল বেহ-বিবুদ্ধ অবস্থার বাস করে; পরে বিচারের দিন সমাগত হইলে আত্মা ভগবানের দরবারে হাজির হয়। সেখানে করুণাবতার বীণাখুঁটি তাহাদের সর্বলের পাপ নিজস্বক্কে গ্রহণ করিলে পরে মানবাত্মা মুক্ত হয়, এবং অনন্তকাল ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করিয়া অপার জ্ঞানের অধিকারী হয়। খ্রীষ্টানেরা পাপ ও মৃত্যু এই দুই তত্ত্বের অতি নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তদুপরি মুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাপ হইতে মৃত্যু এবং মৃত্যুর দ্বার দিয়া অমৃত প্রবেশ—ইহাই খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের মূল কথা।

Like the hand which ends a dream
Death with the might of his sunbeam
Touches the flesh and the Soul awakes
—Browning.

খ্রীষ্টীয় এই মুক্তিবাদের মধ্যে আমরা প্রাচ্য আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই না। আত্মার মর্শ্বন-ব্রহ্মগতা ইহার প্রতিপাদ্য নহে। ইহাতে পাপতত্ত্ব আছে, অজ্ঞানতত্ত্ব নাই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে, অদৈবত সিদ্ধি নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে আর্হত মর্শ্বনে বন্ধের হেতু কথার

বা পাপ বুলিয়া বর্ণিত আছে। “নিম্মর” না হইলে নির্দোষ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানবাদী যোগমর্শ্বনকারী বলিয়াছেন, চরিত্র শুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার যোগ্যতা হয় না।

স্বত্বত্ব সৌন্দর্যতত্ত্ব কাণ্ডোক্তির জরাজন্য মর্শ্বন-

যোগাশ্রয় চ

(সাধনপাথ—৪১)

ওচিহ্ন হইতে স্বত্বত্ব, অর্থৎ মনের নির্মলতা; মনের নির্মলতা হইতে আনন্দ; তাহা হইতে একাগ্রতা; তাহা হইতে ইন্দ্রিয়জয় এবং ইন্দ্রিয়জয় হইতে বুদ্ধিস্বত্বের আত্মমর্শ্বনযোগ্য শক্তি হয়।

রামানুজ মর্শ্বনেও ঐ একই কথা :—

আহারভুক্ত্যে স্বত্বত্বত্ব; স্বত্বত্বত্বা জ্ঞান স্বত্বত্বত্ব
এবং জ্ঞান স্বত্বত্বত্ব মোক্ষের উপায় বলিয়া কথিত হয়। (সর্বদর্শন)

হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য আত্মতত্ত্ব।

খ্রীষ্টানদিগের ধর্মতত্ত্ব চরিত্র-নীতির স্থান অতি উচ্চে। মৃত্যুর চিন্তা হইতেই পরলোকের নামা প্রকার ব্রহ্মনা উদ্ভূত হইরাছে। পরলোকবাদ ধর্মতত্ত্বের প্রাণ ব্রহ্মণ। শোপেনহাওয়ার বলেন “মৃত্যুই সমস্ত মর্শ্বন শাস্ত্রের জননী।” মৃত্যুকে বরণ করিতে কেহ চাহে না। সকলেই জীবনের প্রাণী; যোগশাস্ত্র ইহাকে অতিনিবেশ বলিয়াছেন—ব্রহ্মসবাহী বিদ্ববোহপি তথাক্রমে অতিনিবেশঃ। (সাধন পথ) আমার বেন মৃত্যু কখনও না হয়, আমি বেন চিরকাল থাকি, ইহা প্রাণীমাজেই কামনা করে। ইহারই নাম অতিনিবেশ। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা ইহাকেই বলেন instinct of self-preservation.। ইহকালে আয়ুর বুদ্ধি এবং পরকালে বাহ্যতে অনন্ত জীবনলাভ হয়, তাহার জন্ম সকলেই সচেত। এই দুই কাল রক্ষা করিয়া বিনি কর্ম করিতে পারেন, তিনিই চতুর।

“বা লোকদ্বয় সাধনী তদুচ্ছতাং সা চাতুরী চাতুরী”।

জুতরাং মৃত্যুর চিন্তা সর্বদা মনে রাখিয়া কর্তব্য করিবার উপদেশ এ দেশের ধর্মশাস্ত্রেও বিরল নহে।

গৃহীত্ব ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্যাচরণং।

পাশ্চাত্য দেশে চরিত্র-নীতি একই ধর্মতত্ত্বের সম্যক অভ্যুদয় হইলেও, এ দেশের বৈশিষ্ট্য আত্মতত্ত্বে। দার্শনিক যুগের প্রথম হইতেই ভারতবর্ষে আত্মতত্ত্বের অভ্যুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে কদাচিত্ কখনও আত্মা ও মনের পার্থক্য স্বীকৃত হইরাছে। আত্মা ও মন একই পদার্থ এইরূপ ভাবই সচর'চর দেখা যায়। মন হিন্দুদর্শনে ইন্দ্রিয় মাত্র। চক্ষু বৈষ্ণব দর্শনের ইন্দ্রিয়, বা সাধন, মন সেইরূপ জ্ঞানের ইন্দ্রিয় বা সাধন। সেই জন্ত ইহাকে অন্তঃকরণ বলা হয়। জড়ের ধর্মও কিছু কিছু ইহাতে আছে। ইহা বিনাশী (ভায় মতে নহে)। পাশ্চাত্য দর্শন মনকে আত্মার সহিত অভিন্ন করিয়া করিয়া, আত্মতত্ত্বের দিকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের মূর্ত-স্বরূপ। ইহাতে এমন এক বিশেষ ধর্ম আছে, বাহার কলে মানবাত্মা আত্মতত্ত্ব পর্বত নিখিল বস্তুর সাক্ষাৎ-কার লাভ করিতে পারে। ভৌতিক উপাদানের দ্বারা ইহা গঠিত হইতে পারে না। জড়-জগতের ধর্ম ইহাতে সম্ভব হয় না। জড়-জগতের যে পরিণাম তাহাও ইহার পক্ষে অপ্রযোজ্য। জগতের ছায়াবাজির মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য, বাহাকে আশ্রয় করিলে সেই অবজ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হয়। উহা পার্থিব জ্যোতিঃ নহে—

That light which never was on land or sea.

যিনি এই আলোক দেখিতে পান, তাহার নিকট সকল অজানাই জানা হইয়া যায়। বস্তু বিজ্ঞাতে সর্বমেব বিজ্ঞাঃ ভবতি। কারণ জড়-জগতের বিরাট গ্রহ তাহার চক্ষুর সম্মুখে সর্বদাই উদ্ভূত থাকে, অত্যাশ্রয় জগতের নিগূঢ় তত্ত্বও সে দেখিবার অধিকারী, তাহার—

তিষ্ঠতে স্বরপ্রহিহিত্তে সর্বংগণাঃ

কীর্ত্তে চাত্ত কর্ণাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

যিস্ত এই আত্মতত্ত্ব জানা বড়ই কঠিন। আত্মা স্নানাত্মন পদার্থ। অণোরণীমান। আরাগ্নমাত্র পুরু-বোহুগুণ্য চৈতন্যবৈচিত্র্যঃ। চৈতন্যকরণ পদার্থ আত্মা ইহাকে চৈতন্য দিয়া জানিতে পারা যায়। একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক বসিরাছেন যে, পরমাত্মাকে জানিলে আত্মা ও পরমাত্মার তেজ থাকে না। The mind that wishes to behold God must itself become God. (Philo the Jew) আমাদের শাস্ত্রেও আছে ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে, সামান্যাদিকরণ আছে ইহা গ্রীক দার্শনিকেরও মত। জীবাত্মাকে তাহারাত্ত বস্তুতঃ ভগবানের অংশস্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিতেন। গীতা বলেন—

মমৈবাংশা জীবলোকো জীবভূতঃ সনাতনঃ।

নিওপ্লেটনিক দার্শনিকেরা বলিতেন, জীবাত্মা সকল ভগবানের স্বরূপ হইতে বিস্মুল্লিঙ্গের মত বিক্ষিপ্ত হইরাছে এবং সেই কেন্দ্রের দিকে যাইতেই তাহাদের নিরন্তর চেষ্টা। (Plotinus)

উপনিষৎ বলেন—

বথায়ৈঃ সূত্ৰাঃ বিস্মুল্লিঙ্গা ব্যাচরন্তি এবমেবান্যং আত্মনঃ সর্বৈঃ প্রাণাঃ সর্বৈঃ লোকাঃ সর্বৈঃ বেদাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যচরন্তি। (বৃহদারণ্যক)

তথু যে জীবজগৎ, তাহা নহে। সমস্ত ভূতবর্গ সেই পরমাত্মা হইতে সত্তা লাভ করিয়াছে।

মন্তঃ পরতরং নাভং কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়।

মরি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। (শ্রীতা) সূত্রে নিবদ্ধ মণিগণের দ্বারা সমস্ত বস্তু আনাতে প্রথিত। সেই জন্ত মধ্বাচার্য্য নিখিল বস্তু তত্ত্বকে ছই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—এক স্ব-তত্ত্ব; অপর অ-স্বতত্ত্ব।

স্বতত্ত্বস্বতত্ত্বক বিবিধং তত্ত্বমিচ্ছতে।

স্বতত্ত্বো ভগবান্ বিস্মুল্লিঙ্গোবোহ শেব'সদৃশঃ॥

(সর্বদর্শন)

পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লিনোজা ভগবানকে causa

sui আখ্যা দিয়াছেন। causa sui অর্থ স্ব-তত্ত্ব, স্বয়ং সিদ্ধ; কারণাত্মক। স্পিনোজার মতে বিশ্ব ও বিশ্বের এক, বিশ্বের হইতে বিশ্বের কোনও পৃথক সত্তা নাই। সমস্ত সত্তাই বিশ্বের পর্য্যায়বিশিষ্ট। নিউ-হেগেলিয়ান সম্ভ্রমায় বলেন, পরিণামশীল প্রকৃতির মধ্যে যে বিবর্তন, তাহা সেই বিশ্ব-সত্তারই ক্রম-বিকাশ। এবং সেই বিশ্ব-সত্তা মানবাত্মার এক চরম অধ্যাত্মতত্ত্ব পরিণতি লাভ করে; সকল ভূতের চিৎশক্তি তাহার আশ্রয় স্থল। সেই চিৎশক্তির পূর্ণ বিকাশ মানবের আত্মার চরম অভিব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

God is a Being with whom the human spirit is identical, in the sense that He is all which the human spirit is capable of becoming. (Green's Prolegomena)

মানবাত্মার চরম অভিব্যক্তি যে ভগবান্, এরূপ তত্ত্বের সহিত বেদান্তের সাদৃশ্য আপাত দৃষ্টিতে অতি নিকট বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যতক্ষণ আত্মা কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারা না যায়, ততক্ষণ এরূপ তত্ত্ব আমাদের কৃষ্টি হয় না। আত্মা যে এই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক অভিনব বস্তু; ইহা যে ভৌতিক উপাদানের দ্বারা বিরচিত হইতে পারে না, এ তথ্যটি যেমন এদেশের মনোবিগণ বুঝিয়াছিলেন, তেমন আর কোনও দেশেই নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা হয়ত বলিবেন যে, আদিম বর্ষের আতিথিগের animism হইতে আত্মা নামক পৃথক সত্তার কল্পনা আমাদের দর্শনে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐটুকু বুঝিলেই আত্মতত্ত্বের কিছুই বুঝা হইল না। আত্মা কি? আমাদের ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা বলিব, মনকে আত্মা বলিব, না চিৎশক্তিকে আত্মা বলিব?

ইন্দ্রিয়াদি পঞ্চাধ্যাত্মিকেরিভ্যঃ পরম মনঃ

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্ঘো বুদ্ধেঃ পরতত্ত্ব সং ॥ (গীতা)

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় অপেক্ষা প্রকাশশীল বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্তক বলিয়া ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। নিষ্করাশ্রিকা বলিয়া বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ।

এবং বুদ্ধিরও উপরে যিনি সাক্ষি স্বরূপে অবস্থিতি করেন তিনিই আত্মা। এই আত্মাই অশেষব্য। এই আত্মাই মোক্ষদর্শনশীল। এই আত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন। এই আত্মার সম্বন্ধই উক্ত হইয়াছে—

প্রজ্ঞানধন এব আনন্দময় আত্মা।

এই আত্মাই “বা সুপর্ণা সমুদ্রা সমাধা” ইত্যাদি শ্রুতিতে কীর্তিত হইয়াছে। ইহারই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—

ন আরতে স্মিরতে বা বিপশ্চিন্নায়ং তুয়া ভবিতা ন ভুয়ঃ।
অকো নিত্যঃ স্বাখতোহয়ং পুরাণো

ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে।

উপনিষদের যুগ হইতে এই তত্ত্ব ভারতবর্ষে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের Cultural individuality বা শিক্ষাশাধনগত বৈশিষ্ট্য যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা এইখানে। আমি বস্তুতঃ তাকে উপেক্ষা করিতে বলিতেছি না। ইউরোপ বস্তুতঃ সাধনার অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে। আরও নব নব আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমকিত করিবার জন্ত অগ্রসর হইতেছে। আমাদেরও নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করিলে, বিজ্ঞানের সাধনাকে অবহেলা করিলে হুর্দল হইয়া পড়িতে হইবে, দারিদ্র্য ভোগ করিতে হইবে, পরমার্থ চিন্তনেও স্তব্ধতা ব্যাঘাত পড়িবে। আমাদের শাস্ত্রেও বলিয়াছেন—

নারমাত্মা বলহীনেন লভ্যতে

কঠোর কর্ম সাধন করিয়াও বল-সঞ্চয় করিতে হইবে।

কর্মণ যেন কেনাপি মুহূনা দাক্ষ্যেন বা।

উচ্চরেক্ষীনাশাশ্বানং সমর্থে ধর্ম্মদাচরেৎ ॥

এরিস্টটলও বলিয়াছেন যে পূর্ণ মানব লাভ করিতে হইলে, অতাব দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হওয়া চাই।

কেহ কেহ মনে করেন আমাদের শাস্ত্রের আত্মতত্ত্ব ও মোক্ষবাদ আমাদের দর্শনালোচনার স্রোত নিকট করিয়া দিয়াছে। এই সকল তত্ত্বের ফলে আমরা এমন একটি সৌমান্য উপনীত হইয়াছি যে আর আমাদের

পক্ষে নূতন কোনও তাৎপর্যের হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। হুঃখবাদ ও অঐক্য তৎকালীন জন্মকাল আমাদের মনে কেবল অবসাদ আনিয়া দিয়াছে, আভ্যন্তরীণ, আমাদের জাতীয় উদ্বোধন দূরে অপসারিত করিয়াছে। এ কথা যে সত্য নহে তাহা ভারতবর্ষের দর্শন চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের হুঃখবাদ সম্বন্ধে যে দার্শনিক মতবাদের অপ্রাচুর্য্য ঘটে নাই, তাহা নানা সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইতে জানিতে পারা যায়।

বেদান্তের অঐক্যবাদ আমাদের জীবনে বর্তমানে প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক সময়ে তাহারই পার্শ্ব, সাংখ্য ও বৌদ্ধ পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দাবী করিত। ইহাদের পৌরোপার্থ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, বেদান্ত বলিতেছেন সর্বত্র ঋষিদং ব্রহ্ম; সাংখ্য বলিতেছেন ঐশ্বর্য্যান্তির প্রমাণ নাই; বৈশেষিক দর্শনেও ঐশ্বর্য্য প্রমাণ খুজিয়া পাওয়া হুঃখ। তৎকালীন দার্শনিক প্রমাণসমূহ। এই ক্ষেত্রে তৎকালীন অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে, কিন্তু ‘ধর্ম্ম’ হওয়ারই অধিকতর সম্ভব।

সাংখ্যদর্শন ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন প্রমাণাত্মক। পাতঞ্জলদর্শনকে সময়ে সময়ে সেখর সাংখ্য বলা হয়। কিন্তু এক সময়ে বৌদ্ধদর্শন ঐশ্বর্য্যকে তেমন আমল দেন নাই, এ কথাও কেহ কেহ বলেন। আমরা যে বৌদ্ধত্ব জানি তাহাতে ঐশ্বর্য্যবাদ অবশ্য সুপরিষ্কৃত রহিয়াছে। কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে যে, সমস্ত বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে উহার ঐশ্বর্য্য তত্ত্বের সম্বন্ধ খুব বেশী নহে। ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়ত ঐশ্বর্য্য লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতে বৌদ্ধদর্শন সেখর বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সাংখ্যের পক্ষবিশেষিত তৎকালীন অপেক্ষা অতিরিক্ত এক তৎকালীন বৌদ্ধদর্শনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যবাদ বৌদ্ধদর্শনে বড়বিশেষ; তৎকালীন। বাহ্য হটক, সাংখ্য এবং বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে উপনিষদের ব্রহ্মবিজ্ঞান আবহমান

কাল ভারতের চিন্তার ধারাকে আঁকড়ে ধরে নাই।

বৌদ্ধমতও এদেশের একটি অতি প্রাচীন মত। ইহার মূল উপনিষদে মিলিলেও ইহা নিশ্চিত যে, বৌদ্ধেরা হিন্দুদর্শনের অচলারতন তেজ করিয়া একটি স্বতন্ত্র পন্থা আপনাদের জন্ম প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যের অস্তিত্ব এবং বাগবক্তের কলদায়ক অস্বীকার করিয়াও বৌদ্ধ মত যে ভারতে বর্ধেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। পরে মহাবানী বৌদ্ধেরা হিন্দু ধর্ম্মমত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৌদ্ধমতকে হিন্দুদিগের নিকট উপাধের করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই হইতেই নাস্তিক দর্শনের স্রষ্টা ঐশ্বর্য্যবাদের বিরোধী তথাগত বুদ্ধ হিন্দুদিগের দশা-ভারতের মধ্যে স্থান পাইলেন। হিন্দু সমাজ, হিন্দুধর্ম্ম এবং সমস্ত দার্শনিক মতবাদ আর একবার ওলটপালট হইয়া গেল।

অনেকে মনে করেন যে বেদান্তের সার্ববাদ বৌদ্ধ দর্শন হইতে আসিয়াছে এবং সাংখ্যমতও বৌদ্ধমত হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল। অতি হুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্র সমূহের ঐতিহাসিক পৌরোপার্থ্য নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। স্মৃত্যু সাংখ্য হইতে বৌদ্ধমত অথবা বৌদ্ধ হইতে সাংখ্যমত আসিয়াছে এ সমস্তার কোনও সমাধান সম্ভবপর নহে। এই সত্য বলিতে পারা যায় যে সাংখ্য ও বৌদ্ধদের মধ্যে সাদৃশ্য খুব বেশী। সাংখ্যের সংস্কার এবং সংস্কার জন্ম পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ বৌদ্ধদর্শনেও আছে। সাংখ্যের সংস্কারবাদ এবং বৌদ্ধদিগের কণিক বাদের মধ্যে সৌম্যদৃষ্ট সুপরিষ্কৃত। সাংখ্য এবং বৌদ্ধ উভয়েই নিরীশ্বরবাদী এবং নির্কারণের পক্ষ। বৌদ্ধদের নির্কারণ ধ্বংসবাদ নহে। উভয় মতবাদের মধ্যে এই সকল বিষয়ে সাদৃশ্য সম্বন্ধে বৈষম্যও অনেক। সাংখ্যের পুরুষ বাদের চিহ্ন বৌদ্ধ মতে পাওয়া যায় না। সাংখ্য ত্রিগুণতত্ত্বেরও কোনও নিদর্শন বৌদ্ধ মতে নাই।

দর্শনে সমন্বয়-প্রসূতি ।

এই সকল দর্শনের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে চিন্তার রাজ্যে তারতীয়দিগের গত্যুপগতিমততা স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা বাইতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে কালোপযোগী দার্শনিকতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। আধুনিক সময়ে সমন্বয়ের চেষ্টা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। সমন্বয়ের যুগ দর্শনের ইতিহাসে নিম্নলিখিত যুগ বলিয়া উল্লিখিত হয়। অনেকে মনে করেন ভারতের নানা দার্শনিক মত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। অবশ্য ইহা স্থিতি যে, সত্য এক ; ভিন্ন ভিন্ন দর্শন সেই সত্যকে আনিবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মাত্র। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশী বলিলে অস্তর হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন সত্যসাধনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরমাত্র ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে চেষ্টা তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না ; সত্য সন্ধানের মূল্য তাহাতে থাকে না। সেই জন্য কেহ কেহ বলেন বলেন যে ভার্য বৈশেষিকের প্রথম সোপান আরোহণ করিয়া, তার পরে সাংখ্য যোগের মধ্য দিয়া আমরা মীমাংসার অধর তত্ত্ব উপনীত হই, তখন আমার মনে হয় যে এইরূপ সিদ্ধান্ত দার্শনিক স্বাধীনতার হানিকর। এই সকল দর্শনের মধ্যে যে মিল আছে, তাহাকে বড় করিয়া দেখিলে প্রত্যেক দর্শনের বৈশিষ্ট্য বার্ষ হইয়া যায়। সত্যাস্থসন্ধানের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অন্তরার আর কিছুই নহে। যুগধর্মীহুসারে, মানব মনের পরিণতি অহুসারে, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপ্রবাহ পৃথিবীর বন্ধের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। চিন্তাশীলের পক্ষে, ঐতিহাসিকের পক্ষে, সেই প্রবাহের প্রত্যেকটি স্তরের মূল্য আছে। পূর্ব মীমাংসার কর্মকাণ্ডের পরে উত্তর মীমাংসার অবৈত তত্ত্বের আবির্ভাব মানবমনের বিবর্তনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে পূর্বমীমাংসার নিরীশ্বরবাদ উত্তর মীমাংসার ব্রহ্মবাদে

সমাধি লাভ করিয়াছে অর্থাৎ একের অভাব অন্তের দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে যোগ দর্শনের দ্বারা সাংখ্যের এবং ভার্যের দ্বারা বৈশেষিকের পাদপূরণ করিয়া লইতে হইবে ; আমার বক্তব্য এই যে, ইহাতে দার্শনিক চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়।

বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে ইতিহাসের নানা ঘটনাবলির মধ্যেও দার্শনিক চিন্তার স্রোত অবাধে বহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম অশোকের সময় মাধা তুলিয়া উঠিগ, দিগ্, দিগন্তে তাহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িতে লাগিল। বাঙ্গালাদেশে এক সময়ে তাহাকে বাধা দিবারও চেষ্টা করিয়াছিল, বাঙ্গালার রাজা শশাঙ্ক বোধিজ্ঞান পর্যন্ত পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে পাণ্ডরাজগণের সময়ে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যে বঙ্গভূমি তাসিয়া গেল, তখন নানাস্থানে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইল, ব্রাহ্মগণ বৌদ্ধদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বৌদ্ধগণ বাঙ্গালীর দেবতাকে বোধিসত্ত্বের পার্শ্ব স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। বঙ্গের অনেক স্থলে এখনও বৌদ্ধ কৌণ্ডির চিহ্ন পাওয়া বাইতেছে। বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তিব্বতে ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। নাগদ্বীপ বিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র সমতটবাসী ছিলেন। দীপঙ্কর ঐজান পূর্ববঙ্গের লোক। ইনি ১০৬৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন।

তাত্ত্বিকতার যুগ ।

বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের নিকট যখন অবাধে গ্ৰহণ করিতে লাগিল, তখন নানা ধর্মমত ও দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি হইল। আমার বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে তাত্ত্বিক মত বিস্তার এই সময় হইতে হয়। যদিও প্রবুদ্ধ ভারতের একজন লেখক কর্তৃক তত্ত্বের উৎপত্তি উপনিষৎ ও বৌদ্ধযুগের মধ্যস্থলে কল্পিত হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহা স্মৃতিশ্রুতি যে, তত্ত্বের প্রচার বঙ্গদেশে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারের পরেই হইয়াছিল। পাণ্ডরাজগণ বৌদ্ধতাত্ত্বিক ছিলেন। মহাবান বৌদ্ধেরা দেব-

দেবীকে নির্বাসন করেন নাই। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের * প্রবর্তক নাগার্জুন বুদ্ধশক্তি চণ্ডিকাদেবীর উপাসনা করিতেন। (আন্তের গন্তীরা) মাধ্যমিক দল হইতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের বিকাশ সাধিত হয়। এই সম্প্রদায় “কালচক্রবান,” “মন্ত্রবান” ও “বজ্রবান” নামেও অভিহিত হয়। তন্ত্রের উপাস্ত দেবতা “শক্তি”। এই আত্মশক্তি স্ত্রীও নহেন পুরুষও নহেন। এই শক্তি একাধারে বিদ্যা ও অবিদ্যা, পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মারা। ইহা বৈতণ্ড্য নহে, অবৈতণ্ড্য নহে।

অবৈতণ্ড্য কেচিদ্বাদন্তি বৈতণ্ড্যমিচ্ছন্তি চাপরে।

মম তৎসং বিজানন্তো বৈতণ্ড্যতবিবজ্জিতাঃ।

(কুলার্ণব তন্ত্র)

বিশ্বের মূল কারণ, বীজ এই বৈতণ্ড্যতরহিত শক্তি। এই শক্তি হইতেই মারা, ইহা হইতেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ইহা হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই শক্তি ভূগনেশ্বরীরূপে জগৎপ্রাণিনীরূপে জগৎ প্রণব করিতেছেন, আবার মহাকালী ভৈরবীরূপে সমস্ত সংহার করিতেছেন। তন্ত্রের মূল তত্ত্ব সংক্ষেপে ইহাই। বেদান্তের অবৈতণ্ড্য তত্ত্ব ও বৌদ্ধ শূন্যবাদের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যের ত্রিগুণতত্ত্ব এবং বৌদ্ধদর্শনের সাধন তত্ত্ব ইহার প্রধান উপদ্রব্য। অধিকাংশ তন্ত্র শাস্ত্রের সংস্কৃত ভাষা দেখিলে তাহা আধুনিক এবং বাঙ্গালী সাধকের লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা ইহা বলিলেই উপলব্ধি হইবে যে এক্ষণে এরূপ কোনও ধর্ম সম্প্রদায় বঙ্গীয় হিন্দুদিগের মধ্যে নাই, বাহা তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবিত নহে। (See Arthur Avalon's

Introduction to Principles of Tantra) এ স্থলে সহজিরা মতের উল্লেখ করাও কর্তব্য মনে করি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রসাদে মধ্যযুগে নাট্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ মতবাদ চলিতেছিল, তাহা আমরা “বৌদ্ধগান ও দোহা” হইতে জানিতে পারি। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই সহজিরা সাধন বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা অন্তঃস্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বৈষ্ণব দিগের ধর্মমত একটি উচ্চ দার্শনিক ভিত্তিতে নিহিত। তাহার সহিত সহজিরাবাদের মহাত্ম্যবাদের আদৌ মিল নাই। সহজিরা তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতের একটি অসম্ভব ফল। তন্ত্রের পঞ্চমকার সাধন হইতে সহজিরা পঞ্চমটি বিশেষভাবে সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের সর্বত্র যে এইভাবে তান্ত্রিকতা গৃহীত হইয়াছিল তাহা নহে। অনেকস্থলে শক্তিবাদের সহিত বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মবাদের সুপরিমিত মিলনও দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায় রাজা রাম-মোহন রায় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক জীৱামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তান্ত্রিকতার শেষ সর্বোৎকৃষ্ট ফল। তিনি ভোগমুখ একেবারে বর্জন করিবার উপদেশ দিতেন। নিজের জীবনেও কামিনীকাকনের সংস্রব এককালে ত্যাগ করিয়াছিলেন। রমণী দেখিলেই তিনি জগন্নাথার প্রতিকৃতি দেখিয়া মা মা বলিয়া মজ্ঞান হইতেন। নিদ্রিত অবস্থায়ও কোনও ধাতুদ্রব্য তাঁহার গায় ঠেকিলে শরীর আপনা আপনি সংকুচিত হইত। তান্ত্রিক শক্তি-আরাধনার সহিত বৈরাগ্যের অপূর্ণ মিলন।

নব্যগ্রন্থ।

* মধ্যযুগে অনুসরণ করেন বলিয়া এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম মাধ্যমিক হইয়াছিল।

অতো ভাষাতাব্যক্তধরহিতবাৎ সর্ববভাবানুৎপত্তিলক্ষণা শূন্যতা মধ্যমা প্রতিপন্নব্যবো মার্গ ইত্যুচ্যতে (Indian Logio Dr. S. O. Acharya)

বদা ন ভাবো নাতাবো মতে: সত্তিষ্ঠতে পুর:।

তদাত্তগত্যাভাবেন নিবালম: প্রশাশ্যতি।

(বৌদ্ধ পান ও দোহা)

মুসলমান রাজত্বকালে নবদ্বীপ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া উঠে। বিজ্ঞানশিকার জন্য দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র এখানে আগিয়া স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন করিত। বাঙ্গালীর অল্পত কৃতিত্ব নব্যগ্রন্থে। কাউন্সেল সাহেব বলিতেন এই সকল তর্কশাস্ত্রের অটলতার

ইউরোপীয়দিগের মাথা কিম্ব কিম্ব করে। বাস্তবিক ভার শাস্ত্রের চর্চা পারিতোষিকতার কত উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নব্য ভারের প্রবর্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায় বাঙ্গালী ছিলেন কি না বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণির তত্ত্ববোধিত নারী টীকা একজন বাঙ্গালীরই লেখা। দীর্ঘতর রচয়িতা রঘুনাথ শিরোমণি "পঞ্চধরের পঞ্চ শাতন করি" নবদীপে হরিষোবের গোরাগে নব্যভারের অধ্যাপনা প্রবর্তিত করেন। ইহার পরেও কয়েকজন অসামান্য বীশক্তি সম্পন্ন দার্শনিক বঙ্গদেশে অল্পপ্রাণে করিয়া নবদীপকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, মধুবালা ও গদাধর ভট্টাচার্যের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। কদাচ তর্কবাগীশ চিন্তামণির একখানি টীকা রচনা করেন, তাহার নাম তত্ত্বটীকা। কদাচ তর্কবাগীশ এই অঞ্চলের লোক ছিলেন। আমাদের জেলার (বশোর) অধিবাসী গদাধর কবিরাজের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি তধু চিকিৎসা বিজ্ঞান অধিষ্ঠার ছিলেন না; নানাশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া তিনি উপনিষৎ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতির ভাষ্য রচনা করেন। ইংরেজ রাজত্বকালের দার্শনিক ইতিহাস বিনি লিখিবেন, তিনি গদাধর কবিরাজ ও রাজা রামমোহন রায়ের নাম সমুদয়ে উল্লেখ করিতে বাধ্য। রাজা রামমোহন বেদান্তের ভাষ্য বাঙ্গালার রচনা করিয়াছিলেন এবং বেদান্তসার নামে একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তুলনা মূলক ধর্মমতের সমালোচনা মহাত্মা রামমোহনই প্রবর্তিত করেন। তিনি সকল ধর্মের সার সত্যগুলি সংকলন করিয়া উপনিষৎ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা রাজা রামমোহনের অন্ততম কীর্তি।

বৈষ্ণব দর্শন।

রঘুনাথ শিরোমণি যে সময়ে নবদীপে প্রাহতুত

হয়েন, সেই সময়ে ঈগোরাজ মহাপ্রভুও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেন। কলিযুগের অধঃপতিত জীবের হৃদয় দেখিয়া তিনি হরিনাম মহাত্মা প্রচার করেন। প্রেমের সহিত নাম করিলেই জীবের গতি হয়, এই তত্ত্ব তিনি আপামর সাধারণে বিলাইলেন এবং নাম প্রেমের মালা গাঁথিয়া আচড়ালের গলে দোলাইলেন। তাঁহার পরিকল্পণ হরিনামের তরঙ্গে বঙ্গদেশ প্রাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদেরই মধ্যে একজন ঈশদত্তিরাম গোবামী এই রাধানগরে গোপী নাথের ঈশাট স্থাপনা করিয়াছিলেন। অতিরাম গোপাল ব্রজলীলার ঈশাট স্থাপনা করিয়া ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

অতিরাম মুখ্য শাখা সখ্য প্রেমরাশি।

ঘোল শালের কাঠ তুলি বে করিল বাঁশী ॥

ব্রজভাবে ভাবিত হইয়া তিনি মুরলী বাজনের ইচ্ছা করিলেন, এবং অত কিছু না পাইয়া একগাছি ঘোল শালের কাঠকে বাঁশী করিয়া বাজাইয়া ছিলেন। বৈষ্ণব সাধক নির্জনে তাঁহার বাহিতকে লইয়া এই নির্জনে পল্লীতে অবশিষ্ট জীবন "নাম" করিয়া কাটাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন, তিনিই এই ঈশাটের সান্নিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া এই স্থানে বাসভবন নির্মাণ করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্তও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। নবাব সরকারের চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি এইস্থানে আসিয়া নাম জপ করিয়া কাটাইলেন। রামমোহনের মাতা কুল ঠাকুরাণী নিজে সম্বর্জনীর দ্বারা ঈশকে জগদাধর মন্দির মার্জনা করিয়াছিলেন। এবং বধন তাঁহাকে বিষয়কর্ম দেখিতে হইত, তখন তিনি ঈশাখাগোবিন্দের বিগ্রহ সমুখে রাখিয়া বিষয় কর্ম দেখিতেন। মহাপ্রভুর ধর্ম এইরূপ ভাবে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাঁহার প্ররশিষ্ট ঈশগোবামী এই ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; পরে উহা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশীবগোবামী কর্তৃক ঘট, লন্দর্ডে ও ঈশদত্তাগবতের বৈষ্ণবতোষণী নামে টীকার

পরিপূর্ণ লাভ করে। তাগবতের ব্যাখ্যাকর্তা জীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও পদ্মসুত সমুদ্রের সংকলয়িতা জীরাধামোহন ঠাকুরের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উপনিষদের জানকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত যে সকল দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করিলাম, তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, এদেশে দার্শনিক চিন্তার ধারা অব্যাহত ভাবে বহিয়া গিয়াছে। এই চিন্তাধারার আত্মতত্ত্বের নব নব বিকাশ, নব নব অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই আমাদের দেশের জল বায়ু ও প্রকৃতির অমুকুল। ইহা ভারতীয়দিগের বৈশিষ্ট্য। অধুনা দর্শন অপেক্ষা বিজ্ঞানের আদর বেশী। বিজ্ঞান ইহলোকের কল্যাণসাধন করে। অধ্যাত্মতত্ত্ব পরলোকের কল্যাণ লক্ষ্য করে। আজ কাল নগদ মূল্যের আদর বেশী। তাই মোক্ষমূলর পর্যন্ত বলেন যে, অহিংসা—যাহা ভারতীয় দর্শন ও

ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—হিন্দুজাতির রাজনৈতিক অধঃপতনের হেতু। হইতে পারে, আমরা আমাদের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার কিছু উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু সে উদাসীনতা দর্শনের অপরাধ নহে, আমাদের দুর্ভাগ্য। আমি যামৌ বিবেকানন্দের সহিত একমত; তিনি বলিয়াছেন যে আমাদের যদি পুনরুত্থান হয়, তবে তাহা এই অধ্যাত্ম বিচার কলেই হইবে। অজ্ঞপ্তের প্রচণ্ডতা অপেক্ষা যদি অধ্যাত্ম বলেই অগণ্যে সম্পূর্ণভাবে জয় করা যায়, তাহা হইলে আমাদের এখনও কিছু আশা আছে। কিন্তু চাই সেই রূপ গুরু, যিনি সমাধি প্রগত জ্বরে পরমার্থচিন্তার নিবিষ্ট হইবেন এবং সেই মৌন গুরুর পার্শ্বে উপসন্ন শিষ্যেরও সমস্ত সংশয় আপনা হইতে দূর হইয়া যাইবে।

ঐশ্বর্য়গঙ্গেনাথ দ্বিজ।

মিলন পথে

(উপন্যাস)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এখন আর বসন্তের সেই করাল সূর্তি নাই। সে বহু বলি গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়া শান্তভাবে বিদায় লইয়াছে। বসন্তের ভয়ে বাহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। গ্রামের হাট, বাজার, রাস্তাগুলি আবার পূর্বের মত সুখের হইয়া উঠিয়াছে। বৈঠকখানা গুলিতে আবার ভাস, পাশা, দাবা এবং তৎসঙ্গে চাটুনি স্বরূপ পরচর্চার আড্ডা জমিয়া উঠিয়াছে। মানের ঘাটগুলি মেরেদের হাসি, গল্প, কৌতুক, কলহে রক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাহারা আপন আপন জ্বয়রত্ন গুলি বসন্তের কবলে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদের বুক ভাল দীর্ঘবাস এবং আত্মরব

গ্রামের আকাশে বাতাসে মাঝে মাঝে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? কেই বা তাহাদের খোঁজ লয়?

মহেন্দ্রলালের বৈঠকখানার গ্রাম প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদের একটি ছোটখাটো অধিবেশন বসিত। এই সন্ধ্যা অধিবেশনে কখনও খোশ-গল্প, কখন নানারূপ বিচার বিতর্ক ও মীমাংসা চলিত। ইহার অধিকাংশ সভ্য এবং স্বয়ং মহেন্দ্রলাল বসন্তের ভয়ে এতদিন গ্রামছাড়া ছিলেন, অধিবেশনও স্তব্ধরূপে বন্ধ ছিল। এখন আবার সকলেই গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার অধিবেশন বসিয়াছে। নানাবিধ আলোচনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্যের সুশীলকৃত মূর্তি এবং

তাহুল চর্কণের শব্দে বৈঠক খানা ভরিয়া গিয়াছে। নকত্র-বেষ্টিত চত্বের ভায় মহেশলাল করাসের মধ্যস্থলে আনীন। উমেশ বাবু পাণের ডিবাটা আগাইয়া দিয়া মহেশলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনি তো একটা পাণও খেলেন না। নিনু।” মহেশলাল ঈষৎ হাস্ত করিতেই তাঁহার হইয়া চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, “আপনি বলেন কি? উনি সন্ধ্যা না ক’রে পাণ খাবেন?” উমেশ বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “ঠিক, ঠিক, আমার ভুল হয়ে গেছে।”

বিজ্ঞানিধি মহাশয় শিখা আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, “আজকাল হিন্দুধর্মের প্রতি এরূপ অমুরাগ বিরল।” বলিয়াই আড় চোখে একবার মহেশলালের মুখ দেখিয়া লইলেন। সেখানে প্রগলভ্য চিত্র দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “ব্রাহ্ম যুক্ত উঠে প্রাতঃসন্ধ্যা, বেলা দশটা পর্যন্ত পূজা পাঠ, তার পর সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত জপতপ, তিথি নকত্র উপলক্ষ্য করে প্রায় আশি ত্যাগ—এ গ্রামে আমি আর তো কারো দেখলাম না। ঐ চাকরের হাতের এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খান না, এর সব খাবার গিন্নিমা নিজের হাতে করেন। যে সে বাসুনের হাতেও খান না। কেনই বা খাবেন? বাসুন হলেই তো আর শুদ্ধাচারী হয় না।”

উমেশ বাবু একটা পাণের খিল মুখে কেলিয়া দিয়া বলিলেন, “সেজ বাবুর কথা তো আমরা সবই জানি। তাঁর তাইপোটির কথা একবার বলুন না।” বিজ্ঞানিধি মহাশয় হুকোটা উমেশে বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, “কে, অশোক? আরে রাম রাম! তার কথা ছেড়ে দিন মশায়।”

চক্রবর্তী মহাশয় সরোষে বলিলেন, “কেন ছেড়ে দেব? সে জমিদারের ছেলে বলেই কি সমাজের বুকের উপর ব’লে বধেছা কদাচার করবে, আর আমাদের টাকা নেই ব’লে, আমরা চুপ ক’রে তাই সরে থাকব? হিন্দু ব্রহ্মতলে গেছে? হিন্দু সমাজ কি ধনের পারে মাথা বিকিরেছে? তা নয়। এখনও সমাজের বাঁধ আছে, ভেঙে আছে।” বলিয়া তিনি এমন অঙ্গভঙ্গী করিলেন

যে, তাহা দ্বারা ই প্রমাণিত হইয়া গেল হিন্দু সমাজের ভেজ-বীর্ঘের অংশ তাঁহাতেও বিদ্যমান আছে।

মহেশলাল নেকা সাজিয়া গভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অশোক আবার কি করেছে?”

উমেশ বাবু মুহূ হাসিয়া বীর ভাবে বলিলেন, “বিজ্ঞানিধি তারো তো বাঁড়ীতেই ছিলেন। বলুন না তিনিই।”

“আমি কেন? চক্রবর্তী তো গ্রামেই ছিল, সেও তো সব জানে।”

উমেশ বাবু বলিলেন, “রসনা কলুষিত হবার ভয়ে বিজ্ঞানিধি মহাশয় বোধ হয় পাণ কথা বলবেন না।”

বিজ্ঞানিধি এই খোঁচাটা নীরবে পরিপাক করিলেন। কিন্তু উমেশ বাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি আবার বলিলেন, “বিজ্ঞানিধি মশায়, আপনার ছেলের স্কুলের মাইনেটা অশোক দেয় বটে, কিন্তু সমাজের মর্ন্তাদার সূচ্য কি সেই ছোটো টাকার চেয়েও কম?”

বিজ্ঞানিধি এবার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “খোঁচাটা আমরা মিলেন বটে, কিন্তু আপনার পিতৃ-শ্রাঙ্কের সময়ে এই অশোক আপনাকে কতখানি সাহায্য করেছে, সেও তো আমরা ভুলে বাইনি। আপনিই বা হ’বছরে ভুলে গেলেন কি ক’রে?”

কষ্ট উমেশ বাবু কি বলিতে বাইতে ছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়া বিজ্ঞানিধি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, “আহা আপনারা থানুন। ব্যক্তিগত কথা নিয়ে আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছেন। সবাই মিলে আলোচনা ক’রে এর একটা প্রতিবিধান করব, তা নয়, ঝগড়া বাধিয়ে বসলেন। সেজ বাবু, শুধুন, আমিই সব বলছি। আপনার তাইপো অশোক, রামা চাঁড়ালের ছেলেটাকে তো বাঁড়ীতে এনে নিজেদের সঙ্গে এক করেছে রেখেছে। তারপর নিজের বসও হওয়ার, সেই ছেলে গোবিন্দ ষোড়শের মেয়েটাকে একেবারে ঘরে এনে রেখেছে। তার হাতে থাকে দাঁছে, আরো কত কাজ করছে। আপনি তাকে বিশেষ ক’রে শাসন ক’রে দোরস্ত করুন। নইলে আমরা আর এই অত্যাচার বেশি দিন সহিতে পারব না

বলে রাখছি। শুধু রায় বংশের ছেলে ব'লেই এতদিন চুপ ক'রে আছি।”

মহেন্দ্রলাল—বোধ হয় বুঝার লজ্জার—জলাট কুচিত করিয়া অনেকক্ষণ শুকু হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে যখন বুঝিলেন, তাঁহার মন্তব্য শুনিবার জন্ত সভা চকস হইয়া উঠিয়াছে, তখন অনেক দিক ভাবিয়া বলিলেন, “দেখুন, অশোক আমার পুত্রাধিক, কারণ তার বাবা জীবিত নেই। আমার নিজের ভেলে হ'লে কথা ছিল না, কিন্তু পিতৃহীন ভাইপোকে এখনি বর্জন করিতে পারিনে। তবে সমাজের বাতে মান থাকে, সে বাতে ভাল হয়, তা আমি নিশ্চয়ই করব।”

সভ্যগণ অশোকের প্রতি এইরূপ পল্লীর স্নেহের জন্ত মহেন্দ্রলালকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আর একবার তাড়ন ও তাম্বকুটের সম্ভাবনায় করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

পরদিন মহেন্দ্রলাল অশোককে ডাকাইয়া আনিয়া, কোন ভূমিকার আঁড়ন না করিয়া, গত সন্ধ্যা বৈঠকের মন্তব্য (অবশ্য তাঁহার চুক্তি সত্ত্বে) তাহাকে শুনাইয়া দিলেন। অশোক ইহার জন্ত প্রস্তুত ছিল। সে বিজ্ঞাসা করিল, “এখন আমাকে কি করতে বসেন?”

মহেন্দ্রলাল বলিলেন, “হ'মাস আগে বা করতে বলেছি, আজ ও তাই বলছি। সেই নষ্ট স্বভাব মেয়েটার সব রকম সংশ্লিষ্ট ত্যাগ ক'রে—”

অশোক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, “আপনি মাখবীর সত্ত্বে অসম্মানজনক শব্দের উল্লেখ করবেন না। তার মত চরিত্র মতিম বদি তদ্র সমাজের থাকত, তা হ'লে সমাজের এমন অধোগতি হতো না।”

আজ অশোককে বেশী চটাইবার ইচ্ছা মহেন্দ্রলালের ছিল না। তাই তিনি বীর ভাবে বলিলেন, “মেনে নিলাম, তার স্বভাব ভাল। কিন্তু তবু তার সঙ্গে এমন ভাবে মেলানোশাটা ভাল কি? তার বাপ মা বাড়ী নেই, এই অবস্থায় তুমি তাকে এক মাস বাড়ীতে রেখেছ।”

“আমি এনে রাখিনি, সে আমাকে বাঁচাতে এসেছিল। তার বাপ মা থাকে তার অতিভাবক করে

রেখে গেছে, তিনিও তার সঙ্গে ছিলেন। যখন বসন্তের আগায় শ্রুত বাড়ীতে ছটকট করছিলাম, তখন কোথায় ছিল আপনার সমাজের এই রক্তগুলি? আমি ত তাদের কাক অনিষ্ট করিনি, বরং সাধামত উপকার করতেই চেষ্টা করেছি। আমি মানুষ, মানুষের একটা ধর্ম আছে; সেটা সমাজ-ধর্মের চেয়ে ছোট নয়। সেই ধর্ম পালন করতে যদি মাখবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখতে হয় তো রাখবই। মিথ্যাকে স্বীকার করে ধর্ম পতিত হ'তে পারব না। মানুষের মহত্ব সমাজ সইতে পারে না, নইলে মায়ের মত বোনের মত মমতায় যে একজন অসহায়কে যমের মুখ থেকে টেনে এনেছে, সমাজ তাকেই ছোট বলে, হীন বলে, দূর করে দিতে বলছে।”

মহেন্দ্রলালের শ্রালক, একটি ম'ত্হারা কথা এবং তাহার বিবাহের জন্ত প'চ হাজার টাকা তাঁহার কাছে রাখিয়া সম্প্রতি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহেন্দ্রলাল স্তব বদলাইয়া বলিলেন, “তুমি বা বলছ, তা ঠিক বটে। যাক, আমি সবাইকে ঠাণ্ডা ক'রে দেব। তোমার বিয়ের সময়ে একটা ভাল তোজ দিলেই সূচি সম্বন্ধের তলে এ সব তলিয়ে যাবে।” তার পর তিনি অন্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, “কিরণ, ও কিরণ, পাণ দিয়ে যাও।”

অল্পক্ষণ পরেই একটি কিশোরী আসিয়া মহেন্দ্রলালের সম্মুখে পাপের ডিবা রাখিয়া বাইতে উত্তত হইলে, খপ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া কেলিয়া তিনি অশোককে বলিলেন, “অশোক, এটি তোমার কাকীমার ভাইঝি। এর বাপ মারা গেছেন, তাই এখানে নিয়ে এসেছি।”

অশোক চোখ তুলিয়া দেখিল, ক্রী ও ক্রী মণ্ডিত কিশোরী সূর্তি। মহেন্দ্রলাল হাত ছাড়িয়া দিতেই মেয়েটি চলিয়া গেল। তখন তিনি অত্যন্ত স্নেহের সুরে বলিতে লাগিলেন, “আমি আর তোমার কোন ওজর আপত্তিই স্তনব না। এই বৈশাখ মাসের প্রথমেই একটা ঠিক ক'রে কেলব। তিরদিন বাক নিয়ে বর করতে হবে, তাকে নিজের চোখে দেখে নেওয়াই ভাল, তাই একবার দেখাগাম। নইলে এর বা কি মরকার

ছিল? তুমি ত আমার ঘরের ছেলে, তুমি যে বাপ খুড়োর কথার ওপর কথা বলবে না, তা কি আমি জানিনে?”

অশোক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাকা, আপনি কি বলছেন?”

কাকা বিরক্তি গোপন করিয়া বলিলেন, “তোমার বিয়ের কথা বলছি।”

“বিয়ে করার সুবিধে এখন হবে না।”

“এবাক্ করলে। বিয়ে করার আবার সুবিধে অনুবিধে কি? সজ্ঞাত ঘরেব স্ত্রী মেয়ে। তোমার ত অযোগ্য নয় বাবা।”

“বোগ্যবোগ্যের কথা হচ্ছে না। এখন আমি বিয়ে করব না।”—বলিয়া অশোক প্রস্থান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

একমাস পরে চক্রবর্তী মহাশয়ের পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গ্রামের সকল ‘সামাজিক’ই নিমন্ত্রিত হইল, কিন্তু অশোকের নিমন্ত্রণ হইল না। অশোক ইহাতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইল না। সে জানিত, সেজকাকার স্ত্রীলোক কতটা বিবাহ করিয়া নগদ অস্ততঃ সাড়ে চারি হাজার টাকা তাঁহার লোহার সিল্কুকে তুলিয়া দিবার সহায়তা না করিলে সমাজের এই ব্রহ্মাঙ্গই বুক পাতিয়া লইতে হইবে।

তাঁহারই গৃহের পাশ দিয়া নিমন্ত্রিতগণ যখন কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল, তখন নিঃফল রুদ্ধ আক্ষেপে সে গর্জিতে লাগিল। একটা কলিত অপরাধের বোঝা তাঁহার মাথার চ’পাইয়া দিয়া এই যে প্রকান্ত অপমান, হঃসহ দণ্ড, ইহা সে কেন সহ করিতে বাইবে? সমাজের ধর্ম্মগুত্র বুদ্ধিষ্টিরণের চরিত্রের কথা ত তাঁহার অবিস্মিত নাই। এই অপমানের গুপ্ত নারক-বে মহেন্দ্রলাল, সে বিষয়ে অশোকের সম্বন্ধেই অবকাশ মাত্র ছিল না। সে একবার তাবিল, সেজ কাকাকে বেশ কড়া কড়া হুকথা শুনাইয়া আসা যাক্। কিন্তু আবার তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইল। ইচ্ছা

করিলে সে দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু সামাজিক সম্মানের মূল্য সে আক কোন মতেই অস্তরে স্বীকার করিতে পারিল না। পথের ধূলি কণার চেয়েও ইহা তাঁহার কাছে নগণ্য তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল।

এই সমাজের সুখ চাহিয়া সে প্রতিদিন একান্ত কাম্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে। কেন? সমাজ তাঁহার এমন কি করিয়াছে যে, তাঁহার বিনিময়ে সে আপনায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবে? নিজের হাতে নিজের জুৎপিণ্ড ছিড়িয়া ফেলিবে? এই ত সমাজ, যে সত্য মিথ্যা দেখিবে না, ভাল মন্দ বিচার করিবে না, মাছুষের স্বরকে অস্বীকার করিয়া চলিবে, তপাক্ষিত ইতর জাতের এতটুকু মহত্ব স্বীকার করিবে না, শুধু নির্ম্মম কঠোর হস্ত দণ্ডমানের জন্তই উদ্ভত করিয়া রাখিবে। ইহারই জন্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বস্বিত হইতে হইবে? না, না, সে তাহা পারিবে না।

সামাজিক সমস্যার নীমাংগার এবং ভাবী জীবন প্রবাহ কোন খাতে বহাইবে, তাঁহারই কল্পনার অশোকের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে সমস্ত রাজি ঘুমাইতে পারিল না। প্রথমে সে যখন শব্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহার মন শুক ও গ্লান দেখা গেল। তাঁহার অন্তরের স্বন্দ শেব চইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার চিত্ত দৃঢ় ও শান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অধরে ও নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব অভিব্যক্ত। সে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে বাইয়া বসিল।

কিছুকাল পরে বহু মণ্ডল আসিয়া অশোকের পারের কাছে এক তাঁড় ছাড়া রাখিয়া তুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। অশোক জিজ্ঞাসা করিল, “বহু, একি?” বহু লজ্জিত হাতের সহিত বলিল, “বাবু, গাইটা বিটরেছে, তারই একটুখানি ছাড়া।”

অশোক প্রসন্ন মুখে বলিল, “বেশ বেশ, সকাল বেলাই কিছু পাওনা হয়ে গেল।”

অধিকতর লজ্জিত হইয়া বহু বলিল, “আপনি বহু

লোক—কত উপকার পাই আপনার কাছে—একি একটা পাওনা হ'লো ?”

অশোক বলিল, “বাও, বাড়ীর ভেতর গিয়ে দুখটা বন্ধুর কাছে দিয়ে এস।”

বহু চলিয়া বাইতেই পাঁচ ছয় জন যুবক কোলাহল করিতে করিতে অশোকেব বৈঠকস্থানার প্রবেশ করিল। এই নিষ্কর্মার দল মাঝে মাঝে তাহার গৃহে চর্যা, চোখ, লেহু, পের দাগা পড়িতৃপ্ত হইয়া গৃহ সুখর করিয়া তুলিত, ইহাদের নিমন্ত্রণের দরকার ছিল না। স্তূর্ত উপদ্রবের মত আসিয়াই ইহারা অশোকেব কাছে খাবার আদায় করিত। আজ ইহাদের দেখিয়া, কল্যকার ঘটনার লজ্জা ইহাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করনার অশোক ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা কিন্তু অশোকেব করনার ধার দিয়াও গেল না। তাহাদের কেহ বা বাগিয়া কেহ বা দাঁড়াইয়াই চক্রবর্তীর উদ্দেশে স্রগ্ধর মিত্র বচন বর্ণন করিয়া, বোধ করি শুষ্ককণ্ঠ হইয়া পড়িল। তাই অতুল অশোকেকে বলিল, “আরে, তুই তামাক খাসনে বলে আমাদেরও কি দিতে বলতে নেই? কিছু তজ্জতা জানিস নে, তাই তো চক্রবর্তী তোকে একঘরে করেছে।” বলিয়া নিজেব রসিকতার নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রভুর আদেশে হক আসিয়া তামাক দিয়া গেল।

তামাক খাইয়া খগেন বলিল, “আমরা কি ঠিক করেছি জানিস অশোক? ছাব্বিশে বোশেখ চক্রবর্তীর ঘরের বিয়ে। সেই বিয়েটা পণ্ড ক'রে বেটাকে বিয়ের সভার মাঝখানে বেহুদ নাকাল ক'রে তবে ছাড়ব। আমরা তার কন্দি টন্দি ঠিক ক'রে রেখেছি। সেই সঙ্গে তোর সেজ কাকার তত্ত্বাসীটাও আচ্ছা ক'রে ভেঙ্গে দেব।”

অশোক বিশেষ করিয়াই জানিত যে, এই সকল সাহসিক কৰ্ম্মে এই বীরপুরুষেরা পশ্চাৎপদ বা অপটু নহে। সে বলিল, “ছি, তাই, এসব কাব কখনো করিস নে। বুড়োর দল আমার একঘরে করলেই বা;

তোরা তো আমার ত্যাগ করিস নি। ওরা আর ক'দিনই বা বাচবে ?”

বীরেন গর্জিয়া উঠিল, “রেখে দে তোর লেকচার। আমরা তোর মত বি-এ এম-এও পাস করিনি, সত্য-তব্যও হইনি। আমরা শোধ তুলে ছাড়ব। মিথ্যাবাদী তত্ত্বের দল।”

এখন এই উত্তেজনার মুখে কিছু বলা বৃথা বুঝিয়া অশোক বলিল, “এখনি তো আর শোধ তুলছিস নে, তারও তো কয়েকদিন দেরী আছে। আর পাশা খেলি।”

পরেশ বলিল, “এখন নয় ও-বেলা খেলব। আর কাল আমরা সবাই তোর এখানে খাব, নেমন্তন্ন ক'রে গেলাম।”

অশোক বলিল, “আমার এখানে খাবি কিরে? তোদের বাপেরা কি বলবেন?”

অতুল বলিল, “বা বলবেন, তাতো আর তোকে শুনতে বেতে হবে না। সে ভেবে তোর কাব কি?”

বীরেন সজীঘের বলিল, “বেলা হয়ে গেছে, এখন চল বাই।”

তাহারা বাইতে বাইতে অশোকেকে বলিয়া গেল, “মাংসে চাই কিন্তু। তোমার বিধু ঠাকরুণকে দিয়ে চলবে না, ভাল রাঁধুনি যোগাড় ক'রো।”

আর একজন অক্ষুটে বলিল, “রাঁধুনি মাখবী হ'লেও আমাদের আপত্তি নেই।”

কথাটা অশোকেব কাণে গেল না। সে চুপ করিয়া বলিয়া ভাবিতে লাগিল, যৌবন জিনিসটা অতুলনীরই বটে। ইহা নির্ভীকতার খনি, সমস্ত শুভ ও অশুভ কৰ্ম্মের উৎস। কিন্তু অশোক ইহাও জানিত, যুবকেরা আজ তাহার গৃহে খাইয়া গেলেও, প্রয়োজন হইলে কালই তাহাদের অভিভাবকেরা সেই ভোজন ব্যাপারটাকে অস্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

ছপুৰ বেলা খাওয়ার পর অশোক চেঁচা করিয়াও ঘুমাইতে পারিল না। আজ মাখবী একবারও এখানে আসে নাই। গোপাল মাখবীর কাছে চার পাঁচবার গিয়াছে। মাখবীর আসিতে দেরী হইলে সে এই

রকমই করিত। অশোক কাহারও অভাব অভিযোগ বুঝিয়া বন্ধ করিতে পারিত না, নিজের অভাব পূরণ করার শক্তিই তো তাহার কোন দিনও ছিল না, তা আবার অভ্য! কাবেই গোপালের সমস্ত ভারই মাধবীর উপর পড়িয়াছিল। গোপালও ছুই মাসের মধ্যে আশ্চর্য রকমে মাধবীর বশ হইয়া গিয়াছিল। গোপাল চার পাঁচবার আনা-গোনা করিয়া আপন মনেই অভিমানক্লান্ত কর্তে একবার বলিয়া উঠিয়াছিল, “হা আজ কেবল তার বাড়ী ব’সে কাবেই করছে, একবারও আমাদের বাড়ী এল না। আমিও আর বাচ্ছিনে।”

কথাটা অশোকের কাণে গিয়াছিল। কালিকার ঘটনাটা যে মাধবীকে কতখানি বেদনার, কতখানি ক্ষতিতে, কতখানি অপমানে বিবাহিয়া তুলিয়াছে অশোক তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিল। আরও বুঝিল, নিঃশব্দে এই বিষ গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দেই সে সহিয়া যাইবে, এ ভক্ত একটা কাতরোক্তি প্রকাশ করিতেও সে স্তম্ভা বোধ করিবে। অশোক জীবনের হিসাবটা আগাগোড়া খতাইয়া দেখিল, খরচ তো তাহার বিশেষ কিছু হয় নাই, জমার পাওরই তরিয়া উঠিতেছে। মাধবীর কাজ এই যে সর্ব্বশেষে ক্ষতি, এও তো তাহারই দেওয়া। এই ক্ষতি সে জীবন তরিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিবে।

অশোক কি একটা কাবে বৈকালে ঘোহনগঞ্জে গিয়াছিল, কিরিয়া ঘরে উঠিতে না উঠিতেই গোপাল ছুটিয়া আসিয়া একমুখ হাসি লইয়া বলিল, “মাকে কোর ‘ক’রে খ’রে এনেছি, ওপরের ঘরে বন্ধ ‘ক’রে রেখেছি। দেখবেন, চলুন।” বলিয়া অশোকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। উপরে উঠিয়া বাহির হইতে নিকল বন্ধ একটা ঘর দেখাইয়া চুপি চুপি বলিল, “এই ঘরে। মাকে আজ ছেড়ে যেবেন না। যেমন আসেনি, তেমন সাজ। আমি নীচে বাই, বুড়ি কেলে এসেছি, কে আবার নিরে যাবে।” বলিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

অশোক দরজা খুলিয়া ঘর ঢুকিয়া দেখিল, মাধবী

কোলের উপর বই রাখিয়া খোলা জানালার কাছে বসিয়া পড়িতেছে। সে দরজা খোলার শব্দ পাইয়া কিরিয়া বলিল, “এগেছ? ছেলেটা আমাকে হু’শক্টা বন্ধ ‘ক’রে রেখেছে। কিছুতেই দরজা খুলে দিলে না। কি যে ছুট হচ্ছে, একটুও শাসন করনা তুমি!”

অশোক এ সকল কথার জবাব না দিয়া অদৃশ্য বিশ্বরে বলিয়া উঠিল, “তুমি পড়ছ? আমি ভাবছিলাম—”

“তুয়ে তুয়ে কাঁদছি? কেন কাঁদব? ঠাকুরী বলেন, ‘হা অনিত্য, হা মিথ্যা, তার ভঞ্জে শোক করতে নেই। আজ সেই কথাটাই আমার বার বার মনে হয়েছে।” বলিয়া মাধবী হাসিল।

হাসি দেখিয়া অশোকের তর হইল। এই হাসি কি অশ্রুর উৎস হইতে স্বতঃ উৎসারিত? নারী জীবনের কঠোরতম আঘাতের চিহ্ন সে তো তাহার মুখ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া লইতে পারে নাই। অশোক সহসা কোন কথাই বলিতে পারিল না। তাহার সান্নিধ্যও মাধবীকে এমনি স্থির রাখিবে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সে নির্বাক বিশ্বরে মাধবীর পানে চাহিয়া রহিল।

মাধবী তাহার আঁচল হইতে একখানা চিঠি খুলিয়া অশোকের হাতে দিয়া বলিল, “বাবার চিঠি আজ এসেছে, পড়ে দেখ।”

অশোক চিঠিখানা পড়িল—

“হা, শ্রীধাম বৃন্দাবন আনন্দের হাট। যদি অতদূরে তোমাকে কেহিয়া না আসিতাম তবে আনন্দ পূর্ণ-মাজার ভোগ করিতে পাইতাম। বখনি মনে হয়, বৃন্দাবনের ধূলির সঙ্গে বশোদা-দুর্গারের রাঙাচরণ ছ’খানির ধূলি মিশিয়া আছে, বখনি মনে হয় সংস্রব প্রেমিকের সঙ্গে তিনি এইখানে কত লীলা করিয়াছেন, বখনি মনে হয় বসুনার নীল জল নীলরতনের স্পর্শ পাইয়া ধক্ত হইয়া আছে, তখন আর এতান ছাড়িয়া বাইতে ইচ্ছা হয় না।

“যেদিন কেশবের সঙ্গে তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে বাইতেছিলাম, সেদিন তোমাকে লুকাইয়া

কাদিতে দেখিয়াছিলাম। তুমি তাহা জান না। কিন্তু সে দিন বুঝিয়াছিলাম, বিবাহে তোমার ইচ্ছা নাই। এখন যদি তোমার মনের পরিবর্তন হইয়া থাকে, ভালই, আমি আশিরা তোমার বিবাহ দিব। আর যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে ঠাকুদাকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে। আমি তাঁহাকেও চিঠি লিখিলাম। তোমার যদি না আসা হয়, আমি যত সঙ্কর পারি চলিয়া আসিব। ইতি।”

অশোক চিঠিখানা মাধবীর হাতে কিরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ চিঠির কি জবাব দেবে? কি করবে তুমি?”

মাধবী স্নিত মুখে বলিল, “এবার সত্যিই গোপী-বল্লভের আহ্বান এসেছে। একে আর অনাদর বা উপেক্ষা করা চলবে না।”

অশোক অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বাহিরের দিকে চাছিল। তারপর আরত সজল নেত্র মাধবীর মুখপানে স্থির করিয়া বলিল, “সবাই যখন আম'কে ত্যাগ করেছে, তুমিই বা বাকি থাকবে কেন মাধু?”

“তোমার ত্যাগ করব? আম'কের দিনটিতেও তুমি আমার ভুল বুঝ কেন।”—বলিয়াই মাধবী বর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অশোক বিচলিত হইল। সে চেয়ারের উপর বসিয়া ছিল, একটু নত হইয়া মাধবীর হাত ছুঁনি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিল, “মাধু, পরস্পর আমরণ ছাড়াছাড়ি হ'রে থাকা ছাড়া আমাদের আর কি কোন উপায় নেই? বল, বল, বিমুখ হ'রে চূপ ক'রে থেক না।”

অশোকের সেই কষ্ট মাধবীর সকল বঁধ ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেল। সে অশোকের হুই পারের মধ্যে মুখ তুলিয়া দ্রুত কণ্ঠে বলিল, “আর কি উপায় আছে? কি করতে পারি বল?”

অশোক সাগ্রহে সঙ্গেহে মাধবীর মুখ ধানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, “তোমাকে ভালবেসে অস্ত্রায় করেছি বলে কখনও মনে হয়নি। সমাজের সব নিয়ম মেনে চলাই বে

ধর্ম, তাও আজ আমার মনে হচ্ছে না। বে সমাজ মিছামিছি আমাদের এত বড় একটা শাস্তি দিলে, তারই আদেশ মাথায় করে নিলে, ছদ্মবেশে অস্বীকার ক'রেই কি আমাদের থাকতে হবে? ইচ্ছা করলেই তুমি আমার হ'তে পার। এই বিবাহ সমাজ কখনো অমুসেদন করবে না জানি; কিন্তু তগবান যদি জগতের সব দম্পতীকে আশীর্বাদ করেন, তবে আমরাও তাঁর আশীর্বাদ লাভে বঞ্চিত হব না।”

মাধবী নিজের হৃদয়ের মত অশোকের হৃদয়ও জানিত, তথাপি অশোকের মনে যে এমন অসম্ভব আশা জন্মিাছে তাহা কখনও জানিতে পারে নাই। তাহার হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দ্রুত তালে ছলিয়া ছলিয়া উঠিতে লাগিল। সে, কথা বলিতে পারিল না। তাহার নীরবতা অশোককে বৈষ্যচ্যুত করিয়া ফেলিল। সে অধীর আগ্রহে বলিল, “কথা বল মাধু; বল, আমাদেরও মিলবার পথ আছে।”

মাধবী শাস্ত অগচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, “না, এরম্বে নয়।”

অশোক হিঙ্কসা করিল, “নয় কেন মাধু?”

অশোকের তথ কণ্ঠ মাধবীকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। তবু সে স্থির কণ্ঠে বলিল, “দেখ, সমাজ আজ গড়ে ওঠনি। এর শত শত বছরের নিয়মগুলি আমাদের স্বভাবের সঙ্গে মিশে গেছে। একে আর আলাদা ক'রে ভাববার উপায় নেই। আজ রাগ করে বাই বলনা কেন, সমাজ কি বর্জনীয়? কেউ সমাজ ছেড়ে থাকতে পারে? না, থাকা উচিত? বুড়ো মা বাবা যদি ভুল বুঝে আমাদের শাসন করেন, তা হ'লে আমরা ক্ষণ পাই, রাগও করি বাটে; কিন্তু তাঁদের মেহের প্রয়োজন, শাসনের প্রয়োজন কি তখনই শেষ হ'য়ে যায়? তাঁদের তৃপ্তি লাভের চেষ্টা, মেহ লাভের চেষ্টা আমরা কেউ কখনো কোন অবস্থাতেই ছাড়তে পারিনে। আমার মনে হয়, সমাজও বুড়ো বাপ মার মত মাঝে মাঝে ভুল বুঝে বসে। কিন্তু এর বিধান গুলি একেবারেই অগ্রদোহনীয় অর্ধশূন্য নয়। সমাজ থেকে আলাদা হ'য়ে থাকা যে কত বড় দুঃখ, কত বড় আপমান, তাতো একটি দিনেই বুঝতে পেরেছ।

মা বাপ হ'লে, সম্মানের ক্ষেত্রে কে এই দুঃখ অপমান সঙ্কিত ক'রে রেখে যেতে পারে? সমাজ ছাড়া বা তাকাই কি বড় কাব? চেষ্টা ক'রে এর ভুল গুলি শোধরান কি কাব নয়?"

অশোক বলিল, "অত কথায় কাব কি? সামাজিক সম্মানটাই তোমার কাছে সব চেয়ে বড় এই একটা কথা বলেই তো হ'তো।"

মাধবী বলিল, "ইচ্ছা ক'রে ব্যথা দেবে তার কি করব? বা বলে, তা বলি সত্যি ক'লেই জানতে, তা হ'লে সমাজের শীর্ষস্থান থেকে আমারই জন্তে এতখানি নীচে নেমে আসতে চাইতে না। সহস্র সুখের প্রলোভনেও তোমার দুঃখ অপমান আমি সইতে পারব না। তুমি হুর্জভ, তাই আমার এত শ্রিয়; তাই তোমার মূল্য তোমার মর্যাদা আমার কাছে সকলের উপরে। জন্মান্তর তুমি ম'ন কিনা

জানিনে, কিন্তু আমি মানি। তোমার সেবার অধিকার,— আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দ—একদিন এগে আমার হাতে ধরা দেবেই। আমি সেই দিনটাকে জুগুপ্স করবার জন্তেই বৃন্দাবনে চললাম। তুমি আজ খুশী মনে আমার আশীর্বাদ কর, আমার তপস্বী সার্থক হোক, মেগবার পথ বেন আমার অনতিক্রম্য হ'রে থাকে না।"

বহু কষ্টে অশোক অশ্রু দমন করিয়া স্থির হইয়া রহিল বটে, কিন্তু একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না। মাধবী অগ্রনয় হইয়া, তাহার পারে মাথা রাখিতেই অশোক জুগুপ্সীর রেহে তাহার মাথাটি বন্ধ লগ্ন করিয়া তাহার ললাট চুষন করিল। সুহৃৎ উভয়ের অশ্রুধারা মিলিত হইয়া গেল।

সমাপ্ত

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

শ্রুতি-স্মৃতি

[পূর্বানুস্মৃতি]

ষষ্ঠদিন বাহিরে থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মাতার নিকট হইতে ভ্রমণের অনুমতি পাইয়াছিলাম, তদনুযায়ী অধিকদিন হইয়া গেল। গৃহে মাতা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগমনের অন্ত তার বাইতে লাগিল। যে স্থানে বেশী দিন থাকিতে হইয়াছে সেখানে চিঠিও পাইয়াছি তাহাতে কিরিবার অন্ত মাতার সনির্বন্ধ অনুরোধ—বাহার অর্থ আদেশ। বঙ্গদেশে আমার জন্ম, জন্মাবধি নাটোর, রাজসাহী এবং কলিকাতা ভিন্ন তারতের অন্ত কোন স্থান দেখিবার আমার সুযোগ তৎপূর্বে হয় নাই। বিভাগের শিক্ষার সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিতে হইত এবং তাহা বর্তমান সময়ের "ঐচ্ছিক" (optional) নহে, "বাধ্যতামূলক" (compulsory) ছিল; সুগু হইতে কলেজ পর্যন্ত

ইতিহাস পড়িতেই হইত, কেবল বি-এ পড়িবার সময়ে ঐচ্ছিক ব্যবস্থা করা বাইতে পারিত। ইতিহাস শুনিয়াছি অনেক ছাত্রের ভাল লাগে না, আমার ভাল লাগিত; মাটক নভেল পড়িতে যেমন অনেকের ভাল লাগে, ইতিহাস আমার তেমনই ভাল লাগিত। সময় পাইলেই স্কুল কলেজের পাঠ্য ব্যতীত অনেক বড় বড় ইতিহাসের কেতাব কলেজ লাইব্রেরি হইতে আনিয়া পড়িতাম, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে আমি অধিক আনন্দলাভ করিতাম। সেই সকল ইতিহাসে বর্ণিত ভারতের নানা স্থানের কথা, মোগল-পাঠানের দিল্লী আগ্রার কথা, মুসলমান শেখ স্বাধীন নরপতির লক্ষ্মীর কথা, শিবাজীর বাহুবল্লভ পশ্চিম ভারতের গিরি-পরিবেষ্টিত পুণা সেতারার বৃত্তান্ত, রাজ-

পুত্রের রাজগুণ্ডার কাহিনী পড়িত পড়িতে সেই সকল দেশ দেখিবার প্রবল ইচ্ছা আমার মনে হৃদয়নীর হইয়া উঠিয়াছিল। সে সুযোগ বখন আসিল, সত্য সত্যই বখন ভারতের ব্রাহ্মণ্য সত্যতার কেন্দ্রস্থল বারাণসীতে, মোগলের লীলা-নিষেকতন দিল্লী আশ্রয় গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, তখন মাতৃ-আদেশ সত্ত্বেও নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আর অধিক বিলম্ব করিলে মাতা ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, সেই ভয়ে সেবারে দিল্লী হইতেই দেশে ফিরিলাম। ইচ্ছা রহিল যথাসম্ভব সত্বর একটু সুযোগ করিয়া লইয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়িব।

বাড়ী আদিয়া একটু বিশ্রাম করি হইলাম। আমার একবিংশতিবর্ষ পূর্ণ হইবার আর এক বৎসর মাত্র বাকি। মাতা আদেশ করিলেন, “জমীদারী কার্য শিক্ষা কর, —আর অল্প দিবস পরেই বখন কার্যভার তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তখন তৎপূর্বে আমাকে সাহায্য কর, সেই উপলক্ষেই তোমার শিক্ষা হইয়া যাইবে।” মাহুয তাবে এক, হয় আর।

উপায় নাই, মাতার অতিপ্রায় মত কার্য করিতেই হইবে, এবং বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাত্রই পুনরায় ভ্রমণার্থ বাহির হইবার উপযুক্ত কারণও খুঁজিয়া পাইলাম না। মা যদি অনুমোদন না করেন, তবে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কায করিবার মত সাহস আমার কোন কালেই হয় নাই। আজ কাল শুনিতে পাই যে, পিতা মাতার ইচ্ছা এবং আজ্ঞার প্রতিফুলেও কার্য করা স্বাধীনচেতার লক্ষণ, গুরুজনের আজ্ঞা পালন নাকি “মানসিক দাওস্তর” অপর এক নাম। আমরা সেকালে শিক্ষকদিগের নিকট বৈরাগ্য শিক্ষা পাইয়াছিলাম, তাহাতে বরং “মানসিক দাওস্তর”ই আভ্যন্তরীণ কিছু অধিক মাত্রার ছিল। নিরুপায় হইয়া মাতৃ-আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হইলাম, কিছু কালের অন্ত ভ্রমণেচ্ছাকে কারকক্ষেণে দমিত রাখিতেই হইল। নিত্য প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে জমানবীশ, স্ত্রীমানবীশ, মুনসী প্রভৃতি কর্মচারীগণ বৃহৎ বৃহৎ খাটা-পত্র লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল। জমাগোরাশীল বাকি, একবার,

তেরিফ, বারিফ, একওয়ান, নিসন্ত বংখাত, আদার তহশীল, ইরগাল প্রভৃতি সেরেক্তার প্রচলিত নামগুলি আরম্ভ করিতেই আমার বহু সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, কারণ আসল কথা এই যে, উহাতে আমার মন ছিল না, সর্বদাই তাবিতাম, কি সুযোগে পুনরায় বাহির হইব, কত দিন পরে সে সুযোগ আসিবে। কর্মচারীগণ আসিয়া আমার সম্মুখে কাগজ খুলিয়া পড়িয়া বাইতেছে, আমি দিগন্তের দিকে চক্ষু দিয়া দেশান্তরের কথা ভাবিতেছি। একরূপ অবস্থার শিক্ষা কত দ্রুত অগ্রসর হয় তাহা আমার পাঠক পাঠিকাগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। প্রণয়ার্ত্ত নর-নারী যেমন প্রিয়জনের চিত্তার নিরন্তর ভ্রমর হইয়া থাকে, আমারও প্রায় তদ্রূপ দশা উপস্থিত হইয়াছিল। নূতন প্রেমের মত নূতন দেশ দর্শনের স্পৃহা আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, জমা-ওয়ানশীল বাকির জীর্ণ জটিল খাতার দিকে মন কি দেওয়া যায়?

যাহা হউক কোনরূপে দিন কাটিতে লাগিল— দিন ত কাহারও সুখ দুঃখের অন্ত বসিয়া থাকে না। ক্রমে ক্রমে বৎসরাধিককাল কাটিয়া গেল। ৮শাব্দীর পূজার পরে এক অক্টোবরের ২ই তারিখে আমার একবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল। প্রথাগুণারে দৈব-কর্ম ও রাজবংশের বিধি-বিধানমত উৎসবান্তে কার্যভার আমার উপরে সমর্পণ করতঃ মাতা নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার ধর্ম-কর্মে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। বিষয়-কর্ম জটিল এবং তাহাতে আনন্দও বিশেষ নাই, তবে কর্তব্য করিতেই হইবে বলিয়া যথাসাধ্য তাহাতে মন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিছু কালের অন্ত দেশ ভ্রমণার্থ বাহির হইবার ইচ্ছা মন হইতে দূর করিতে হইল, কারণ বিষয়-কর্মে আমি নূতন ব্রতী, কর্মচারীগণ আমাকে উহাতে নিয়ত নিবিষ্ট রাখিবার অন্ত সমস্ত ব্যাপারেই আমার মতামত লইতে লাগিলেন, অধিক অবসর পাইবার আর উপায় রহিল না।

এই ভাবে যে সময় কাটিয়া গেল তাহা নিতান্ত নগণ্য নহে; ইতিমধ্যে আমার একটি পুত্র সন্তানের

অন্ন হইল। জন্মের প্রায় তিন মাস পর হইতেই নব-জাত শিশু ইনফ্যান্টাইল লিভার রোগে ভুগিতে লাগিল, অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুর প্রাণ রক্ষা হইল না। আমার মাতৃদেবী এবং শিশুর জননী শোকে নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপের রাজ্য কিছু অধিক। ডাক্তারগণ বলিলেন ম্যালেরিয়ার ইনফ্যান্টাইল লিভার অসুখইরাছে, তবিশ্রুতে অপর শিশুর জন্ম হইলে তাহাকে রোগের পূর্বেই স্থানান্তরিত করিতে হইবে। চিকিৎসকগণের উপদেশ রহিল বটে কিন্তু কার্যাতঃ তাহা ঘটিল না। কিছুকাল পরে একটি কস্তা সন্তান জন্মিত হইল, সে কস্তাটিরও সাতমাস বৎসর সময়ে বকুতের দোষে মৃত্যু ঘটিল। এবার ডাক্তারগণ বলিলেন যে, শিশুর জন্মের পূর্বেই শিশুর জননীকে স্থানান্তরিত না করিলে সন্তান রক্ষা করা কঠিন হইবে। উপধূপনি পোজ ও পোজীর মৃত্যুতে মাতা ঠাকুরাণীর শোকের অবধি রহিল না। ডাক্তারগণের ব্যবস্থামত তবিশ্রুতে শিশু জন্মবার পূর্বেই আমাদের জীকে স্থানান্তরিত করিবার বিষয়ে তিনি আর বিধা করিলেন না। সকলের পরামর্শমত আমার জীৱ কলিকাতা আসাই স্থিরীকৃত হইল, কেন না কলিকাতার ম্যালেরিয়ার বিশেষ আধিক্য নাই, এবং শিশুর কোন ব্যাধি পীড়া হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সাহায্যও পাওয়া বাইতে পারিবে। মাতা গৃহ-বিব্রহ ভ্রামহুন্দরের সেবা ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত অধিককাল থাকিতে পারিবেন না, সুতরাং জীৱ সহিত আমাদেরই আসিতে হইল। যে সকল ঘটনার কথা বলিলাম সে সমস্ত ঘটতে প্রায় তিন বৎসরের অধিককাল কাটিয়া গেল। যখন কলিকাতার আসিলাম তখন আমার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর হইবে। সেই সময় হইতে রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূত্রপাত হইরাছিল। আজ যে শাসন পরিষদে বহু সদস্য নির্বাচিত হইতেছেন, সে দিনে সমস্ত বল বিহার উড়িয়া হইতে পরিষদে পাঁচজন মাত্র সদস্য লওয়া হইত, এবং সেই পাঁচজনও বর্তমানের দ্বার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ছিলেন না, মিউনিসিপ্যা লিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে সভ্যগণের দ্বারা

মনোনীত হইতেন মাত্র, তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন গভর্ণমেন্ট। সুতরাং বাবু (অথবা তত্বে সুব্রহ্মনাথ) আমাদের সদস্য পদ প্রার্থী হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টারোধ আরম্ভ করিলেন। অশ্রান্ত পক্ষবিশেষিত বৎসরের যুবকের রাজনীতির অভিজ্ঞতা সে দিনে প্রায় কিছুই হইত না। আমি বতাই সময়ে পঞ্চাৎপদ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, সুব্রহ্মনাথের নির্বন্ধা-তিশ্য ততই বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল কলতঃ রাজসাহী বিভাগের মিউনিসিপালিটি সমূহ আমাদেরই মনোনীত করিল এবং তদানীন্তন ছোটলাট স্যার চার্লস এলিয়ট সে মনোনয়ন মঞ্জুর করিয়া লইলেন। তদবধি লর্ড কারমাইকেলের সময় পর্যন্ত আমি একাধিকবার শাসন পরিষদে আসিয়াছি; কিন্তু সে সকল রাজনীতির নীরস কথাই পাঠক পাঠিকার বৈধব্যচ্যুতি ঘটাইবার ইচ্ছা আমার নাই।

কলিকাতা আসিবার কিছুকাল পরে আমি একবার পীড়িত হইলাম। পীড়া বিশেষ কিছু নহে, কাণের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণ হইতে লাগিল এবং ত্রণের ব্যাধা ভয়ঙ্কর ও সেই ব্যাধার সত্বে অন্ন। ডাক্তারগণ বলিলেন দ্রাব্য মন্দ হইরাছে—তাঁহাদের ভাবার বলিলেন, "Your health is below par." ইহার অর্থ বাহাই হউক, তাঁহারা বলিলেন "Go for a change". আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করিবার পথ পাইলাম। চিকিৎসকগণ বলিলেন, "সমুদ্রতীরে যাও।" সে দিনে পুরী ক্যাসান প্রচলিত হয় নাই, তাই অ্যাগও হয়ত তাৎপূর্ণ স্থপরিজ্ঞাত ছিল না। সমুদ্রতীরে থাকিবার স্থান প্রায় কোথাও সে দিনে পাওয়া বাইত না—ইষ্ট কোস্ট রেলওয়ে তখন খুলে নাই, গোপালপুরের নামও সে দিনে কেহ জানিত না। সুতরাং বোম্বাই সহরই একমাত্র গন্তব্যস্থান, বাহা সমুদ্রতীরেও বটে এবং থাকিবার মত স্থানেরও সেখানে অভাব নাই, কারণ সমগ্র ভারত-বর্ষে বোম্বাই নগরী কলিকাতার সমকক্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, অনেকাংশে কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই ভাল স্থান ইহাও অনেকের মত।

সকল দিক দিরাই আমার দীর্ঘকালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ হইতে লাগিল, কারণ, ছত্রপতি শিবাজির বাহুবলে যে কোঙ্কণ গিরিমালা পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডে হিন্দু-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, সে ভূভাগ এই বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত। ভূগোল ইতিহাস এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের “জীবন প্রভাত” প্রভৃতি উপস্থানে, শিবাজী মহারাজের কোঙ্কণ প্রদেশের গিরি-দুর্গাবলীর অনেক কথা পড়িয়াছিলাম এবং সেই তরুণ বয়স হইতেই মহারাষ্ট্র দেশ এবং সেই দেশবাসিগণকে দেখিবার এক হৃদয়মণী ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। শুনিয়াছিলাম কোঙ্কণ প্রদেশেই আমাদের চিরদিনের চিরসংস্কারের মলয়চল, যেখানে চিরবল্লভ চিরবিরাজমান রহিয়াছে, যে মলয়ালে ভীমপুরন্দ্রী, চন্দনভক ইন্দ্রন রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

শুভক্ষণ স্থির করাইয়া, অপরাত্নে বাতী করিয়া গৃহান্তরে রহিলাম, পরে সন্ধ্যা নরটার সময়ে পাঞ্জাব মেলে রওনা হইলাম। সেকালে বোম্বাই মেল বলিরা পৃথক কোন গাড়ী ছিল না—বেঙ্গল নাগপুরের লাইন তখন খুলে নাই। তাহার কিছু দিবস পরে খুলিলেও, নতুন লাইনে পান তোলনাদি বিষয়ে নানা অসুবিধা বলিরা অনেকে দৈনিক দিরা দক্ষিণপথে বাইতে চাহিত না। এখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর বোম্বাই মেল একখানি স্বতন্ত্র গাড়ী এবং উহা শিউকী হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু আমি যে দিনের কথা বলিতেছি সেদিনে বোম্বাইয়ের রাজীকে এলাহাবাদ হইয়া বাইতে হইত। গাড়ী কিছুকাল এলাহাবাদে দাঁড়াইয়া পুনরায় নাইনী জংশন দিরা জব্বলপুর হইয়া বাইত।

আমার শরীর সে সময়ে খুব সবল ছিল না, সুতরাং পরামর্শ হইল যে, পথে বিশ্রাম করিতে করিতে বাওরাই কর্তব্য। এখান হইতে সন্ধ্যা নরটার বাতী করিয়া পরদিন প্রভাতে পাটনার নাহিলাম। কিন্তু ট্রেন মাঠার বসিলেন। পাটনার থাকিবার ভেমন ভাল স্থান পাওয়া কঠিন, যে সকল ভদ্রলোক ছই একদিন থাকিতে চাহেন তাঁহারা বাকীপুরে অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া লইয়া

থাকেন। আমরাও তাহাই করিলাম। পাটনা হইতে বাকীপুরে গাড়ী করিয়া গিয়া ডাকবাংলার আশ্রয় লইলাম। পাটনা পুরাতন স্থান হইলেও, সেদিনে সেখানে দর্শনীয় বিশেষ কিছু ছিল না। বাকীপুরও আর তরুণ, সুতরাং সেখানে ছই দিন মাত্র থাকিয়া এলাহাবাদে বাইবার ব্যবস্থা করিলাম। আমার সঙ্গী একজনকে আগে পাঠাইয়া একটি বাংলা ভাড়া করাইলাম, আমরা গিয়া সেই ভাড়ার বাংলাতেই উঠিলাম। আসবাবপত্র সে বাংলাতে বিশেষ কিছু ছিল না, তবে খাটিয়া এবং ভাল ছই একখানি চেয়ার বাহা ছিল তাহাতেই কাম চলিয়া গেল। এলাহাবাদে আমার এক মাতৃবলা থাকিতেন, এখনও আছেন। আমার যেনো মহাশয়ের নাম ছিল ডাক্তার এস, পি, রায়। তিনি এলাহাবাদের খ্যাতিনামা চিকিৎসক ছিলেন, এখন স্বর্গগত। মাসিমার সঙ্গে বখন দেখা করিতে গেলাম তখন অল্প বাসা লইয়াছি শুনিয়া অসুযোগ দিতে লাগিলেন। আমি কহিলাম “সঙ্গে অনেক লোক আছে, তোমার বাসার স্থান হইবে না বলিরা বাসা ভাড়া করিয়াছি।” সে কথাকে শুনে? তাঁহার অসুযোগ আর ফুটাইতে চাহে না। বাহা হউক, ছই বেলাই তাঁহার বাড়ীতে আহ্বানের প্রতিক্রিয়া লইয়া তবে আমাকে অব্যাহতি দিলেন। ডাক্তার এস, পি, রায় সেখানে সুপরিচিত, তিনি এলাহাবাদের তদানীন্তন খ্যাতিনামা বহুলোকের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। সে সকল বন্ধু জনের মধ্যে আজ অনেকেই লোকান্তরে গিয়াছেন, বাহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে হয় কলিকাতার নতুবা এলাহাবাদে কিংবা অপর কোন তৃতীয় স্থানে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।

এলাহাবাদে চারি পাঁচ দিন রহিলাম। এই কয় দিনেই আমার অসুস্থতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া গেল। যেনো মহাশয় আমার শারীরিক অবস্থা শুনিয়া নিজে ঔষধ দিলেন এবং বোম্বাই বাইবার সময়ে অনেকগুলি প্রেসক্রিপশন আমার সঙ্গে দিরা সেই সকল ঔষধ ব্যবহার করিবার অঙ্গ

বারবার অস্বস্তি করিলেন। সুদূর বিদেশে অস্বস্তি শরীরে কষ্ট না পাই সেইজন্য বোম্বাইয়ের এসিদ্ধ পার্সী ডাক্তার বাহাদুরজীর নামে একখানি পত্র লিখিয়া আমার সঙ্গে দিলেন। বলিলেন প্রয়োজন হইলে তাঁহাকেই বেন ডাকি। ডাক্তার বাহাদুরজী মেশোমহাশয়ের বিশেষ স্বস্তি ছিলেন, সুতরাং আমার চিকিৎসা তিনি স্বস্তি সহকারে করিবেন, সেইজন্য এই পরিচয় পত্র মেশোমহাশয় নিক্তে উভোগী হইয়া দিয়াছিলেন। সে পত্র ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় নাট, কারণ স্থান পরিবর্তনেই আমার শরীর ক্রমশঃ ভাল হইতেছিল, ঔষধ পত্রের আর বিশেষ কোন আবশ্যক হইল না। এলাহাবাদ পূর্বে আমি দেখিয়াছি, সুতরাং সেবারে আর অধিক ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হয় নাই। পথের প্রয়োজনীয় কোন কোন জিনিস, যাহা কলিকাতা হইতে লইয়া বাই নাই, সেইরূপ কিছু কিছু সামগ্রী কিনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সাগুরজী নামক পার্সী দোকানদারের দোকান হইতে সে সকল ডাক্তার রায়ের সাহায্যে ক্রয় করা হইল। দুই তিন দিবস খঞ্ঝবাগটি পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, কারণ খঞ্ঝবাপের গোলাপ ফুল পশ্চিমাঞ্চলে এসিদ্ধ। বস্ত্রভঃ তাড়ন বৃৎ এবং সঙ্গন্ধযুক্ত গোলাপ মধুপুর বৈষ্ণবনাথ অকল যতীত অত্র কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। রাজপুত্র খঞ্ঝর সঙ্গহজনক অপঘাত মুক্তার বিবাদ কাহিনী ঠাহার কবরের সহিত বিজড়িত থাকার সমগ্র খঞ্ঝবাগটিকে বেন শোকাছর ও স্নান করিয়া রাখিয়াছে—চিরবন্দী ও হুঃখী রাজকুমারের স্বপ্ন বেননা বেন রক্ত গোলাপ হইয়া ফুটরা উঠিয়াছে। তাই এই শোকনয় নিভৃত স্থানটিতে বারবার বাইবার প্রয়োজন আমি মমিত করিতে পারিতাম না। জবলপুত্র হইয়া বাইতে হইবে, ডাক্তার রায় জবলপুত্রে নামিয়া নর্মদার জল-প্রপাত ও মর্শ্বর-শৈল দেখিয়া বাইবার উপদেশ বারবার করিয়া দিলেন। উহা নিশ্চয়প্রয়োজন ছিল, কারণ রায়ের গাইড ও কেনের ইণ্ডিয়া হইতে সে সকল ভাষা আমি পূর্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এবং জবলপুত্রে নামিবার সঙ্গ আমার পূর্ক হইতেই ছিল।

চারি পাঁচ দিবস এলাহাবাদে থাকিয়া এক দিন অপরাহ্নে বে গাড়ীতে জবলপুত্রে রওনা হইলাম। সে ট্রেনখানি প্রাতে গিয়া জবলপুত্রে পৌছিত। সকাল বেলা নূতন স্থানে পৌছিলে থাকিবার স্থান-স্থির করিতে কষ্ট পাইতে হইবে না, এবং সমস্ত দিবস ঘুরিয়া বেড়াইবার দীর্ঘ সময় পাওয়া যাইবে, সেইজন্য ডাকগাড়ীতে না গিয়া এই অপেক্ষাকৃত মন্থর গতির ট্রেনই পছন্দ হইল, কারণ সেদিনে ডাক গাড়ী জবলপুত্রে বাইত প্রায় প্রায় রাজি শেষে। গাড়ী যখন জবলপুত্রে পৌছিল তখন ভোর হইয়া গিয়াছে, বেলা প্রায় সাতটা হইবে। অত্র কোথাও বাসার চেষ্টা না করিয়া রেল-স্টেশনেই রহিলাম। জিনিষ-পত্র বাহা সঙ্গে ছিল তাহা ওয়েটিংরুমে রাখিয়া স্টেশনেই আহাঙ্গারির ব্যবস্থা করিলাম এবং শীঘ্র শীঘ্র সকল কার্য সমাধা করিয়া লইয়া টাঙ্গা বোঙ্গে ভেড়াবাটের জল-প্রপাত ও নর্মদার গর্ভোখিত শুভ্র শৈলশ্রেণী দেখিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

জবলপুত্র রেলস্টেশন হইতে ভেড়াবাট অনেক দূরে, প্রায় ১১১২ মাইল পথ হইবে। টাঙ্গাগুলি একটু অভূত রকমের গাড়ী। সম্মুখে গাড়োরানের স্থান, তাহার বামপার্শ্বে একজন বসিতে পারে, এবং পশ্চাতে বিপরীত দিকে সুখ করিয়া ছইজনের স্থান হয়। গাড়ী সম্মুখে চলিতেছে, আরোহী পশ্চতের দিকে সুখ করিয়া বসিয়া থাকিলে, (জানি না সকলের হয় কি না) আমার বড়ই অস্বস্তি হয়; মনে হয় বুঝি গাড়ী হইতে পিছলাইয়া পড়িয়া যাইবে। সেই জন্য আমি কোচোরানের পাশেই বসিলাম। আমার সঙ্গী-দিগের মধ্যে ছইজন পশ্চাতে স্থান করিয়া লইয়া নিরুদ্বেগে মহানন্দে গমন করিতে করিতে বাইতে লাগিলেন। বিজ্ঞাঙ্গা করিলাম কোন অস্বস্তি হইতেছে কি না। তাঁহারা বলিলেন, অস্বস্তি হুঃ থাকুক, অস্বস্তি হইয়াছে; কারণ তাঁহারা অব এবং অখ-চালকের গাড়গন্ধ হইতে দূরে আছেন। কথা সত্য, কারণ ঐ প্রাণিযুগলের মেহ হইতে যে গন্ধ বাহির হইতেছিল, আভর, ওলাব, কতুন্নি, কুহুম বা অগন্ধ-

চন্দনের সহিত তাহার তুলনা কিছুতেই হইতে পারে না। টাকার অংশগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুত যার; এগার বার মাইল পথ যাইতে প্রায় দেড়ঘণ্টা সময় লাগিল, ঠিক গাড়ীর পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে।

নদীতীরে যেখানে ডাকবাংলা আছে, টাকাকুলি সাধারণতঃ দেইখানেই দাঁড়ায়। আমাদের টাকাও সেইখানে গিয়াই দাঁড়াইল। স্থানটি বড়ই মনোরম। “বিদ্যাপাদমূলে, উপল-বাঞ্ছিত গতি,” কলনাদিনী রেবা প্রবাহিতা, উত্তরতীরে খেতৈলমালা তাহাদের ইচ্ছাশির উর্দ্ধে তুলিয়া দিয়া নন্দনার স্বচ্ছ নীরে নিজ প্রতিবিম্ব যেন নীরবে নিরীক্ষণ করিতেছে; নৃত্যপরা নটীর নৃপুত্রিকণের স্তায় প্রসঙ্গ প্রতিহত নিবারণের স্বর্গ

মধ্যে অপেক্ষাকৃত চতুর এবং বাকপটু দুইজনকে আমাদের গাইড পদে বরণ করিয়া লইলাম। ডাক-বাংলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গাইডের সঙ্গে রওনা হইলাম। যথাক্কে ভেড়াঘাট বলে, অর্থাৎ নন্দনার জলপ্রপাত যেখানে বৃহৎ শিলাসমূহের উপর পিয়া নৃত্য করিতে করিতে ঘোর রবে চলিয়াছে, ডাকবাংলা হইতে সে স্থান প্রায় এক মাইল পথ। গাইড ডাক্তি আনিবার ব্যবস্থা করিতেছিল, আমরা তাহাকে নিষেধ করিয়া পদব্রজেই যাত্রা করিলাম। কিন্তু দেখিলাম কাষ ভাল করি নাই। এক মাইল পথ কিছুট নহে, কিন্তু যেখান দিয়া যাইতে হয় উহা পথ নহে, নতোরত উপল-বিকীর্ণ বঙ্গুর ভুমিখণ্ড, যাহার উপরে পাড়কা সহ



ডকবগপুর—নন্দনার শৈল

স্ব এবং কচিং বিহঙ্গ কাঞ্চী ব্যতীত আর সমস্তই সেখানে যেন নিষ্কল ধ্যাননিরত।

আমাদের টাকা আসবামাত্র চতুর্দিক হইতে গাইড গাইড রবে অনেকগুলি লোক আসিয়া আমাদের সঙ্গে বেঠন করিয়া ধরিল। আমরা তাহাদের

গমন অনভ্যন্তর পক্ষে কেবল কষ্টদায়ক নহে, বিপজ্জনকও বটে। অতি সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঐ ব্যাপার এতই প্রমসাদ্য যে ডিসেম্বর মাসের শীতেও বর্ষাক্ত কলেবর হইতে হইল। আমরা যে করজন ছিলাম তাহার

মধ্যে গাইড হইজন ছাড়া সকলেরই সমান অবস্থা। হুই একজন, মধ্যে মধ্যে বসিরা বিশ্রাম না করিয়া কিছুতেই বাইতে পারিলেন না। স্বতঃপ্ৰত্যয়েই আমার গতি বীর, অত পথ চলা আমার পক্ষে অসম্ভব, বিশেষতঃ আমি এই অসমতল উপলান্তীর্ণ ভূমির উপর বহু সাবধানে চলিতেছিলাম বলিয়া আমার সঙ্গী সকলেই প্রথমে হাসিতে আরম্ভ করিলেন। আমি সে বিক্ষিপ্ত নীরবে সহ্য করিতেছিলাম। কিছুকাল পরেই যখন সকলেই সমান অবস্থাপন্ন তখন আমার হাসিবার সময় আসিল। আমি প্রতিশোধ ভাল করিয়া লইব বলিয়া হাসিলাম না। যিনি সর্কাপেক্ষা অধিক শ্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার দিকে হস্তপ্রদর্শন করিয়া দিয়া বলিলাম, “আমুন, আমার হাতের উপর ভর দিয়া বীরে বীরে চলুন।” বলাবাহুল্য তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন, কিন্তু তথাপি নির্লজ্জের মত আমার হাতে ভর করিয়া কিছু দূর গেলেন।

এক মাইল পথ বাইতে আসনের প্রায় একঘণ্টা সময় লাগিল। মর্দবানী প্রপাতের নিকট পহুঁছবার পূর্বেই নৃত্যশীল নিকরের শিলাপ্রতিহত, উর্দ্ধে ংক্ষিপ্ত শীকরশি বায়ুবাহিত হইয়া আমাদের সর্কজে পড়িতে লাগিল। পরিধের শীতবস্ত্রগুলি প্রায় সম্পূর্ণই ভিজিয়া গেল, কিন্তু সেই শীকরসম্পাত, শ্রমজল পরিপূর্ণ দেহে যেন অমৃত বৃষ্টির ভায় বোধ করিতে লাগিলাম। পাছকা থলিরা প্রপাতের সন্নিকটস্থ অপেক্ষাকৃত অঞ্চল জলের মধ্যে আমরা সকলেই নামিয়া পড়িলাম। হস্ত-পদ, মুখ মস্তক, শরীরের উত্তমার্জ প্রায় সমস্তই শীতল জলে দ্রুত করিয়া লইবার পরে, শ্রান্তদেহে যেন নবজীবন সঞ্চার হইল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বহুক্ষণ প্রপাতের সন্নিকটবর্তী শিলাতলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি অপনোদিত হইলে, কিরিবার অস্ত্র প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু এবারে গাইড আমাদের ছরবস্থা দেখিয়া নিবেদন সঙ্গেও ডাঙি আনিয়াছিল। আমরা পালা করিয়া সকলেই এক একবার ডাঙিতে চড়িলাম, সেইজন্য প্রত্যাবর্তনকালে প্রপাত পরিশ্রম হয় নাই।

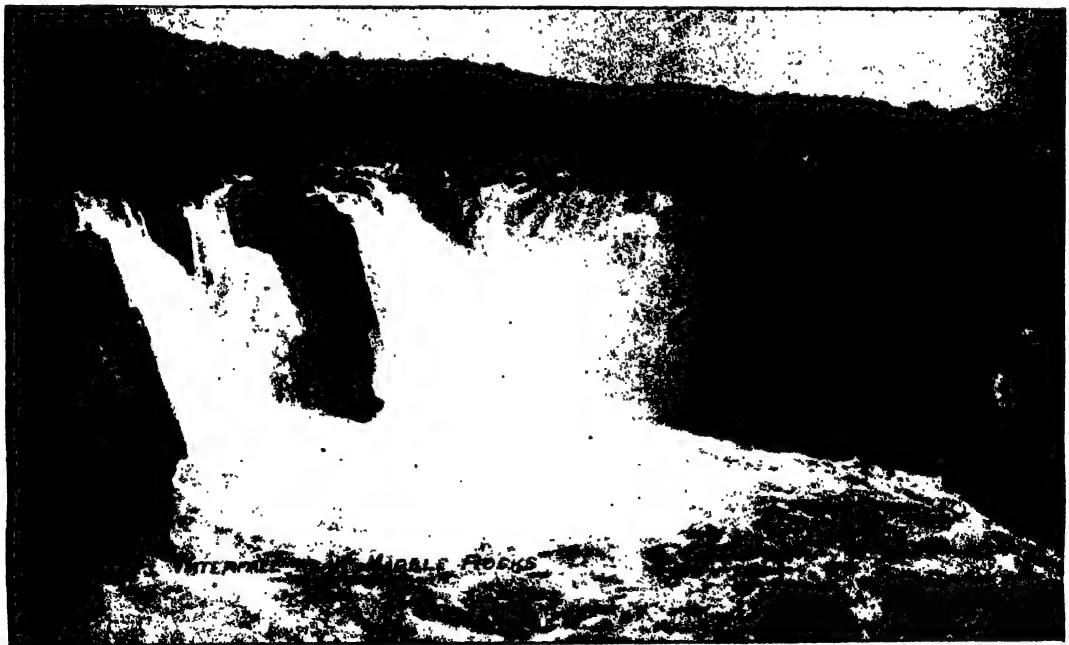
মার্কল রক দেখিতে নৌকার কিছুদূর বাইতে হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নৌকা ডাকবাংলার নিকটেই থাকে, মাঝিমালা ঠিক করিতে এক মিনিট সময়ও যায় না, কারণ ভ্রমণকারী সেখানে উপস্থিত হইলেই গাইড, ডাঙি ওয়ালা, মাঝিমালা সবলেই সেখানে সমবেত হয়। ভ্রমণকারীগণের নিকট হইতে বৎসরে ইহারা নিতান্ত কম উপার্জন করে না।

নৌকাখানি দেখিতে সুন্দর, পাঁচ ছয়জন লোক বেশ আরা ম বসিতে পারে। মালাগণ দাঁড় টানে, মাঝি পশ্চাতের গলিতে বসিয়া হা'ল ধরে। দাঁড় এবং হাল ইংরাজী ধরণের। ক্ষুদ্র নৌকা অথচ পাঁচ ছয়খানি দাঁড় বসাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে বর্ষার সময়ে নদীর স্রোতোবেগ অত্যন্ত প্রবল হয় স্রোতের প্রতিফল নৌকা লইতে হইবে, কারণ খেঁত শৈলশ্রেণী দেখিতে বাইতে উজান বাহিতে হয় স্রুতঃ দাঁড়ির সংখ্যা অধিক না হইলে বাওয়া হুফর। নৌকার উত্তীর্ণামাত্র মাঝি বলিল, সুখের সিগারেট কেনিয়া দিতে হইবে। কারণ জিজ্ঞাসার জা'নিলাম মার্কল রকের গারে মধুমক্ষিকার চাক রহিয়াছে, চুকটের ধূম দেখিলে তাহারা সেই ধূম উদ্দিগণকারী লোককে আক্রমণ করে। একবার হুইজন ইংরাজ সেনানী মার্কল রকের নিকট বন্দুক লইয়া শীকার করিতেছিল, মক্ষিকাগণ তাহাদের মধুচক্রে আক্রান্ত হইতেছে তাবিয়া ঐ শীকারিধরকে আক্রমণ করে। সে আক্রমণ এত ভীষণ যে সেনানী হুইজন নিকরায় হইয়া মর্দবানী জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং প্রবল স্রোতোবেগে নদীগর্ভস্থ শিলাসমূহে আহত হইয়া প্রাণ হারায়। পরে দেখিলাম, সৈনিকদ্বয়ের কবর সেখানে রহিয়াছে এবং প্রস্তরফলকে তাহাদের শোভনীয় অশ্রুত মৃত্যুর আনুগত্য বৃত্তান্ত লিখিত আছে। আর একখানি নোটশ বোর্ডে, মর্দবানীলের সন্নিকটে ধূমপান বা বন্দুকের শীকার নিষিদ্ধ বলিয়া লেখা আছে। আমি মাঝিঃ বিবেচ্যেই সুখের চুকট নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়া, নিতান্ত স্রুতি

বাগকের মত নৌকার হাত পা গুটাইরা বসিয়া
রহিলাম।

দেখিলাম, নর্মদার স্রোতবেগ নিত্যন্ত কম
নহে; স্রোতের এড়িকূলে যতই অগসর হইতে-
ছিলাম, স্রোতের বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সেই
ডিসেম্বরের শীতেও দাঁড়িগণ বর্ষাক্ত কালের হইয়া
উঠিল। আর একমাইল পথ অতিবাহনের পরে
নদী ক্রমেই সর্পিণ হইয়া আসিল। উত্তর পার্শ্বে
দেখিলাম, ভূবার্ধবল শৈলমালা আকাশে শির উত্তোলন
করিয়াছে। কি মন্দর ৭১ দূত! পর্বতের যে অংশ
খ্যেত নহে, সে অংশ নানাবিধ বৃক্ষলতাগুণ্ডে পরিপূর্ণ,
কিন্তু শৈলমালার খেতাংশে তরু, তৃণ, লতা কিছুই

দেখা যায় ছিল, এবং সে সকল দেবমন্দিরের প্রস্তরে
খোদিত কারুকার্যের তন্মাবশেষ আজও দেখিলে
বিস্মিত হইতে হয়। এখানে অতাপি দুই একটি
দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার সকল
শক্তিই জীর্ণ, ভগ্ন, পরিত্যক্তপ্রায়। এই স্থানের
লোকেরা বলে যে, ঔরঙ্গজেব যখন হিন্দুদেবালয়
ধ্বংস কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তখন
এই দূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সীমান্তস্থিত মন্দিরগুলিও
তাঁহার রোষদৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। জানি না
ইহার মধ্যে সত্য কতখানি আছে; তবে সত্য হওয়া
বিচ্যুত নহে, কারণ যখন বৃন্দাবনের গোবিন্দ, গোপীনাথ,
মদনমোহন, মথুরার কেশব, বারাণসীর বিশ্বনাথ কেহই



নর্মদা জলপ্রপাত

নাই, কেবল “কুন্দ-গুহা নরকাস্তি” খ্যেত শিখরী
অন্তগমনোন্মুখ রবিরাগ্রসম্পাতে বলমূল্য করিতেছে।
তরুণকের শেবার্ধের পরিপুষ্ট চন্দ্রকিরণ যখন এই
খেতৈলনের শিখরদেশে বর্ষিত হয়, তখন ইহার অপক্লপ
সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে।

প্রাচীনকালে এই বিজ্ঞাশিখরীর পাদমূলে অনেক

রাজরোষ হইতে অব্যাহতি পান নাই, তখন বিদ্যা-
পাদমূলের “চৌবটি ষোগিনী”ই বা মুক্তি পাইবেন কোন
শক্তির বলে? এই চৌবটি ষোগিনীর মন্দির-প্রাঙ্গণ
বিত্তীর্ণ, এবং সেই প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে প্রস্তর-প্রাচীর
গায়ে যে সকল অপূর্ণ খোদিত কারুকার্য আজও
রহিয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আধ্যাত্মিক

নানা আবর্তের বেগে হিন্দুর দেব-মন্দিরগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর যৌব বহু তাদৃশ প্রজ্জ্বলিত হইবার অবকাশ এবং অবসর পায় নাই। সেই জন্ত আজও বিক্ষোভ নক্ষিপে হিন্দুর কীর্তিচিহ্ন যাহা আছে, দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কতিপয় শতাব্দী পূর্বেও এই জাতির ধর্মপ্রাণতা কত অধিক পরিমাণে ছিল এবং কত সুদীর্ঘ সময়ে অল্পস্ব অর্থব্যয়ে এবং অক্লান্ত-শ্রমে এই সকল কার্য খচিত গগনস্পর্শী দেবায়তন নির্মিত হইয়াছিল। আমি একাধিক বার দাক্ষিণাত্যে গিয়াছি, বিদ্যা হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নগরী দেখিয়াছি, তাজোর, ত্রিচিনাপল্লী, নাছুরা, রামেশ্বর, বস্তাকুমারী প্রভৃতি স্থানে যে সকল বিচিত্র কার্যকার্য সমাধিত জ্বলন্ত দেবায়তন দেখিয়াছি, তাহা আজও ভগতের বিশ্বাস হইয়া রহিয়াছে। কেবল অর্থব্যয়ে বা রাজশক্তির প্রভাবে তাদৃশ সময় ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারিত না। আমার মনে হয়, যে সকল নৃপতি ও শ্রমজীবী এই কার্যে লিপ্ত ছিল, তাহাদের মন প্রাণ অন্তর দিয়া এই ধর্মকার্যে সহায়তা না করিলে এই বিরাট ব্যাপার নিষ্পন্ন করা মানুষের সম্ভব হইত না। ধর্ম আত্মা এবং ধর্মার্থে স্বেচ্ছাকৃত শ্রম ব্যতীত অসম্ভব ও ইলোরার বিপুল গুহা-মন্দির নির্মাণ মনুষ্য শক্তির অতীত ব্যাপার। এই সকল মানব ও পর্বত গুহার ভিত্তি গাঢ় ও শুষ্ক যে কার্যকার্য রহিয়াছে তাহার এক এক ক্ষুদ্রাংশের কাষ কাষতে বোধ করি এক এক জনের জীবন কাল অতবাহিত হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ দেবায়তন সমাধা করিতে ভারতের শিল্পী সম্প্রদায় কত পুরুষ ধরিয়া কাষ করিয়াছে কে কানে? যে সকল দেব মন্দিরের উল্লেখ করিলাম তাহাদের তুলনার অবলম্বনের চৌকিট যোগিনী বা উত্তর ভারতের বর্তমান যে কোন মন্দির নগণ্য বলিলেও অত্যাধিক হইবে না।

প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়া যুরিয়া যুরিয়া মর্শ্বদার জল প্রপাত, মর্শ্ব শৈল, ওগ দেব মন্দিরাদি দেখিয়া শ্রান্ত দেহে অপরাহ্ন ডাকবাঙ্গালার ফিরিলাম, এবং শ্রান্তি দূর

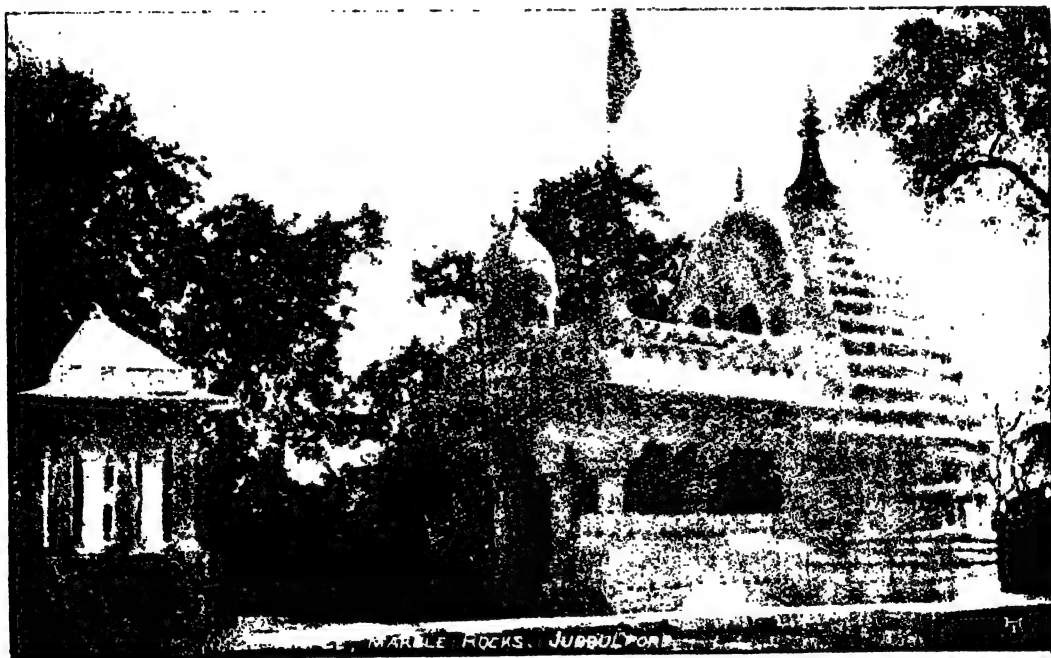
করিবার নিমিত্ত চা নামক রঞ্জিত উষ্ণোদক পান করিয়া কক্ষিৎ সুস্থ হইলাম। ফিরিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছি এমন সময়ে আমাদের ডাক বাঙ্গালার বারীন্দ্র পাথর বিক্রেতার ভরসা গেল। মর্শ্বদার স্রোত-চলিত বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরে নানাবিধ প্রায়াজনীর অপ্রায়াজনীর পদার্থ লইয়া তাহার হাজির হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ সামগ্রীর মধ্যে দেখিলাম কাগজ চাপা, কাগজ কাটা (paper knife), সাটের হাতার বোতাম (sleeve links) এবং নমনীয় প্রস্তর (flexible stone) প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক। প্রায়াজনীর পদার্থের মধ্যে কাগজ চাপাই একমাত্র পদার্থ দেখিলাম, এবং সেগুলি বিচিত্র বর্ণের মর্শ্ব প্রস্তরে, বিচিত্র আকারে নির্মিত; কতকগুলি তাহাই কিনিয়া কোন মতে বিক্রেতাগণের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম। কিন্তু গাইড আসিয়া তাহার 'খাতা' হস্তে দাঁড়াইল। তাহার পাশ্চাত্মিক বাহা পাইবার তাহা সে পাইয়াছে, এখন চাহিতেছে— "সাটিকফিক্ট", সে যে সমস্ত গাইডগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গাইড, সেই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। কি উপায়ে সে আমার পরিচয় সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল জানিনা, বোধ করি সঙ্গীয় কাহারও নিকট হইতে; এবং তাহার বিশ্বাস একজন "জীবন্ত" মহারাজার হস্তাকরে "সাটিক ফিক্ট" থাকিলে সেই বলে সে সমস্ত সাহেব লোক এবং বড় লোককে ধরিতে পারিবে। দেখিলাম, একটি মাত্র গাইড (জুইজন লইয়া গিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা একই দলের লোক), অথচ লিখিতে হইবে সে সর্বশ্রেষ্ঠ। একপা তুলনার সমালোচনা করা কঠিন হইল, কিন্তু করি কি? কোন মতে ইংরাজী ভাষার "কারুচুপার" সাধ্যা তাহার বাহা পূর্ণ করিলাম। ডাঙিওয়াল, নৌকাওয়াল, ডাক বাঙ্গালার চৌকিদার সকলকে কোন মতে খুসী করিয়া ওধা হইতে ষ্টেশনের দিকে ফিরিয়া চলিলাম। সেই রাজির মেল ট্রেনই বোম্বাই রওনা হইবার ইচ্ছা মনে মনে রহিল।

আরও ছই চারি বার অবলম্বনে গিয়াছি। প্রতি বারেই জল প্রপাত ও শৈল দেখিয়াছি। যে বার

আমার জীকে সঙ্গে করিয়া গিয়াছিলাম, সে বার নন্দা ভীরু ডাক বাজলার রাজি বাপন করিয়াছে; সৌভাগ্যক্রমে সে রাজি পূর্ণিমার রাজি ছিল। বীতিবিক্রম নন্দার বারি রাশির উপরে চতুর্দশ কিরণ সম্পাত দেখিয়াছি, কি অপূর্ণ সে শোভা! জীলোক সঙ্গে থাকিলে যে সকল বিপদ হয়, তাহাও হইয়াছে। নন্দার সলিলে অবতান করবার সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন আমার জী! উপায় নাই, জানের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই হইবে, অথচ কানাত দিয়া ঘাট ঘিরিতেও হইবে। কি সর্বনাশ, সে জললে কানাত কোথায় পাই? জবলপুরে সেই রাতে লোক পাঠাইয়া কানাত ভাড়া করাইলাম, ঘাট ঘিরিলাম, পুরোহিত আসিল—সে কি জাতি তাহা শপথ করিয়া বলিতে

ভূমিতে অধিককাল থাকিবার অবসর ও সুযোগ হইয়াছিল।

জবলপুরে ইংরাজদিগের একটি ক্লাব আছে, তাহার নাম নন্দা ক্লাব। এই ক্লাবের ইংরাজগণ তিনিয়াছি সপ্তাহে এক বা দুইদিন এইখানে সমবেত হন। নন্দার গর্ভ হইতে বাধিয়া একটি ব্যাঙ টাও প্রস্তুত করাইয়াছে, সেখানে বাজা বাধে। আগার বিহারের জন্ত ডাক বাজলা বাতীত আরও একটি গৃহ নির্মিত হইয়াছে। “গোছনা মতা” বামিনী বেগে নন্দার নির্মল তটে নির্মিত নন্দাভূষণ গৃহতলে যেরবার শীত সমীর বিতাক্তিত সলিলকণা নৈশ ভোজনান্তে নৃত্যপর ইংরাজ দম্পতীর শ্রমাপনোদন করিয়া থাকে এই কথা শুনিয়াছি। বাস্তবিক



চৌষটি-যোগিনীর মন্দির

আমি পারি না, বোধ করি সেও শপথ করিয়া বলিতে পারিত না। বাহা বাহা করণীর অকরণীর সমস্ত নিষ্পন্ন হইল। এ সংলগ্ন করিতে শ্রম ও উষেগ বয়স হয় নাই, কিন্তু সে সমস্তই বিনা বাক্যে স্বীকার করিয়াছিলাম, কারণ, এই উপলক্ষ্যে নির্মল সলিলা নন্দার তট

যে যে ভাবেই জীবন উপভোগ করুক না কেন, একজনে প্রকৃতির সর্বসম্পদ সমন্বিত স্থান জীবনোপভোগের জন্য নির্বাচিত করিতে হইলে বোধ করি এই স্থানের নামই সর্বপ্রথমে মনে আসিবে।

গাড়ী যথা সময়ে রেল ষ্টেশনে পড়াছিল। আসিয়া

দেখিলাম, সন্ধ্যার এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার হইয়াছে। সমস্তাইল যে, ইহার আরোগ্যলাভ পর্যন্ত এই স্থানে থাকি, কিংবা বোম্বাই যাওয়া। সন্ধ্যার ডাক্তার বাবু বলিলেন, বোম্বাই যাওয়াই উচিত, কেন না দৈবাৎ অরুণি হইলে বোম্বাই সহরে ডাক্তার ও ঔষধাদির সুবিধা পাওয়া যাইবে।

ডাক্তার বাবুর মতানুসারে রোগী লইয়া বোম্বাই সিদ্ধান্ত হইল; পথে রোগীর সুবিধার জন্য বাহা কিছু করা সম্ভব, সমস্তই করিয়া ডাক্তার বাবুকে রোগীর সঙ্গে এক গাড়ীতেই বাইতে বলিলাম। অবলম্বন ঠেশন হইতে সকালে গাড়ী শেব রাজিতে ছাড়িত। শীতকালে অবলম্বনের ঠাণ্ডা কম নহে—রোগীর কামরার সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া ঠাণ্ডা নিবারণ করা কঠিন হইল। রোগ, কফ, লেপ বাহা কিছু ছল, সমস্তই রোগীর সঙ্গে চাপা দিয়া চলিলাম। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, রোগীর নিদ্রাবনের সঙ্গে ঈর্ষ রক্তের আভা দেখা বাইতেছে। এক ঠেশনে গাড়ী দাঁড়াইবার পর ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করিয়া আমাকে গোপনে বলিলেন, রোগীর নিউমোনিয়া হইয়াছে। আমার কামরার আদিত্য বলার রোগী শুনিতে পাইল না বটে, তবে শিক্ত ভয় রোগীর বুদ্ধিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার পীড়া নিত্য সামান্য নহে। গৃহ হইতে বহু দূরদেশে চলিয়াছেন, আত্মীয় স্বজন, সম্পর্কিত ব্যক্তি কেহই সঙ্গে নাই, তরসা আমরাই, সেই জন্য পুনঃ পুনঃ আমাকে তাঁহার কামরার ডাকিইয়া নিত্য ব্যাকুলভাবে তাঁহার চিকিৎসা শুধু বা বন্ধ প্রভৃতির জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি বারবার তাঁহাকে আশ্বাস দিলাম যে তাঁহার পীড়া সামান্য, এবং অতি শীঘ্রই তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন, এবং আমাদের বখাণাধ্য তাঁহার চিকিৎসা, সেবা, বন্ধ সমস্তই করিব, তাহাতে কোন ত্রুটি হইবে না।

উষ্মের মধ্যে রেলপথ অতিবাহিত করিতে হইল। পথের মধ্যে নতুন নতুন ঠেশনে নতুন নতুন লোকের আনাগোনা, নামাউঠা দেখিবার যে আনন্দ আছে, তাহা ভাল করিয়া উপভোগ করা হইল না। তবে এ যে বরষের

কথা, তখন আনন্দের জন্য বিশেষ আয়োজনের আবশ্যক হয় না, অন্তরের মধ্যে যে অক্লান্ত আনন্দের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে তাহাকে দমন করাই কঠিন। সে দিনে রেল গাড়ীর গতিবেগ আজিকার দিনের মত ছিল না। অবলম্বন হইতে শেব রাজিতে রওনা হইয়া পরের সমস্ত দিন রাজি গেল, তৎপর দিবস প্রাতঃকালে বেলা প্রায় সাড়ে আট নয়টার সময়ে বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ঠেশনে গিয়া পৌছিলাম। তৎপূর্বে তাদৃশ বৃহৎ রেল ঠেশন আমি দেখি নাই; বর্তমান সময়ের হাওড়া ঠেশন বড় হইয়াছে, প্রায়টকরম অনেক হইয়াছে, কিন্তু সে দিনে ভিক্টোরিয়া ঠেশন বোধ করি সর্বাঙ্গাঙ্গী বড় ছিল। সেই বৃহৎ ঠেশনে যখন গাড়ী থামিল তখন দেখিলাম চতুর্দিকে লোকারণ্য, নানা দেশের নানা পরিচ্ছদধারী নানা ভাষাভাষী প্রকৃষ, বালক বালিকা চারিদিকে নানা কার্যে ব্যস্ত থাকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

বোম্বাই সহরে পহুঁছবামাত্র কলিকাতা হইতে একটি বিষয়ের পার্শ্বক্য তৎক্ষণাতঃ চক্ষুর উপরে ভাসিয়া উঠে। কলিকাতাও বৃহৎ সহর, বোম্বাই কিংবা ভারতের অপর সমুদ্র সহর অপেক্ষা বড়, ইংরাজ রাজ্যের মধ্যে লণ্ডনের পরেই সর্ব বিষয়ে কলিকাতার স্থান। কিন্তু কলিকাতা বাঙ্গালার সহর, বাঙ্গালীর সহর (এখন যদিও বাঙ্গালী অপেক্ষা অপর দেশের লোকের সংখ্যা সম্ভবতঃ অধিক) সুতরাং শিরাজগণীন মাহুকের গতিই চক্ষে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব সহরে পাগড়ীধারী লোক আছে বটে, কিন্তু বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিবামাত্র গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, তামিলা, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, বেহারী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজপুত, বোরা, খোজা, পেশোয়ারী প্রভৃতি ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু মুসলমানের নানা বিচিত্র বর্ণের শিরাজগণ এবং পশ্চিম ভারতের “সৌভাগ্যবতী” (সখবা) হিন্দু রমণীদিগের শাটীর বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া বখাণাই মনে হয় যে কোনও নতুন আরব্যোপভাসের রাজ্যে আসিয়াছি,—বুঝ বা হারুণ অলরসীদেব বেগদাদ নগরী।

আমরা ঠেশন হইতে বাহির হইয়াই পার্শ্ব কোচ-ম্যানের ল্যাণ্ডো ও জুড়ী দেখিলাম এবং সে পার্শ্ব

কোচম্যানটি আমাদিগকে বাঙ্গালী দেখিয়া বিস্ময়
ইংরাজীতে কথাবার্তা করিতে আরম্ভ করিল। আমরা
নূতন লোক, কিছুই জানি না, সে স্থানের কিছুই
চিনি না, ইহা আমাদের কথাবার্তার সে বিলক্ষণ বুঝিতে
পারিল, এবং ইহাও বুঝিল যে, ইহারা নিতান্ত নিঃস্ব দরিদ্র
নহে, ইহাদিগকে নাড়া দিলে কল প্রাপ্তির সম্ভাবনা
আছে। সন্ধানের গাড়ীর দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ
করিতে বলিল এবং কহিল যে সে বোম্বাইয়ের সর্কাপেক্স
শ্রেষ্ঠ হোটেলে লইয়া যাইবে। রোগীকে ডাক্তার ব'বু
এবং ভৃত্যবর্গ সহ অল্প সময়ের অন্ত একটী ধর্মশালা গোছ
হোটেলে পাঠাইয়া, আমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর
সহিত পার্শী চালিত গাড়ীতে বসিয়া তদানীন্তন সময়ের
উৎকৃষ্ট ইংরাজী হোটেল গ্রেট ওয়েস্টার্ন গেলাম- পরামর্শ
হইল, সেখানে স্নানাদি সারিয়া একটি বাতী খুঁজিয়া লইতে
হইবে, কারণ বাড়ী ভিন্ন রোগীর সেবা সুবিধামত হইবার
সম্ভাবনা হোটেল বা ধর্মশালার নাই।

পার্শী কোচম্যানটিকে দেখিয়া তাহার কথার বার্তার
বেশ বিস্তারিত বিশেষ ভাষা বলিয়া মনে হইয়াছিল।
ভাবিয়াছিলাম যে বিলাত বা মার্কিনে যেমন শিক্ষিত
তালোকে একরূপ কাব করিতে বিধা বা অপমান বোধ
করে না, বোম্বাইও বুঝি সেইরূপ বিলাতের মতই হইয়া
উঠিয়াছে। কিন্তু আমার ভ্রম দূর হইতে অধিক বিলম্ব
হইল না। বেশ বিস্তারিত দেখিয়া বাহা মনে করিয়াছিলাম,
তাঁহা নহে। দেখিলাম ইনি “বিসকুজং পরোবুধম্।”
হোটেলের দ্বারে নামিয়া যখন তাড়ার কথা জিজ্ঞাসা
করিলাম, সে অগ্নান বদনে বলিল “Twenty rupees,
sir.” অর্থাৎ অশ্বক! ট্রেন হইতে হোটেল অর্ধ
মাইল পথ হইবে কি না সন্দেহ, তাহার ভাড়া কুড়ি
টাকা, কি সর্বনাশ! কলিকাতার বোল টাকার
কুকের বাড়ীর জুড়ীগাড়ী সমস্ত দিন কাব করে, আর
এখানে এ কি ব্যাপার। শুনিয়াছিলাম বোম্বাইয়ে
ধনকুবেরগণের বাগ, তাঁহা হইলেও এ কি অসম্ভব
রকম গাড়ীভাড়া! আমার সেক্রেটারীটি তিরকাল
দ্রব্ধকর করিয়া আসিতেছেন, তিনি বলিলেন “তোমার

মিউনিসিপ্যাল রেটের টিকিট দেখাও।” সে কহিল,
“উহা আনি নাই।” সেক্রেটারী বাবু কহিলেন,
“উহা না দেখাইলে ভাড়া পাইবে কিরূপে?” পার্শী
কোচম্যানটি তখন দেখিলেন, ইহাদিগকে দেখিতে
যে রূপ নির্যাস মনে হয়, কাবের বেলায় তেমন নহে।
এই সকল কথাবার্তা যখন হইতেছে সেই সময়ে
হোটেলের ম্যানেজার সাহেব তথার আসিলেন, এবং
তাঁহারই হোটেলের visitor বা guest বাহাই বলুন
তাঁহারই সহিত গাড়োয়ানের বিবাদ দেখিয়া তিনি
কারণ জিজ্ঞাসা করার আমি কথাটা বুঝিয়া দিলাম।
তিনি কহিলেন, “এই শ্রেণীর ভ্রম বেশধারী লোকেরা
নূতন লোক পাইলেই এইরূপ করিয়া থাকে; রেল-
স্টেশন হইতে এখানে আসিবার ভিক্টোরিয়া ভাড়া
এক টাকার অধিক নহে, উহার লাগু গাড়ী এবং
তাঁহাতে জুড়ী বেড়া আছে, সুতরাং দুই টাকা উহার
ভাড়া প্রাপ্য; এখন আপনার যে রূপ অভিকৃতি।” আমি
তাঁহার কথিত প্রাপ্য দুই টাকার উপরে আর দুইটি
টাকা দিলাম, সে বকবক করিয়া শুভ্রাটী ভাবার কি
বকিতে বকিতে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল তাহার বিন্দুবিসর্গও
আমরা বুঝিলাম না। ইতিমধ্যে আমার চাকর
আবশ্যক জিনিষপত্রের ট্রাক, স্টকেস প্রভৃতি লইয়া
পহঁছিল, ম্যানেজার সাহেবের সহিত আমি আমার
ঘর দেখিতে উপরে চলিয়া গেলাম।

হোটেলটি সুবৃহৎ, বহু শত লোকের স্থান সেই
হোটলে হইতে পারে। ভোজনগার প্রত্যন্ত এবং
প্রতি guest এর শয়ন ঘর শুলিও বড় এবং
আলোক ও বায়ু প্রবেশের আনালা দরজা শুলিও প্রশস্ত।
বাহ্য হটক, আমরা সেখানে অল্প সময়ের অন্তই আসিয়াছি,
সেই দিবসই বাড়ী ভাড়া লইয়া রোগীটিকে তথার লইতে
হইবে, তাহার ঔষধাদির ব্যবস্থা এবং ডাক্তার আনাইবার
বন্দোবস্ত করিতে হইবে, সুতরাং শীঘ্র স্নান ভোজন
সমাপন করিবার দিকে মনোনিবেশ করিলাম। ভোজন
সমগ্রী প্রস্তুতই ছিল, আমি স্নানান্তে কাপড় বদলাইয়া,
ভোজন শেষ করিলাম। দীর্ঘ সময় ট্রেনে আসিবার

পরে নান ব্যাপারটি বড়ই আশ্চর্যজনক মনে হইল। বোম্বাই সহরে ডিসেম্বরেও শীত অধিক নহে, আমাদের দেশের ফাল্গুন মাসের মত, সুতরাং নানে আরাম ব্যতীত কষ্ট হইবার কথা নহে। আহারের পরে বিশ্রাম করা হইল না, ভৃত্যকে জিনিষপত্র সহ আমার কামরায় রাখিয়া আমি এবং সেক্রেটারী বাবু বাড়ী ঝুঞ্জিবার জন্ত বাহির হইলাম। তখনকার দিনে মোটর ছিল না, ঘোড়ার গাড়ীই এক মাত্র দ্রুত যান। বোম্বাইয়ের গাড়োয়ানের যে নয়না প্রথমেই পাইয়াছি তাহাত একটু ভীত হইয়াছিলাম। কিন্তু হোটেলের বাহিরে যাইবামাত্রই সম্মুখে অনেক গুলি ভিক্টোরিয়া দেখিলাম, কিন্তু পার্শ্ব গাড়োয়ান দেখিতে পাইলাম না, একটু আশ্বস্ত হইলাম। একখানি নূতন গোছের গাড়ী দেখিলাম এবং তাহার অধিনায়ক হুদারও দেখিতে মন্দ নহে। কোচবাক্সে যিনি বসিয়া আছেন তিনি সুরাটের সুশলমান। তাহাকে “ভাড়া যাবেগা?” জিজ্ঞাসা করিতেই “হঁ সাহেব,” বলিয়া উত্তর দিল এবং কোচবাক্স হইতে নামিয়া গাড়ীর গদী প্রভৃতি যথা সম্ভব কাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিল। “কাতা চলুন হুজুর?” বলিয়া সে প্রশ্ন করিলে তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া প্রয়োজন আছে, যে দিকে ভাল বাড়ী মিলিবে সেই দিকেই বাইতে হইবে। সে কহিল, সহরের মধ্যে অনেক বাড়ী পাওয়া যায়, কিন্তু সে সকল বাড়ী আমাদের পছন্দ হইবে না, ভাল বাড়ী যে দিকে পাওয়া যায় সেই দিকেই লইয়া যাইবে। সহরের মধ্যের বাড়ী আমাদের পছন্দ হইবে না তাহা সে কিসে অনুমান করিল জিজ্ঞাসা করার উত্তরে সে কহিল, “হামকো দেখেনেই সে মালুম হো যাতা হুঁর, সাহেব।” সে আমাদেরকে বালকেশ্বর, নেপিয়ার্স রোড, মালাবার, ওয়ার্ডেন রোড প্রভৃতি ইংরাজ ও বোম্বাইয়ের ধনিগণের পল্লী গায় সমস্তই বুঝাইল, কিন্তু কোথাও এক মাল ছুই মাসের জন্ত ভাল বাড়ী ভাড়া দিতে চাহিল না। বড়ই বিপদে পড়িলাম।

আমাদের এই মুখ গাড়োয়ানটি দেখিলাম হৃদয়বান শোক; সে বুঝিয়াছিল, রোগী লইয়া আমরা অপরিচিত

বিদেশে বিপদে পড়িয়াছি, বাড়ী না পাইলে রোগীর চিকিৎসা পথ্য শুদ্ধি কিছুই হইবে না, সম্ভবতঃ জে মারা যাইবে। গাড়োয়ানটি আমাদের সাহস দিয়া কহিল, “হুজুর, হাম্ চুড়কে কোঠি নিকালে গা, ধোখড়িকা অন্দর আপকো মকান্ মিল্ যাবেগা।” আমি কহিলাম, “চল বাপু যেখানে হয় একটা বাড়ী মিলাইয়া দাও।” গাড়ী যুটাইয়া লইয়া সে তাহার আন্তাবলের দিকে চলিল। সেখানে ঘোড়া বদলাইয়া, নানা গলি ঘুরিয়া ফিরিয়া একস্থানে উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সে দিকটার নাম বাইকাণা এবং দেখিলাম সেখানে ভাল এবং বড় বাড়ী অনেক আছে, তবে অল্প সময়ের জন্ত ভাড়া পাওয়া যাইবে কি না এই বা ভাবনার কথা। একটি বৃদ্ধ বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “সাহেব, ফালাট লেজে?” ফালাট দেখিলাম flat। আমি কহিলাম ফ্যাটে আবশ্যক মত কামরা, ঘানের ঘর প্রভৃতি থাকিলে ফ্যাটে বোন বাধাই নাই। সে কহিল, “তব ভিতর যাটার, শেঠ সে পুহ লিজিয়ে, মগর ভাড়া শেঠ জান্তি মানেগা, আপ্ কম ক’হয়ে গা।” আমি কিছু আশ্চর্য্যবিত হইলাম। অজ্ঞাত কুলশীল অপরিচিত লোক আমি, আমার অর্থের অধিক না হয় তৎপ্রতি ইহার দৃষ্টি কেন? তখন কিছু বুঝিলাম না, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম যে, লোকটির অন্তর বড়ই চমৎকার ছিল। আমি সে যাত্রা যতদিন বোম্বাইয়ে ছিলাম, ঐ ব্যক্তির গাড়ীই আমি নিত্য ব্যবহার করিয়াছি। আমরা যে বাড়ী লইয়াছিলাম সেই বাড়ীর আন্তাবলেই দিব্যাজি তাহার গাড়ী ঘোড়া রাখিয়া দিত এবং আমাদের সর্ব প্রয়োজন সাধন করিয়া দিয়া যে বিপুল আনন্দ লাভ করিত, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে কাহারও বাকি থাকিত না। যে দিন আমি বোম্বাই ছাড়িয়া যাই, সে দিনে প্রাটকরমে দাঁড়াইয়া গাড়ী ছাড়িবার পূর্বে যখন সে বালকের ভাষা হুকুরিয়া উঠিল, তখন আমরাও কেহই অশ্রু সঞ্চে করিতে পারি নাই।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেই একটি পার্শ্ব

মহিলা বাহির হইল। আসিলেন এবং ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি প্রয়োজনে আসিয়াছি। আমি ক'ইলাম, "ঘারে নোটিশ দেখিলাম এই বাড়ী বা বাড়ীর অংশ ভাড়া দেওয়া হইবে, আমি সেই খোঁজ লইতে আসিয়াছি।" তিনি আশ্চর্য করিয়া আমাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গিয়া, বসিবার ঘরে বসিতে বলিলেন এবং নিজে গর্দা সরাইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। কক্ষকাল পরে বাহির হইয়া আমাকে সেই কক্ষে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। দেখিলাম সে ঘরে একটি প্রাচীন পার্শী তত্ত্বলোক শয্যা শয়ন করিয়া আছেন, বাঁতে চলৎ-শক্তি রহিত। তাঁহার পুত্র ও জামাতা সকলে ব্যবসার উপলক্ষ্যে কেহ করাচী, কেহ জাকিয়ার, কেহ নেটালে গিয়াছে, বাড়ীতে স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং বস্ত্রাগণ সহ তিনি বহিরাছেন; বাড়ীর নীচতালার তাঁহার বাস করেন; উপর তাল ভাড়া দিবেন এবং অল্প দিনের জন্য বিতেও কোন বাধা নাই। পুত্রবধূ এবং কস্তুরা আমাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলের সমস্ত ঘর গুলি দেখাইলেন। দেখিলাম স্থল

বাড়ী, এবং প্রয়োজনীয় চেয়ার চৌকী কোচ বেদার মাটিং গালিচা, পালঙ্ক সমস্তই আছে, আমাদিগকে কেবল করটি বাতি সংগ্রহ করিতে হইবে। দ্বিতলের হল কামরা অতি প্রকাণ্ড। গাড়ী বারানার উপরের ঘরটির চারিচিক কাচের সার্শী দেওয়া, ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করিতে পারা যায়। শয়ন ঘর গুলিও তাল, স্নান-গার প্রভৃতি কিছুই অভাব নাই। বৃদ্ধ ভাড়া চাহিলেন ছই শত, দেড় শত টাকার রাজি হইয়া গেলেন। বলিলেন, লেখা পড়া কিছুই করিতে হইবে না, তত্ত্বলোকের কথাই যথেষ্ট। পার্শী বা অপর কোন জাতীয় ব্যবসারী লোকের মধ্যে এমন তোলা মহেশ্বর আমি কম দেখিয়াছি। সেই দিবসেই হোটেলের ফিরিয়া আমার জিনিষপত্র গঠাইয়া দিলাম এবং ধর্মশালা হইতে রোগী, ডাক্তার বাবু এবং অপরাপর ভৃত্যবর্গকে আনাইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই নতুন ভাড়ার ক্যাটে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

ক্রমশঃ

ঐজগদিস্ত্রনাথ রায়।

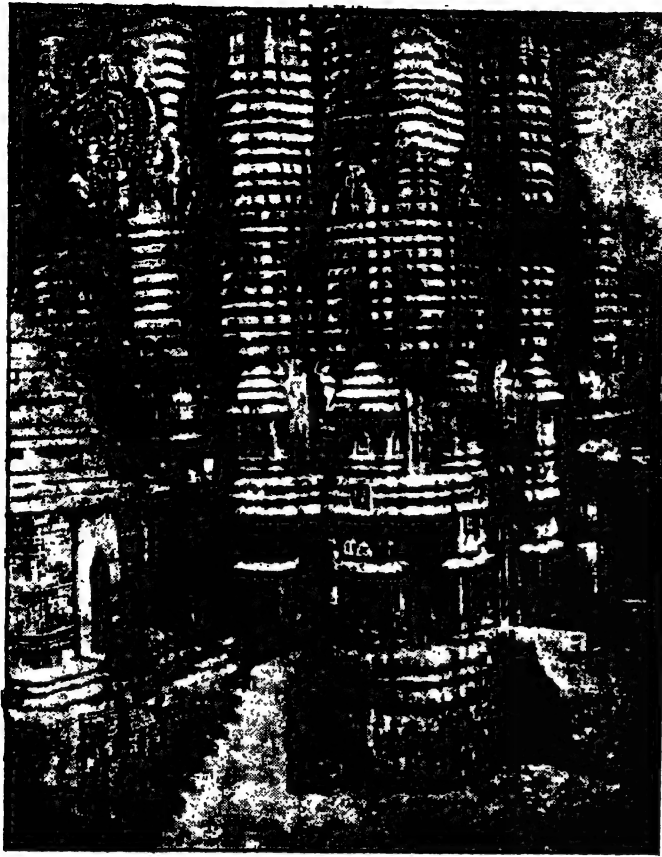
মূর্তি ও মন্দির

(রাধানগরে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ১৫শ অধিবেশনে, ইতিহাস-শাখা-সভাপতির অভিভাষণ)

আপনারা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকার শ্রীযুত নিখিলনাথ রায় মহাশয়কে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এই রাধানগর অধিবেশনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি নির্বাচন করিয়া সুবিবেচনার কার্য করিয়াছিলেন। দান পুণ্যের মত ইতিহাসের আলোচনাও নিজের বাড়ী হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত। রাধানগরের অধিবেশনে হুগলী জেলার ইতিহাসের আলোচনার সুব্যবস্থা সর্বাগ্রে করা কর্তব্য। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকার অপেক্ষা এরূপ আলোচনা পরিচালনের যোগ্যতর ব্যক্তির সহিত আমি পরিচিত নহি। প্রবীণ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং বঙ্কুর কুমার শরৎকুমার রায়ের সহিত বহিও

আমার বরজের কিছু কিছু পুরাকীর্তিচিহ্ন দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, রাঢ়ের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞান আমার মোটেই নাই, কাজেই এই পদগ্রহণের যোগ্যতাও নাই। তবে যে দরার পরবশ হইয়া আপনারা আমাকে এই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই দরার পরবশ হইয়া আপনারা আমার ভুল-ভ্রান্তিও সার্জন করিবেন এই ভরসা, আমার প্রতি এইরূপ উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, আমি এই পদ গ্রহণে সাহস করিয়াছি।

আজ আমরা যে মহাপুরুষের জন্মস্থানে সম্মিলিত হইয়াছি, তিনি একটী উন্নত সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু, এবং



লিঙ্গরাজমন্দির, ভুবনেশ্বর

সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান গুরু। মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ধর্ম্মান্ধারনের ফলে এদেশে সাকার-নিরাকার উপাসনা লইয়া যে বাদামুখ্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রায় শতবর্ষ কাল প্রবলভাবে চলিয়া এখন অনেকটা নীরব হইয়াছে। বর্তমান বিংশ শতাব্দে সাকার উপাসনার আর এক দিক্ লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিহাসের উপাদান এবং কমনীয় কলার নিদর্শনের হিসাবে এখন প্রাচীন দেবমূর্তির বিচার হইতেছে। প্রাচীন মূর্তির বিবরণ সকলনে এবং কমনীয়তা বিচারে মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের দেশবাসীরা ইদানীং বিশেষ উদ্ভূত-উৎসাহ দেখাইতেছেন।

আপাততঃ আমারও ব্যবসা মূর্তিসংগ্ৰহ এবং মূর্তিবিচার। স্মরণ্য ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতের মূর্তি ও মন্দির সম্বন্ধে করেকটা কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিব।

ঋগ্বেদ সংহিতা লইয়া ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের আরম্ভ। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতির সঙ্গ সঙ্গে আবৃত্তিঃ তন্ত্র ঋগ্বেদের মন্ত্র রচিত হইয়াছিল। যজ্ঞাস্থানে মূর্তির কোন স্থান নাই, কিন্তু মন্দিরের স্থানে অগ্নি-গৃহের প্রয়োজন ছিল। বৈদিক যুগে সকল শ্রেণীর লোকেই যে যজ্ঞাস্থান করিতেন এমন কোন প্রমাণ নাই। যজ্ঞে অনধিকারী কোন কোন জাতির মধ্যে তখন মূর্তিপূজা প্রচলিত থাকাও সম্ভব। কিন্তু বৈদিক যুগের মূর্তিপূজা সম্বন্ধে কোন নিদর্শন বস্তু এখনও আমাদের

হস্তগত হয় নাই। স্মরণ্য বৈদিক যুগে ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা যায় না। অবশ্যই অনেক বেদমন্ত্রে অনেক বৈদিক দেবতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা আছে। কিন্তু নিদর্শন বস্তু ব্যতীত শিল্পের বিচার হইতে পারে না।

বৈদিক যুগের শেষভাগ, উপনিষদের সময় হইতে হিন্দুর ধর্ম্মজীবনে দুইটা আপাত-বিরোধী লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়; একটা লক্ষণ উন্নতিশীলতা, আর একটা লক্ষণ রক্ষণশীলতা। বেদের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ ভাগে স্বর্গ কামনার যজ্ঞাস্থানের এবং তপশ্চরণের বিধান আছে। উপনিষদে স্বর্গ কামনা কৰ্ম্মাস্থানের পরিবর্তে পুনঃপুনঃ জন্ম মরণের বস্তু হইবে



গিরীজামন্দির, ভুবনেশ্বর

মুক্তি পাইবার জন্য ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞান সাধন বিহিত হইরাছে। উপনিষদে স্বর্গ কামনা নিষিদ্ধ হইলেও বাগ-বজ্র একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই; চিত্তশুদ্ধির জন্য যজ্ঞাহুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। এই প্রকার ব্যবস্থা হিন্দুর উন্নতিশীলতার সঙ্গে স্বাভাবিক রক্ষণশীলতার পরিচয় প্রদান করে।

উপনিষদের পর গ্রীষ্ম ভারতে বৌদ্ধধর্মের অভ্যাস হইয়াছিল। উপনিষদের কর্ম ও জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি এবং বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্যও জন্ম-মরণের হস্ত হইতে মুক্তি। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ জীবাণী ও পরমাণুর (অণুর) অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন পরিকার মত প্রকাশ করেন নাই, পঞ্চাঙ্গের আত্মা আছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা একেবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধের উপদেশের সার কথা, অষ্টাঙ্গ মুনীতি মার্গ অনুসরণ

করিলে নির্বাণ-মুক্তি লাভ হয়। স্তব্ধতা বৌদ্ধধর্মকে নিরীক্ষণ মুনীতি পথ বলা বাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ আদর্শ সম্বন্ধে, উপনিষদের ধর্ম যেমন কর্মের সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারে নাই, গোড়া হইতেই বৌদ্ধধর্মও জড়োপাসনার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ আগমে দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধ প্রথমতঃ যে দেশে ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই মগধে এবং বিদেহে তৎকালে জনসাধারণের মধ্যে বৈদিক যোগযজ্ঞাহুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল না, তখন প্রাধান্য ছিল কোন মুচ মহাপুরুষের চিত্তাভ্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত সূত্রের এবং বন্ধ বা যক্ষীর আবাস চৈতন্য বুদ্ধের উপাসনার। যখন বুদ্ধদেবের মরণ-নির্ব্বাণের সময় নিকটবর্তী হইয়াছিল তখন আনন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“প্রভো (ভদ্রে)! আমরা তথাগতের মৃত দেহের কিরূপ সংস্কার করিব।”

বুদ্ধ উত্তর করিলেন—“হে আনন্দ, তথাগতের শরীর পূজা করিয়া নিজের মোক্ষের বাধা উপস্থিত করিও না। নিজের মোক্ষের চেষ্টায় ভূমি আত্মনিরোগ কর। তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ অনেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং গৃহস্থ আছেন যাহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।”

এখানে বুদ্ধদেব ভিক্ষুর পক্ষে শরীর পূজা নিষেধ করিয়াছেন, শরীর পূজাকে মোক্ষের অন্তরায় স্বরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু গৃহস্থেরা যে শরীর পূজা করিবে, এ বিষয়ে বাধার কোন সন্দেহ ছিল না, এবং এ বিষয়ে যে বিধি নিষেধের অবকাশ আছে তাহাও তিনি মনে করেন নাই। অবশ্যই আনন্দ বুদ্ধের নিষেধ বাক্য শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, বুদ্ধের দ্বারা ব্যবস্থা করাইয়া লইলেন, চক্রবর্তী রাজার শরীরের ভস্মাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণ করিয়া লোকে যেমন তাহার পূজা করিয়া

থাকে, বুদ্ধের দেহের উদ্ভাবনের উপর তৃপ্ত নির্মাণ করিয়া ভেদনি করিতে হইবে। চৈত্যবুদ্ধের পূজা সম্বন্ধে মহাপরিনির্বাণ হুজে এবং অন্তঃস্থ বৈশাণীর গিচ্ছবীর্ণকে বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন, তোমরা যদি স্বজাতির মঙ্গল কামনা কর, তবে অন্তঃস্থ সংস্কর্ষের মধ্যে বৈশাণীর উপকর্ষিত চৈত্যবুদ্ধকে বোধাবিধি পূজা করিও। মহাপরিনির্বাণ হুজে বুদ্ধের বচন ঠিক বিনিবদ্ধ হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, কিন্তু শাক্যপুত্রের শ্রমণেরা যে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অনতি-কাল পরেই তৃপ্ত পূজা এবং বোধিবৃক্ষরূপে চৈত্যবুদ্ধের পূজার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তারহস্তের এবং সাঁচীর তৃপ্তের বেনিকার (বেড়ার) লিপিমাল্য তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। এই লিপিমাল্য পাঠে জানা যায়, বাঁহারা চাঁদা তুলিয়া এই সকল বেড়া নির্মাণ করাইয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী।

বুদ্ধদেব শরীর বা চৈত্যপূজা নিবেদন করিয়া না থাকিলেও প্রতিমার সংশ্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং সেই উপদেশ যে অনেকদিন পর্য্যন্ত কতক পরিমাণে প্রতিপালিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। পালি বিনয়গিটকের অন্তর্গত চুল্লবগ্গে (সুত্তবর্গে) কথিত হইয়াছে, এক সময় বুদ্ধ রাজগৃহ নগরে বেণুবনে বাস করিতেছিলেন এবং ভিক্ষু-গণের বাসের জন্য বিহার নির্মিত হইতেছিল। তখন অনাচারপরায়ণ বটবগীর ভিক্ষুগণ ত্রী-পুরুষের প্রতিভান চিত্র (প্রতিকৃতি) অঙ্কিত করিয়া বিহারের দেওয়াল ভূষিত করিতে লাগিলেন। এই ব্যাণার দেখিতে পাইয়া লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, “এ যে ভোগমুখ রত গৃহীর মত আচরণ।” বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া ত্রী পুরুষের চিত্র অঙ্কন নিষেধ করিয়া দিলেন এবং বিহারের শোভার জন্য মালা, লতা প্রভৃতি অঙ্কিত করিবার অনুমতি দিলেন। বিনয়গিটকের স্তম্ভবিভঙ্গে আছে (ভিক্ষুণী বিভঙ্গ, ৪১ পাঁচতিয়) এক সময় বুদ্ধ বখন শ্রাবস্তীনগরে ভেদবনে বাস করিতেছিলেন, তখন কোশলরাজ এসেন-



নটরাজ, খিচিং, ময়ূরভদ্র

জিতের উদ্ভানের চিত্রাগারে অনেক মনুষ্যচিত্র (প্রতিভা-চিত্র) প্রদর্শিত হইতেছিল, এবং অনেক লোক তাহা দেখিতে বাইতেছিল। এই জনপ্রবাহের সঙ্গে বটবগীর ভিক্ষুগীরাও দেখিতে গিয়াছিলেন। অমনি লোকে নিষেধ করিতে আরম্ভ করিল। শুনিতে পাইয়া বুদ্ধদেব ভিক্ষুণী রাজকেই চিত্রাগার দেখিতে বাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বখন মনুষ্য চিত্র দর্শন ব অঙ্কন নিষেধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে মনুষ্যাকাং-গঠিত প্রতিমা পূজাও নিষেধ করিয়াছিলেন, এ কং সহজেই অনুমান করা বাইতে পারে।



নাগ, খিচিং, ময়ূরভজ

মলিনতার চিহ্ন স্বরূপ মনে হইলেও এই সম্পর্কেই
প্রাচীন ভারতে কমনীয় শিল্প অভ্যাসিত হইবার অবকাশ
পাইয়াছিল। মৌর্য্য সম্রাট অশোকের সময়ের ভাস্কর্য্য
নিদর্শনের মধ্যে অশ্বশাসন সহিত স্তম্ভের শীর্ষ বিশেষ
উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্তম্ভের সঙ্গে উপাসনার কোনও
সম্পর্ক ছিল কি না বলা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে
ভারতবর্ষে ভাস্কর্য্য-কলার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্র-
পাত হয় খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দে গুপ্ত বংশের অভ্যাসের
সঙ্গে সঙ্গে, এবং এই গুপ্তশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ
করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্য-
ভারতে। সারনাথ, পাটলিপুত্র এবং বিদিশার ভগ্নাব-
শেষের মধ্যে গুপ্তশিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত

হইয়াছে। কিন্তু এই যুগের প্রধান কীর্তি, ভারত
স্তম্ভের বেদিকা ও তোরণ, গাঁচীর প্রাচীন স্তম্ভভয়ের
বেদিকা ও তোরণ, বোধগয়ার প্রাচীন বেদিকা এবং
উড়িষ্যার উদয়গিরির গুহামন্দিরনিচয়ের কারুকার্য্য।
এই সকল বেদিকার এবং তোরণের গাজে প্রাসাদ ও
কুটার বা কুটাপার অঙ্কিত দেখিয়া মনে হয় যে প্রাচীন
কালের কুটারই আধ্যাত্মবর্তের মধ্যযুগের বহুদূর
সম্পন্ন মন্দিরের মূল আদর্শ। গুপ্তযুগের এই সকল
বৌদ্ধ বেদিকার এবং তোরণের গাজে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যের
মধ্যে বুদ্ধের এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর চিত্র অঙ্কিত হয় নাই।
উপাস্ত বস্তুর মধ্যে দেব-দেবীর প্রতিমা নাই, আছে স্তূপ,
চৈত্যবুদ্ধ, বোধিবৃক্ষ এবং নানা প্রকার চিত্রযুক্ত বেদি।
কিন্তু দেবদেবীর যে সকল মূর্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহা
উপাস্তরূপে অঙ্কিত হয় নাই, বুদ্ধের উপাসকরূপে অঙ্কিত
হইয়াছে। সুতরাং গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্য পরীক্ষা করিলে
হুইটী সিদ্ধান্ত মনে উদ্ভিত হয়। প্রথম, তৎকালে প্রতিমা
নির্মাণ রীতি প্রচলিত থাকিলেও প্রতিমা পূজারীতি
বোধ হয় বিশেষ প্রচলিত ছিল না; প্রতিমার পরিবর্তে
দেবদেবীর আশ্রয়বুদ্ধ বা সাক্ষেতিক চিহ্ন এবং মহা-
পুরুষের শরীরাবশেষ পূজিত হইত।

দ্বিতীয়—ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার পৌরাণিক
লক্ষণ সকল তখনও পরিকল্পিত হয় নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ
ত্রিপিটকে নানাপ্রকার দেবতার বিবরণ আছে। তন্মধ্যে
বেদের ইন্দ্রাদি দেবতা অষ্টত্রিংশ নামে বর্ণিত
করিয়াছে। গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্যে এই সকল দেবতা
মহাব্যাকৃতি, একটা মস্তক এবং দুইটা হস্তবিশিষ্ট, এবং
পুষ্পাণোক্ত বাহনের চিহ্নবিশীন। বৈদিক এবং পৌরাণিক
দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের মূর্তি বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে
পুনঃপুনঃ অঙ্কিত হইয়াছে। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত
প্রথম দেখা যায় শক-কুশাগ যুগের মথুরার একখানি বৌদ্ধ
চিত্র-কলকে, এবং ব্রহ্মার চতুর্মুখাদি পৌরাণিক লক্ষণ
অঙ্কিত হইয়াছে মধ্যযুগের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে। পৌরাণিক
লক্ষণাক্রান্ত মূর্তির মধ্যে গুপ্তভাস্কর্য্যে একমাত্র দেখা বা-
স্তব মূর্তি। শ্রী "গয়্যা গয়হস্তা চ গজোৎকলিগুপ্তমুতা

আকারে শুভযুগের বেদিকার এবং তোরণে পুনঃপুনঃ অঙ্কিত হইরাছে। ফুশে বলেন, এই মূর্তি এখনও ত্রিমূর্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ইহা খুব সম্ভব গৌতম বুদ্ধের কল্পের সাংকেতিক চিত্র। ফুশের সিদ্ধান্ত স্বীকার করা কঠিন। কিন্তু শুভযুগের ত্রীর মূর্তিত পৌরাণিক লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্ম, ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার প্রতিমার পৌরাণিক লক্ষণের অভাব সপ্রমাণ করে, শুভযুগে এই সকল প্রধান দেবতার মূর্তিকল্পনার পৌরাণিক লক্ষণ প্রবেশ লাভ করে নাই। শুভরাজ-গণের সময়সময়ের পঞ্চালের একজন রাজা অগ্নিমিত্রের মূর্তির অগ্নিমূর্তি এই কথার সাক্ষ্য দান করে। অগ্নিমিত্রের মূর্তির অগ্নির মূর্তির পার্শ্বে অগ্নির পৌরাণিক বাহনের কোন চিত্র নাই; এবং স্বর্গের উপর মন্তকের স্থানে প্রোক্ষিত ছাশন শিখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

শুভযুগের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য দেবদেবীর মূর্তি উপাত্ত দেবতার আকারে গঠিত হয় নাই; এই সকল মূর্তিত দেবতার কোন চিত্র লক্ষিত হয় না। এই সকল মূর্তি মনুষ্যাকৃতি এবং মনুষ্যভাব পূর্ণ। শুভশিল্পীর অঙ্কিত মনুষ্যাকৃতি স্বভাবসঙ্গত নহে। শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। বস্তুর রসোদ্দীপনী শক্তির নাম সৌন্দর্য্য। মনুষ্যের অবিকৃত স্বভাবতঃ সুন্দর। শুভশিল্পীগণের মনুষ্যাকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে ভ্রমশীল দোষের বিষয় বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে এইরূপ দোষারোপ সঙ্গত নহে। স্বভাবতঃ বাহ্য সুন্দর তাহার অবিকৃত প্রতিকৃতি অবশ্য সুন্দর হইবে। কিন্তু এরূপ নকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি যদি শিল্পের উদ্দেশ্য হয়, তবে শিল্প না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই, কেন না মূল বস্তু দেখিয়া সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করা বাইতে পারে। স্বাভাবিক পদার্থে যে সৌন্দর্য্য বা রসোদ্দীপনী শক্তি অম্লভূত হয় না, সেই ভাবরসের অবতারণার জন্য শিল্পের সৃষ্টি। বাহন ভিন্ন এই ভাবরসের অবতারণা অসম্ভব। সঙ্গীতে এই ভাবরসের বাহন সুর, কাব্যে এই ভাবরসের বাহন শব্দ, স্থাপত্যে এই ভাবরসের বাহন গৃহ এবং চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে এই ভাবরসের বাহন

স্বাভাবিক আকৃতি। কিন্তু কোথায় সেই বাহন স্বভাবের অবিকল নকল হইবে, আর কোথায় তাহা ইচ্ছিতে প্রদর্শিত হইবে, উদ্দেশ্যের হিসাবে এই বিচার করিবেন শিল্পী। যদি বাহনকে অবিকল স্বভাব-সঙ্গত না করিলে



মহিষমর্দিনী, খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

রসোদ্দীপনের ব্যাঘাত না হয় তবে শিল্পী তাহা স্বভাব সঙ্গত করিবার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়াও পারেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া শিল্পী ভাস্কর্য্যের বেদিকা এবং সাতীর তোণে বৌদ্ধ আধ্যাতিকার চিত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হইরাছিলেন, “জাতকমালা”কার অর্থশূর তাহা এই দুইটা স্নোকে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

“ত্ৰিমূর্তি সদৃশপরিগ্রহমঙ্গলানি

কীর্ত্যাপ্পদান্তমবগীতমনোহরাণি।

পূৰ্ণ প্রজন্মস্থ মূনেন্দ্রিতাজ্ঞানি

• তজ্জা স্বকাব্যকুম্মাঞ্জলিনার্চয়িমে ।

প্রবৈয়ারমীতি রতিলক্ষিতচিহ্নভূতে-

ব্রাহ্মেশতো ভবতি যৎসুগং স্বমার্গঃ ।

ভাদেব কক্ষমনসামপি চ প্রসাদো

ধর্ম্যাঃ কথাস্ত রমনীতেঃ স্বমীযুঃ ॥

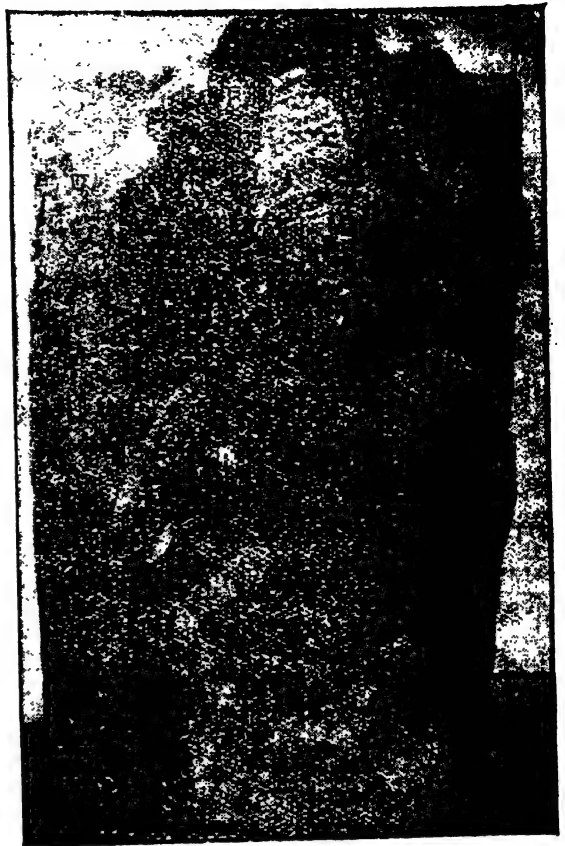
“শ্রীসম্পন্ন, সৎগুণময়, মঙ্গলময়, প্রশংসাহ, অনিন্দ্য মনোহর শাকামুনির পূৰ্ণ পূৰ্ণ জন্মের চরিত-কথানিচয় তত্ত্বসহকারে স্মরণিত কাব্যকুম্মাঞ্জলির দ্বারা অর্চনা করিব।”

“এই সকল কীর্ত্তিলাপ বুদ্ধদ্ব্যন্তের পথের চিহ্ন স্বরূপ, (এই সকল কীর্ত্তি কথার দ্বারা) সেই পথ উপনিষ্ট হইল। (এই কাব্য) কষ্টিন জন্ম ব্যক্তিদ্বিগকেও প্রেম করিতে পারে। (ইহা) ধর্ম্মবিষয়ক আধ্যাত্মিক-নিচয়ের রমনীয়তা সম্পাদন করিতে পারে।”

যে সকল শিল্পী ভারতের বেদিকার এবং সাঁচীর তোরণে বুদ্ধের জন্ম সন্মাস্তরের মনোহর কাহিনী সকল অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল নির্দোষের পথের এই সকল চিহ্নের রমনীয়তা সম্পাদন। কাল-কার্য্যের হিসাবে এই সকল চিত্র নির্দোষ না হইলেও এই সকল চিত্র শিল্পী যে রমনীয়তা অর্থাৎ মর্শ্বকের চিত্তকে রসার্জ করিবার শক্তি সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইরাছেন একথা অস্বীকার করা যায় না।

৩

গুজরাতের অধঃপতনের অনতিকাল পরেই বেন প্রাচ্য ও মধ্যভারতে প্রাচীন শিল্পের ধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শতাব্দে নির্মিত যে কথখানি মূর্ত্তি এবাবৎ সাঁচীতে, সারনাথে, এবং প্রাবস্তীতে পাওয়া গিয়াছে তাহা মথুরার তাল পাথরের দ্বারা মথুরার কারখানার নির্মিত। দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজপিল্লের দ্বারা আরও দুই শতাব্দীর অধিককাল অন্ধ্র প্রবাহমান ছিল, এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে অমরাবতীর ধর্ম্মের উৎকীর্ণ তাম্রলিপি



নাগ, খিচিং, মথুরাজ

উন্নতির চরম সীমার পর্ষদ্বিহাছিল। মথুরার গুপ্ত-শিল্পদ্বারা একেবারে লুপ্ত না হইলেও খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে শকজয়পগণের অধিকারে নবাত্মাদিত গ্রীক-শিল্পের সহিত গুরুতর সংসর্গে আসিয়া প্রাচীন শিল্প নব কলেবর ধারণ করিয়াছিল। মথুরার শব্দ-কুশাণ-যুগের শিল্পের সম্বন্ধে লিপিবৃত্ত অনেক নিদর্শন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিলে মনে হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে মথুরার বেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেব-দেবী গড়নের একটি বৃহৎ কারখানা খোলা হইয়াছিল। কিয়ৎ এই কারখানার তৈয়ারী দেব-দেবীর মূর্ত্তি কলের তৈয়ারি জিনিষের মত প্রাণহীন ভাবসহীন শুষ্ক পাথর। স্তম্ভাংশ শিল্পের অবতারণার হিসাবে মথুরার শব্দ-কুশাণ-

যুগের শিল্পগোষ্ঠীকে নিপুণ পাথরশিল্পী ছাড়া আর বেশী কিছু, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ম প্রকৃত শিল্পী, বলা যায় না। তথাপি মধুরার প্রাচীন শিল্পিদিগের একটি কীর্তি তাঁহাদিগকে ভারত-শিল্পের ইতিহাসে অনস্বয় স্থান করিয়াছে। এই কীর্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্ত দেব-দেবীর প্রচলিত মূর্তির আকৃতির উদ্ভাবন। মধুরার কারখানার বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব মূর্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অবকাশে প্রত্নতত্ত্ববিৎ মনে করেন বুদ্ধমূর্তি উদ্ভাবিত হইয়াছিল গাঙ্কার এবং মধুরার শিল্পীরা তাহা অনুকরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ মূর্তি বেথানেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকুক, তৈল মূর্তি নিচর যে উদ্ভাবিত হইয়াছিল মধুরার শক-কুবাণযুগের কারখানার, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন না আর কোথাও এত প্রাচীন তৈলমূর্তি পাওয়া যায় নাই। খুব সম্ভব পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি গড়ন প্রথমত মধুরার এই যুগের আরম্ভ হয়। মধুরার এই যুগের একখানি বৌদ্ধচিত্রকলকে ঐরাবত সহ ইন্দ্রের মূর্তির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মধুরা হইতে আনিত এবং কালকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত লাল-পাথরের একখানি সিংহবারিনী মূর্তি এবং একটি জটামূকট ত্রিশির (অর্থাৎ চতুর্মুখ) মহাদেব মূর্তির ভগ্নাংশ শক-কুবাণযুগের তৈয়ারি বলিয়া মনে হয়। মধুরা মিউজিয়ামে রক্ষিত লালপাথরের দ্বারের একখানি পার্শ্বকলকের পশ্চাতে একটি অসম্পূর্ণ লিপি আছে। পাথরখানি চিরিয়া হুকলা করার এই লিপির প্রত্যেক পংক্তির অর্দ্ধাংশ লুপ্ত হইয়াছে। এই লুপ্তাংশ পূরণ করিয়া আমি স্থানান্তরে দেখাইয়াছি, এই লিপিতে কথিত হইয়াছে যে, মহাক্ষত্রপ সোভাসের রাজত্বকালে একব্যক্তি তপস্বান বায়ুদেবের মহামানে (অর্থাৎ ক্রকের অন্তর্যমানে) একটি চতুঃশালা, তোরণ, এবং বেদিকা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালের রীতি অনুসারে এই তোরণ এবং বেদিকা অবশ্যই কারুকার্য এবং ভাস্কর্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল, এবং এই ভাস্কর্যের মধ্যে পৌরাণিক আখ্যায়িকার

চিত্র থাকিও সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শক-কুবাণযুগে মধুরার সহসা দেব দেবীর মূর্তির গড়ন আরম্ভ হওয়ার কারণ কি?

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর, এই শক-কুবাণযুগেই আর্ধ্যাবর্তের উত্তর পশ্চিমাঙ্গে মূর্তি পূজা-রীতি প্রবলতা লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্বে মূর্তি গঠিত হইত, বোধ হয় স্থানে স্থানে তাহা পূজিতও হইত; কিন্তু তখন যেন মূর্তি পূজা প্রবলতা লাভ করে নাই, প্রবল ছিল তপ, চৈত্যা, বৃষ সিংহ গন্ধদ্বাদি ধ্বজ, এবং ব্যতিক্রমী ত্রিশূলাদি চিহ্নের পূজা। তৎ-রাজগণের সময়ের দেবীর রাজগণের সুজার চিত্রও এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুরূপ। দেবদেবী, বক্ষ, নাগ, এবং বুদ্ধ, তীর্থঙ্কর প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই অবশ্য চৈত্যা ও চিহ্নাদির পূজা হইত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রতিমা পূজা প্রবল ছিল না বলিয়াই হয়ত দেব-দেবীর আকৃতি সম্বন্ধে কল্পনা-জন্মনা প্রবলতা লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু শক-কুবাণ যুগে পৌত্তলিক বিদেশীয়গণের সংসর্গ-গুণে সম্ভবতঃ মধুরার মূর্তিপূজা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শক এবং পহ্লা রাজগণের সুজার যে সকল দেবদেবীর মূর্তি আছে তন্মধ্যে কোন কোনটা হিন্দু দেবদেবী বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় কদাকিস প্রমুখ কুবাণ সম্রাটগণের সুজার পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি স্পষ্ট। দ্বিতীয় কদাকিস শৈব ছিলেন, এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দের তৃতীয় পক্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুবাণরাজগণ মূর্তির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের সুজার নাম সহ অনেক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। তাঁহারা নিজেদের মূর্তি নির্মাণ করাইতেই, সম্ভবতঃ সম সময়ে রোমের সম্রাটগণের অনুরোধে প্রজা সাধারণের পূজার জন্য। মধুরার নিকটবর্তী মট্ নামক স্থানে কয়েকজন কুবাণ সম্রাটের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে অনুমান হয় কুবাণ-প্রভাব আর্ধ্যাবর্তে মূর্তি পূজা প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

মধুরার শক-কুবাণ যুগের শিল্পগণ মূর্তির কার্য মাজ গড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই কার্যতে

সমীচীনতা এবং বসোবসীপনীর শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।
মধ্য এবং প্রাচ্য ভারতের গুপ্তযুগের শিল্পগণ। খৃষ্টীয়
চতুর্থ শতাব্দের প্রথম ভাগে প্রাচ্য ভারতে গুপ্তরাজ্য
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং চতুর্থ শতাব্দী সমাপ্ত হইবার
পূর্বেই প্রায় সমস্ত আৰ্য্যাবর্ত গুপ্তসম্রাটের পদানত
হইয়াছিল। এই শতাব্দীে রাত্তীর একতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে
সঙ্গে আর একটি মহত্তর ব্যাপার ঘটয়াছিল; আৰ্য্যাবর্তে
প্রাচীন সর্কোচীন, দেশীয় বিদেশীয়, সকল প্রকার শিকা-
দীকার সম্বন্ধের ফলে, বাহা এখন হিন্দু সভ্যতা নামে
পরিচিত তাহা আবির্ভূত হইয়াছিল। কুবাণ সম্রাটগণের
সময়েই এই সময়ের সূত্রপাত হয়। কুবাণ-যুগে যে এই
ব্যাপার কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, শেষ কুবাণ সম্রাটের
বাহুদেব নামেই তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।
অধ্যাপক কার্ণ (ভট্টকার্ণ) দেখাইয়াছেন, ভগবদ্গীতার
উপনিষ্ট ভক্তিতত্ত্বের সহিত মহাবাহুদেব সঙ্ঘর্ষগুণত্রীকে
নিবদ্ধ উপদেশের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কুবাণ-
গুপ্তযুগে ভক্তির প্রচার শিক্ষা-দীক্ষা সময়ের নিশ্চয়ই
বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। যখন প্রাচীন জ্ঞানমার্গ
এবং বৌদ্ধ-নীতিমার্গ প্রবল ছিল, তখন সাধকগণের
মধ্যে বাহারা নিম্ন অধিকারী তাহারা কেবল ধর্ম-
তৃষ্ণার তৃপ্তি সাধনের জন্য শিল্পের আশ্রয় লইত। কিন্তু
ভক্তি সাধনার ধ্যানকে সাধক সমাজের সর্বোচ্চ
তরে পূর্বাভাস উচ্চাঙ্গের শিল্পের অভ্যাস সাধিত
করিয়াছিল। মহুগ্ধের সর্বোচ্চ করনা জীবন করনা;
এবং ঐশ্বরিক ভাবকে নরনরনের গোচর করান
মহুগ্ধ শিল্পের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। গুপ্ত-যুগের
ভক্তগণ মধুগ্ধ কারখানার উদ্ভাবিত কার্য লইয়া সেই
মহান লক্ষ্য সাধনের জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন।
তাহাদের এই মহাব্রত সকল হইয়াছিল। ভারতের
শিল্পী দেবতাব প্রকাশে বতটা সকলতা লাভ করিয়া
গিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোন দেশের আর কোন
যুগের শিল্পী ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।
আৰ্য্যাবর্তে গুপ্তযুগে যে মন্দির ও সূর্তিনির্মাণরীতি অর্থাৎ
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা নানা

শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রায় সমস্ত বৎসর জীবিত
ছিল। এই সুদীর্ঘ কালের আৰ্য্যাবর্তের শিল্পের ইতি-
হাসের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করাও এখানে
অসম্ভব। এখানে কেবল দুই একটি উদাহরণ দিয়া
উহার অন্তর্নিহিত রস-ধারার আভাস দিতে চেষ্টা
করিব।

এই মধ্যযুগের স্থাপত্যের পরিণতি শিখর বা মূকুরী
বিশিষ্ট মন্দিরে। মন্দিরের নিম্নভাগ গর্ভগৃহ এবং
উপরিভাগ শিখর নামে পরিচিত। গর্ভগৃহ গবাক্ষহীন;
উহার ভিতরে আলোক প্রবেশের একমাত্র পথ সন্মুখের
দ্বার। সূত্রাং আধ আঁধার অথবা প্রদীপের ক্ষীণ
আলোকে ভিন্ন গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য
বস্তু বা প্রতিমা মর্শনের উপায় নাই। আঁধার অজ্ঞেয়তা
সূচক, আধ আঁধার রহস্ত সূচিত করে। মহুগ্ধের
প্রকৃত আরাধ্য বস্তু অজ্ঞেয় নয়, কিন্তু অতীন্দ্রিয় এবং
রহস্তাবৃত; গর্ভ-গৃহের অভ্যন্তরের আঁধার সর্বদাই উপা-
সককে এই তথ্য স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভারতীয় মন্দিরের নির্মাণপদ্ধতির আর একটি
বিশেষত্ব, উপরিভাগের তার বহনের জন্য খিলানের
পরিবর্তে সমান্তরাল ভাবে প্রস্তর ফলক বা ইষ্টক
সাজান হয়। হিন্দুরা যে প্রাচীনকালে খিলানের ব্যব-
হার জানিতেন তাহার প্রমাণের অভাব নাই। খিলান
অতি প্রাচীনকালে বাবিলনে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।
গ্রীক শিল্পীরা বাবিলনের নিকট হইতে অনেক বিষয়
ধারণ করিয়া থাকিলেও খিলান গ্রহণ করেন নাই।
তাহার কারণ, খিলান তাঁহাদের ভাবের এবং ক্রটির
সহিত খাপ খায় নাই। হিন্দুরাও সেই নিমিত্তই
মন্দিরে খিলান ব্যবহার করেন নাই। খিলান ঠেলা-
ঠেলি, প্রতিযোগিতা, অটোখ্য সূচিত করে। আর তার
বহনের জন্য সমান্তরলভাবে সাজান প্রস্তরফলক বা
ইষ্টক সূচিত করে শান্ততাব, সংযম, তিত্তিকা। স্থাপ-
ত্যের অন্তর্নিহিত ভাব বিষয়ে এতদূর পর্যন্ত গ্রীক
এবং হিন্দুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হিন্দুর মন্দিরের
উচ্চশিল্পের প্রকাশ করে হিন্দুধর্মের অস্ত্র একটা ভাব,

—গর্ভ-পৃষ্ঠস্থ আরাধ্য বস্তু লইয়া তুষ্ট না থাকিয়া আকাশ ব্যাপী অনন্তের অন্তে পর্জিবার জন্ত উর্দ্ধমুখী প্রবল আকাজকা। গম্বিক শিখার শিখরস্থ শিখানের পৃষ্ঠারূপ হইয়া এই আকাজকা আরও তীব্রভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু গম্বিক আকাজকার এই তীব্রতার সহিত যেন অসহিষ্ণুতা জড়িত আছে। হিন্দুর মন্দিরের শিখরে এই উর্দ্ধমুখী আকাজকার সহিত সংঘর্ষ এবং ভিত্তিকার সামঞ্জস্য সাধিত হইরাছে।

হিন্দুর প্রাচীন স্থাপত্য হিন্দু সভ্যতার স্বভাবগত আর একটি লক্ষণ প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য শিল্প-শাস্ত্রে মন্দির নির্মাণ লব্ধকৈ বিস্তার নিয়ম আছে। সেই নিয়মগুলি পাঠ করিলে মনে হয় হিন্দুর স্থাপত্য নির্মাণ নকলনবিশী; ইহাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি নিরোধের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু যে সকল প্রাচীন মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় স্থাপত্যে হিন্দুর উদ্ভাবনী শক্তি আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পাইরাছে। যে সকল মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে তাহাদের আকারে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়; এবং মন্দিরের শোভা সম্পাদক ভাস্কর্য্যে ত বৈচিত্র্যের সীমাই নাই।

আর্য্যবর্তের মধ্যযুগের মন্দিরের মধ্যে জুবলে-খরের লিঙ্গরাজ মন্দির সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দর। ১ নং চিত্রে এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে আশ্রয় করিয়া শিখরের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইরাছে। এই মন্দিরের পীঠ (plinth) নাই। গর্ভগৃহের প্রাচীর প্রাঙ্গণ হইতে একেবারে গাঁথিয়া তোলা হইরাছে। শিখর যদিও বক্রিম ভাবেই গড়া হইরাছে, মন্দিরের উচ্চতা নিবন্ধন শিখরের বক্রিম ছাঁদ স্নায় লক্ষিত হয় না; মনে হয় যেন শিখরটি কাত হইয়া উঠিরাছে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে শিখর ভেৎ বাঁকা হওয়ার সেই কাত ভাব চক্ষুর পীড়াদায়ক হয় না। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের আমলকের দিকে তাকাইলে বোধ হয় কেহ যেন দেহ মন প্রাণ উর্ধ্বে টানিয়া তুলিতেছে।

এই বিরাট রেখাঘেউলের রেখা বা ছাঁদ যেমন মনোহর, ইহার সকল অংশই তেমন মানানসহি।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের বহির্ভাগের কারুকার্য্য এবং ভাস্কর্য্য সুন্দরও বটে এবং দেখারও সুন্দর। অনেক মন্দিরের কারুকার্য্য সুন্দর হইলেও সুন্দর দেখার না। তাহার কারণ, কারুকার্য্যের বাহুল্য বশতঃ কোন অংশই ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না বা উপভোগ করা যায় না। লিঙ্গরাজ মন্দিরের কারুকার্য্যে এইরূপ চক্ষুর পীড়াদায়ক বাহুল্য নাই। মন্দিরের গায়ে যে পার্শ্ব দেবতার মূর্তি, অষ্টদিক্‌গণের মূর্তি এবং ঐতিহাসিক বা গোরাগিক দৃষ্ট অঙ্কিত হইরাছে তাহার প্রত্যেকটির চারিদিকে মনোহর লতাকর্ষ আছে। কিন্তু লতাকর্ষের বাহিরে খানিকটা ব্যরণ্য কারুকার্য্য-হীন সাদা থাকায় এই প্রতিমা এবং লতাকর্ষ ভালরূপে দেখা যায়। ২ নং চিত্র লিঙ্গরাজ মন্দিরের গায়ে এইরূপ একটি দৃষ্ট। শুদ্ধদেব শিখরগণকে উপদেশ দানে রত। এমন স্বভাবসম্মত সৌন্দর্য্য মূর্তি আর কোথাও দেখিরাছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

৪

হিন্দুর দেবতা-কল্পনার প্রধান বিশেষত্ব, হিন্দুর দেবতা একাধারে উপাস্ত এবং উপাসক। স্বর্গের আছে বজ্রভাগী দেবতার নিজেই বজ্র করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। বজ্রকোঁদ মতে স্বরং প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি জন্ত তপস্তা করিয়াছিলেন। মহাত্মারত পুণ্যপাদিবে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইরাছে শিব মহাবৈষ্ণব, এবং ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতি প্রয়োজনমত তপশ্চর্য্য করিয়া থাকেন মধ্যযুগের দেবদেবী মূর্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শনে এই উপাস্ত উপাসকের ভাবের সুন্দর মধুর মিলন দেখা যায় দেবতার প্রতিমার কাষায় উপাস্ত দেবতার লক্ষণ লক্ষ্য বিদ্যমান রহিরাছে, কিন্তু সুখমতলে ফুটরা উঠিরাছে গভীর ধ্যানমগ্ন উপাসকের তাৎ। এক সতে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট মূর্তি দেখিলে মনে হয় "কত যোগীজ্ঞ ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধানে মগ্ন।"

মধ্যযুগের হিন্দু শিল্পীরা নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান মূর্তিতে এই ধ্যানের বা বোগের ভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। অনেক মূর্তিতে কি প্রগতির সঙ্গে সঙ্গেও তাঁহারা এই ভাব ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং অনেক মূর্তিতে অল্প প্রকার ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন। এবার আমরা ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিং, তাম্রপাসনোক্ত খিজিরকোটের, তদ্ব্যবসেব খননের সৌভাগ্য ঘটাইয়াছি। ময়ূরভঞ্জের বর্তমান অধিপতির পূর্বপুরুষ বশিষ্ঠগোত্রীয় ভজবংশীয় প্রাচীন নৃপতিগণ সম্ভবতঃ দশম একাদশ শতাব্দী খিচিংএর ঠাকুরাণীর বর্তমান মন্দিরের সন্নিহিত ভগ্ন ভূপে পরিণত মন্দিরগুলি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভগ্নভূপে ফুটাইয়া বা খনন করিয়া যে সকল প্রতিমার ভগ্নাংশ পাইয়াছি উদাহরণ স্বরূপ তাহার কয়েকটির চিত্র এখানে প্রকাশ করিব।

কুর্ঙ্গপুরাণের মতগত জৈবর গীতার কথিত হইয়াছে, এক সময় সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, কপিল, কণাদাদি মুনিগণ নর-নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞানযোগ লব্ধে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। তখন নরনারী অস্তিত্ব হইলেন এবং নারায়ণ তাপসবেশ পরিত্যাগ করিয়া শয্য, চক্র, পদা, পদ্ম ধারণ করিলেন। এমন সময়ে শশাঙ্কেশ্বর শিব আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণের অনুরোধ অনুসারে ঋষিগণের নিকট জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। উপসংহারে শিব বলিলেন—

“সোহং প্রেরয়িতা দেবঃ পরমানন্দ সংপ্রিতঃ।

নৃত্যামি যোগী সততং যন্তবেদ স যোগবিৎ ॥”

“(অগৎ) প্রেরয়িতা (পরিচালক), পরমানন্দবর যোগী (যোগাত্মস্বরূপ) সেই আমি সর্বদা নৃত্য করিয়া থাকি; যে তাহা জানে সে যোগবিৎ।” তার পর—

“এতাবহুজ্ঞা ভগবান্ যোগিনাং পরমেশ্বরঃ।

মনন্ত পরমং ভাবটৈবধরং সম্পদর্শন ॥”

“এই বলিয়া যোগিগণের পরমেশ্বর ভগবান্ (শিব) পরম ঐশ্বর্য ভাব দেখাইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।”

৩ নং চিত্রে দেখা যাইবে একখানি নটরাজ প্রতিমার উপরের অংশ এবং পাদপীঠ কোন প্রকারে ছোঁড়া দিয়া কটো তোলা হইয়াছে। প্রতিমার দেহের অধিকাংশ ভাগই এখনও পাওয়া যায় নাই। তথাপি এই ভগ্নাংশ দেখিয়া মনে হয় পুরাণের বর্ণনা বেন মূর্তি ধারণ করিয়াছে। নটরাজের মুখমণ্ডলে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ বিরোধ জাত বোগানন্দ সমাধির ভাব চমৎকার প্রতিলিখিত হইয়াছে; কমনীয় দেহখানি দ্বীর গভীরভাবে নৃত্যের ছলে বিখলীলার অতিনয় করিতেছে। তামিল দেশের সুপ্রসিদ্ধ নটরাজ মূর্তিতে গতিশীলতা প্রবলতর। খিচিংএর মূর্তিতে গতির ও স্থিতির, জ্ঞানের ও কর্মের, সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।

৫ নং চিত্র খিচিংএ প্রাপ্ত একখানি মহিষমর্দিনী মূর্তি। এই মূর্তির নিম্নভাগ বড় অসাবধানে খোদিত হইয়াছে, বোধ হয়, আনাড়ির হাতের কাজ। কিন্তু উপরার্দ্ধ বড় সুন্দর। মার্কণ্ডেয় পুরাণাঙ্গত দেবো-মাহাত্ম্যে মহিষমর্দিনী ভাবে উক্ত হইয়াছে—

“চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্ট।

ভব্যেব দেবী বরদে ভুবনজয়েৎ ॥”

“হে দেবি, একা তোমাকেই চিত্তে কৃপা এবং সমরনিষ্ঠুরতা একজ্ঞ দেখা যায়; তুমি জিতুবনে বরদায়িনী।”

এই মূর্তির মুখমণ্ডলে পুরাণোক্ত ভাব সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবী বেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কঠোর কর্তব্য-জ্ঞানের অনুরোধে এই নিষ্ঠুর অনুর বিনাশ কার্য সম্পাদন করিতেছেন। প্রাচীন গ্রীক ভাস্করেরা যখন হিরেক্লসকর্তৃক সিংহবিনাশের চিত্র বা অস্ত্র কোনরূপ ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তখন নিধনকারী দেবতার মুখমণ্ডল কতকটা সৌম্য করিয়াছেন। কি প্রাচীন গ্রীসে কি ভারতবর্ষে দেবাত্মের মুখে অনুর-বিনাশের চিত্রে গীতার—

“যোগহঃ কুরু কর্মাণি সদং ত্যক্তা বনজরং”

এই আদর্শই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রীক ভাস্কর্যে হত্যাকারীর মুখে কৃপা প্রকাশিত হয় নাই।

৬ নং চিঃ খিঃএর মূগ্ধ বড় মন্দিরের নাগমূর্তি ;
বিশ্বর-বিদ্যারিত নেত্র কি দেখিতেছেন ।

৪ নং চিত্রে আর একটা নাগ আরাধ্য দেবতার
গলে মালা পরাইয়া দিতে উদ্ভূত হইরাছেন । সুখমণ্ডল
আনন্দে ঢগ ঢগ ।

যে মন্দিরের শোভা সম্পাদনের জন্ত খিঃএর
(মহিষমর্দিনী ছাড়া) এই কয়েকটা এবং আরও অনেক
দেব-দেবীর এবং নাগনাগীর মূর্তি গঠিত হইরাছিল তাহা
আকারে ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বর বা রাজারানীয়া
মন্দিরের অপেক্ষা বড় না হইলেও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়
ছিল । যে কিছু ভগ্নাংশ আমরা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ
করিতে সমর্থ হইরাছি তাহা অবলম্বন করিয়া চিত্রেও
যে এই মন্দিরের পূর্ণাবয়ব দেখাইতে পারিব এমন
সাহস করি না । তবে এই পর্য্যন্ত বলা বাইতে পারে
যে এই মন্দিরের গর্ভ-গৃহের বহির্ভাগের অংকারে
অসাধারণ কলা-কৌশল এবং সুকৃতির পরিচয় পাওয়া
যায় । বাড়াবাড়ির এবং ইস্ত্রিপরাণতার নিদর্শন
অপেক্ষাকৃত বিরল । যে জিনিষটী দেখিতে ভাল
লাগে সেই জিনিষটীকে অতিপ্রকাশিত বা অতি ক্ষীণ
করিয়া দেখান শিল্পে ইস্ত্রিপরাণতার পরিচায়ক ।
অলঙ্কারের বাহুল্যও ইস্ত্রিপরাণতার নিদর্শন ।
খিঃএর বড় মন্দিরের কারুকার্য্যে এই ইস্ত্রি-
পরাণতা লক্ষিত হয় না, সকল অঙ্গই সংযতভাবে
অলঙ্কৃত হইরাছিল । এই মন্দিরের শিখরে অতি অল্প
কারুকার্য্য ছিল । যে স্থানের অলঙ্কার সহজে দেখা
যায় না সেই স্থানকে অলঙ্কৃত করা বিড়ম্বনা মাত্র ।
উচ্চ মন্দিরের শিখর কারুকার্য্য খচিত করা বৃথা
পরিশ্রম । লিজরাজের মন্দিরের শিখরও আর অলঙ্কার
শূন্য । মন্দিরের সৌন্দর্য্যের ভিত্তি—গঠনের ছাঁদ এবং
মানানসহি অঙ্গাবয়ব । যে অলঙ্কার সেই ছাঁদ এবং
মানানকে, মর্শকর অঙ্গোচ্চর করিয়া রাখে, সেই
অলঙ্কার স্বস্ত্র ভাবে দেখিতে বড় সুন্দর এবং
সরল হউক না কেন, মন্দিরের হিসাবে
অসঙ্গত ।

সুন্দর মন্দিরের এবং মূর্তির মর্শন ও মনন যেমন
রসবোধ বৃত্তির প্রসূরণের সহায়তা করে, তেমন
কারুকার্য্য বৃত্তির প্রসূরণেরও সহায়তা করে ।
লিজরাজের মত মহান্ মন্দির গড়িতে ও গাড়াইতে
যে অসামান্য ধৈর্য্য, সাবধানতা এবং প্রশমীলতার
দরকার হইরাছিল তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে
স্মরণকর্তার অভ্যাগত জড়তা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা কতক
পরিমাণে শিথিল না হইয়া পারে না । অল্প জাতির
এই প্রকার কীর্ত্তি দেখিলে অনেক সময় নৈরাশ্যের
উদয় হইতে পারে ; কিন্তু নিজের জাতির নিজের
জাতির মহান্ কীর্ত্তি হৃদয়ে আশার সঞ্চার না করিয়া
পারে না । উড়িয়া কতটুকু দেখ ! প্রকৃত প্রভাবে
উড়িয়া কর্দনের জন্তই বা একেবারে স্বাধীন রাজ্য
ছিল ! উড়িয়ার রাজাকে হয় গৌড়াধিপতির প্রধাত্ত
স্বীকার করিতে হইত, নয়ত হেলুগতাবী দক্ষিণ
কলিঙ্গের রাজার পদানত হইতে হইত । গঙ্গ-
বংশীরেরা দক্ষিণ কলিঙ্গ হইতে আসিয়া উড়িয়া জয়
করিয়া থাকিলেও, শিকারীকার ক্ষেত্রে তাঁহার
উড়িয়াদিগের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য
হইরাছিলেন, যেমন প্রাচীন গ্রীসের কাছে রোম
সাম্রাজ্যকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইরাছিল ।
তারতবর্ষেও শক, তুখার, হুণ প্রভৃতি আক্রমণকারি-
দিগকে প্রাচীন হিন্দুদিগের অল্পগত হইতে হইরাছিল ।
বস্তুতঃ ইতিহাসে দেখা যায় বাহুবলে বাল্য অসাধ্য,
শিকারীকার বলে অনেক সময় তাহা সাধ্য ; শিকারী
কার বলে পরাজয় কেন, সাম্রাজ্য লাভ করাও বাইবে
পারে ।

যখন মহাআ রাজা রামমোহন প্রাক্তরূত হইরাছিলেন
তখন হিন্দুর শিকারীকার মূল হইতে বিচ্যুত হইয়
অধঃপতনের রচনসীমার পছঁছিয়াছিল । তিনি যেহে
একদিকে বেদান্তমর্শন, উপনিষদাদির মূলের আলোচন
পুনরুজ্জীবিত করিয়া শিকারীকারকে মূলের দিকে
টানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তেমন আর একদিকে

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের সহায়তা করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাদীক্ষাকে সময়ের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহারা ইংরেজী শিক্ষাবিধানের প্রকৃত বিধাতা হইরাছিলেন তাঁহারা বর্তমান লইয়াই ছিলেন, অতীতের দিকে চাহিয়া, এদেশের লোকের খাত হিসাব করিয়া, বিধি-ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিহিত শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, বিভাগীকে ইংরেজী ভাষা এবং সঙ্গে সঙ্গে এক আধটু সংস্কৃত বা আরবী কার্শি শিখান, এবং জ্ঞানরাজ্যের কতকগুলি আবশ্যিক খবর গিলান। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক বিকাশ সাধন সে কথা বেন তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ শিক্ষার কলে, বাহা হইবার তাহা হইরাছে। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার বিরুদ্ধে এখন দেশব্যাপী বিজ্রোহ উপস্থিত হইরাছে। অনেকে বেন শিক্ষা জিনিষটার উপরই বীতরাগ হইরাছেন। অনেকে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের অস্ত্র ব্যাকুল হইরাছেন। এখন জিজ্ঞাস্ত,—জাতীয় শিক্ষা কি? এ সম্বন্ধে নানা-মুনি নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বাহা মনে হয় তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিয়া এই স্তম্ভের প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আমাদের মনে হয়, যে শিক্ষা জাতিগত আত্মজ্ঞান দান করে তাহাই জাতীয়-শিক্ষা। আমাদের জননী জন্মভূমি আমাদের উপর যেভাবে কোন্ কোন্ দোষগুণের বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ-দ্বিপের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-স্বত্ব কি প্রকার মতি-পতি শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়াছি, যে শিক্ষার দ্বারা তাহা সঠিক জানিয়া লওয়া যায় তাহাই জাতীয়-শিক্ষা। যে যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা পূর্ণরাজ্যের আত্মশক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন সেই কৃষাণ-গুপ্ত-যুগের সাহিত্য, শিল্প, এবং দর্শন আমাদের জাতীয় শিক্ষার

ভিত্তি হওয়া উচিত। এই যুগেই আমাদের মহাত্মার বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে; অর্থব্যব, আর্থ-শূর, কালিদাস, ভারবি, তবত্বতির কাব্য রচিত হইরাছে; বৌদ্ধ-দর্শন প্রবর্তিত হইরাছে; বড়দর্শনের প্রচলিত ভাষা সঞ্চলিত হইরাছে; এবং হিন্দু আর্থ্য-শিল্প জগৎপ্রাণ করিয়াছে। শিল্পে সমাজের বাহু এবং অন্তর্জীবনের চিত্র পূর্ণরাজ্যের প্রতিবিম্বিত হয়, এবং দর্শনের স্মরণতত্ত্বও দৃষ্টিগোচর হয়। এই শিক্ষাসংস্কারে ইউরোপের দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণীয় এবং কতক পরিমাণে অনুসরণীয়। ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষার ভ্রম হইরাছিল গ্রীসে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দী। তারপর মেনিসিনোরেরা সেই শিক্ষা-দীক্ষার বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন; রোম তাহা সবল্লভে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইউরোপের মধ্যযুগে খৃষ্ট ধর্মের অহুচর ইহুদীর সঙ্কীর্ণতা তাহাকে অনেক দিন পর্যন্ত পঙ্কু করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুর্দশা হইতে ইউরোপ মুক্তিলাভ করিয়াছে কি উপায়ে? খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী ইটালী প্রবর্তিত “রেনাসান্স” বা নব শিক্ষা—অর্থাৎ গ্রীসের পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা। ইউরোপকে মুক্তিদান করিয়াছে। আমাদেরও মুক্তির অস্ত্র কৃষাণ-গুপ্তযুগের শিক্ষা-দীক্ষার পুনরুজ্জীবন আবশ্যিক। কিন্তু এই পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করিবে কে? বাহারা দেশের নায়ক, দেশের ব্যবস্থাপক, তাঁহারা গণের হিতসাধনে এত ব্যস্ত যে, জনে জনের উন্নতি না হইলে যে গণের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নহে একথা হিসাব করিবার তাঁহাদের বেন অবসরই নাই। সুতরাং এই পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে বাঙ্গালা সাহিত্যকে। তারতবর্ষের আত্মাত্ম প্রদেশের কুলনার বাঙ্গালার শিক্ষা-দীক্ষার যে প্রাণের চাকল্য অধিকরাজ্য দেখা যায়, তাহার কারণ বাঙ্গালা সাহিত্য। বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর ভরসা।

শ্রীমদপ্রসাদ চন্দ্র

ভণ্ডের সার্থকতা

(গল্প)

পৌষ মাসের সন্ধ্যার কনুক্ষে ঠাণ্ডার চারিদিক বেন আড়ষ্ট। কলিকাতা সহরের কল-কারখানার চিম্নির ধোঁয়া শীতের ভায়ে জড়-সড় হইয়া শুট মারিয়া বাটার বুকে সুটাইতে ব্যগ্র। কলিকাতার কারখানা-বহুল স্থানগুলির রাস্তা দিরা চলিতে গথিক গণের নিঃশ্বাস ধোঁয়াটে বাতাসের বাশচাপে বুকের ভিতর বেন আটকাইয়া বাইতেছে।

কম্বুলে টোলার ‘...’ স্ট্রীটে এটর্নি মহাদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সড় রং কর! নুতন তেতলা বাড়ী বিদ্যায় আলো বুকে ধরিয়া গর্ভভরে হাসিতেছে। এটর্নি মহাশয়ের আলোকোজ্জ্বল সমজ্জ অকিস ঘর বা বৈঠক খানার ল্যাকারাস কোম্পানীর খাস কারখানার তৈরী চেয়ার সোকা কোচে শুটকতক খনী মাফোরারী ও বাঙালী মকেল বসিয়া সতৃক দৃষ্টিতে এটর্নি মহাশয়ের জীমুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছে।

সবুজ বনাত ঢাকা স্রুবহৎ সেক্রেটারিরেট টেবিলের কাছে একটা গবী মোড়া চেয়ারে বসিয়া প্রৌঢ় এটর্নি মহাদেব চট্টো চুকট টানিতেছিলেন। মহাদেব বাবুর চর্কি-বহুল বেঁটে চেহারার মাঝে সুবিশাল ভুঁড়ি এবং আকর্ষ বেষ্টিত গরম কাপড়ের মোটা ইংরেজি পোষাকে তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র হস্তপদমণ্ডল বিশিষ্ট সজীব ফুটবলের মত দেখাইতেছিল। বুকের উপর হীরক-খচিত টাইপিনে আঁটা রঙিন রেশমী টাই ছিলিতেছে। আঙুলে হীরার আঙটি বক্ বক্ করিতেছে। মাথার প্রকাণ্ড টাক। মুখের দাড়ি গৌক কোর-মস্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখে লুক-চুকল প্রথর দৃষ্টি। পুরু পুরু অধরোষ্ঠ হুট প্রচণ্ড আশ্চর্যের ভায়ে বেন উঠাইয়া পড়িতেছে। মাহুটির দিকে চোখ পড়িলেই মনে হয়, লোকটির সব দিক দিরা বেজার জাঁক—বিপুল দল্ল ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রবীণ এটর্নির ডানদিকে বসিয়া তাঁহার নব-জামাতা নবীন এটর্নি অরুণ বাবু। তাঁহার বেশ-ভূষার পারি-পাট্য বস্ত্রের বেশ-বিভাসের অনেক উচ্চ। অধিকন্তু কাফালো জু, কামানো গৌক এবং ব্যারিষ্টারী ক্যান্সানের কেশ প্রসাধনে তাঁহার স্ত্রী তরুণ মুখমণ্ডল অধিকতর জীমান। অরুণ বাবুর অদূরে তীমকান্তি অনন্ত কেরাণী বসিয়া আছেন।

এটর্নি মহাদেববাবু মাফোরারী মকেলদের সহিত কথাবার্তা শেষ করিয়া সম্মানে তাহাদের বিদায় দিলেন। তারপর বাঙালী মকেলদের একজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার সেটার কি হল?”

বাঙালী মকেল বলিলেন, “আপনি যেমন যেমন শিখিয়ে দিচ্ছেলেন, কান্দিবাবুকে ঠিক তেমনি গিয়ে বললাম—”

অনন্ত কেরাণী বাধা দিয়া বলিলেন, “কি কি কথা বলেছিলেন আগে বলুন—”

বাঙালী মকেল বলিলেন, “বললাম কারবারে পাঁচ বছরের নোকনানে বা ফেনা হয়েছে, তার অংশ নিতে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু বাবা মারা বাবার পর দশ বছরের লাভের অংশ আমাদের দিতে হবে।”

মহাদেব চট্টো বলিলেন, “হাঁ। তাতে কি বলেন?”

বাঙালী মকেল বলিলেন, “তিনি জবাব দিলেন, পাঁচ বছরে পনের হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, কিন্তু দশ বছরের লাভ মাত্র বারো হাজার। অর্থাৎ এখনো ফেনা তিন হাজার বাকি।”

অরুণবাবু অবজার হাসি হাসিয়া বলিলেন, “Impossible! কোর্টের আদ্রর নেওয়া তির ও সব বদমাইসকে সিদ্ধ করা বাবে ন্য। আপনারা নালিশ করুন।”

বাঙালী মকেলটি বিগ্ন ভাবে মাথা চুলকাটয়া বলিলেন, “তাই করব মনে করছিলাম। কিন্তু না কারাকাটি করছেন। মল্লছেন উনি আমার বর্গগত পিতার বহু দিনের হিঠৈবী বন্ধ, আজ সামান্য হু পাঁচ হাজার টাকার জন্তে তাঁকে নালিশ ক্যাসাদে কেলে জব্ব করা উচিত হবে না।”

অরুণবাবু বক্রহাস্তে অস্তমিকে মুখ কিরাইলেন। মহাদেববাবু উগ্র ভাবে ক্র কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “তাহলে আর আমার সময় নষ্ট করতে এসেছ কেন? বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে যদি মেরেলি sentimentই বেশী মূল্যবান মনে কর, তাহলে আইন আদালত জুগের কোন দরকারই নেই। আমরা বাপু ও সব আধ্যাত্মিক বুলবুলিকি বুঝি না, আমরা ও সব কথাই কি বলব? হাঁ, এস আইনের দিকে, আমরা তোমার হয়ে লড়ছি। — না হয়, বা বোঝ কর।”

তিরস্কৃত তত্ত্বলোকটি অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। অরুণবাবু অস্ত্র একটি মকেলের দিকে চাহিয়া স্নেহ-মিশ্রিত বাক্য হস্তে বলিলেন, “এ ছুনীরার একদল লোক আসে ঠকাতে, আর একদল লোক আসে ঠকতে। নিজের জোরে বিনি প্রথম দলে স্থান নিতে না পারেন, struggleএর চোটে তাঁকে দ্বিতীয় দলে গিরে পড়তেই হয়। কোন ক্রজিম তাবুকতাই জীবনের সে লোকসানকে ঠেকাতে পারে না, কি বলুন মশাই।”

মকেলটি এই মন্তব্যে মহা চরিতার্থ হইয়া মহাশ্লাঘে বাঁড় নাড়িয়া বলিল, “আজ্ঞে, বা বলেছেন মশাই। এ ছুনীরার নিরমই হচ্ছে হয় ঠকা, নয় ঠকাও।”

তৃতীয় মকেলটি নিজের কোটের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে মুহু-হাস্তে বলিলেন, “তবে নির্কিভাবে পরকে ঠকাতে হলে পকেটে কিছু পরসা থাক। চাই। খালি পকেটে ঠকাঠিকির কারবারে নামলেই বিপদ। কেন-না ধরা পড়লে উদ্ধারের পথ থাকে না।”

মহাদেব চট্টা মুগ্ধভীর মুখে বলিলেন, “উদ্ধারের আবার পথ থাকে না? সব দিকেই পথ। তবে ধার্মিক পরমহংস হয়ে চলতে গেলে কোন দিকে পথ

দেখতে পাবেন না। নইলে বুদ্ধি থাকলে দেখতে পাবেন, পকেট খালিই আর থাক। ভুঁইই থাক, পরসা চারিদিকে ছড়ানোই রয়েছে, শুধু কুড়িরে নেওয়ার অপেক্ষা। উপার্জনের পথে ধর্মভর, চমুলজা থাকলে উপার্জন হয় না।”

এই উপদেশ বুদ্ধি মাহাত্ম্যে ধরের সমস্ত লোকগুলি অশকালের জন্ত বেন ময়বুদ্ধ অতিভূত হইয়া পড়িলেন। বোধ করি সকলেই অতঃপর নিজ নিজ ভবিষ্যৎ উপার্জনের অবাধ স্বচ্ছলতার সোনার স্বপ্ন একবার করনা চক্ষে দেখিয়া লইলেন। ধর্মভর, নীতিজ্ঞান, চমুলজা ইত্যাদি ক্রজিম তাবুকতাগুলো এ পৃথিবীতে উন্নতিকামী মানুষদের সমস্ত উন্নতির যে কত বড় প্রতিবন্ধক, সে তবুটা দিব্যচক্ষে সকলেই পরিষ্কাররূপে বেন দেখিতে পাইলেন। সুবৃহৎ তেতলা চারতলা বাড়ী, সুদৃশ্য মূল্যবান মোটর গাড়ী, ধরের ভিতরের আনামপ্রদ আসবাব ও উজ্জল বিছাৎবাতি যে ধর্মভর, চমুলজা, নীতিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় না, এগুলি উপার্জনের পথ যে সম্পূর্ণ বতর, এ কথা সুকৃ-বিহ্বল চিত্তে একবার সকলেই স্বরণ করিয়া লইলেন। ভিতরের দিকে একটা দৃষ্টি বড় অনেক কুসংস্কার, ক্রজিম তাবুকতা ওলট পালট হইয়া গেল। কিন্তু সে ওলট পালটের সংবাদ কেহ কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না, সকলেই বিশেষ বস্ত্রে গাভীর্ষ বজায় রাখিয়া নীরব রহিলেন।

এই অবকাশের কঁাকে শোনা গেল, বাহিরের রাস্তার একখানা ভাড়াটে গাড়ী শানিয়া দাঁড়াইল এবং কে একজন বক্র-কণ্ঠে দরোয়ানকে প্রদ্র করিল, “এই-ত ছজ্জিম বাই ছই নবর বাড়ী? মহাদেব বাবু বাড়ীতে আছেন?”

সুহৃৎ মহাদেব বাবু টেবিলের কলিং বেল টিপিয়া দরোয়ানের উদ্দেশে সাক্ষেতিক আহ্বান জানাইয়া নিজে উঠিলেন। দ্যস্ত চরণে পাশের কামরার দিকে বাইতে বাইতে বলিলেন, “মোহিতবাবু আপনার কাগজগুলি আর কি’র টাকা অনন্ত কেয়াপির কাছে জমা দিয়ে

যান, আপ'নি পও' সকালে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আর বস্ত্র বাবু আপ'নি অন্তর্গত করে কাল সন্ধ্যায় আসবেন, আজ আপনার মামলার কথা অল্পগতক বুঝিয়ে দেন। আমি পরে সব ঠিক করব।”

দুয়ারের ঘেশবী পর্দা ঠেলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

২

মহাদেব বাবু পাশের কামরার ঢুকিতেই বিপন্নীত দিক হইতে দরোয়ান ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিল। বিনা প্রেমেই নিবেদন করিল, “খিদিরপুরে জানানা সোনারী আরা। আপ'কা মূল্যকাৎ মাংতে?”

“জানানা সোনারী?” বলিয়া মহাদেববাবু চিন্তিত ভাবে গভীর হইয়া বলিলেন, “শেফারকো বোল্ দেও, হাম্ পাঁচ মিনিটকা ভিতর গাটী মাংতা।”

“বো হকুম”—বলিয়া দরোয়ান প্রস্থানোত্তত হইয়া পুনশ্চ কিরিয়া দাঁড়াইল। মাথা চুলকাইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, “উরো লোক হকুমকো মূল্যকাৎ মাংতে খে। কেয়া বোলেদে?”

জুহু কর্তে হকুম বলিলেন, “উরো লোককা হকুম তামিল করণেকে ওয়াস্তে হাম তুম্কে তল্ নেহি যেতা। তোম্ পর্লে মেয়া হকুম মেখে—”

কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুত পদক্ষেপে অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। দরোয়ান উর্দ্ধ্বাসে বাহিরের দিকে ছুটিল।

মহাদেব বাবু অন্তঃপুরে ঢুকিতেই দেখিলেন, সিঁড়ির উপর হইতে একটি তেরো চৌদ্দ বৎসরের ছোটপুট শ্রামবর্ণ বালিকা নামিয়া আসিতেছে। অগ্রসর যুগে তিনি বলিলেন, “এই রুজি, তোর মা কোথা?”

মেয়েটি বলিল, “মার মাথা ধরেছে, গুয়ে আছেন।”

মহাদেব বাবু বলিলেন, “কোথা?”

“দক্ষিণ দিকের ঘরে।”

“আচ্ছা। বাড়ীর সকলকে বলে দে, যেন কেউ এখন তোর মাকে বিরক্ত করতে পার না। বাইরে

থেকে মেরেরা কেউ দেখা করতে আসে ত তোর বাইরে থেকেই বিদেয় করে দিস, বুঝ্দি?”

“আচ্ছা।”

মহাদেব বাবু টক্ টক্ করিয়া উপরের দক্ষিণ দিকের ঘরে চলিলেন। ঘরের বিজ্ঞান আলো নিবান ছিল, অন্ধকারে দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, “গিন্নি বেগে আছ?”

অন্ধকার ঘরের ভিতর হইতে উত্তর হইল, “আছি।”

“মাথা ধরেছে তোমার?”

“হঁ।”

মহাদেব বাবু বলিলেন, “তালই হয়েছে। তুমি গুয়ে থাক। খিদিরপুর থেকে মিহিরের মা এসেছেন। তুমি আজ আর ও'ক দেখা দিও না। আমিও বাইরে চলে যাব। যেমন আলাতে এসেছে, তেমনি লব্ধ হয়ে কিরে যাক্।”

অন্ধকারে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গৃহিণী সন্তুষ্ট ভাবে বলিলেন, “পিসিমা নিজে এসেছেন? কৈ, কোথা?”

বর্জী রুট ঘরে বলিলেন, “যেখানেই হোক। তুমি অত বাড়াবাড়ি কোর না। আমি বার বার বলেছি অত আমল দিও না, ওতেই ওদের আকারা বেড়ে যাচ্ছে। যদি ওরা বোকে যে টাকা পাবার আশা নেই, তাহ'লে ওরা এমন করে বার বার উত্যাগ করতে আসে না। বুঝ্তে পারছ আমার কথা?”

গৃহিণী একটু নীরব থাকিয়া বিবগ্ন স্বরে বলিলেন “বুঝ্তে ত পারছ। কিন্তু একদিন যে বড় বিখাস করেছে; শুধু আশ্রয় বলেই বিধবার সর্বস্ব ঝুলি বেড়ে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সে দিনের কথা—”

বরুদের স্বপ্নে যেন আগুন পড়িল! দপ্ করিয়া অগ্নি উঠিয়া বর্জী চাপা গর্জন সহ বলিলেন, “চপ'রাও! বুধ সামলে! অত আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকলে আমার আর করে খেতে হ'ত না। পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে দাও অমনি বয়েই হল? টাকা কি খোলাসহুটি না কি?”

ভালমানুষ গৃহিণীর বুকের পক্ষে এই তর্জনটাই যথেষ্ট। তিনি শুক রহিলেন।

কর্তা রাগ সামলাইয়া নরম স্বরে বলিলেন, “আইন-মতে আমার কাছে হ্যাণ্ডনেট লিখিয়ে নেয়নি কেন? এভাবে আলাতন করা, ওদের অজ্ঞার। টাকা ফেরৎ পাবার যদি ইচ্ছেই ছিল, তাহলে তখন টাকা হাতছাড়া করেছিল কেন?”

গৃহিণী মুহূর্তের বলিলেন, “মিহির ঠাকুরপোর বড় অল্প বয়সেই ত? এই শ্রীতের রাতে বুড়োমানুষ কষ্ট করে এসেছেন এখন, শুধু হাতে কেয়ান কি ভাল?”

কর্তা জুতা ঝুঁকিয়া বাঁধানো নকল দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, “তোমার মত নছার মেয়েমানুষকে চাবুক দেওয়াই ঠিক। আমি এক পরসাগ দেব না, তোমার কমতা থাকে, বাগের ঘর থেকে টাকা এনে দাও। না হয় নিজে রোজগার করে দিতে পার ত মিও।”

অন্ধকারেই নিঃশব্দে গোপনে গৃহিণী চোখের জল মুহিলেন। কর্তা প্রস্থানোত্তত হইয়া তীব্র বিরক্তির সহিত বলিলেন, “আমি একে সাত ঝড়োটের মানুষ। কত কষ্টে মাথা খাটিয়ে সকল দিক সামলে চলছি। এমন করে না চললে তোমার ছেলের বিনেত পাঠানো, মেয়ের জন্তে এটনি, ডাক্তার আমাই আনা মাথার উত্ত। শুভিহু ওই ফুটপাথে গে দাঁড়াতে হ’ত আজ, তার খোঁজ রাখ? বড় আদার থরথর করবার পরসাগ দেখছ। কিন্তু এ দিকে যে কি করে দিন চালাচ্ছি, তার খোঁজ রাখ না ত! ভাল চাও তো বা বলছি শোন। সাবধান, বাড়ী ফিরে যদি তনি, আবার ভেমনি করে লুচি মোণ্ডা খাই-ওদের খাতির করেছে, তা হলে আজ তোমারি একদিন কি আমারই একদিন!”

কর্তা কিরিয়া চলিলেন। বারেকা দিয়া বাইতে বাইতে উচ্চ কণ্ঠে সকলকে ডমাইয়া বলিলেন, “আজ আমার কিরন্তে রাত বারোটা হবে। বাড়ী এসে খাবার সময় হবে না, বড় কাব। আমার খাবার রেখে না।”

বাছিরে মোটর প্রস্তুত ছিল। নীচে আসিয়া খান-

সামার নিকট হইতে হাট ও ছড়ি লইয়া মহাদেব বাবু ভাড়াভাড়ি মোটরে উঠিতে বাইতেছেন, এমন সময় একটি বোল সতের বৎসরের বালক আসিয়া প্রণাম করিল। ছেলোটর ক্রশ বলিল সুষ্ঠি, মৈন্য-সুচক বেণ-জুয়া এবং পায়ের ছোঁকা জুতা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ভদ্রপুত্রের ছেলে হইলেও বেচারার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ছেলোটর চোখে সুখে নিদারুণ উষ্ম ও ভীতির চিহ্ন; ছেলোটর মুখের দিকে চাহিলেই মনে হয় সে বেন কোন এক অজ্ঞাত অপরাধের বেদনার সন্তপ্ত; অথবা বেন অন্ত্যস্ত হাতে চুরি করিতে আসিয়া এইমাত্র সে হঠাৎ থরা পড়িয়াছে।

ছেলেটি প্রণাম করিতেই মহাদেব বাবু তার দিকে চকিত চটক্কে একবার চাহিয়াই, প্রতিদমনকারহুলে চুপটি দোলাইয়া ক্রতপদে চলিলেন। ছেলেটি জন্তে তাঁহার অসুসরণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “না এসেছেন খিদিরপুর থেকে। একবার অল্পগ্রহ করে দেখা করে বান।”

মহাদেব বাবু বেন তনিতে পান নাই, এমনি ভাবে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “উঃ? আমার কিছু বলছ?”

ছেলেটির জিত্ বেন জড়াইয়া গেল। শুক কণ্ঠে বলিল, “আজ্ঞে হাঁ,—না এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।”

পরম অজ্ঞতার ভাণ করিয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, “না কে?”

ছেলেটি প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, “খিদিরপুরের মিহির বাড়ুয়োর তাই আমি, অনিল বাড়ুয়োর। আমার মা—”

মহাদেব বাবু বলিলেন, “অ! তুমি অনিল? আমি চিন্তে পারি নি। তার পর, বাড়ীর সব ভাল ত?”

ছেলেটি কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, “আজ্ঞে না, দাদার বড় অসুখ। সেই জন্তেই না চিঠি লিখেছিলেন আপনাকে।”

অগ্রসর হইয়া নিরকণ্ঠ মহাদেব বাবু বলিলেন,

“হাঁ সে চিঠি গেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার জবাব দেবার মত কিছুই নেই বাবু, নইলে কি চূপ করে থাকি? তোমার মাকে বুঝিয়ে বলগে এর পর একদিন আমি অবকাশ মত গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব, আজ দেখা করবার সময় নেই। ঐ দেখ গাড়ী দাঁড়িয়ে, এখন জরুরী কাজে বাছি, এর পর রাত বারোটার কিরব। আজ দেখা হবে না, তোমরা আজ বাড়ী যাও।”

কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোটরে উঠিয়া বসিলেন। লোকের মোটরে হাঁট দিয়া টিয়ারিং হইল ধরিয়া বসিল। গ্রহানোভত গাড়ী থক্ থক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ছেলেটি ছুটিয়া আসিয়া মোটরের পাশে দাঁড়াইল। উৎসর্গকৃত কর্তে বলিল, “আপনার সঙ্গে যার দেখা করা আজ বিশেষ দরকার। আপনি কিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এইখানেই রইলুম।”

ব্রহ্মবরে মহাদেব বাবু বলিলেন, “থাক্তে পারো। কিন্তু আজ আমি কিরব কি না সম্বন্ধ। তা ছাড়া তত রাতে কিরে দেখাপোনা করা সম্ভব হবে না, আমার বাড়ীতেও আজ অস্থব বিস্থব। তোমরা এই সময় কিরলেই ভাল করতে।”

হতবুদ্ধি বালককে দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারণের অবকাশ না দিয়া মোটর ঘোড়িল।

৩

বাল্যবপক্ষে মহাদেব বাবুর কোন কাবই ছিল না। সুতরাং উদ্বেগজনক ভাবে হু পাঁচটি বন্ধুর আড্ডার খুঁজিয়া, শেষে ইংরেজি হোটলে গিয়া মোটা দক্ষিণা দিয়া রান্না ও উদয়ের তৃপ্তিবিধান পূর্বক কিকিং পোলাপী বেশা লইয়া খোশ মেজাজে বাড়ী কিরিলেন। রাজি তখন সাড়ে এগারটা বাজিয়াছে। এত রাতে কোনও মিলাজ পাওনার দ্বারা খরা দিয়া বসিয়া থাকিবে এমনটা আশা করা অধবিলাসী মোটর বিহারী মূল্যবান পরিচ্ছদ মণ্ডিত মহাদেব বাবু অসম্ভব বলিয়াই মনে কিরিয়ছিলেন।

মোটর বাড়ীর দ্বারা আসিয়া থাকিল। মহাদেব বাবু গাড়ী হইতে নামিতেছেন, এমন সময় বাখার মাপার মুক্তি দিয়া আমার সেই ছেলেটি আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

বৈঠকখানার মস্তকের চিক্ নাই, হাতে কাবের ভিক্ নাই, উদর পূর্ণ—সুতরাং বেজান তখন পরম শীতল। মহাদেব বাবু এবার বরং উপবাচক হইয়া বলিলেন, “কি হে অনিল, এখনো রয়েছ বে?”

অনিল শুক রান্নাযুখে বলিল, “না আপনার ভক্তে বলে রয়েছেন।”

গভীর ভাবে মহাদেব বাবু বলিলেন, “অনর্থক বসে থাকা। চল বাড়ীর ভেতর।”

উত্তরে বাড়ীর ভিতর বাইবার জন্ত উত্তত হইয়াছেন, এমন সময় রাত্তার ওমিকের ফুটপাথ হইতে একটা লোক ছুটিয়া আসিয়া। লোকটার চেহারা বণ্ডানার্ক, পোষাক পরিচ্ছদ পশ্চিমা ভক্তলোকের মত। নিকটে আসিয়া একটা ছোট সেলাম কিরিয়া লোকটা বাজখাই জুরে বলিল, “তোমার ওজাসে সারা এটর্নি পাড়া ক’দিন যুছছি মুশই, এইখানে লজুন বাসা গিরেছ কেন?”

ক্রকৃকিত কিরিয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, “তুমি কে বল বেধি? কাকে খুঁজছ?”

রক্ত চক্ষু খুঁজিয়া লোকটা বলিল, “তোমার গো মহাদেব বাবু তোমার খুঁজছি। হামার চিন্তে পারছ না? হামী তোমাদের পুরোণো মোত পীর মহানব। আজ পনরো রোজ জেল থেকে খালাস হয়েছি;”

অনাকীর্ণ রাত্তার দিকে শক্তিত দৃষ্টিক্ষেপ কিরিয়া মহাদেব বাবু নিরবরে বলিলেন, “দেউড়ীর ভেতর এস। এখনি পুলিসের লোক এসে পড়বে হর ত।”

তিন জনে দেউড়ীর ভিতর ঢুকিলেন। দারোয়ান তটস্থ হইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, মহাদেব বাবু বলিলেন, “বাহার মাকে খাড়া রও।”

দারোয়ান বাহিরে গেল। অনিলের দিকে চাহিয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, “ওহে তোমার মাকে একটু অপেক্ষা করতে বল, আমি শীঘ্র বাছি। তুমি যাও।”

অমিল ভিতরে গেল। তার প্রশ্নান পথের দিকে চাহিয়া পীরমহম্মদ বলিল, “এ ছোকরা কি তোমার পাণ্ডনার আছে না জী?”

ওক ঘরে মহাদেব বাবু বলিলেন, “না। ও ছোকরা আমার আত্মীয়।”

বিকট হাতে পীরমহম্মদ বলিল “হাঁ হাঁ সে হামি শুনেছে। সেই বাথনার ওর দায়ের দশ হাজার রূপেরা মেরে লিয়েছে, না? তুমি পাকা খেলওয়াড়, বাবু সাহেব। আচ্ছা, ভালো হোক। হামার আবি ভিন চায়শো রূপেরা হাওলাং দেও তো।”

চমকাইয়া উঠিয়া ওকবুখে মহাদেব বাবু বলিলেন, “ভিনশো টাকা? রামচন্দ্র বল! আমার বাজে আল গোটা ত্রিশ টাকাও আছে কি না সন্দেহ।”

পীরমহম্মদ পাকা ব্যবসারী। মহাদেব বাবুর কথার কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্মিত মুখে বলিল— “বাবু সাহেব! তোমার শুভাবি সুটা বাতে, ওর আংয়েরজকা আইন আদালতে! লেকিন পীরমহম্মদের শুভাবি—সাজা ছোরার কাজা বা’ও মে! সুট বাৎ মাৎ বোলো। বোহিত মিত্তির আল সাম্‌কো বৎ পীচশো পীচশ রূপেরা তোমার বাড়ীতে দিয়েছে, হামি খবর রাখে। চায়শো রূপেরা নিকালো বাবু, বহৎ জ্বিতা করে বলেছি। একরোজ হামার চার হাজার খাঁকে হামার জেলমে তেজিয়াছিলে, খেরাল হার?”

মহাদেব বাবু নীরস কর্তে বলিলেন, “আমরা কি ইচ্ছা করে মজেলকে জেলে পাঠাই বাপু? সেবার তোমার কেস খারাপ হয়ে গেল, আমরা অত চেষ্টা করলুম—”

উত্তেজিত হইয়া পীরমহম্মদ বলিল, “তোমরা হরিহর উকিলকা ভুড়ি কাঁড়কে হামরা দো হাজার রূপেরা একরোজ নিকালে জিবই বাবু সাহেব! ও শালা হামরা সাৎ বহৎ দাগাখাজি কিরা। হম জেলকো নেহি ডরুতা, লেকিন জেলমে বব বানাই পড়া ভব, রূপেরা কাহে-হোড়কে?”

ক্রোধের উত্তেজনায় পীরমহম্মদের হিন্দী ক্রমে উর্দুতে চড়িতেছিল।

সহানুভূতি-বিগলিত কর্তে মহাদেব বাবু বলিলেন “সেত বটেই, হরিহর বাবু তোমার অত টাকা খেয়ে ভাল কাব করেন নি। কিন্তু আমার খাটুনি দেখেছ তো? তোমার সঙ্গে নিয়ে ছপুর রাত পর্যন্ত ব্যারিষ্টার-দের বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি, নিজে ত আমার নিজা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তোমার জন্তে বত খেটেছি এত খাটুনি আর কখনো—”

বাখা দিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইয়া পীরমহম্মদ বলিল, “উস্মে মেরা কেয়া কাম্‌ হরা? কুহ নেই—”

মহাদেব বাবু বলিলেন, “আহ-হা! সে কি আমাদের দেব? ডাক্তার কবিরাজ রোগী দেখে ওষুধ দেয়, পরসা নেয়, তারপর রোগী যদি না সারে, তাহলে কি নিজের পারিভ্রমিক কিরিয়ে দেয়?”

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রক্ত পর্জনে পীরমহম্মদ বলিল, “জাতি বড়বড়াও মৎ! পীরমহম্মদকো পছন্দা নেহি? মোতি মালো তো চায়শো রূপেরা দে দেও, বাস্‌ চলা বাতাহে। নেহিত হুসমনি মালো তো, জান বায়েগা বাবুসাং। হাম্‌ সাজা বাৎ বোলা, আব্‌ তোমরা বো খুনী—বোল্‌ দেও।”

গায়ের কাপড় সরাইয়া পীরমহম্মদ ইলিতে দেখাইল,—কোমরে দীর্ঘ ছোরা! দারুণ শীতের রাজে মহাদেব বাবুর কপালে ঘাম কুটরা উঠিল, ক্রত নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। ইতস্ততঃ চাহিয়া, একটু কাগিয়া ওক বিনীত কর্তে তিনি বলিলেন, “না, না, ওগব কথা তুমি মনে করুহ কেন? তবে কি না—কথা হচ্ছে-কি—”

পীরমহম্মদ বুঝিল, এই তুমিকার শেষ পরিণামে বহু আপত্তিই বাহির হইবে। বহুজ্ঞে সে ছোরা খুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তীব্র কর্কশ কর্তে বলিল, “বুঝে ঠিক বোল দেও রূপেরা জাতি মিলে পা; ইয়া নেহি?”

মহাদেব বাবুর আপাদ স্তম্ভক কাগিয়া উঠিল।

পীর মহম্মদের সে কর্কশ কর্কশনি দেউড়ীর খিলানের
পারে প্রতিহত হইয়া চারিদিকে যেন ৭২ পদু করিয়া
উঠিল। মহাদেব বাবু স্পষ্টই বুঝিলেন এই গোঁয়ার
ওঁতাটা আর বাই হউক,—এ ব্যক্তি আত্মীয়-বালক
অনিলাচন্দ্রের মতো নহে। হুর্কলকে কঁাকি দ্বিবার সময়
অনেক জুলুম খাটে, কিন্তু সবল যখন পদাঘাত
করিয়া লইতে আসে, তখন আইন কাহুন ওলা বড়
বিশৃঙ্খল বোধ হয়? নিরুপায় তাবে মাথা চুলকাইয়া
ক্লেশ পীড়িত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “আচ্ছা খান. গোণ-
নাল কোর না। তোমার টাকা দিচ্ছি। ওরে কে
আছিল, অনন্তকে ডাক তো।”

প্রভুর আদেশ মত দরোয়ান বাহিরে অপেক্ষা
করিতেছিল। আদেশ মাইই “যো হকুম” বলিয়া
ছুটিয়া গিয়া নিম্নিত অনন্ত বাবু কেরাণীকে ডাকাডাকি
কুড়িল। পীর মহম্মদ ছোরা বখাশানে রাখিল।

মহাদেব বাবু ইতস্ততঃ চাহিয়া করণ কণ্ঠে বলিলেন,
“ভাখো পীর মহম্মদ, টাকাটা তোমার দিচ্ছি বটে,
কিন্তু এটা এক রকম খার করেই দিচ্ছি। কথাটা
গোপন রেখো, এমন কি আমার কেরাণী দরোয়ানের
কাছেও একথা প্রকাশ কোর না। স্বরাটা জানা
জানি হলে এখুনি চারিদিক থেকে সব পাণ্ডনাদার
ছুটাছুট করে আসবে।”

অনন্ত কেরাণী চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বিশাল
ভুঁড়ির তারে ইসকাস করিয়া ছুটিয়া আসিল।
মহাদেব বাবু চোক গিলিয়া ক্লিষ্ট ভাবে বলিলেন, “ওহে
অনন্ত, ৭ তিনেক টাকা নিরে এস।”

অকুণ্ঠিত করিয়া পীর মহম্মদ বলিল “আউর
এক শো?”

মিনতি-করণ কণ্ঠে মহাদেব বাবু বলিল, “ভাখো,
সেটা আর এক দিন এসে নিও। কাল সকালে
উঠেই আমার সংসার খরচ আছে, তারপর বাড়িতে
আমার জীর অল্প—”

দাঁটা কতক আগে এই মহাদেব বাবু শিকারী
সালিয়া শিকার-মকেলকে বৈবরিক ব্যাপারে

সেটিমেণ্টের অসারতা সবচেয়ে সারগর্ভ উপদেশ
দিয়াছিলেন। সুখ ওঁতা পীর মহম্মদ সে
উপদেশ শুনে নাই, শুনিলে সম্ভবতঃ নিজের শিকারের
উপর এখন সেই উপদেশ বর্ষণ করিয়া বলিত—
“তোমার সংসার খরচ আছে, তোমার জীর অল্প,
তাতে আমার কি? আমার বহু টাকা গিলিয়াছ,
আজ তার কিঞ্চিৎ উপগ্রাহি না দিলে ছাড়িব না।”

কিন্তু পীর মহম্মদ লেখাপড়া শিখিয়া প্যাঁচালো
বুদ্ধির কোরে ওঁতামি করিতে অভ্যস্ত নয়, তার ওঁতামি
সোজামুগি গারের কোরে। সুতরাং মহাদেব বাবুর
অনুরোধে কিঞ্চিৎ সদয় হইয়া বলিল, “আচ্ছা তাইরা,
তুমি খরচা রহনে দেও, আজি তিন শো লাও।”

একটা তুচ্ছ ব্যক্তিকে এটর্নি প্রভুর সঙ্গে সমান
ক্রমে কথা কহিতে দেখিয়া অনন্ত কেরাণীর সুপ্রী-
কড়িত মস্তক বখেটে বিবল হইয়া পড়িয়াছিল। তুচ্ছ
পরিক্রমে আবৃত হইলেও লোকটা যে কোন একজন
মহৎ ব্যক্তি না হইয়া যায় না, এটুকু অনুমান করিয়া
সঙ্গমে নমস্কার করিয়া টাকা আনিতে ছুটিল।

তিন মিনিটের মধ্যে জিনখানি দশ টাকার নোট
আনিয়া, অনন্ত কেরাণী পীর মহম্মদের হাতে গণিয়া
দিল।

টাকা পাইয়া পীর মহম্মদ অপেক্ষাকৃত মেনাগ্রহ
হইল। লম্বা সেলান হুকিয়া বলিল, “দো হণ্ডা বান-
আকে বাকী রূপেরা লিয়ে বাব।”

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে দ্রুত গদে গদু হইল।

বাড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল।

চোর পলাইবার পর অনেকের বুদ্ধিই অনেক দিকে
বাড়ে। মহাদেব বাবুরও বাড়িতে কহুর হইল না। ঐ
ওঁতাকে দেউড়ী হইতে দক্ষিণ দিয়া বিদায় না করিয়া
কোন পড়কে যদি ঘরের ভিতর আনিয়া বসান হইত,
তারপর টেলিফোনে যদি পুলিশকে খবর দেওয়া

বাইত, তারপর—তারপর—ইত্যাদি অনেক কথাই মহাদেব বাবুর মনে হইল। কিন্তু অসময়ে সেগুলি মনে হওয়ার তিন শো টাকার শোক, তিন লক্ষকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিল। মহাদেববাবু নিজের আঙুল কামড়াইতে লাগিলেন।

সত্য বটে, তিনি এক সময় বিপদগ্রস্ত অবস্থার ঐ ভগ্নাটিকে হাতে পাইয়া অতি অযথা পরিমাণেই তার কবির শোষণ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া লোকটা এতদিনের পর পলায় আঙুল দিয়া অবলীলাক্রমে সে কবির বাহির করিয়া লইবে, এ কি সহ হয়? এ দিকে ও সব প্রেমীর লোককে চটাইলে ধন প্রাণ নিরাপদ নর। হার, কি স্বক্কারি করিয়াই আজ রাতে তিনি বাহিরে গিয়াছিলেন।

এই আক্ষেপটার সঙ্গে সঙ্গেই স্বরণ হইল, অতঃপরে আর একটা হতভাগিনী পাণ্ডনার অপেক্ষা করিতেছে। মহাদেব বাবুর বিবাক্ত মেজাজ আরও বিবাহীয়া উঠিতেছিল—কিন্তু তখনই কি একটা কথা মনে পড়ায় তিনি আশ্ব-স্বরণ করিলেন। খানিকটা ভাবিয়া মনে মনে একটা মৎস্যব আটিলেন। তার পর মাথা দোলাইয়া নিজমনে উৎফুল্ল হইয়া স্বগত বলিলেন, “হঁ, শানিত ছুরি নিয়ে যে দাবী করতে এসেছিল তাকে ঠেকাতে পারিনি—সে লোকসান এবার ক্ষুদ্র সমেত উত্তল করা বাক। নিরুপায় হয়ে চোখের জল নিয়ে যে দাবী করতে আসে, তাকে বুঝাছুঁত দেখানই বুদ্ধিমানের কাণ্ড।”

তীব্র গভীর স্তম্ভি ধরিয়া তিনি বাহিরের অফিস ঘরে বলিলেন। স্তম্ভকে ডাকিয়া বলিলেন, “খিদিরপুর থেকে বারা এসেছে, তাদের এইখানে ডাক।”

মিনিট পাঁচেক পরে শঙ্কিত অনিলের সঙ্গে এক বুঝা ঘরে চুকিলেন। বুঝা অস্থি চর্মসার। শোক, হুঃ, দৈহিক, মনস্তাপ, এক সঙ্গে মিশিয়া বেন সজীব স্তম্ভি ধরিল। এই অত্যাগিনী বুঝার আপাদমস্তকে দেহীপ্যমান।

মহাদেব বাবু উঠিয়া কঠে স্তম্ভে কোন গভিকে একটা প্রণাম করিলেন। শীতল বুঝা মৌর্য্য কাম্পিত কীণ

কঠে আশীর্বাদ করিয়া ছুরারের কাছে লজ্জল হইয়া বসিলেন। অনিল শুকনুখে তাঁহার পাশে বসিল। মহাদেব বাবু স্তম্ভভাবে নিজের আসনে বসিয়া চুকট ধরাইলেন।

বুঝা কিছু বলিবার আগেই মহাদেব বাবু চুকটে এক স্তম্ভীর্ষ টান দিয়া বলিলেন, “আপনি এসেছেন খবর পেয়েছি অনেকক্ষণ। তাকাতাড়ি এক বারপার বেরুতে হয়েছিল বলে দেখা করতে পারিনি। যে হুঃসময় কাছে আমার তা আর কহতব্য নর। এখুনি গুণ্ডার ছুরিতে—”

কথাটা বলিয়াই সহসা রসনা স্বরণ করিয়া জিনি বাড় উঠাইয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন। কড়াঙ্করে বলিলেন—“এই, বারেওয়ার কে রয়েছে?”

নীলু চাকর ছুরারের সামনে আসিয়া বলিল, “জাজে আমি। তামাক দেব?”

মহাদেব বাবু বলিলেন, “এখানে নর। ওপরে সেজে রেখে এস। আর শোন, সবাইকে বারণ করে দাও, এ দিকে এখন বেন কেউ না আসে, বুঝে?”

“বে আজে” বলিয়া নীলু প্রস্থান করিল।

মহাদেব বাবু বলিলেন, “অনিল, ডাখো ত তাই, বারেওয়ার কেউ আছে?”

অনিল সঙ্গত ভাবে বারেওয়ার গিয়া চারিদিক দেখিয়া আসিয়া জানাইল, কেহ নাই।

মহাদেব বাবু তখন নিরকটে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “বাড়ীতে কাউকে বলবেন না বেন, বাইরেও বেন কথাটা প্রকাশ না হয়। আপনার চিঠি পেয়েই সেই থেকে আমি টাকা বোগাড় কন্বার চেঁচায় দিন রাত ফুরাই। আজ অনেক কঠে এত রাত পর্যন্ত বলে থেকে এক জনের কাছে হু হাজার টাকা ধার পেলাম। রানবাগান ছাড়িয়ে মোটর একটা গলির কাছে দাঁড় করিয়ে আমার সোকার পেট্রোল কিনতে একটা দোকানে গেছে, হঠাৎ পাচজন গুণ্ডা এসে আমার উপর পড়ল। এই ছোরা মারে ত এই ছোরা মারে।—বেহাৎ গিড়পুণের জোরে প্রাণটা বেঁচ গেছে। শেকে বুঝাকারকে হু হাজার টাকা নিয়ে ব্যাটারি দৌড় দিলে।”

সংবাদ ওমিরা বুঝা হততথ ! অনিল উত্তেজনারক
কণ্ঠে বলিল, “তার পর ? তারা ধরা পড়েছে ?”

সবেগে মাথা নাড়িয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, “কে
ধরবে তাদের ? তাদের হাতে এক এক ছোরা। পুলিশ
তাদের বেধে সরে পড়ে, অস্ত্রে এগুবে কি ?”

আজ তিন বৎসর এই বুঝা ক্রমাগত তাঁহার বাড়ীতে
হাটাহাট ও কানাকাটি করিতেছেন। স্বাক্ষর নাবালক
পুর ছুটিটার পড়াশুনা এবং সংসার নির্বাহের সুবিধা
করিয়া দিবার চুক্তিতে মহাদেব বাবু বুঝা পিসির
কাছে বিনা খতে দশ হাজার টাকা ধার লইয়াছিলেন।
সেই অবধি তিনি আর এক পরস্যাও দেন নাই।
পর দৈন্ত-গীড়িতা আত্মীরের আকুল অশ্রুপূর্ণ গৃহিণীর
অনুর ও ধর্মতর প্রভৃতি নানা কারণে উত্থাপ্ত হইয়া
মহাদেব বাবু এক সময় হালার দুই টাকা দিতে প্রতিশ্রুত
হইয়াছিলেন। এখন বুঝার লোভপূর্ণ মিহির কালাজরে
শ্যাশারী, ছেলেটার চিকিৎসা-খরচ করাইবার সামর্থ্য
বুঝার নাই। ঐশ্বরের দ্বারে বাঁকুল বুঝা শেষ আশার
নির্ভর করিয়া মহাদেব বাবুর দ্বারে উপস্থাপি আবেদন
পাঠাইয়া শেবে নিজে আজ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।
এই দারুণ শীতের রাত্রে স্মৃতিশ্রুত পুত্রকে সঙ্গে করিয়া
শীতান্ত বুঝা সন্ধ্যা হইতে রাত দুপুর পর্যন্ত বড়লোক
তাইপোর ছুরারে ধরা দিয়া বসিয়া থাকিয়া এতকণে যদি
বা সাক্ষাতের অসুবিধা পাইলেন, তবে সংবাদ বা পাইলেন
—তা অতি শুভ।

বুঝা শুভিত নিম্পন্দ হইয়া পড়িলেন। বড়লোক
ব্রাহ্মপুত্রের প্রয়োজনের সময় আত্মীরের উপকার করি-
বার ইচ্ছাতেই বড় বিশ্বাস করিয়া তিনি নাবালক পুত্র
ছুটির প্রাসাদাদানের সমল, দশ হাজার টাকা ব্রাহ্মপুত্রের
হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। টাকাগুলি লইবার সময়
শিক্ষিত সম্রাণী উপার্জনশীল ব্রাহ্মপুত্র কত প্রত্যা-
কারের আশা দিয়া কত কৌশলময় বাক্য-বিবাসে বুঝার
হাতে টান ধরিয়া দিয়াছিলেন। তারপর সে
চ'দের মহিমার আজ তিন বৎসর বুঝার নাবালক পুত্র
ছুটি অসহীন, বসহীন, হরত রোগে শ্যাশারী হইয়া এক

কোঁটা ঔষধ পাইতেছে না, উপযুক্ত পথ্যের ত কথাই
নাই। এদিকে এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা সহরে
এটর্নি বাবুর হুখানা তেতাল্লা বাড়ী উঠিয়াছে, মূল্যবান
মোটরগাড়ী হইয়াছে, উৎকৃষ্ট আশবাব গজে, উজ্জল
বিছান বাতিতে ঘর ঘর হাতময় হইয়াছে। কোন্
বাহুস্বয়ের বলে এ সব হইয়াছে কেহ জানে না।
কিন্তু হইয়াছে স্নানচিত্ত ! সকল দিকের বড়মহুখী
কারদা বজার রাশিবার লভ্য ব্যয় নির্বাহে তিনি সক্ষম।
তাঁহার বত কিছু অকমতা শুধু দরিদ্র বিধবা ও নাবালক
পাণ্ডাদারদের ভ্রাতৃ প্রাপ্য কিয়দৈরা দিবার সময়।

অনেকক্ষণ শুক থাকিয়া মর্শ্বভেদী ক্রেশের নিঃশ্বাস
চাড়িয়া বুঝা বাস্পাক্রম কণ্ঠে বলিলেন, “তা হলে কি হবে
বাবা ? ছেলেদের ভিটেমাটি বিক্রী করে, সর্বস্ব হুচিরে
ডোমার হাতে দশ হাজার টাকা তুলে দিবেহিলাম।
তার পর আমার কপালদোবে, এখন ছুনি দয়া না
করলে—”

মহাদেব বাবু গভীর হইয়া বলিলেন, “না থাকলে
কোথেকে দেব ?”

বুঝা বলিলেন, “নেই বলো না বাবা ! ডোমার বা
বাড়ী, গাড়ী—”

বাধা দিয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, “সব দেনার
ওপর ! সব দেনার ওপর ! বলে হরত আপনারা
বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু বাস্তবিক বলছি, বাবারে
একটু স্নান আছে, ব্যবসার খাতিরে তাই ধার পাচ্ছি,
তাই এসব করেছি।—এসব ঠাঁট বজার না রাখলে
বে আমার ব্যবসা চলবে না তাতো বোঝেন ?”

কোঁতে হুখে নৈরাশ্যে বালক অনিল অন্তরে অন্তরে
ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিশ্বাসঘাতক মরণপত্র
হাতে বড় বিশ্বাসে সর্বস্ব সঁপিরা বিধবা দরিদ্র মাতা আজ
কতদূর সাংঘাতিক অর্থক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তার
প্রতিদিনের প্রতি অভাব, অনটন মনস্তাপ অশ্রুপূর্ণ
প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই বালক “মোরিরা” হইয়া বলিল,
“বেশ, তাহলে একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না।
দেনার ওপর যদি এত বাড়ী গাড়ী ইলেক্ট্রি, লাইট, ক্যান-

টেলিকে। করতে পেরেছেন, তাহলে আরও কিছু বেনা করে পরীক্ষার দ্বঃসময়ে সাহায্য করুন দাদা।”

মহাদেব বাবু সপ্রতিভভাবে তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “তাইত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তোমাদের বে কপাল মন্দ—এই ত তোমাদেরই ছই হাজার টাকা হাতের ওপর থেকে গেল। লোকে কেনেছে, এখন আমার অনেক ধার হয়ে পড়েছে। তাই আর সংক্ষেপে কেউ ধার দিতে চাচ্ছে না যে।”

অনিল বুঝিল ইহার উপর বাক্যব্যয় করা সুততা।

মহাদেব বাবু উঠিয়া বলিলেন, “আমি আর বসতে পারছি নে, এবার শুতে বাই। আপনারা যদি বাড়ী যান তো এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন। দরোয়ান আর দেউড়ী খুলে রাখতে পারবে না।”

মর্যাদিক আক্ষেপে অশ্রু উচ্ছ্বসিত কর্তে বৃদ্ধা বলিলেন, “বাবা কিছু দাও, আমার মিহিরের বে পথ্য কিছুই হচ্ছে না।”

বিরক্ত হইয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, “সেই এক কথা তবু। আপনাকে দেখছি বুকিরেও বোঝান বাবে না। টাকা যোগাড় করলাম কিন্তু ভোগে লাগল না, আমি আর কি করি? নিজে যে মরতে মরতে বেঁচে গেছি, এই যথেষ্ট।”

নিরুপায় বৃদ্ধাকে সাহায্য স্বরূপ এই উপদেশের পরটি শুনাইয়া মহাদেব বাবু উচ্চ কর্তে বলিলেন, “এই নীলে, দরোয়ানকে বল, এঁরা এখনি যাচ্ছেন। তার পর বেন দেউড়ী বন্ধ করে।”

অনিল উঠিয়া শুককর্তে বলিল, “একটা গাড়ী নিয়ে আসি না—”

মা কাতর কর্তে বলিলেন “গাড়ী ভাড়ার টাকা কৈ বাবা? ষটি বাটি বাঁধা দিয়ে চারটি টাকা ধার পেরেছিলাম, আগতে গাড়ী ভাড়া তিন টাকা আট আনা গেছে। মোটে আট গুণা পরস। আছে। এটা থাক কাল সকালে তোমাদের বাবার খরচ হবে।”

উদ্বিগ্ন ভীত বালক বলিল, “তা হলে কি করে বাবে না?”

“হেঁটেই বাব বাবা, চল। দরোয়ান এখনি আবার দেউড়ী বন্ধ করবে। শীগ্গির চল।”

মহাদেব বাবু কথাগুলো শুনিয়াও শুনিবেন না। নিজের মনে উপরে উঠিয়া গেলেন। বুদ্ধি থাকিলে তিন শো টাকার লোকসানকে সধ্যাবহার করিয়া, ছ হাজারের পাণ্ডানাদারকে কেমন কেমন বন্ধে বৃদ্ধাশ্রুত প্রদর্শন করান যায় সে হিঙ্গীব আলোচনা করিতে করিতে তিনি নিজের কৃত্তিখে বিশেষ গর্কবোধ করিলেন। তাঁহার জ্বংগিতের সানন্দ লক্ষের মাঝে সাহসান্দে ধনিত হইতে লাগিল—শুভামি ও ভুগামির জয় জয়কার। হয় গায়ের জোরে কাড়িয়া লওয়া, নয় বুদ্ধির জোরে ঠকাইয়া লওয়াই ত এ সংসারে—মাহুষের কাণ।

এটর্পি মহাশয় দেতালার উচ্চ গৃহে আরাধনার ক শয়ান শুইয়া যখন নিজের মন বুদ্ধির সঙ্গে এমনি প্রীতি-কর আশ্বাস ন রত, তখন হুটপাথে রাত হুপরের প্রচণ্ড শীত-কুহেলিকার মাঝখান দিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে অবসর পদে চলিয়াছিল—একটি ক্ষুধার্ত বালক ও একটি সর্কস্বাতা, নৈরাশ্য-কাতরা বৃদ্ধা। উভয়ের নিরুপায় অশ্রু নিদারুণ মর্ষবেদনার চোখের তিতর জমাটি বাঁধিয়া গিয়া-ছিল। সেই জমাট যন্ত্রণা-স্তুপের অস্তিত্ব এ পৃথিবীর স্বার্থপর বিখ্যাসঘাতক জ্বরহীনরা ভগ্নেরা হয়ত প্রোছের মধ্যে আনিবে না, কিন্তু অলক্ষ্যে কোনও সংহার দেবতার কোনও রক্ত অভিমান সেইখান হইতে জ্বল হইবে কি না কে জানে। প্রোতা-রিভা সর্কস্বাতা অগাধিনীর তপ্ত মর্ষব্যথা মাখা অগহার অশ্রু—ভগ্ন-ভজ্ঞতার সুখোস পরা, পঃস্বাপহারী দস্যুর দঃস্বারে উপেক্ষিত হইলেও, সর্কনিরন্তর ভায়বিচার-লয় সে উপেক্ষার উপবৃত্ত প্রতিশোধ দানে নিরন্ত থাকিবে কি না, সে প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর বোধ হয় ভবিষ্যৎ একদিন প্রত্যক্ষ দৃশ্যে দেখাইবে। আগন্ততঃ প্রতাপশীল ভগ্নের প্রতাপে বৃদ্ধ হইয়া সাধারণ মাহুষ নির্জিয়ারে তাবিয়া লউক—এ পৃথিবীতে সার্বিক ভগ্ন ভগ্নের ভুগামি, এবং দৈত্যের শুভামি।

ঐশ্বর্যবান। যোবজান।

নববর্ষের আবাহন

উষার অরুণরাগে তটিনীর কল কল তানে,
শ্রামল-বিটপ-কোলে বিহগের মধুময় গানে,
সন্ধ্যার চঞ্চল-মেঘ কুসুমের হাসির সুবাসে
প্রকৃতি সহাস মুখে 'নববর্ষ আগত' সম্ভাষে।

সুপ্তি অলসতা ভ্যাজি পুত এ মজলমর কণে,
নবোত্তমে নবচ্ছন্দে নবমন্ত্রে নব স্বকল্পণে,
উদ্ধার আশার বশে নবোৎসাহে বাঁধিয়া হৃদয়
অসমাপ্ত কার্যগুলি সাধিতে হইবে সমুদয়।

বিকলতা বিকলতা চিরতরে বিসর্জন দিয়া,
শোকহঃখ বিজড়িত স্বপ্নসম অতীত ভুলিয়া,
হাসিমুখে এস কর্মি ! হে আতুর, অক্লান্তি, হতাশ !
বিশ্বনিরন্তর পদে চলে দাও প্রাণপূর্ণ আশ।

ঐবিজয়চন্দ্র তট্টাচার্য্য।

দারার দুরদৃষ্ট

[পূর্বানুসৃতি]

কল্পনাভীত ক্লেশ সহ্য করিয়া, বহু সৈন্য, হতী
অথ উষ্ট্র প্রভৃতি সাময়িক প্রয়োজন সাধনোপযোগী
বহু প্রাণী দ্রুতর লবণ মরুর মধ্যে যুদ্ধাশুখে বিসর্জন
দিয়া সপরিবারে দারা কোন মতে কছে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন, এবং কালহরণ না করিয়া গুজরাটের
রাজধানী আহমদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগি-
লেন। সে সময়ে তাঁহার মাত্র তিন সহস্র সৈন্য সঙ্গে
ছিল। ইচ্ছা ছিল যে রাজধানী আহমদাবাদে পহঁচিয়া
কামান বন্দুক রসদ সৈন্য বাসবাহন এবং অর্থ সংগ্রহ
করিয়া ঔরঙ্গজেবের সহিত আর একবার বল পরীক্ষা
করিতেন; এবং ভগবানের কৃপা হইলে ময়ূর সিংহাসন
লাভ অসম্ভব না হইতেও পারে। বস্তুতঃ ধরমভৈরব
যুদ্ধে বশোবন্তসিংহ যুদ্ধের ভার যুদ্ধ-নীতি অবহেলা
করিয়া ঔরঙ্গজেবের কাননের মুখে রাজপুত অখারোহি-
গণকে অনর্থক ঢালাইয়া দা দিলে অবশ্য সৈন্য ধ্বংস

হইত না, এবং সম্ভবতঃ পরাজিত হইয়া বশোবন্তের
বন্দীরূপে শাহজাহানের পদতলে শৃংখলাবদ্ধ ঔরঙ্গজেব
ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন; কিংবা সামুগড়ের
যুদ্ধক্ষেত্রে দারা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিয়া সেনার মধ্য-
ভাগে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া যদি বাহিনী চালনা করিতেন
তাহা হইলে অরঙ্গজেব যুবরাজ দারার কাছেই অসমাল্য
পরাজিত হইতেন, তদ্বিধে সে কালের যুদ্ধনীতি বিশারদ
সেনাপতিগণ কেহই কোন সম্ভেদ প্রকাশ করেন
নাই। কিন্তু দারার দুরদৃষ্ট যে, বাহা হইতে পারিত তাহা
হইল না, বাহা ঘটবার নহে সেই ঘটনাই ঘটিল। গেল;
নতুবা বশোবন্তের ভার সাহসী সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে
যুদ্ধের ভার বৃথা বীরগর্ক প্রকাশ করিতে গিয়া স্বীয়
সৈন্য বেচ্ছায় নষ্ট করিয়া পরাজিত হইবেন কেন, এবং
অর সিংহের ভার প্রবীণ সৈন্যধ্যক্ষ, যুদ্ধ সম্রাট
শাহজাহানের উপদেশ এবং আদেশ লঙ্ঘন করিয়া

বিভিন্নবাক্যের মত নৌগমে ঔরঙ্গজীবের পক্ষপাতী হইবেন কেন? সমস্তই বিবিলিপি, দ্বারার প্রবর্তনকার এক ঔরঙ্গজীবের একাদশ বৃহৎপত্রের কথা। বাক্য হউক, আহম্মদাবাদে পড়িলে দ্বারার অর্ধেক দেবতা একবার তাঁহার দিকে কৃপাচক্ষুপাত করিলেন। ঔরঙ্গজীবের খত্তর শাহনেওয়াজ খাঁ সে সময়ে আহম্মদাবাদের শাসনকর্তা, ধনাগার এবং সৈন্তসমিষ্ট সমস্তই তাঁহার অধীন; এই শাহনেওয়াজ শাহাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একাশের জন্ত ঔরঙ্গজীবের প্রতি অনন্ত ছিলেন, বিশেষ তাঁহার কন্যা তখন জীবিত ছিলেন না, সুতরাং কানাকার সহিত মেহ বন্ধনের স্বর্ণ মুখল তখন ছিল। বৃদ্ধ বস্ত্রকে দক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজীব একবার কাগাগারে বন্দী করিয়া কিছুকাল রাখিয়াছিলেন। এই সকল কারণে দ্বারা আহম্মদাবাদে পড়িবারাজ, শাহনেওয়াজ তাঁহাকে সুব্রাহ্মণ স্বরূপ অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন এবং ডাকঘাটের বাহাদুরী বাহিনী রাজকুমারের সাহায্যার্থ নিয়োজিত করিলেন। বৃদ্ধবীর শাহনেওয়াজ স্বয়ং অসি হস্তে শাহাহান বাহাদুরের মনোনিবেশ ভবিষ্যৎ রাজ্যাবিকারীর জন্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া দ্বারার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শাহনেওয়াজ খাঁর দ্বারাপক অবলম্বন করিবার অনেক অনেক কারণ দ্বারা থাকেন, কিন্তু দ্বারার প্রীতির দীর্ঘ দিনে, অগ্নি বিকীরণকারী সূর্যের হুঃসহ তাপে হৃৎক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমস্ত্রণ এবং পরাভবের বেদনা করিয়া গলায়নের অপমান যে রাজকুমার দ্বারা কতই সহ্য করিয়াছেন, সে কথা তাহিলে নিতান্ত পাবাণ দ্বিগুণ বিবীর্ণ হয়, পাথরের চক্ষু গলিয়াও অক্ষ বাতির হইয়া পড়িল। বৃদ্ধবীর ধর্মতীর শাহনেওয়াজ যে দ্বারার পক্ষ অবলম্বন করিবেন ইহা নির্দিষ্ট নহে।

ডাকঘাটে বিদ্যা সংবাদ ঘটিল যে, স্বজ্ঞার সহিত বৃদ্ধ ঔরঙ্গজীব পত্রাভিত হইয়া পাক্ষ্যের দিকে পত্রাভন করিয়াছেন। দ্বারা মনে করিলেন এই ভক্ত-বৃদ্ধকে সৈন্তের আশ্রিত করিয়া বৃদ্ধ শিতা সত্রাট শাহাহানকে

কার্যাকৃত করিয়া পূর্বের ভার তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবেন এবং স্বয়ং তাঁহার সিংহাসন নিরে অসিরা তাঁহার প্রতিবিবিল্পে পূর্ববৎ রাজকাব্য চালাইবেন। কিন্তু সেই বৃহৎ ব্যাপারে সাক্ষ্য লাভ করিতে হইলে বৃহৎ আয়োজনের আবশ্যক। বিপুল বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতে পারিলে তবে ঔরঙ্গজীব এক তাঁহার পক্ষপাতী, ক্ষমতাপন্ন হিন্দুসুলভানগণ ভীত হইয়া রাজকুমার দ্বারার পথ ছাড়িয়া দূরে দাঁড়াইবে। কিন্তু শাহনেওয়াজের সৈন্তবল পাইলেও সে সৈন্তের সংখ্যা অধিক ছিল না, বন্দুক কাশান অর্ধ ও রসদ আরও অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক, সেই জন্ত দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন, ধন জন ও সাহসিক প্রত্য সত্রাট দ্বারা তাহাকে সাহায্য করিবার মত লোক কে আছে? তাঁহার দৃষ্টি পড়িল গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের উপরে। ঔরঙ্গজীব সুবাদগণে বখন দক্ষিণাত্যে ছিলেন সে সময়ে তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বারা এই অভিযানের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং বুদ্ধান্তে সত্রাট শাহাহানের নিকট নানারূপ আবেদন নিবেদন করিয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার অলভানগণের অহুকুল সন্ধি করাইয়া দিয়াছিলেন। দ্বারার বিদ্যা, তাঁহার এই পূর্ব সময় ব্যবহার স্মরণ করিয়া অলভানগণ তাঁহার সহায়তা করিবেন এবং ঔরঙ্গজীবের পূর্ব শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার এই উত্তম সুযোগ তাঁহারা ভাগ করিবেন না। এই সকল কারণে দ্বারার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে দক্ষিণাত্যে অভিযুখে প্রথমে গিয়া বিজাপুর গোলকুণ্ডার সৈন্তের সহিত নিজ সৈন্ত সম্মিলিত করতঃ বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক রূপে আগ্রার পথে অগ্রসর হইবেন। এমন সময়ে বাক্ষ্যের দ্বারা যশোবন্তসিংহ তাঁহার রাজপুত্র সৈন্ত দ্বারা পুনরায় দ্বারাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া সূত্রাট পাঠাইলেন এবং দ্বারাকে আজীবনে সৈন্তের গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্ত অহুরোধ করিলেন। দ্বারার উত্তরগড়ট উপস্থিত হইল, কি করিবেন মহাশয় করিতে পারিলেন না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার

সহিত সন্নিহিত হওয়ার সময় সাপেক্ষ এবং সন্মতাবরণ
দ্বারা আর্থিকরূপে সাহায্য দানে সম্মত হইলেন কি না
তাছাড়া আর কিছু নিশ্চয়তা নাই—এটিকে যশোবন্ত কং
সাহায্যদানের সংবাদ পাঠাইয়াছেন; সুতরাং ইহা এক-
রূপ নিশ্চিত এবং অসংশয়কৃত হইতে আশীষের অন্ন
হুয়ের পথ, উত্তর সৈন্দের সন্নিহিত কর্তাইয়া আশ্র-
তিরূপে সম্ভাবিতবান করিতে বিলম্ব করিতে না। এই
সকল কথা চিন্তা করিয়া যশোবন্তের সন্মতাবরণ এবং
করাই সমস্ত বোধ করিলেন এবং দানিগাত্যে বাইবার
সকল একরূপ ত্যাগ করিলেন; ইহাই হইল দ্বারার
সম্মতাবরণ নূল।

মহাসীজ অসিংহের ভার রূপক সেনাপতি সে
সময়ে আর কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। আবার জ্বরময়ণার
তিনি কোটাল অপেক্ষাও মহাশোণাধ্যায় ছিলেন। মন-
কুপন ঔরঙ্গজীব একথা বুঝিয়াই অরুণিহকে পূর্ব
হইতে হস্তকৃত করিয়াছিলেন। অসিংহও চতুর চূড়ামণি
ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে গমন করা বুঝিমানের কার্য
হইবে না জাবিরা সহজেই ঔরঙ্গজীবের বক্তব্য বীকার
করিয়াছিলেন; সুতরাং একেত্র যোগ্যের সহিত
যোগ্যের যোগনা হইয়াছিল, ব্যাক নথর সুবর্ণমণ্ডিত হইয়া
উজ্জ্বল হইয়াছিল, শনিমাকার সহিত সুবর্ণমণ্ডিত হইয়া
হইয়াছিল, অশোকতার রাজিতে তরঙ্গী নন্দনের সংযোগ
হইয়াছিল।

এই রাজা অসিংহ, যশোবন্তকে ঔরঙ্গজীবের পক্ষতুচ্ছ
করিবার জন্য নানা কল কৌশল প্রযোজ্য করিতে
ছিলেন; সাবুগড়ের যুদ্ধে দ্বারা পরাজিত হইয়া পলায়ন
করিবার পর এবং সম্রাট শাহজাহান ঔরঙ্গজীব কর্তৃক
কারাবদ্ধ হইবার পরে অসিংহের প্রমথন চেষ্টা হইল
যশোবন্তকে ঔরঙ্গজীবের দক্ষতুচ্ছ করা; কখনও উপেক্ষ
কখনও অত্যাচার, কখনও বা রাজসম্মানের তর প্রদর্শন
ইত্যাদি কল কৌশল চর্চাতে লাগিল।

যশোবন্তের যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর হস্তে যশোবন্ত
সেই অগম্যভবন প্রতিপোষ হইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত
হইয়াছিলেন। রাঠোরসম্রাট আদ্র বীর ও পাহাড়

কর্ত্তিক বোমবাই তাঁহার অত্যাচারে সন্তুষ্ট হইয়া
হইতেন। কিন্তু দ্বারা তখন পলায়ন-পর, ঔরঙ্গজীব
কর্ত্তের সিংহাসনে সম্রাটরূপে সমাসীন, বৃদ্ধ শাহজাহান
কারাবদ্ধ, যশোবন্ত একাকী অসহায় সম্রাটের প্রতি-
যোগিতা করিবার জন্য ব্যক্তি নহেন, সুতরাং তাঁহার
অত্যাচারে বৃদ্ধ যশোবন্ত তাঁহাকেই দণ্ড করিতে পারিলেন,
ঔরঙ্গজীবকে স্পর্শও করিতে পারিতেন না। যখন
এইরূপে রাজা যশোবন্ত নিঃশব্দ অবসরের প্রতীকার করিয়া
অত্যাচারে অত্যাচারে অসিংহেতেছিলেন, এমন সময়ে
রাজকুমার দ্বারা ওজরাটে পহুঁচিবার সংবাদ আসিল।
আসিও সমবাদ আসিল যে পাহাড়ে রাজা বীর দ্বারা
ধন এবং জনবল দ্বারা সাহায্য করিতেছেন এবং যখন
আসি হস্তে তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া-
ছেন। যশোবন্তের রাঠোররাচিত রণলিপ্সা আশ্রিত
হইয়া উঠিল, পূর্বাশ্রমভবন প্রতিপোষের অবসর উপস্থিত
দেখিয়া তিনি দ্বারা আশীষে আসিবার জন্য সংবাদ
পাঠাইয়া দিলেন এবং বীর রাঠোর সৈন্য সম্মত করিয়া
অরুণ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এটিকে ঔরঙ্গজীবের
দক্ষ-বল অসিংহ নীরব নিশ্চেষ্ট ছিলেন না,
যশোবন্তকে নানাপ্রকারে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া
ঔরঙ্গজীবকে দক্ষিণের আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিলেন।
কারণ চতুর্দশগ্রন্থ অসিংহ অনিচ্ছা যে নিজের বিশেষ
উপস্থিত হইলে যশোবন্ত দ্বারা প্রতিকূল সাহায্য গ্রহণ
করিবার অবসর পাইবেন না, এবং হস্ত বা স্বদেশান্তরে
আক্রমণ হইতে দ্বারা প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য সম্রাট
ঔরঙ্গজীবের সহিত সন্ধি করিতে তিনি বাধ্য হইতেন,
ধন জন সহায় সম্পদ বিহীন রাজার পুনরায় প্রাণ রক্ষার্থে
পলায়ন তির্যকপথে থাকিবে না; হইলও তাহাই।

যশোবন্ত বাহাদুর কর্তৃক দ্বারা আক্রমণের
সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া দ্বারা পক্ষিগণ প্রবেশ, কি
করিবেন স্থির করিতে পারিতেন না। অসিংহের
প্রয়োচনা, প্রয়োজন প্রদর্শন, চরিত্রই অসিংহ। অসিংহ
মতি রূপাধার অসিংহের দ্বারা ত্যাগ করাই কর্তব্য
বলিয়া স্থির করিলেন। রাঠোর-রাজা যশোবন্তের

অকস্মাৎ উদ্ভূত বল বীজ্যে ছন্দ পরিপূর্ণ ছিল, ইন্দ্রকোষে
সমুদ্র হুগে গ্রীষ্ম ভূমি করিয়া অগ্নিবর্ষা কাননের সুখে
বুক পাতিয়া দিতে বশোবন্তের সমকক্ষ কেহই বোধ
করি সে দিলে ছিল না। কিন্তু সর্বত্র পদ করিয়া
শরণাগত পশিন এবং বাক্যমান করিয়া সে বাক্য স্বকায়
অন্ত প্রাণপণ প্রভৃতি রাজবর্ষ ও কাকবর্ষ বশোবন্তের
হৃদয়ে স্থান পাইত বলিয়া মনে হয় না, নতুবা দ্বারাকে
আক্রমণ করিয়া, সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি দান
করিয়া অবশেষে তাঁহাকে সেই প্রাণসঙ্কট বিপদ সমুদ্রের
মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ নিজের আপদ নিবারণের জন্য
অগ্নিসিংহের নির্ঝঙ্কারশব্দে ঔরঙ্গজীবের সহিত সন্ধি
করিতে পারিতেন না। আশ্রিত ক্ষুদ্র পারাবতকে
রক্ষা করিবার জন্য কজির রাজা বীর বক্ষমাণে দান
করিয়াছিলেন, শরণাগত দত্তী রাজাকে রক্ষা করিতে
কক্ষপাশ্রিত একান্তভক্ত পাণ্ডবগণ সেই ঐক্যের
সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তত হইয়াছিলেন, এ সকল কথা
পুর্বে পাওয়া যায়। বশোবন্ত ও তারতের সেই কজির
বংশেই জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তথাপি কক্ষকুলোচিত
একান্ত কর্তব্য, আশ্রিত পরিপালন বর্ষে পরাশ্রুত হইলেন,
ইহা দ্বারাই অদৃষ্টের কল ব্যতীত আর কি বলিব ?

মনে হয় বশোবন্তের আক্রমণ গ্রহণ না করিয়া দ্বারা
বদি পূর্ব সক্ষম অহুগারে দাক্ষিণাত্যে গিয়া পোলকুণ্ডা
এবং বিজাপুরের গুলতানগণের সহিত সম্মিলিত হইতেন,
তাহা হইলে বোধ করি শাহজাহান-সম্মনগণের সৌন্দর্য-
সংক্রান্তের কণ ভিন্নরূপ হইত এবং তারতের ইতিহাস
রূপান্তর গ্রহণ করিত। বাহা হইবার নহে তাহা হইবে
না, সেই জন্যই দ্বারার বশোবন্তের আক্রমণ গ্রহণের হুম্মতি
উপস্থিত হইয়াছিল; অগ্নিসিংহের ভার চিরসংগ্রাম বিজয়ী
রাজনীতি-বিশারদ, কক্ষকুল চুড়ামণি, বীজ্যপ্রণয় রাজাধি-
রাজ, যুদ্ধ বাদশাহের বিধানের পাত্র হইয়া তাঁহার প্রিয়-
তম পুত্র, তারতের ভাবী সম্রাট, সুব্রাহ্ম দ্বারার পক্ষ
ভাগ করিয়া পোপনে ঔরঙ্গজীবের পক্ষাবলম্বন করিয়া-
ছিলেন; আর হুজুর বীর, রণহর্ষ বশোবন্ত বরষতের
কোষে ইষ্টকারিতার জন্য পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং

রাজবর্ষ কাকবর্ষ পরিভ্রাণ করিয়া কোট দুক্কানকে
অবশেষে অগ্নি সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,
বাগ্য চরম কল হইল সদাশপতা দ্বারার নৃপংস হত্যা।
একজনকে আশা আশাস দিয়া অবশেষে প্রয়োজনকালে
নিরাশ করিলে ভগবানের ভার-বিচারে একদিন সেই
কৃত কাণ্ডের কলতোপ করিতে হয়, ইহা মানব মাজেরই
হির বিধান। বশোবন্তকে তাঁহার কৃত কার্যের কল
তোপ করিতে হইয়াছিল। যে ঔরঙ্গজীবের ক্রোধোপ-
নয়ের জন্য দ্বারাকে অগ্নিসুখে আহুতি দান করিয়া-
ছিলেন, ঔরঙ্গজীবের সে ক্রোধ বশোবন্তের জীবনে
এবং জীবনাভেও প্রদর্শিত হয় নাই। আকস্মিকভাবে
প্রেরণ করিয়া ছলপূর্বক সৈন্য সাগাথ্য না দিয়া জয়-
কর্মা ঔরঙ্গজীব বশোবন্তের অকালমৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন
এবং বশোবন্তের দেহাবসান পরে তাঁহার শিতপুত্র
এবং পত্নীকে দিল্লীতে কারাবদ্ধ করিবার চেষ্টার ক্রটিও
তিনি করেন নাই। বশোবন্তের চিরবিধাবাদী রাজ-
পুত্র সেনাপন প্রাণপণ না করিলে দ্বারার রাজবংশের
চিহ্ন পর্বাত ঔরঙ্গজীব রাখিতেন কি না সন্দেহ।
চিরন্তন রাজভক্তির পুরস্কার মহারাজ অগ্নিসিংহও
ঔরঙ্গজীবের নিকট পাইয়াছিলেন। সিংহাসনের
বর্ষা উত্তরাধিকারী দ্বারাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজীবের
হস্তে সমর্পণ করিবার প্রদান উভোগী ছিলেন অগ্নিসিংহ।
বাক্যিক হইতে কেবল পর্বাত মোগল পতাকা চিরবিজয়ের
মধ্য দিয়া অগ্নিসিংহই বহন করিয়া গিয়া গিয়াছিলেন।
ছত্রপতি শিবাজির মৌর্য্য প্রতাপে দিল্লী রাজশালায়
সম্রাট আলমগীরের বধন যুদ্ধে যুদ্ধে তজ্রা টুকরা
বাইতে লাগিল, তখন কোকন শৈলশালায় হুম্মারোহ
গিরিচূর্ণদ্রিকারে মোগল পাতাকা অগ্নিসিংহই প্রোথিত
করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক বীর শিবাজি রাজা বধন হিন্দু
রাজ্য স্থাপনের জন্য বীর বক্ষরত বিন্দু বিন্দু করিয়া
পাত করিতেছিলেন, তখন ছলে কলে কোণে তাহার
ব্যাখ্যাত ঘটাইবার অহুতানে ব্যাপ্ত ছিলেন রাজা
অগ্নিসিংহ। ছত্রপতিকে কোণে দিল্লী আনিয়া বন্দী
করিবার প্রদান সফল ছিলেন রাজা অগ্নিসিংহ। অবশেষে

সম্মুখীন হইয়া বসন্ত বুদ্ধ সেনাপতি জয়সিংহের বুদ্ধি বশ, সে বুদ্ধিও উন্নতীভবেরই কৃত কার্য। ইতিহাস যদি সত্যরূপে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে রাজকুলে, ক্ষত্রিয়কুলে অন্য গ্রহণ করিয়া এক জীবনে জয়সিংহের ভায় বিধানবাতকতার পাগাচরণ আর কেহই করে নাই। বাহার জন্য এই সকল পাগাচরান সেই উন্নতীভবই জয়সিংহের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন।

সুভদ্রা দ্বারা আশঙ্কিত হইয়া সটেন্দ্রে আজমীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আজমীরের সম্মিলিত হইয়া দেখিলেন, যশোবন্ত বা তাঁহার রাজপুত বাহিনীর কোন চিহ্নই দেখানো নাই। ইহার কারণ কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মনোরূপ চিন্তায় দ্বারার মন আশঙ্কিত হইয়া উঠিল। কিন্তু যথার্থ কারণ জয়সিংহ— উন্নতীভবের হিত কামনার তিনি যশোবন্তকে নিরস্ত তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য অব্যাহতি উপদেশ দিতে এক দিনের জন্যও কাত হন নাই। অবশেষে উন্নতীভবের দ্বারা মাদোরার আক্রমণের ব্যবস্থা করা হইয়া বসন্ত তার প্রেরণ করিলেন তখনই দ্বারা যশোবন্ত কর্তৃক একান্ত পরিত্যক্ত হইলেন। বিপদাপন্ন দ্বারাকে আশ্রয় করিয়া আনজীরে আনাইবার যেতু যে তিনিই, এ কথা বলাবলি হইয়া গিয়া পরশাগত প্রতিপালনরূপ কাঞ্চনবর্ষের মন্তকে পদাঘাত করতঃ রাজকুমারের সাহা-যাধ্যায়ী তাঁহার বা তাঁহার রাজপুত সেনার কনিষ্ঠাগুলি পর্য্যন্ত হেলিল না। শালাহান বাহিনীকে আনন্দ হুলাল সুভদ্রা দ্বারা বসন্ত সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ শিখরে সমানী ছিলেন, তখন মাদোরার রাজ্যে তাঁহার পাদস্পর্শ হইবার সন্ধ্যা হইলে যশোবন্ত তাঁহাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করিতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রত্যক্ষদর্শনার্থ যশোবন্ত রাজ্যসীমার বাহিরে কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেন তাহা আজ অনুমান করা কঠিন। ভবিষ্যৎ সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দ্বারার “ডায়াবল” বক্তৃতা যশোবন্তের হৃদয়ে উত্তীর্ণ কি না জানি না। আজ সেই দ্বারা রাজ্যের সীমান্তে পূর্বাভিষেক যশোবন্তের

সাম্মুখীন হইয়া বসন্ত বুদ্ধ সেনাপতি জয়সিংহের বুদ্ধি বশ, সে বুদ্ধিও উন্নতীভবেরই কৃত কার্য। ইতিহাস যদি সত্যরূপে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে রাজকুলে, ক্ষত্রিয়কুলে অন্য গ্রহণ করিয়া এক জীবনে জয়সিংহের ভায় বিধানবাতকতার পাগাচরণ আর কেহই করে নাই। বাহার জন্য এই সকল পাগাচরান সেই উন্নতীভবই জয়সিংহের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন।

দ্বারা অভিমানের সে সময় নহে, অপমানকে অপমান জ্ঞান না করিয়া দ্বারা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিংহের সেকোকে যশোবন্তের নিকট পাঠাইলেন এবং সময়ের সঙ্গীর্ণতা জানাইয়া সটেন্দ্রে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে দ্বারার সম্মিলিত হইবার জন্য সন্মিলিত আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। যশোবন্ত কুমার সিংহকে রাজ্যে গমনে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া রাজপুতীতে মাত্র অভিধানে দ্বারা দিলেন এবং তাঁহার সৎকারার্থ পানভোজন নৃসিংহের যশোবন্তে আয়োজন হইল; কিন্তু সম্রাটের কোন বিধিব্যবস্থা হইল না, কেবল কালহরণ হইতে লাগিল। যদিও সিংহ চতুর্দশবর্ষীয় শিশু, এ সময় তাহার দ্বারার মেহশীতল অঙ্গে নির্ভর নিদ্রা বাইবার কথা, স্বাধীন ধর্মীর মরণশিষ্টাঙ্গের বুদ্ধিগ্রহ হত্যা প্রভৃতির তাড়ন বৃত্তের আবেশের মধ্যে পড়িবার তাহার সময় নহে, কিন্তু অদৃষ্টবশত এই শৈশবেই তাহাকে দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শৈশবেই কোষপুত্র তরবারি হস্তে বাহিনী পরিচালনতার গ্রহণকরতঃ বুদ্ধিগ্ধ পিতার পার্শ্বকর্তৃত্ব হইয়াছে, বুদ্ধে পরাভূত হইয়া পলায়নপন্ন পিতার সহচররূপে অনশন অনিদ্রা ও পথভ্রমের কত দুর্ভাবনা তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দুঃখে ক্লেশে বেদনার সাহসের বসন্ত বুদ্ধি করে, অর্থাৎ অল্প বয়সেই প্রবীণোচিত অভিজ্ঞতা লাভ হয়। সিংহের তাহাই হইয়াছিল এক সেই অভিজ্ঞতার বলে যশোবন্তের ব্যবহার দেখিয়া সিংহের বুদ্ধিতে বাকি থাকে নাই যে, রাজপুত মরণতি যশোবন্ত কেবল মিষ্টবাক্য ও ব্যবহারে কাল হরণ করিতেছেন, তাহার পিতা দ্বারাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। বালককে সেই সময়ের মনোভাব সম্বন্ধে জন্মের দ্বারা বুঝিবার সামর্থ্য, বগিয়া বুঝাইবার নহে।

বিদ্যাপুর ও গোলাপপুর দুর্গভাঙ্গনের সন্ধ্যায়

একশের চেঁচী না করিয়া তাহার পিতা যে অব্যবহিত-
চিত্ত বশোবস্তের আয়তন প্রণে করিয়া রাজপুতানার
দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মহাজন করিয়াছেন, ইহা
বালক সিপারের বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তখন
নিরুপায়, তাই সে মকল কথাই উল্লেখ মাত্র না করিয়া
গলসন্দেনের, বোড়করে, একান্ত বিনয়ের সহিত,
বশোবস্তকে বারবার বুদ্ধসম্ভার্য্য সম্বর হইবার জন্য
অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল,
ঔরঙ্গজেবের অধিবর্ষী কামানের লৌহপিণ্ডের কালমিক
ছবি বশোবস্তের মানসেন্নের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া
সিপারের সাক্ষিনেত্র আবৃত করিয়া ফেলিল, রাজপুত
সরগতি রাজবর্ষ বিস্মৃত হইয়া শরণপ্রার্থী অতিথিকে
বিস্ময় করিলেন।

এক দিন ছিল, যখন দারার তর্জমার এক ইজিতে
শত শত বশোবস্তের নাম পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষে
মুগ্ধ হইয়া বাইতে পারিত। একদিন ছিল, যখন দারার
প্রসাধকপিকা লাভের জন্য বশোবস্তের জায় বহু রাজপুত
সরগতি বোড়করে সিংহাসনের পাদদীপ্তিতে মত্ত
মত্তকে অপেক্ষা করাও সম্মানজনক বলিয়া জ্ঞান করিত।
আর আজ সেই দারার দুঃখাল ভীষণ দার হইতে
তরাস হইয়া প্রতিবিম্বিত হইতেছে, কালের এমনই
মহিমা। সিপার রাজপুতীতে অর্থক অপেক্ষা করা
আর সমস্ত মনে করিয়া না; যোর হুসমের পিতার
কেন্দ্রকার সাহায্য করিবার জন্য মেহলালিত সন্তানের
প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, রাজপুত বিদায় লইবার
সময়েও অক্ষমতার অতিশয়িত হইতে হইতে বশোবস্তের
নিকট শেখ-ভিক্ষা আদায়িলেন, সমস্তই নিফল হইল।

এদিকে সিপারের বিলম্ব দেখিয়া দারা কখনও অশা-
বিত কখনও বা হতাশ হইয়া ব্যাকুলনৈরাজ্যে পুঞ্জের পথের
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দিন কাটাইতে ছিলেন, এমন
সময়ে সিপার একাকী প্রত্যাবর্তন করিয়া হুঃসংবাদ
আনয়ন করিলেন।

বাহুব চেঁচাইয়াই করিতে পারে, সে চেঁচীর কল-
হাতী তরবার। দারার চেঁচীর কটী ছিল না, কিন্তু

বিস্ময় বিধাতা জৈনিত কলহানে ক্রোধ হইয়া তাহাকে
যে সঙ্কেটে ফেলিলেন তাহার চরম কল হইল দারার
পুঞ্জকলত্রের সহিত শোচনীয় অপমৃত্যু।

সিপারের নিকট হুঃসংবাদ পাইয়া দারা নিভাতই
তরমনোরথ হইলেন। দাক্ষিণাত্যের দুঃখজনকদের
নিকট সাহায্যপ্রার্থনা না করিয়া অব্যবহিতবুদ্ধি
বশোবস্তের আয়তন স্বীকারের নির্বুদ্ধিতা তিনি এখন
ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এখন আর
বিজয়পুর গোলকুণ্ডা বাইবার সময় নাই, করণ
ঔরঙ্গজেবপ্রেরিত বাহিনী দারার পশ্চাদ্ভাবন করিয়া
আগিতেছে; সমাগতপ্রায় মজ্জৈমন্তের সহিত বুদ্ধ
অনিবার্য্য, সমভিত্যাহারী বর সৈন্য লইয়াই তাহাকে
যুদ্ধার্থ প্রেরণ হইতে হইবে। বর সাংখ্যকের বৃহত্তর
বাহিনীর সহিত বুদ্ধ করিতে হইলে গিরিবরী, শৈলসাহ,
মহানালার অন্তরালে ব্যহরচনা না করিলে পরাজয়
স্থান্ধিত। সেই জন্য দারা এবং শাহনেওয়ার সেইরূপ
হানের অল্পমতানে চতুর্দিক চর প্রেরণ করিলেন।
চরণের নিকট সংবাদ পাইয়া আজমীরের সন্নিকট-
বর্তী শৈলখালার সন্নিকট একস্থানে খনিত :তুপুর্থে
তিনদিক বেটন করিয়া দারা তাহার সৈন্য সমাবেশ
করঃ মজ্জৈমন্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার
সৈন্তের পশ্চাদ্ভাগ উচ্চতলে সমাবৃত ছিল, স্তম্ভাঃ
অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বেত্রপ হানে
হ রচনা করা, সমরকুশল সেনাপতির উচিত। দারা
বর্তমানে সেইরূপ সৈন্যপত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন—
প্রতিপক্ষের অধারোহী বা পদাভিক সৈন্তের আক্রমণের
প্রতিরোধার্থ তিনদিকে তুপুর্থে খনন করা হইয়াছে
এবং—পশ্চাতে প্রহরীবরুণ সমুদয়শীর্ষ শৈলপ্রশী।
সামুগ্ধের বৃদ্ধে পরাতন দারার নির্বুদ্ধিতার কল,
বাহিনীর মধ্যভাগে তিনি না থাকিয়া তাহার বাম
পার্শ্বক্ষীর সাহায্যার্থ হানদ্রষ্ট হইয়াই তিনি সর্বমানের
আজ্ঞান করিয়া আনিরাছিলেন। কিন্তু আজমীরের
দিবসজয়্যাপী বৃদ্ধে দারা যে সৈন্যপত্যের পরিচয়
দিরাছিলেন, যে সাহস এবং বীর্য্যের সহিত সৈন্তাঙ্গনা

কামরাহিলেন তাহাতে বিবাহা বিবৃথ না হইলে ঔরঙ্গজীবের পরামর্শ সূক্ষ্মিত ছিল। খাজোয়ার যুদ্ধে ঔরঙ্গজীবের নিকট জ্ঞান যে পরাজিত হইরাছিলেন তাহাও ঔরঙ্গজীবের বীক্টে বা রণকৌশলে নহে, তাঁহার বিখ্যাতত্ব এবং কাপট্যের বলে। স্বয়ং বিজ্ঞতা মনুষ্যত্বকে বসাইরা তারতের রাজদণ্ড বাহার হাতে তুলিয়া দিবেন তাহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করি নবুত্বশক্তিতে সম্ভব হয় না।

সে দিনের যুদ্ধের রীতি বর্তমান রণনীতি অপেক্ষা ভিন্নপ্রকারের ছিল। উত্তর পক্ষের সৈন্য দৃষ্টিমান্য নক্সে আসিলেই দুই পক্ষের কামান গর্জন করিয়া উঠিত এবং প্রতিবারে বারুদ গোলা প্রভৃতি সামগ্রী বারিমে দিয়া আওরাজ করিতে বহনময় লাগিত। আঁক কামান বন্দুক সর্বপ্রকার আগেরাজের বহু উন্নতি লাভিত হইয়াছে এবং বিবাহা বাপ প্রভৃতি দ্বারা নরহত্যার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়া যুদ্ধের ভীষণ ব্যাপারকেও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সেকালের যুদ্ধে বলবীৰ্য্য, সাহস, সৈন্যপত্য দেখাইবার অকাল ছিল। দারার প্রবে সাবুগড়ে জয়লাভ হইয়াছিল এবং কাপট্যের বলে খাজোয়ার যুদ্ধ পরাজিত হইরাছিলেন বটে, কিন্তু ঔরঙ্গজীবের তার রণকৌশল সেনাপতির বুদ্ধিতে বাকি ছিলনা যে, বিশেষভাবে রণনন্দা না করিলে, রণরক্ষ সেনাপতিগণকে বিজ পক্ষে না আনিতে পারিলে বারবার জয়লাভ করি সম্ভব নহে। সেইজন্য দারার সহিত এই আগমীরের যুদ্ধে ঔরঙ্গজীব বিশাল সেনোচ্চোগ করিয়া ছিড়েন; পক্ষের শত্রুঘাতে বীহাদের সর্বশরীর অশনিতুল্য ক্ষতিন হইরাছিল অল্প শত সমরবিজয়ী সেনাপতি জয়সিদ্ধ, দিগির ধী, শায়েস্তা খাঁ, সেখ বীর প্রভৃতিকে ঔরঙ্গজীব সঙ্গে লইয়া দারার ক্ষুদ্র বাহিনীর সমুখীন হইরাছিলেন।

সামরীরের নিকটবর্তী হইয়া ঔরঙ্গজীব তাহার "দারার" সৈন্যের দারক পদবিশ্ব বীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, দারার ক্ষুদ্র সৈনিকগণের মধ্যে তাঁহার

সৈন্য সমাবেশ করিয়া উত্তরপার্শ্ব এক সমুখ "নিবাহা" দ্বারা বেটন করতঃ বৃহিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সমতিব্যাহারী সেনাপ গণ সতয়ে দেখিলেন যে বীহার পার না হইলে সেই "নিবাহা" উত্তীর্ণ হইয়া দারার কেশাগ্র স্পর্শ করা নামবের সাধ্যানন্ত নহে। দারার কামানশ্রেণী শৈলসামুদ্রেশে সারি সারি সজ্জিত হইয়া মুখবাহান করিয়া "হিরাতে, অবারোহী পদাতিক যে কেহ হুঃসাংসে ভয় করিয়া তাহার বৃহিত সৈন্য আক্রমণ করিতে বাইবে, দারার কামানসিঙ্হেত উত্তপ্ত জৌঃগিও তাহাকে অচিরে বমপুত্রীয় প্রপত্ত তোরণ পার করিয়া সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের অতীত লোকে পছঁ হইয়া দিবে। সসেনাপতি ঔরঙ্গজীব প্রমাদ গমিলেন; এবং দুই হইতে গোলাবর্ষণের চিরাচরিত প্রথার কোন কল হইবেনা কেবল বারুদ গোলায় অপব্যয় হইবে বুদ্ধিরা, আক্রমণের অস্ত পছঁ বাহির করিবার অস্ত সেনাপতিগণকে একত্র করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

যে স্থান হইতে কামানের গোলাবর্ষণ করিলে অপেক্ষাকৃত সুবিধা হইতে পারে, সেইরূপ স্থানে শুদ্ধ তার কামান লইয়া বাইতে এবং বধাহানে সরিবেশিত করিয়া লক্ষ্য স্থির করতঃ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিতে ঔরঙ্গজীবের সেনাপতিগণের সমস্ত দিবস অভিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে তাহার গোলাবর্ষণ করিতে আঁন্ত করিল। কিন্তু রাজির অন্ধকারে ভাল করিয়া লক্ষ্য স্থির হয় না, কেবল গোলা বারুদের অপব্যয় হইল, দারার বৃহিত সৈন্যের কোন অপকাই করা গেল না। প্রত্যাতে উত্তর পক্ষ হইতে পুনরায় গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে দারার বাহিনীর অসদ-সাহসী অবারোহী বীরগণ তাহাদের নিজগণ "নিবাহা" পশ্চাৎ হইতে বাহির হইয়া ঔরঙ্গজীবের সৈন্যশ্রেণীর উপরে বজ্রের তার ভাঙ্গিয়া গড়িতে লাগিল এবং তাহাদের বর্শা এবং ভয়বারির আঘাতে এবং অধের গতিবেগে ঔরঙ্গজীবের বহু গোলাবর্ষণ এবং বরফবাধ সৈন্য অহত ও বিনষ্ট করিয়া তাহাদের নিরাপদ যুদ্ধের মধ্যে পুনরায় কিরিয়া বাইতে লাগিল। এরূপ যুদ্ধে

দারার পক্ষের সেনার অগভর অতি সামান্যই হইতে লাগিল, ক্ষতি অধিক হইতেছিল ঔরঙ্গজীবের। ধনবত, সামুগড় ও খাজোয়ার বিজয়ী বীর ঔরঙ্গজীব মনে করিয়াছিলেন দারার সৃষ্টির কৈশিক তাঁহার বিপুল বাহিনীর সম্মুখে ঝটিকাগ্রে তুণের ন্যায় বৃহৎ উড়িয়া যাইবে, এবং দিল্লীর, অরসিংহ, শাহজাদা খাঁ, সেখ মীর প্রভৃতি বহু সমরবিজয়ী চুর্চুর সেনাপতিগণের সৈন্যপতনের গুণে দারাকে পরাভূত করা শিশুর ক্রীড়া অপেক্ষাও সহজ, কেননা দারা অসংখ্য সেনাপতিরূপে সৈন্যপরিচালনার পরিচয় সামুগড়ের সমর ক্ষেত্রে দেন নাই। কেবলমাত্র বুদ্ধ শাহনেওয়ারাধা জরাজীর্ণিত দেখে একাকী এতগুলি রণকুশল সেনাপতির সম্মুখে কতকগুলি দাঁড়াইতে পারিবে? কিন্তু তাঁহার সে প্রশ্ন অচিরে বিদূষিত হইয়াছিল। দারার বর্তমান রণক্ষেত্রে নির্বাচন, সৈন্য সমাবেশ, বৃহৎসংখ্যক এবং বুদ্ধবলে সৈন্যগণকে উৎসাহ দান ও সূচনামূলক সৈন্যের পার্শ্ব ও পশ্চাৎ রক্ষার ব্যবস্থা দেখিলে কে মনে করিবে দারা বুদ্ধকৌশলে ও সৈন্যপত্য গুণে তৎকালের কোন সেনাপতি অপেক্ষা হীন? বস্তুতঃ দিবসব্যয় অশ্রান্ত চেষ্টা ও বহু সৈন্য ধ্বংস করিয়াও ঔরঙ্গজীবের পক্ষের রণকুশল সেনাপতিগণ কিছুই করিতে পারিলেন না যেহেতু দ্বিতীয় রক্তনীতে ঔরঙ্গজীব সমরলভা আহ্বান করিয়া সৈন্যসংগঠনকে বৎগলোনাতি তৎসনা করিতে লাগিলেন এবং মনুর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত ও রাজবশত হতশক্তি হইবার ভয়ে হুনিরাবাক বাদশাহ আলমগীর কর্ণধারী সঙ্কট হইয়া উঠিলেন। ঔরঙ্গজীবের সেনাপতিগণের কোন সন্দেহ ছিল না, তাহারা আশংকা করিয়াই বুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু সৃষ্টির সৈন্য লইয়া বাগকে বৃহৎ বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইবে, আশা বাহার নাই, তাহাকে হত্যাশাসনের সহস্রকে আশ্রয় করিয়াই রণক্ষেত্রে অসহ্য হইতে হয়—দারার আজ তাহাই হইয়াছে। বুদ্ধ শাহনেওয়ারা এবং বালক সিংহর মজি তাঁহার সহায়, মুহুরা, হাজার আশংকা এবং ঔরঙ্গজীবের বেতন ভোগী সেনাপতিগণের আশংকা, এতদ্ব্যতীত মধ্য অনেক

প্রভেদ। তাই দারা আজ চুর্চুর, তাঁহার সৈন্য চালনার মধ্যে আজ কোন ছিন্ন নাই, তাঁহার সাহসের আজ অভয় নাই, তাঁহার বীর বিক্রমের আজ অংশ নাই। এক দারা আজ শত দারা হইয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে—ইহা ঐতিহাসিকের কল্পনা নহে, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা একান্ত সত্য কথা, কারণ যে দারার বিপুল বাহিনী সামুগড়ের ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রেরণ বেলা অতীত হইবার পূর্বেই বিধ্বস্ত হইয়াছিল, আজ সেই দারার ক্ষুদ্রতর বাহিনী অল্পত বীৰ্য্যে তিন নিবল ধরিয়া বুদ্ধ করিতেছে, ঔরঙ্গজীবের রণকৌশল সেনাপতিগণ এবং বৃহৎসংখ্যক বাহিনী কিছুই করিতে পারিতেছে না, ইহা কেবল মাত্র নিরাপদ স্থানে সৈন্য সমাবেশের ক্ষমতা হইতে পারে না; ইহা বলবীৰ্য্য সৈন্যপত্য, কল্পিত বিবেচনা, আশংকা প্রচেষ্টা প্রভৃতির সমষ্টি মাত্র।

পরাজয় এবং পলায়নের অপমান ও হৃত্তর লবণ দক অভিক্রম করিবার হুঃসহ ক্রেশ, অর্থনাশ ও সেনাকর প্রভৃতি বতকিছু হুঃখ ছিল, দারা সে সমুদয়ই তৌপ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া এবং কেবল মাত্র শাহনেওয়ারা খাঁর জরাজীর্ণ বাহুর উপরে নির্ভর করিয়া পুনরায় পরাজিত হইবার সম্ভাবনাই সম্বন্ধে এই কথা চিন্তা করিয়া, বুদ্ধশেষে যদি একান্তই পলায়ন করিতে হয় সে ব্যবস্থাও দারা পূর্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজকুমার দারার প্রেরণা নবীন পক্ষের নন্দিনী নাদিরাবাহু এবং পরিবারস্থ অপরায়ণ নারী বৃন্দকে ক্রতগামী উষ্ট্র এবং হস্তী পৃষ্ঠে বসাইয়া বাজার লজ প্রস্তুত করিয়া “আনা সাগর” তীরে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন এবং ঘন রক্ত রাসা কিছু ছিল তৎসমুদয় ও উষ্ট্র এবং অশ্বতর পৃষ্ঠে রাখিত। ক্রতঃ বিধানে অগ্রসর এবং খোলাগণের প্রেরণা রাখিয়া এবং বুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন। উপস্থিত ছিল যে, সমর ক্ষেত্রে হইতে সংবাদ পাঠায়ে তাঁহার দারা এবং সিংহের লজ অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন, পথে কোনও সময়ে ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

কৈশিক

ঐতিহাসিকনাথ দার।

হুটু সেয়ে উঠবে। নীরদরা সবাই পশ্চিমে বেড়াতে গেছে, খালি বাকী গড়ে রয়েছে, থাকবারও অনুবিধা হবে না।”

কুসুমপুরে আমার আমিরা বাগ্যবদ্ধ নীরদ বাবুর বাকী। নীরদ বাবু বহুদিন বহু চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া বাইতে সন্মত হন নাই। কারণ, আমি সহরের মেয়ে, আমার স্তনের শৈশব, হাসিতারা কৈশোর, স্বপ্নময় যৌবনের প্রারম্ভ সহরেই অতিবাহিত হইয়াছে, আমার অপরিচিত, অজ্ঞাত পন্নীর যে চিন্তাটি কল্পনার বলে আমি ছবর কলকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলাম—সেটা মোটেই আশাশ্রয় নহে। কাবেই আমিরা প্রত্যর্থে সহজে সন্মত হইতে পারিলাম না।

তিনি আমার মনোভাব বুঝিয়া সহান্তে কহিলেন, “কুসুমপুর বেতে চাক্তি শুনে তোমার মুখ যে শুকিয়ে গেল; সেটা নিতান্ত বনবাস নয় বীণা; সেখানে তোমার মত, আমার মত, হুটুর মতও ঢের লোক আছে।”

বলিলাম, “আছে বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। তারা চাষা, তাঁদের আবার মুখ ছাধ, তাঁদের আবার ভাল মন্দ। চাষীদের আমি টেবী কুকুরের চেয়েও অধম মনে করি। চাষীদের ভিতর আমার বেতে ইচ্ছে করে না।”

স্বামী বলিলেন, “মানুষকে এত ঘৃণা করা ভাল নয় বীণা, চাষীদের মধ্যেও কত উদার মহৎ প্রাণ আছে,—বা শিক্ষিত সমাজে, সত্য সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তুমি আর আগন্তি করো না। পাড়াগাঁয়ে কুবকদের মধ্যে তোমাকে একটবার নিয়ে যেতে আমার বড় সাধ হয়েছে। তুমি রাজী হলে আমার সাধও পূর্ণ হবে, হুটুও সেয়ে আসবে।”

হুটু সারিয়া আসিলে, স্নান সবল হইবে একথা জাবিতেই আমার অন্ততল পুলক-প্রাবনে প্রাবিত হইল। মনের মধ্য হইতে অদ্বানী স্থানের জীতি; প্রানের বিভীষিকা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আমি বীরে বীরে বলিলাম, “হুটু ভাল হবে বুঝলে কুসুম-পুরে যেতে আমার আগন্তি নেই; কিন্তু সাবধান হয়ে, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যেতে হবে। ছেলে সারিতে গিয়ে সাপ, বাঘের মুখে তোমাদের তুলে না দিতে হয়।”

তাঁহার চোখ হুটু সকৌতুক হাসিতে উজ্জল হইয়া উঠিল। তিনি হস্ত-তরল কর্তে কহিলেন, “তুমি বীরভাঙ্গা, বীরেন্দ্রাণী বীণা, এখন আবার বীর জননীও হয়েচ; কাবেই প্রতিপদক্ষেপে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে বৈ কি। তাই বলে কুসুমপুরে তোমার সময় সাজে যেতে হবে না। সেটা স্তম্ভর বনও নয়, সাঁওতাল পরগণাও নয়, সাদা কথার ছোট্ট একটি পাড়াগাঁ; যি ভগ্নার মাদের মত মানুষ সেখানকার অধিবাসী।”

ভজার মা হুটুকে কোলে করিয়া এই দিকেই আসিতেছিল, তাঁহার নান উল্লেখ সে সাগ্রহে বিভ্রাঙ্গা করিল, “আমাকে ডেকেছিলেন কি বাবু?”

স্বামী কহিলেন, “তুমি কুসুমপুর দেখেচ ভজার মা? সে জায়গাটা কেমন? পন্নীর ধারের কুসুম-পুরের কথা কিন্তু আমি বলচি।”

ভজার মা প্রহুস হইয়া, হাত নাড়িয়া মুখ দুগাইয়া বলিল, “কুসুমপুর আবার দেখিনি? খুব দেখেছি বাবু। সেখানে আমার বোনঝিরা বস করেচে। বড় ভাল গাঁ, ঠিক যেন ইন্দিরের অমরাপুরী; কিবে কলের বাগিচা, কিবে ধানের ক্ষেত; পন্নীর জল যেন ধই ধই করচে, ঢেউ গুলিই বা কি তারিগের—চারদণ্ড থাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।”

আমি উৎসুক হইয়া কহিলাম, “কেবল ভাল ভালই তো করছো ভজার মা! সেখানে কত বড় লম্বা সাপ আছে, কত বড় বাঘ আছে তা তো বলছ না?”

ভজার মা বিস্ময় বিফারিত নেত্রে জ্বক্জ্বক করিয়া বড়ার দিয়া উঠিল, “এমন আতঙ্কি মিছে কথা তোমার কে বলেচে মা? স্বয়ং মা পন্নী বেখানে, সেখানে নাকি সাপ বাঘ আসিতে পারে! আতঙ্ক

না, এতক না, এক চেঁটেই বাহাধনদের পটল তুলতে হবে।”

ভজার মারের পটল ভোলায় ভরীতে ছুঁ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাঁহারও অপরোক্ষে মুহূর্ত্ত রেখা খেলিয়া গেল; আমিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

স্বামীর একান্ত ইচ্ছায়, ভজার মার সরস বর্ণনায় আমি কুহুমপুর বাইতে বসিত হইলাম। কয়েক দিন পর বৌচকা বাধিয়া, বাস সাঝাইয়া আমরা কুহুমপুর রওনা হইলাম। ঐ ভজার মা ও চাকর বহু আমাদের সঙ্গী হইল।

২

দূর হইতে যে স্থান মানব বর্জিত বস্ত্র জন্তর আবাস-স্থল ভাবিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিল, কাছে আসিয়া কুহুম-পুরের নরনাতিরাম দৃষ্টে স্নিগ্ধ-ভ্রামল শোভা সম্পদে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। গ্রামের অধিকাংশই কৃষক, চারিদিকেই খড়ের কুটার, ধানের সরাই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নীরম বাবুর গৃহ পদ্মা হইতে বেশী দূর নহে। বাড়ীর দক্ষিণে বিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তরের শেষে অগণিত বৃক্ষ-শ্রেণী তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কৃষক পত্নী, বামে দিগন্ত প্রসারিত শস্তক্ষেত্র, কোনখানে স্বর্ণবর্ণে অলঙ্কৃত, কোন খানি বা স্ত্রাম শোভায় শোভমান। সমুখে তৃণশূভ্র বালির চর, তাহারই শেষ প্রান্তে দৃঢ় ধবলিত কাশের বন ঘোত করিয়া সীমাহারা আপনহারা তরুণময়ী পদ্মা প্রবাহিত।

পদ্মার তীর নীরের অপূর্ণ লহরী লীলা দর্শন করিয়া, কৃষকদের মেঠো জ্বরের উচ্ছ্বাসিত গান শুনিয়া অনির্বচ-নীর আনন্দের মধ্য দিয়া আমাদের কয়েকটা দিন অতি-বাহিত হইল। কিন্তু সে আনন্দ অধিক কাল স্থায়ী হইল না। সেদিন যেচ্ছিন্ন সন্ধ্যায় ছুঁর অন্ন অন্ন প্রবলতাব ধারণ করিল। স্বামী বাস্তব সমস্ত হইয়া ডাক্তারের অস্থ-সন্ধান করিয়া জানিলেন, এটা চিকিৎসকপুত্র গ্রাম,

গ্রামের ছই ক্রোশ দূরে মহকুমার তিন্ন ডাক্তার নাই; ঔষধ নাই। মহকুমার ডাক্তারও রাজ্যে গ্রামান্তরে বান না। সমস্ত শুনিয়া স্বামীর হাতোজল মুখ চিত্তার ছারায় স্নান হইয়া গেল। হুঃখে কোঁতে আমি অশ্রুজল স্রবণ করিতে পারিলাম না, অকস্মাৎ আমার ছুটা চক্ষে বরষার ধারা ছুটিল।

তিনি সম্মুখে আমার অশ্রুজল মুখ মুছাইয়া দিয়া সাধনার স্বরে কহিলেন, “ভর নেই বীণা; কাল সকালেই আমি মহকুমা থেকে ডাক্তার আনাব। যেখানে টপায় নেই সেখানে ব্যাকুল হয়ে লাভ কি? এখানেও লোকের ছেলেরিগে আছে, তাদের কথা মনে করে শান্ত হও।”

তাঁহার সাধনার আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত শান্ত হইল না। আমার সহিত চাবার তুলনার আমি দৃক হইয়া বলি-লাম, “চাবার সঙ্গে তুলনাকের তুলনা হ’তে পারে না; তাদের আবার সুখ, দুঃখ, উৎসব, উৎকর্ষ। আমি শুধু এখানে আসিতে চাইনি, তোমার বুদ্ধির দোষে আজ আমার এত বিড়ম্বনা, এত কষ্ট।

তিনি কি বেন বলিবার জন্ত মুখ তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠের তাবা পরিষ্কৃত হইল না। ছুঁর অন্নের প্রাবল্যে চীৎকার করিয়া উঠিল—“জগাই দাদা, আমার ধরে নিলে বাও, আমি চান করব, তোমার সঙ্গে ভলে নেবে চান করব।”

আমি ছুঁর অন্নতল মেহটি বকে জড়াইয়া ডাকি-লাম, “ছুঁ কি বলছে বলি, জগাইদাদা কে?” ছুঁ আমার কথার প্রত্যুত্তর করিল না। অক্ষুঁট কণ্ঠে কয়েকবার জগাই দাদা জগাই দাদা বলিয়া পাশ ফিরিয়া শরন করিল।

ভজার মা বাহান্নার বসিয়া বাতি সাঝাইতেছিল, ছুঁর চিৎকারে সচকিত হইয়া শয্যাপ্রান্তে ছুটয়া আসিল। কিয়ৎকাল ছুঁর পানে চাহিয়া আন্তে আন্তে বলিল, “আপনি ভর পেয়েনা মা; খোকাবাবু ভাল হবেন; রাতের তিতর মা রক্ষাকালী অন্ন ছাড়িয়ে দেবেন। ডাক্তার কি করবে? যে অব্য ওর শরীলে”—বলিতে বলিতে

হঠাৎ খামিরা গিয়া বোঁড়করে গলবস্ত্রে ভজার মা রক্ষা কালীর উদ্দেশে পাটীতে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

আমরা এ কালের শিক্ষাপ্রাপ্তা; শশানকালী রক্ষাকালী, বুধদের কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞা উপহাস করিতেই শিখিয়াছি; তাই ভজার মায়ের তক্তি-উচ্চুসে আমার অগ্রসর চিত্ত আদৌ প্রসন্ন হইল না; আমি বিরক্ত হইয়া তিক্তকণ্ঠে কহিলাম “এখানে গোলমাল করো না ভজার মা; এটা আমার গোলমালের সময় নয়; আমি কালী টালি কিছু মানি না; আমার ছেলের অন্ত্রে তোমাকে কাউকে ডাকতে হবে না।”

ভজার মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে চলিয়া গেল।

স্বামী হুটুর মাখার পাখার বাতাস দিতে দিতে কহিলেন, “ভজার মা বড় হুংরিষিত হয়ে গেল বীণা, খিসারি বিশ্বাসে, ভক্তের তক্তিতে সন্দেহ করতে নেই। ভজার মা হুটুকে তোমার চেয়ে আমার চেয়ে কম ভাল বাসে না।”

আমি রুদ্ধস্বরে কহিলাম, “ছোটলোকের আবার ভালবাসা, তাদের স্নেহ মনভা! তারা টাকা ভালবাসে, অর্থের প্রত্যাশার ভালবাসা দেখাতে আসে। আমি ওদের স্নেহ কখনো বিশ্বাস করি না, করবও না।”

তিনি কথা কহিলেন না, নিরুদ্ধস্বরে ব্যথিত দৃষ্টি আমার সুখের উপর ফেলিয়া দিলেন।

৩

ভজার মায়ের রক্ষাকালীর রূপাতেই হটুক অথবা অস্ত্র কার্যেই হটুক, পরদিন প্রভাতেই হুটুর অর ছাড়িয়া গেল। হুটু কঠিনস্বখে হাসির লহর ফুলিয়া ভজার মার কোলে চড়িয়া বেড়াইতে বাইবার বারনা ধরিল। এখানে আসিয়া হুটু আমার স্নেহাঞ্চল হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া বনে প্রান্তরে বেড়াইতেই ভালবাসিত। হুটুর এ পরিবর্তনে আমি খুশী না হইয়া একটু হুংরিষিত হইয়া-

ছিলাম। মায়ের স্মৃতিষ্টি হুনিরাপন স্নেহের কোণ ভিন্ন ছেলের আকর্ষণের আবার কি থাকিতে পারে?

আমি হুটুকে বকে চাপিয়া কহিলাম, “এখন বেড়াতে যার না মনি, তোমার বে বড় অসুখ করেছে। অসুখ ভাল হলে ভজার মার সঙ্গে বেড়াতে যেরো।”

কুসুম-পেলব বাহু হুটুতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের স্বরে হুটু কহিল, “অসুখ আমার ভাল হয়েছে মা, আমি এখুনি জগাই দাদার কাছে যাব।”

আমি চমকিয়া উঠিলাম, এ ত হুটুর জ্বরের প্রলাপ নহে, স্বপ্নের জড়িমা নহে, জগাট দাদা কে? কোন্ অপরিচিত অনাখীর আমার চক্ষের অন্তরাল হইতে এমন করিয়া শিশু ছন্দটি অর করিয়া লইয়াছে?

আমি ভজার মাকে ডাকিয়া এরূপ ভেদ করিতে চেষ্টা করিলাম, কারণ এখানে আসিয়া হুটু ভজার মার অত্যন্ত মগ্নরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সহজে বহুর নিকটে বেসিতে চাহিত না। তাহার প্রসাধন, ভ্রমণ, স্নান, ভজার মা না হইলে সুসম্পন্ন হইত না।

আমার প্রস্নে ভজার মা স্নানসুখে সংক্ষেপে জানাইল, গ্রামের একটা আধ পাগলা লোককে বালচপলতা বশতঃ খোঁকাবাবু জগাই দাদা বলে। শিশুচরিত্র বালকের খেলাল, তাহার মূল্য নাই। স্বামী ভজার মার কথাটা সমর্থন করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, হুটুর আবোল-তাবোলে মাহুব আবার কাণ দেয়। ও বেড়াতে যেতে চাচে—মোট কাপড় দিয়ে বেশ করে গা ঢেকে, ভজার মার কাছে দাও একটু বেড়িয়ে নিয়ে আশুক। আজ আর ডাক্তার ডেকে দরকার নেই, আমার মনে হচ্ছে এখন এমনই হুটু ভাল করে যাবে।”

আমি স্বামীর আদেশ অবহেলা করিতে পারিলাম না। হুটু ভজার মার সহিত বেড়াইতে গেল; কিন্তু আমার মনের মেঘ কাটিল না। বে জগাই আমার হুটুর ছন্দ-আগন অধিকার করিয়া লইয়াছে—তাহার সংবাদ জানিবার অন্ত আমি উৎসুক হইয়া রহিলাম।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, স্বামীর অসুস্থতান

নিখা হইল না। সেই দিনের প্রবল অরের পর ছুটু ক্রমেই সূর্য হইতে লাগিল। তাহার চোখের কোল ছুটি ভরিয়া উঠিল, যেত অথর্বোষ্ঠ রক্তিমাতা ধারণ করিল। তাহার পরিবর্তনে আমার কুহুমপুরের প্রতি বিহ্বলতা বিমুগ্ধতা কোন্ বাহুযন্ত্রে বেন অন্তর্হিত হইল। প্রভাতবাহুবাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মত, আনন্দে আমার হৃদয়টুকু ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেদিন ভজার না গম্মার জল আনিতে গিয়াছিল, আমি ছুটুকে ঘান করাইবার জন্য তাহার গানের জামাটি খুলিয়া সবিনয়ে দেখিলাম—ছুটুর দক্ষিণ বাহুতে য়াভা হুতার সহিত একটি তাহার মাহুলী বাঁধা রহিয়াছে। বাহা কখনও বিশ্বাস করি না, যে জন্ম সত্য-সমাজে অতি হের, হাতকর—আমার পুত্র আমারই অজ্ঞাতে সে জিনিষ শরীরে ধারণ করিয়াছে। লজ্জার স্থণার আমার গর্কোজ্জল হৃদয় খুলি-শব্দ্যার লুটাইয়া পড়িল, আমি ক্রোধভরে একটানে হুতা খুলিয়া মাহুলীটা প্রাণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

ছুটু হই হাতে মুখ ঢাকিয়া কঁদিয়া উঠিল, “আমার লাল গরনা ফেলে দিলে কেন না? জগাই দাদা আমার লাল গরনা পরিবে দিবে।”

বলিলাম, “জগাই দাদা কে ছুটু? সে কোথায় থাকে?”

ক্রন্দন ভঞ্চিত কণ্ঠে ছুটু কহিল, “জগাই দাদা জলের ধারে থাকে না, আমাকে আদর করে গরনা পরিবে দেয়, জগাই দাদার গরনা আমার হাতে বেঁধে দাও।” বলিতে বলিতে ছুটু ছুটিয়া গিয়া প্রাণে রইতে মাহুলীটি কুড়াইয়া আনি।

আমি বিহ্বলের মত কণকাল চিন্তা করিয়া বহুকে ডাকিয়া মাহুলীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বহু বলিল, সে কিছুই জানে না, খোকাবাব সর্বদা ভজার দার কাছেই থাকে, তাহার সহিতই বেড়াইতে যায়। একদিন ছুর হইতে একটা তিথারী গোছের বুড়ার কোলে সে খোকা বাবুকে দেখিয়াছিল।

আমি কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। সে

বুড় কে? সেই কি ছুটুর জগাই দাদা? ছুটুর সহিত তাহার এত বন্ধুত্বের কারণই বা কি? ছুটু যদি তাহার মেহের পাজই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে মেহ ভালবাসা সন্মোহন রাখিবার এত প্রয়াস কেন? তাবিতে তাবিতে অকস্মাৎ একটি কথা হুপ্পট দিবা-লোকের মত আমার স্মৃতির দর্পণে ছুটিয়া উঠিল।

এখানে আসিবার পর দিন একটি কুবকপন্থীর নিকট তনিরাছিলাম, অনেক কাল পূর্বে এদেশে একবার ছেলেধরার প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। গম্মার বাঁকে নৌকা রাখিয়া ছোট ছোট ছেলে ঘেরের সন্ধানে তরুরূপ চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। অতিরঞ্জিত জনপ্রতি তাহারা সেদিন কুবকপন্থীর কথার কর্ণপাত করি নাই, কিন্তু আজ তাহার সেই সুখরোচক বাক্যবিজ্ঞান নিখা বলিয়া অবহেলা করিবার ক্ষমতা আমার রহিল না। আমি বেন বিনা সংশয়ে ভজার দার হাতে ছুটুকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু অশিক্ষিতা নিরক্ষরা ভজার না অর্থের প্রলোভনে ছুটুর যে অপকার করিতে পারে তাহা একবারও স্মরণ হয় নাই। ভজার না বোধ হয় ছেলেধরাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া ছুটুকে বশীভূত করিয়া লইতেছে, তাই এত গোপনতা, এত লুকোচুরি।

ছুটুর হালিভরা মুখগানে চাহিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। মাথার মধ্যে কিম্ব কিম্ব করিতে লাগিল, আমি স্পন্দিত বক্ষে ছুটুকে কোলে লইয়া শব্দ্যার আশ্রয় লইলাম।

৪

প্রতিদিনের মত বথানিয়মে রৌজতপ্ত ধরণীর বক্ষে অপরাহ্নের নিম্ন দ্বারা বনাইয়া আসিল। লক্ষ ফুলের পরিমল বহিয়া মন সমীরণ আগ্রহ সন্ধ্যার ব্যস্ততা বিশ্বের দ্বারে জানাইতে লাগিল।

ছুটু তাহার জামা জুতা হাতে লইয়া ডাকিল, “তুঝা, আমার জামা পরিবে জুতো পরিবে আমার জগাই দাদার কাছে নিবে চলে। শীগ্গির করে নিবে চলে।”

ভজার মা তাড়াতাড়ি আরত্বেকার্য শেষ করিয়া ছুটর কাছে আসিতেই আমি বলিলাম, “ছুটু আজ বেড়াতে বাবে না; অলো হাওয়ার ওর সর্দির মত হয়েছে। তুমি বাও কাব কর গে।”

ভজার মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, “খোকাবাবু কি ঘরে থাকবে মা? ও বে কৈদে কৈদে অনর্থ করবে, পদ্মার ধারে না গিরে মাঠের দিক থেকে বেড়িয়ে আনলে হয় না?”

একবার সাধ হইল ভজার মাকে ছুটর জগাই দাদার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এ সমস্তার সমাধান করি, কিন্তু সাহস হইল না। আমি সব জানিতে পারিয়াছি জানিলে হয়ত উহাদের তর ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখন বাহা কোশলে আরত্বে করিতে বস্ত্রবান হইয়াছে, তর ভাঙ্গিলে তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। এই আত্মীয়শূভ, বান্ধবশূভ স্থানে আততায়ীর হস্ত হইতে কে আমাদের রক্ষা করিবে? কাহার মাথা ব্যথা! আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, “একটু কাদে কাদবে, আমি তুলিয়ে রাখব ভজার মা, তোমার ইচ্ছে হয় তুমি বেড়াতে বাও গে।”

ভজার মা বিশ্বর বিস্ময়িত নেত্রে আমার পানে চাহিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ছুটু হাতের জুতা ফেলিয়া দিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল—“আমি তোমার কাছে থাকব না মা, ভজু মার কোলে চড়ে জগাই দাদার কাছে বাব।” আমি আদর করিয়া, চুমো খাইয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে শান্ত হইল না, আমার স্নেহ বেঠনের মধ্যে ধরা দিল না।

ছুটর চিংকারে স্বামী আমার নিকটে আসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছুটু কাদে কেন? ওকে বেড়াতে পাঠিয়ে দাও না। পদ্মার বাতাসে ওর কিছু অস্থখ করবে না, এখানকার বাতাসই ওরুধের কাণ্ড করে।”

তাহাকে নিকটে গাইয়া আমার অবাক্ত বেদনা, অন্তরের উদ্বেগ সহসা উচ্ছ্বসিত হইল। তবু আজ আমি

হৃদয়ের দার তাঁহার কাছে খুলিতে পারিলাম না। আমার বিলম্বপূর্ণপে জানা ছিল, তিনি আমার স্নেহ আমার অসুস্থমান একটুও বিশ্বাস করিবেন না; ব্রাহ্ম বলিয়া, আগাগোড়া ঘটনাবলী উপহাসের সহিত উপেক্ষা করিবেন। সমস্ত তুমিরা ভজার-মা স্বরার নিজের অতীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করিবে। তাহার চেয়ে কাহাকে কিছু না জানাইয়া, অবিলম্বে এখান পরিত্যাগের সংকল্প করিয়া আমি ছলনারই আশ্রয় লইলাম। তাঁহার কথার প্রত্যুত্তরে কহিলাম, “ছুটর সর্দির মত হয়েছে, হুপুয়ে গা একটু গরম হয়েছিল, আজ আর বেড়াতে যেতে দেব না। আমার শরীটাও ভাল লাগছে না, চল কাল ভোরের গাড়ীতেই আমরা কলকাতা চলে যাই। এখানে আর একসুস্থকর্ত্তও মন টক্ছে না।”

তিনি পরিহাসের স্বরে বলিলেন, “আসা বত সোকা, ফেরা তেমন সহজ নয় বীণা! তোমার শরীটা ভাল নয় বলচ, শরীরের দিকে চেয়ে দেখে বলচ, না, না দেখেই বলচ? ছুটর সর্দি, গা গরম, এটাও তোমার উৎকট কল্পনা বীণা! ছুটু যে সারা হুপুয় আমার কাছেই শুয়ে ছিল, সর্দি হলে, গা গরম হলে আমি কি টের পেতাম না? আজ বোধ হয় কেউ তোমার কাছে বাঘের গল্প করেছে, তাই ঘরে ছিপি আঁটার ব্যবস্থা করচ।”

আমি বলিলাম, “বাঘের তরে নয়, আমার এখানে ভাল লাগছে না, আমি আর থাকতে পারছি না, এখানে থাকলে আমি মারা বাব। তুমি বাঁচবে না, ছুটু শেষ হয়ে বাবে। চল কালই আমরা চলে যাই।” বলিতে বলিতে আমার অশ্রুধ্বল কর কর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

তাঁহার আগমনের সঙ্গেই ছুটর কান্না ধামিরা গিয়াছিল। ছুটু জুতার মধ্যে পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে আমার দিকে বাড়ি ক্রিয়াইয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “বাবা, মা কাদে, মাকে বকো না।”

তিনি বিস্মিত হইলেন, ব্যথিত হইলেন। আমার হাতখানি হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সম্মুখে বলিলেন, “কান্না কেন বীণা, কি হয়েছে আমার বলবে না? সত্যি

তোমার এ আরগার থাকতে তর করচে, কিসের তর বীণা ?”

“কিসের তর আমি না, আমি এখানে আর থাকতে পারব না, আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।”

কিরংকাল চিন্তার পর তিনি কহিলেন, “আজ রৌদ্রের চিঠি পেলাম, আমরা এখানে এসেচি শুনে চারি বড় খুসী হয়েছে; আমাদের সঙ্গে দেখা করতেই চারি সজীক শীগগির আসছে নিখেচে। আর তিন চার দিন অপেক্ষা ক’রে তাদের সঙ্গে দেখাটা না ক’রে বাওয়া কি ভাল হয় বীণা ?

বলিলাম, “তিন চার দিন আমি এখানে থাকব, তার বেশী থাকতে পারব না। হুটুকে আমি বাড়ীর বের হতে দেব না, ভজার মার সজ্ঞাও নয়, বহুর সজ্ঞাও নয়। এমন কি তোমার সজ্ঞাও নয়।”

তিনি আমার সুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, “কিসে এত তর গেলে বীণা তা আমাকে গোপন কর কেন ? আগে তো তুমি এমন ছিলে না। তোমার বা খুসী তাই কর, আমি কিছু জ্বনেতে চাইব না।”

তিনি অভিমানে আমার নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার অভিমান, আজ্ঞা কর্তব্য, ছল ছল চক্ষু আমার অন্তরে পীড়া দিতে লাগিল। হুটুর কল্যাণ কামনার আমি তাঁহাকে ডাকিতে পারিলাম না, আমার মর্দোচ্ছাস তাঁহাকে জানাইতে পারিলাম না, নীরবে রহিলাম।

৫

সে দিন বিপ্রহর বেলা, আমি গৃহে ছিলেন না। জানাধারের পর মহকুমা দেখিতে গিয়াছিলেন। ভজার বা তাহার বোনবির বাড়ী বাইবার নিমিত্ত আমার নিকট হইতে ছুটি লইয়াছিল। শরন বন্ধে হুটুকে লইয়া আমি শুইয়াছিলাম। বাহিরে বহু তাহার নবীন

বহু কালু চৌকিদারের সহিত বোধ হয় গজিকা দেবীর উপাসনা করিতেছিল।

এতক্ষণ-বিছানার তইয়া মায়ের সুখে তেপান্তর মাঠের গর শুনিতে হুটুর ভাল লাগিল না; হুটু বাতঃরন সম্মুখে দাঁড়াইয়া দূরের বনরাঙ্গীর দিকে মুখ করিয়া আগন মনে বকিতে লাগিল। কখনও বা যুগ্ম ককণশ্বর অহুঃকরণ করিয়া মধুর কণ্ঠে যুগ্ম শব্দে নির্জন গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল।

গভীর নিস্তন্ধ মধ্যাহ্নে তরু পল্লবের মর্দর ধ্বনি, পাখীর সঙ্কল্প বিলাপ, এবং পদ্মার কুলু কুলু কলোচ্ছাস শুনিতে শুনিতে জীবৎ তপ্ত সুকোমল বাতাসে আমার চক্ষু হুটি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া সুনিদ্রা আসিল। ক্ষণকালের জন্ত আমি সংসার তুলিয়া; হুটুকে তুলিয়া নিজাদেবীর শান্তিময় কোড়ে আত্মসমর্পণ করিলাম।

“জগাই দাদা, ও জগাই দাদা !”

“দাদামণি, দাছ আমার।” এ সম্বোধনে আমার হৃদয়ের বোর ভাঙ্গির গেল। আমি বজ্রাহতের মত চমকিয়া কি দেখিলাম! হুটু জানলার মধ্য দিয়া হাত ছইখানি বাহিরে প্রসারিত করিয়া কাহাকে বেন জড়াইয়া ধরিয়াছে, বাহির হইতেও ছইটি বাহুর বন্ধনে হুটুকে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাঝখানে জানলার গরাদগুলি তেমনি অক্ষর অটল হইয়া ছইটি হৃদয়ের মাঝখানে একটি ব্যবধানের বাধা নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

বে হুটুকে খেঁটন করিয়া ধরিয়াছে তাহার প্রতি চাহিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আমার শরীর বেতস পত্রের মত কম্পিত হইতে লাগিল।

লোকটির বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ বছরের অধিক হইবে না। রূক্ষ চুলগুলির অধিকাংশই সাদা হইয়া গিয়াছে। পরশে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র। চোখের দুষ্টিটা বেন তায়ী উদ্ভ্রান্ত, কাতরতাময়। ও বে হুটুর জগাই দাদা, ভজার মা যে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। আমি ভাল করিয়া লোকটাকে নিরীক্ষণ করিতে সন্নিহনে

মেথিলাম, বাতায়ন পার্শ্ববর্তী টেবিলের উপর আমার সোণার হাত ঘড়িটা নাই। যে ঘড়ি লইয়াছে, সেই হুটকে অপহরণ করিবে এই আশঙ্কার বিষয়ের মত চিন্তার করিতে লাগিলাম, “চোর! কে কোথায় আছে রক্ষা কর! চোর।”

কিসের একটা উদ্ভাবনার, কিসের আবেশে কিয়ৎকালের নিরন্তর আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমার চিন্তাকারে কে যে আসিয়াছিল, কে যে চোর ধরিয়াছিল আমি তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যখন শান্ত হইলাম; লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন কালু চৌকিদার জগাইকে বাধিয়া লইয়া গিয়াছে; দূর বনপথ হইতে কেবল একটি আন্তর্নাদ আমার কর্ণমূলে প্রবেশ করিয়া আমার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে লাগিল—“আমার মেয়ে না, আর মেয়ে না তাই, আমি চোর নই।” সেই আত্ম-স্বরের সহিত যেন স্বর মিলাইয়া হুটু কাদিতে লাগিল—“আমার জগাই দাদাকে মেয়ে কেল্লো রে, আমি জগাই দাদার কাছে যাব।” বেগুনের শীর্ষ জ্বলাইয়া বাঁশ কাড়ের কম্পন তুলিয়া একটি বৃদ্ধ এবং একটি শিশুর ক্রন্দনের প্রতিধ্বনির মত বাতাস হা-হা করিয়া বহিয়া গেল। মেঘচ্ছন্ন আকাশে গুরু গুরু মেঘ ডাকিতে লাগিল। আমি রোহুন্তমান বালকের সম্মুখে পাবাণ মুক্তির মত বসিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার প্রাকালে বামী গৃহে ফিরিয়া ডাকিলেন, “বীণা! বছর কাছে আমি সব শুনলাম। এত কাণ্ড হবে জানলে আমি কখনো বাড়ী ছেড়ে যেতাম না। তুমি এমন হয়ে বসে আছে কেন? হুটু মাটিতে ঘুমিয়েছে, ওকে বিছানার ভইরে দাও।”

অপ্রত্যাশিত ঘটনার আমাকে যেন কেমন বিবশা করিয়া কেলিয়াছিল। হুটু কাদিতে কাদিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল আমি তাহা লক্ষ্যও করি নাই। বামীর আঙ্গানে আমার চমক ভাজিল। আমি হুটুকে বিছানার রাধিয়া বামীর পারের কাছে বসিয়া পড়িলাম। আল অশ্রুজলের মধ্য দিয়া আমার আতঙ্ক, হুটুর জগাই

দাদার প্রতি প্রাণের টান, ভজার মার গোপনতার প্রয়াস সমস্তই তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিলাম। তিনি একটু চিন্তা করিয়া নিঃশব্দে কহিলেন, “আমার মনে হচ্ছে—তোমার অনুমান একটাও সত্যি নয়, সবটাই ভুল। তোমার মহাতুলে হয় তো একটি নির্দোষ প্রাণীর তরানক ধরণা পেতে হবে। অনাচার অপরিচিত একটি ছেলেকে যে এত ভাল বাসতে পারে, সে কখনো ছেলেধরা নয় বীণা, চোরও নয়।”

আমি বলিলাম, “সে যদি সাধুপ্রকৃতি হবে তাহলে কি উদ্দেশ্য হুপুর বেলা এখানে এসেছিল? আর তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘড়িটা কেন অন্তর্ভুক্ত হ’ল?”

“ঘড়ি তো তার কাছে পাওয়া যায় নি, হুটু হয় তো কেউ কোথাও রেখেছে। কি উদ্দেশ্যে সে এসেছিল তাও কি বুঝতে পারছ না বীণা? সে হুটুকে স্নেহ করে, হয়তো খুবই স্নেহ করে। তুমি এখন হুটুকে ঘরের বের হ’তে দাও না তাই জগাই সুকিরে হুটুকে একবার দেখতে এসেছিল।”

কি নূতন কথা, কি অভাবনীর কল্পনা! এমন কি হইতে পারে? নিম্ন শ্রেণীর চাষ, তারা কি লোকচন্দ্র অন্তরালে থাকিয়া এমন নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে জানে। ভ্রম—বামীর মহাত্ম্য, ভজার মাকে কঠোর শাস্তি দিয়া তাঁহার মন হইতে এ ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে।

আমি তখনই ভজার মাকে তাহার বোনবির বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিতে বহুক পাঠাইয়া দিলাম।

৬

সন্ধ্যার পর বারান্দার মাজুর বিছাইয়া আসি তাঁহার নিকটে বসিয়া ছিলাম। বর্ষার মেঘাচ্ছায়ে ধরণী আবৃত হইয়া গিয়াছিল। গগনপট চক্রমা শূভ, নক্ষত্র শূভ, মেঘে মেঘে মেঘময়।

শৃংগালের সন্ধ্যা ঘোষণা করিয়া সেইরাজ ধামিরাছে, কিন্তু বিল্লীর একতান তখনও নীরব হয় নাই।

খোপে খোপে বোনাকীর মুহূর্ত আলো এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল, পরক্ষণে নির্ভীক হইতেছিল।

এমন সময় বহুর সহিত ভজার মা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার গায়ের কাছে আঁহড়াইরা পড়িয়া সে ক্রন্দন জড়িত কর্তে বলিতে লাগিল—
“আমি বহুর কাছে সব শুন্লাম মা। তোমরা থাকে ছেলেধরা ভেবে, চোর ভেবে খানার পাঠালে,—তার কোন দোষ নেই, বড় দোষ আমার। তোমরা কিছু বিশ্বাস কর না, ছোটলোককে ঘেরা কর বলেই আমি এতদিন জগাইয়ের কথা তোমাদের বলিনি। তার করণ্য হল আমার কি দশা হবে গো, আমি যে পাণের আগুনে জলে পুড়ে মরবো।”

বাকী জিজ্ঞাসা করিলেন, “জগাই কে? তার সঙ্গে ছুটুর এত তাব হল কি করে, আর মাহুলিই বা কোথার থেকে এল?”

ভজার মা বলিল, “জগাই এই গাঁয়েরই চাষা, ওর কেউ নেই। সেবার ওলাঙঠার জগাইয়ের ছেলে, বৌ, মেয়ে সব মরে গেছে বাবু, কেবল একটি নাতী ছিল। সেই নাতীটিকে জগাই বড় ভালবাসতো—বুকে করে মাহুল করছিল, একদণ্ড চোকের আঁড় করতে পারে নি। সেই নাতীটি ছার বছর বয়সে, আজ চার বছর হ’ল মা বাপের কাছে চলে গেছে। তারই শোকে জগাই ঘরে থাকতে পারে না, কাঁচ-কর্মে মন দেয় না, পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। আমাদের খোকাবাবু দেখতে নাকি জগাইয়ের নাতীর মত, বয়সও তাই। জগাইয়ের বিশ্বাস—তার নাতীই খোকাবাবু হ’লে আপনাদের ঘরে অন্য নিয়মে, মায়া কাটাতে না পেরে তার ঠাকুরদাদাকে দেখা দিতে এসেছে।”

আমার বন্ধ আন্দোলিত হইতেছিল। আমি ব্যথিত হইয়া কহিলাম, “একথা আগে আমার জানাও নি কেন ভজার মা?”

ভজার মা অকলে চক্ষু মুছিয়া কোড়ের হাসি হাসিয়া বলিল, “ছোট নোকের ভালবাসা তুমি ভালবাসতে না

মা, হয়তো জগাইয়ের কাছে খোকা বাবুকে বেতে দিতে না। সেই জন্তে মাহুলীর কথাও আমি তোমাকে বলিনি। খোকাবাবুর অর ছাড়ে না শুনে জগাই সমস্ত দিন উপোষ ক’রে, অমাবস্তার নিশীথ রাতে মোহনপুরের শ্মশানে গিয়ে রক্ষাকালী মায়ের চরণ পূজার বেলপাতা এনে খোকাবাবুর মাহুলী করে দিবেছিল। মাহুলী অবিশ্বাস করলে কলে না বলেই তোমার বলিনি মা।—ক’দিন খোকাবাবুকে না দেখে জগাই অস্থির হ’লে আজ তাকে দেখতেই এখন এসেছিল। বড়ি চুরির জন্তে নয়, খোকাবাবু তখন বড়িটা ভাজতে গিয়েছিল বলে আমি সেটাকে সাবানের বাস্তের মধ্যে তুলে রেখেছি।”

ভজার মা উঠিয়া গিয়া গৃহ হইতে বড়িটি আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিল।

অকস্মাৎ আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। দেহের অভ্যন্তরে কর্ণ-কুহরের মধ্যে মৃত্যু রজনীর ঝিলি-ধ্বনির মত একটা শব্দ হইতে লাগিল। হাঃ, কি করিয়াছি, শিকারভিমান বংশ-সৌরবে ক্ষীণ হইয়া কাঁহাকে স্থগা করিয়াছি, সন্দেহ করিয়াছি! একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, একটিবার অনুসন্ধান করাও দরকার বোধ করি নাই, অজ্ঞান বদনে চোর অপবাদে তাহার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি! ভগবান, তুমি কি আমার এ অজ্ঞান, এ অপরাধ মাফ করিতে পারিবে?

অনুশোচনার তাঁর আগুনে পুড়িতে পুড়িতে আমি তাহার পা ধরিয়া বন্ধ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম “তাকে কিরিয়ে আন, আমার সর্গদ্ব-বিনিময়ে তাকে কিরিয়ে আন।”

তিনি মেহতরে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “শান্ত হও বীণা, ছিঃ এমন কি করে! আমি এখুনি খানার বাবার ব্যবস্থা করছি। খানা এখান থেকে চের ছুর, আমার পথ বাটও চেনা নেই, বহুকে দিয়ে একখানা গরুর গাড়ীর বোঝা করছি। বহুকে নিয়েই আমার বেতে হবে, কিন্তু তুমি কি ভজার মাকে নিয়ে খালি বাড়ীতে থাকতে পারবে?”

বলিগান, “পারবো, আর আমার ভয় নেই। তাকে নিশ্চয় করে আমার কাছে কিরিয়ে এনো।”

“আনতেই তো ব্যক্তি বীণ। পুণিশের হাত থেকে তাকে মুক্ত করতে পারব কি না তা ভগবান জানেন।” বলিতে বলিতে তিনি বাহিরে বাইবার বেশভূষা করিতে লাগিলেন।

ভজার মা আসিয়া কহিল, “মা, বাবু বে এখন বাচ্ছেন, রান্না হয়নি, বাবুর খাবার কি হবে?”

“রাতে বঁদ কিরিতে পারি, কিরে এসেই খাব। এখন আর দেয়ী করবার সময় নেই, পথ থেকেই গোকুর পাড়ী ঠিক ক’রে নেব, তোমরা সাবধান হ’য়ে থেকে। ভজার মা।”—বলিয়া বাবুর মধ্য হইতে একটা নোটের ডাড়া লইয়া তিনি বছর সহিত প্রস্থান করিলেন।

কিরকাল পরে ভজার মা আমাকে শয়ন করিবার জন্ত ডাকিয়া গেল; কিন্তু আমি উঠিলাম না। আমার তুলিয়া, নিয়া তুলিয়া, ভামল হুন্দর বহুদ্বার পানে চাহিয়া রহিলাম।

ক্রমে মেঘ কাটিয়া চন্দ্র দেখা দিল। কান-শ্রেণীর প্রান্তে শান্ত পদ্মাবক্ষে শত চন্দ্ৰের প্রতিবিম্ব বক্রমক করিতে লাগিল। তরুতল হইতে ঝিল্লিরব শ্রান্ত হইয়া আসিল। বর্ষাদিত্ত বনের বৃহৎ গন্ধোচ্ছ্বাস গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল।

• • •

প্রত্যন্তে স্বামী কিরিয়া আসিলেন। আশঙ্কার আভাষে আমি তাঁহাকে একটি প্রশ্নও করিতে পারিলাম না। তিনি বৃহৎ বলিলেন, “তোমার ভয় নেই বীণ। দারোগাকে ছশো টাকা সুব দিবে জগাইকে নিয়ে এসেছি।

কিন্তু চুরি স্বীকার করবার ভয়ে পুলিশের লোক মারতে মারতে, ডান হাতখানা একেবারেই তেজে দিরাছে। আমি ডাক্তার দিবে তার হাত পরীক্ষা করে এনেছি। ডাক্তার বলেন, এত বয়সে ডাড়া হাড় কোড়া লাগবার আশা নেই। একটু ওষুধ দিবে হাতখানা বেঁধে দিরাছেন।”

আমি তাঁহার সহিত স্বপ্নগলিঙের মত বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিলাম, খুলার উপর জগাই বসিয়া রহিয়াছে, ছটু তাঁহার কোলে উঠিয়া ডাড়া হাতখানার হুঁ দিয়া দিতেছে।

সেই প্রকারে অর্জরিত ক্ষুৎপিপাসায় তাতর উৎপীড়িত চাবার নিকটে সরিয়া গিয়া আমি অশ্রুপূর্ণ কর্তে বলিলাম, “জগাই, আমিই তোমার এত ছঃখ কষ্টের কারণ। ছটুর সুখের দিকে চেয়ে তুমি আমার মাগ কর।”

জগাই মর্মভেদী কাতর দৃষ্টি আমার পাশে প্রসারিত করিয়া, আমার পারের বুলা মাধার তুলিয়া লইল। একটু হাসিয়া অত্যন্ত সহজ স্বরে বলিল, “আমার নিজের পাশেই আমি কষ্ট পেয়েছি মা, আপনি ও কথা বলে আমার অপরাধ বাড়াইও না। এখন আমার কোন বাতনা নাই; আমার দ্বারামণিকে কোলে করে সকল ছঃখ শীতল হয়ে গেছে।”

বলিলাম, “বাকি পেরে তোমার এত কষ্টের অবসান হল জগাই, আল থেকে তাকে আমি তোমার হাতেই দিলাম। এখন ছটুর ঘর, তোমার ঘর হল, ছটুর মা তোমার মা হল।”

জগাইয়ের বলিল বুধে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কৃতজ্ঞতাভরা সরল নেত্র আমার সুখের উপর স্থাপিত করিয়া জগাই আমার পাশে লুটাইয়া পড়িল।

ত্রিগিরিবাল্লা দেবী।

সাহিত্য

(রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৫শ অধিবেশনে, সাহিত্য-শাখা-সভাপতির অভিভাষণ)

বঙ্গসাহিত্যসেবকবৃন্দ,

সর্বোপায়ে সর্বসিদ্ধিদাতা ঈশ্বরবানের নাম স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে বখাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন জানাইয়া প্রার্থনা করি—অন্নবারন্তঃ উভায় তৎতু।

স্বদীর্ঘ পকাশ বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যের ও সাহিত্য-সেবকগণের সেবা করিয়া আসিতেছি; তজ্জন্য সেবার বৎকিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিয়াছে; কিন্তু পোরোহিত্য অনত্যন্ত অনধিকারচর্চ্চা। আপনারা অনধিকারীর চুকল সম্বন্ধে সম্মানের উকীষ পরাইয়া দিয়া তাহাকে পোরোহিত্যে বরণ করিয়াছেন। একরূপ অবস্থায় আপনাদিগের নিকট যে ছুই চারিটা কথা বলিব, তাহা সভাপতির অভিভাষণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না,—তাহা সেবকের বিনীত নিবেদন।

আজ যে স্থানে আমরা সম্মিলিত হইয়াছি, তাহা সমগ্র বঙ্গবাসীর সুপরিচিত তীর্থক্ষেত্র। একদিন ইহা আচার্য্য অতিথ্য ঠাকুরের দীলাঙ্গ ছিল; তাঁহার ঐশিষ্ট এখনও অসংখ্য ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর তৃষ্ণার অর্ধো সুরভিত; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দ্বানশগোপালের অন্যতম। এই স্থানে আবার বাঙ্গালা সাহিত্যের অগ্রদূত, নব্যভারতের নব-যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। এই স্থানেরই অনতিদূরে সেনহাট গ্রামে বহুদিন পূর্বে—১১২২ সালে আর এক সাধক, তত্ত্ব কবি জগদ্বৈরাগ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বিখ্যাত দাস। তাঁহার ‘জগদ্বৈরাগ্য মঙ্গল’ ১২২৩ সালে লিখিত হয়। তাঁহার ‘সঙ্গীত মাধব’, ‘প্রেম-সম্পদ’ ‘তত্ত্ব রত্নমালা’ বঙ্গসাহিত্যের অলংকার। সন্ন্যাসী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিতকার বঙ্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যাধি মহাশয় এইখানে বলিয়া সংবাদ পত্র ও বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। বহুদিনের বহুশ্রমের পথপ্রদর্শকের অবসানে তীর্থক্ষেত্রের নিকটবর্তী হইয়া সন্নিহিত

করিয়া থাকে, এই স্থানে, এই পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হইয়া সেইরূপ উল্লাসে সর্বোপায়ে ইহার জয়ধ্বনি করি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতে করিতে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি; তাহার কোনটারই সীমাংসা করিতে পারি নাই; করিবার মত সেরূপ শক্তি সামর্থ্য নাই; সেরূপ স্পর্শাও প্রকাশ করিতে পারি না। সেই সমস্যাগুলিই সর্বোপায়ে নিবেদন করিব।

প্রথম সমস্যা—বর্ণ-বিভাগ। পুরাতন পুথিতে বর্ণ-বিভাগের যে রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই যে পুরাতন রীতি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা পরিবর্তিত হইয়া যে রীতি ধীরে ধীরে নব্য কল্পে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাকে পুনরায় পরিবর্তিত করিবার জন্য আমরা হইতে নবীন উদ্ভব প্রকাশিত হইতেছে। ‘বর্ণ’ হইতে কালের উৎপত্তি ধরিয়া লইয়া সেকালের লেখক-গণ বার্ষিক ‘ব’কারের ব্যবহার করিতেন; ‘কার্য’ হইতে ‘কা’র উৎপত্তি করিয়া, পরবর্তী কালে অনেক অন্তঃস্থ ‘ব’কারের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিলেন; এখন ‘কালের’ বর্ণ-বিভাগে আমরা কোন্ রীতি অবলম্বন করিব,—ইহার সমাধান কঠিন নয়। কারণ, উত্তর রীতির মূলেই ইতিহাস আছে। কিন্তু যে সকল বর্ণ-বিভাগের মূলে কোনরূপ ইতিহাস নাই, সেরূপ বর্ণ-বিভাগ চালাইতে হইলে, শব্দের ইতিহাসের মূল স্মরণ হইয়া বাইবে। আমরা সে সকল মূলে কোন্ রীতির অনুসরণ করিব? সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক শব্দ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। এই শ্রেণীর অনেক শব্দ দিন দিন অধিক মাত্রায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া তাহার শব্দভান্ডার বৃদ্ধি করিতেছে। তাহাদের বর্ণ-বিভাগ কিরূপ হইবে? ‘ব’ নাকি পুরাতন; তাহা পুরাকালে আমাদের দেশের একটি

সমগ্র দেশকে বুঝাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার বর্ণ-বিভাগ কিরূপ হইবে? এ বিষয়ে নীমাংসা আবশ্যিক, নীমাংসা হয় নাই।

দ্বিতীয় সমস্যা—পদ-বিভাগ। ইহাও বহু পূর্বে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু নিত্যকাল আধুনিক হইলেও, বিলম্বলম্বিত। পদ-বিন্যাসের সঙ্গে রীতির সম্বন্ধ অপরিহার্য; রীতির সঙ্গে দেশের সম্বন্ধও সেইরূপ। পুরাকালে সংস্কৃত সাহিত্যে “গৌড়ী রীতি” প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল,—বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যের উপরেও তাহা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাঙ্গালীর সেই নিজস্ব রচনারীতি ছাড়িয়া দিয়া, পদ-বিন্যাস করিলে, অধিকাংশ বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা স্বকোথা হইবার আশংকা আছে। বাজার, কথকতার সাধারণ-বিন্যাসের আভিপ্রাণ থাকিলেও কোন বাঙ্গালী অর্থবোধ করিতে কষ্ট বোধ করে না। তাহাকে বতই আধীন ও সরল করা হউক না কেন, তাহাকে সর্বপ্রকারে উচ্ছিন্ন করা সম্ভব কি না, তাহাই বিচার্য। আমরা বাহাকে মৃত ও বাহাকে জীবিত ভাষা বলিয়া থাকি, তাহাদের ঐক্য নাশকরণ করা ঠিক কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। যে ভাষা স্ফুটত, স্ফুর্জিত, স্ফুৎস্বত, তাহা যেরূপ না বলিয়া, তাহাই জীবিত ভাষা বলিয়া কথিত হইতে পারে,—সংস্কৃত, আরবী, লাতিন, গ্রীক এই হিলাবে মৃত নয়, চির-জীবিত ভাষা। আধুনিক ভাষাগুলি পৃথগ্নবৃত্ত হইয়া, নিরন্তর পরিবর্তিত হইতে হইতে নিরন্তর অগ্রসর হইতেছে। এক যুগের রচনা অন্য যুগে স্বকোথা হইয়া পড়িতেছে সত্য, কিন্তু এই পরিবর্তন কি সম্ভবতার লক্ষণ নহে? আমাদের জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালী ভাষার গতি কি হইবে? ইহাকে যদি সমীচীন করিতে হয়, তবে নিরন্তর-পৃথগ্নলৈ বাধিয়া রাখিতে হইবে কি না? সে নিরন্তর পুরাতন না হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু সকলকেই তাহা মানিয়া চলিতে হইবে কি না?

তৃতীয় সমস্যা—স্বকৃতি ও কুরূতি, সুনীতি ও কুনীতি। বঙ্গ সাহিত্য-সমাজে এই স্বকৃতি ও কুরূতি, সুনীতি ও কুনীতি লইয়া আন্দোলন, আন্দোলন ও কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধানও আমরা দেখিতে চাই। বঙ্গসাহিত্য এক্ষণে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য নয়; বাঙ্গালী ভাষার তথা বাঙ্গালী সাহিত্যের সেবকগণ

নানা ভাতি, নানা সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহাদের রীতি নীতি, আচার ব্যবহারও বিভিন্ন। এ অবস্থার কোন এক সাম্প্রদায়িক সামাজিক রীতির বৈশিষ্ট্যই স্বকৃতি কুরূতির মানদণ্ড হইতে পারে কি না, সে কথা চিন্তাশীল স্মৃতিস্বপ্নের বিচার্য। দেশের এই যুগ পরিবর্তনের সময়ে বাঙ্গালী সাহিত্য তাহার দ্বার উন্মুক্ত রাখিবে কি না, তাহা সাম্প্রদায়িক-বিশেষের পুরাতন গভীরে আবদ্ধ থাকিবে কি না, নূতনের সংস্পর্শে আসিবে কি না, তাহার নীমাংসার সময় আসিয়াছে। তাই আপনাদের সম্মুখে কথাটা উপস্থিত করিলাম।

এই তিনটি সমস্যা সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার স্পর্শা রাখি না। সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে কোন পক্ষেরই পক্ষপাত কোন দিক করি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ভাষার গতি নিরূপিত করিবার জন্য আপনারা কি কোন চেষ্টা করিবেন না? যদি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—আর বিনয়ের অবসর নাই,—সময় আসিয়াছে।

এক্ষণে সাধারণ ভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে ছই চারিটি কথা বলিব। সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, প্রথমেই কাব্যের কথা আসিরা পড়ে,—সেই কথাই সর্বপ্রায়ে বলিবার চেষ্টা করিব।

কাব্য একটা মলিত কলা। কাব্য অমৃত্যুর সাহায্যে ভাবকে সৃষ্টি দান করে। স্বকৃতি ও বরণ্য সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড সভ্যই বলিয়াছেন, “কাব্য এক শ্রেণীর ভাষা—জীবন-বেদের ভাষা;—মানব-মনের আনন্দমাতা, মানবের রক্ষাকর্তা।” কাব্য ছাড়া বিজ্ঞানও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এখন আমরা বাহাকে দর্শন ও বর্ণ নামে অভিহিত করিতেছি, কালে কাব্য তাহারও স্থান অধিকার করিবে।” অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—“এখন আমরা বাহাকে বর্ণ নামে অভিহিত করিতেছি, তাহার অন্তরালে নিত্যকাল অজ্ঞাতসারে যে কাব্যরস বর্তমান আছে, তাহাই বর্ণ-শক্তির মূল প্রায়শঃ।” যে বর্ণ অমৃত্যুর সাহায্যে পরব্রহ্মকে পাইবার সন্ধান দিতে পারিবে সেই বর্ণই শ্রেষ্ঠ বর্ণরূপে জগতে পরিগণিত হইবে।

সংস্কৃত অলকার-মাত্র “সাধুকাব্যনিবেশনে”র উল্লেখ করিয়া, “অসাধু কাব্যের” প্রতি প্রসঙ্গক্রমে কটাক্ষপাত

করিয়া গিয়াছে। উৎকর্ষে কাব্য সাধু হয়, অগর্বে অসাধু হইয়া থাকে। তখন, অলঙ্কার এবং রীতি—এই ভিত্তী কাব্যের উৎকর্ষের বোঝা। ইহা কেবল সংস্কৃত-সাহিত্যের কথা নয়, সমগ্র মানব-সাহিত্যের কথা। ইহাকে বুঝিতে হইলে কবির মর্যাদা কোথায়, তাহার অঙ্গসজ্জান করিতে হয়। মাহুবকে মাহুব করিবার উদ্দেশ্যেই মানব-সমাজের সম্মানিত মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত সকল দেশে সকল যুগে নানারূপ রীতিবিধি ও সমাজবিধি উদ্ভাবিত হইয়াছে,—কিন্তু তাহাতে উদ্ভেদ স্ফূর্ত হইতে পারে নাই। কারণ তাহা দণ্ডমূলক বলিয়া কেবল দণ্ড দান করিয়া আসিয়াছে—চরিত্র সংশোধনে মাহুবকে মাহুব করিয়া তুলিতে পারে নাই। বিচারালয়, কারাগার, ধর্ম্মশাস্ত্রান, সামাজিক আশ্রমিক্ত এবং বাধ্যতামূলক লোকশিক্ষার ব্যবস্থা এই জন্ত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; কেবল কবির ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, তাহা দণ্ডমূলক নয়—সমবেদনামূলক। উজ্জ্বল কবিই কেবল অলঙ্কিত ভাবে অন্ততলে প্রবেশ করিয়া স্বপ্নের ক্ষতে সহস্রকৃতির শীতল প্রলেপ প্রদান করেন, মহত্বের দিকে অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করেন,—মাহুবকে মাহুব হইবার জন্ত সাহায্য দান করেন। এই শুধে কবি মানব-বন্ধু—মানব-শিক্ষক—মনোবী ও কবি;—এই শুধে ব্যাগ বাজীকি—ব্যাগ বাজীকি। কবির এই সমুদ্র পদমর্যাদা বিশ্বত না হইয়া, কবি যদি কাণ্ড রচনা করেন, তবে তাহা সংসার-বাবলধি জনসমাজের পক্ষে চির শীতল অনৃত প্রলেপে পরিণত হয়। দণ্ডদানের দ্বাং ক্রেশের পরিবর্তে পঞ্চমাত্র মানবকে কবি মেহাগিনিসে সংপথে আকর্ষণ করেন,—“তোগে নহে ত্যাগে”—এই মহাশিক্ষার মানবকে দেবত্বের দিকে পরিচালিত করিয়া থাকেন।

সত্যনিষ্ঠাই সাহিত্যের পবিত্র পদ্য। তাহাই সকল সমাজের বেকদণ্ডকে সুস্থ ও সবল করিতে পারে; তাহাকে কথার হেয়করে হাসিয়া উড়াইয়া দিলে, সমাজকে পরিণামে পচু হইয়া পড়িতে হয়। উজ্জ্বল সাহিত্যে সত্যনিষ্ঠা আবশ্যক। বঙ্গসাহিত্যের সমুখে আশায় যুগ আসিয়াছে বলিয়া, এই কথা পুনঃ পুনঃ

বলিয়াই পবিত্রতার কথাটা বিশেষ ভাবে তাবিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

বঙ্গপালিতা, আশ্রমলগ্নকৃত্য শত্ৰুত্বগর রূপ বর্ণনার অমর কবি তাহাকে “মধুনবমনাবানিত রস” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। পরিপূর্ণ মধুতাও হইতে কেহ এক বিন্দু তুলিয়া গইয়া আবাদন করিলে, তাওহিত অবশিষ্ট মধুর রস অন্ন হইয়া যায় না, মিষ্টতা লমাইয়া রহিয়া যায়,—তবে কবি এমন ব্যর্থ শব্দ প্রয়োগে শক্তিকর করিয়াছিলেন কেন? সকলই থাকে, থাকে না কেবল পবিত্রতা,—তাহার অনাবানিত মিষ্টতাই প্রকৃত মিষ্টতা,—এই কথাটুকু বুঝাইবার জন্যই কবি এত প্রয়াস বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যেও সেই পবিত্রতা আবশ্যক। না থাকিলে মিষ্টতার অন্নতা হয় না, কলাকোশলের অপচয় হয় না, কিন্তু উপাদেয়তা নষ্ট হইয়া যায়। কলা-সাহিত্যে মিষ্টতা চাই,—কিন্তু তাহাই সর্ব্বত্র নয়,—সঙ্গে সঙ্গে উপাদেয়তাও অপরিহার্য্য। ইহার একটিকে মরিয়া, অন্যটিকে বাঁচাইয়া রচনা করিলে, তাহাতে সাহিত্য অদ্বীন হয়; বাহা আদর্শের সমুখে অসাধারণ দেবত্বের আদর্শ ধরিয়া রাখিতে পারিত, তাহা সাধারণ মহত্বের হীন আদর্শ ধরিয়াই দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। বাহা আছে তাহার কটো-প্রাক এবং বাহা হইতে পারে তাহার আলোচ্য এক নয়, পৃথক;—ললিতকলার হিসাবেও কোনটা অপরিহার্য্য, কোনটা পরিহার্য্য, তাহার বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। কারণ, রসকে বড় সতর্পণে রক্ষা করিতে হয়, নচেৎ রস রস থাকে না, বিকৃত হইয়া স্রাসারের অঙ্গদান করে; তখন তাহার মিষ্টতা স্বতীত্ব নানকতার পরিণত হয়।

এখন বঙ্গসাহিত্যের ক্রীড়া-কৌতুকময় শৈশব-লীলার অবসান হইয়াছে,—এখন বাহারী ইহার সেবাস্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সকলই স্থপিত্ত, কেহ কেহ রিখবিখ্যাত, অনেক রচনাশক্তিতে বিশ্বসাহিত্য-সেবকদের মধ্যে উজ্জাদন লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহার কেবল আদর্শের দুর্ভাগ্য দেশের আশায় প্রতীপ নন, সমগ্র মানব-সমাজের চিন্তাপ্রবাহের গতি নির্দেশ করিবার উপযুক্ত শক্তিসামর্থ্যে শক্তিশালী। তাহাদিগকে সাধর অতি-

কাব্যের আলোচনার পর নাটকের কথা বলা কর্তব্য। কাব্য, তাহাও কাব্যের অন্তর্গত;—শ্রাব্য নয়, দৃশ্য—এই-নাজ পার্থক্য। নাটক সম্বন্ধে গতবর্ষের সাহিত্য বিভাগের সভাপতি শ্রদ্ধের রসরাজ অনুভূতলাল বসু মহাশয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ; তাহার অধিক আমি নুতন কিছু বলিতে পারিব না। বর্তমান সময়ে বাঙ্গলা নাট্য-সাহিত্যের, তথা বঙ্গ-রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্ত একটা বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে; অনেক কৃতবিত্ত ব্যক্তি রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন; রঙ্গালয়ের শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্ত একদিকে যেমন আয়োজন হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয়েরও ব্যবস্থা হইতেছে। আশা করা যায়, অভ্যস্ত কালের মধ্যেই আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চগুলি আপনাদের গৌরব অক্ষুর রাখিবে। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে সার্ববর্ষিক পঞ্চম বেদরূপে নাটক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সেই মূল উদ্দেশ্য অব্যাহত থাকিলেই নাট্য-সাহিত্য দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে,—এ কথা বেন বিশ্বাস না হই।

এক সময়ে বাঙ্গলার চিত্তাধারা পত্রের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হইত। গল্প-সাহিত্যের প্রচলন বাঙ্গালার কতদিন হইয়াছে, সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতে চাই না—বলিবার অধিকারীও আমি নই। তবে রাম-মোহনের অক্ষত্মিতে ঝাঁড়াইরা গল্প সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক স্বরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। রাম-মোহন-বিভাগাগর-অক্ষরকুমার-বক্তিমচন্দ্র-ভূদেব-কাকাল-হরি নাথ-কালীপ্রসন্ন সেবিত যে বক্তাবা বাণ্যে পাঠ করিয়া আনন্দ ও শিক্ষা পাইয়াছি, যৌবন হইতে আজ পর্যন্ত যে তাবা-জননীর সেবার মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, সেই বঙ্গবাণীর বরষপু সাজাইবার জন্ত ঝাঁড়া বাহা দিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য আমার নাই। তবে, এ কথা গর্বের সহিত বলিতে পারি যে, প্রাচীনকালে যে সকল মহানরোষী তাবা জননীর মন্দির নির্মাণকল্পে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাবের ও তাবুকতার গুহু বনিয়াদের উপর মন্দিরের ভিত্তি গড়িয়াছিলেন, উপকরণ সংগ্রহের জন্ত তাঁহারা নানাদেশ হইতে মালমসলা আহরণ করিয়াছিলেন, নব নব রত্নরাশি

সংগ্রহ করিয়া মাতৃমন্দিরকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন; এবং আমাদের চিরসাহায্য বঙ্গবাণীর দেবীপ্রতিমা তাহার ভিতর প্রতিষ্ঠা করিয়া তক্তিতরে মায়ের পুন্নার আরাধন করিয়াছিলেন। সে পুন্নার রীতি আজ পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য পুরাতন-প্রীতিতে। এই পুরাতন-প্রীতির বন্ধন এখনও ছিন্ন হয় নাই।

গল্প সাহিত্যের ভিতর তিনটা বিষয়ে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক।

প্রথমে সন্দর্ভের কথা। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পূর্বের ভায় আলকাল চিত্তাশীল সাহিত্যবিষয়ক সন্দর্ভ বক্ত একটা বাহির হইতেছে না। যে জাতি তাবুক ও চিত্তাশীল বলিয়া অগতের নিকট পরিচিত, সে জাতির সাহিত্য হইতে চিত্তাশীলতার ছাপ কি একেবারে মুছিয়া বাইবে? বক্তিম-মণ্ডলীর কথা ছাড়িয়া দিলেও, পরবর্তী বহু লেখকের সন্দর্ভে যে চিত্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া বাইত, সেসকল পরিচয় আলকাল ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথ চিত্তাশীল দার্শনিক লেখক—তাঁহার কাব্যে উপভাসে গভীর চিত্তাশীলতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার উপভাসে চরিত্র বিশ্লেষণ যেমন আছে, চিত্তা করিবার সত্যও তাহাতে সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে বিস্তারিত। ইতিহাস, প্রকৃতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে চিত্তাশীলতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু দার্শনিক সূচিত্তিত প্রবন্ধ আজ কাল আর প্রকাশিত হয় না বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। এই চিত্তাশীলতার অভাবের কারণ অমূল্যমানের সময় আসিয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহার যে কারণ অন্তর্নিহিত হয়, তাহা আপনাদের নিকট বলিব। দারিদ্র্য-হুংস-অভাব-ক্লিষ্ট আমরা চিন্তা করিতে পারি না—চিন্তা করিবার জন্ত যে সম্মতি ব্যয় করা আবশ্যক, তাহা আমরা ব্যয় করিতে পারি না, সে অবসর আমাদের নাই, সে সাধনা আমাদের নাই, তাই আমরা চিত্তাশীল প্রবন্ধ পাইলেও গ্রহণ করি না। আমরা চাই সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু রস, একটু আনন্দ, একটু তৃপ্তি। সেটা পাই আমরা কথা সাহিত্য হইতে। তাই আমরা কথা-সাহিত্যের অধিক মাত্রার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছি। সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য, চিত্তাশীল প্রবন্ধাবলী প্রচারিত না হইলে

আমরা কেবল রস-সাহিত্য খরিদা মানুষ হইতে পারিব না। দেশ চার ভাবের প্রেরণা, নতুন ভাবের সন্ধান। যে জাতিক এই ভাবের সন্ধান দিতে পারিবেন তিনি আমাদের নমস্ত হইবেন। তিনিই একদিন ভগ্নরথের ভার নতুন ভাঙ্গ-গুদার প্রাণে ছুটাইবেন, বাহার শীতল বারি পান করিয়া জাতি প্রাণরক্ষা করিবে। আর একটা কথা। যদি কথা-সাহিত্যের প্রতি সাধারণ লোকের অজ্ঞরাগই অধিক সূচিত হয়, তাহা হইলে কথা-সাহিত্যিকদিগের কর্তব্য—অন্ততঃ উপভাসের ভিতর দিয়া চিত্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া; কেবল রসস্থতির দিকে মনোবোঁগ না দিয়া মানব-সমাজে নানাবিধ সমস্তার সমাধানের চেষ্টা করা কর্তব্য। “গোরা” ও “গল্পীসমাজ” ভাল করিয়া পাঠ করিলে আমরা ইহার প্রশংসা প্রাপ্ত হইতে পারি।

কেবল বঙ্গ আত্মরপের জন্য দেশবিদেশে ছুটিলে চলিবে না; মানবকে বাঁচিতে হইলে আহার করিতে হইবে। এই আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এদেশে এখন কৃষি-মস্তার মূল আলিয়াছে, খাঁটি জিনিষ এখন আর বড় মেলে না এখন ভোজ্যাদেই দিন। তাই বলি, ভাব-মননীর প্রাণরক্ষার জন্য খাঁটি আহাৰ্য্য গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অগতের আহাৰ্য্য-ভাণ্ডার হইতে বলকারক আহাৰ্য্য-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। এই কার্য্য করিতে হইলে অজ্ঞাদের আবশ্যক। বিশ্বসাহিত্যের যেখানে যা কিছু ভাল, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। এই অজ্ঞাদের প্রয়োজনীয়তা সর্বদেশেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। অজ্ঞান করিতে হইলে মূল হইতে অজ্ঞান করাই বুদ্ধি-বৃত্ত। আর কেবল অজ্ঞান করিলেও চলিবে না; দেশ, কাল পাঞ্জোপযোগী করিয়া অনুদিত বিবরণকে নিজস্ব করিয়া লইতে হইবে।

এইবার কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চাই। নাটকের ও কথা-সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত একরূপ। উভয় হইতেই আমরা চিত্তবিনোদন ও শিক্ষা লাভ করি। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই; নাটক কার্য্য ও দৃষ্টাবলীর ভিতর দিয়া চরিত্র ফুটায়, কথা-সাহিত্য সরূপ করে না। কথা-সাহিত্য মানবমগ্নে স্থায়ী অম্লভূতি উজ্জ্বল করিয়া দিবার চেষ্টা করে। চরিত্র-সৃষ্টি, রসোজ্জ্বল ও

উদ্দেশ্য, মানবজীবনের পরীক্ষিত সত্যগুলিকে কাল্পনিক বা প্রকৃত চরিত্র ও ঘটনার ভিতর দিয়া পরিষ্কৃত করা। সমাজবদ্ধ মানব-সংস্কৃতির জন্য যে সমস্ত সমস্তা ঘটয়া থাকে, উঠিয়া থাকে বা উঠিতে পারে, তাহাদের সমাধান করাও কথা-সাহিত্যিকের কর্তব্য। কোন কোন কথা-সাহিত্যিক উপন্যাসে অন্য গত সমস্তা তুলিয়া থাকেন। কিন্তু এগুলিকে আমাদের দেশ কাল পাঞ্জোপযোগী না করিয়া উপহাসিত করিলে কোন দিনই চলিবে না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কথা-সাহিত্যিক না হইলে কেহই অন্যগত সমস্তার কথা লিখিতে পারেন না।

কথা-সাহিত্যের দুইটা দিক আছে—উপন্যাস ও ছোট গল্প। ছোট গল্পে একটা ঘটনা বা মানবীয় একটা অম্লভূতির অথবা একটা ঘটনা-কলে উৎপন্ন করেকটা অম্লভূতির সমাবেশ, ভাবের একতা ও পূর্ণতা থাকে। করানী কথা-সাহিত্যিকদিগের মতে ছোট গল্পের উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্য্য ও রসাম্লভূতির উজ্জ্বল করা—কোনরূপ শিক্ষার কথা ছোট গল্পে স্থান পায় না। আমেরিকার কথা-সাহিত্যিকদিগের মতে ছোট গল্পের উদ্দেশ্য—অন্য পরিসরের ভিতর সহজে একটা সজীব ভাবের উজ্জ্বল করা।

ছোট গল্পে করানার প্রকার—অবাধ গতি ও বহুদল লীলাভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট গল্পলেখককে জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিতে হয় না; উপন্যাসিককে তাহা দেখিতে হয়। ছোট গল্পলেখক জীবনের কোন একটা ঘটনা বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে অভিজ্ঞতা মনোভা ভাবায় ফুটাইয়া তুলিয়া সঙ্গকাম হয়। অভিজ্ঞতা তুর্য্যদর্শন-সাপেক্ষ।

একণে উপন্যাস সম্বন্ধে ‘একটি কথা বলিব। উপ-ভাস দুই প্রেণীর, ভাবগত (Idealistic) ও বস্তুগত (Realistic) বস্তুগত উপভাসে জীবনের পরীক্ষিত বাস্তব সত্যের অলঙ্কার দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়; আর ভাবগত উপভাসে জীবনের উচ্চ আদর্শ বিবৃত হয়। বস্তুগত উপভাসিকদের লক্ষ্য থাকে ঘটনা ও চরিত্রের বার্থ বর্ণনের দিকে, মান-সিক ভাবের সূত্রের দিকে। অবস্থা বা ঘটনা তাহাদের নিকট চরিত্রবিকাশের সহায় মাত্র। কোন অবস্থায় মানব চরিত্র কি ভাবে ফুটিয়া উঠে, তাহার তাহারই বর্ণনা করিয়া

আবার অত্যধিক হইতে দেখিতে গেলে, বঙ্গবাহীদিগের বাধীনতা বড় কম; কারণ, আপনাদের পরীক্ষিত বিষয় ভিন্ন তাঁহারা কোনও কথা বলিতে পারেন না। ভাবগম্ভীর ঔপন্যাসিকদের বাধীনতা কিন্তু খুব বেশী। কল্পনার মনোরম চড়িয়া তাঁহারা যে সত্যের সন্ধান পান, তাহাই পাঠকদিগের নিকট উপস্থাপিত করেন। বঙ্গবাহী তাঁহাদের পাঠকেরা তাঁহাদের প্রতি আত্মবিশ্বাস থাকেন, ততক্ষণ তাঁহাদের সিংহাসন অপ্রতিহত থাকে। কিন্তু সত্যের পথ হইতে কিকিৎসাজ ঘুরে সরিয়া গেলে, তাঁহাদের প্রতিপত্তি আর থাকে না।

একশ্রেণী আদি ত্রীমান চাকচাক্য বিজ্ঞের 'উপভাসে বাস্তবতা বনার ভাবুকতা' প্রবন্ধ হইতে সামান্য একটু উদ্ধৃত করিয়া এ আলোচনা শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন,—

“জগতের বড় বড় মনীষীরা, বড় বড় ঔপন্যাসিকেরা নীতির পথ হইতে বিচ্যুত হন না। তাঁহাদিগকে নীতিবিদ (moralist) বলিলে অত্যাধিক হয় না। তাঁহারা বাস্তব ঘটনাগুলিকে এরূপভাবে চিত্রিত—জীবনের কার্যগুলিকে এরূপভাবে অঙ্কিত করেন, বাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা দেখাইতে চান প্রত্যেক কার্য বা ঘটনার একটা নৈতিক দিক (moral bearing) আছে। পাপের প্রতি আত্মা কখনই তাঁহাদের লেখনী হইতে পাওয়া যায় না। জীবন সমস্তার সমাধান তাঁহারা করিয়া থাকেন। জীবন-বেদ আর্টিষ্টের তুলিকার অঙ্কিত করিতে না পারিলে সকলকাম হওয়া যায় না। উপভাসের আখ্যান ভাগের ভিত্তর দিয়া চরিত্র বা নীতির কার্য চলিবে, জীবনের সমস্তাগুলি ঔপন্যাসিককে সমাধান করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু একদেশদর্শী ধর্মপ্রচারকের জার মতবাদের অজুগোতে লেখক মহাশয়ের সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে এইরূপ হাঁড়াইতেছে, উপভাস চারিত্র্য নয়। উপভাসে চারিত্র্যের মন্তগুলির ব্যাখ্যান বা বিবৃতি আমরা চাই না;—চাই আমরা সমগ্র উপভাসখানি পাঠ করিয়া জীবনের ব্যাখ্যা দেখিতে, মানবের চিন্তা, কার্য ও তাবের ভিত্তর নীতির ছাপ দেখিতে। নৈতিক নিয়মবশে বাহাতে কার্যগুলি সম্পন্ন হয়, তাহা দেখিতে পাইলেই আমরা বস্ত হইব।”

একশ্রেণী আমরা ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে হই এক কথা

বলিতে চাই। আধুনিক ইংরাজী ভাষার অতিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বিগের ধারণা যে, ইংরাজী ভ্রমণকাহিনীর অল্পকরণে এ দেশে ভ্রমণকাহিনী প্রচলিত হইয়াছে। এ ধারণার মূলে কিন্তু সত্য আদৌ নাই। প্রাচীনকালে হিন্দু-মুসলমানেরা যথেষ্ট ভ্রমণ তীর্থ ভ্রমণ করিতে বাইতেন, বাহ্যিক-ভ্রমণ কেহ কখনও বাইতেন না, কারণ তখনকার দিনে সকলের বাহ্য অটুট থাকিত। প্রাচীন ভ্রমণ কবি মরহরি চক্রবর্তীর ‘ভ্রমণ-পরিভ্রমণ’ ও ‘নববীপ-পরিভ্রমণ’ হইতে এই দুই স্থানের ভৌগোলিক তথ্য বেশ জানিতে পারা যায়। রাজা রাজনারায়ণ ঘোষাল মহাশয় ইং ১৮০২ সালে কাশ্মীর পরিভ্রমণ করিয়া মনোজ্ঞ ভাষায় ‘কাশ্মীর-পরিভ্রমণ’ বর্ণনা করিয়াছেন। কবি বিজয়রাম ১১৭৭ সালে তীর্থভ্রমণ গাহিয়াছেন। সেও আদি ১৫০ বৎসর পূর্বের কথা। এতলি তৎকালে প্রচলিত রীত্যুসারে কবিতার রচিত। ৭০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গলা গভে আমার শ্রদ্ধের বন্ধুবর সাহেব দেবজ্ঞান সর্কারিকারী মহাশয়ের পিতামহ স্বর্গীয় বহুনাথ সর্কারিকারী মহাশয় সরল ভাষায় তীর্থভ্রমণের যোজনামালা লিখিয়া যান। আমরা ধারণাই করিতে পারি না যে, এরূপভাবে যোজনামালা বাঙ্গালীর সেকালে লিখিত হইয়াছিল। এ পুস্তকে কেবল তীর্থ-মাহাত্ম্য বা পৌরাণিক স্থান-সংস্থানের কথা আলোচিত হয় নাই—ইহাতে “নানা স্থানের সমাজ-চিত্র, লোকচরিত্র, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সংকীর্ণ ইতিহাস ও ইতি-কথা ইত্যাদি বহু জাতীয় বিষয়” বর্ণিত আছে।

এখন ভ্রমণ-কাহিনী লেখার ভঙ্গীটা একটু পরিবর্তিত হইতেছে। পাশ্চাত্য জগতে সাহচর্য (Laws of Association) নিয়মবশে ভ্রমণ-কাহিনী লিখিত হইয়া থাকে, এ প্রকৃতিতে যে কোন স্থানের বিষয় বাহা কিছু জানা প্রয়োজন তাহাই বিবৃত হয়। ইতিহাস, ভূগোল, উৎপন্ন প্রভৃতির বিষয়, স্থানের অধিবাসীদের স্বভাব-চরিত্রের কথা, স্থান, কাল, পাত্র ও তাবের সাহচর্য মনোরম ভাবে লিখিত হয়। বড় বড় মনীষীদের চিন্তার ধারাও ইহাতে বেশ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত হয়।

এইবার আমরা জীবনবৃত্ত বা জীবনচরিত সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। “নাহয় হইতে গেলে—প্রকৃত মনুষ্য কি তাহা বুঝিতে গেলে কেবল চরিত্র পাঠ

করিলে চলে না। চরিত্র পড়িয়া বহিঃসর্বথা চরিত্রবান হওয়া বাইত, তাহা হইলে নীতিবিশিষ্ট মার্শনিক ভিত্তকে চরিত্রহীন দেখিতে হইত না। পুঁথিপত্র ভিত্তি বিতাকে কার্যকরী করিতে হইলে সন্মুখে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানস-চক্ষুর-সন্মুখে রাখা সর্বদা কর্তব্য। প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যোগ্য ব্যক্তির বাস্তব চিত্র। তাহাকে যোগ্য ব্যক্তি বলিব, যিনি জানেন ও কর্মে, যারা দাম্পন্যাদি সন্মুখে ও ভাষা চিত্তাঙ্গীল ব্যক্তিবিশেষ তত্ত্ব ও প্রজ্ঞা আকর্ষণ করেন—বাহার প্রেমানলে আপ দিতে মানব-পদ ছুটিতে ব্যগ্র—বাহার ছার-শীতল পাদমূলে বসিলে অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়—যিনি নুতন ভাবের প্রেরণা দিয়া জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেন—যিনি সভ্যের সন্ধান বলিয়া দেন। এইরূপ যোগ্য ব্যক্তির জীবন চরিত্র বিবৃত করা উচিত। অযোগ্যকে যোগ্যের আগন দিয়া, তাহাদের জীবন-চরিত্র ব্যাখ্যা করা কিছুতেই উচিত নয়।

বাংলা দেশে শতকরা বহুজন নিরক্ষর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, অগতের কোন দেশেই ততজন দেখিতে পাওয়া যায় না। জানের আলোক প্রাপ্ত না হইলে, অজান-অন্ধকার ঘুর হয় না—মানব পশু হইতে মানবত্ব উপনীত হইতে পারে না। এই জ্ঞানলাভ সাধন-সাপেক্ষ। ভারতে ইংরাজ-আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ইংরাজী ভাষার প্রচলন হইয়াছে। জ্ঞানমার্গে উপনীত হইবার ইহাই এক সময়ে একমাত্র সোপান বলিয়া স্থির হইয়াছিল। এতদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষাকে বাহন করিয়া বিজ্ঞান দান করা হইত। আশ্চর্যের বিষয়, অগতের কোনও দেশে বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান করা হয় না; এরূপ করাও অজ্ঞবেশে সম্ভবপর নয়। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা এই উপায়কে এতদিন ছাত্রবিশেষের অন্তর্নিহিত শক্তি-বিকাশের চরম পন্থা বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। সে দিনের কথা মনে পড়ে, যে দিন কৃশাশ্রয়িত্রি দুঃখদর্শী গার ওল্ডফান বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলা ভাষার পঠন-

মাতৃভাষার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে হইয়াছে। বাক্য এম-এ পরীক্ষার বাংলা ভাষার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সভ্যের অগ্ররোধে বলিতে হইবে, মাতৃভাষার শিক্ষার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মগুলি এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা—বাংলা ভাষার সাহায্যে বর্তমান না চলিবে, ততদিন দেশের মঙ্গল হইবে না। বিদেশী ভাষাভারত কণা সময় সাপেক্ষ। জ্ঞানার্থে যথার্থ বিজ্ঞানকে অকারণ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্ত সময় নষ্ট করিতে হয়। উচ্চশিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করা একে হ্রস্ব, তাহার উপর ভাষা-বিজ্ঞানে অধিকতর কষ্ট হইয়া পড়ে। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের নিকট আমাদের সনির্ভর অগ্ররোধ—সর্বশ্রেণীর শিক্ষা বাহাতে মাতৃভাষার দান করা হয়, তাহার ব্যবস্থা তাহারা করিয়া দিল। অর সময়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি হইবে।

আধুনিক নারী-জাগরণের দিনে দেশে জ্ঞানশিক্ষা কি ভাবে প্রচলিত হইয়া উচিত, সে সম্বন্ধে দেশবাসীকে চিন্তা করিতে অগ্ররোধ করি। আজকাল জ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেহ আর সন্দেহান নন;—তবে তাহা কি ভাবে চলিবে, তাহাই বিচার্য। প্রজ্জ্বল ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সহিত আমরাও বলি,—“শত যৌব স্বীকার করিয়াও আমি জ্ঞানশিক্ষার পক্ষপাতী। ইহাতে পৃথিবীর কি উপকার বা অপকার হয়, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি সম্পূর্ণ আরত করিতে অক্ষম হইলেও—এইটুকু বলিতে পারি যে, সাহিত্য ও শিল্পকলা পুরুষের জ্ঞান রমণীর পক্ষেও অতি সুখের সামগ্রী, অতি আদরের বস্তু। তাহা যে কত অবসরের নিশ্চিত আশ্রয়, কত নির্জ্ঞানতার নিকটক সমী, কত নবরাজ্যের চিরোদ্ভূত দ্বার, কত উচ্চাকাঙ্ক্ষার নীরব প্ররোচক, কত সুখস্বপ্নের সমতাপূর্ণ বস্তু, কত মাধুর্যের অনুর-প্রসবণ—তাঁহা যিনি জানিয়াছেন, তিনি কেন না ইচ্ছা করিবেন যে, সকল নারীই সেই সুধারস পান করুক;—করিয়া তাহাদের নারীমধুরতর, গভীরতর, উচ্চতর, উদারতর, বিস্তৃত হউক।”

বাংলা ভাষার প্রচার করে আর একটা কথা বলিতে চাই। পূর্বে ধর্ম্মাধিকরণে উর্দু ও বাংলা

তাই গ্রহণ করিয়াছে। একে অসুস্থ মনুষ্যকে বাজার স্থান ইংরাজী ভাষা গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ হইতে দেওয়া কোন মতে উচিত নয়। বাজারী হাকিমদের নিকট ইংরাজীতে সওয়াল জবাব করা কোন মতেই কর্তব্য নয়। বাদী-প্রতিবাদী, সাক্ষী-সাব্দ, উকিল ও হাকিমেরা যে ভাষার মনোভাব ব্যক্ত করেন, পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়া যে ভাষার প্রথম তাঁহারা ব্যাক্যচারণ করিয়াছিলেন, সেই মাতৃ-ভাষা কি এত দীন যে, ইংরাজীতে না বলিলে বক্তব্য বিষয় বুঝান যায় না? জেলার ইংরাজ হাকিমদিগকেও অন্তে পাই, এদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া আসিতে হয়। তবে তাঁহাদের নিকটেই বা বাজারী ভাষা চলিবে না কেন? অবশ্য আইনের পারিভাষিক শব্দগুলি (legal terms) ইংরাজীতে বলিলে ক্ষতি নাই, কারণ এখন পর্যন্তও সর্ব বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ বাহির হয় নাই। আমি আপনাদের নিকট ও বাজারীর বার লাইব্রেরী-গুলির উকিল মহাশয়দের নিকট অনুরোধ করি, এ বিষয়ে তাঁহারা অবহিত হউন—ভাষার প্রসারকল্পে সহায়তা করুন।

সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদি এখন আমাদের দেশের শক্তিশ্রমে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সংবাদ-পত্রের আলোচনার উপর লোক আর নাসিকা কুঞ্চিত করেন না; তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় লইয়া সাধারণে এখন আলোচনা করিয়া সত্যের পথে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করেন। এই শক্তির অপব্যবহার করা যে উচিত নয়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আর আমি কিছু বলিতে চাই না; বলিবার সামর্থ্যই বা কোথায়? বঙ্গবাণীর সেবা করিবার জন্য আপনাদের সম্মুখে যে দণ্ডারমান হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি, ইহাই বশেষ। তাহার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ। যখন সন্নিগন-পরিচালক-সমিতির আহ্বান আমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আমি শয্যাসীম—অনন্ত পথের বাজী।

আশা ছিল না যে, এ বাজী রক্ষা পাইব। ভগবানের কৃপায় ও আপনাদের শুভ কামনার ধীরে ধীরে সুস্থ হইলাম বটে, কিন্তু লিখিবার পদ্ধিবার পূর্ব সামর্থ্য এখনও পর্যন্ত কিরিয়া পাই নাই।

সামর্থ্য অসুস্থ থাকিলেও, মনের কথা মনের মত করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিতাম না। বাহ্যিক চরণোপাঙ্গে বসিরা ভাষা-জননী সেবারাজের উপদেশ লাভ করিয়াছিলাম, যে সকল সহোদয়াদিক সেহপরাধ সেবতবুদ্ধের সাহায্যে সেই সেবারাজ উদ্ভাপনের জন্য বধাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আদিরাছি, তাঁহারা অনেকে এখন পরলোকগত। তাঁহারা বঙ্গভাষা সেবার জন্য যে উৎসাহপূর্ণ অক্লান্ত আকাঙ্ক্ষার হোমসি-শিখা জ্বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দিনে দিনে অল্পে অল্পে আগোকসম্পাতপূত ধুমপুঞ্জে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে—এখন সকল দিক হইতে এক মর্শ্বস্তন হাহাকার—কেবল একটী কথাই নিস্তার প্রতিশ্রুতি করিতেছে,—“তে হি নো দিবসাগতাঃ।” এমন দিনে এমন অবস্থায়, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, আপনাদিগকে কি বলিব—কি শুনাইব,—তাঁহা সাজাইয়া গুছাইয়া স্থির করিতে পারিলাম না। কথা অপেক্ষা দীন নয়নের সজল দৃষ্টিগাতই সেবকের আবেদন অধিক পরিষ্কৃত করিয়া থাকে। আমি সেই সেবকের মতই আপনাদের সম্মুখে দণ্ডারমান হইয়া এক বাচ্ঞা আপনাদের কাছে, আর এক বাচ্ঞা জননী বঙ্গবাণীর কাছে করিতেছি। আপনাদের কাছে বাচ্ঞা এই যে,—আপনারা বঙ্গসাহিত্যকে তৃণের ভার স্রোতে তাসিয়া বাইতে দিবেন না,—ইহার গতি নির্দেশ করুন, গীতি নির্দেশ করুন, নীতি সংস্থাপন করুন। ভাষা-জননী কাছে বাচ্ঞা এই যে,—

“জননি-বঙ্গভাষা, এ জীবন চাহিনা অর্থ চাহিনা মান,
২দি তুমি নাও তোমার ও দুটী অমল-কমল চরণে স্থান।”

ঐজলধর সেন।

ঋগ্বেদের মর্শ্ববাণী

ভারতবর্ষের বেদান্তমর্শ্বন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই এই জগতের প্রকৃত 'কারণ'। এক চেতন কারণ সত্তা হইতে এই জগৎ বিকাসিত হইয়াছে। জগতের বাহ্য কিছু দেখা বাইতেছে, তৎসমন্বয়েই অন্তরালে সেই ব্রহ্ম বস্তু অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারি দ্বারা ইহার নিরঞ্জিত শাসিত ও পরিচালিত হইতেছে। তাঁগকে ছাড়িয়া, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, কোন বস্তুই এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। তেন না, সত্ত্বগুণই তাঁগারি বিকাশ। যেটা বাগার বিকাশ, সেটা তাঁগকে ছাড়িয়া থাকিবে কিরূপে? একই চৈতন্য-সত্তা। নানাবস্তুর মধ্য দিয়া, নিজেরই স্বরূপের বিকাশ করিতেছেন; আপনাই পরিচয় প্রদান করিতেছেন। সুতরাং এ সকল বস্তু, তাঁগার পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য কোন বস্তুই তাঁগার স্বরূপে পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে না; পূর্ণ পরিচয় দিতে সমর্থ নহে। কিন্তু তথাপি জগতের বস্তু মাঝেই, কিছু না কিছু, কোন না কোনরূপে,—সেই সত্তা-স্বন্দর পরমেশ্বরের পূর্ণ ঐশ্বর্যের সমাচার বহন করিয়া আনিতেছে। সুতরাং তাঁহা হইতে, কোন বস্তুকেই পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না; স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারা যায় না। ভারতের বেদান্ত এই কথাই বলিয়া দিয়াছেন। বেদান্তের বিশ্ব-বিখ্যাত ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই তত্ত্বই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন

এই তত্ত্বটি বড় প্রাচীন। ঋগ্বেদের মধ্যেই সর্বত্র এই তত্ত্বটি গূঢ়-ভাবে নিহিত রহিয়াছে। সূর্য-চন্দ্র, ইন্দ্র-বরুণ প্রভৃতি জড়বস্তুর করা ঋগ্বেদে আছে সত্য; কিন্তু জড়-বস্তু বুঝানই ঋগ্বেদের উদ্দেশ্য নহে। অতীত অবলম্বন করিয়া, ভেদের অন্তর্গতবর্তী সেই পন্থা-কারণ ব্রহ্মবস্তুর কথা নির্দেশ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভাষ্যকার গণ, নিরুক্তকারগণ ঋগ্বেদে এই উদ্দেশ্যই জানতেন। আমরা কেবল পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের সুখেই, বর্তমানে, এই কথা শুনিতে পাাইতেছি যে, ঋগ্বেদে ব্রহ্মের কথা বিশেষ কিছু নাই, ঋগ্বেদে কেবল জড়বস্তুর জ্ঞান ও বর্ণনা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের এত সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, সে কথা বাহারা ২২-শ্রী ও "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের দ্বিতীয় ২৩ পড়িয়া দেখিয়াছেন, তাহারাক জানেন। আমরা সেই গ্রন্থে, বিশেষ বহু সহকারে, ঋগ্বেদের মধ্য হইতেই বিবিধ প্রমাণ বাহ্যর করিয়া দেখায়াছি যে ঋগ্বেদ প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্মেরই জ্ঞতি প্রতিপাদক গ্রন্থ। এই সকল যুক্তি ছাড়াও, ঋগ্বেদে এ বিষয়ে আরো অনেক

প্রমাণ আছে। আমরা বর্তমান গ্রন্থে একটা নূতন প্রমাণ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। পাঠক দেখিবেন বেদান্ত যে ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার নূতন কথাগুলি সমস্তই ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য নূতন কিছুই বলেন নাই। বাহ্য ঋগ্বেদে সংক্ষেপে ছিল, তিনি তাহারি বেদান্তে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র।

শঙ্করাচার্য্য বারংবার বেদান্তে বলিয়া দিয়াছেন যে,—আমাদের এই একটা বড় দোষ যে আমরা এক বস্তুকে "অন্ত" বস্তু বলিয়া ধরিয়া লই। এই আমার নিজের কথা ধরুন। আমার নিজের একটা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ আছে একটা স্বতাব আছে। ঐ স্বরূপটা আমার প্রকৃত বস্তু—উঠাট আমার প্রকৃত আমিহ বা আত্মা। আমি সতত পরিবর্তন হইতক; আমার হাজার অবস্থা—তদনুসারে আমার ঐ স্বরূপটা ঠিকট থাকিয়া বাইবে; উঠার কো পরিবর্তন হইবে না। আমার এই অবস্থান্তর গুলি আমার এই পরিবর্তনগুলি, আমার সেই স্বরূপেরই না—তাবে পরিচয় দিয়া থাকে মাত্র। অবস্থার ভেদে, সে স্বরূপটীর ভেদ হয় না; সেই স্বরূপটা 'অন্ত' একা কিছু হইয়া উঠে না। শুইয়া থাকা, কথা বলা, হাঁটি যাওয়া, নিদ্রা দেওয়া এগুলি আমার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ভেদ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল অবস্থার মধ্যে আমি ত যে আমি, সেই আমিই রহিয়াছি। আমিই ত ক বলি, আমিই ত হাঁটিয়া যাউ, আমিই ত নিদ্রা দে। আমিই ত শুইয়া থাকি। এই সকল অবস্থান্তরের সন্দেহ, আমি কি 'অন্ত' একটা কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হই পড়িয়াছি? আমি যখন কথা বলিতেছিলাম, তখন আমি কি সেই 'কোকিলেশ্বর'ই ছিলাম না? আবার, আমি যখন শুইয়া আছি, তখনও 'ক আমি সেই 'কোকিলেশ্বর'ই নহি? অবস্থার ভেদে, প্রকৃত স্বরূপটীর ভেদ নাই। আমি 'অন্ত' একটা কোন ব্যক্তি হইয়া উঠি নাই ইহাই প্রকৃত কথা। কিন্তু আমাদের প্রকাণ্ড দোষ এ যে, আমরা ঐ স্বরূপটীর কথা একেবারে ভুলিয়া যা। এই অবস্থান্তরকেই বথাসর্ব্ব বলা দিয়া ধরিয়া ল। করা-রোগ-প্রকৃত, সুখ-দুঃখ-পীড়িত, ঐ যে মানুষ দেখিতেছি, আমরা তাহাকেই ত মানুষ বলিয়া ল করিয়া থাকি। করা-রোগ, সুখ-দুঃখ—এগুলি যে অব মাত্র, এবং এগুলির অন্তরালে যে প্রকৃত স্বরূপটা আ—তক ইহা ত আমাদের মনে উদিত হয় :

জরা রোগাদি সৰ্ব্বপ্রকার অবস্থার মধ্যে যে মানুষের বয়সগণী ঠিক থাকে; কোন অবস্থাই যে সেই বয়সগণীর কোন কতি করিতে পারে না,—একথাটা ত আমরা কখনই মনে আনি না। ইহাকেই শব্দ বলিয়াছেন—এক বস্তুকে ‘অন্ত’ বস্তু বলিয়া মনে করা। আমার বয়সগণীই প্রকৃত বস্তু; উতাকে জুলিয়া আমরা উতাকে লুপ্ত হুং, জর-রোগাদি নানা প্রকার অবস্থাগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতেছি। ইহাই আমাদের প্রকৃত ভুল। শব্দ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, এই এক বস্তুকে ‘অন্য’ বস্তু বলিয়া বোধ করা, এই যে ‘অন্য-বোধ’ ইহার নশ করিতে পারিলেই মুক্তি হইল।

কেবল যে আমরা জগতের বস্তু বা ভাবকেই ‘অন্য’ বলিয়া মনে করি তাহা নহে। আমরা ব্রহ্মকেও ‘অন্য’ বলিয়া বোধ করি। আমাদের ন্যায়, ব্রহ্মও নিজের একটা স্বতন্ত্র বস্তু আছেন; একটা ‘সত্য’ আছে। এই বস্তুপের কোন পরিবর্তন সম্ভব নহে। উঠা নিড়া একরূপ। কিন্তু যখন তাঁহা হইতে এত বিবিধ জগৎ সম্ভবিত জগৎ বিকশিত হইল, তখন আমরা—ব্রহ্মও যেন ‘অন্য’ একটা কিছু হইলেন, ইহাই মনে করিতে লাগিলাম। আমরা তাঁহার সেই বস্তুপের কথা জুলিয়া গেলাম। এই জগৎটাই আমাদের বর্ধাসকৃত হইয়া উঠিল। এ জগৎ ছাড়া আবার ব্রহ্ম শোখার—এই বোধ দৃঢ়তালভ করিল। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম—এই জগতের অন্তরালে অবস্থিত; এজগৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে; তাঁহার কোন পরিবর্তন জগৎটিতে পারে না। তাঁহার সেই বস্তুপের কথা জুলিয়া, আমরা এই জগতের স্ব-শোক, সুখ-দুঃখ, কামিনী-কাঞ্চন, ধন-জন—এই গুলি লইয়াই উন্নত হইয়া রহিয়াছি। ইহাকেই শব্দ ‘অন্ত-বোধ’ বলিয়াছেন। একবস্তুকে ‘অন্য’ বস্তু বলিয়া বোধ করা—ইহারই নাম। ব্রহ্মকে জুলিয়া, তাঁহাকে এই জগৎ বলিয়া বোধ করা, অথবা সৰ্ব্বদা কেবল এই জগতের ধন-জনাদির চিন্তা ও কথার ব্যাপ্ত থাকি,—ইহাকেই বলে, একবস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ।

যতদিন না এই জগৎ বাইবে, ততদিন মনুষ্য এই সংসারেই আবদ্ধ হইয়া রহিবে। মুক্তির পথটি এই—

এই তত্ত্বটি যে ঋগ্বেদেরই তত্ত্ব, তাহা প্রায় পাঠক পাঠিকা, নিম্নোক্ত মন্ত্রটি দেখিলেই বুঝিবেন। ঋগ্বেদের একটা মন্ত্র এই—

“ন তং বদাথ ব ইমা অজান;
‘অন্তং’ বুদ্ধ্যাকমন্তরা বভূব”।

আমরা এই মন্ত্রটির অর্থ করিয়া তলাইতেছি। বি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা হইতে এই পরিপূর্ণতা তাৎপৰ্য্য অসম্ভব, কেহই তাঁহাকে জানিতেছে না কেন জানিতেছে না? কেন তাঁহাকে কেহই জানি পাইতেছে না? ক্রটি দ্বিতীয় চরণে তাহার কাই নির্দেশ করিতেছেন।—‘অন্তং বুদ্ধ্যাক মন্তরা বভূব’ তাঁহাকে জানিতে পারিতেছে না এই জ্ঞত যে,—‘ত’ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, এই বিশ্বের অন্তরালে আশ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। কিরূপে তিনি আপনাকে লুকাইয়াছেন? ক্রটি বলিতেছেন—‘অন্তং বুদ্ধ্যাক’।—বেচেষ্টা তোমরা তাঁহাকে ‘অন্ত’ বলিয়া বোধ করিতেছ অর্থাৎ কথাটা এই যে, তোমরা সকলে তাঁহার নিব বস্তুপের কথা ভুলিয়াছ, তোমরা জুলিয়া গিয়াছ। এই বিশ্বের তিনিই কারণ। তোমরা সেই কারণ সত্ত্বকে জুলিয়া, জগতের কার্যবর্গকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছ। তিনি যেন ‘অন্ত’ কিছু হইয়া পড়িয়াছেন তোমরা। উঠাই মনে করিতেছ। তিনি যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া, একটা ‘অন্ত’ বস্তুপ—এই জগৎকে—উপস্থিত হইয়াছেন, শোখার ইহাই তাহাতেছে। তা শোখার তাঁহাকে জুলিয়া, এত জগতের বস্তু পাঠি সৰ্ব্বদা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছ। ক্রটি এইরূপ জুলিয়া কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকা দেখি পাঠিতেছেন, একতাদার্য্য বাগকে ‘অন্ত-বোধ’ বলি বাধ্য করিয়াছেন, অবিকল সেই কথা ঋগ্বেদের এ বিখ্যাত মন্ত্রটিতে উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্ব এই যে, শব্দ-তত্ত্ব মন্ত্রটি ঋগ্বেদের এই মন্ত্র হইবে প্রথম গ্রন্থে কথিত হইলেন। ইহাই তিনি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রুতঃ এই তত্ত্ব উপরেই তাঁহার বিখ্যাত মন্ত্র বাস্তবিক নিত্য স্থাপন করিয়াছেন।

কিন্তু কিরূপে এই অন্ত-বোধ করে; কিরূপে এ বস্তুকে ‘অন্ত’ বস্তু বলিয়া বোধ করা সম্ভব হয়, সেই কথা আলোচনা ব্যতীত, শব্দের মার্য্যবাদ সম্পূর্ণ হইবে না তাই আমাদের ইচ্ছা আছে যে, আগামীবারে যে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)।

ত্রিকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

বৈশাখ

কহু তুমি, দীপ্ত তুমি, কিপ্ত তুমি, কণ্ঠে নীল
চরণতলে পঞ্চশরের নিকীর্ণিত তন্মলেশ,
মস্ত্র বেগে স্তম্ভ হল বসন্ত সে মস্তশীল
—বলয় তব শুভ হ'ল গহবরেতে দ্বন্দ্ব বেশ ;
কহু তুমি কহু নয় !

বহি তব উত্তরীয়, বহি তব অঙ্গনয়।

অগ্নি বীণা বাজাও তুমি দীপক স্তরে গাঁও হে গান,
রক্ত তব তপ্ত তালে সপ্তপত সূর্য্য রান
অগ্নিনিধি পিতৃ কটা তুল শিরে অশ্রুহার,
অগ্নি গোলা নক্ষ অঁখি বক্ষ চোখে শূন্য চার ;
কহু তুমি কহু নয় !

হস্তে অলে কিপ্ত তেলে দীপ্ত মশাল বিধনয়।
মস্ত তব মর্দমেতে ত্রস্ত ধরা কম্পমান,
নিঃশ্বাসেতে বক্ষা ছুটে হৃদয়ারিমা শব্দ তার,
মূলির প্রলয়-গর্জ মেঘের ঘূর্ণি উঠে দুর্নিবার,
অন্ধকারে বনের মাঝে ঘন্য করে দৈত্য-দান,

কহু তুমি কহু নয় !

মূর্ত্ত হুমি মৃত্যুরঙ্গী, মূর্ত্তি করে সৃষ্টি নয়।

তরু অগৎ মরুর পারা শব্দহারি, কি নির্জন,
তরুছায়া কুক্ষিমাঝে পক্ষী বেন সুচ্ছলীন,
লুপ্ত বিবর কুণ্ডকোণে কুণ্ডলিত সর্পগণ,
মুমূর্ষু এ পৃথ্বী বেন শুকতালু শক্তিহীন।

কহু তুমি কহু নয় !

গণ্ডযুগেতে নিঃশেষেতে সাগর শুবেও তৃকা নয়।

কহু তুমি, দীপ্ত তুমি, কিপ্ত তুমি তরুণ,
ঈশান কোণে পুঙ্ক মেঘে বিধাণ কাঁজাও বজ্রবাদ,
বর্ষা হাতে বর্ষা ছুটে লক্ষ তব শুভচর,
বক্ষ পিরার বক্ষ 'চরে বক্ত পিরে কি আছাদ ;
কহু তুমি কহু নয় !

বিকট তব অট্টহাসি আঙন লাগে আকাশনয়।

ঐহরিদাস মৈত্রেয় ।

আমাদের কথা

চৈত্র সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, আমাদের প্রেস বিভিন্ন ষ্টীটে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ, দুই সপ্তাহকাল কাষকর্ম বন্ধ থাকায়, ঐ সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে। বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশেও তজ্জপ বিলম্ব ঘটিল, তাহার কারণ, নুতন ঠিকানায় আসিয়া, প্রেসে আমরা বিদ্যুদ্বল পাই নাই, বৃহৎ মেশিন কুলির দ্বারা হাতে খুদাইয়া একদিনের কাষ তিন দিনে সমাধা করিতে হইতেছিল। সম্প্রতি আমাদের সে কষ্টের অবসান হইয়াছে—১লা মে তারিখে আমরা বিদ্যুদ্বল প্রাপ্ত হইয়াছি—জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা নিয়মিত সময় মধ্যেই প্রকাশ করিতে পারিব।

বর্তমান সংখ্যায় সাহিত্য সম্মিলনের কয়েকটি অভিভাষণ প্রকাশিত হইল ; সেই কারণে, এ মাসে পূর্ব বিজ্ঞাপিত ও ধারাবাহিক সকলগুলি প্রবন্ধের স্থান করিতে পারিলাম না—আগামী সংখ্যায় সেগুলি আবার প্রকাশিত হইবে ; এজন্য লেখক এবং গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট আমরা কমাপ্রার্থনা করিতেছি।



ଅନ୍ଧାର ଦୁଃଖ

"Her soul is sad, her wings are weary."

—Tom Moore's

Paradise and the Peri.

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ }
১ম অংশ }

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

{ ১ম অংশ
{ ৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্যে স্মৃ ও কু

পাঠকের মনে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা আনন্দ সঞ্চার করা যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ইহা সর্ববাদিসম্মত। বাঁহারা আর্টের জন্যই আর্ট ("art for art's sake") এই মন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা সেই আনন্দ সঞ্চারকেই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন। আর বাঁহারা নীতি-বাদী, তাঁহারা আনন্দসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সুনীতির মহিমা প্রচার দ্বারা মনুষ্য সমাজের উন্নতিবিধান করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য মনে করেন। এখন সেই আনন্দ কিরূপ আনন্দ তাহা বুঝিতে হইবে।

সকল লোকের সকল বিষয়ে সমান আনন্দ হয় না ইহা সকলেই জানেন। বিভিন্ন লোকের প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের। একজন লোকের মন খাইয়া আনন্দ হয়, আর একজন লোকের দাবা খেলার আনন্দ হয়, আবার আর একজনের পুস্তক পাঠে আনন্দ হয়। পুস্তক পাঠের মধ্যেও আবার সকল লোকের সকল বই ভাল লাগে না। একজন বিজ্ঞানচর্চা করিয়া

আনন্দ পান, একজন ইতিহাস পাঠে আনন্দ পান, আবার আর একজন কাব্যাহুঙ্গীলনে আনন্দ পান। সেই কাব্যের মধ্যেও আবার ইতর-বিশেষ আছে। কেহ বাস্ট্রীকি, ভিক্টর হিউগো পড়িয়া আনন্দ পান, কেহ বা শেলি, সেক্সপীরার ডিকেন্স পড়িয়া আনন্দ পান, আবার কেহ বা রেনল্ড, জোনা পড়িয়া আনন্দ পান। এইরূপে পাঠকের কচির বিভিন্নতার জন্য সাহিত্যেরও শ্রেণীবিভাগ আছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কোন্ শ্রেণীর সাহিত্য সর্বোৎকৃষ্ট?

কাব্যের ভালমন্দ বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে তাহা দ্বারা কি প্রকার রসের সঞ্চার হয়— সেই রস (emotion) কণিক স্পর্শদ না চিরানন্দ-প্রদ, সেই রস কত গভীর—মহুয়া জীবনের উপর তাহার প্রভাব কত দূর বিস্তৃত, মানব জীবনের গুণ রহস্য সকল সীমাবদ্ধ করার সম্বন্ধে তাহা কতদূর সাহায্য করে ইত্যাদি। একজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন—

"There is no surer test of the permanent worth of a book than this—Does it move our sympathy with the deepest things of human life? If it does not, whatever other virtues it may have, it is not great literature." * অর্থাৎ কোন পুস্তক স্থায়ী সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত কিনা তাহার পরীক্ষা এই, ঐ পুস্তক মানুষ জীবনের কোনও গভীর তথ্যের প্রতি আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে কিনা? যদি তাহা না করে, তবে সে পুস্তকের অল্প বয়সে গুণ ধাক্ক, উহা উচ্চতরের সাহিত্য নহে ইহা নিশ্চয় জানিবে। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন,—

"Emotions excited by the moral qualities or by the moral suggestions of material things are higher in rank, than those excited by purely material or sensible things. More briefly, moral emotion is of higher literary value than purely sensuous or æsthetic."—অর্থাৎ নৈতিক গুণের দ্বারা, অথবা জড় বস্তু হইতে প্রাপ্ত নৈতিক গুণের ব্যঞ্জনা দ্বারা, যে সকল রসের সঞ্চার হয়, তাহা, কেবলমাত্র জড় বস্তুর দ্বারা সঞ্চারিত রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কেবল জড়-স্বাদের সৌন্দর্য্য অথবা শিল্পকলার সৌন্দর্য্য দ্বারা যে রসের সঞ্চার হয়, তাহা অপেক্ষা, উচ্চ নীতির সাহায্যে যে রস সৃষ্ট হয় তাহার মূল্য অনেক বেশী।

যদি বল, অধিকাংশ লোকের মনে আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে কি না, ইহাই সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচারের মাপকাঠি (standard) কারণ সমাজের অধিকাংশ লোকের রুচি কখনও বিকৃত না দুৰ্ব্বিত হইতে পারে না; যে কাব্য অধিকাংশ লোকের প্রিয়, তাহাকে মন্দ বলিব। কল্পণে?

সাহিত্যক্ষেত্রে একজন সবার উপস্থিত হয়, যখন একজন সাহিত্য-সম্রাটের (great master) যুগ শেষ হইয়াছে, তাহার খেঁচু দান করিবার ছিল তাহা তিনি দান করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার ভাঙার নিঃশেষিত হইয়াছে, তিনি আর নূতন কিছু দিতে পারেন না। অথচ তিনি যে সকল পাঠক পাঠিকার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার নূতন জিনিষ চায়, কারণ নিত্য নূতনের পিপাসাই হইতেছে সাহিত্য রসিকের জীবন। সেই সময়ে কোনও সাহিত্যস্রষ্টা যে কোন একটা নূতন জিনিষ লইয়া বাজারে উপস্থিত হইবেন, অমনি তাহা লইয়া একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে, সে জিনিষের ঘোষ গুণ বিচারের আর অপেক্ষা থাকিবে না। তাহার সে জিনিষটা কাচ কি কাঞ্চন তাহা বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইবে। এই কারণে উল্লিখিত সমালোচক (Winchester) লিখিয়াছেন,—

Popularity is no sure indication of permanence of a literary production. Popularity may arise from novelty. A book may be popular as it represents some contemporary movement—economic, political or religious. But "the surest recipe for popularity is an attractive mediocrity, for the mass of people bow respectfully to the great books and never read them." অর্থাৎ কোন পুস্তক সাধারণ পাঠকের প্রিয় হইলেই তাহাকে স্থায়ী সাহিত্য বলা যায় না। নূতন বলিয়া জনপ্রিয় হইতে পারে। আবার যদি কোন পুস্তক কোন অর্থ-নীতি, রাজ-নীতি বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তাৎকালিক হুজুগ লইয়া জনপ্রিয় করে তবে তাহাও জনপ্রিয় হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট মধ্যম শ্রেণীর রচনা যদি চমকপ্রদ হয়, তবে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর লাভ করে; কারণ অধিকাংশ লোকেই উচ্চতরের সাহিত্য পড়ে না, তাহাকে দূর হইতে নন্দন করে।

* Some Principles of Literary Criticism—By

এক শ্রেণীর কাব্য পাঠের আনন্দকে মনের নেশার সহিত তুলনা করা বাইতে পারে। মন খাইলে মনে একটা প্রবল ক্রুটি হয়, কামক্রোধাদি রিপু সকল উত্তেজিত হয়, এবং মানুষ কণকালের জন্য পৃথিবীর সুখ হুঃখ তুলিয়া যেন এক স্বপ্নলোকে বিচরণ করে। কোন কোন কাব্য পড়িয়াও পাঠক পাঠিকার মনে সেইরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু মস্ত পানের বে উত্তেজনা তাহা কণকালী, নেশা ছুটিয়া গেলে আর সে সকল ভাব থাকে না, তখন পূর্বের অবস্থা স্বপ্নের ভাৱ বোধ হয়। কাব্য পাঠের দ্বারা যে উত্তেজনা হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী। এমন কি যে সকল কাব্যে উচ্চাঙ্গের আর্ট (art) আছে, তাহা আমাদের হৃদয়ে তীব্র অস্থিত্তি জাগ্রত করিয়া একরূপ দাগ কাটিয়া দেয় যে, তাহা কখনও মিলাইয়া যায় না। যে কারণে মস্তপান স্থগিত, যে সকল কাব্য মস্তপানের ভাৱ কু-প্রবৃত্তির উত্তেজনা করে তাহারাও সেই কারণে স্থগার বস্তু সম্বন্ধে নাই।

অধিকাংশ কাব্যই নর-নারীর প্রেম অবলম্বনে রচিত। কারণ এক মতে প্রেমই মানব-জীবনের গভীরতম অস্থিত্তি ("deepest thing of human life") এবং সেই গভীরতম অস্থিত্তির প্রতি পাঠক পাঠিকার মনে সহায়ত্ব জাগাইতে পারিলেই কাব্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু স্থল বিশেষে সেই প্রেম স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে, কখনও আবার তাহা ঘোর নারকীয় ভাবে পরিণত হয়। যে কাব্য পাঠক পাঠিকার মনে স্বর্গের সুখের বিস্তার করিয়া আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে তাহাই শ্রেষ্ঠ, আবার যে কাব্য নারকীয় প্রেমের অস্থিত্তি জাগাইয়া তাহাকে নরকের দিকে টানিয়া নানার তাহাকে অবশ্যই নিকৃষ্ট বলিতে হইবে।

বর্তমান সময়ে ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, নর-নারীর বিবাহ বাটত পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম অপেক্ষা ব্যক্তিচারকে কাব্যে উচ্চ স্থান দিতেছেন। তাঁহাদের দেখাদেখি, আমাদের বাঙ্গলা ঔপন্যাসেও এইরূপ ব্যক্তি-চারের ছড়াছড়ি হইতেছে। সংগ্রতি বিখ্যাত ইংরাজ

ঔপন্যাসিক মিঃ গিলবার্ট ক্রাফো তাঁহার এক বক্তৃতায় এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদিগকে . লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"Those writers seem to think that the human animal is only an animal; and that the love of a man for a woman or of a woman for a man is on exactly the same level as the loves of the cocks and the hens, the bulls and the cows, or the other beasts of the field.

"These younger novelists are not content to follow in the paths of the great masters. They are not content with the fine, pure love motives of a Dickens, a Scott, or a Thackeray. Instead they prefer to grovel in the mire of their own mean little imagination, to impute the worst motives rather than the best, to depict all that is vile in human nature instead of all that is beautiful.

"That is not the way in which great literature has been made in the past, nor is it the way in which great literature will be made in future. The mission of a novelist is not to cast down humanity, but to uplift it. And how can a novelist uplift humanity except by showing us that which is best in humanity—love?

"For love is not, as the Barnyard school of novelists would have us believe—mere foolish sentimentality, any more than it is mere physical passion. On the contrary, man's love for woman and woman's love for man, or in other words, the

right of natural mate selection, is mankind's highest natural attribute—the one instinct which separates him from the beast.” *

অর্থাৎ—এই সকল লেখক বোধ হয় মনে ভাবেন, মানুষ কেবলই পশু বিশেষ, নরনারীর প্রেম কুকুট কুকুটার, বৎ-গাতীর অথবা অন্ত প্রকার জন্তর জী-পুষ্করের মধ্যে ভালবাসার সমজাতীয় একটা মনোবৃত্তি তিন্ন আর কিছুই নহে। এই সকল নব্য তত্ত্বের উপভাস লেখক বড় বড় সাহিত্য-শিল্পীকে অহুসরণ করিতে চাহেন না। ইংলান্ড ডিকেন্স, স্কট বা থ্যাচারের সৃষ্ট সুন্দর পবিত্র প্রেম নইরা সৃষ্ট নহেন। তৎ পরিবর্তে ইংলান্ড ভালবাসেন নিজ নিজ ক্ষুদ্র নীচ কল্পনা-পক্ষে নিমগ্ন থাকিতে—কার্য্যের উচ্চাভিপ্রাণের পরিবর্তে নীচোন্নতা আরোপ করিতে, মানবচরিত্রে বাহা কিছু সুন্দর তাহার পরিবর্তে বাহা কিছু কদর্য্য তাহা অঙ্কিত করিতে। এই প্রণালীতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য অতীত যুগে সৃষ্ট হয় নাই, এবং এই প্রণালীতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য অবিস্মৃত কালোৎসৃষ্ট হইবে না। উপভাস লেখকের জীবনের ব্রত হইতেছে, মানব জাতিকে নরকে নিক্ষেপ করা নহে, স্বর্গে উন্নয়ন করা। কিন্তু যে উপভাস লেখক মানব জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু যে প্রেম তাহা আমাদের কাছে দেখাইতে পারেন না, মানবজাতিকে তিনি কি প্রকারে স্বর্গে উন্নত করিতে পারিবেন? এই প্রশ্নের উপভাসলেখক প্রেমকে আমাদের নিকট যে একটা পাগলের খেয়াল বলিয়া বুঝাইতে যান, বস্তুতঃ প্রেম তাহা নহে, আবার প্রেম কেবল কামজ মোহও নহে। পক্ষান্তরে, নরের নারীর প্রতি অথবা নারীর নরের প্রতি প্রেম—অথবা অন্ত ভাবার মানুষের জীবন-সঙ্গী বা জীবন-সঙ্গিনী নির্বাচন করিবার স্বাভাবিক অধিকার

হইতেছে মনুষ্য জাতির উচ্চতম স্বভাবগত গুণ—এই একটি গুণের জন্তই মানুষ পশু হইতে পৃথক প্রাণী।

মিঃ গিলবার্ট ক্রাফোর্ড ইংরেজ উপভাস লেখকদিগের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের বাঙ্গালী নকল-নবিশদিগের সম্বন্ধে সে কথা বেশ খাটে। তাঁহারা প্রেমের পাশবিক ভাবকে উপভাসের আখ্যান বস্ত করিয়া সাহিত্যকে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সমাজকে কি প্রকারে কলুষিত করিতেছেন, তাহা আমার “সাহিত্যের বাহ্যরক্ষা” পুস্তকে বিবৃত করিয়াছি। সংগ্রহিত প্রেমের মনবিদী ভগিনী শ্রীমতী সরলা দেবী আমার সেই পুস্তকের সমালোচনা এসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

“সত্য কথা এই—‘সম্ভার প্রেম’ ও ‘বিধবার প্রেম’ অর্থাৎ দুইয়েরই ‘পরকীর প্রেম’ এদেশে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। পুরাকালে পুরাতন বিধার চলিত, নূতনকালে নব্যবিধার চলিতেছে—এই ‘প্রেম’ বস্তু হিন্দুর ঘরে ঘরে, সিন্দূকে প্যাটারার লুকান। উপভাসে কাব্যে শুধু “চাতরে হাঁড়ি ভালা” হইতেছে। কবিরা তাঁহাদের পাপকলুষিত স্বপ্ন হইতে পাপভিত্ত উত্ত বন করিয়া সমাজকে কলুষিত করিতে বলেন নাই, কিন্তু যে সকল পাপ সমাজের বর্ত্তমান বিকৃত অবস্থার অবশ্যস্বাভাবী তাহার চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া সমাজ সংস্কারের ইঙ্গিত করিতেছেন।” *

শ্রদ্ধাপদ ভগিনী বাহাদিগের পক্ষে ত্রিক্ (ওকা-লতী) গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা পড়িয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধর্ম্মবাদ দিবেন না। প্রথমতঃ তাঁহারা আর্টের জন্ত আর্টের সেবা করেন। সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁহারা উপভাস লিখিয়াছেন, একথা বলিলে তাঁহাদিগকে যে দ্বন্দ্বমাত্রার সম্মান করা হইল—অর্থাৎ তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে গালি দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় কথা, তাঁহারা “চাতরে হাঁড়ি ভাঙিতেছেন”—এ কথাটাও তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসাত্মক নহে। বিষ্ঠার হাঁড়ি যদি কেহ হাটে ভাঙে, পাঁচ আইন অঙ্গুণারে

সিন্ধুই সে দণ্ডনীয় হয়। আর সেই মরলা সফ-
করিবার তত্ত্ব তখন হেলথ-অফিসার বা স্পিনিটারি
ইন্স্পেক্টরের তলব পড়ে। (এই দীন লেখকও
সেই কার্যে ব্রতী হওয়ার খবরের কাগজে
তাঁহার নাম হইয়াছিল “সাহিত্যের হেলথ অফিসার”;
ঐশ্বরী মরলা দেবীও এখন তাঁহাকে “সেনিটারি
ইন্স্পেক্টার” নামে অভিহিত করিয়াছেন।) ধরিলাম
যেন পরকীর প্রেম বস্তু “হিন্দুর ঘরে ঘরে
সিন্দুক প্যাটারার লুকান আছে”—কিন্তু একজন
উপভাস লেখক সেই অবস্থ প্রবৃত্তিকে যদি তাঁহার
উপভাসের আখ্যানবস্তু করিয়া তোলেন, তবে তাহা
যদি মানব সমাজকে বর্ণে উন্নত করা হইবে, না তাহা
যদি তাহাকে নরকে নিপাতিত করা হইবে?—“And
how can a novelist uplift humanity except
by showing us that which is best in huma-
nity—love?”

আমাদের নব্যচরিত্রের ঔপভাসিকগণ যে পরকীর প্রেম
লইয়া কারবার করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর
ঘরে ঘরে সিন্দুক প্যাটারার লুকান নাই—তাহা যে
দেশী নহে, বিলাতী, আমি তাহা অস্ত্র আর একটি
প্রবন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।* তাঁহারা সে প্রবন্ধ
পড়েন নাই, তাঁহাদের সুবিধার লজ্জা নিয়ে তাহা হইতে
কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ
করিব :—

“কিন্তু আমাদের ঔপভাসিকগণ, সমাজে বাহা আছে,
তাহা লইয়া সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা চাহেন বিলাতী
প্রেম (love) আমাদের সমাজে আমদানী করিতে।
এই লজ্জা তাঁহারা ঘাদশ বা জ্যোদশ বৎসরবয়স্ক বালিকার
পূর্বরূপ ঘটান, অথবা সধবা বিধবা বা বারবনিতাকে
উপভাসের মধ্যে টানিয়া আনেন। সধবা, বিধবা বা
বারবনিতা পরকীর প্রেমে আসক্ত হইতে পারে, তাহা
অসম্ভব নহে; সেরূপ ঘটনা সমাজে যে না ঘটে, এরূপও

নহে। কিন্তু তাঁহারা যেকোন প্রেমে “পডে” তাঁহার
নাম “পীরিত”। আমাদের ঔপভাসিকগণ সেই
“পীরিত”কে বিলাতী গোষাক পরাইয়া সাহিত্যে
চালাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের সেই প্রেমচিহ্ন সমাজের
প্রকৃত চিহ্ন নহে, তাহা সমাজের পক্ষে অসত্য।.....
এই স্থানে কেহ হয়ত বলিবেন, ইঁহারা ত সাহিত্যের
উৎকর্ষ সাধনই করিতেছেন। ইঁহাদের হাতে পড়িয়া
যদি সেই স্থল গ্রন্থ “পীরিত” refined হইয়া সত্য-ভাব্য
বেশ ধারণ করে, তবে সে ত ভাল কথা; সাহিত্যে
কুরুতির পরিবর্তে ইঁহারা সুরুতির আমদানী করিতে-
ছেন। আমি বলি—আপনি তবে বিলাতী প্রেমকে
চিনিতে পারেন নাই। বিলাতী প্রেম কেবল refined
পীরিত নহে, ইঁহার নিজস্ব মূর্তিও আছে। এই বিলাতী
প্রেম বেশ-কাল-পাজের অপেক্ষা রাখে না, বৃষ্টির রাস
মান্নে না, দ্রষ্ট অশ্বের স্তায় আরোহীকে আরোই পগারে
কেলিয়া দেয়। উধাকে স্বাধীন প্রেম বলিতে চাহ
ত বলিতে পার, কিন্তু উহার বেচ্ছাচারিতাই বেশী।
আর উধা বড়ই বিশ্বাসঘাতক, শনির স্তায় অতর্কিত
ভাবে কাহার শরীরে কখন প্রবেশ করিয়া তাঁহার
বাঁড়ে চাপিয়া বলিবে, তাঁহার হিরতা নাই। সুতরাং
এরূপ প্রেম সত্যভাব্য বেশধারী হইলেও ইঁহাকে সাহিত্যে
আমদানী করা নিরাপদ নহে। তবে সমাজে যদি ইঁহা
পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকিত, তবে কোন কথা ছিল
না। আমাদের ঔপভাসিকগণ প্রেমের নীলা-বৈচিত্র্য
দেখাইবার লজ্জা ইঁহাকে বাহির হইতে হাত ধরিয়া
টানিয়া আনিয়া ঘরে বসাইতেছেন। * * *

“আমাদের কোন্ উপভাস লেখক মানব জীবনের
ও প্রকৃতির করুণা নুতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন?
আমি ত দেখিতে পাই, বঙ্গ-সাহিত্যের উপভাস লেখক-
দিগের মধ্যে একজনও সেই উচ্চতম আদর্শ লাভ
করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কারণ, আমরা বাহা
লিখিতেছি, তাঁহার অধিকাংশই পান্ডিত্য উপভাস
লেখকগণের অসুকরণের অসুকরণ, অসুবাণের অসুবাণ।
তাঁহাতে এ দেশীয় নর-নারীর জীবনের প্রকৃত রহস্য

* “উপভাসে প্রেমচিহ্ন”—মাসিক বহুবলী, চৈত্র ১৩২১।

উদ্ঘাটনের চেষ্টা করই দেখা যায়। এ দেশীয় নর-নারী বিলাতী আদর্শে গঠিত হইলে ভবিষ্যতে বেকর প্রেমের খেলা খেলিবে, বেকর courtship, coquetry, flirtation, jilting ইত্যাদি করিবে, তাহারই পূর্বাভাস দেখা যায়। প্রবন্ধ লেখক বলেন, আনাতোল ফ্রান্স জোনার (zola) গ্রন্থসমালোচনা করিয়া লিখির-ছেন—“জোনা করানী নর-নারীর জীবন যে ভাবে দেখাইয়াছেন ও চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অসত্য এবং অসত্য বলিয়াই তাহা দুষ্ট।” আমিও বলি,

আমাদের তথাকথিত realistic মতেল লেখকগণ বন্দীর সমাজের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তাহা অসত্য এবং সেই কারণেই তাহা সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে দুঃখী। সমাজ ৩কার খাতিরে, সমাজের কোনও সত্যকে উলঙ্ঘন করিয়া দেখাইলে আমরা তাহাকে তর করি না,—আমরা সত্যের নামে এই অসত্যের প্রচার বন্ধ তর করি।”

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ভুবন ভুলানো হাসি

অলস ও'লোনো, অপটু বলো না—নই ত বিলাসী বাবু।
একটুকু শীতে বৃষ্টি বা তাতে হইনা কখনো কাবু।

খেটে খেতে পারি উন্নয় অস্ত,
কাষ দেখে কতু হইনা জস্ত,
প্রাপ্তি না জানি, ক্রান্তি না মানি খেটে বাব বারমাসই,
ঘরে কিরে যদি হেরিবারে পাই ভুবন ভুলানো হাসি।

মেজাজের দোষ দিওনা মিথো, রুক্ষ নয় তা কতু।
অবনত শিরে সকলি সহিব যেমনি হউন প্রভু।

উচ্ছৃঙ্খলের জুড়টি শালন,
করিতে পারিব মাথার ভূষণ,
জীর্ণ করিতে পারিব সকল লাজ লাঞ্ছনা রাশি,
ঘরে কিরে যদি পাই দেখিবারে জীবন জুড়ানো হাসি।

মর্যাদা জ্ঞান নাহি মোর অন্ত, নই আমি অভিমানী,
সব কাষে আমি গণি বিতুচ্ছ, শ্রমেয়ে ধর্ম্ম জানি।

হের অমৃত বলি কোন কাষে
দেবাক করিয়া ত্যজিব না লাজে,

হতে পারি আমি মুটে কি ম'ল্ল, অথবা মাঠের চাষী,
ঘরে কিরে যদি হেরিবারে পাই নয়ন ভুলানো হাসি।

বিশ্রাম নাই বলিয়া কখনো করিব না হা হতাশ,
কতি নাই, মোর হোকনা জীবন সশ্রম কারাবাস।

মিলে না যোগ্য পারিশ্রমিক
বলিয়া জীবনে দিবনাক বিক্
উন্নতি নাই বলিয়া কখন হব না পক্ষযতাবী,
ঘরে কিরে যদি দেখিবারে পাই কুল জুটানো হাসি।

বিরহ আমায়ে অপটু করেছে, অলস করেছে এত,
কারো কথা হার সছেনাক গার, মেজাজ হয়েছে তেঁত।

বিরহ ঘটায় জুড়টি পরমান
আনার শ্রান্তি বত অবলাদ—
কাষে পাকিলতি হবে না আমার বত কর করবাসই
ঘরে কিরে যদি হেরিবারে পাই নিখিল ভুলানো হাসি।

শ্রীকালিদাস দাস।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বাঙ্গালী

আজকাল বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বাহির করিতে হইলে ঐক্যবদ্ধগণের গবেষণার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন আমাদের এই দেশে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। সেই সকল মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের পদতলে বসিয়া শত সহস্র ছাত্র শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিত। তাঁহাদের বিদ্যা ও জীবনের পবিত্রতার খ্যাতি দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। সুদূর চীন, তিব্বত প্রভৃতি রাজ্য হইতে ধর্ম ও জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রগণ তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আগমন করিত। তাহারা আবার কৃতবিত্ত হইয়া স্বদেশে বাইরা এই সকল গুরু বশোভীর্ণ করিত। তাহা শুনিয়া সেখানকার রাজারা ঐ বিশ্ববিখ্যাতকীর্তি পণ্ডিতদিগকে নিজ নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া ধর্ম সংস্কার ও প্রচার করাইবার জন্য, তাঁহাদের আহ্বান করিতে লোক প্রেরণ করিতেন। কোন পণ্ডিত বা বাইতেন, আর কেহ বা এত ব্যস্ত থাকিতেন যে বিদেশ গমনের সময় পাইতেন না— তবে উপদেশাদি প্রেরণ করিতেন।

সাহেবই হউন আর বাঙ্গালীই হউন, আমাদের দেশের বাঁহারা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই এই সকল পণ্ডিতদের কাহিনী সত্যতারে বর্ণনা করেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি কেবল মাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিই নিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালার Cultural history বা সভ্যতার ইতিহাস জানিতে হইলে, শিক্ষা, ধর্ম ও পণ্ডিতমণ্ডলীর বিবরণ সংগ্রহ করা যে কতদূর প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, রাজ্য শব্দে সঘনো বাঁহারা সম্পূর্ণ এক অধার লেখেন, তাঁহারা ঐ নৃপতিরই সমন্বিত, বৌদ্ধ ভারতের ভবানীভূত গুরু বাঙ্গালী শীলভক্ত সঘনো হই

চারি পংক্তি লেখাও স্থান ও সময়ের অপব্যয় মনে করেন। পাল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস সঘনো তিন চার খানি প্রমাণ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; কিন্তু সেই সময়ের মহাপণ্ডিত শাস্ত্র রক্ষিত ও অতীশ দীপকর শ্রীজ্ঞান সঘনো হই তিনটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও এ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। এক মাত্র মহামোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ব্যতীত অপর কাহারও দৃষ্টি এ বিষয়ে এপর্যন্ত পতিত হয় নাই।

আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ষেড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালী যে কেবল মাত্র বৌদ্ধধর্মের অনুসরণ করিত তাহা নহে, সে চীন, তিব্বত, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি সুদূর দেশে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ ধন ধাত্র, বিদ্যা পাণ্ডিত্যে ভারতের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। যে যুগে কর্ণসুবর্ণের বীর নৃপতি শব্দ বজ্রের বাহিরেও রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস পাটয়াছিলেন, সেই যুগেই বাঙ্গালীর আদি গৌরব শীলভক্ত জীবিত ছিলেন। শীলভক্ত সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সে তিনি দত্তভক্ত, দত্তদেব বা দত্তসেন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি অল্পবয়সেই নানা বিদ্যা অর্জন করিয়া সুশিক্ষিত হইলেন। কিন্তু 'হেতু ত্রিভু', শব্দ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, অর্থর্ববেদ বা সাম্ব্যাদর্শন তাঁহার মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত করিতে পারে নাই। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য নানান্থা বিশ্ববিভাগে উপস্থিত হইলেন। ওখায় তিনি "শব্দ বিদ্যা সম্যক শাস্ত্র" গ্রন্থেতা ধর্মশালার নিকট ধর্মোপদেশ লাভ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। পরে তিনি তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা বলে বহুগণকে

বুঝ করিয়া ও সঙ্কল্পের শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হইলেন।

চৈনিক পরিত্রাণক হইলেন সাং এই বাঙ্গালী গুরু পদতলে বলিয়া ধর্ম সঙ্কীর তাঁহার বাবতীর সমস্তার সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন। জ্ঞানের একমিষ্ট সাধক হইলেন সাং বৌদ্ধ ধর্মের বিষয়ে সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবেন বলিয়াই, কত দেশ কত নদী কত পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পথে কান্দীয়ে পৌছিয়াই তিনি তাঁহার মনের সন্মোহ নিটাইবার জন্য যে পণ্ডিতদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সমস্তার সমাধান করিয়া দিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী আচার্য্য শীলভদ্র অতি সরল ভাবে তাঁহাকে ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। হইলেন সাং ১০৩ বৎসর বয়সে ঐ অসীম-জীর্ণ পণ্ডিতকুলচূড়ামণির নিকট ৫ বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করিলেন। যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য। তাঁহাদের উভয়েরই মনের উদারতার কথা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে যুগের লোকেরা—বিশেষতঃ খৃষ্টীয় ধর্মের নেতৃবৃন্দ, নিজের ধর্মের শাস্ত্র ব্যতীত, অন্য ধর্মের গ্রন্থাদি আলোচনা করাকে পাপ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু শীলভদ্র নিজে মহাবান মতাবলম্বী হইয়াও, বৌদ্ধধর্মের অন্ত্যস্ত শাখার শাস্ত্র বিভাগ সুনিপুণ ছিলেন, এবং হিন্দুধর্মের সমগ্র বিভাগ তিনি আরও করিয়াছিলেন। এখন এই বিদেশী ছাত্রটির নিকট তাঁহার চিরজীবনের সাধনার ধন অর্পণ করিতে তিনি বিন্দুবাক্য সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ছেলে—বৌদ্ধই হউন আর বাই হউন—তিনি যে চীনদেশের এক ব্যক্তিকে বেদ পড়াইলেন, ইহা তাঁহার মনের কম উদারতা ও তেজস্বিতার পরিচায়ক নহে। হইলেন সাং আবার পাণিনির ব্যাকরণ ও শীলভদ্রের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। কলতঃ তাঁহার উদ্বেগ ছিল ভারতের সমগ্র cultureকে আরও করিয়া চীনদেশে তাঁহার প্রচার করা। তিনি কেবল মাত্র বৌদ্ধ ধর্মের গভীর মধ্যে নিজের মনকে আবদ্ধ

করিয়া রাখেন নাই। তাঁহার নিজের লিখিত স্রবণ বৃত্তান্তে ও তদীয় একজন ছাত্র লিখিত জীবনচরিতে শীলভদ্রের গুণ ও বিভাবতার কথা পড়িতে পড়িতে বাঙ্গালীর গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিবার জন্য শীলভদ্রের আগ্রহ ছিল। কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মা অসং হিন্দু হইলেও অশেষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন সাংকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজরাজ্যে একবার লইয়া বাইতে চাহিয়াছিলেন। হইলেন সাং বিধর্ম্মীর রাজ্যে বাইতে বড় ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব শীলভদ্র তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, বৌদ্ধধর্মের প্রচারকগণের সেই-খানেই সর্বাগ্রে গমন করা উচিত। হইলেন সাং গুরুর আদেশে কামরূপ গিয়াছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সেখানে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

নালন্দার সকল পণ্ডিতই কিছু আর শীলভদ্রের মত উদার প্রকৃতির ছিলেন না। হইলেন সাংয়ের পাণ্ডিত্য প্রতিতাকে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে ভীষ্মা করিতেন। তাই বখন সেই চীনদেশীয় পরিত্রাণক আবার চীনে ফিরিয়া বাইতে চাহিলেন, তখন সকলেই তাহাতে আপত্তি করিলেন। মিথিলা হইতে যে জন্য নব্য ভারতের গ্রন্থ বাহিরে আনিতে দেওয়া হইত না, ঠিক সেই জন্যই হইলেন সাংকে ভারতীয় বিভাগ লইয়া বিদেশে বাইতে দিতে পণ্ডিতগণ আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী শীলভদ্রের ইচ্ছা ছিল বৌদ্ধ ধর্মকে দেশদেশান্তরে প্রচার করা। তাই তিনি তাঁহা-দিগকে বলিলেন যে হইলেন সাং যদি দেশে ফিরিয়া যান তবে চীনের জ্ঞান সুবিস্তৃত দেশে বৌদ্ধধর্মের বর্ধাণ জ্ঞান অচিরকাল মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। এই কথার সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। হইলেন সাংও দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া শীলভদ্রের আশা পূর্ণ করিলেন। চীনের বৌদ্ধগণের মধ্যে তিনি এমন এক নবজীবনের সঞ্চার করিলেন যে তাহাতে তাঁহারা অহুপ্রাণিত

হইয়া জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে বুদ্ধদেবের পবিত্র ধর্ম প্রচার করিবার জন্ত গমন করেন। বৌদ্ধধর্মের এক্ষণ প্রচারের সুখে একজন বাঙ্গালীর কৃতিত্ব রহিয়াছে, এই কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে।

ইহার পর, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে আবার আমরা বাঙ্গালীর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের বিবরণ অবগত হই। তিব্বতের রাজা Thi-srong-dentsan ছইজন বাঙ্গালী পণ্ডিতকে তাঁহার রাজ্যে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। তাঁহারাই সেখানে প্রথম বৌদ্ধধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মরূপে স্থাপন করেন। এই দুইজন বাঙ্গালীর মধ্যে একজন ছিলেন গৌড় নিবাসী মহাপণ্ডিত শাস্ত্র রক্ষিত। শীলভদ্রের ভ্রাতা তিনিও নাগন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভারত-বর্ষের সেই শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ক্সাপেক্ষা গৌরবের আসন বাঙ্গালী পণ্ডিতদের আশ্রিতে বহুবার আসিয়াছে। আর আর যে বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী অধ্যাপকেরা আহৃত হইয়া বিজ্ঞা দান করিতেছেন, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসে নূতন নহে। বাহা হউক, শাস্ত্র রক্ষিতকে তিব্বতের অধ্বাঙ্গিস্বন্দ মহাসম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তাঁহাকে তাহার আচার্য্য বোধিসত্ত্ব নামে সম্বোধন করিত। শাস্ত্ররক্ষিত বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের নৈ'তক চরিত্র সংশোধনের জন্ত ও তাহাদের জীবনে সংযম শিক্ষা দিবার জন্ত নিরমাদি প্রণয়ন করেন।

রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহোদয় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্থলিখিত "Indian Pandits in the Land of snow" নামক গ্রন্থে যেমন উল্লিখিত বিবরণটি প্রদান করিয়াছেন, তেমন বাঙ্গালীর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের আর একটা সংবাদ দিয়াছেন—"In the 9th century many learned pandits from Bengal were invited to Tibet by King Ralpachan and employed by him in

translating Sanskrit works into Tibetan." অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা রাল্পাচান বুদ্ধদেশ হইতে বহুপণ্ডিত আহ্বান করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষা হইতে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

তিব্বতে বাঙ্গালীরা যে কেবল বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে। যখন সে দেশের বৌদ্ধধর্ম বীভৎস বদাচারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখনও একজন বাঙ্গালী হইয়া তাহার সংস্কার সাধন করিয়া আসিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালীর নাম অতীশ দীপকর জীজ্ঞান। Pag som son-sang নামক তিব্বতীয় বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্মের নবসংস্কারে লা-চেন, লো-চেন, রাজা বোশীহড্ ও অতীশ প্রধান ছিলেন। কিন্তু ইহাদের চারিজনদের মধ্যে আবার বুদ্ধদেশবাণী অতীশই খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতেন। অতীশ ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১০৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের বিক্রমদীপুর বা বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণজী, মাতার নাম প্রভাবতী। বাল্যকালে তাঁহার অতীশকে চন্দ্রগর্ভ নামপ্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে জেতারি নামক পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হীনযান প্রাবকের তিনটি পিটক, বৈশেষিক দর্শন, মহাযান মতের ত্রিপিটক, মাধ্যমিক মতবাদের দর্শন শাস্ত্র, যোগাচার্য্য মতবাদ ও চারি প্রকার তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎকালে দীর্ঘজীবী পরাভূত করিতে না পারিলে পাণ্ডিত্যের সম্যক প্রতিষ্ঠা হইত না। অতীশ একজন দীর্ঘজীবীকেও পরাভূত করেন। কিন্তু ধর্মের জন্ত যাহাদের অন্তর ব্যাকুল হয়, তাহার। শুক বিজ্ঞার তার বহন করিয়া বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া শাস্ত্র লাভ করিতে পারেন না। অতীশ ধর্মলাভের আকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণাঙ্গির রাজল গুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাহুল ও শুভ তাঁহাকে জিনিস প্রদান করিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি ওমস্তপুত্রীর বিহারে তিব্বতীয় গ্রহণ করেন। পরে ৩১ বৎসর বয়সের কালে শ্রেষ্ঠ তিব্বত আসনে উন্নীত হন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অন্তরের ধর্মপিপাসা মিটিল না। ভারতবর্ষের মধ্যে কেহই এই নবীন সাধকের সমস্ত সমাধান করিতে পারিলেন না; তাই তিনি সুবর্ণধীপে গমন করিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন, এই সুবর্ণধীপ বর্মাদেশেরই নানান্তর। সুবর্ণধীপে তিনি অশেষ বিভালাত করিয়া বহন দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন পালাস'ব্রাহ্মণের অধীশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে বিক্রমশিলা মহাবিহারের অধাঙ্ক হইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন।

অতীশ রাজাপুরোধক্রমে সেই মহাসম্মানজনক পদ গ্রহণ করিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে বহু ছাত্র আসিয়া অতীশের নিকট শিক্ষালাভ করিতেন। এইরূপ একদল তিব্বতীয় ছাত্র অতীশের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া দেশে বাইরা তাঁহার গুণ কীর্তন করিলেন। এদিকে তিব্বতের রাজা বোশীংড বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করিবার জন্ত কি উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি ভারত-প্রত্যাপ্ত ছাত্রগণের মুখে অতীশের কীর্তিগাহিনী শুনিয়া, তাঁহাকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথমবারে যে চীনদেশীয় পরি-ব্রাজক দল তাঁহাকে লইতে আসিল, তাহারা শুনিয়া যে, অতীশকে সাধারণতঃ দ্বিতীয় সর্বজ্ঞ বলা হইরা থাকে। তাঁহাকে লইয়া বাইবার প্রস্তাবকে লোকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবে—তিনি কি কখনও সম্ভারাম ছাড়িয়া বিদেশে যান? এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিমুক্ত হইরা দেশে চলিয়া যান। দ্বিতীয় বারেও রাজা বহু অর্থ দিয়া Royatson-gru-nagor নেতৃত্বে একদল ধর্ম প্রচারক অতীশকে আনিবার জন্ত প্রেরণ করেন। তাঁহারা আসিয়া অতীশকে বহু অর্থ উপঢৌকন দিয়া নির্দেশের প্রস্তাব বিনীতভাবে জ্ঞাপন করিলেন।

করিয়া পবিত্র ধর্মজীবন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কি আর সামান্য অর্থ লোভে মুগ্ধ হইবেন? অতীশ তাঁহা-দিগকে সমস্ত অর্থ ফেরত দিলেন, কিছুই গ্রহণ করিলেন না; আর, বেশ ছাড়িয়া বাইতেও অস্বীকার করিলেন। ইহাতে তাহাদের নেতা কানিয়া ফেলিলেন। তখন অতীশ তাঁহাকে এই বলিয়া সাধনা দিলেন যে, তাঁহাদিগকে অপমান করিবার জন্ত তিনি অর্থ গ্রহণে অন্বীকৃত হইবেন নাই; তবে তিনি তিব্বতে বাইতে পারিবেন না।

ইহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে পর, রাজা বোশীংড পুনরায় অতীশকে আনিবার জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের সংকল্প অটল, অটল—অধাবসার অনন্তসাধারণ। কিন্তু এবার বখন তিনি কোন সুবর্ণধিনি হইতে বর্ণ আহরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শত্রু এক যাত্রা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। শত্রুর কায়াগারে রাজা বোশীংড প্রাণ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু মৃত্যুর শেষ নিশ্বাসের সহিত তাঁহার ব্রাহ্মপুত্রকে অনুরোধ করিয়া গেলেন যে, অতীশকে যেন পুনরায় তাঁহার নাম করিয়া আহ্বান করা হে—যেমন করিয়া হউক, অতীশের দ্বারা যেন তিব্বতীয় ধর্মের সংস্কার করা হয়।

এবারে Nag-tcho নামে একজন তিব্বতীয় পণ্ডিত অতীশকে লইতে আসিলেন। ইনি একখানি গ্রন্থে অতীশের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেখানিকেই উপলব্ধি করিয়া উল্লিখিত ও নিম্ন লিখিত বিবরণ প্রস্তুত হইল। Nag-tcho বিক্রমশিলা মহাবিহারে উপস্থিত হইয়া তিব্বতীয়গণের জন্ত যে ভাগ নির্দিষ্ট ছিল, তাহাতে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা বহুদিন এক পণ্ডিতের সহিত বৃত্তি করিয়া স্থির করিলেন যে বুদ্ধ হবির আচার্য্য রত্নাকরের মনোভূতি বর্ষ Nag cho সাধন করিতে পারেন, তবে তাঁহার দ্বারা অতীশকে তিব্বত গমনের জন্ত আদেশ করা হইতে পারে। Nag-tcho রত্নাকরের শিষ্য গ্রহণ করিয়া বহুদিন পরে তাঁহাকে মনের অতি-

লাব জ্ঞাপন করিলেন। রত্নাকর অতীশকে তিব্বত বাইতে আদেশ দিলেন। অতীশকে ঐ সময়ে পুনরায় Nag tobo ত্রুচর অর্থ উপচোকন দিলেন—অতীশ পূর্ববারের ভার এবারও তাহার এক কর্ণধিক গ্রহণ করিলেন না। তিনি গুরুর আদেশ ও তিব্বতবাসীদের একান্ত আগ্রহ অবহেলা করিতে না পারিয়া, এবার তথার গমন করিতে বীকৃত হইলেন। তবে তখন তাঁহার হস্তে বহু বিহারের ভার ছিল বলিয়া, তৎক্ষণাৎই বাইতে পারিলেন না। কিছু বিলম্ব হইল।

অতীশকে বেক্স সমারোহের সহিত তিব্বতবাসিগণ আহ্বান করিয়া লইয়াছিল, তাহারও উদ্দেশ্য চিত্র Nag-toho এবং—তাঁহার গ্রন্থের ভাব লইয়া লিখিত “Indian Pandits in the Land of snow” নামক গ্রন্থে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

তিব্বতের রাজা অতীশকে কোতোলী বা প্রত্ন বন্য বলিয়া সম্বোধন করিতেন—সম্ভবতঃ বদাচ নাম গ্রহণ করিতেন না। অতীশ পঞ্চদশ বর্ষ কাল তিব্বতে বাস করিয়া সেখানকার ধর্মকে সুসংস্কৃত করিলেন। সেখানে আত্মার নুতন সংস্কার করিলেন ও লোকের নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের চেষ্টা করিলেন। তিনি তিব্বতের যে সকল বিহারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, আজও তিব্বত বাসীরা, তাঁহার স্মৃতি সর্বদা সেই সকল স্থানে রক্ষা করিয়াছে। তিব্বতীর লামাধর্মের গুরু ব্রাহ্মটন তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি তিব্বতে বহু গ্রন্থ রচনা করেন—তন্মধ্যে “বোধি পথ প্রদীপের” আলোকে আজও তথাকার লোক ধর্ম পথ নিরূপণ করিতেছে। তাঁহার ধর্ম মতের প্রভাব সর্বদা পণ্ডিতগণের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা যায়। Sir Charles Eliot তাঁহার নব প্রকাশিত Hinduism and Buddhism গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

“It may seem a jest to call the teaching of Atisa a reform, for he professed the Kalachakra, the latest and

most corrupt form of Indian Buddhism ; but it was doubtless superior in discipline and coherency to the native superstitions united with debased Tantrism which it replaced.”

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—“তিনি তিব্বতে মহাবান মতেই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীরা বিতর্ক মহাবান ধর্মের অধিকাংশ নয় ; কেন না, তখনও তাহারা দৈত্য দানবের পূজা করিত ; তাই তিনি অনেক বজ্রবান ও কাণচক্র বানের গ্রন্থ তর্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পুনঃপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন।”

নেপালেও বাঙ্গালীরা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। কাহ্নাদ, লুই, ভূম্বক প্রভৃতি বৌদ্ধ লেখকগণের স্মৃতি আমাদের দেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, নেপালে কিছু তাঁহাদের আজও পূজিত হন। মহা-মহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তথা হইতে তাঁহাদের দোঁহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গসাহিত্যকে অপরূপ সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত কল্যাণী নগরের শিলালিপি পাঠ অবগত হওয়া যায় যে, নেপালেও তান্ত্রিকগণের বৌদ্ধ তিব্বতী অর্ণববানে গমন করিয়া তথার বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার করেন। আবার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাভ্যারন গোত্রের একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তাঁহার বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অমুরাগের জন্য দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সিংগলে. বৌদ্ধগণ চক্রবর্তীর পদলাভ করিয়াছিলেন। (ঐহুক নগেন্দ্রনাথ বহু কৃত Modern Buddhismর ভূমিকায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালীরা পরবর্তী কালের বৌদ্ধধর্মের প্রচারে তাহাদের শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ।

তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী

(জীবন চরিত)

শৈশব, বাল্য ও যৌবন। ধনবান পিতা মাতার পুত্র স্নেহগ্রহণ করিলে সচরাচর যেমন আদর বক্ষে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, কজির সিদ্ধার্থের পুত্র সেইরূপ বক্ষে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সিদ্ধার্থ পরিবার পার্শ্বনাথ স্বামীর মতাবলম্বী প্রাবক ছিলেন। ধনের প্রথমাবধি অগ্রভূক্তা ছিল না, তত্ক্ষণি শিশুর গর্ভবাস কালে নানা ধন-সম্পদের আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। সিদ্ধার্থ নবজাত শিশুর জন্ত পাঁচজন সেবিকা নিযুক্ত করিলেন। একজন দুগ্ধপান করাইত, একজন স্নান করাইত, একজন বস্ত্র পরাইত, একজন শিশুর সহিত খেলা করিত, ও একজন জোড়ে করিয়া বেড়াইতে লইয়া বাইত।

কেবল সে কালে নহে, একালেও রাজপুত্র রাজা ও ধনবানদের শিশুদের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন বরকা ও জাতীয়া সেবিকা নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরিবর্তন অতি অল্পই হইয়াছে। দুগ্ধপান করাইবার সেবিকা দুই প্রকার হয়। (১) বাহারা কেবল গো-দুগ্ধ পান করার ও (২) বাহারা আপন স্তনদুগ্ধ পান করার। প্রথম প্রকার সেবিকা এমন হওয়া উচিত, বাহার ২১টি স্তনান হইয়াছে, স্তনান পালন করিবার ক্ষমতা ও বহুদর্শিতা আছে, গোছাইয়া শিশুর সূখা বুকেরা খাওয়াইতে পারে, ও শিশুপালন বিভার কিছু জ্ঞান আছে। দ্বিতীয় প্রকারের, অর্থাৎ স্তনদুগ্ধ পান করাইবার জন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, নীরোগ, নির্দোষ স্বভাবের খাজী নির্বাচন করিতে হয়। কজিরের শিশুকে, বিশেষতঃ পুত্রসন্তানকে, সাহসী কজির কস্তার দুগ্ধই পান করান হয়। পূর্বকালে লোকে বিশ্বাস করিত, ও এখনও অনেকে বিশ্বাস করে যে, ইতর জাতীয়া বা

সম্পন্ন অর্থাৎ সাহসী বীর হইতে পারে না। সেই জন্ত স্তনদুগ্ধ পান করাইবার খাজী বিশেষ অঙ্গসন্ধান ও বিচার করিয়া নিযুক্ত করা হয়। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে এইরূপ খাজীয়া বিশেষ সম্মানের পাত্রী বিবেচিত হইয়া থাকে। শিশু ভবিষ্যতে রাজা হইলে, খাজী রাজমাতার সম্মান লাভ করে। এ নিয়ম কেবল ভারতে নহে, মধ্য এশিয়াতেও প্রচলিত। বাবরের সহিত যে তুর্কীরা ভারতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও ঠিক এই রীতি প্রচলিত ছিল। তাহারও বিশ্বাস করিত যে, যে খাজীর স্তনদুগ্ধ রাজকুমার পান করে, তাহার চরিত্রের মতই রাজকুমারের চরিত্র হইয়া যায়। অতএব সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সাহসী পিতা মাতার কস্তাকেই এ কার্য্যে নিযুক্ত করিত। তুর্কীরা স্তনদ্বাজী খাজীকে অনুকা ও তাহার কোলে সে সময়ে যে পুত্র থাকে তাহাকে খাজপুত্রের কোকা বলে। রাজপুত্র সিংহাসন লাভ করিলে এই কোকা সম্মান লাভ করিয়া কোবল তাপস হইয়া যান। কোকার সম্মানেরও কোকা নামে সম্মানিত হইয়া থাকেন। কোকার পিতাকে অংকা অথবা অংকা খাঁ বলে।

স্নান করান ও কাপড় পরান কার্য্যে প্রায় অঙ্গ-সেবা-পরায়ণা নিপুণা নাগিত কস্তাদের নিযুক্ত করা হয়। রাজপুতনাতে ধনবান কজিরদের সেবার কার্য্য নাগিতের একচেটিয়া, এমন কি বঙ্গদেশের রাঁধুনি ব্রাহ্মণদের কাষও রাজপুতনাতে নাগিতেরা করিয়া থাকে; তাহাদের সচরাচর রাধুনির জাতি বলে। খেলা করিবার জন্ত মিঠেখাবনী, সজরজা, সাহসী, স্তম্বী, সৎসীয়া, কিশোরী, ধর্মভীক কজিরবালা নির্বাচিত হয়। বেড়াইতে লইয়া বাইবার জন্ত নীরোগ, সবল, সংযতাবা, সন্তানবত্তী নাগিত কস্তা বা কজিরকস্তা নিযুক্ত করা হয়।

ভীক, ধর্মজ্ঞানহীনা অসচ্চরিত্রকে কোনও কাৰ্যে নিযুক্ত করা হয় না। জৈনদের মধ্যে খাণ্ডব্রব্যের ছুৎ বিচার নাই। অল্পশীঘ্র ছাড়া, যে কোনও জাতীর জৈনি, অল্প জাতীর জৈনির প্রস্তুত অন্ন একসঙ্গে বসিয়া গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য, বিবাহ আপন আপন জাতিতেই হয়।

মহাপুরুষদের শৈশব সম্বন্ধে যেমন নানা প্রকার সম্ভব ও অসম্ভব গল্প রচিত ও প্রচলিত হইয়া থাকে, বর্দ্ধমান সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়াছিল। ঐ সকল গল্প অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য হইতে পারে না, তবে উহাদের সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজনীয় বলা অসম্ভব হয়। ঐ সকল গল্প বাহ্যিক সম্বন্ধে রচিত হয় তাহার কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা প্রকাশিত না হইলেও ব্রহ্মা কালের লেখক ও লিখার পাঠকের চিন্তাশ্রোত ও কৃতির এমন নিবৃত্ত চিত্র আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নহে। যেমন, ঐকৃষ্ণের শৈশবাবস্থার গোপবালাদের সহিত আদিরস পূর্ণ প্রেমালাপ ও জীড়া বর্ণনাতে ঐকৃষ্ণের শৈশবের কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার কথা জানিতে পারা যায় না। ঐকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক মহাত্মারতকার এ সকল কথা কিছুই লেখেন নাই। কিন্তু ভাগবত ব্রহ্মা কালের—সে কাল মহাত্মারত রচনার বহু কাল পরেই আসিয়া থাকুক—লেখক ও পাঠকের চিন্তাধারা ও কৃতির বর্ধে পরিচয় পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানের শৈশবের সকল গল্পে [বাহা তাঁহার মোক্ষের আর তিন শত বৎসর পরে পুস্তকাকারে লেখা হইয়াছে, এবং ইহার পূর্বে কতক গাথারূপে কতক গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বাচনিক সংবাদ রূপে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে] তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অলংকার বল, সাহস ও বৈরাগ্যের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

বর্দ্ধমান একদিন তাঁহার সমবয়স্ক করেকটি বালকের সহিত মাঠে খেলা করিতেছিলেন, হঠাৎ এক প্রকাণ্ড মত্ত হস্তী তাহাদের আক্রমণ করিল। অল্প বালকেরা যে যেদিকে পথ পাইল ছুটিয়া পলাইতে লাগিল, কিন্তু নির্ভীক বর্দ্ধমান পলাইবার নামও করিলেন না।

হস্তী নিকটে আসিলে তিনি তাহার ত্ত [বা দস্ত] ভর দিয়া কোণলে তাহার হৃদয়ে আরোহণ করিয়া, হস্তী চালকদের মত বসিলেন এবং অন্নকাল মধ্যে তাহাকে বশীভূত করিলেন।

অল্প একদিন বর্দ্ধমান আপনার সমবয়স্ক করেকটি বালকের সহিত এক মাঠে “মাবলি-পিলী” নামক খেলা খেলিতেছিলেন। একজন নিকট প্রেয়ীর দৈত্য, বর্দ্ধমানই তাহা তীর্থঙ্কর কিনা সম্বন্ধে করিয়া পরীক্ষা করিতে আসিল, এবং তাঁহাকে বল পূর্বক আপন হৃদয়ে তুলিয়া লইল ও তাঁহাকে সেই আকাশে অতি উচ্চে উড়িয়া গেল। অল্প বালকেরা ভয় পাইয়া কেহ পলাইয়া গেল, কেহ টোচাইতে লাগিল, কেহ পিতাকে সংবাদ দিতে ছুটিল; কিন্তু বর্দ্ধমান একটুও ভীত হইলেন না। তিনি দৈত্যকে শাস্তি দিতে সক্ষম করিলেন ও তাহার চুল ধরয়া এমন পীড়িত করিলেন যে, দৈত্য জাহি ডাক ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিল এবং তাঁহাকে নামাইয়া কোনও মতে শ্রাব লইয়া পলাইল। বর্দ্ধমানের খেলার সাথীরা এইরূপ নানা ঘটনা দেখিয়া তাঁহাকে “বীর” বলিয়াই সম্বোধন করিতে লাগিল। তাহার বর্দ্ধমানের পিতৃবল নাম অপেক্ষা বীর বা মহাবীর বলিয়া সম্বোধন করিবার পক্ষপাতী হইল।

বর্দ্ধমানের মোক্ষের হুইতিন শত বৎসর পরে জৈন সম্প্রদায়ের দুই শাখা—দিগম্বর ও শ্বেতাশ্বর—হইয়া গিয়াছে। ঠিক কোন সময়ে ও কি কারণে হইয়াছে সে সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে; কিন্তু কোনটি সত্য বলা যায় না। বর্দ্ধমান স্বয়ং ব্রহ্মচর্য্যী নহ্ন সন্ন্যাসী ছিলেন। দিগম্বর শাখার বতি ও মুনীদের এখনও নয় থাকিবার ব্যবস্থা, কিন্তু এরূপ সাধু এখন আছেন কি না সম্বন্ধে থাকিলে, বন জঙ্গলে ২১ জন থাকিতে পারেন, লোকালয়ে নাই। উহাদের নিয়মগুলি যেমন কঠোর, সেইরূপ অতি কঠোরতার সহিত সেগুলি পালন করিয়া থাকেন বা করিতেন। এ শাখার শ্রাবক সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অল্প। শ্বেতাশ্বর শাখার মুনি বতির আচ্ছন্নহীন শ্বেত বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত

রাখেন। এই দুই শাখার লোকেরা বর্দ্ধমানের জীবন কাহিনী এবং জীবনের ঘটনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, বা করিতে ভাল বাসেন। দিগ্বরেরা কঠোরতার পক্ষপাতী, কিন্তু খেতাষরেরা অনেকটা কোমল বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন, দিগ্বরেরা বলেন বর্দ্ধমানের শৈশবাবস্থা হইতেই ঘোর বৈরাগ্যোদয় হইয়াছিল। তিনি আট বৎসর বয়সেই পার্শ্বনাথস্বামী-নির্দিষ্ট জৈনগৃহস্থদের দ্বাদশ শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি বাল-ব্রহ্মচারী ছিলেন; পিতা মাতার জীবিতাবস্থাতেই, তাঁহাদের সাদর অশ্রুগোধ উপেক্ষা করিয়া, কঠোর সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু খেতাষরেরা বলেন যে, ব'দও তিনি শৈশবাবস্থা হইতেই মনে মনে বৈরাগ্য গোষণ করিতেন, তথাপি পিতা মাতার জীবন কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন নাই। খেতাষরেরা বলেন, বর্দ্ধমান গর্ত্বাগ কালে একদিন ভাবিলেন, তাঁহার নড়া চড়াতে তাঁহার গর্ত্বাগিণীর না জানি কত কষ্ট হইতেছে, অতএব তিনি এক দিবসোত্তরী নড়েন নাই। কিন্তু তাঁহার গর্ত্বাগিণী অজ্ঞরূপ ভাবিলেন। তিনি মনে করিলেন পেটের সন্তান মরিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে তিনি এত কাতর হইলেন যে, একান্তে ব'সিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। মাতার হৃৎ দেখিয়া গর্ত্ব বীর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, একটু নড়িলেন। অবনি প্রস্থতিও অশ্রু বিসর্জন ত্যাগ করিয়া আনন্দিতা হইলেন। এই ঘটনা ঘারা বীর মাতৃদেহের গভীরতা অমূল্য করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই মাংস গিও প্রতি মাতার যখন এত মেহ ও মমতা, তখন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার সময়ে না জানি তাঁহার কত কষ্ট হইবে। বীর সেই সময়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাহার মাতার জীবিতাবস্থার সংসার ত্যাগ করিবেন না, সাধারণ সংসারী-সুখকের মত সংসারে নিপু থাকিবেন; মাতার আনন্দের জন্য বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিবেন। পরে তাঁহার দেহান্তের

পর অগতঃ শিক্ষা দিবার জন্য ও পরে বোকালাভের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। [জৈনেরা বিশ্বাস করেন যে, তীর্থঙ্করেরা জন্মাবস্থা হইতেই পূর্ণ জ্ঞানী, অতএব মাতৃগর্ভে বাসকালেই জীবনের কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানী আত্মা মাতৃদেহের গভীরতা সযত্নে কেন অজ্ঞান ছিলেন তাহার বিচার করিতে পারিলাম না। জৈনধর্মের বিধান কোন মহাশয় বিচার করিয়া দিলে বাধিত হইব। আমি জৈন গ্রন্থে বেরূপ পাইয়াছি সেই রূপই লিখিলাম—লেখক]

শিক্ষা। বর্দ্ধমান স্বামীর জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি অতি সংক্ষিপ্ত, কেননা সে কালে জীবনী লেখার নিয়ম ছিল না। তথাপি তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার আভাস তাঁহার উপদেশাবলী হইতে পাওয়া যায়। তাঁহার মোক্ষের প্রায় তিনশত বৎসর পরে সংক্ষিপ্ত জীবনীও লেখা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে আজকালকার অনিসন্ধিগ্ৰস্ত তৃপ্তি হয় না। কিন্তু তাঁহার বিদ্যাপ্রসঙ্গের কথা কোথায় নাই। হিন্দুদের পূর্বাভার ত্রীকৃতককেও সন্দীপনী খবির টোলে ৬৪ দিন বাস করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইয়াছিল। এই সমাপ্ত শব্দ হইতে বোধ হয় পূর্বে অজ্ঞ হানে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের শিক্ষার কথা তাঁহার জীবনীতে আছে। কিন্তু জৈনরা বলেন তীর্থঙ্করেরা জন্মাবধি পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইরা হইরা থাকেন, অতএব তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজনই হয় না। বর্দ্ধমানের শিক্ষা সযত্নে কোনও প্রমাণ পাওয়া যাক বা না যাক, তিনি যে এক জন অধিষ্ঠার বেদ বেদান্তবেত্তা, সাহিত্যিক, নৈরাসিক ও দার্শনিক ছিলেন তাহা তাঁহার শিক্ষাদানের নানা গল্পে প্রমাণিত। একবার গৌতম ঐশ্বর্যভূতি প্রমুখ একাদশ জন দেশের প্রধান বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বড় বড় টোলের আচার্যগণ তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন। কাহারও কথা, কহিবার পূর্বেই তিনি প্রত্যেকের নাম বলিয়া নিকটে আসিতে বলিলেন। নিকটে আসিলে সেই

ব্যক্তি কোন্ কোন্ প্রতির অর্থ ভুল বুঝিয়া সিদ্ধান্তে সন্ধিহীন ছিলেন তাহাইয়া দিলেন এবং সেই প্রতির প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া তাহার সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন। এই গল্পে দুইট কথা প্রমাণিত হইতেছে। প্রথম—তিনি পরের মনের কথা জানিতে পারিতেন ও দ্বিতীয়তঃ সাহিত্য কোষ ও যেহে অধিকার বিধান ছিলেন। তাহার উপদেশাবলী অর্দ্ধ মার্গবী বা সে সময়ের দেশের প্রচলিত ভাষাতেই লিখিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অল্প বৈদ্যের সকল প্রাচীন হুই পালী ভাষাতে লেখা।

বৌবন।—খেতাবরেরা বলেন, তিনি প্রথম বৌবনে কৌত্তন্য গোজিয়া বশোদা নামী কজির কস্তার পানিপীড়ন করিয়াছিলেন। অমৃত্যু বা প্রিয়দর্শনা নামে তাহার এক কস্তা অগ্রগ্ৰেণে করিয়াছিল। এই কস্তার কৌশিক গোজল জমাণী নামক এক সম্রাট কজিরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল ও শোভাবতী বা বশোদা নামী এক কস্তার জন্ম হইয়াছিল। জমাণী কিছুকাল বর্দ্ধমানের মতাবলম্বী প্রচারক ছিলেন কিন্তু পরে কোন-কাঃণে মত পরিবর্তন করিয়া বহু মত স্থাপন কর্তা হইয়াছিলেন। এই সংকল্প নামগুলি ছাড়া তাহার জী. কস্তা, বৌ হজী সম্বন্ধে বড় বেশী কিছু জানা নাই। দিগবরেরা এ বিবাহের কথা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে তিনি বালজন্মচারী ছিলেন।

পিতা মাতার সমাধি। সিদ্ধার্থ পরিবার পার্শ্বনাথ স্বামীর মতাবলম্বী শ্রাবক ছিলেন। বৈদ্য ধর্ম্মে এক বিধি আছে যে, শ্রাবক যখন দেখিবে তাহার দেহ ক্রমে অগষ্ট হইতেছে, আর বেনীদিন কর্তৃকম থাকিবার আশা নাই, তখন শ্রাবক পারতপক্ষে গৃহে বাস না করিয়া নদীরে বসিয়া আত্মচিন্তা ও মোক্ষচিন্তা করিবে। শ্রাবক ইচ্ছা করিলে গুরুর কাছে আগমন জীবনের সমস্ত পাপ স্বীকার (Confession) করিয়া অনেকটা পাপের বোকা কমাইতে পারে। এরূপ পাপ স্বীকার বাধ্যতা মূলক নহে; শ্রাবকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। পরে, ইচ্ছা হইলে সন্ন্যাস করিয়া দেহত্যাগ

করিতে পারে। শ্রাবক একটি পবত্র স্থান নির্দেশ করে, অর্থাৎ এমন স্থান খুঁজিয়া পরিষ্কার করিয়া লয়, যেখানে পোকা মাড়ক দিম ইত্যাদি জীব বা অগবিজ বস্তু নাই। পরে কিছু কুশ বা ধানের খড় সংগ্রহ করিয়া কাড়িয়া বাছিয়া, দুইয়া শুকাইয়া লয়। এই খড় বা কুশ পাতিয়া শয্যা রচনা করে। পরে, সন্ন্যাস করিয়া অন্নজল ত্যাগ করিয়া ভূপশয্যা গ্রহণ করে। শয্যাগ্রহণের পূর্বে তাহার আত্মীয় কুটুম্বগণ দেহরক্ষা করিবার সন্ন্যাস-ত্যাগ করিতে নানাপ্রকারে অনুরোধ করিয়া থাকে, কিন্তু একবার সন্ন্যাস করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলে আর ত্যাগ না করিতেই উত্তেজিত করে। কেননা শ্রাবককে এইরূপে শয্যাগ্রহণ করিবার পর আবার ত্যাগ করিলে ধর্ম্ম ও সমাজে চিরজীবন পতিত হইয়া থাকিতে হয়। ক্রমে অন্নজল অভাবে শ্রাবকের শরীর শুষ্ক হইয়া জীব-দেহ ত্যাগ করে। এরূপে দেহত্যাগকে সমাধি বলে। বৈদ্যনাথ এরূপ সমাধিকে অতি সম্মানীয় ও বাহ্যিক মৃত্যু বিবেচনা করে। আত্মকাল এরূপ যেহে-মৃত্যু বা সমাধি বিরল হইলেও মধ্যে-মধ্যে দুই একটি দোখতে পাওয়া যায়। সমাধির সংবাদ পাইলে দেশ দেশান্তরের শ্রাবকেরা দর্শন করিয়া ধন্য হইতে আসে। সিদ্ধার্থ ও তাহার সহধর্ম্মিণী উভয়ে এক সন্ধ্যা সমাধি হইলেন। তখন বর্দ্ধমানের বয়স ২৮,২৯ বৎসর হইবে।

বর্দ্ধমান পূর্বাবধি গৃহত্যাগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া ছিলেন, কেবল পিতা মাতার সমাধির অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহাদের সমাধির পর আর গৃহে থাকিতে চাহিলেন না। তাহাদের উত্তর স্রাতা মধ্যে পাচ প্রীতি ছিল। বর্দ্ধমান অগ্রজের অনুমতি না লইয়া কিছু করিতেন না, তিনি এখন অগ্রগ নন্দীবর্দ্ধনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নন্দীবর্দ্ধন বলিলেন;—“আমি জানি তুমি বাল্যাবস্থা হইতে সংসারে বিরক্ত; কিন্তু এই রাজ্য মাতা পিতা উভয়ে সমাধি হইলেন, আর এই সময়ে তুমি যদি স্বীকা গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় সমাজের লোকে বলিবে আমি

তোমার বিষয়ের গোতে তোমাকে কষ্ট দিয়া গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলান। তুমি আমার অল্পরোখে আর এক বৎসর [মতান্তরে দুই বৎসর] গৃহে বাস করিয়া আমাকে এই ভিত্তিহীন ভূগম হইতে রক্ষা কর। তাহার পরও যদি তোমার মনের তাব পরিবর্তিত না হয়, তবে তোমার বাহা অতিক্রমিত তাহাই করিও।” বর্ধমান তাহাই স্বীকার করিলেন। তখন প্রায়ে আছে যে, এই এক বৎসর কাল তিনি প্রত্যহ এককোটি আট লক্ষ সুবর্ণ দান করিতেন; অর্থাৎ ৩৬০ দিবসে তিনি ৩৮৮, ৮০০০০, ০০০ সুবর্ণ দান করিয়াছিলেন। তাবী তীর্থঙ্করের দান তাঁহার ঈশমুক হংরা চাই, সেই কারণে দানের অন্ত দেবরাজ ইন্ড্রের অল্পচরেরা পৃথিবীর সকল প্রোথিত ধন আনিয়া যোগাইয়া থাকেন। এই সময়ে বৈশ্রবনের কুণ্ডল-ধর, লোকান্তিক দেবতা ও পঞ্চবশ কর্মভূমির মহার্দ্ধিক দেবতার সংসারী শরীর মধ্যে স্থপ্ত তীর্থঙ্করকে স্তুতি ও জয়গান করিয়া আগ্রত করিয়া থাকেন। [এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, তখন শাস্ত্র মতে অনুযায়ী কর্মভূমি নাম তিনটি,—ভারত, আর্ধ্যাবর্ত ও বিদেশ]

দীক্ষা। নির্দিষ্ট এক বৎসর অতীত হইলে বর্ধমান মোট সর্বাঙ্গের ও অন্ত সকল গুরুত্বের অল্পমাত প্রাণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করাই স্থর করিলেন। সেই সময়ে লোকান্তিক দেবতার প্রাচীন নিয়ম মত নিম্ন নিধিত শব্দে তীর্থঙ্করের স্তুতি ও জয়গান করিতে লাগিলেন;—“হে জগতের আনন্দদায়ী। তোমার জয় হউক। হে মঙ্গলদায়ী ক্ষত্রকুল ব্যবত, তোমার জয় হউক। হে জগৎ নাথ! আগ্রত হও, উত্থান কর, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বস্বত্বের হিতকর ধর্ম স্থাপন কর। জগতের সকল জীবের হিত ও কল্যাণ সাধন কর।” ইত্যাদি ॥

বীর সংসার প্রবেশ করিবার পূর্বেই [অর্থাৎ বিবাহ করিবার পূর্বেই] অতোগিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এই অতোগিক জ্ঞান অবধিজ্ঞানপেক্ষ। নিষ্কষ্ট; কিন্তু প্রায় কাছাকাছি সমান। ভগবান আপন এই জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে তাঁহার নিজস্ব সমস্ত উপস্থিত হইয়াছে। তিনি আপন ব্যবহারের

রোগা সুবর্ণ ইত্যাদি নানা রত্ন, মণি, মুক্তা-প্রাণাদি হংসীদেব দান করিলেন ও অগ্রহারণ মাপের কৃষ্ণা বশমীর দিন, বিপ্রহরের এক বাস পরে, সুব্রত দিবসে, বিজয় সুহৃৎ, চন্দ্রপ্রভা নামক সংস্র সেবক-বাহিত চতুর্দোলে উঠিয়া দেবতা, অন্নয়, মহুয়, আশীর, সুটুয়, দেশবাসী সহিত শব্দবাদক, বকী, স্তুতিকারকগণে পরিবৃত্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া বাজা করিলেন। সর্দার স্তুতি ও জয়গান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—“হে জগতের আনন্দদায়ী তোমার জয় হউক, তুমি আপন অসীম জ্ঞান দ্বারা ইন্ড্রের জয় করিও, প্রমথের ধর্ম পালন করিও, আপন ও আমাদের প্রধান শত্রু কর্মকলকে ভগ্নতা দ্বারা জয় করিও। হে জগদ্বন্দী, তুমি কেবল জ্ঞান দ্বারা জিজগৎ জয় করিও। পূর্ব জিনদের প্রবর্তিত মোক্ষসাধক করিও, এবং সকল বাধা সংহার করিও। হে ক্ষত্রিয় সিংহ! তোমার জয় হউক। তুমি বহু দিবস, বহু পক্ষ, বহু মাস, বহু ঋতু, বহু বৎসরার্দ্ধ, বহু বৎসর ধরিয়া কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিও না। সকল প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া ধর্মপালন করিও।”

বীর এইরূপে বহু দেবতা, সুরাসুর, নাগরিকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কুণ্ড প্রাণের মধ্য দিয়া জ্ঞানদেব বগবন [দ্বিগদ্বয় মতে সারথি খণ্ড] নামক বনে নির্দিষ্ট অশোক তরু মূলে উপস্থিত হইলেন। তিনি চতুর্দোল ত্যাগ করিয়া একটি পূর্ব প্রান্তত পাণ্ডুলিঙ্গা অর্থাৎ পঞ্চকোণ বিশিষ্ট প্রস্তর নির্মিত সিংহাসনে পূর্বমুখ হইয়া অন্নকণ মৌনাবলম্বন পূর্বক বসিয়া রহিলেন। এই প্রস্তর সিংহাসন খানি একরূপ ভাবে রাখা হইয়াছিল যে, পূর্ব দিকে তাহার একটি ভূজ ও পশ্চিম দিকে একটি কোণ ছিল। ইহার পূর্বে তিনি আড়াই দিন নির্জলা উপবাসী ছিলেন। পরে, একে একে আপনার শরীরের সকল অঙ্গভার ও ভূষণ ত্যাগ করিলেন। বৈশ্রবণ দেব [ইন্ড্র] ঐষ্টাদে শপথ করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত বসন ও ভূষণ ভগ্নি সংগ্রহ করিবার অল্পমতি প্রার্থনা করিলেন এবং অলঙ্কার ভগ্নি এক খানি বহু সুখ্য সুবর্ণ স্ত্রী প্রথিত বস্ত্রে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পরে, বীর দক্ষিণ ও বাম দিকের

মাথার চুল গুলি পাঁচ মুঠিতে (১) তুলিয়া কেলিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইচ্ছা চুল গুলি মাটিতে পড়িতে দিলেন না, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি হীরকের বাটিতে রাখিলেন ও ভগবানেঃ অজ্ঞপতি গ্রহণ করিয়া তাহা ক্ষীরোদ সাগরে লইয়া গেলেন। বীর চুল তুলিয়া সুভাষা জৈবরগণকে (২) প্রণাম করিলেন ও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি কখনও পাপ কর্ম করিবেন না। এইরূপে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পবিত্র জীবন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই ক্রিয়া সমস্ত মনুষ্য ও দেব সমাজ চিত্তবৎ নিতরু হইয়া দাড়াইয়া দেখিতেছিলেন। প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর, দেবরাজের ইচ্ছিতে সকলে মুহূর্ত্ত অরক্ষণ করিতে লাগিলেন। আবার, পবিত্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার সময়ে দেবরাজের আদেশে মনুষ্য ও দেবাজ্ঞেরা নিতরু হইল।

এই বিশেষ দীক্ষার সময়ের একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, যখন বীর আপনার সকল ধন, রত্ন, বসন, ভূষণ দান করিলেন, তাহার পর সোমদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল, “আমার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, আমাকেও কিছু দান করুন।” তখন তাঁহার কাছে আর কিছুই ছিল না। কেবল দেবরাজ ইচ্ছা দত্ত একটি স্বর্গীয় বসন বা বহিরীস ছিল। তিনি তাহার অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া সোমদত্তকে দান করিলেন। সোমদত্ত স্বর্গীয় বসন পাইয়া অতিশয় অহ্লাদিত হইল ও আপনার বন্ধু এক তত্ত্বাবধক দেখাইল। তাঁতি বলিল, অপরাধ সংগ্রহ করিতে পারিলে তোমার একটি স্ত্রীর অঙ্গাবরক হয়। কিন্তু

(১) অস্ত্রান্ত সস্ত্রদায়ের সন্ন্যাসীরা দীক্ষার পূর্বে নব ত্যাগ করিয়া কৌরব করাইয়া চুল ত্যাগ করেন। কিন্তু বৈশ্যেরা শরীরের প্রতি মনোভা শূভতা প্রদান করিতে চুল টানিয়া তুলিয়া কেলেন। তাহা করিলেও কেবল পাঁচ মুঠিতে সব চুল ভটা সম্ভব বোধ হয় না।

(২) লৈন শাস্ত্র মতে মোক প্রাপ্ত সুভাষারাই ইবর নামে পরিচিত। অগ্ন্যুৎপত্তি কর্তা ইবর তাঁহার বিবাহ করেন না। ইবরের সংখ্যা অনন্ত।

সোমদত্ত ব্যবসায়ী ভিক্ষুক হইলেও নূতন সন্ন্যাসীর কাছে অপরাধ চাহিতে লজ্জিত হইল। সোমদত্ত বীরের কাছে আসিয়া দেখিল তিনি অর্দ্ধনিবীলিত নেজে কিছু ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে পথ হাঁটিতেছেন; তাঁহার বাহুজান মোটে নাই ও তাঁহার স্বল্প হইতে ইচ্ছদত্ত বসনের অপরাধ খানি ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে। সোমদত্ত তাঁহার অহুসরণ করিতে লাগিল। যখন স্বল্প হইতে বসনটি পড়িয়া গেল, তখন তাহা লইয়া পলাইল। এ গল্পটি বোধ হয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিন্দাকারী কোনও ব্যক্তির রচিত। কেননা আচার্য্য শ্রুংগর প্রথম স্বল্পের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম উদ্দেশ্যের প্রথম ও তৃতীয় গাথাতে এই ইচ্ছদত্ত বসনের তের মাস পর্যন্ত ধারণ করিবার, অথবা ত্যাগ না করিবার কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

খেতাবয়েরা বলেন, ভগবান মহাবীর এইরূপে সংসার ত্যাগ করিবারাজ মনঃপর্যায় জ্ঞানলাভ করিলেন। এই জ্ঞানের বলে তিনি পঞ্চেন্দ্রিয় বৃত্ত [দৃষ্টি, শ্রবণ, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ] সকল জীবের মনের কথা জানিতে পারিলেন। কিন্তু দিগম্বরেরা বলেন তাঁহাকে ঐ জ্ঞান অর্জন করিতে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি দীক্ষার পর ছয় মাস কঠোর কারোৎসর্গ [তপস্ব—কৃচ্ছ্রসাধন] করিয়াও সফল হইতে পারেন নাই। তিনি এই ছয় মাস একা-সনে নিশ্চলভাবে বসিয়া ছিলেন। ছয় মাসের পর তিনি কুলপুর নামক নগরে গিয়াছিলেন। কুলপুরের রাজা কুলাধিপ তাঁহার ছই পাদ প্রকালন করিয়া ক্ষীর [পায়স] খাইতে দিলেন। ইহার পর তিনি বনে প্রবেশ করিয়া দ্বাদশ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিলেন; কিন্তু কোন মতেই সফল হইতে পারিলেন না। তখন মাননবদেশে প্রদান নগর (৩) উজ্জয়িনীতে গিয়া সেধানকার মহামন্ত্রানে কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করিলেন।

(৩) এখানে হিন্দুদের দেবতা ও দেবী—কর ও কর্ণাঙ্গী— লৈনমতে তপস্যাতে বিরক্তারী “বার” স্বরূপ। সকল দেবতাই ভীৰ্করের সেবা ও পূজা করিয়া থাকেন।

এই সময়ে রক্ত ও রক্তাণী তাঁহার তপস্তাতে ব্যাধাত জন্মাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রলোভনে না ভুলিয়া দ্বিতীয় বার যেন গিয়া কুচ্ছসাধন করিলেন ও কিছু পরে মনঃপর্বার জালনাভ করিলেন।

এই জ্ঞান লাভ করিবার পর তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, “আমি বৎসর বৎসর পর্বাত আপনায় শরীরের সেবা করিব না, আমি বীর ভাবে মহুয়া দেবতা, ও অস্ত্রধীরদত্ত সকল প্রকার জালা বরণা নির্মিকার চিন্তে সহ করিব।” এই প্রতিজ্ঞাগ্রহণের পর, মর্ষা-স্তের এক মুহূর্ত্ত পূর্বে তিনি কুম্ভার গ্রামে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আপন দেহের মায়াত্যাগ করিয়া কেবল আত্মচিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি পৌষপুত্র প্রব্রজ্যা কালে, দোষ রহিত স্থানে বিশ্রাম, মন ও ইন্দ্রিয় শাসন করিয়া সদয় ত্যাগ ও পবিত্র জীবন বাপন করিয়া নির্ঝাঁপের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি তেরমাস কাল পার্শ্বনাথ স্বামী নির্দিষ্ট মতাহুয়ারী কোপীন, বহির্কাস ও কহু ধারী ছিলেন। কিন্তু তাহার পর নিজের সর্বস্বত্যাগের মতস্থাপন করিলেন, ও সেই নিয়ম মতে স্বয়ং বস্ত্রত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণনগ্ন থাকিতে লাগিলেন।

জৈনগ্রন্থে উপরি উক্ত ঘটনাকে “দীক্ষা” বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু দীক্ষা অংগক্ষা “গৃহত্যাগ” বলিলেই ঠিক হয়। সকল সম্প্রদায়েই দীক্ষাদাতা গুরুর উপদেশ মত সাধনা করিতে হয়, কিন্তু তীর্থঙ্করের গুরু নাই, তাঁহারা জন্মাবধি পূর্ণজ্ঞানী, অতএব তাঁহাদের শিক্ষাও নাই দীক্ষাও সম্ভব নহে। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া, কাহারও শিষ্য না হইয়া, পার্শ্বনাথস্বামীর স্থাপিত মতাহুয়ারে তপস্তা, কুচ্ছসাধন অথবা আত্মচিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রবকেরা ও বৈদ্যন বিভিন্ন রীতিমত গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া থাকেন।

অজ্ঞাত। মহাবীর স্বামীর মনবাস সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক উঠিয়াছে। কেহ বা ইহাকে সর্বস্ব

ত্যাগের পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ অভি উক্ত বলিয়াছেন; আবার কেহ সামাজিক নীতি বিগর্হিত লজ্জাশূন্য পদবৎ আচরণ বলিয়াছেন। এমন কি পরবর্ত্তীকালে, বৈদ্যনাথ ও চাই সম্প্রদায় বিতর্ক হইয়া পড়িয়াছেন। মনবাসের পক্ষপাতী [অর্থাৎ দিগম্বর সম্প্রদায়ের] সাধু ও সাধ্বীরা নগ্ন থাকেন। কিন্তু কার্যতঃ আজকাল নগ্না সাধ্বী ত পরের কথা একটাও নগ্ন সাধু আছেন কিনা সন্দেহ। যে সম্প্রদায় সাধুদের লজ্জা আড়ম্বরহীন খেত-বস্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা খেতাধর নামে পরিচিত। খেতাধর সাধু কোপীন বহির্কাস ইত্যাদি ধারণ করিয়া থাকেন।

যে সময়ে বীর সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে দেশে সাধারণ জৈন সম্প্রদায়ে পার্শ্বনাথস্বামীর মত প্রচলিত ছিল। পার্শ্বনাথ স্বামীর মতে জৈন সাধু অথবা নির্গ্রহুদা ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের মত গৈরিক কোপীন, বহির্কাস, কহু, জলপাত্র ও দণ্ড ধারণ করিতেন। মহাবীরও তেরমাস পর্বাত ঐরূপ বেশেই ছিলেন, পরে নিজের মতস্থাপন করিয়া দিগম্বর থাকিতে লাগিলেন। কিন্তু আধুনিক দিগম্বরেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন এরূপ ক্রিয়া স্বীকার করিলে প্রকৃতিভয়ের স্বীকার করিতে হয় যে, দীক্ষার সময়ে বীরের কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল না, পরে জ্ঞান হইলে বস্ত্রত্যাগ করিলেন। কিন্তু তীর্থঙ্কর মাঝেই পূর্ণ জ্ঞান সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ভ্রম আরোপ করা ধুষ্টতা মাত্র। তাঁহাদের যেমন কোনও প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ জন্মাবধি তাঁহারা ভ্রম করিতে পারেন না। ইহা ছাড়া নিজের নিয়মই পালন করিয়া থাকেন; পরের মতের, এমন কি, পূর্ণ তীর্থঙ্করদের মতেরও বশবর্ত্তী করেন না।

একজন আধুনিক [সম্ভবতঃ দিগম্বর সম্প্রদায়ের] জৈন লেখক মনবাস সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভগবান যখন সর্বস্বত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং সাধুরাও ত্যাগ করিয়া থাকেন, তখন “সর্বস্ব”র মধ্যে লজ্জাও

ত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব সাধুদেরও সেইরূপ করা উচিত। সর্ব্বত্র ত্যাগ করিয়া কোনও একটি দ্রব্য সম্বন্ধে পোষণ করিলে তাহার সর্ব্বত্যাগ হয় না। এখানে লজ্জাকে “দ্রব্য” মধ্যে গণনা না করিলেও বস্ত্রকে গণনা করা বাইতে পারে। সর্ব্বত্যাগ করিয়া লজ্জা অথবা লজ্জা আবরণক বস্ত্র ধারণ করিলে তাহার অস্ত্রের আচরণ করা হয়। সাধু যখন সুখ দুঃখ, ক্লেশ, মার, মোহ, রাগাদি সকল অবস্থাই ত্যাগ করিলেন, তখন লজ্জা পোষণ করিবেন কেন? তিনি বাইবেলের গল্পের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, বতদিন আদম ও ঈভ পবিত্র ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের নগ্নতা জ্ঞান বা লজ্জা ছিলনা। নগ্নতাজ্ঞান হইতেই, অর্থাৎ অপবিত্র হইতেই তাঁহারা আচ্ছাদিত হইলেন। অপবিত্র হইয়া স্বর্গ হইতে পতন হইল। অতএব নগ্নতাই পবিত্র, আচ্ছাদনই অপবিত্র। [তর্কশাস্ত্র মতে এ যুক্তি ভ্রান্ত কি অস্ত্রের হইল সুধীশ্বর তাহার বিচার করিবেন।] তিনি আরও বলিয়াছেন যে বাহ্যজ্ঞান হীন সাধুই নগ্ন থাকিবার অধিকারী, বাহ্যের আপনাকে নগ্ন বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহার নগ্ন থাকিবার অধিকারই নাই। কিন্তু কার্যতঃ ঐরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন সাধু দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি অস্ত্রস্থানে বলিয়াছেন যে নগ্নবাস না করিলে মোক্ষলাভ হয় না, অতএব মোক্ষলাভের জন্য সাধুকে এত বিতর্ক হইয়া আশ্চর্য্যতা করিতে হইবে যে, বহির্জগতের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না, তবে সে মোক্ষলাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। তাঁহার কথা সত্য হইলে ঐরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন সাধু ছাড়া শ্রাবকেরাও মোক্ষাধিকারী নহেন। অর্থাৎ শ্রাবকেরা নগ্ন সাধু সঙ্গ করিয়া মোক্ষের পথে অগ্রসর হইবেন মাত্র। তবিশ্বেও জীবনে স্বয়ং নগ্ন থাকিয়া মোক্ষলাভ করিবেন। কিন্তু জৈন ধর্ম্মমত এত সঙ্গীর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন সঙ্গীর্ণ ধর্ম্মমত বলে যে, কেবল তাহাদের মতের লোকদেরই মুক্তি সম্ভব, তিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মুক্তি সম্ভব নহে। কিন্তু জৈনচার্য্যেরা বলেন :—

নাশাযাঃ সত্যং ন তর্কবাদেন চ তদ্বাদে ।
ন পক্ষসেবাসংপ্রাণেন মুক্তিঃ কথায় মুক্তিঃ কিলমুক্তিরেব ॥
[উপদেশ তরঙ্গিনী]
অর্থাৎ মোক্ষ দিগম্বর অবস্থাতে নাই, খেতাবর অবস্থাতেও নাই, তর্কজালেও নাই, তদ্বাদেও নাই, স্বপক্ষ সমর্থনেও নাই। মোক্ষ কেবলমাত্র কথায় (ক্ৰোধ, মান, মাদা, ও মোহ) হইতে মুক্তিতেই আছে।

বদিও মহাবীর স্বামী স্বয়ং নগ্ন থাকিতেন, ও সাধুদের নগ্নবাসই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি স্থান বিশেষে আচ্ছাদনের অমুমতি দিয়াছেন। তাঁহার গম্বথর অর্থাৎ প্রধান শিষ্যগণ মধ্যে কেবল মাত্র দুই জন তাঁহার নির্কারণের সময়ে ও পরে জীবিত ছিলেন। এই দুইজন মধ্যে কেবল মাত্র সুধর্ম্মন শিষ্য রাবিশা গিয়াছেন। এই সুধর্ম্মন মহাবীর স্বামীর মুখে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা আপন শিষ্য জম্বুবামীকে বলিয়াছিলেন। সেই উপদেশাবলীর কতকগুলি আচরণ হয় নামে প্রসিদ্ধ। তাহার এক স্থানে [স্বক ১, অধ্যায়ন ৭, উদ্দেশ্য-৭] তিনি বলিয়াছেন :—

“অচেলকের [নগ্ন সাধুর] মনে যদি এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় যে আমি শরীরে তৃণ ও কণ্টকের আবৃত, শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপ, না হই মশা ও অন্ত গোলা বাকড়ের দংশন ও নানা প্রকার শারীরিক কষ্ট অনাগ্রাসে সহ করিতে পারি, কিন্তু আমার গোপনীর অঙ্গের আচ্ছাদন ত্যাগ করিতে পারি না, তাহা হইলে সে আপন গোপনীর অঙ্গ এককণ্ড বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে পারে।”

টীকাকারেরা লিখিয়াছেন, এই আচ্ছাদন বস্ত্রের নাম “কটিবন্ধন” অথবা “চোলপতক”। ইহা সাধুর হাতের এক হাত লম্বা ও চার অঙ্গুলী চওড়া হইতে পারে ॥

খেতাস্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায় ।
এককালে জৈন সাধু মজ্জেই দিগম্বর ছিলেন। কোন কালে ও কিরূপে খেতাবর, সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল

সে সবকে নানা গল্প প্রচলিত আছে। তদ্বাধ্য নিম্ন
লিখিত দুইটি সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তবে কোনটি
ঐতিহাসিক সত্য, বলা যায় না। প্রথম—মগধেশ্বর
চন্দ্রগুপ্তের সময়ে দশ বর্ষ বাঙ্গালী চুক্তি হইয়াছিল।
তখন রাজার গুরু ২৪০০ সাধু সহিত পাটনাপুত্রে
ছিলেন। চুক্তির সময়ে এত সাধুর ভিক্ষা সংগ্রহ
অসম্ভব হওয়াতে রাজগুরু ১২০০ সাধু লইয়া দক্ষিণাত্যে
গমন করিলেন ও অপর্য্যক্টে উত্তর ভারতে নানা
স্থানে ছড়াইয়া থাকিতে অগ্রমতি দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত
গুরুর সহিত নয় সাধুরূপে দক্ষিণে গিয়াছিলেন।
আধুনিক মহীশূর রাজ্যে শ্রবণ বেঙ্গগোলা নামক স্থানে
ভাঁহার গুরু নির্বাণলাভ করিলেন। সেখানে ভাঁহার
সমাধি ও চন্দ্রগুপ্তের তপস্তা কুটির এখনও আছে।
দশ বর্ষ পরে গুরুর প্রধান শিষ্য সাধুদের হইয়া
উত্তর ভারতে ফিরিয়া আসিলেন ও দেখিলেন উত্তরের
সাধুরা খেত বজ্র ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।
উত্তরের সাধুরা বলিলেন আমাদের ভিক্ষার জন্য গ্রামে
প্রবেশ করিতে হইত, আমাদের অনেক শিষ্য হইয়াছে,

তাহাদের রমণীদের উপদেশ দিতে হইত, অতএব বজ্র
ধারণ না করিলে ধর্মপ্রচার অসম্ভব হয় সেই জন্য
এইরূপ করিয়াছি। দিগম্বর সাধুরা বজ্র ধারণ করিতে
অস্বীকার করিলেন; অতএব দুই সম্প্রদায় হইয়া গেল।
দ্বিতীয়তঃ—এক জৈন ধর্মাবলম্বনী রাজকুমারীর
গুরুদেবের এক শৈব রাজার সহিত বিবাহ হইয়া
ছিল। রানীর পিতৃকুলের গুরু অনেকগুলি সাধুর সহিত
রাজধানীর নিকট দিয়া বাইতেছেন সংবাদ পাইয়া
রাণী আপনার পাত্র মিত্রের সহিত অত্যধনা করিতে
গেলেন, কিন্তু উলঙ্গ দেখিয়া ঘৃণার ফিরিয়া আসিলেন।
রানী সাধুদের খেতবজ্র পাঠাইয়া বজ্র ধারণ করিয়া
নগরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন ও বলিয়া
পাঠাইলেন, আপনারা নগরে না প্রবেশ করিয়া চলিয়া
গেলে লোকেরা জৈন ধর্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে।
সাধুরা সেই অবধি খেত বজ্র ধারণ করিতে
লাগিলেন।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

নগবালা

(উপন্যাস)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রেমের চিত্র।

আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বাহা বিবৃত করিলাম,
তাহাতে উত্তান, পুষ্প, সৌরভ, সঙ্গীতে প্রেমের রাজ্য
রচিত ছিল বটে এবং সেই প্রেমরাজ্যে যুবক যুবতীর
অভিলষিত আলিঙ্গন ও চুম্বন ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে
বোধ হয় আমরা আমাদের প্রেমিক পাঠকগণের মনস্তপ্তি
করিতে পারি নাই; কেন না তাহা নিছক প্রেমচিত্র

ছিল; অনাবিল প্রেম অর্ধের নিকণ শোনে না; তাহা
সর্ব্বদা দৈব চিত্র দরিদ্র; তাহা তাহে না যে অর্ধে
কোনও স্থখলাভ হইবে।

আমরা প্রেমচিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া একবার
অকৃতকার্য হইয়াছি। কিন্তু আমাদের অধ্যবসায় আছে।
আমরা আবার চেষ্টা করিয়া দেখিব বোধ প্রেমচিত্র
আঁকিতে পারি কি না।—“যে কতে যদি ন সিদ্ধতি
কোহত্র দোষঃ।”

রমেশ ও ভ্যোতিঃপ্রকাশ উত্তান মধ্যে সেই বেকের

দেখিয়া উত্তরে গাজোখান করিয়া আপন আপন বাটীর দিকে ফিরিল। জ্যোতিঃপ্রকাশের পকেটে পরসী ছিল, সে ট্রাম গাড়ীতে উঠিল। বলশালী রমেশ পদব্রজে চলিল।

রমেশের ক্ষুদ্র সংসারে আর কেহ ছিল না; কেবল মা ও জী ছিল। পাঁচ বৎসর আগে তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল; তদবধি সে দরিদ্রতার নিম্পেষিত হইতে-ছিল। পিতা সওদাগরি আফিসে সামান্য বেতনের কেরানী ছিলেন। সামান্য পৈতৃক গৃহ ব্যতীত জী পুত্রের ভ্রাতৃ আর কিছুই রাখিয়া বাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিহীন রমেশও অধিক বেতনের চাকুরী লাভ করিতে পারে নাই। সে দালালের আফিসে মুহুরীগিরি করিয়া যে বিশ টাকা বেতন পাইত, তাহাতে কলিকাতার মত স্থানে থাকিয়া, সংসারস্বাভাৱী নিকাহ করা কত শক্ত কায তাহা সহজেই অনুমের। কিন্তু রমেশ এই শক্ত কায হাসিমুখে নিকাহ করিত।

ভগবান দরিদ্র রমেশচন্দ্রকে দুইটি অপারিষ সম্পদের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহার অগাধ মাতৃভক্তি ছিল, আর প্রণয়িনী পত্নীর ভ্রাতৃ তাহার সয়লস্বদরে অহরহঃ যে প্রেম সঞ্চারিত হইত, তাহার তুলনা এই পৃথিবীতে নাই। এই দুই সম্পদে সে দারিদ্র্যের ক্লেশছারাকে চিরোন্মূল করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার সামান্য বাটীতে সর্বদা ভক্তি ও প্রেমের যে বজ্রা বহিত, তাহাতে দারিদ্র্যের সমস্ত মলিনতা বিধৌত হইয়া বাইত; তাহাদের সামান্য খাদ্য সামগ্রীকে মধুর রসে প্রাণিত করিয়া দিত।

এই ভক্তি ও প্রেম বন্ধে বহন করিয়া, সে বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল, “মা”।

গর্ভধারিণী ব্যতীত অজ্ঞা জীলোককে ‘মা’ বলিয়া সম্বোধন করিলে, তাহার হৃদয়েও পরমানন্দের সঞ্চার হয়। আপন গর্ভধারণীকে পুত্র বধন মা বলিয়া সম্বোধন করে, ‘খন তাহার হৃদয় মধ্যে যে আনন্দের ঢেউ উঠে, যে অপারিষ সুধারাশি ক্ষরিত হয়, যে মহা আনন্দবাপী বন্ধ মধ্যে গজল করিয়া উঠে, তাহার তুলনা ত অর্পণও নাই।

মাতা সন্ধ্যাদীপ আলিয়া তুলসীভলার ঠাকুরের নিকট পুত্রের ভ্রাতৃ মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন। পুত্রের সুখ-পূর্ণ আশ্বাস শুনিয়া পুত্রের সুখ দেখিবার ভ্রাতৃ প্রদীপ হস্তে ছুটয়া আসিলেন। পুত্রকে স্বর্গীয় কলেবর দেখিয়া ডাকিলেন, “বৌমা একখানা পাখা নিয়ে একবার এস ত মা।”

বৌমা পাখা লইয়া পূর্বেই নিভুতে হাজির ছিল। এক্ষণে স্বর্গঠাকুরাণীর আদেশ পাইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল এবং স্বামীকে বীজন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বধুর নাম মালতী। মালতী শ্রামবর্ণা যুবতী, শ্যামা মালতী লতার মতই দ্বিধ। মালতী শ্রামবর্ণা হইলেও রূপসী। বাহারা সৌন্দর্যের উপাসক তাহার সহজেই বুঝিবে যে, স্নগোর গাজকাতিই সর্বদা রমণীর সৌন্দর্যের নিদর্শন নহে; বুঝিবে যে পরিপুষ্ট স্বাস্থ্য এবং জ্ঞান মনস্তিই রমণীগণকে মধুরা করিয়া থাকে। মালতীর এই দুই সম্পদই ছিল। সুল্যবান উপাদের আহার ধনিগণকে যে স্বাস্থ্যদান করিতে পারে না, তাহা দরিদ্রা মালতী তাহার সামান্য আহারেই লাভ করিয়াছিল, তাহার উপর স্বাভাবিক বদে, স্বামীর আদরে তাহার মনস্তিও অতাব ছিল না।

মালতী স্বাভাবিক নিকট শিক্ষা করিয়াছিল যে স্বামী জীলোকের পক্ষে দেবতা। দেবদর্শন করিতে বাইবার সময় যেমন উৎসব বসন পরিতে হয়, স্বামীকে দর্শন করিতে বাইবার সময়, তেমনই উৎসব বসন পরিয়া বাইতে হয়; আনন্দময়ের মন্দিরে যেমন হাসিমুখে বাইতে হয় তেমনই হাসিমুখে স্বামীকে দেখিতে হয়। দরিদ্রা মালতীর উৎসব বসন ছিল না। কিন্তু সে সর্বদা পরি-মার্জিত গায়ে নির্মল পরিষ্কৃত পরিধের পরিয়া বিমল দ্বিধ রক্তাধরে মধুর হাসি ভরিয়া স্বামীর কাছে আসিত। কদাচ কদমলিষ্ঠ বা ঠেল হরিজাদি রক্তবোপকরণলিষ্ট বসনে তাহার প্রাণের দেবতার কাছে আসিত না।

রমেশ পরিপুষ্ট নয়নে সেই ব্যঙ্গমরতা নির্মলার সম্মিত সুখ দেখিল, অবগতন মধ্যে, কাহ্নস মধ্যে দীপ শিখার স্তায় তাহার প্রেমোন্মদ বিশাণ নয়নের দীপ্তি

দেখিল; মধুঃ রক্তাধরে অনিলের চিরোচ্ছল প্রভা
নিরীক্ষণ করিল। মহা প্রেমানন্দে তাহার সরল হৃদয়
ভরিয়া গেল—সে দারিদ্র্যের সব মানি ভুলিয়া গেল।

কিন্তু রমেশ দরিদ্র হইলেও মালতী তাহাদের সংসারে
কোনও অভাব দেখিতে পাইত না। তাহার একদিনের
বাক্য শুনিগে ইহা প্রতীতি হইবে। একদিন তাহার
ঋদ্ধাকুরাগী পুত্রের কোন সেবার সম্ভব হইয়া, মালতীকে
বলিয়াছিলেন, “তুমি দেখে নিও আমার আশীর্বাদে
রমেশের খুব ভাল হবে।” এই কথা শুনিয়া মালতী
লজ্জাবনত মুখে উত্তর করিয়াছিল, “আর ক ভাল হবে
না? মায়ের সেবার উনি যে দেবতার চেয়ে বড় হয়েছেন,
আমাদের ত কোন অভাব কোন অসুখ নেই।”

অবাস্তব কথাই আবার গল্পের সূত্র হারাইয়া
কেলিতেছি। এক্ষণে ও সব কথা ত্যাগ করিয়া মাতা
পুত্রকে নিকটে পাইয়া কি বলিলেন, আমান্নগকে
তাহাই শুনিতে হইবে।

মাতা বধূকে পুত্রের ব্যঙ্গনে নিযুক্ত রাখিয়া কহিলেন,
“তুমি কোথায় গিয়েছিলি? এ যে ঘামে নেয়ে উঠেছিস।”

রমেশ বলিল, “আজ মা কোম্পানীর বাগানে জ্যোতিঃ
প্রকাশের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে আসবার
সময় জ্যোতিঃপ্রকাশ ট্রামগাড়ীতে এলো। আমার পকেটে
পরসা ছিল না তাই এইটুকু রাস্তা হেঁটে এগেছি। সন্ধ্যা
হয়ে গিয়েছিল, তোমরা ভাববে বলে একটু জোরে
চলে এসেছি, তাই ঘামে গেছি।”

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাস্তার বেকবার সময়
কিছু পরসা নিয়ে বেকস না কেন?”

রমেশ কহিল, “আগে আগে বেকতাম। কিন্তু
দেখেছি, পকেটে পরসা থাকলেই থরচ হয়ে যায়। রাস্তার
ধারে কল মূলটি দেখতে পেলে লোভ সামলাতে পারিনে,
কিনে কেলি। শেষে মাসের শেষে টানাটানি পড়ে
যায়।”

মাতা বুঝিলেন পুত্র কাহার লজ্জা কলমুল ক্রয় করিবার
লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। বুঝিয়া মাতৃহৃৎ
পুত্রকে মনে মনে আশীর্বাদ করিলেন। পরে বলিলেন,

“এখন উপরে গিয়ে একটু ভিরিয়ে নাও গে। বৌমা, বাও
ত মা ভিজে জামাটা খুলে নিয়ো।”

মালতীর বাজন বড় মিষ্ট। প্রেমমিত্ত হাতের গুণে
পাখার বাতাস কি এত মিষ্ট এত মিষ্ট হইয়াছিল?
অথবা সে পাখাখানা পূর্ণ হইতে শীতল জলে তিজাইয়া
রাখিয়াছিল? রমেশ সেই বাতানে বড় পরিতৃপ্ত হইতে-
ছিল; তাহা বেন মালতীর প্রেমপূর্ণ আদরের ভাস,
অথবা দেবতার আশীর্বাদ বৃষ্টির ভায় তাহার গায়ে বর্ষিত
হইতেছিল। এক্ষণে মায়ার আদেশ পাইয়া সে একটু
বিশ্রাম লাভের লজ্জা উপরে উঠিল।

উপরে দুইটি কক্ষ ছিল। একটিতে মাতার লজ্জা
শয্যা রচিত ছিল। অস্ত্রপানিতে মেঝের উপর রমেশের
শয্যা বিস্তৃত ছিল। উত্তর শয্যাই মালতীর গুণে
পরিণাটি ও নির্মল। কক্ষটিতে দুই একটি পেটক ও দাক
নির্মিত বাক্স ছিল। রমেশ উপরে উঠিয়া অন্ধকারে
আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর উপবেশন
করিল।

মালতী আর একটি প্রদীপ জালাইয়া উঠা হস্তে লইয়া
রমেশের অঙ্গসংগে করিয়াছিল। সে রমেশের কক্ষে
প্রবেশ করিয়া নিজের হাতোচ্ছল মাথুরীতে
ও দীপালোকে কক্ষটি আলোকিত করিল। হস্তহিত
মুগ্ধপ্রদীপটি মার্জিত বর্ণের ন্যায় একটি শিতল নির্মিত
পিললুকের রাখিল। হস্তাহলিখিত তৈল ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডে মুছিল।
রক্তাক্ত পদতলের ধূলি একটি ছিন্ন চটে ঝাড়িল। তাহার
পর রমেশের পারের কাছে শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিল,
যেব সূক্ষ্মমতী হাসি আগিয়া রমেশের নয়নাগ্রে বিরাজিত
হইল।

মালতী রমেশের আবার দিকে তাকাইয়া বলিল,
“তোমার জামাটা খুলে আমার হাতে দাও; এখন
বাইরে হাওয়ার শুকুতে দিই, কাল হুপুর বেলা ওটা
সাবান দ্বারা কেচে দেবো এখন।”

রমেশ বলিল, “কাল হুপুর বেলা? কাল আমি
আকিস বাব কি পরে?”

মালতী। কেন তোমার আর একটা জামা আছে।

রমেশ। সেটা পরবার মত নেই, ছিঁড়ে গেছে।

মালতী। ছেড়ে নি, সেলাই খসে গিয়েছিল, তা আমি সেয়ে কেচে তুলে রেখেছি। তোমাকে এনে দেখাচ্ছি, দেখ যদি সেটাতে না চলে তাহলে এই জামাটা আম রাত্রেই কেচে দেব।

রমেশ। তা আর কাঁচ নেই। তাহলে যে আমার কাছে আসতে তোমার অনেক দেরী হয়ে যাবে।

মালতী হাসিল, সে হাসিতে চেঁচরাশি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কহিল, “তা না হয় একটু দেরী হল। কিন্তু জামা কাটতে হলে ক’ল কি না দেখবার জন্যে প্রদীপটা নীচে নিয়ে যেতে হবে, তোমাকে খানিকক্ষণ অন্ধকারে থাকতে হবে।”

রমেশ বলিল, “তুমিও থাকবে না—আবার প্রদীপটাও থাকবে না? এ যে অমাবস্তার আকাশে মেঘে ঘনবট হবে! না না তোমার রাত বেগে জামা কাটতে হবে না; আমি একলাটি অন্ধকারে থাকতে পারব না। তার চেয়ে আমি সেই ছেঁড়া জামাটা পরেই কাল আকিসে যাব।”

মালতী তাহার অন্তর্পন্থিত আশঙ্কার বামীকে শব্দিত দেখিয়া মনে মনে অতিশয় আনন্দিতা হইল, প্রকাশে একটু হাসিল মাত্র। সেই সুস্থ হাসি দেখিয়া রমেশ হৃদয় মধ্যে অন্ততব করিল যে, বুঝি সেই স্নিগ্ধ হাসিতে ঘন-ঘটাকীর্ণ অমাবস্তার আকাশও জ্যোৎস্নারাসিতে ভরিয়া যায়। বামীকে সেই অন্তত্বতির মধ্যে রাখিয়া মালতী হাসিমুখে বলিল, “পুরান জামাটা পরা চলবে; আমি বরং এনে দেখাই।” এই বলিয়া সে রমেশের আদরমাখা হস্তের আকর্ষণ হইতে আপন কোকসদৃশ করণমব যুক্ত করিয়া, সন্ধ্যর পোটক খুলিয়া একটি অমল জামা রমেশের হস্তে আনিয়া দিল।

রমেশ জামা দেখিয়া বুঝিল যে, একমাস কাল আর একটি জামা জ্বরের ব্যয় হইতে পরিজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। ইহাতে সে হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়া পরীকে প্রশংসমান নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, “বাঃ, এবে একেবারে নূতন জামা হয়েছে।”

প্রীতিতে মালতীর বক্ষ ভরিয়া গেল। কিন্তু মুখে সে কোনও কথা বলিল না।

রমেশ আবার তাহার করতল আপন করতল মধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিল, “এখন আমার ভাবনা আর নেই। এখন তুমি একটু বল।”

মালতী বসিয়া বলিল, “এস তোমাকে আর একটু বাতাস করি।”

রমেশ বলিল, “না, না, বাতাস আর করতে হবে না। তুমি শুধু বস। আমি তোমাকে দেখি, তোমাকে দেখলে আমার প্রীতি থাকে না।”

বাস্তবিক মালতীর স্নিগ্ধ সৃষ্টি দেখিলে রমেশের প্রীতি থাকিত না; তাহার হাসিমাখা মুখের দিকে তাকাইলে তাহার সুখা থাকিত না। সে একাই সমস্ত পরিতৃপ্তি আনিয়া দিত। শীতের শীতল দিনে দরিদ্র রমেশের পক্ষে সে ক্রিকেট ক্লাবের কাঁচ করিত, নিরাপত্তার তপ্ত দিনে সুশীতল মল্লমারুতের কাঁচ করিত।

হুইজনে হুইজনকে দেখিল; দেখিতে দেখিতে বেন তাহার উভয়ের সৌন্দর্যাসাগরে ডুবিয়া গেল। উভয়ে উভয়ের মধুর কথা শুনি, শুনিতে শুনিতে বেন তাহাদের কর্ণমধুরতার ভরিয়া গেল। কতক্ষণ পরে রমেশ চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, “মা যে একলা নীচে রয়েছেন।”

মালতী ধীরে ধীরে বলিল, “হাঁ, এতক্ষণ মালা অপে ছিলেন। এইবার বোধ হয় মালা জপা হয়ে গেছে। এইবার আমি নীচে যাঈ, কেমন? রান্নাবান্নার যোগাড় দেখি গে।”

রমেশ কহিল, “ল, আমিও নীচে যাই। সেখানে মার সঙ্গে গল্প করব; আর তুমি রাখবে, তোমার চুড়ির টুন টুন শব্দ শুনবো। বড়লোকেরা শুনেছি, সন্ধ্যার সময় গল্প করে আর গান শোনে। আমিও আজ বড় লোক হব, মার সঙ্গে গল্প করব, আর তোমার চুড়ির সঙ্গীত শুনব।”

বামীর উক্তিহে মালতী প্রীতি হইয়াছিল; কিন্তু সে মুখে কেবল বলিল, “বাঃ ঠাট্টা করতে হবে না।” এই বলিয়া সে স্বশ্রুতাকুরাণীর নিকট নিয়ে চলিয়া গেল।

বলাবাহুল্য রমেশ তাহার পশ্চাতে আসিয়া মাতার সহিত গল্প করিয়াছিল এবং পত্রীর চুড়ির টুন টুন সঙ্গীতও শুনিয়াছিল।

কিন্তু আমরা এ কি করিতেছি? এই কি মধুর প্রেমের চির রত্নিন চিত্র হইল? ইহাতে কোকিল কুজিত সরোবর শোভিত মধুর ওজিত পুষ্পোদ্ভান কৈ? ইহাতে রসিক সুবক সুবতীর প্রেমরসসিক্ত মধুর বাক্য বিভাস কৈ? ইহাতে ভুগল অথবা পুষ্পমালা নিম্নিত বাহুর কোমল বন্ধন কৈ? ইহাতে চঞ্চল তড়িতলু চকিত কটাক্ষ কৈ? সুবন্ধনের চিরবাহিত মধুরস-সিক্ত কোমল রক্তাধরের চূষন কৈ? তা ছাড়া গোড়ার গলদ,—নারিক। যে বকীয়া! পরকীয়া না হইলে আবার প্রেম?—ছোঃ। হি হি আমরা ঠাকুর গড়িতে বীদর গড়িলাম। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও। আমরা বদ্ব করিয়াছিলাম; কিন্তু এই দুষ্টিহীন বুদ্ধ বংশে এই কল্পিত হস্ত লইয়া তোমাদের অভিলষিত প্রেমচিহ্ন আঁকিতে পারি নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নাবালিকা বধু।

জ্যোতিঃ প্রকাশ সন্ধ্যার সময় বাটী কিরিয়া, আন্ধারি পাক্কাবী আবৃত বন্ধে জ্যোতির্শ্রীর জ্যোতির্শ্র আলোখ্য অঁত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিল; এবং বহির্কীটীর কক্ষটিতে মলিন মাহুরের উঁর, জীর্ণ তক্তাপোবে শুইয়া পড়িয়া তাহার ঘানে আপনাকে নিযুক্ত রাখিল। আহা! স্বপ্নীর এত রূপ সে ত আগে কখনও কোথায় নয়ন-পোচর করে নাই। জ্যোতির্শ্রীর রূপাধির প্রবল জ্যোতিতে পৃথিবীর লোক দিশাহারা হইয়া যায়; সেই রূপাধির তাপে, বোধহয়, গোষ্ঠীশব্দের মাধার চির-সংহত তুষাররাশিও গলিয়া যায়। সেই জ্যোতিঃ সেই তাপ স্বরূপে পুরিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ কেমন করিয়া ছিন্ন হইয়া থাকিবে? সে কেবলই অস্থির চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল,—এই সুবাসন্য অবয়ব কি গ্রহনদলের

লাগিতা দিয়া রচিত হইয়াছিল? অথবা, স্বর্গের কোনও অঙ্গরী সৌন্দর্যের নীলা দেখাইবার মত মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিল?

কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্শ্রীর রূপের ধ্যান করিতেছিল কেন? সে কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে? জ্যোতির্শ্রী কি জাতি, বা অন্তপ্রকারে বিবাহযোগ্যা কিনা, সে এই সকল বিবরণ ত কিছুই জানে না। সে এ সকল কিছুই জানিতে চাহে না; সে জানিত, প্রেমের জাতিভেদ নাই; আর অন্ত প্রকারের বাধা অতিক্রম করিতে বর্ষাধ প্রেম কখনই পরাশ্রয় হয় না। সে সেই প্রোমবেগ কোন ক্রমেই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না; সে জ্যোতির্শ্রীকে বিবাহ করিবেই;—স্বরং হিমালয় তাহার বিবাহ-পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইলেও, তাহার প্রেচও প্রেমের অমিত বেগ, ডিনামাইটের মত, সে বাধা চূর্ণ করিয়া, ধুলির আকারে ব্যোমপথে উড়াইয়া দিবে; স্বরং ভারতগঙ্গার আসিরা, যদি তাহার বিয় হইয়া দাঁড়ায়, তবে,—সে বাগমার একপুত্র, প্রাণের ভয়ে কখন জলে নামিয়া সত্তরণ শিক্ষা করে নাই; কাষেই সে সাতরাইয়া ভারতজলধি পার হইতে পারিবে না; কিন্তু,—সে বৃদ্ধপ্রেম স্বরূপ হইতে এমন তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির করিবে যে, তাহার তাপে মহানসুজের সমুদার লবণাধু বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। সে অন্ধকার ঘরে, মলিন মাহুরের উপর শুইয়া, দেবতাগণকে সাক্ষী করিয়া সত্যই অসুচু এতিজ্ঞা করিয়া বলিল যে, যেমন করিয়া হউক, সে সুন্দরী জ্যোতির্শ্রীকে বিবাহ করিবেই। কি উপায়ে সে এই কার্য সম্পন্ন করিবে, সে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। প্রথম বাধা.....

সে একটা মহা লজ্জার কথা। তাহা তত্ত্বসমাজে প্রকাশ করিবার নয়; কিন্তু না বলিলেও আমাদের এই আধ্যাত্মিক অদহীন হইবে। তাই জনান্তিকে তোমাদের কর্ণের গোপন গহবরে অত্যন্ত চুপি চুপি বলিব।

সেই মর্শ্বাত্তিক লজ্জার কথাটা এই। প্রায় চারি

বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ বধন জীমান জ্যোতিঃপ্রকাশ বি, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছিল, সে তখন এক পল্লীগ্রাম-বাসিনী, অশিক্ষিতা, নোলকপরা, একাদশবর্ষীয়া, নাবালিকা বালিকাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু সে লজ্জার কথা, সে, রমেশ প্রভৃতি তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সমাজেও প্রকাশ করে নাই।—কৃত্তমানী একাদশ-বর্ষীয়া বালিকাকে, তাহার মত উচ্চশিক্ষিত, চন্দ্রমালকৃত সুখ বিবাহ করিয়াছে, এ কথা জানিতে পারিলেও যে বন্ধুসমাজ ছি-ছি-কার করিবে।

এই বিবাহটা এইরূপে ঘটয়াছিল। পঞ্চাদির মৃত-দেহ দেখিলে, গৃহগণ যেমন ছুটিয়া আসিয়া তাহার উপর পতিত হয়, সংবাদপত্র পাঠ করিয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ বি, এ, সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে এই শুভসংবাদ অবগত হইয়া কত্কা-অভিভাবকগণের লোলুপ দৃষ্টি তেমনই তাহার উপর পতিত হইল। অনেক লোকের প্রস্তাবের পর, একজনের প্রস্তাব রামপ্রাণ বাবুর মনোনীত হইল। জ্যোতিঃপ্রকাশের মাতাও একটি নোলক পরা টুকটুক পুত্রবধু পাইবার জন্য, এবং ওদ্বারা আপন অন্ধকার গৃহ আলোকিত করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য শিক্ষিত জ্যোতিঃপ্রকাশের একরূপ প্রেমহীন বিবাহে আদৌ কোনও উৎসাহ ছিল না; এবং প্রথমে সে বিবাহ করিতে একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিল। রামপ্রাণবাবুও পুত্রের বিজ্ঞাশিক্ষার কতি হইবে, আশঙ্কা করিয়া প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। অবশেষে এই সুবিধানক বিবাহ প্রস্তাব পাইয়া সহজেই রাজি হইলেন। পল্লীগ্রামের এক হাবতাব চাকুরী, বিহীন, অপরিণতবয়স্ক, বালিকা বধু পাইয়া ভাবিলেন, বধুর বয়স নয়, বিশেষতঃ এক্ষণে সে পিজালয়ে থাকিবে, সুতরাং জীমানের পড়াপড়ার কোনও কতি হইবে না; অধিকন্ত, যোতুক বাবদ চারি হাজার টাকা নগদ পাওয়ার পুত্রের এম, এ,—বি, এল, পড়িবার সমূহ ব্যয় তাহা হইতে নির্বাহ হইতে পারিবে। পুত্রকাদি ক্রয় করিবার জন্য, এবং সোনার হাত বড়ী ও

হীরকাসুরী, স্বর্ণবোতাম, চশমা, পাঞ্জাবী, লপেটা, ক্রমাল, এসেন্স সিগারেট প্রভৃতি ক্রয় জন্য, এবং বন্ধুবর্গকে চপ্ কাটলেট ইত্যাদি দ্রব্য পাওয়ারিবার জন্য, নগদ যোতুক হইতে, হাজার টাকা প্রাপ্ত হওয়ার, জীমান জ্যোতিঃপ্রকাশও আর শুভবিবাহে কোনও আপত্তি করে নাই।

এইরূপ চারিবৎসর পূর্বে জ্যোতিঃপ্রকাশের বিবাহ হইয়াছিল। এইরূপে যোতুক অর্থের কিয়দংশ সে পিতার নিকট উৎকোচ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, নিজের উৎকট সখ মিটাইল; বন্ধুবর্গের রসনা-তৃপ্ত জন্য উক্ত অজানিত দ্রব্যের ভোজনাগারে ব্যয় করিল, সিগারেট ফুকিল, গন্ধ উড়াইল; এইরূপে কতাদার-প্রাপ্ত অভিভাবকের কঠে-সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ উদারাময়ে ও সিগারেটের ধূমে পরিণত হইল। কিন্তু তাহার বন্ধুবর্গের মধ্যে একজনও ঘৃণাকরে জানিল না যে, জ্যোতিঃপ্রকাশের বিবাহ হইয়াছে।

শুধু বিবাহই হয় নাই। কলেজ বন্ধ থাকিলে স্কোষ্ঠ শ্যালকের সাদর আস্থানে, সে মাঝে মাঝে খণ্ডরালয়ে বাইরা জামাতার মহা আদর লাভ করিয়াছে। আর—আর পত্নীর প্রেম! তাহা কি লাভ করে নাই? তোমরা বিস্মিত হইও না, আমরা বলিব, ই! সে পত্নীপ্রেমও লাভ করিয়াছিল। তোমরা অবিশ্বাস করিলেও, এখনও আমাদের এই পুণ্য দেশে পল্লীগ্রামের কুসংস্কারাজ্ঞ বালিকাগণ, এগার বার বৎসরেই “বর”কে ভালবাসিতে, বর করিতে, ও ভক্তি করিতে পারে। এই ভালবাসা, এই বর, এবং এই ভক্তি মাতৃগর্ভ হইতে তাহাদের রক্তে মিশিয়া থাকে।

যে বধুর সহিত জ্যোতিঃপ্রকাশের বিবাহ হইয়াছিল, তাহার নাম নগবালা। বিবাহের পরেই একদিন সন্ধ্যার পর নগবালা ঠাকুরমার নিকট উঠিয়া ছিল। নানা কথার মধ্যে ঠাকুরমা তাহাকে প্রশ্ন করিলেন যে, বরকে তাহার পছন্দ হইয়াছে কিনা? এই প্রশ্ন শুনিয়া নগবালা লজ্জার লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু ঠাকুরমার কাণের কাছে তাহার লজ্জাক্ত নোলক

পরা সুখখানি আনিয়া চুপি চুপি বলিয়াছিল, 'হাঁ, শুধু পছন্দ হ'য়েছে।' পছন্দ হইবারই কথা';—এ পছন্দ স্বামীর গুণের উপর নির্ভর করে না; ইহা রূপজ মোহ নহে; ইহা যৌবন অলস আকর্ষণও নহে; ইহা হিন্দুবালিকার অন্তর্গত সংস্কার।

জ্যোতিঃপ্রকাশও কি নগবালাকে সেই বসে ভাল-বাসিয়াছিল? কেমন করিয়া বাসিবে? সে তাহার অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিয়া চাহিয়াও দেখে নাই, বধু সুরূপা কি কুরূপা।—‘শ্রমসহীনা, অশিক্ষিত’, একাদশ বর্ষীয়া, নাবালিকা। বালিকাকে কি শিক্ষিত যুবক তাহার চশমাভূত চক্ষুদ্বারা চাহিয়া দেখে? সে যুগ ত চাহিয়া দেখিবার সামগ্রী নহে।

কিন্তু এখন ত নগবালা আর একাদশ বর্ষীয়া বালিকা নহে। এক্ষণে সে পঞ্চদশ বর্ষীয়া কিশোরী; বিধাতা তাহার দেহপটে যৌবনের রং ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে নগবালায় পছন্দটা, অলস দেওয়া ছুঁড়ের মত, ঘন হইয়া গাঢ় প্রেমের পরিণত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার ‘ফুটোনোগু’ যৌবন জ্যোতিঃপ্রকাশের দেখিবার সামগ্রী হইয়াছিল; এবং সংপ্রতি স্বপ্তকালে বাইরা, তাহাকে সে যুগু নেমে নিরীক্ষণ করিয়াছিল; এবং তাহাকে আদর না করিয়া থাকিতেও পারে নাই। কিন্তু সে তাহার লজ্জাবিজড়িত বাক্যে প্রেমের ‘ফুর্টি’ দেখিতে পার নাই. এবং সে বাক্যে শিক্ষা গৌরবেরও সন্ধান পায় নাই।

তাহার পর, বাটী কিরিয়া ইডেন ব'গানে বেড়াইতে গিয়া তাহার সর্বনাশ হইল; তাহার দেহমধ্যে পাপ প্রবেশ করিল।—সে অশিক্ষিতা, প্রেমসম্পূর্ণ, যৌবনোচ্ছাদনময়ী জ্যোতিঃশ্রীরীকে দেখিল; তাহার শিরায় শিরায় নুতন প্রেমের প্রবল বজা বহিল। সেই বজার বালিকা নগবালায় ব্রীড়া-সংকুচিত সৃষ্টি কোথায় তাসিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকমলের কথা।

কয়েকদিন পরে, জ্যোতিঃপ্রকাশ রমণের

সঙ্গে আবার সেই বাগানে বৈকানিক ভ্রমণে গিয়াছিল।

সেদিনও সেখানে মলয় পবন, তাসীরবী জলকণা স্পর্শে শীতল হইয়া বহিতেছিল, পুষ্ণিত কুঞ্জে কুঞ্জে প্রস্রবণপুঞ্জ তেমনই হাসিতেছিল; সঙ্গীতের স্বরলহরী তেমনই বিজাতীয় উদ্দীপনা আনিয়া দিতেছিল এবং আলোকমালা তেমনই দীপ্তি প্রদান করিতেছিল। কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রেমতীক্ষ্মমনে শত অত্মসন্ধান করিয়াও আজ সেখানে জ্যোতিঃশ্রীরীকে দেখিতে পাইল না। খুঁজিতে খুঁজিতে সে কেবল কৃষ্ণকমলকে একটি বেকের উপরে একাকী সমাসীন দেখিল। সে কতকটা আনন্দিত হইয়া সেই বেকের নিবট আসিল।

রমণকে দেখিয়া কৃষ্ণকমল সৌভাগ্য সহকারে নমস্কার করিল; এবং তাহার পার্শ্বে তাহার বসিবার স্থান করিয়া দিল।

রমণ প্রতিনমস্কার করিল। এবং জ্যোতিঃপ্রকাশের সঙ্গে কৃষ্ণকমলের পার্শ্বে উপবেশন করিল। আজ তাহার সঙ্গে জ্যোতিঃশ্রীরী ছিল না; কা'বই অপরিচিত ভদ্রমহিলা সঙ্গে থাকিলে, কথা কহিবার পক্ষে, ভদ্রতার বে বাধা থাকে, আজ আর সে বাধা ছিল না। আজ রমণ কৃষ্ণকমলের সহিত কথা কহিল; তাহার এবং তাহার তগিনীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল; জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত তাহার পরিচয় ঘটাইয়া দিল।

এক্ষণে কৃষ্ণকমলের সহিত জ্যোতিঃপ্রকাশের পরিচয় ঘটায়, উভয়ে উভয়ের সহিত সন্মিলন করিবার সুযোগ হইল। কিয়ৎকাল সন্মিলনের পর, কৃষ্ণকমল আগন পকেট হইতে স্মৃদুস্ত সিগারেটের খোঁটা বাহির করিয়া, এবং তাহা হইতে ছুটি সিগারেট লইয়া, একটি জ্যোতিঃপ্রকাশকে দিল, এবং অপরটি রমণকে দিবার লজ্জা বৃত্ত প্রসারিত করিল; কিন্তু রমণ সিগারেট প্রত্যাশী নহে জানিয়া, নিজেই উহা যুগ তজ্জনা সহকারে, সুকোশলে আগন বধুপুটে গ্রহণ করিল। পরে বেশলাই জালিয়া, সেই একই বাটীতে জ্যোতিঃ-

প্রকাশের সুখস্থিত সিগারেটটি ধরাইয়া দিয়া, নিজের অধরদ্বিত সিগারেটটিও জালাইয়া লইল। যে ভাবে কৃষ্ণকমল এই কার্যটি সম্পন্ন করিল; তাহাতে তাহার সিগারেট খাওয়ার পারদর্শিতা সম্বন্ধে, বোধ হয়, কেহই সন্দেহান হইবে না।

কৃষ্ণকমলের নিকট সেই সিগারেট প্রাপ্ত হইয়া, এবং তাহার সরস ও মধুর সদালাপে, জ্যোতিঃ-প্রকাশ সুখ হইয়া গেল; মনে করিল, পৃথিবীর মধ্যে, কৃষ্ণকমল তাহার সব চেয়ে আত্মীয়।

সন্ধ্যা বনোভূত হইতেছে দেখিয়া, রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং বলিল, “আজ আমার কাব আছে। আমি বাই।”

কৃষ্ণকমল সামনের জ্যোতিঃপ্রকাশের হস্তধারণ করিয়া, রমেশকে বলিল “তুমি যাও; আমরা একটু পরে যাব।”

রমেশ প্রস্থান করিলে, রমেশের দর্পিততা প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদের দিকে অবজ্ঞাকবাক্তিত গোচনে তাকাইয়া তাহার দাঁড়িয়া ভক্ত তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণকমল বলিল, “নেহাৎ hand to mouth। ওর সঙ্গে আমাদের গোথাবে না। চলুন জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবু, একটা refreshment room এ গিয়ে একটু তাল হরে নেওয়া যাক। কলেজকোয়ারে যে নতুন refreshment room খুলেছে, বড় neat and clean—চলুন, সেইখানে যাওয়া যাক; সেখান থেকে ছু cup চা খেয়ে বাড়ী ফেরা যাব।”

কৃষ্ণকমল কখনও বিজ্ঞানার্গে পরিভ্রমণ করে নাই; সে কেবল ভগিনীর কল্পকমল ধরিয়াই সংসারপথে বিচরণ করিয়াছে। কিন্তু ইংরাজী ভাষা—দালালদের সঙ্গে বিশিষ্ট ছুই চারিটি ইংরাজি বাক্য শিখিয়াছিল; তাহাই তাহার অশিক্ষিত বাঙ্গালার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার ইংরাজি ভাষার দৌড় দেখাইতে চেষ্টা করিত। বাহারা ইংরাজি ভাল জানে না, তাহারাই কথা কহিতে বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজির অনাবশ্যক বুকনি দেয় ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ কৃষ্ণকমলের ছুই পেরাণ চা খাইবার প্রস্তাবে কিছু চিন্তিত হইল। ভাবিল, তাহার পকেটস্থিত ব্যাগে সে শু কেবল মাত্র আট আনা পরসী লইয়া বাহির হইয়াছিল; তাহারও কতক ইতিপূর্বেই ট্রাম ডাক্তার ও সিগারেটে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। একপে তাহার ব্যাগে চারি আনা মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই চারি আনা পরসী তাহার সবই ফেরত বাইবার ট্রামডাক্তার ব্যয় হইয়া যাইবে। তাহা হইলে, সে চা খাইবার অর্থ কোথায় পাইবে? এই অভাব তাহার বন্ধাদির পারিপাট্যের সহিত মোটেই মানইল না। জ্যোতিঃপ্রকাশের জাতার নিকট তাহার পকেট শূন্যতার সংবাদ দিতে অপমান ভয়ে তাহার গণ্ডহল উত্তপ্ত হৌর জ্বর রঙা হইয়া উঠিল। এই আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার সে কোন উপায় দেখিতে পাইল না।

কৃষ্ণকমলের বিজ্ঞান অতাবটা বিখ্যাত ধূর্ততার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিঃপ্রকাশকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়াই সে সেই ধূর্ততার বল সহজেই নতুন বস্তুর অর্থসকলের গোপন কথা প্রবাহিত করিল। সে চতুরতার সহিত বলিল, অবশ্য আপনি টাকা নিয়ে আজ বাড়ী থেকে বেরতে পারেন নি। সকল ভুললোকেরই নাকে নাকে এরকম ছোট খাট mistake হয়ে থাকে। Never mind! তার জগেই ত আমরা বন্ধুবান্ধব আছি। আমার টাকা আপনার টাকা; আবার আপনার টাকা আমার টাকা। আজকে অল্পগ্রহ করে আমাদেরই আমাদের সমস্ত বরটা নির্বাহ করতে দিন। আবার যেদিন আমার পকেট শূন্য থাকবে, সে দিন আপনি থরচ করলে আমি কিছুই আপত্তি করবো না।”

জ্যোতিঃপ্রকাশ কৃষ্ণকমলের দ্বারের সহস্র দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।

অন্তঃপর তাহার কলেজ কোয়ারে সেই নতুন ভোজনালয়ে বাইবার ভক্ত ট্রাম-গাড়ীতে আরোহণ করিল। জ্যোতিঃপ্রকাশ ট্রামডাক্তার দিবার ভক্ত আপন পকেটে হাত দিবার পূর্বেই কৃষ্ণকমল সশব্দে আপন পকেট হইতে পরসী বাহির করিয়া ছুইপনের ছুইখানি

টিকিট ক্রয় করিয়া, একখানি জ্যোতিঃপ্রকাশের বস্ত্রে অর্পণ করিল।

বধাস্থানে তাহার ট্রায় হইতে অবতরণ করিল; এবং ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। সেখানে জ্যোতিঃপ্রকাশের বসিবার জন্য কৃষ্ণকমল একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিয়া নিজে অন্য একটি চেয়ারে বসিল।

হোটেলের পরিচারকেরা তাহাদের কি আবশ্যক জানিবার জন্য নিকটে আসিলে কৃষ্ণকমল নিঃশব্দ পরিচিতির ন্যায় তাহাদিগকে আদেশ করিল :—কিন্তু কেবলমাত্র ছই পেরালা চাঁ আনিতে বলিল না, পরন্তু চপ কাটলেট এবং অন্তবিধ খাদ্য আনিবার ফরমাইস করিল। এবং তাহার ঐ ঐ খাদ্য আনিতে ছই নবীন বন্ধুতে মিলিয়া, তাহা মহানন্দে আহার করিল। আহার শেষ করিয়া তপ্ত চাঁ পানের দ্বারা আপনাদের কণ্ঠনালী পরিষ্কার করিয়া লইল। চাঁ পান করিতে করিতে ছই বন্ধুতে মিলিয়া অনেক গল্প করিল। কৃষ্ণকমলের গল্প শুনিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ বুলিল সে মহাধনী সন্তান;

আবার জ্যোতিঃপ্রকাশের গল্প শুনিয়া কৃষ্ণকমল বুলিল যে তাহার নবজ্জিত স্তন্য নিত্য নিত্য নির্ধন নহে; তবে তাহার পিতা কিছু ব্যয়কুঠ, তেমন সুবিধান ও শুলীল পুত্রের জন্তও সক্ষিত অর্থ ব্যয় করিতে কাতর।

রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময়, কৃষ্ণকমল হোটেলের পাওনা একটাকা বার আনা জ্যোতিঃপ্রকাশের সম্মুখেই পরিশোধ করিল। তাহার পর উভয় বন্ধুতেই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। কৃষ্ণকমল জ্যোতিঃপ্রকাশকে একটি সিগারেট দিয়া এবং তাহা ধরাইরা দিয়া, নিজে সিগারেটের ধূমপান করিতে করিতে আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্ময়ীর রূপ এবং কৃষ্ণকমলের সৌন্দর্যের কথা ভাবিতে রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় বাড়ী ফিরিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

দারার দুরদৃষ্ট

[পূর্বানুস্মৃতি]

অদৃষ্ট দেবতার অগ্রগম দৃষ্টি মাহুয়ের উপরে যখন পতিত হয় তখন বিজ্ঞা বুদ্ধি পুরুষকার প্রভৃতি কিছুই কোন কাষেই লাগে না, করারান্ত সিদ্ধি হস্তস্থলিত হইয়া পড়ে, বাহা ঘটবার নহে তাহাই ঘটয়া যায়; কেন্ হুল্লঙ্কা ছিন্নপথে দুর্ভাগ্য প্রবেশ করিয়া আমাদের সকল সাধনা ব্যর্থ করিয়া দেয় আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দারার ভাগ্য দেবতা অগ্রম হইলেন না, একান্ত সাধনার সিদ্ধিলাভ তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না, যে পরাতনের আশঙ্কা করিয়া তিনি পলারনের ব্যবস্থা পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন, অরশেবে তাঁহাকে সেই পলারনই

করিতে হইয়াছিল; রাজদ্রোহী ঔরঙ্গজেবকে শূল্যলিত করিয়া বিজয় গর্বে রাজপুরী প্রবেশ করতঃ পিতা শাহজাহানের পদতলে বিদ্রোহীকে উপস্থাপিত করা এবং বধাকালে তাঁহার ভাষা প্রাপ্য ময়ূর তক্তে আরোহণ তাঁহার কপালে ঘটিল না।

ছই দিবস ক্রমাগত রাত্রি দিন যুদ্ধের পরেও ঔরঙ্গজেব যখন দেখিলেন যে, ওরঙ্গ প্রাণীতে যুদ্ধ করিলে কেবল সৈন্ত ক্ষয় এবং শেষ কল পরাতব হুনিশ্চিত, তখন গোপন আক্রমণের পন্থা আবিষ্কারের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। দারার সৈন্তের উত্তর পার্শ্ব ডরারোহ শৈলের

দারা রক্ষিত স্ত্রতরাং সমুখ আক্রমণ বাতীত উপায় নাই, কিন্তু সে আক্রমণের কল ছই দিৎস পর্যন্ত দেখিয়া তিনি হতাশ হইরা গোপনে পর্ত্তারোধে করতঃ অতর্কিত ভাবে দারার পার্শ্ব আক্রমণের সুযোগ অবশেষের অস্ত্র সেনাপতিগণকে আদেশ দিলেন।

তদুত্তর পার্শ্বতঃ অংশের রাজপুত-রাজ রাজরূপসিংহ ঔরঙ্গজীবের একতম সেনানায়ক ছিলেন। পার্শ্বতঃ প্রদেশের অধিবাসী রাজপুতগণ পর্ত্তারোধে পটু; রাজরূপের এক সচিব রাজপুত সৈনিক রাজির অন্ধকারে গোপনে পর্ত্তাভোগি নিঃশব্দে আরোহণ করিতে লাগিল। সমুখ হইতে অধারোহী সৈন্তের দ্বারা যুগপৎ আক্রমণের ব্যবস্থা করা হইল। দারার সৈন্তের উত্তর পার্শ্ব শৈলশ্রেণীর দ্বারা সুরক্ষিত মনে করিয়া, দারা বা শাহনেওয়াজ সৈনিক হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা করেন নাই, তাঁহার সমুখে শত্রু দেখিয়া সমুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। দিলীর খাঁ, শাহজোয়া খাঁ, জয় সিংহ, সেখ মীর প্রভৃতি ঔরঙ্গজীবের সেনাপতিগণও তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইরা ক্রোধে অন্তরে অন্তরে জ্বলিতেছিলেন, সমুখে দারার সৈন্ত দেখিয়া প্রতিশোধ কামনার নিজ নিজ বল সহ প্রচণ্ড বেগে ধাবমান হইলেন। শাহনেওয়াজ, দারা ও সিপার অমুরূপ বীৰ্য্যে তাঁহাদের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতেছিলেন; এই সময়ে উত্তর পক্ষের বহু সৈন্ত ধ্বংস হইয়া গেল, ঔরঙ্গজীবের অসমসাহসী রণকুশল সেনাপতি সেখ মীর সাংঘাতিক আঘাতে আহত হইরা হস্তী পৃষ্ঠেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

দারার ব্যূহের সমুখভাগে যখন এই মহামার চলিতেছে, তখন নিঃশব্দ বীর পদক্ষেপে রাজরূপের রাজপুত সৈন্ত ঠেলায়োরোহণ করিয়া দারার ব্যূহের পার্শ্ব আক্রমণ করিল। দারা ও শাহনেওয়াজ সতরে দেখিলেন, বাহ্য অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন তাহাই সম্ভব হইয়াছে, দুর্ভেদ্য বলিয়া ব্যূহের যে অংশ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন, সেই অংশ তেদ করতঃ রাজরূপের রাজপুত সৈন্তের রূপ ধরিয়া দারার চূর্ত্তাপ্য সূক্ষ্মমান হইয়া দেখা দিল।

সমুখ ও পার্শ্ব হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইলে সে

আক্রমণ নিবারণ সহজসাধ্য নহে। কিন্তু শাহনেওয়াজ ও তাঁহার পুত্র, দারা বরং ও সিপার কেহই ভীত হন নাই, বিপদের সময়ে দিগুণ সাহসে ভর করিয়া তাঁহার সৈন্ত চালনা করিতে লাগিলেন এবং সৈন্তগণকে উৎসাহিত করিবার অস্ত্র নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া শত্রুর কামান ও বন্দুকের মুখে বারবার বাইতে লাগিলেন। এই সময়ের ধ্বংস লীলার বর্ণন ছঃসাধ্য। উত্তর পক্ষের সৈন্তের স্তূপীকৃত মৃতদেহ পর্ত্ততঃ প্রমাণ হইয়া উঠিল; মৃতদেহের উপরে দাঁড়াইয়া সেনা ও সেনাপতিগণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজীবের সাহসী সেনাপতি সেখ মীর মরণাহত হইয়াও বীর সৈন্তকে উৎসাহিত করিতে করিতে প্রণত্যাগ করিলেন। দিলীর খাঁ তীরবিদ্ধ হইয়া রক্তপ্রাবে ছুঁকল দেহ হইলেও রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন নাই। কলঃ দিলীর ও সেখ মীরের অমানুষিক সাহস এবং অণৌকিক প্রভুত্বের বলেই ঔরঙ্গজীব এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, নতুবা ঔরঙ্গজীবের চতুরতা এবং বিপুল বাহিনীর বলে কিছুই হইতে পারিত না। কেহ কেহ বলেন যে ঔরঙ্গজীব অর্থ দ্বারা দারার তোপখানার সিপাহীগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং দারার কামান হইতে গোহগোলা নিঃসৃত না হইয়া কেবল কাঁকা শব্দই বাহির হইয়াছে। একথা কতদূর সত্য তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। তবে ছল চতুরী কাপটা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি ব্যাপারে ঔরঙ্গজীব সার্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন; যুদ্ধের গতি দেখিয়া, দারার সৈন্যের অসুস্থবীৰ্য্য দেখিয়া, অর্থদ্বারা গেলান্দাগণকে বশ করা তাঁহার পক্ষে বিচিহ্ন নহে বরং স্বাভাবিক। অমিত বিক্রমে শাহনেওয়াজ ও তাঁহার পুত্র যুদ্ধ করিতেছিলেন, শত্রুপক্ষের গোলা আদিয়া যুদ্ধ বীর শাহনেওয়াজ খাঁর নখর দেহ রেণু রেণু করিয়া ফেলিল। অধর্ম্ম-আশ্রয়ী জামাতা ঔরঙ্গজীবের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ সম্রাটের আনন্দকুলাল ও সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী দারার জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে বীরের বাহিত রণমুহুর লাভ করিয়া শাহনেওয়াজ স্বর্গে চলিয়া গেলেন; তাঁহার বীর পুত্রও পিতার অমুগামী

হইলেন। পিতাপুত্র উভয়েই দারার অন্নরূপ বড়ারগণ্ডার পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রবীণ সেনাপতি শাহনেওয়াজ এবং তাঁহার বীর পুত্রের মৃত্যুতে দারার হতাবশিষ্ট সেনাগণ ভীত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল। দারার অন্যান্য সেনানায়কগণও কেহ হত এবং আহত হইয়া একে একে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপস্থত হইতে লাগিল। সিপায় ও দারা শেব সুহৃৎ পর্যন্ত মৃত্যুর সৈন্যগণকে ব্রাহ্মিত করিয়া ঔরঙ্গজীবের বিপুল সেনা-তরঙ্গাতিবাতের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন জয়ের আশা একান্তই তিরোহিত হইয়াছে, সে সময়ে রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সেনার সমুখীন হওয়া এবং যমমন্দিরের উন্মুক্ত দ্বারে বৈষ্ণব প্রবেশ করা একই কথা। সেরূপ স্থলে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া মৃত্যুকে অঙ্কন করিয়া লইতে পারে একরূপ বীর ভগতে আছে কিনা সন্দেহ। দারার স্বল্প সংখ্যক হতাবশিষ্ট সেনা তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া বে বেদিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল; ক্ষুদ্র, স্তম্ভ মর্দাহত দারা এবং কুমার সিপায় চিহ্নপুস্তলিকার ন্যায় রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ঔরঙ্গজীবের বাহিনীর অরোহণ ধ্বনি শুনেতে শুনিতে তাঁহাদের ললাটলিপির লেখকের উদ্দেশ্য কি বলিতেছিলেন কে জানে? সে সময়ে পিতা পুত্র দুই জনেই শত্রুগণিবেষ্টিত রণক্ষেত্রে উদাসীনবৎ দাঁড়াইয়া ছিলেন, শত্রুসৈন্যের কর-নিষ্কিপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের একটিমাত্র উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড আসিয়া বে উভয়েরই জীবন শেষ করিয়া দিতে পারিত সে দিকে তাঁহাদের লক্ষ্যই ছিল না। সম্ভবতঃ রাজকুমার দারা ভাবিতেছিলেন যে এই রণপরাজিত, লাহিত, দিক্ত জীবনের সেইভাবে শেষ হইয়া বাওয়াই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলকর। নিতান্ত অল্পপুত্র প্রভুভক্ত যে করটি ভূত ও সৈন্য তখনও জীবিত ছিল, তাহারা প্রভুর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া যায় নাই; তাহারা দারা ও সিপায়ের অবশেষ সুখ কিরাইরা দিয়া তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্রে ত্যাগ করিয়া বাইবার জন্য বাহবার সাহসের অল্পরোধ করিতে লাগিল। তাহাদের নির্ভীকাত্মিত্ব এবং প্রিয়তমা নানিরা

বাহুর কথা শ্রবণ করিয়া পিতা পুত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া রাজির অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন।

জয় পরাজয়ের বার্তা বাহুও অন্ধে ধাবিত হয়। “মানা সাগরে”র তীরে যেখানে দারার অবশিষ্ট ধনরত্ন, রাজমহিষী নানিরাবাহু এবং পরিবারস্থ অপরাপর রমণীগণ সহ বিখ্যাতী খোজা প্রহরীগণ অপেক্ষা করিতেছিল, সেখানে এই ছঃসংবাদ পহঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। পরাজয়ের বার্তা শুনিয়া রমণীগণ আত্মনাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু রোদনে কালক্ষেপ করিবার সময়টুকুও তখন নাই। দারার পূর্ব আবেশ অনুসারে খোজা প্রহরীগণ নির্দিষ্ট দিকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল, ঔরঙ্গজীবের সৈন্য পশ্চাচ্ছাবন করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিবে সেই ভয়ে ধীর গতিতে বাইবারও উপায় নাই। বহুক্ষণ পরে অন্য পথ দিয়া দারা ও সিপায় আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

ঔরঙ্গজীবের সৈন্য পশ্চাচ্ছাবন করিয়া আনিতেছে। দক্ষিণ, বামে পশ্চাতে সকল দিকই শত্রুসৈন্যদ্বারা ঘেষ্টিত, কেবল কচ্ছের দ্রুতর লবণময় বে দিকে, সেই দিকে গেলে হয়ত আপাততই শত্রুহস্তে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। দ্রুতরাং গতাত্তর বিরহিত দারা সেই পথেই যাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে দারার হতাবশিষ্ট সৈন্যগণের মধ্যে অধিকাংশই, তাঁহার অনুবর্তী হইয়া পলায়নক্রমে সহ করা অপেক্ষা ঔরঙ্গজীবের পক্ষাবলম্বনই শ্রেয় বলিয়া মনে করিল; যে বহু সংখ্যক সৈন্য দারার অনুবর্তী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকে, কচ্ছময় দ্রুতর ক্রেশের ভয়ে আর অগ্রসর হইল না। কেহবা দারার নিকট বিদায় লইয়া, কেহবা কিছু না বলিয়াই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল; বাইবার সময় দারার অব্য সামগ্রী ধন রত্ন যে বাহা পাইল লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। বিধাতা বিস্ময় হইলে এইরূপই ঘটনা থাকে।

রণক্লান্তি, পরাজয়ের অপমান, প্রাণতরে পলায়ন, সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আশায় কলাগুলিমান—ইহার কোন একটির বেদনাই দারার অঙ্গ; দারার দ্রুতগতির

কলে এই সকল গুলি একত্র হইয়া রাজকুমারকে কি
হাতনা দিতেছিল তাহা তাঁহার অন্তরাঙ্গাই জানিত।
এই পুঞ্জীভূত হুংখের উপরে হুংখ, প্রাণপ্রিয় মহিষী
নাগিরাবাহুর মারাত্মক উদগমন। অমৃতচর্য্য সজে নাই,
হাকীর বৈজ্ঞানিক নাই, ঔষধ পণ্যের ব্যবস্থা হইবার উপায়
নাই, সমুখে কচ্ছের দুর্ভাগ্য লবণময়, যেখানে পিপাসার প্রাণ
ওষ্ঠাণ্ড হইলেও একবিন্দু পানীর জল পাইবার সম্ভাবনা
নাই। একবার এই দুস্তর ও বিস্তীর্ণ লবণপ্রান্তর পার
হইয়া আসিবার সময়ে ইহার ভীষণ ক্রোধ ইহার অমৃতব
করিয়াছিলেন; বহু বস্ত্রী, উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর এবং
মহুগুণের পিপাসার প্রাণবিরোধের শোচনীয় দৃশ্য ইহা-
দিগকে সমুখে দাঁড়াইয়া দেখিতে হইয়াছে, অথচ
কোন উপায়ই করিতে পারেন নাই। ক্ষুণ্ণপিপাসার ক্রোধ
রাজপরিবারকেও সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে
সময়ে আশা ছিল একবার এই পথটুকু পার হইতে
পারিলে শুকরাট বা দক্ষিণাভ্যে গৈর স গ্রহ করিয়া
সিংহাসনের জন্য সকল সময়ে চিন্ত হইতে পারিবেন।
কিন্তু আজ রণনির্জিত হস্তসর্ব্বস্ব, নৈরাশ্রপীড়িত দারা,
মুমূর্ষু মহিষীকে সঙ্গে লইয়া সহায় সম্পদহীন নিতান্ত
দীনের ন্যায় সেই দুস্তর পথে বাজা করিয়াছেন,
প্রাণঘাতী শত্রুগণের অশ্বপদ ধ্বনি প্রতি মৃদুর্ভে
ষমদূতের পদশব্দের স্তর কর্ণরঞ্জে প্রবেশ করিতেছে।
চতুর্দিকে সীমাহীন ভাবী অধীশ্বরের পক্ষে
ইহা কি ভীষণ, তাহা কে বুঝাইবে এবং কে বুঝিবে?
হুংখকর্ণনিত কুহুমকোমল শব্দের বাহার শ্রী হইত
কি না সন্দেহ, আজ অনাবৃত তপস্কবালুকা তাহার
মুখশয্যা; গুলাব, কেঁচড়া মিশ্রিত তুষার-সিক্ত বাঁর
বাহার তৃকা নিবারণ করিতে পারিত কি না জানি না,
আজ চন্দ্রাধারে কদম্ব পানীর তাহার নিকট বর্গ-
বন্দাকিনীর অমৃত ধারা; রজ মহলের কক্ষে কক্ষে
রুচনে করিতেও প্রাতিবেদ্য বাহকে চতুর্দোলায় আয়োজন
করিতে হইত, আজ দুস্তর মরুভূমিকা পার হইবার জন্য
সে একটি উষ্ট্র, অশ্ব বা অশ্বতরের কানাল। বস্ত্রতঃ
যে পুঞ্জীভূত হুংখে দারা আশীর্ষ নিমজ্জিত হইয়াছিলেন,

তদপেক্ষা সমুখযুদ্ধে তিনি রণযুদ্ধা লাভ করিলে
তাঁহার পক্ষে সে মরণ মঙ্গলেরই হইত। কিন্তু আশা
কুহকিনী, মাহুগুণের শেষতম নিমেষ পর্য্যন্ত তাহাকে
মৃত্যু করাইতে ছাড়ে না; এই কুহকিনীর বোহম্যেই
দারা এত হুংখের পরেও পথ চলিতে আশ্রয় করিলেন
—আশা যে তাঁহার অতিবৃদ্ধ পিতামহ হুমায়ূনের স্ত্রী,
পাণ্ডু হইতে সহায়তা লাভ করিয়া সিংহাসন উদ্ধার
করিয়া লইবেন।

কিন্তু আজীবন হইতে পাণ্ডু বহু দূরে।
পশ্চাতে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতিগণ ক্ষতবেগে
আসিতেছে, এবং ক্ষতগামী দূতদ্বারা সকল স্থানের
রাজা জমীদারকে ঔরঙ্গজেব আদেশ দিয়াছেন যে দারা
বাহারট এলাকার মধ্য দিয়া বাইবার চেষ্টা করিবে
সেই যেন তাহাকে বন্দী করিয়া পশ্চাদ্ধাবিত সেনাপতি-
গণের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করে। সৈন্তসামন্ত,
অমৃতচর্য্য রক্ষিণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই দারার
সঙ্গে আছে, এমনতাবস্থায় যে কোন ব্যক্তিই দারাকে
অনাগাসে বন্দী করিতে পারে। সুতরাং তাঁহাকে অতি
সাংখ্যানে পথ চলিতে হইতেছে এবং সকল দিকেই
বিপদাশঙ্কা থাকায়, কচ্ছময় পথ ব্যতীত অন্য কোন
দিকে বাইবার উপায় তাঁহার একেবারেই ছিল না।
আসিবার সময়ে যে সকল রাজা জমীদার সর্দারগণ
দারাকে রাজোচিত সম্মান দেখাইয়া তাহাদের সাধ্যা-
সারে সাহায্য করিয়াছিল, সহায় সম্পদহীন পরাজিত
ও পলায়নপর দারাকে এবারে তাহারা কোন সাহায্যই
করিল না; এমন কি যে সকল রাজপুত্র গৈর্য্য দারা
তাঁহার ধনস্বত্ব রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা
ধনভাগ্যগাহী উষ্ট্র অশ্ব ও অশ্বতরগণকে আপনাপন
বসভবনের দিকে লইয়া বাইতে লাগিল, দারার কোন
শক্তিই নাই যে এই লুণ্ঠনকারী দস্যুগণের হস্ত হইতে
সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলি পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন।
দারার অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, মহিষী নাগিরা-
বাহুর চিকিৎসার্থ যে ইউরোপীয় ডাক্তার তাঁহার সঙ্গে
ছিল, মরুপথে চলিবার জন্য তাঁহার নিমিত্ত একটি

উঠে বা অখতর পথান্ত সংগ্রহ করিতে দাড়া পারিলেন না। অগত্যা চিকিৎসকের রোগিনীর সঙ্গে বাঙরা বটল না।

লোকচক্ষু দিবাকরের অন্তঃগহনের সময় আঙ্গিলে সহস্রকর দ্বারা গগনতলকে ধারণ করিয়াও তাঁহার অন্তঃগহির অন্তরালে পতন নিবারণ হয় না, মাহুকের অভ্যাস ও পতনও তদনুরূপ। দারার “ভাড়া” আজ অন্তঃগহনের জন্ত কুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য? এবং ঔরঙ্গজীবের আজ বৃহস্পতি কেন্দ্রী, তাহার অভ্যুত্থানের প্রতিরোধ করে এমন শক্তি অগতে কাহার আছে? অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বহু শত্রু হইয়া দাঁড়ায়; যে বংশবন্ত, দারার পক্ষ হইয়া ধর্ম্মভে ঔরঙ্গজীবের সহিত সময় করিয়াছে, যে বংশবন্ত দারাকে খেজুর আক্রমণের আশ্রয় করিয়া আনিয়াছিল,—স্বয়ং বুদ্ধ করিয়া তরফাল্য দারার কর্তে পরাইবে, সেই বংশবন্ত ঔরঙ্গজীবের আদেশে আজ দারার পলায়নের পথ রুদ্ধ করিবার জন্ত সটেনয়ে বাড়া করিয়াছে, জয়সিংহের সহিত একত্র হইয়া দারাকে বন্দী করিবার জন্ত তাহার পশ্চাত্ত্বান করিতেছে। হারের মানবের স্বার্থ, হারের তাহার প্রয়োজনানুরোধে কপট প্রীতিবন্ধনের তিক্ত, নির্মম পরিণাম।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যায় বখন বিশ্রামার্থ তরুতলে বা পথপ্রান্তে দাড়া সপরিবারে উপবিষ্ট, তখন সংবাদ আসিল শত্রু সমাগত প্রায়। দার বিশ্রাম বটল না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দিনান্তের ক্ষুধার কদর্য আহারটুকুও পথপ্রান্তেই নিক্ষেপ করিয়া, পীড়িতা নাদিরা এবং বালক সিপাহকে সঙ্গে লইয়া দাড়া প্রাণভয়ে রজনীর অন্ধকারে রক্তধামে পলায়ন করিলেন। এরূপ দুর্ভটনা একদিন নহে, বহুদিন ঘটয়াছে। বহুদিন সিপাহার বারিকণা এবং ক্ষুধার অন্নপিণ্ড ঔরঙ্গজীবের তুলিয়া ধরিবার সময়টুকু পাওয়াও এই বিধিবিভূষিত রাজ পরিবারের অদৃষ্টে ঘটনা উঠে নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আজীবনের সন্নিকট-বর্তী শোকলার গরিসঙ্কটে দিবসজয় ব্যাপী ঘোর

সময়ের পরে দাড়া বখন সুষ্টিবের সেনা ও অল্পচরবর্গ সমভিযাহারে সপরিবারে পলায়ন করেন; তখন পশ্চাত্ত্বানিত ঔর সিংহ তাঁহাকে অনারাসে বন্দী করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই দারাকে পলায়নের অবসর দিয়াছিলেন। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে—শাহানুগ্রাহ বাদশাহ শাহজাহানের বিশেষ অল্পগ্রহভাজন প্রবীণ রাজা জয়সিংহ, বাদশাহের আনন্দ ফুলাল রাজকুমার দারাকে এই বংশবন্ত অল্পগ্রহ দেখাইবেন ইহা আশ্চর্যজনক নহে; কারণ সকলেই জানিত যে, দাড়া বন্দীভাবে ঔরঙ্গজীবের নিকট আনীত হইলে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর ঔরঙ্গজীব কি ব্যবস্থা করিবেন। সুরাদের প্রতি যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলে জানিত যে ঔরঙ্গজীবের ভ্রাতৃবর্গ এবং ভ্রাতৃপুত্রগণের যে কেহ ঔরঙ্গজীবের কবলগত হইবে তাহার দেহপিঞ্জরের মধ্যে প্রাণবিহ্বল অধিকক্ষণ থাকিবে না। অসি, অগ্নি, অহি—যে কোন উপায়ে তাহার হত্যা অচিরে সাধিত হইবে। বুদ্ধ জয়সিংহের এইরূপ ভ্রাতৃহত্যা ও রাজহত্যার সুখ্য হেতু হইবার অনিচ্ছা হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ধার্থই জয়সিংহ ইচ্ছাপূর্বক দারাকে পলায়নের অবসর দিয়াছিলেন ইহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ইতিহাসে আছে বলিয়া মনে হয় না। দারার পশ্চাদহসরণ করিতে রাজা জয়সিংহের কিছু বিলম্ব হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার কারণ ছিল; আহম্মদাবাদের রাজকোষ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে তাঁহার বিলম্ব হয়, এবং কচ্ছের দুত্তর লবণ মক্ক বৃহৎ বাহিনীর সহিত পায় হওয়াও সময়সাপেক্ষ; দারার সহিত সুষ্টিবের মহত্ব; অপর পক্ষে জয়সিংহ হত্যার পদাতি সমন্বিত বৃহৎ সেনাভাগ লইয়া চলিয়াছেন; সঙ্গে ভারবাণী উষ্ট্র, অশ্ব, অখতর প্রভৃতি বহু সংখ্যক পশু, অগণিত গুরুভার আধেয়াজ্ঞ অগার মক্কাবাসীক পায় করিয়া লইয়া বাওয়াও কি কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। মক্কাভূমি উত্তীর্ণ হইবার সময়ে জয়সিংহের ভারবাহী বহু পশু মৃত্যুযুগ্মে পতিত হয়, সে সকল পুনরায় সংগ্রহ করিতেও তাঁহার বহু সময়ক্ষেপ হইয়াছে। এরূপ কেন্দ্রে জয়সিংহের বিলম্বিত গতি

ইচ্ছাকৃত এরূপ অজ্ঞান বৃত্তিসম্বৃত নহে। একজন প্রাণতরে পলায়ন করিতেছে, অপরে তাহাকে বন্দী করিবার জন্ত তাহার অনুসরণ করিতেছে, এতদ্ব্যতীত গতির পার্থক্য হওয়াই নিত্য স্বাভাবিক এবং হইয়াও থাকে। সুতরাং ঔরঙ্গজীবের তক্ত বন্ধ হুজা রাজা জয়-সিংহের লগাটে খেঁজার দ্বারার পলায়নের শুভসুযোগ করিয়া দিবার কলঙ্ককালিনা লেপন করা সম্ভব হইবে না—বিলম্ব বাহা ঘটয়াছিল তাহা অনিবার্য কারণে, জয়-সিংহের খেঁজাকৃত নহে। বেক্রপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত জয়সিংহ দায়ার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন, বেক্রপে সকল পথ বন্ধ করিয়া দায়াকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, বেক্রপে ছলে কৌশলে বশোবস্তকে ঔরঙ্গজীবের পক্ষভুক্ত করিয়া দায়ার সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে সকল কথা চিন্তা করিলেও দায়ার প্রতি দয়াপ্রকাশের অপবাদ জয়সিংহকে দেওয়া যায় না। জয়সিংহ বীর ছিলেন, সৈন্যপত্যগুণে অধিতীর্থ ছিলেন, রাজনীতিতে বিশারদ ছিলেন; কিন্তু কপটতার ঔরঙ্গজীবের সমকক্ষ না হইলে, তাহার প্রীতিভাজন হওয়ার তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত। পাণে কুর্ভাষিত ঔরঙ্গজীবের তক্তবন্ধ কপট চূড়ামণি জয়সিংহ যে ভ্রাতৃহত্যা ও রাজহত্যার পাণে প্রত্যেকে বা পরোক্ষে লিপ্ত হইবার আশঙ্কার, শক্তিসম্বন্ধে দায়ার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে পলায়নের অবসর দিয়াছেন, এ কথা সহজে বিখান করা যায় না, এবং সম্ভবতঃ সে কথা সত্যও নহে। কারণ, তাহা হইলে সে সংবাদ ঔরঙ্গজীবের কর্ণগোচর হইত এবং খেঁজাকৃত সেই অপরোধের জন্ত একান্ত স্বার্থপর পরম পাণাচারী স্বজনহত্যা ঔরঙ্গজীব জয়সিংহের প্রতি সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা কোন না কোনও সময়ে করিতেন। বশোবস্তের অপরোধ ঔরঙ্গজীব কোনও দিন বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরেও রাজস্বয়ং তাঁহার বিধবা পত্নী ও শিশু সন্তানকে দণ্ড করিবার জন্ত অশ্রুধারের অনলশিখার দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাস্বামী বা গুণবান কেহ তাঁহার পরম উপকারী হইলেও তাহার নিষ্ঠার ছিল না, সেই জন্ত বীরজুংলার

অকাল মৃত্যু ঘটিল। ঔরঙ্গজীবের সিংহাসন প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম সহায় ছিলেন বীরপ্রগণ্য বীরজুংলা, তাঁহার অসি এবং উপদেশ বলেই সমরক্ষেত্রে ঔরঙ্গজীব রক্ষা পাইয়াছিলেন, নতুবা সুজার কিন্তু রণহতীর পদতলে ঔরঙ্গজীবের পাপ লীলার সেই দিবসেই অবসান হইত। সেই বীরজুংলা আসামের অভিযানকালে প্রার্থিত সেনাবলের অভাবে অপমানিত, লাহিত, পরাজিত হইয়া বখন ঢাকার কিরিলেন, তখন তাঁহার জীবন দীপ নির্কাপিত প্রায় হইয়াছে। তাদৃশ উপকারী বীর বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে বাদশহ ঔরঙ্গজীব স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিলেন এই ধারণায় যে, তেমন ক্ষমতাসালী ব্যক্তি যদি কখনও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা হইলে তাঁহার বিপদের আশঙ্কা আছে; সে কণ্টক বিদূরিত হওয়ার বাদশাহ নিঃশঙ্ক চিত্তে নিজা বাইতে পারিবে। তখন দায়ার সুবাদ সকলে পরলোকে, দিল্লীর রাজসিংহাসন নিরাপদ, সুতরাং বীরজুংলার ইহলোকে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই।

এইরূপ বাহ্যিক চিন্তাবৃত্তি, কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র বাহ্যিক অন্তরে নাই, ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্রগণের হত্যা যে নির্দ্বন্দ্বিভিত্তে ঘটাইয়া তুচ্ছ সিংহাসনকে নিকটক করত শান্তিলাভ করে, বৃদ্ধ পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট সংকীর্ণ জীবনকালকে সংকীর্ণতর করিতে বাহ্যিক ইহপরকালের কোন প্রকার ভরসাই অন্তরে উপর হয় না, সোদর-সংগ্রামের সহায় স্বীয় বীরপুত্রকে যে বাধ-জীবন কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারে, সেই ঔরঙ্গজীব জয়সিংহের খেঁজাকৃত গুরুতর অপরোধের দণ্ডবধান না করিয়া নীরবে তাহা পরিপাক করিবে ইহা উদ্ভাসের কর্ম্ম।

হুঃসহ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুপথে, চতুর্দিক হইতে বিভাঙিত হইতে হইতে, পীড়িতা পত্নী ও গুরুজন্যাপনসহ দায়ার কি অসীম ক্লেশ দিন কাটাইতেছিলেন, তাহা যে বিধাতা সেই ক্লেশ তাঁহার কপালে লিখিয়াছিলেন তিনিই জানেন। অসহ কষ্টে, ঔষধ পথ্যের অভাবে, পীড়িতা নদিয়ার

নীচা বুদ্ধি পাইল, তাঁহার জীবন প্রদীপের ঠৈলটুকু
প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল, তখনও দীর্ঘপথের
শেষ গীমারেখা দেখা যায় না। নাদিরবাহু পরভেকের
কন্যা, সর্বগুণাধিত রাজকন্যার্তী আকবর শাহের
প্রপৌত্রী, জম্মাবিধি দিল্লী রজমহলের অকুলনীর সুখ-
সম্পদে লালিতা, ভারতের ভাবী সম্রাট দ্বারার প্রিয়তমা
মহিষী। যে দিল্লীর রজমহলে সূর্য্যাস্ত প্রবেশ করে
না, মলয় মাকুত মন্ড গতিতেও সে ইন্দুপুত্রীতে প্রবেশ
করিতে পারে কি না সম্ভেদ, আজন্ম সেই সুখখণ্ড-
পরিপূর্ণ পুত্রীতে পাকিত বর্জিত হইয়া ভাগ্যদোষে
নাদির আজ যে অপার হুঃখ সাগরে পতিত হইয়াছে,
তাহাতে এতদিন যে সে জীবিত রহিয়াছে ইহাই
আশ্চর্য্যের বিষয়।

নাদিরার হুঃখের উপর হুঃখ এই যে, তাঁহার কোষ্ঠ
পুত্র সুলেমান আজ পিতারই ন্যায় বিতাক্তিত হইতে
হইতে দেশে দেশে ক্রিান্তিতেছে, তাহাকেও বন্দী করিয়া
দিল্লীতে আনিবার জন্য নররাকস ঔরঙ্গজীবের ক্রোধ
তাহার পশ্চাতে ক্রিান্তিতেছে।

দ্বারার সাধুগণ্ডে পরাতবের সংবাদ বখন পড়ছিল,
তখন সম্রাটবাহারী সেনাপতি জরসিংহ তাঁহাকে
ভ্যাগ করিয়া রাজপুত বাহিনী সহ বিজয়পুত্র নবীন
বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের উদ্দেশে বাজা করিলেন। অপর
সেনাপতি ছিলই খাঁ বরিও বা সুলেমানের সহায়তা
করিতে প্রস্তুত ছিলেন, জরসিংহের ছটবুদ্ধি ও প্রয়োচনার
তিনিও তাঁহার হোহিলা দল লইয়া, নবোদিত সূর্য্যপদে
অর্য্যদান করিবার জন্য আগ্রার পথে বাজা করিলেন।
সৈন্যবল বিহীন সুলেমানের, পিতার সাহায্য দিল্লীর
পথে বাজা করিবার সুযোগ রহিল না, কারণ তখন
দিল্লী ও আগ্রার পথ ঔরঙ্গজীবের সৈন্যদ্বারা অবরুদ্ধ।
নিরুপায় সুলেমান পাহাড়বাল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন,
আশা যে, সেখান হইতে বহিঃসৈন্য সংগৃহীত হয়, তাহা
হইলে পিতার সহায়তার জন্য সৈন্যে তাঁহার সহিত
যোগ দিবে। পাহাড়বাল রাজ্য সেরূপ সাহায্যদানে
— — — — — সুলেমানের মনের আশা মনেই বিলীন

হইয়া গেল, পিতামাতার সহিত আর জীবনে তাঁহার
সাক্ষাৎ ঘটিল না।

কোষ্ঠপুত্র সুলেমানের এই দুঃখবহার কথা বখন
নাদিরার নিকট পড়ছিল, তখন মাতার অন্তরের
মধ্যে হুঃখ শোক বেদনার কি তরঙ্গ উঠিতেছিল তাহা
নাহুৎকর ভিন্ন আর কে বুঝিতে বা অনুমান করিতে
পারে? আধিব্যাধি উত্তরে মিলিয়া আজন্ম সুখলিলা
রাজগণী নাদির বাহুকে উন্মূলিতা মতায় ন্যায়
দিন দিন পরিণত করিয়া তুলিতেছিল। তদুপরি
অনশন ও পথশ্রমে আত তাঁহার মৃত্যু আসন্ন, বহুত
একেবারে আজ শিরে বসিয়া হস্তপ্রসারণ করিয়া
দাঁড়াইয়াছে।

জরসিংহ এবং বাহাদুর খাঁ কর্তৃক পশ্চাৎকারিত
হইতে হইতে, দ্বারা নিরাপদস্থানের আশ্রমে সিদ্ধমন্দের
অপর তীরে পার হইয়া গেলেন। পরপারে দ্বারা না বাইতে
পারে সৈন্য জরসিংহ পূর্বে হইতে ব্যস্ত করিয়াছিলেন
কিন্তু সে ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্বেই দ্বারা
সিদ্ধ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দ্বারার ইচ্ছা ছিল বোলান
গিরি সঙ্কটের মধ্য দিয়া কান্দাহারের পথ বাজা করিবার
পূর্বে, কোন এক নিরাপদ স্থানে থাকিয়া নাদিরাকে
কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম দিবে; কারণ রাজমহিষীর
দেহের বর্তমান অবস্থায় বোলান গিরিসঙ্কটের পথে বাওয়া
এবং বদমায়ে বাওয়া একই কথা। দ্বারার সম্রাট-
বাহারী অপরাপর সৈন্য ও গিরিসঙ্কটের ক্রান্তির ভয়ে,
তরিকটবর্তী স্থানের অসত্য পার্শ্বত্যাগ জাতি কর্তৃক
লুণ্ঠন এবং জীবাশ্মের চরম অপমানের ভয়ে সে পথে
বাইতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন।
দ্বারার অন্তরে একটি কীর্ণ আশার সঞ্চার হওয়ার তিনিও
ভারতবর্ষে সীমন্ত পার হইয়া কান্দাহারের পথে পারতে
বাজা করিতে সহসা ইচ্ছুক ছিলেন না; তিনি ভাবিতে-
ছিলেন, এই পার্শ্বত্যাগ প্রদেশের কোনও এক জমীদারের
সহায়তায় কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কান্দাহার দূর্গে
(যেখানে “খোনা” বসত তখনও পর্য্যন্ত তাহা শুষ্ক
দ্বারার আগমন প্রত্যাশার ঔরঙ্গজীবের সৈন্যের অক্রমণের

প্রতিরোধ করিতেছিল) উপস্থিত হইবেন এবং সেই দুর্গে রাজমহিষী মাদিরা এবং অপর নারীকুলকে রাখিরা, কান্দাহার হইতে আরও সৈন্য সংগ্রহ করতঃ আর এক-বার ভাগ্য পরীক্ষা করিরা দেখিবেন—হরত বা সোঁরে ভাগ্য দেবতা প্রসন্নমনে তাঁহার দিকে চাহিতেও পারেন।

অদৃষ্টের চক্র ত ঘুরিয়াও থাকে—“নৈর্গৈর্জ্ঞত্বাপরি চ দশা চক্রেনৈমি ক্রমেণ” ইহাও ত মহাজন বাক্য—কুহকিনী আশা এই কথা তাঁহার কাণে কাণে কহিতেছিল।

ক্রমশঃ.

শ্রীজগদিশ্রনাথ রায়।

দৈনিক নিদ্রা দীর্ঘ নিদ্রা ও যোগনিদ্রা

(২)

আমরা দেখাইয়াছি যে ত্রিবিধ নিদ্রার লক্ষণ সকল সম শ্রেণীর এবং পদম্পরের সহিত তুল্য। দৈহিক লক্ষণ তুলনা করিরা আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, ও-সকল বেন একের পর অন্তে ক্রম বিবর্তিত—দীর্ঘ নিদ্রা বেন অপর ত্রিবিধ নিদ্রার মধ্যবর্তী অবস্থা।

এক্ষণে দেখিতে হউবে যে ঐ মধ্যবর্তী অবস্থার হেতু কি? উহা অবগত হইলেই দৈনিক নিদ্রার এবং যোগনিদ্রার হেতুও কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে।

হেতু নির্দেশ করিতে হইলে প্রথমতঃ কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা আবশ্যিক। তাঁহার মধ্যে প্রধান কথাগুলি উল্লেখ করিতেছি। (১) দীর্ঘনিদ্রিত হইবার কিছু পূর্বে জীবগণ দেহের নানা স্থানে মেদ (fat) সঞ্চয় করে। নিদ্রিতাবস্থার উদ্ভারাই যথাসম্ভব দেহ গোষণ হয়। (২) যে সকল প্রাণী এক দেশে হইতে অন্য দেশে ভ্রমণ করে এবং পুনরায় সে দেশে হইতে স্বদেশে চলিয়া যায়, * সেই সকল প্রাণী দীর্ঘনিদ্রাগত হয় না। উহারা স্বদেশে আহারের অসুবিধা হইলেই অন্য দেশে ভ্রমণ করিতে যায়। যে দেশে যে প্রাণীর আহার যে ঋতুতে অপ্রাপ্য অথবা হুপ্রাপ্য হয়, সে দেশ হইতে সেই প্রাণী সেই ঋতুতে অন্য দেশে গমন করতঃ আহারাবেশণ করে। আহারাবেশণই প্রাণী-

গণের দেশভ্রমণের * প্রধান কারণ। যে সকল দেশভ্রমণ করে না তাহারাই প্রায়শঃ দীর্ঘনিদ্রাগত হয়; যাহারা দেশভ্রমণ করে তাহারাই দীর্ঘনিদ্রাগত হয় না। এ কথাটির অর্থ এই যে, আহারের অসুবিধা হইলেও যে সকল প্রাণী আহারাবেশণে দেশান্তর ভ্রমণে বহির্গত হয় না তাহারাই দীর্ঘনিদ্রাগত হয় এবং যে কাল পর্যন্ত আহার অপ্রাপ্য অথবা হুপ্রাপ্য থাকে সে কাল নিদ্রিত অবস্থাতেই কাটাইয়া দেয়। পরে যখন ঐ কাল অন্তে আহার সুপ্রাপ্য হয় তখন তাহারিগের নিদ্রাভঙ্গ হয়। ইহা জীবন রক্ষার একটা কৌশল মাত্র। দীর্ঘনিদ্রাগত না হইলে উহারা অনাহারে মরিয়া যাইত; এই নিমিত্ত দেহে মেদ সঞ্চয় করিরা দীর্ঘনিদ্রাগত হয়, এবং নিদ্রিত অবস্থাতে ঐ মেদ দ্বারা শরীর রক্ষা করে। ঐ অবস্থায় কোন কর্ম করে না বলিয়া কর্মজনিত দেহক্ষয় না। (৩) তৃতীয় কথা এই যে, যে প্রাণী এক দেশে এক ঋতুতে দীর্ঘনিদ্রাগত হয়, সেই প্রকার + প্রাণী অন্য দেশে অন্য ঋতুতে দীর্ঘনিদ্রিত হইতে পারে; অথবা সেই প্রকার অপর প্রাণী মোটেই দীর্ঘনিদ্রিত হয় না এরূপও হইতে পারে। ইহা হইবারই কথা। কারণ আহার সকল দেশে একই ঋতুতে অপ্রাপ্য অথবা হুপ্রাপ্য হয় না; অথবা

* Migration.

+ Variety.

কোন প্রাণীর আহার সর্বত্রই জুলত হইতে পারে। এ কথার সত্যতা দীর্ঘনিজাগত প্রাণিগণের শ্রেণী, গণ ও প্রকার বিবেচনা করিলেই প্রতীয়মান হয়। ইহা-বিশেষ মধ্যে কতিপয় প্রাণীর উল্লেখ করিতেছি। মশা, নাছি, ছারগোকা, মাকড়সা, কেন্দ্রে অথবা কেন্দ্রে, বোলতা, বিছে অথবা চেনা, শুবরে পোকা এবং তজ্জপ কঠিন আবরণ যুক্ত অন্য কয়েক প্রকার পোকা, শুগলি, শমুক, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, তেক, সর্প, কাছির, মৎস্ত, সন্ডাক, ইন্দুর, বাহুর, মর্কট, বানর, মানুষ—ইহারা দীর্ঘনিজাগত হয়। এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে কীট অবধি স্তন্যপায়ী জীব পর্যন্ত সকল শ্রেণীর জীবই দীর্ঘনিজাগত হইরা থাকে। কিন্তু সকল শ্রেণীর সকল গণের অথবা সকল প্রকারের সকল জীবই দীর্ঘনিজিত হয় না। কীটের মধ্যে মশা নাছি দীর্ঘনিজিত হয়, কিন্তু অন্য অনেক কীট হয় না। শমুকগণ মধ্যেও অনেক প্রাণী ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। স্তন্যপায়ণ মধ্যেও ভ্রাহাই দেখা যায়। ইন্দুর দীর্ঘনিজিত হয় কিন্তু ছুঁচা হয় না। বানরগণ মধ্যে কতিপয় প্রাণী ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অন্য হয় না। অবশেষে মানুষের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, কোনপ্রকার মানুষই দীর্ঘনিজিত হয় না; কেবল ইউরোপীয় রুসিয়ার Pskov প্রদেশের কুবকগণ অর্ধ-নিজিত অবস্থাতে প্রায় সমস্ত শীত ঋতু কাটাইয়া দেয়। † উহাদিগের পরিবারস্থ এক এক জন পালা করিয়া আগিরা থাকে এবং নিজিতগণকে একবার মাত্র জাগাইরা একটু রুটি খাওয়াইরা দেয়। মানুষের নানা উপায়ে আহার সংগ্রহ হইরা থাকে; এবং মানুষ একদেশ হইতে অন্য দেশেও আহারাধেবণ করিতে যায়। সুতরাং দীর্ঘনিজিত হইরা জীবন রক্ষা করা তাহার আবশ্যক হয় না। (৪) চতুর্থ কথা এই যে, যে সকল প্রাণী সর্বত্রই দেহের প্রয়োজনীয় তাপ রক্ষা করিতে

সমর্থ হয় তাহারাই দেশান্তর গভীরত করিতে পারে। বাহারি চতুষ্পার্শ্ব তাপের সহিত দেহ তাপের প্রয়োজনীয় মাত্রা রক্ষা করিতে অসমর্থ তাহারাই দীর্ঘনিজাগত হয়। মানুষ চিরকুবারূত অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশেও দেহের প্রয়োজনীয় ২৮ ডিগ্রী তাপ রক্ষা করিয়া থাকে; এবং অগ্নিকুণ্ডবৎ সাধারণ প্রদেশেও ঐ পরিমাণ তাপই রক্ষা করে। নচেৎ শীত প্রধান দেশে চতুষ্পার্শ্ব হিমের অল্পপাতে দেহতাপ হ্রাস হইরা মারা বাইত; এবং অত্যধিক দেশে চতুষ্পার্শ্ব তাপের আধিক্য হেতু দেহতাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইরা মারা বাইত। চতুষ্পার্শ্ব উত্তাপ বত কমই হটক, অথবা বত অধিকই হটক, মানুষ এবং অন্যান্য অনেক প্রাণী সে অবস্থার মধ্যেও স্ব স্ব প্রয়োজনীয় দেহতাপ স্থির রাখিতে পারে। এ নিমিত্ত তাহার দেশান্তর ভ্রমণ করতঃ আহার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু স্তন্যপায় প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর চতুষ্পার্শ্ব হিমের দেহ-তাপ কমিয়া যায়, অথবা চতুষ্পার্শ্ব উত্তাপ বশতঃ দেহতাপ বৃদ্ধি হয়, তাহার দেশভ্রমণ করতঃ আহারাধেবণ করিতে পারে না। অবশেষে শীত অথবা গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রয়োজনীয় দেহ-তাপ স্থির রাখিতে সমর্থ হয় না। এই হেতু তাহারাই প্রায়শঃ দীর্ঘনিজাগত হয়। নচেৎ তাহারি অত্যন্ত শীত সময়ে দেহ তাপ কমি: এবং অত্যন্ত গ্রীষ্মের মধ্যে দেহ তাপ বাড়িয়া মারা বাইত। কিন্তু ঐ কৌশলে আশ্রয়লা করিতে সমর্থ হয়।

এই চারিটা প্রধান কথা স্মরণ রাখিলেই বুঝা যাইবে যে, অনাহারই দীর্ঘনিজার প্রধান হেতু। আহারের অভাব বশতঃই দীর্ঘনিজা অবলম্বন করিয়া জীবগণ মৃত্যু হইতে আশ্রয়লা করে। এই অবস্থার খাঁস চলে না, জ্ঞান থাকে না, মনমুগ্ন ভাগ হয় না; সুতরাং ইহাকে প্রায় মৃত্যুর ন্যায়ই দেখা যায়, কিন্তু বেহ গচে না বলিয়া ইহাকে মৃত্যু বলা যায় না। বিশেষতঃ দীর্ঘনিজা ভদ্র হইলে বধন পূর্ণবৃতি কিরিয়া আসে, পূর্ণের অভিজ্ঞতাও পুনরাগত হয়, তখন

* Species.

† Ency. Brit: 11th Edition, Vol XII page 445.

জান কিছুমানও থাকে না এ কথা বলা যায় না।
জান ও চৈতন্য কোন এক বিশেষভাবে নিশ্চয়ই
থাকে। সেই ভাবে কুটন্য ভাব বলা না গেলেও
প্রচ্ছন্ন ভাব বলা যাইতে পারে।

একপে যোগনিজ্জার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।
পূর্বে দেখাইয়াছি যে, এ অবস্থাতেও বিশ্বাস চলে না,
মলমূত্র ত্যাগ হয় না; বাহ্যতঃ জান থাকে না বলিয়াই
প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জান ও চৈতন্য
উভয়ই বিশিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্ন থাকে।
নচেৎ কোন কারণ বশতঃ যোগাবস্থা তদ্রূপ হইলে
পূর্বস্বপ্নিত কিরীয়া আগিত না। এই বিশিষ্ট অবস্থা
কি? দেহের দিক হইতে দেখিলে যোগনিজ্জার লক্ষণ
সকল পিটুটারি গণ্ডের (Pituitary gland)
পূর্বাংশে আরতনে ছোট হইলে অথবা ঐ গণ্ডের রস-
ক্ষরণ কিরীয়া অত্যন্ত কমিয়া গেলে জীবমেহে যে সকল
লক্ষণ প্রকাশ পায় তৎসং। প্রকৃত পক্ষেও দীর্ঘনিজ্জিত
প্রাণিগণের ঐ গণ্ড পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে
উহার রসক্ষরণ অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। যোগ অত্যা-
স করিবার প্রথম অবস্থা হইতেই অনাহারী হইতে হয়।
তাহাতে ঐ গণ্ডের রসক্ষরণ কমিয়া যাইবে, ইহা অনা-
হাসেই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও
অনাহারই প্রধান কারণ। দৈনিক নিজ্জাও অনাহার
হইতে আগত হইতে পারে। দীর্ঘকাল অনাহারে
থাকিলে মাহুয দুমাইয়া পড়ে। * দীর্ঘনিজ্জার ত
প্রধান কারণই অনাহার; তাহা উপরে দেখাইয়াছি।
সুতরাং জীবিত নিজ্জারই মূলে অনাহার রহিয়াছে, একথা
বলা যাইতে পারে। অনাহারে মেহ-বস্র দুর্বল হয়,
ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তাঁর পর, বাহ্যজ্ঞান অর্থাৎ
বিষয় জ্ঞান ইন্দ্రిয় সাপেক্ষ। যোগিগণ ইন্দ্రిয়দ্বার বন্ধ
করায় বিষয় জ্ঞান গ্রহণ করেন না। সুতরাং জগতের
নানা বিষয়ক অহুত্ব এবং তদ্ব্যঙ্গক জ্ঞান তাঁহাদিগকে
বিক্টিষ্ট করিতে পারে না। কেবল মাত্র যে পূর্ব

সংস্কার ও বিশ্বাসের বশবত্তা হইয়া তাঁহারা যোগাত্যাস
করিতে প্রবৃত্ত হন, একাগ্র তন্ময় চিন্তে তাহাই ধ্যান
করেন। তদ্ব্যস্ত কালসহকারে তাহাতে এতদূর অত্যন্ত
হইয়া যান যে, তাহাই একমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইয়া
উঠে, অন্য সকল জ্ঞানই লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং
তাহাই প্রত্যক্ষীভূত হয়; তাঁহারা তাহার সহিত যেন
এক হইয়া যান। ঐ পূর্বসংস্কার ও বিশ্বাস কি? তাহা
আর কিছুই নহে, যোগবলে অট্টেখ্য লাভ হইতে
পারে এবং ক্রমে সম্প্রজাত এবং অসম্প্রজাত
সমাধি প্রাপ্ত হইয়া যোগী ব্রহ্মে লীন হইয়া যান।
ঈদৃশ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিতেই যোগাত্যাসের প্রবৃত্তি জন্মে,
এবং এই দৃঢ়বিশ্বাসের কলেই পূর্বসংস্কারের অল্পরূপ ব্রহ্ম
পদার্থে যোগী লীন হইয়া যান। এই বল বিশ্বাসমূলক।
উৎকৃষ্ট বল লাভ হইতে পারে, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস
থাকিলে একাগ্র তীব্র আকাজ্ঞাও জাত হয়। বিশ্বাস
এবং আকাজ্ঞার এবগতাৎফল তদনুরূপ ফল প্রাপ্তি
অথবা ফলপ্রাপ্তির ভায় ধারণা, কেবল পারমার্থিক
বিষয়ে নহে, ঐহিক বিষয়েও অনেক সময় দেখা যায়।
শারীরতত্ত্ব, মনতত্ত্ব এবং ক্রমতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে ইহার
অনেক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। আমরাও প্রায় প্রত্যহই
ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। যোগীর যে চিকিৎসকের
উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাঁহার ঔষধে বেরূপ
উপকার হয়, অন্যের ঔষধে তজ্ঞান হয় না।
একজন অহিকেন-গেবীকে তাঁহার স্ত্রী ধরের-বক্তি
প্রায় এক মাস বাৎ খাওয়াইয়াছিলেন, তাহাতে
অহিকেন বধা সময়ে না পাইলে অহিকেনসেবিগণের
দেহে যে সকল বস্রণা উপস্থিত হয় তাহার কিছুই
হয় নাই; কারণ তাঁহার স্ত্রী অহিকেনের বক্তি
দিতেছে এইরূপই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। অথবা গাছের
নীচে একজন শূলবেদনার রোগী গভীর বিশ্বাসে দুই
তিন দিন অনাহারে পড়িয়া ছিল। ঐ বৃক্ষের অসাধারণ
দৈববল শক্তিতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রকৃত-
পক্ষেও সে এইরূপ করিয়াই যোগবৃত্ত হইয়াছিল।
একটা ইউরোপীয় মহিলা পুত্রের মা তইবার প্রবল

* অত কারণেও মাহুয দুমাইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু সে
পৃথক কথা।

আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নে পোষণ করিতেন। তাঁহার একসময় কোন কারণে মাসিক জীলক্ষণ বন্ধ হওয়াতে তিনি পরম অজ্ঞানচিত্ত হইলেন এবং নিশ্চিত বিশ্বাস করিলেন যে তিনি অস্তঃস্বপ্না হইয়াছেন। কয়েক মাস পরে প্রাতে তাঁহার একটু একটু বমি হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। পরে ক্রমে নীচের পেট স্ফীত হইতে লাগিল, শুনে হৃৎ আসিল। অবশেষে বমি সময়ে প্রেসববেদনা উপস্থিত হইলে ডাক্তার দেখিলেন যে জরারূপে মুখ একটুও প্রশান্ত হয় নাই। তিনি তখন অজ্ঞান্যবহারের নিমিত্ত রোগিণীকে ক্লোরো-ফর্ম জ্বাণ করাইলে, বড় একটা শব্দ হইয়া স্ফীত পেট ছোট হইয়া গেল এবং ঐ গর্ভাবস্থা যে সম্পূর্ণই অলৌকিক তাহা বুঝা গেল। এরূপ একটা দৃষ্টান্ত ওয়েলিংটন স্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ডাক্তার জীবন্ত অভিতনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকটও শুনিয়াছি। হাওড়াতে তিনি এরূপ একটা রোগিণী পাইয়াছিলেন। বাহা হউক দৃঢ় বিশ্বাস এবং একান্ত কামনার ফল শুধু প্রস্থানিতে নহে, দৈনন্দিন জীবনেও অনেক সময় প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এ ফল অনেক সময় সত্যই লাভ হইয়া থাকে ; কখনও বা কাল্পনিক হইয়া যায়।

আমার ভায়রাননধিকারী ব্যক্তির বোগ সিদ্ধির ফল সম্বন্ধে কিছুই বলা সম্ভব হয় না। তথাপি দৈনিক নিজার দীর্ঘনিজার এবং বোগনিজার লক্ষণ সকল ফুলনা করিলে এবং পিটুটারি গণ্ডের রসস্রবণের হ্রাসবৃদ্ধির ফল সকল বিবেচনা করিলে এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও একান্ত কামনার প্রত্যক্ষ ফল সকল লক্ষ্য করিলে, বোগাবস্থার বাহ্য চরম ফল, অর্থাৎ ব্রহ্ম লীন হওয়া, সে ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবিবাক্য হওয়া যায় না। অন্ততঃ তিনি

বোগাত্যাগে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহার নিজের নিকট আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তি সত্য বলিয়াই প্রতিপাত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই ; এবং প্রকৃত পক্ষেও ঐ ফল সিদ্ধ হইতে পারে, ইহাও অসম্ভব করিবার কারণ আছে। আত্মাই এক মাত্র সং পদার্থ, ইহা এক্ষণে বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিতেছেন। বস্তু পদার্থ কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিকগণ এখন প্রায় সব-স্বরেই বলিতেছেন, “বস্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্তু।” * এ কথা সত্য হইলে, শক্তিরই একমাত্র সংপদার্থ। ইহা অক্ষ শক্তি নহে, এ কথা জীবন্ততত্ত্ববিদগণ এখন বিশদ-রূপে বুঝাইতে সমর্থ হইতেছেন। এই শক্তিকেই আত্মা শব্দে অভিহিত করা যায়। আত্মাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া লইয়াছে। দেহও যে তাহারই রচনা, ইহা জ্ঞান তত্ত্ব হইতে প্রমাণ করা খাইতে পারে। তাহা হইলে, দেহকোষে সীমাবদ্ধ হওয়াতেই আত্মার শক্তিস্থিতি হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করা যায়। স্মৃতরাং অনা-হার এবং ইন্দ্রিয়দ্বার রোধদ্বারা দেহের বন্ধ হেদ করিলে আত্মা যে স্বীয় শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে এবং পরমাত্মার লীন হইবে, ইহা অবিবাক্য করা ত সম্ভবই নহে, বরং বিশ্বাস করাই সম্ভব। বস্তু পদার্থের অসামান্য প্রমাণ হইলেই এ সিদ্ধান্তও অনিবার্য হইয়া উঠে। সে প্রমাণ এক্ষণে বৈজ্ঞানিকগণ বিশদ-রূপেই করিয়াছেন বলিয়া প্রতিপাত হইতেছে।

ঐশ্বর্যধর রায় ।

* Matter is composed of electrons, and electrons x x are not matter.—Modern Theory of Physical Phenomena, by Righi.

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্বানুস্মৃতি)

ঐ বাড়ীর রত্নশালার ব্যবহৃত চমৎকার ছিল, স্ততরাং সন্ধ্যার সময়ে আসিরাও আমাদের বা রোগীর কোন কষ্ট হয় নাই। বাড়ীর গৃহিণী এবং তাঁহার পুত্রবধূ ও কন্যাগণের দ্বারা অনেক বিষয়ের সহায়তা পাইরাছিলাম। সে রাত্রির অল্প আলোর ব্যবস্থা তাঁহারাই করিলেন, বলিলেন, পরদিন সে ব্যবস্থা আমরা করিয়া লইলেই চলিবে। কলতঃ সে দিবস ঐ গাড়োয়ানের সাহায্য না পাইলে আমরা এই ভয় বাড়ীওয়ারার স্থান পাইতাম না এবং না পাইলে ধর্মশালার রোগীর বড় কষ্ট হইত। সঙ্গে রোগী থাকিবার জন্য বাড়ীর গৃহিণী এবং অন্তান্ত নারীবর্গের সহানুভূতি এবং সহায়তা অনেক পাইরাছিলাম, রোগীর পথ্যাদি বিষয়ে তাঁহার অনেক আত্মকূল্য করিয়াছিলেন, সে সকল গুণ অপরিশোধ্য। আর্ন্ত আত্ম গীড়িতের জন্য নারীর অন্তর সর্বদাই কাঁদিয়া থাকে এবং এই আর্ন্তের সেবার রত্নশ্রী দেশ বিদেশ, আপন পর, ভাতি বিজাতি জান না—শোক, দুঃখ, বেদনঃময় সংসারে ইহা মানবের অসূচ্য সম্পদ।

ভাবিরাছিলাম সন্ধ্যার বিনি গীড়িত হইরাছিলেন, তিনি সহজেই আরোগ্যলাভ করিবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। আমাদের ডাক্তার বাবু একদিন বিমর্ষ মুখে আমাকে জানাইলেন, রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, রোগ বৃদ্ধি পাইরাছে, এবং নাকীর প্রতিও মন্দ, পরামর্শের (Consultation) জন্য ভাল ডাক্তারের আবশ্যক। তবে মাত্র দুইদিন পূর্বে বোম্বাইয়ে পহঁছিরাছি, কিছুই এবং কাংকোও তখন চিনি না। বাড়ীওয়ারা ও তাঁহার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম কে সেখানে সর্বাপেক্ষা ভাল চিকিৎসক। তাঁহার বাহাছরদী এবং সেখানকার মেডিক্যাল কলেজের Ist. Physician এক ইংরাজ ডাক্তারের নাম করিলেন। বাহাছরদীর নাম ড এলাহাবাদে মেশো মহাশয়ের নিবট

শুনিরাছিলাম, এবং তাঁহার নামে চিঠিও ছিল। কিন্তু ডঃ ডাক্তার পত্রের জন্য হস্ত বাহাছরদী তাঁহার প্রাণ্য বর্শনী লইবেন না, এবং রোগীরও ইচ্ছা। বুঝিলাম যে ইংরাজ ডাক্তারকেই আনিব হয়। স্ততরাং তাহাই করা হইল। আমি ও সেক্রেটারী বাবু উভয়ে সেই ডাক্তারের সন্ধানে বাহির হইলাম। আমার গাড়োয়ানটি দেখিলাম “সব জাভা”; বিনা ক্রেশে সোলা ইংরাজ ডাক্তারের বালকেনার-হিত কুঠিতে পাকী লটরা হাজির করিল। প্রয়োজন লিখিয়া “চিট্” পাঠাইতেই লোক আসিয়া বসিবার ব্যয় লইয়া গেল। ডাক্তার সাহেবকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলাম; রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বলার, আর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি আসিলেন। রোগীকে অনেক সাহস জ্ঞাপনা দিলেন বটে, কিন্তু বাইবার সময় আমাকে এবং ডাক্তার বাবুকে বলিলেন “He is desperately ill, but I hope we shall be able to pull him round.”

বাহা হউক, প্রায় এক মাসের চিকিৎসার তত্ত্বাবধি তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু পথ্য বিষয়ে তাঁহাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িরাছিলাম। ডাক্তারগণের উপদেশ, পাকী ভাষার মধ্যে যেটি নিষিদ্ধ, সেইটির স্মরণাই তাঁহার পথ্য। কিন্তু তিনি কোন মতেই তাগাতে স্বীকৃত নহেন। অগত্যা পারাবত বলিয়া নিষিদ্ধ পক্ষিমাংসের রসই চালাইতে লাগিলাম এবং প্রতিবারে শপথ করিয়া বলিতে লাগিলাম উহা পাররা, পাররা পাররা—“প” বর্ণের আভ্যন্তর, শেফাকর নহে। একদিন তাঁহার অবস্থা এমন মন্দ হইরাছিল যে আমি গোপনে শবদাহের স্থান পর্যন্ত দেখিয়া আসিরাছিলাম। সেখানে সর্বত্র শবদাহ করিবার ব্যবস্থা নাই এবং সমুদ্রতীরেও শবদাহের স্থান নাই। কুইল রোডের উপরে, চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান আছে, আবশ্যক কাঁঠ ইত্যাদি সেইখানেই পাও

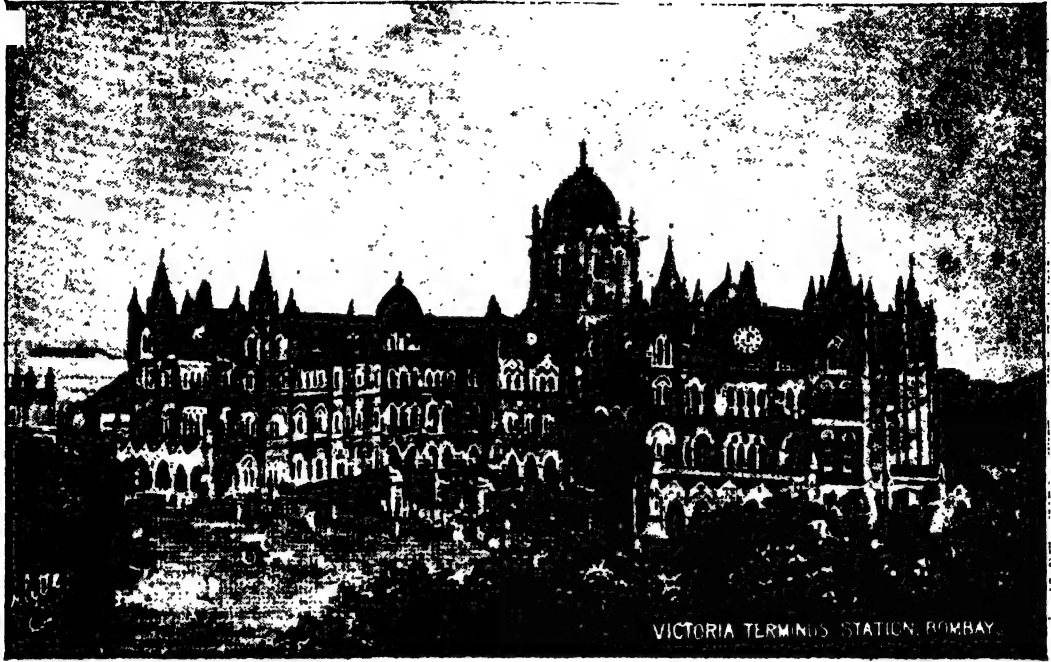
বার। পার্শ্ববর্তী শবের ব্যঙ্গ্য অতরূপ। টাওয়ার অক-
সাইলেন্স নামক ইটকাচি নির্মিত বেদিকার মত
ছোট বড় করটি মঞ্চ মাতাবার হিলের সর্বোচ্চ শিখরে
প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে—শবদেহ সেইখানে লইয়া ঐ
মঞ্চের উপরে স্থাপন করিবামাত্র গৃহের দল আশ্রিত
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা নিঃশেষে ভেঙেন করিয়া
কেলে। অবশিষ্ট বহি কিছু থাকে তাহা জল দ্বারা ধৌত
করিয়া দিলে মঞ্চের নিম্নস্থ নালা দিয়া একেবারে সমুদ্রগর্ভে
চলিয়া যায়, এবং শবদ্বার পরিষ্কৃত হয়। অপেক্ষাকৃত
বৃহৎ শবদ্বারগুলি পরিণত বয়স লোকের শবদেহের জন্য
এবং ছোটগুলি শিশু ও বালকদের নিমিত্ত নির্মিত।

শবদেহের স্থান দেখিয়া আসিয়া আমার মন বড়ই
বিষন্ন হইয়া পড়িল। ভাবিলাম লোকের মৃত্যুর পূর্বেই
অশ্রু দেখিয়া বোধ করি অমরনের কার্য করিলাম।
যদি বা এই ভয়সন্ধানের মৃত্যু নাও হইত, আমার এই
অপকার্যে বুঝি অণ্ডতক আসি ডাকিয়া আলিলাম।
একান্ত আত্মগোষ্ঠিত অন্তর ভরিয়া উঠিল, ভগবানের
নিকট কায়মনোবাক্যে অন্তর হরণের জন্য প্রার্থনা
করিতে লাগিলাম। যাহা হউক, কোন বিপদ হইল
না, সেই দিন crisis কাটিয়া গেল, তাহার পর হইতে
তিনি ক্রমেই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি রোগীর পথ্য লইয়া বিপদে পড়িয়া-
ছিলাম। যখন তিনি আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে-
ছিলেন, তখন তাঁহার কুপথ্য করিবার সূচনা এতই বগবতী
হইয়া উঠিল যে, সে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ঐ
ভয়ংকর বড়ী নাটোরের সন্নিকটবর্তী এক পল্লীগ্রামে।
নাটোরের সন্দেশের সাহিত্য বদদেশে এসিদ্ধ এবং সে
সন্দেশও নানা প্রকারের। ঠৈশবাবধি তিনি ব্রাহ্মণোচিত
মিষ্টান্নভোজনের ক্ষমতাকে এতই বর্ধিত করিয়া তুলিয়া-
ছিলেন যে, জলযোগের জন্য তাঁহাকে দুই তিন সের
সন্দেশ দিলেও তিনি কখনও না বগিতেন না।
দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগভোগ ও অনশনের পর তাঁহার সূচনা
এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, বাগরের ককাকর্ষন থাকিলে,
যদি তাঁহারা খাওবন খাইয়া কেলিবার জন্য তাঁহাকে

আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উদাহর্য অসম্ভবতা
নিরতিপর তুলিলাভ করিতেন সন্দেহ নাই। নাটোরের
সন্দেশের ভায় সন্দেশ বদদেশের অন্য কোন স্থানেই পাওয়া
হুইত, বোম্বাই প্রদেশে তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনাই
নাই। তথাপি যে সকল মিষ্টান্ন নামধারী অখাদ সামগ্রী
সেখানে পাওয়া যায়, তাহাই ভৃত্যদ্বারা গোপনে আনাইয়া
আহার করিবার সন্ধানে তিনি কিরিতে লাগিলেন। হরি-
চরণ নামক আমার এক ভৃত্যকে তিনি গোপনে আদেশ
করিয়াছিলেন; পীড়ার সময় হরিচরণ দ্বিবারাত্রি তাঁহার
সেবা করিয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছে, সুতরাং কুপথ্য করিবার
সহায়তা করিয়া পুনরায় গুজবাব কষ্ট ভোগ করিবার তাহার
ইচ্ছা ছিল না। সে আসিয়া ভাতার বাবুকে ও আমাকে
গোপাল বাবু (ভজলোকের নাম গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী)
এই সন্দেশের কথা জানাইল। হর্ষগতা এতটুকু তাঁহার
নিজের কোথাও বাইবার শক্তি নাই, সেই জন্য হরিচরণের
নিকট অকৃতকার্য হইয়া তিনি প্রত্যেক চাকরকে অর্থের
প্রলোভন দেখাইয়া সন্দেশ আনিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু
আমাদের ভয়ে কেহই স্বীকার করে নাই। অবশেষে আমি-
দের নিকট কাকুতি মিনতি, সর্বশেষে বালকের ভায়
অস্বাভাব এবং রোদন। আমি বখাওই আশ্চর্যগাথিত
হইলাম। ভাবিলাম, বুঝিবা গোপাল বাবুর মতি-বিকৃতি
ঘটিয়াছে। ডাক্তার বাবু কহিলেন, উহা টাইফয়েড
লক্ষণযুক্ত পীড়ার ধর্ম, রোগের অবসানে কিছুদিন ঐরূপ
সূচনা এবং লোভ বর্ধিত হইয়া থাকে; অল্পকাল পরে শরীর
একটু সবল হইলেই ওসকল লক্ষণ দূর হইয়া যায়। হইলও
তাহাই। গোপাল বাবু পীড়ার সময়ে তাঁহাকে বাসার
রাখিয়া দীর্ঘকালের জন্য কোথাও বেড়াইতে বাইতে আনয়ন
কেহই পারি নাই; তিনি সুস্থ হইলে সকাল সন্ধ্যা বিগ্রহর
কেবল বুঝিয়া বেড়ানই আমাদের কাব্য হইল।

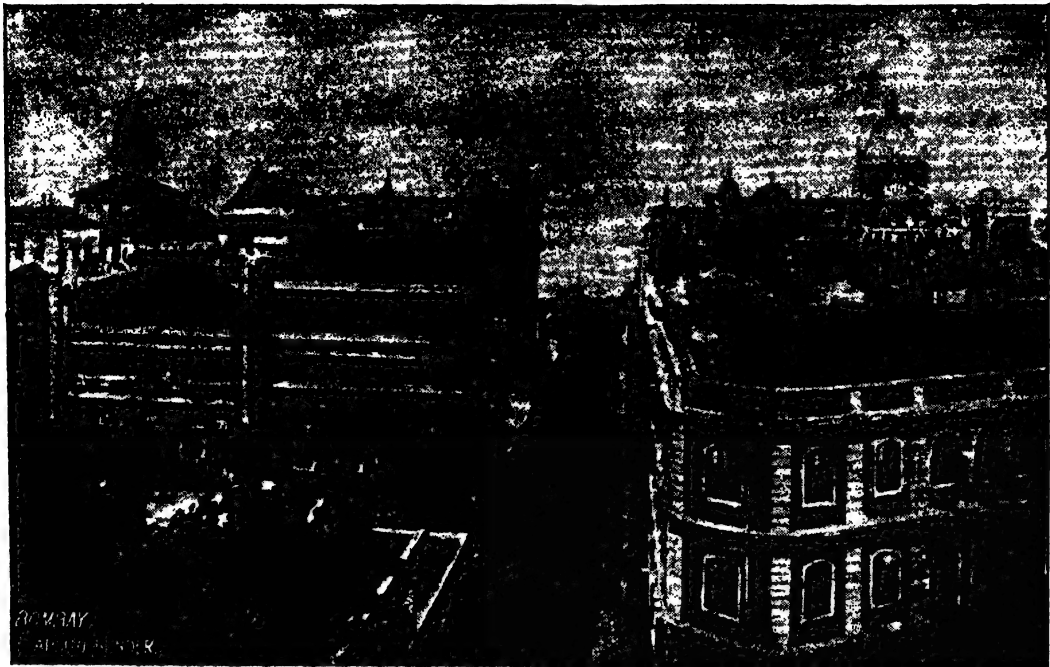
বোম্বাই সহর অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বিবাহের বৌতুক
স্বরূপ ইংরাজসাজ ইহা অপূর্ণ ইউরোপীয় পূর্বাধিকারী-
নিকট পাইয়াছেন এবং সেই সময় হইতেই ইহার বর্তমান
সুদৃষ্টি স্থচনা এইরূপ শুনা যায়। কলিকাতা বাহার
নিকট স্থপরিচিত, বোম্বাই দেখিয়া তাহার বিষয় অস্বাভাব



বোম্বাই—ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশন

বিশেষ কারণ নাই। তবে সেদিনে কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইয়ের ঘর বাড়ীগুলি বৃহত্তর ছিল এবং কলিকাতার দ্বিতল গৃহের সংখ্যাই সামান্য, বোম্বাইয়ের দ্বিতল ছাড়িয়া সপ্ততল সৌধও সেদিনে দেখিয়াছি। সেখানে চৌপ বলিয়া এক জাতীয় গৃহ আছে, বাহার অভ্যন্তরে দুই তিন শত পরিবার অনারাসে বাস করে এবং রক্তনাদ সমুদয় প্রয়োজনীয় কার্য উহারই মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে; জানি না সেই কারণেই সেখানে প্রেগ মৌরুদী পাট্টা লইয়া বসিয়াছিল কি না। বোম্বাই নগরীর স্থান বড়ই মনোহর। চতুর্দিকে অলংকৃষ্ট সালসিটি বীণের একতম এই বোম্বাই। সে অলংকৃষ্ট বিল, খাল নদী নালায় অলংকৃত, আরব সাগরের উত্তাল তরঙ্গময় অলংকৃষ্ট—বত দূর চক্ষু বার কেবল অলের পর অল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বোম্বাই হইতে পোতারোহণে বাজা করিয়া আরবের উপকূলে স্মৃতিকা স্পর্শ করিতে

প্রায় এক সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন হয়, বোম্বাইয়ের পদপ্রান্তস্থিত দিক্‌ সলিলের বিস্তৃত অসুমান ইহার দ্বারাই হইতে পারে। কেবল দিক্‌ই ইহার একমাত্র মৌল্য নহে—এই সাগর সলিল ভেদ করিয়া “মালাবার” শৈল উর্দ্ধে উঠিয়াছে—বাহার শিখরদেশে দণ্ডারমান হইলে ধন জন সৌধ সমন্বিত এই মহানগরীর অপূর্ণ স্ত্রী নরন-মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। ইহার একদিকে মহাসমুদ্রের অনন্ত সলিলরাশি তরঙ্গাতিঘাতে নিরন্ত চঞ্চল, অপরদিকে উপসাগরের স্থির অবিকল্পিত বারি কদাচিত্ বাত সংস্পর্শে ঈষৎ ক্ষীণ। এই উপসাগরের অগভীর স্থির অঙ্গে অপরাহ্নে বিলাসী ইংরাজ ও ধনী দেশীয়গণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিলাসভরণীগুলি বখন পালতরে হংসীর ভায় চলিয়া যায়, সে দৃশ্যও মনোরম; আমাদের কলিকাতার সাগর শৈলের সমন্বিত নাই, বোম্বাইয়ের Yacht club এর পালতরা অসুন্দরী বিলাস তরণীরও একান্ত অভাব।



বোম্বাই, আগলো বন্দর

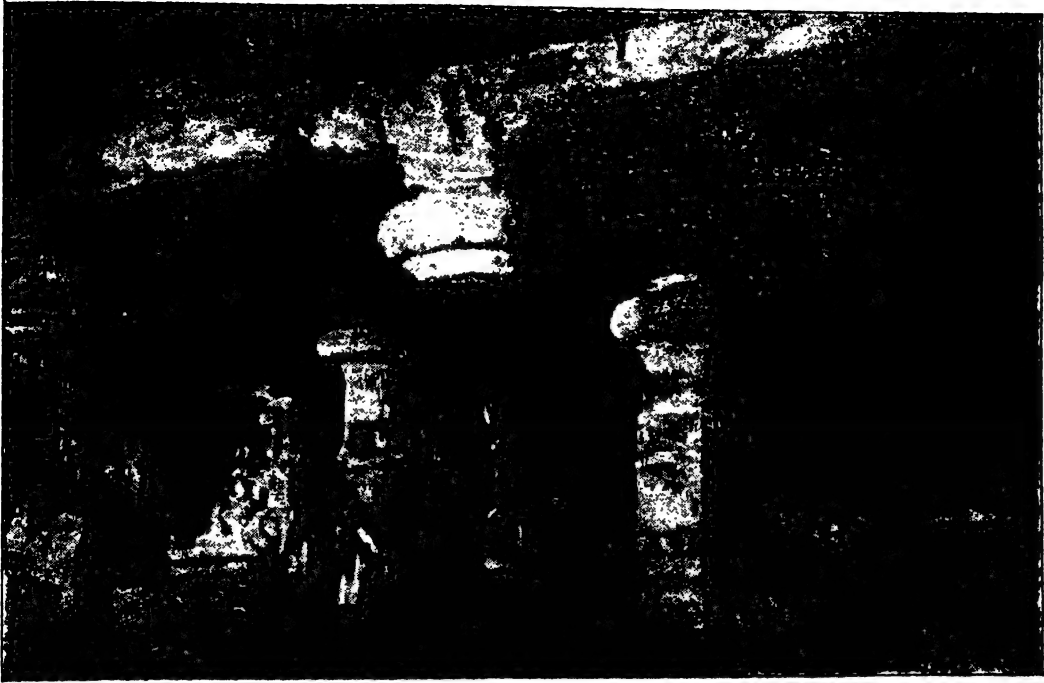
কোলাবা হইতে চৌপাটি পর্যন্ত চারি পাঁচ মাইল দূর হইবে। সমুদ্রসৈকতে এই চার পাঁচ মাইল দীর্ঘ বাঁধ (embankment) রহিয়াছে। সেই বাঁধের উপর দিয়া বাম্বাইয়ের মারাঠী, মাড়োয়ারী, মুসলমান, শুজরাটী, গাটরা, গোয়ানীজ সর্বপ্রকারের সহস্র সহস্র নরনারী দলভুক্ত বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণে বাহির হয়। কিন্তু অশুচ্যের বিষয় এই যে, এই অশুচ্য নরনারীর মধ্যে ইংরাজ বা ক্রিষ্ণীয় সংখ্যা অতি অল্প, নাই বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে না। সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য দেশীয় লোকের অধীনে থাকার সরকারী কর্মচারী ব্যতীত ব্যবসায়ী ইংরাজ লোকেরা একরূপ নাই।

বিদ্যেয় দক্ষিণে জীলোকের 'পর্দা' নাই। বোম্বাই, পোস্তা, শুজরাট, মালাবার সর্বত্রই বিশিষ্ট ভদ্র এবং নী পরিবারের নারীগণও কাঙ্ক্ষণলব্ধ বা বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণে, সমুদ্রসৈকতে, অব্যাহাতে ভ্রমা করিয়া থাকেন; কিন্তু ভারতে এবং বাঙ্গালা দেশেই পর্দার আধিক্য

দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে উক্ত ভারতবর্ষে ও বাঙ্গালার মুসলমান প্রাধান্ত ছিল এবং তাঁহাদের অনুকরণে কিংবা হরত বা অস্ত্রান্ত কারণে এই পর্দাপদ্ধতির প্রচার হইয়া থাকিবে।

বোম্বাই সহরের সমস্তই আধুনিক। পুরাতনের মধ্যে কেবল হস্তিগুপ্তা (Elephanta Caves) বাস্তবিকই ইহা পুরাতন এবং টঙ্কাজ্বারা কঠিন পর্কটগাজ বিদ্যানে বিস্তার প্রাচীন ভারতবর্ষ কি নৈগূণ্য লাভ করিয়াছিল এই হস্তিগুপ্তা তাহার একতম উদাহরণ। এলোরা, অজন্তা, লোনা, কালা খডগিরি, উদগিরি প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গুপ্তা পরে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এই হস্তিগুপ্তাই আমি প্রথমে দেখিয়াছিলাম এবং ভারতীয়গণের ওক্ষণ-সকতার বিষয়ে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছিলাম।

হস্তিগুপ্তা দেখিতে জলপথে যাইতে হয়। কেহ কেহ পালের নৌকার কেহ বা টীয়ারযোগে যাইয়া থাকে। পালের নৌকার বিলম্ব হয়, গতায়ত এবং সেখানে

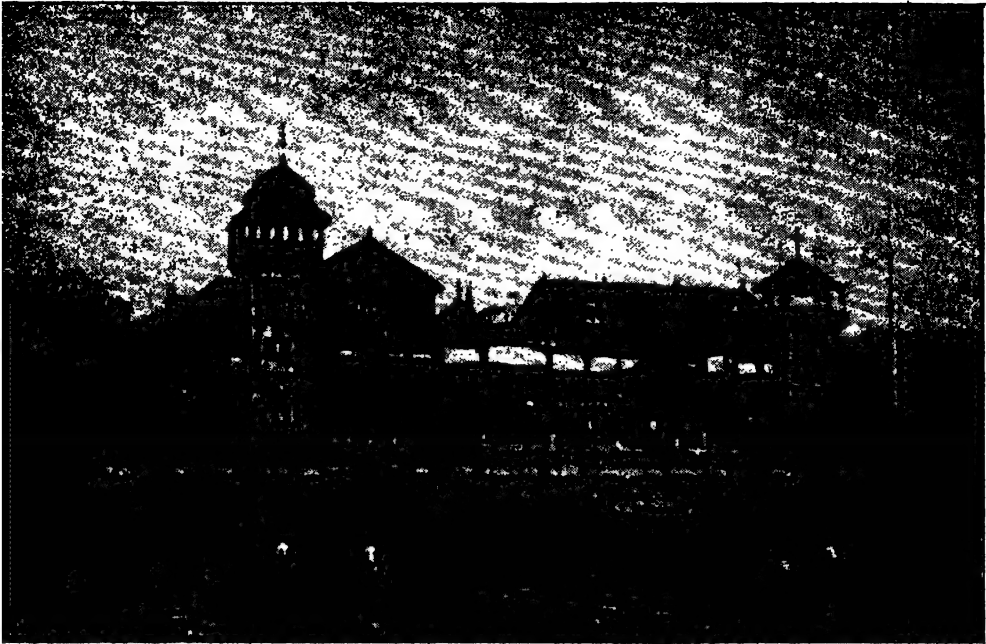


হস্তিগুপ্তার প্রবেশদ্বার

কেবল যে সময় লাগে তাহাতে তার প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন কাটিয়া যায়। সেইজন্য আমরা নৌকার না গিয়া জীবারে বাইবারই ব্যবস্থা করিলাম। এক পার্শ্বীয় জীবার ঠিক হইল, গতরাতে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া বন্দোবস্ত হইল। যখন পার্শ্বীয় সহিত কথাবার্তা হইতেছে, আমার সেই পূর্ববর্ণিত ঠিকাগাড়ীর গাড়োয়ান আমাকে ইন্দিতে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া উহার জীবার লইতে নিবেদন করিল। বলিল, সেই পার্শ্বী লোক ভাল নহে, তাহার জীবার ভাড়া এবং লোককে ঠকাইয়া ভাড়া অধিক লইয়া থাকে, অপেক্ষা করিলে ভাল লোকের ভাল জীবার সে ভাড়া করিয়া দিতে পারিবে। দেখিলাম পার্শ্বী আভির উপরই এই সুরাটের মুসলমানটির বিভাজী বিবেচন রহিয়াছে। আমি মনে করিলাম সেই বিবেকের আলোতেই এ ব্যক্তি ওরূপ বলিতেছে, বস্তুতঃ সেই পার্শ্বী তল্লোক মল্লোক নাও হইতে পারে। পরে দেখিলাম,

গাড়োয়ান বাহা বলিয়াছিল সেই কথাই সত্য, আমার অনুমান ঠিক নহে।

পরদিন প্রাতে আহাঙ্গাদি শেষ করিয়া আপলো বন্দরের ঘাটে আসিলাম। দেখিলাম জীবার প্রস্তুত রহিয়াছে এবং পার্শ্বীটিও সেখানে উপস্থিত আছেন। বাইবামাত্র তাড়াতাড়ি টাকা চাহিলেন এবং বলিলেন ভাড়া না দিলে জীবারে উঠিতে পারা যাইবে না। তদ্রূপে পার্শ্বীটির নিকট হইতে এরূপ কথা আমি প্রত্যাশা করি নাই। মনে মনে একটু বিরক্তি বোধ করিলাম। তাবিলাম বাইব না; কিন্তু প্রস্তুত হইয়া গিয়া জীবার ঘাট হইতে ফিরিয়া আসাও ঠিক মনে হইল না। অপরাহ্ন পাঁচটার মধ্যে সেই ঘাটে জীবার ফিরিবে এই ব্যবস্থা ছিল, তদনুসারে আমার গাড়োয়ানকে ঐ সময়ে গাড়ী আনিবার আদেশ দিয়া, আমরা তুর্গানাম স্মরণ করিয়া বাজা করিলাম। বলা বাহুল্য তাড়াতাড়ি পার্শ্বী আগেই লইল।



“রয়াল বথে ইয়ট্ ক্লাব”

বাইবার সময় কোন বাধা বিদ্য হইল ন', নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বখাছানে ঈশার পছন্দ ছিল। আমরা নামিয়া গন্তব্য পথে চলিলাম। পথ নতোরত সমুদ্রতল হইতে একটি ক্ষুদ্র পাথর উঠিয়াছে, সেই কঠিন শিলাগাত্র তক্ষণ করিয়াই এই গুফার স্রষ্টি। পাথর ছোটবড় বে ক্রপই হউক, পথ বন্ধ হইবেই। বিশ্রহের প্রচণ্ড রোদ্রতাপে বন্ধুরপথে চলিতে শ্রম বিলক্ষণই হইল এবং শিলাগাত্র : আমরা সকলেই কাতর হইয়া পড়িলাম। কিন্তু জল কোথায় জানি না। চারিদিকে দেখিঃছি অসুস্থ লবণাশু! গাইড সর্বজই আছে। ঈশার হইতে নামিবামাত্র সেই বীণেও গাইড সঙ্গ লইয়াছিল। তাকে পানীর জলের কথা জিজ্ঞাসা করার সে একস্থানে লইয়া গেল। দেখিলাম সেখানে নির্মল সুমিষ্ট বরগার জলের একটি অতিক্রম চৌকাঙ্গ রহিয়াছে, সকলে সেই জলই পান করে। সঙ্গে একটি গ্লাস ছিল, সকলে সেই জল আকর্ষণ পান করিয়া তবে চলৎশক্তি করিয়া পাইলাম।

গিরিগুফার নিকট গিয়া আমরা সকলেই শুভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। ২৭পূর্বে আর কখনও তক্ষণশিল্পের কোন নির্দর্শন দেখি নাই, ইতিহাস পাঠ করিয়া এবং লোকমুখে শুনিয়া ইহাদের অস্তিত্বের বিষয় অবগত ছিলাম মাত্র। প্রথম দর্শনে আনন্দ, বিস্ময়, গর্ভ, কত ভাবের উদয় যে মনের মধ্যে হইতে লাগিল তাহা আজ ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। অদূরপূর্বে অত্যাশ্চর্য তক্ষণ-দক্ষতা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ছিলাম এবং এই শিল্পদক্ষতা বাহারা দেখাইয়া গিয়াছে তাহারা এই ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি এবং সেই ভারতের হিন্দুকুলে আমার জন্ম বলিয়া গর্বে বখাখই ক্ষীতবন্ধ হইতেছিলাম।

হস্তিগুফার ভিত্তি, স্তম্ভ, ছাদ, গৃহতল সমস্তই এক বিশাল শিলাখণ্ড হইতে খোদিত। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথক্ভাবে প্রস্তুত করিয়া একত্র সংবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই, তক্ষণ শিল্পের সাহায্যে শৈলাদি ছেদন করিয়া

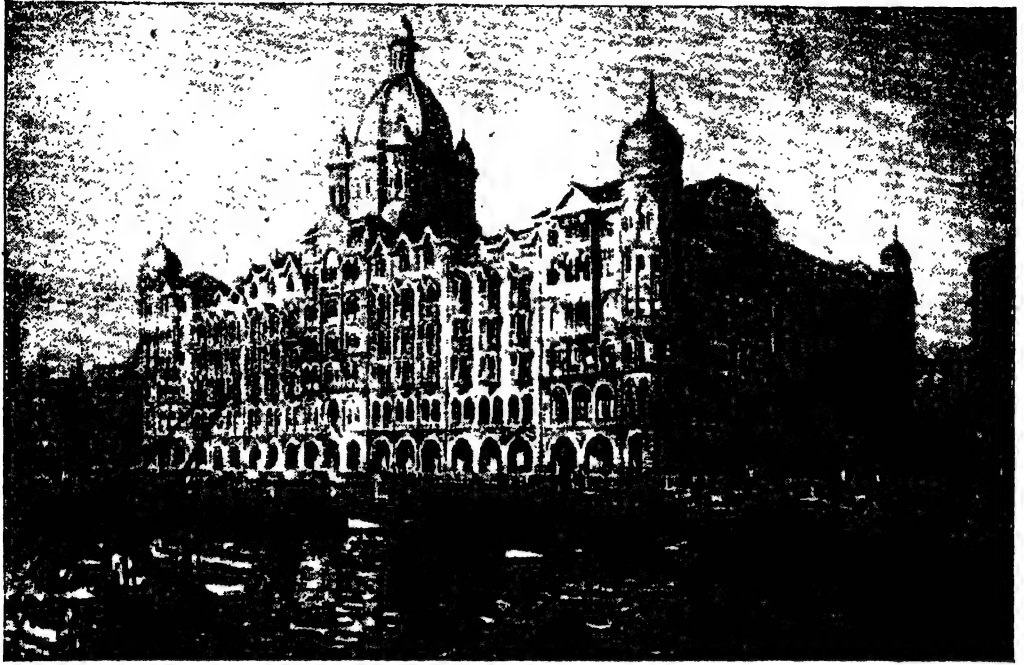


বোম্বাই, মিউনিসিপল হল (বামে) ও ভিক্টোরিয়া টার্মিনস স্টেশন (দক্ষিণে)

কঠিন গিরিগাত্ৰকে এই আকার প্রদান করা হইয়াছে। —কেবল ইহাই নহে, গুহাতিষ্ঠিতে যে সকল স্থল কার্য্য রহিয়াছে তাহা অত্যাস্থ্য এবং গিরিগাত্ৰক্ষেদন করিয়া যে সুবৃহৎ অৰ্দ্ধনারীখর সৃষ্টি নির্মিত হইয়াছে তাহাও অপূৰ্ণ। পাব'নে এরূপ কোমলতা সরিবেশ এবং অন্তর সৃষ্টির সুখে তাবের এতাদৃশ অতিব্যক্তি আমি তৎপূৰ্বে আর কোথাও দেখি নাই। বস্তুর হস্তগুন্দের এই অৰ্দ্ধনারীখর সৃষ্টি এবং তাহার চতুর্দিক অত্যন্ত সৃষ্টিগুলি ভারতীয় তত্ত্বশিল্পের অপূৰ্ণ সম্পদ। অৰ্দ্ধ-নারীখর সৃষ্টিটি আকারে একাধ, কিন্তু আধ হয় আধ গৌরী এই সৃষ্টির প্রতি অবরূপ এমন সুন্দর স্তম্ভ, গৌরীগাত্ৰের এবং শিব অঙ্কের আভরণ ও অটাকুট, শিঙা, ডবক প্রভৃতি আবশ্যক সকল সামগ্রী এমনি সুন্দর করিয়া নির্মিত যে, মোম বা মুক্তিকা দ্বারাও সেরূপ গঠন সম্ভব কি না সন্দেহ। এই আশ্চর্য্য কলাকৌশলময় গিরিগুন্দের এবং সমুদ্র পরিবেষ্টিত, পত্রদ্বন্দ্ব গুণগত

পরিশোধিত বীণের আপাদশীর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতে দেখিতে প্রায় অপরাহ্ন হইয়া গেল। আমরা স্বরাশ্রিত হইয়া সীমারে চড়িলাম, সীমার ছাড়িয়া দিল।

কিছুদূর আসিয়া দেবিলাম বায়ু প্রবল হইয়াছে এবং বায়ুর প্রতিকূলেই আমাদেরকে বাইতে হইবে। সীমার ক্ষুদ্র, সুতরাং তাহার কল বজাও বিশেষ বলশালী নহে। বায়ুপ্রভাবে অগভীর উপসাগরেও উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র তরলীরও তরঙ্গাভিঘাতে নাভিখাস উপস্থিত; নৌকার দোলন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সোজা হইয়া পীড়ান অসম্ভব। সকলেই সমুদ্র পীড়ার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতেই, একটি যে ক্ষুদ্র ক্যাবিন ছিল তাহার মধ্যে আশ্রয় লইলেন, আমি একাকী ডেকের উপরে বসিয়া লবণাচ্ছাশির তরঙ্গ-তল দেখিতে লাগিলাম। মন্থরগামিনী তরলী কিছুদূর অগ্রসর হইতেই শ্রাম্যমানা সন্ধ্যার অন্ধকারে সাগর-বন্ধ আঁধার হইয়া গেল এবং সারেক হঠাৎ কল বন্ধ করিয়া দিয়া নৌগর কেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।



তাজমহল প্যালেস হোটেল, বোম্বাই

কল বন্ধ হওয়ার নৌকার দোলন এত বৃদ্ধি পাইল যে চৌকিতে বসিয়া থাকিও ঢুকর হইল।

সারেককে কারণ জিজ্ঞাসা করার জানিলাম যে ষ্টীমারের বরলার পুরাতন, অতিশয় গরম হওয়ার ফাটিয়া বাইবার মত হইয়াছে, যদি ফাটিয়া যায় তবে আরোহিগণের প্রাণের আশঙ্কা, সুতরাং বরলার ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত নোঙ্গর করিয়া থাকিতে হইবে, কাল প্রাতে কোন সময়ে ষ্টীমার আগলো বন্দরে পৌঁছিতে পারে। এতক্ষণে বুঝিলাম গাড়োয়ান বাহা বলিয়াছিল সেই কথাই সত্য। পুরাতন জীর্ণ ষ্টীমারে গভীরভাবে অসুবিধা হইতেই পারে এবং তাহা হইলে তাড়া পাইবার সম্বন্ধে গোল হইবে, সেইজন্য ষ্টীমারের মালিক পার্শী মহাশয় আগেই তাড়া আদায় করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ষ্টীমারে আহাৰ্য্য কিছুই নাই—পাঁচ সাত ঘণ্টার মধ্যে কিরিব, সুতরাং আমরাও কোন ব্যবস্থা করিয়া বাই নাই, একরূপ ঘেঁষাটতে

পারে তাহা করনাতেও আসে নাই, কারণ :খেঁচা লোকে sailing boatএ সর্বদা গভীরত করিতেই কোন বিপদ হয় না, সেখানে ষ্টীমারে আসিয়াও এম আশঙ্কিত হইব ইহা কে ভাবিতে পারে? সারেককে জিজ্ঞাসা করিলাম এখন কি উপায় হইবে? কে বলিল, তাহার ষ্টীমারের জালিবোট আছে, তাহাতে বসি মাঝগাম্ বন্দরে নামিয়া বাইতে পারা যায়; আপন বন্দরে বাইতে বিলম্ব হইবে কারণ দূরপথ এবং ব প্রতিকূল। আমরা দেখিলাম, বান্দু এবং দেবতা উভয়ে প্রতিকূল, নতুবা অসময়ে একরূপ ঝটিকার মত প্রবল ব বহিবে কেন এবং গাড়োয়ানের নিবেদন সবেও আর বহু ষ্টীমার থাকিতে ঐ পার্শী মহাশয়ের ষ্টীমার না কেন? তাহা হউক জালিবোটে বাড়াই স্থির করিয়া সমস্ত রাত্রি অনাহারে, কেবল মাত্র দোল খাইয়া ষ্টীমা থাকা অসম্ভব মনে হইল, কারণ সে বরসে ক্ষুধার ক্রো

কম ক্লেণ মনে হইত না, এবং তুঙ্গপরি বয়সার কাটিতে পারে সে ভয়ও ছিল।

ক্ষুদ্র জালিবোটে কো-মতে আমরা করজন বসলাম। ছইজন দাঁড় দাঁড় বাহিতে লাগিল এবং একজন মাঝি হাল ধরিয়া রহিল। ষ্টীয়ার হইতে জালিবোটে ঝড়ের সময়ে নামাও ছুঃসাধা ব্যাপার। যদি বা কোনমতে বোটে নামিলাম, চলিবার সময়ে তরঙ্গবেগে ক্ষুদ্র বোট উলটি পালটি খাইতে লাগিল। কখন কখনও একটু আঘটু জলও নৌকার মধ্যে উঠিয়া পড়িবার বস্তাদি দিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। সেই সময়ে পার্শ্বী পৌঃ-ডয়লাকে যে আলীকীর্দাটা করিতেছিলাম তাহা আর বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, সে মনের কথা মনেই জানে, আর জানেন তিনি যিনি অদ্বৈতী।

মাঝগাম বন্দর অপেক্ষাকৃত নিকট হইলেও দেখানে পহুঁহিতে প্রায় দেড়ঘণ্টা কাগেরও অধিক লাগিয়া গেল। যখন উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের উপরে নৌকা উঠে এবং তরঙ্গ অপমৃত্ত হইলে নৌকা নামিয়া যায়, সে দোলন, এবং পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে দোলন এই উভয়বিধ গতি মিলিয়া ক্ষুদ্র তরঙ্গীখানির সমুখ গতি বড়ই বিলম্বিত হইতে লাগিল। সমুদ্র-পীড়ার ভায় লক্ষণ সকলেরই দেখা গেল, কেবল প্রবল বাতাস ছিল বলিয়া কষ্টমারক সমুদ্র পীড়া সর্কসম্পূর্ণ লক্ষণ হইতে পারিল না। বাহা হটক কোন মতে গিয়া মাঝগাম বন্দরে পহুঁছিলাম। আমাদের গাড়োয়ান পূর্বব্যবস্থা মত আপলো বন্দরে অপর ছু পঁচ ঘটিকা হইতে অপেক্ষা করিতেছিল। যখন সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া গেলেও আমাদের ষ্টীয়ার বন্দরে আসিয়া পহুঁছিল না, তখন কোন বিপদ ঘটিয়াছে আশঙ্কা করিয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন রা'জ আটটা পর্যন্ত আমাদের কোন খোঁজ নাই, তখন সে জলপুলিশে গিয়া খবর নিয়াছে এবং বলিয়াছে যে “বিশেষী করজন তরলোক অসুখ পার্শ্বী পুরাতন ষ্টীয়ারে এলিক্যাটা গিয়াছে, বেলা পাঁচটার এখানে কিরিবার কথা, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাহারা কিরিল না, নিশ্চয়ই কোন বিপদ হইয়াছে, তোমরা তোমাদের ষ্টীয়ার লইয়া অসুগদান কর, যদি প্রয়োজন

হয় তবে আমি লিখিত এজাহার করিতেছি।” আমা-দেয় ক্ষত্র পুলিসের বিশেষ ব্যস্ততা ছিল না, কিন্তু গাড়ো-য়ান তাহাদিগকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা নিত্যন্ত জাগ্রত হইয়া তাহাদের জলপুলিশের ষ্টীয়ার প্রস্তুত করিয়া চতুঃদিক্কা পথে রতন চাইবে, এমন সময়ে আমরা মাঝগাম হইতে আপলো বন্দরে গিয়া পহুঁছিলাম এবং আমাদের গাড়োয়ানের নাম ধরয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম। আমার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র সে “খোদা বাচায়া, শেঠ তোম আরেছো, এনা দেয় কাঙ্কো দুরা?” ইত্যাদি বহু প্রশ্ন এক সঙ্গে করিতে করিতে ছোট্ট দিকে কক্ষখাসে দৌড়িল এবং পুলিসের কর্মচারীকে আমাদের আগমন সংবাদ জানাইয়া, সঙ্গে করিয়া আমাদের নিকটে তাহাকে আনিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনেতে কাঁহল। পুলিস কর্মচারীর প্রার্থে উত্তরে আমি সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনি চিন্তা সা করিলেন, সেই পার্শ্বীর নামে অভিযোগ আনিবার ইচ্ছা আমাদের আছে কি না। আমি দেখিলাম বিদেশে মাঝলা মোবদমা করিয়া একটা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িবার কোন প্রয়োজন নাই, শারীরিক কষ্ট বাহা হইবার তাহা হইয়াছে, পুনরায় ঘরের টাকা ব্যয় করিয়া মাঝলা করিতে হইবে এবং মাঝলার ফলও অনিশ্চিত। আমরা অস্বীকার করায়, আমাদের সুরতী গাড়োয়ানটা মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল যে বাঙ্গালী শেঠের নিকট পার্শ্বীটি কিঞ্চিৎ শিক্ষা পায়। তাহার কথায় বার্তার বুঝাছিক্যাম যে সমগ্র পার্শ্বী জাতির উপরে তাহার বড়ই বিদ্বেষ ছিল। জানি না একটি সম্প্রদায়ের সমগ্র লোকের উপরে তাহার এরূপ বিজাতীয় ক্রোধ কেন জন্মিয়াছিল। আমি তদূর বিদেশবাসী, আমার সহিত এই গাড়োয়ানের কখনও কোথাও পূর্বে পরিচয় ছিল না, হোটেলের দ্বারে গাড়ী খুঁজিবার সময় হঠাৎ তাহার সহিত দেখা, সমুখেই তাহার গাড়ী উপস্থিত ছিল সুতরাং তাহার গাড়ী খানিই ভাড়া করা হইল, অন্য কেহ সমুখে থাকিলে হয়ত তাহার গাড়ীই গওয়া হইত—এইরূপ পথের পরিচয় ত জীবনে কত হইতেছে কত বাইতেছে তাহার শেষ নাই সীমা নাই। কিন্তু এ ব্যক্তির সহিত একদিনের

সেই দৈবাৎ পরিচয় এমন অকল্পিত সেব্য সেবক সম্বন্ধে পরিণত হইবে, আমার আপদ বিপদের চিন্তামাত্র তাহাকে অস্থির অধীর করিয়া তুলিবে, ইহার কারণ অনেক চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। বাহাকে একান্ত প্রিয় জানে হৃদয়সনে বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই প্রীতি মমতা বাহা কিছু জবরের প্রেষ্ঠ সামগ্রী সমস্তই বাহাকে নিঃশেষে দান করিয়া নিঃশ্ব হইয়াছে, মানুষ অনেক সময়ে তাহার নিকট হইতে নিদারুণ বেদনা লাভ করিয়া জীবদ্দশার ভার শেষ নিমেষ-পাতের জন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে! আবার ঘটনাবীন বারেকের চারিচক্ষুর সম্মিলনে যে "তারি মৈত্রী"র উত্তর হয়, তাহা আনন্দকণ স্মারী হইয়া জীবনকে সরল ও সার্থক করিয়া দেয়—সংসারের এই বৈচিত্র্য কেন কে বলিবে? এ সমস্তার সমাধান তিনিই করিতে পারেন যিনি সংসারে এই সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছেন।

বেলা প্রায় নয়টার সময় আহাৰ করিয়া এলিক্যান্টা বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইরাছিলাম এবং রাত্রি এগারটা পর্যন্ত পর্ত্ত প্রত্যহ্ন শীতল বারি ব্যতীত জঠরস্থ হতাশনে অস্ত্র কোন প্রকার আত্মতা দিবার সুযোগ হয় নাই। মনে হইতে লাগিল, রামায়ণ বর্ণিত কুস্তকর্ণ, মহাতারতের ভীম বা খাণ্ডবভোজী স্বয়ং দেব ঐশ্বানরকেও পরাজিত করিতে পারা যায়। তাড়াতাড়ি গাড়ীতে বলিয়া বাড়ী করিলাম। জৌশনীৎ রন্ধনপটু ঈশানচন্দ্র ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া, আমাদের বিলম্বে উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাল কাটাইতেছিল, বাইবামাত্র সোপকরণ অরের খালা সম্মুখে আনিল। অরের খালায় এবং ব্যঞ্জনের বাটিতে যে রাত্রির ভূজ্যবশিষ্ট বাহা ছিল তাহাতে একটি সুবিকের পর্যন্ত পেট ভরিত কিনা সন্দেহ। আহাৰ বেরূপ কুস্তকর্ণের মত হইল, নিদ্রাও তদনুরূপ। বিছানার অঙ্গশর্শ হইবামাত্র চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল এবং অপ্রবীণ সুযুক্তির মধ্যে কখন রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই। বাড়ীওয়ালা পার্শী ভদ্রলোকের প্রাণে জীভাশীল শিত শোভে পৌজীগণের হস্ত কলরবে চক্ষুদ্রলন করিলাম।

বোম্বাইয়ের "রাজাবাই টাওয়ার" একটা দর্শনীয় সামগ্রী।

বৃত্তিবাতা প্রোমটাইব রায়দীন তাঁহাদের মাতার পূণ্যস্মৃতি চিরজীবী করিয়া রাখিবার জন্ত এই "টাওয়ার" নিৰ্ম করিয়া দিয়াছেন। ইহার শীর্ষদেশে আরোহণ করি কেবল বোম্বাই সহর নহে, সহরের চতুর্দিকে বহুদূর পৰ্ব দেখা যায়। এই টাওয়ারের উচ্চ চূড়া হইতে আ সাগরের তরঙ্গসঙ্কুল অগার জলরাশির দৃষ্ট বড়ই মনোরম। মিউনিসিপ্যাল হল এই সহরের আর একটি গগনভেদী, ইহার গম্বুজে আরোহণ করিলেও চতুর্দিকে দি চক্রবাল পর্যন্ত দৃষ্টি অবোধে প্রসারিত করিয়া দেওয়া যায়। আজিকার দিনে ইলেকট্রিক এবং হাইড্রলিক লিফট্ বেধা সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়—এমন কি বহু ধনী লোকে আবাগম্বেও লিফটের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ যেদিনের কথা সেদিনে কেবল বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল হলের গম্বুজে চড়িবার জন্ত একটি লিফট দেখিয়াছিলাম এবং সেই লিফট যোগেই সৌধশিখ চড়িয়াছিলাম। নতুবা চক্রাকার সোপানশ্রেণী (সিঁড়ি) আরোহণ আমার সাধো কুলাইত না। লোকে জাকরি যেহা একটি ঘর, বলিবার জন্ত একখানি সে রাখিয়াছে, সেই ঘরের নিকটে বাইবামাত্র liftman জাকা দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিল এ নিজেও প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ব্যক্তি গৃহকোণের এক স্থানে হাত দিবামাত্র খট কা একটা শব্দ হইল এবং সমগ্র ঘরখানি সোকাগহিত আনন্দ লইয়া সোঁ সোঁ শব্দে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল তৎপূর্বে কখনও গুরুপ ব্যাপার দেখি নাই; সত্য বলিতে হইলে আমাকে আজ স্বীকার করিতে হইবে প্রথমটা বড়ই ভয় পাইরাছিলাম, কিন্তু লজ্জার liftman কিছু বল নাই। ইচ্ছা হইতেছিল বলি যে আমার উঁ কাষ নাই, আমাকে মাতা ধরিজীর হির অঙ্কে নামা দাও। কিন্তু বলা হইল না। সংসারে অনেক সময়ে বলি করিয়া অনেক কথাই বলা হয় না। এবং তাহার হ্রঃ বেদনাও বড় কম হয় না। তবে liftmanকে বলি করিয়া না বলার হ্রঃ কিছু হয় নাই বরং সৌধশিখ হাঁ যে দৃষ্ট দেখিতে পাইরাছিলাম, তাহাতে আনন্দই।

করিয়াছি। আজ বোম্বাই সহরে বহু উচ্চতর সৌধরাশি আকাশ ভেদ করিয়া তাহাদের গর্ভোন্নত মস্তক উর্দ্ধে ভুলিয়াছে। সেদিনে রাজাবাই টাওয়ার, মিউনিসিপ্যাল হল, ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন প্রভৃতি চারি পাঁচটি প্রকাণ্ড সৌধ সহরের বাবুদানা অংশে (fashionable quarter) ছিল, দেশীয়গণের আবাসের জন্য অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন অংশে চৌল নামক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাঁত আট তালি গৃহ ছিল, বাহার গঠন প্রণালী এবং বাহ্যশোভা দেখিয়া প্রাণাদ সৌধ প্রভৃতি নাম তাহা দৃশ্যকে দেওয়া যায় না। আজকাল সে সকল চৌলের অদৃষ্টে কিরিয়া গিয়াছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্লেগ আসিয়া বোম্বাই সহরে বহুলোক মর করিয়াছে। কিন্তু সহরের ত্রিবৃদ্ধির সূচনা সেই হইতেই হইয়াছে। আজ সমুদ্রতীরস্থ সৌধরাশি দেখিলে মন মুগ্ধ হয়, চক্ষু কিয়াইয়া লগ্না কর্তন হয়। সে দিনে Yacht Club এর স্মরণ অট্টালিকা Green's Restaurantর দশ তালি ইয়ারত, পার্শ্ব ধনকুবের টাটার প্রাসাদানন্দী "তাজ প্রাসাদ" (Tajmahal Palace Hotel) কল্পনার অতীত সামগ্রী ছিল। কোলাবা বন্দরের আলোকস্তম্ভ (light house) সহরের দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে একতম। লোকের গমনাগমনের সুবিধার জন্য বোম্বাইয়ের চতুর্দিক বেটন করিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে এবং প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি বায়টী পর্যন্ত বহু ট্রেন যাতায়াত করে, কলিকাতার সেক্স Circular line নাই। সহরের মধ্যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে বাইবার জন্য রেল চড়িবার সুযোগ কলিকাতার হয় না, সেই জন্য কোলাবার বাইবার সময়ে প্রান্তরোড ষ্টেশনে রেল চড়িয়া কোলাবা ষ্টেশনে নামিগাম। সমুদ্রের উপলান্তীয় সৈকতভূমির উপর দিয়া অনেকদূর গেল Light house পাওয়া যায়। আমরা করতলে একজনে সেই প্রান্তরময় বন্ধুর পথে কষ্টে চলিতে লাগিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে জোয়ার আসিয়া পড়িল, আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না, ঘরাবিহীন হইয়া ক্রিান্তে ক্রিান্তেও পাহাড়া এবং পারদ্রাঘা তিহিয়া গেল। সিক্তবসনে ও সিক্ত পথে আমরা ষ্টেশনে কিরিয়া আসিলাম। সে

বারা আর Light house দেখা হইল না, পরে দেখিয়াছি।

বোম্বাইয়ের আর একটি দৃষ্ট বড়ই স্মরণ; বাজালায় স্তম্ভ ও পাটের যে সকল কল আছে, তাহা কলিকাতার নহে, কলিকাতা হইতে দূরে গঙ্গাতীরে সে সকল কল অবস্থিত। হাবড়ার কলগুলিই সর্বাঙ্গেক্ষেত্র নিকটে অবস্থিত। কিন্তু বোম্বাই সহরের মধ্যেই বহুতর কলের কাষ নিত্য চলিতেছে এবং প্রতি কলে বহু সহস্র লোক কাষ করিতেছে। সন্ধ্যার কলগুলি বন্ধ হইলে সংস্র সংস্র কুলী কলবরের উচ্চ বন্ধবাহু হইতে ক্ষুধিত লাভ করিয়া বধন রাজপথে সারিবদ্ধ হইয়া একজনে আনন্দ কলরবে তাহাদের আবাস গৃহের দিকে চলিয়া যায়, সে দৃষ্ট বড়ই মনোরম।

বোম্বাই প্রদেশের সকল পুরুষের মস্তকে কোন না কোন প্রকার শিরজ্ঞাপন রহিয়াছে এবং সে সকল শিরজ্ঞাপন বিভিন্ন বর্ণের; ঐ প্রদেশের ইতর ভাষা সকল শ্রেণীর জীলোকেই রজনী কাগড় পরিয়া থাকে এবং কাগড় পরিবার ধরণও তাহাদের বিভিন্ন। বিভিন্ন বর্ণের শাড়ী ও শিরজ্ঞাপনে সমগ্র রাজপথগুলি রজনী হইয়া উঠে; সমুদ্রগর্ভে মজ্জমান সন্ধ্যারবির বর্ণজটাজনিত আকাশের শোণিমায় সহিত রাজপথবিহারী নরনারীর বস্ত্রে বর্ণবিচিত্র্য সম্মিলিত হইয়া সমগ্র নগরকে এক অপূর্ব শোভা দান করে বাহা বর্ণনা যায়। বুকাইবার সামগ্রী নহে। তাদৃশ বিচিত্র বর্ণ-বিভার অপর কোন নগরী প্রতি সন্ধ্যার তেমন উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে কি না জানি না,—শেষতঃ দেশ আমাদের বাজালায় যে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ নাই ইহা নিশ্চিত।

বোম্বাই সহরে কাকি এবং চাঁদর দোকান কলিকাতার পাণ্ডা দোকানের ভার রাজপথের মোড়ে মোড়ে রহিয়াছে, এবং সে সকল দোকান প্রাতে ছয়টা হইতে রাত্রি ছয়টা পর্যন্ত সর্বদা লোকে পরিপূর্ণ। চাঁ কাকির এত চলন বুঝি ভারতের অন্য কোন স্থানে নাই। মিশর, আরব, চীন, জাপানে আছে কি না আমি জানি না, কারণ সে সকল দেশ আমি দেখি নাই।

বোম্বাই সহরে জগতের আর সমস্ত ঘেণের মানুষ বাস করিতেছে। এই সহরকে পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র সংক্ৰমণ বলিলে অতুক্তি হইবে না—ইরানী, আরবী, মিশরী, তুর্কী, চীনা, জাপানী, বোম্বাই, বোম্বাই, ক্যানগারী, ইরাকন্দী, তুটানী, কান্দীরা কিছুই অভাব নাই। বুদ্ধি এই সকল চাপান বিধে মহামহোপাধ্যায়গণের সহবাসে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সকলে ঐ কার্যে বিশ্রাম হইয়া উঠিয়াছে। সেখ মেস রোড, গ্রান্ট রোড প্রভৃতি বহু জনাকীর্ণ মহলার যে সকল চা কাকির দোকান আছে, সন্ধ্যার পরে সে সকল স্থানের অধিকাংশ দোকানে হারমোনিয়ম সহকারে গীতবান্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ সময়ে আলোর খটা আর দেওয়ালীর মত। এ সহরে থিয়েটারের সখও কম নহে; শুদ্ধাঙ্গী, মারাঠী, পার্সী নানা সম্প্রদায়ের লোকের থিয়েটার রহিয়াছে এবং সকলগুলিই প্রতিদিন দর্শকে পরিপূর্ণ, স্থানান্তরে অনেক কিরীয়া বাইতে বাধ্য হয়। পার্সীদিগের থিয়েটারই আমার নিকট ভাল বলিয়া

বোধ হইল এবং কেবল বর্তমানে নহে সে দিনেও পার্সী থিয়েটারের দৃশ্যপট গুলি বড়ই সুন্দর ছিল, বোধ হয় পেরুগ সুন্দর দৃশ্যপট আদ্যও কলিকাতার অনেক বাঙালী থিয়েটারে দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোপাল বাবুর পীড়ার অস্ত বাধা হইয়া বোম্বাইয়ে অনেক দিন থাকিতে হইয়াছিল। কালের মধ্যে দুই বেলা যুরিগা বেড়ান। একদিন আটকাল উদ্দেশ্যবিশীন অলস ভ্রমণের সময়ে চৌপাঠী নামক সমুদ্রতীরবর্তী মহলার ভারতের বিখ্যাত চিত্রকর রাজা রবিবর্মার বাড়ীর দ্বারে তাঁহার নাম লিখিত প্রস্তরফলক দেখিলাম। তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হইল। ফটক পার হইয়া গৃহের সমুখস্থিত উদ্যানের লোহিত কঙ্কণের পথে ঘুরে ঘুরে অগ্রসর হইলাম।

ক্রমশঃ

ঐজগদিশ্রনাথ রায়।

পতিতার কাহিনী

(গল্প)

আমি পতিতা! পতিতা—সমাজের চোখে; পতিতা সরকারের খাঁতার! আর ধর্মতঃ? জগবান কোথায় তুমি—উত্তর দাও। থাক—সে বিচার একদিন হবে' খন। আমি এখন পতিতাই! তাই হোক!

আমার এ পতিতার কাহিনী—সত্যী সাক্ষী পুরুরীরা তোমাদের না হয় শুনে কাঁদে নেই। কিন্তু ওগো অসহৃদয় প্রেতসৃষ্টি পুরুষজাতি, যদি তোমাদের ধর্ম থাকে, তবে ধর্মতঃ এ কাহিনী শুনে তোমরা বাধ্য! মাতৃপুত্র হতে পতিতার সৃষ্টি হয় নি।—তোমরাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা! তোমাদেরই অবিচারে ব্যক্তিচারে উৎপীড়নে প্রলোভনে আমাদের উৎপত্তি। কার জন্তে নিরাশ্রয়-মহলা,

পাণের বোকা বাড়ি নিয়ে নরকের দরজার গিঁড়ে দাঁড়ায়? কার জন্তে সমাজের তলে তলে জগহত্যার বস্ত্রাদ্রব্য বিতরণ? কার জন্তে বিধবা দড়িতে বেলে, আঙনে পোড়ে, বিষ খায়, গলার ভোবে?

যে নরকে আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও একদিন দ্রুতি ভোগ করতে হবে, সেই নরকের কীটও আমাদের দৃশ্য করতে পারে,—কিন্তু তোমরা পার না! সুতরাং সৃষ্টির তত্ত্বানী ভাগ করে আমার এ কাহিনী শোন।

আমিও একদিন তোমাদেরই ঘরে মা বোনের মতন স্বপ্নবাহীর পুণ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। তখন আমার বয়স হবে চোদ্দ পনেরো। বোবনের রান্না নেশার আমের

সবে আগছিল, তখন কেবল সংসারের কুটনো কোটা বাটনা বাটা ঠাকুর ঘরের নৈবিত্তি সাজানর মত গরমর কাঁবে মনের তৃপ্তি হত না। অথচ খাণ্ডী ঐ কাঁবগুলোই আমার জীবনের ক্রম লক্ষ্য বলে ভেদেছিলেন এবং জানিয়েও ছিলেন। তাঁর ছেলে অর্থাৎ আমার স্বামী, পুলিশকোর্টে ওকালতী করতেন। তখন স্তনতুহ এবং বুকেও ছিলুহ, পুলিশকোর্টের উকীলরা নাকি সব দিন বাড়ী আসতে পারে না—বিশেষত শনিবারটা। এই ধারণা নিচে, আঁধ পেটা খেয়ে এবং খাণ্ডীর ঘরের মেঝের রাস্তা কাটিয়ে, ক্রমে বোলায় পড়লুহ। আমি নাকি স্মরণী ছিলুহ। তাই পাড়ার পাঁচজনে বখন আমার খাণ্ডীর বধু ঐসংখ্যের পরিচয় না পেয়ে আমার পূর্ব রূপ ও বাহ্যের তুলনা করে নিজাঙ্গা করত—আমি কেন এমন দিন দিন শুকিয়ে বাচ্চি, তখন খাণ্ডী ঠাকুরাণী দোষটা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে বলতেন—“খাচ্চন মাচ্চন, সবু বে কেন মরা কাট হচ্চন বলতে পারিনে।” দোষারোপটা এইখানেই শেষ হলে বাঁচতুহ। আমার ছেলেপুলে হচ্চ না, আমি বন্ধা—এ অপবাদটাও সঙ্গে সঙ্গে পেতে হত। তখনও খণ্ডরবাড়ীর ভর ভাঙনি, তাই এ সব চুপ করে সহ্য করতুহ। নরত আমার যেমন রাগী মেজাজ, তাতে হয়ত একটা কাণ্ড করেই বসতুহ।

স্বামীর মূর্তি আমার কাছে কতটা অপরিচিত ছিল স্তনুে হয়ত তোমরা বিখ্যাপ করবে না—হাসবে। এক দিন রবিবারে ছপুয় বেলা আমার স্বামীর শোবার ঘরে বসে কি করছি, এমন সময় আমার স্বামী (পরে জানতে পেয়েছিলুম) টলতে টলতে ঘরে ঢুকচেন। দেখে “মাগো একটা মাতাল” বলে ভরে টেঁচিরে উঠেছিলুম—আর তার কল ও হাতে হাতেই পেয়েছিলুম।

স্বামীর প্রহারে অচেতন হওয়ার পর বখন জ্ঞান হল, তখন স্তনলুহ, খাণ্ডী বাধিনীর মত ভীষণা হয়ে গাল দিচ্চেন—“হারামখাদি ছোট লোকের ঘরে—এত বড় আন্দাজ! আমার ছেলে মাতাল? বেশ করেছে! তোর বাবার পরসি খেয়েচে?” ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি বলছি, স্বামীর প্রহারের পরিচয় পেয়ে মনে যে ব্যথা পেয়ে-

ছিলুহ, তাতে শরীর ও মন অসাড় হয়ে গেছিল। প্রহারের ব্যথা বা বাক্যের আলা সব ভলিরে-গেছিল।

বাগের বাড়ীর চুলোর তেমন কেউ থাকলে আজ আমার এ কাহিনী লিখতে হত না। তাই আমার পিঠের ব্যথার সহশ্রুণ ব্যথা মনে নিয়ে সংসারের দাসীপনা করেও দিনের পর দিন কাটাতে লাগলুম।

ছঃখময় জীবনের তারে বখন বড় হয়ে পড়তুম, তখন মনে হত আত্মহত্যা করে সব জালা জুড়োই! কিন্তু জানিনা এ পৃথিবীর আকাশে বাতানে কি একটা অন্ধ মাদকতা ছিল, যা ছেড়ে যেতে মন চাইত না। বখন বড় কষ্ট হত, তখন ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতুম। তাতে যেন অনেকটা জালা নিবে আসত।

কিন্তু খাণ্ডীর সঙ্গে এ শান্তিহুও সব সময় ভোগ করতে পারতুম না।

“সোমন্ত বউ ছাতে ছাতে বেড়াবে—এত ভাল নয়!” “কুলকণ” বলে বিধিরে বিধিরে কত ভৎসনা করতেন। তিনি ভাবতেন স্বাক্ষার কাঁব ছাড়া তাঁর সোমন্ত বউয়ের পক্ষে এ সংসারে আর সবই অনাবশ্যক। যদি এমতু লুকিয়ে বই পড়তুম অমনি যেন গল্প পেয়ে কোথা থেকে বাধিনীর মত তেড়ে এসে তা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন।

এই রকমে বছর পাঁচ ছয় জালিয়ে গুড়িয়ে আমার খাণ্ডী হুদিনের অরে বাকরোধ হয়ে হঠাৎ মারা গেলেন। আমি যেন—স্বীকার করছি—খানিকটা মুক্তির আবাদন পেলুম। দিন দুই পরে আমার ননদেরা গোষ্টকাডে'খবর পেয়ে বাগের বাড়ী এসে মড়াকারার বাড়ীবাড়ি আরম্ভ করে দিলেন। আমি তখন তেতালার ছাতে বসে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে আকাশের নীল রং দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছিলুম।

ননদেরা বোধ হয় আমার এ ব্যবহারের খবর পেয়ে-ছিলেন। তাই খানিক পরে আমার মেজো ননদ মুখখানা আবাড়ের মেঝের মত তার করে আমার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, “তোমার আপন তো দুই হয়েছে,

আর আকাশও তো পালাচ্চ না, তা এখন একবার নীচে এলে ভাল হয় না ?”

ইচ্ছা হল বলি “আকাশ পালাবে না সত্যি, কিন্তু কিন্তু আপদ একেবারে দূর হয়েছে কৈ ?” কিন্তু তা না বলে’ নন্দনের স্নেহের উত্তরে শুধু বলেন, “তোমাদের কারা শেষ হয়েছে ?”

নন্দ বাবিনীর মত ভীষণ হয়ে বলেন, “আমরা ত বউ নই যে লোক-দেখানো কারা কঁদতে এসেছি।”

আমি একটু হেসে বল্লুম, “কোন কোন খাণ্ডীর গুণে লোক দেখান কারা কঁদতেও ঘোরের প্রবৃত্তি হয় না।”

নন্দ আমার গর্জ্জে উঠে বলেন, “কেউ তোমার কঁদতে বলচে না—তোমার আপদ গেচে, দাদাকে বলে বাড়ীতে বিয়েটার দাও।” নন্দ রাগে হুম্ হুম্ করে নেমে গেলেন।

২

বিজ্ঞানের হুঁপাতা পড়ে লোক বলে ভূত নেই, কিন্তু ভূত আছে—অন্ততঃ তার প্রভাব আছে। খাণ্ডীর মৃত্যুর পর তেবেছিলুম অস্বাভাবিক সন্দেহের অত্যাচার থেকে পালিয়ে। কিন্তু তা হল না—তিনি ভূত হয়ে আমার হাতীকে আশ্রয় করে আমার আগাতে লাগলেন। জ্বর দতি স্বামী, বিশেষতঃ চরিত্রহীন স্বামীর সন্দেহ যে কি হালার তা যে ভুক্তভোগী সেই জানে। কাটা ঘরে ঘুপের ছিটে তার কতকটা উপমা। যে অকথ্য কুখ্যা সাধারণ মানুষে মুখে আনা ত দূরের কথা, মনে আনতেও নিজের কাছে ছোট হয়ে যায়, সেই সব অকথ্য কুখ্যা বলে স্বামী আমার সন্দেহ করে আগাতে লাগলেন।

শিশির আমাদের পাশের বাড়ীর অতুল বাবুর ছেলে। চার বরষ বার তের হবে। আমি, যখন বউ হবে আমি তখন স বছর ছয় সাতের। সে আমার কাকীমা বলে ডাকত। টি ছাটা থাকলে গল্পের লোভে সে আমার কাছে এসে বাসতো। এই ঘটনা একদিন স্বামী আমার কাছে থেকেই জানতে পেরে, যে কথব্য বিষয়ী একটা কথা বলেন,

তা মনে করলে আজও ঘেরার মরে যেতে ইচ্ছে করে। চরিত্রহীন পুরুষের মন যে কত নীচ হতে পারে, সে দিন প্রথমে বুঝতে পারলুম। তার পর থেকে শিশির গল্প শুনতে এলে নানা অছিলা করে তাকে বিদায় দিতাম, কিন্তু হুবিধা পেলে সে গল্প শুনতে আসতেও ছাড়ত না। একদিন কোন আপত্তিই খাটল না। তার কাকুতি মিনতি দেখে একটা গল্প বলতে হল। গল্পটা শেষ হয়-হয়, এমন সময় হঠাৎ দেখলুম স্বামী সামনে দাঁড়িয়ে। বুঝলুম, তিনি ইচ্ছে করেই নিঃশব্দে এসেছিলেন। চোখোচোখি হতেই তিনি গভীরভাবে বললেন, “বেশ।” এই বলেই তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। শিশির বেচারী সেই গভীর আগ্রহে খতমত খেয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি ত স্বামীর গুণ জানতুম—পাছে কিরে এসে আমার কি বলে বলেন তাই শিশিরকে বললুম—“তুমি এখন বাড়ী যাও।” বাবার সময় বেচারী মুখ শুকিয়ে বলেন—“বাথাকে কাকা বলে দেখেন না ত কাকী-মা ?...আমি তো পড়া তৈরী করে এসেছি।”

আমি তাকে অতর জানিয়ে বত তাড়াতাড়ি পারি বিদায় দিয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে বললুম—“তোমার কি হল ?...মুখ অত গভীর কেন ?”

ছই চোখে নিরুদ্ধ রোষের খানিকটা আভাস দিয়ে তিনি বলেন—“এর উত্তর কাল পাবে।” কথাটা শুনে আমার বুকাটা কেঁপে উঠল। তাবলুম পুরুষ জাতিটা বদমেজাজী, কি জানি কি করে বলে। তাই একটু নরম-স্বরে বললুম, “তুমি পাগল হয়েচ ? আজ আমার ছোট তাই নিতাই যদি থাকত, তো সেও ওর চেয়ে বড় হ’ত।” উত্তরে স্বামী যে কথা বলেন, তা আমি গতিতা রমণী হলেও বলতে পারব না। সেই কথা শুনে, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত রাগে এমন রি-রি করতে লাগল যে, আমি নিজেকে সামলাতে পারব না কেনেই আর সেখানে দাঁড়ালাম না।

পরদিন স্বামী উত্তর দিলেন বটে—কিন্তু তার সবটুকুই ভুল। আমি কিন্তু সেই ভুল উত্তরের যে প্রত্যুত্তর দিমে-হিসুস, তা আগা-গোড়া এমন নির্ভুল চোভ—এমন

মুখের মত যে, তা তাবলে এখনও আমার গা শিউরে ওঠে।

সেদিন শনিবার। কোর্টের ফের্তা স্বামীর আমার বাড়ী আসবার কথাই নয়। তবু পূর্ন দিনের কথাটা মনে করে মনটার মধ্যে একটা অস্পষ্ট ভর কেমন যেন তাল পাকিয়ে উঠছিল।

বিকালের দিকে আমি রাস্তাঘরের দাঁকে বসে,—কত কি ভাবছিলাম। বি উল্লুনের জন্তে করলা ভাঙছিল। হঠাৎ একটা মোটর এসে আমাদের সদর দরজার ইঁপাতে লাগল। স্বামী কিরলেন তেবে মনটা অনেকটা হাকা হয়ে গেল। মনের আবেগে আমি মাঝের দরজার দিকে খানিকটা ছুটে গেলুম...বেশী দূর বেতে হল না, দেখলুম স্বামী অন্যরে চুকে গড়্চে, আর তাঁর সঙ্গে—এই আমাদের দলের—একটি সুন্দরী শরভানী।

না-সুখ না-ছাণের অবস্থাকে ‘নির্কীর্ণ’ বলে, না? এক তিন্তি যেমন কোন্ এক বাদশার অজ্ঞেহে করেক ঘণ্টার জন্তে বাদশাগিরি গেরেছিল, আনিও তেমনি আমার স্বামীর অজ্ঞেহে করেক সুহৃদের জন্তে বুদ্ধদেবের স্রুর্কটোর সাধনালঙ্ক সেই ‘নির্কীর্ণ’ গেরে বসেছিলুম।

তারপর ‘নির্কীর্ণের’ বেশা কেটে গেলে শুনলুম স্বামী বলচেন—“ইনি হচ্ছেন ‘মায়’ থিরেটারের সেই বিখ্যাত মিস্ ‘মকু’...এঁর ওখানেই আজ আমার নিমন্ত্রণ... আজ আর আমি বাড়ি কিরচি না, তুমি না হয় আজ শিশিরকে গল্পের নেমতর কোরো।” স্বামীর কথা শেব হতে দেখলুম তাঁর সহচরী খানিকটা চাপা হাসি ক্রমালে মুছে নিয়ে বলেন—‘আসি, নমস্কার!’

আমি একটা কথাও উত্তর দিতে পারলুম না। পাখরের মত তাঁর দাঁড়িয়ে রইলুম মাত্র। তারা আমার চোখের সামনে সাহেবী কেতার হাত ধরাধরি করে চলে গেল। তখন আমি আগম মনে বল্লাম—“আচ্ছা।”

৩

পুলিশ কোর্টের উকীলের ভূতপূর্ন জী আমি নির্দল-কুমারী যে কেমন করে’ এখন বীড়ন দীটের উপরকার

নীল চিক চাকা বারান্দার ‘আঙুরবাগা’তে পরিণত হয়েচি তার বিহৃত বিষয়ণ দিতে চাই না। সে ইতিহাস এক থিষাক্ত,—এত তীব্র, যে তা উদ্ধাটিত করলে তার নিখাসে ঘারে ঘরে অন্তঃপুরের হাওরা পর্য্যন্ত কলুষিত হয়ে উঠবে। আর তার কলে হরত আমার মত অনেক অতাগী পতি-ভক্তির শিকল ছিঁড়ে’ আমার গথে ছুটে আসতে উৎসাহ পাবে। আমি চাই না সে উৎসাহ দিতে। আমি চাই, স্বামী জাঠটাকে সতর্ক করে দিতে। ওগো নারীর ‘পরম শুক’র দল! দেবতা হতে চাও তো সত্যিকার দেবতা হও!

বাক্, এখন আমি আমার কথা বলি। এই যে আমি এ গথে উদ্ধার মত ছুটে এসেছিলুম—কিসের জন্তে? নবল অলঙ্কারে রূপের ডালি সাজিয়ে, নৃত্যঙ্গিতে পত্ত-শুলোর বৃকে ভোগলালসার দাবানল সৃষ্টি করতে কি? তা নয়।—সেই যে আমার স্বামী, আমার স্বপুনের লাভ পুরুষের ভিটের দাঁড়িয়ে আমার অপমান করে গেছেন,—সে অপমানের শোধ দেবার জন্তে আমি আমার তিন-কুলের মুখে কাণী মাথিয়ে এসেছিলুম। সে অপমানের শোধ আজও তো নিতে পারলুম না।

আগশোবে বিকারে আরও ছ’মাস কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন তগধান সুখ তুলে চাইলেন। দেখি,—আমার স্বামীর এক এটর্নি বন্ধ এসে আমার ঘারে অতিথি। আঙুরবাগার গানের খ্যাতি তাঁর কাণে বাওয়ার, তিনি নাকি গান শুনতে এসেচেন!

আমার গানের খ্যাতি তাঁর কাণে পৌঁছতে এত দিন লাগল বিজ্ঞাসা করার তিনি একটু হেসে বলেন—“না, তোমার গানের খ্যাতি অনেক পৌঁছেছিল। আমি তখন—ওয়ারলটোরের হাওয়ার তাকা শরীর ঘোরামত করতে ব্যস্ত ছিলাম।” আমি বল্লুম “জানেন ত, ডায়েক্ জিনিস খুব সাবধানে রাখতে হয়!” তিনি বলেন—“তাই-ত আর বড় একটা এদিকে আসিনা...তবে নেহাৎ গান শোনবার বাতিকেই যা আসা।”

আমি মনে মনে স্থির করলুম, এঁর ঘরাই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়ে নিতে হবে।

তারপর আরও তিনমাস কেটে গেছে। আজ আমার ঐক্য উদ্‌যাপনের দিন। কানীপুর অঞ্চলে এটর্নিবাবুর বাগনবাড়ীতে পাটির ব্যবস্থা করিয়েছি। আমি আর এটর্নিবাবু, মোটরে করে বাবার পথে, তাঁর পুলিশকোর্টের উকীল বন্ধুটিকে গাড়ীতে তুলে নেব স্থির হয়েছে। এ সব আমারই চক্রান্ত।

বেলা তিনটার লগ্ন স্থির হয়েছে। আমি আজ খুব মনের মত করে লাগ-গোঁজ করলুম।

ঠিক সময়ে এটর্নিবাবু এসে উপস্থিত হলেন। আমি সেই ভুবন বলগান রূপ নিয়ে গাড়ীতে উঠলুম। গাড়ী তেঁ। তেঁ। শব্দে ছুটলো, আর আমি রাস্তার দুধারে রূপের আশ্রয় ছড়িয়ে চকিতে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলুম।

এইবার আমার বুকের রক্ত তালে তালে নাচতে লাগল। মনে হতে লাগল, ভীষণ আনন্দের টুন্টনামিতে বুঝি হৃদপিণ্ডটা কেটে পড়বে। ক্রমে গাড়ীর গতি চিলে হয়ে এল...ঐ অদূরে আমার ষড়রবাড়ীর চিলের ছাদ দেখা যাচ্ছে।—তার পর—আর কিছুই মনে নেই।...গাড়ী এখন বাড়ীর কাছে থামল, আমি নাকি তখন অজ্ঞান।

হার! এত চেঁচা করেছে, আমার দেখে আমার হুতপূর্ব্ব স্বামীর মুখের ভাবটা কেমন হয়েছিল তা দেখতে পেলুম না। এটর্নি বাবুর মুখে শুনলুম, আমার মুক্তি মুখের পান্নে চেয়ে স্বামী নাকি চমকে উঠেছিলেন, আর তাঁর মুখখানা নাকি ছাইয়ের মত কঁকাসে হয়ে গিয়েছিল...তিনি নাকি টলতে টলতে কোনও কথা না বলে' ভিতরে চলে গেলেন, এটর্নির সঙ্গে আর দেখা করেন

না। বা চেয়েছিলুম, সবই হ'ল—কেবল নিজের চোখে দেখবার সখটুকু মিটল না।...

হৃদয় পরে শুনলুম, তিনি সেই দিনই বন্ধুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন। ঠিকই করেছেন। এ না করলে আমাকে তাঁর আরো অপমান করা হত। এই আত্মহত্যা করেছে তিনি বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন,—তিনি তাঁর পত্নীকে অপমান করে' কতদূর অস্তার করেছিলেন তা এখন বুঝতে পেরেছেন।

এইবার আমার পালা।

তিনি আত্মহত্যা করলেন আমার জন্যে। আর আমি তা নীরবে সহ্য করব?...তার উত্তর দেব না?—এ হতে পারে না। এত ভালামানুষ আমি নই—হতে পারব না।

তোমরা হয়ত আমার এ কাহিনী শুনে আমাকেই ঘোষ ঘোষ ও বলবে, "তোমার স্বামী হতই ঘোষ কক্ক না কেন, তা বলে তোমার অমন করাটা কিছুতেই ভাল হয় নি।" সে ভাল মন্দ বিচার তোমরা কোরো, আমার উগ্র প্রকৃতিতে সহ্যে না পেরে বা করেছিলুম, তাই এক বর্ণ না বাড়িয়ে বসলুম। এখন ঘোষ দিতে হয় দিও, আহা বলতে হয় বোল, আমি শুনতে আসব না।

এ কাহিনী তোমাদের কাছে পৌছবার আগেই আমার দেহ মড়াকাটার ঘরে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে, পরে কানী মিডিরের বাটে, অস্ত সব "গাদার মড়া"র সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যদি পরজন্ম থাকে, আর যদি সেখানে স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়, তবে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আমি পতিতা কি না।

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

সবাই সমান

ধনী ও দরিদ্র মাঝে অর্থের প্রভেদ,
রাজা ও প্রজার মধ্য ক্রমতার ভেদ।
সম্মানের ভেদাভেদ জানী মূর্থ মাঝে,
সবল হুর্জল মাঝে শক্তি ভেদ আছে।

সাদু ও পানীর মাঝে ধর্মের প্রভেদ;
কিন্তু এক স্থানে নাই এই ভেদাভেদ।
অতিশয় পুণ্যভূমি—সে যে রে মশান,
তার কাছে ছোট বড় সবাই সমান।

শ্রীমদেবচন্দ্র লাহিড়ী।

সমালোচনার

সমালোচনা বলিতে বিষয়-বিশেষের সম্যক্ আলোচনা বুঝায়। সুকুমার বলার বিষয়ীভূত বাহ্য কিছু প্রচারিত হয় তাহা বুঝাইবার, তাহার দোষগুণ বিচার করিবার চেষ্টার নাম সমালোচনা। রসাত্মকত্বের (appreciation) বার্থ্যও কতকটা তাই। রসাত্মকত্ব ও সমালোচনার পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত পদ্ধতিতে দোষ ও গুণ বিচারিত হয়। রসাত্মকত্বিতে কেবলমাত্র গুণ-ব্যাখ্যানই হইয়া থাকে। কবি, চিত্রকর, নাট্যকার ও শিল্পীকে বুঝাইবার, তাহাদের বৈশিষ্ট্য বোঝাইবার ও অমূল্যত্বের সাহায্যে রস-ব্যাখ্যা করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। সমালোচনার স্বল্প বিশ্লেষণ দ্বারা সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা থাকে। তীক্ষ্ণবী সমালোচক বিচারক। তাঁহার রায় বিচার-সহ হওয়া চাই। সহজ-জ্ঞান, বিচক্ষণতা, রসবোধ, সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব-জ্ঞান এবং মার্জিত কৃতির বলে সমালোচক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সত্য-সন্ধ নিরপেক্ষ সমালোচকের কষ্টিপাথরে আর্ট, শিল্প, কাব্যাদি বাচাই হইয়া তাহাদের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, ঐ সকল বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ প্রচারিত হয়। প্রকৃত সমালোচনা তাহাই, বাহার দ্বারা নিরপেক্ষভাবে সত্যকে লুপ্তকরণ করিতে পারা যায়। প্রকৃত সমালোচনার ফলে শিক্ষার বিস্তার হয়, ভাবুক লেখকের ও কবির সৌন্দর্য্যাত্মকত্ব ও চিত্তাঙ্গীণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের একটা দুর্বলতা আছে যে, সে অপরের বিচারকসম নত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারে না। অহং-জ্ঞান ও অভিমান এই দুর্বলতার সূলে বিভ্রম। যতক্ষণ সমালোচক আমাদের কার্যের উৎকর্ষ দেখান, ততক্ষণ আমরা তাঁহার পক্ষপাতী, আর যখনই তিনি আমাদের দোষ দেখান, তখনই তিনি আমাদের শত্রু হইয়া পড়েন। ভূয়োদর্শন, ভূয়ঃগঠন, বিচার-বিশ্লেষণ-

শক্তি, সাহিত্যের রসবোধ না থাকিলে ও মার্জিত কৃতি সম্পন্ন না হইলে কেহ প্রকৃত সমালোচক হইতে পারে না। সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠা না থাকিলে সমালোচক হইতে বাওয়া বিঘ্নবশত মাত্র।

চিত্র, শিল্প ও কাব্যাদির বর্ণিতব্য বিষয় মানবজীবনের অমূল্যত্ব ও ভাবের অভিব্যক্তি। যখন সমালোচককে এইগুলি বিশ্লেষণ করিতে হয়, তখন মনে হয়, মনো-বিজ্ঞানের নির্দ্ধারিত সত্যগুলির সহিত সমালোচকের সম্যক্ পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। কোন্ অবস্থার কিরূপ অমূল্যত্বের সুরণ সম্ভবপর, কোন্ মানসিক ভাবের বহিঃপ্রকাশ কিরূপে হইয়া থাকে, কোন্ ইচ্ছা মানুষকে কি ভাবে কার্যে প্রোদিত করে, তাহা ভালরূপে জানা না থাকিলে জীবনের অমূল্যত্ব ও বেদনার সমালোচনা করা ধুইতামাত্র। এ ছাড়া লেখক-সৃষ্ট চরিত্র বা অমূল্যত্বের ব্যাখ্যা সমালোচককেই করিতে হয়। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ না হইলে এরূপ কার্য কেহ সুসম্পন্ন করিতে পারে না। লেখক বা চিত্রকরের ব্যক্তিত্ব, বাহ্য রচনা বা চিত্রের ভিতর দিয়া পরিষ্কৃত হইয়া উঠে, তাহাই সমালোচক আমাদের নিকট বিবৃত করিয়া দেন, তাহাদের স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, সাহিত্যিক স্রষ্টাদের জ্ঞান চরিত্র সৃষ্টি না করিলেও সমালোচকেরা জীবন-বেদের ব্যাখ্যা করিয়া নূতন ভাবের সন্ধান দেন। স্রষ্টার সৃষ্ট চরিত্রের অপূর্ণতা দেখাইয়া চরিত্রকে সর্ব্বদা-সুন্দর করিবার পন্থা প্রকাশ করিয়া তাহারাও সৃষ্টি-শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় দেন।

এখন দেখিতে হইবে সাহিত্যক্ষেত্রে সমালোচনার আবশ্যকতা আছে কি না। অধুনা সুস্বাভাব্য রূপার প্রতিদিন বেকর ভূরি ভূরি পুস্তক ও চিত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা একজীবনে পাঠ করা বা দেখিয়া ওঠা

বড় সহজ ব্যাপার নয়, কে বলিয়া দিবে ইহাদের মধ্যে কোনগুলি অবিভ্য ও দ্রষ্টব্য। মনোবী বেকন একদিন বলিয়াছিলেন, “কতকগুলি পুস্তক কেবল গড়া চাই, কতকগুলি গলাধঃকরণ করা চাই, আর কতকগুলি পুনঃ পুনঃ গড়া ও আরস্ত করা চাই।” এ কথাই সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আর এই খণ্ড বঙ্গভাষার প্রকাশিত পুস্তকাবলীর প্রতি সম্পূর্ণ প্রযুক্ত। তাই বলি, ভাল ও মন্দ বাছাই করিবার ভার লয় কে? সমালোচকেরা এই কার্যের ভার লইয়া থাকেন।

এখন দেখিতে হইবে সমালোচকের হস্তে এই ভার দেওয়া সঙ্গত কি না? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, লেখক ও পাঠকের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি সমালোচকের স্থান নাই। পাঠক লেখকের রচনা পড়িয়া স্বয়ং তাঁৎকে বুঝিবার চেষ্টা করিবেন, সমালোচক এই দুই জনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইবেন কেন? এই ‘কেন’র উত্তর দিবার একটু চেষ্টা করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, সমালোচকের কাৰ্য বড় সহজ নয়। আজ কাল অনেক স্থলে আলোচ্য পুস্তক ভাল করিয়া পাঠ না করিয়া সমালোচক সমালোচনা করিয়া থাকেন। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ নন, অনেক সময় দেখা যায় তিনিই সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের ন্যায় মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। আবার কেহ কেহ মাসিক বা সাময়িক পত্রের প্রকাশিত সমালোচনার প্রতিধ্বনি করিয়া আপনাদের দারিদ্র্যজন-হীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সমালোচকের প্রথম কর্তব্য সমালোচনা করিবার পূর্বে ভাল করিয়া একাধিক বার আলোচ্য পুস্তক পাঠ করা। সমালোচক প্রথম পঠনেই যে লেখকের ভাবের সহিত পরিচিত হইবেন সকল সময় গ্রহণ মনে করা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকাশিত পুস্তকাবলীর মধ্যে অনেকগুলি অপঠ্য। কতকগুলি কেবল মাত্র বিষয়-বিশেষ বা চরিত্র-বিশেষের জন্য পাঠ করা উচিত। প্রকৃত সমালোচকদের নিকট হইতে এই দুই শ্রেণীর পুস্তক সম্বন্ধে আশ্রয় বঞ্চিত সাহায্য পাইয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারি। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তক সম্বন্ধে আবার

এই কথা বলিতে চাই যে, ঐগুলির ভিতর বাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য তাহার বখাৰখ চিত্র সমালোচকদের নিকট হইতে পাইয়া আশ্রয় সম্বন্ধে থাকিতে পারি। শুকতোজননে শরীর যে অস্থূল হয় একথা নুতন করিয়া বলিতে হইবে না। শুকতোজননের দায় হইতে ইহারা আশ্রয় দিগকে অব্যাহতি দেন। আর কতকগুলি যুগান্তকারী পুস্তক আছে, বাহা ভাষা ও ভাবের নুতনত্ব জগৎকে মোহিত করিয়া দেয়, নুতন আলোক-সম্পাতে তাবকে উজ্জ্বল করিয়া দেয়, জ্ঞানমার্গে মানবকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এ শ্রেণীর পুস্তক সকলেরই পাঠ করা উচিত। কিন্তু একটা কথা বলিতে চাই, ভাবের অগ্রদূত কবি বা মনোবী সাধনবলে যে অমূল্য রত্ন পাইয়া জগতে বিলাইয়া দেন, তাহার সন্ধান সাধারণে কি করিয়া রাখিবে? পক্ষি-শীর্ণ জগতে অগ্রগামী ভাবের সহিত পরিচিত না হইলে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। আর কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

“আগে চল আগে চল তাই

পড়ে থাকা মিছে

মরে থাকা মিছে

বৈচে মরে কিবা কল তাই।

পিছনে পড়িয়া থাকা, আর পলে পলে যুড়ার পথে অগ্রসর হওয়া একই কথা। জীবদ্ভুতের অবস্থা শোচনীয়। তাই বলি, জগতের নুতন ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়া মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এ কার্যে সমালোচকই আমাদের সহায়ক হইতে পারেন; কারণ জগতের বাহা কিছু নুতন প্রকাশিত হইতেছে, সর্বত্রই তিনিই তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁর কথামত আশ্রয় ও তাহা পাঠ করিয়া যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বাঁহারা বলেন লেখক ও পাঠকের মধ্যে সমালোচকের স্থান নাই তাহাদের কথাটা গ্রহণ করা সমীচীন নয়। এ বিষয়ে আরও একটা তাবিবার কথা আছে। সাধারণ লোককে নানা-

বিধ কর্তব্য কার্য্য করিয়া সমসাময়িক নির্বাহ করিতে হয়। পাঠ করিবার অবসর তাহাদের বড় থাকে না। আর যেটুকু থাকে, সে সময়ে কতগুলিই বা পুস্তক পাঠ করিতে পারা যায়? সেই বস্তু অবসরটুকু বাজে বই পড়িয়া নষ্ট করা কি উচিত? না, সেই সময়ে প্রকৃত সমালোচক-প্রশংসিত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা ও তৃপ্তি লাভ করা যুক্তিসঙ্গত?

সমালোচক আমাদের যেরূপ সহায়ক হইতে পারেন, সেইরূপ তিনি আবার আমাদের ভাবের নিয়ামক হইয়া আমাদের স্বাধীন চিন্তার হস্তারকও হইতে পারেন। কথটা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে চাই। সমালোচকের লেখা পাঠ করিয়া অনেক সময়ে আমরা তাঁহার চিন্তাশ্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া থাকি। তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিচারসহ কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখি না। আবার তিনি যদি বিস্তৃতকীর্তি সমালোচক হন, তবে ত কথাই থাকে না। তাঁহার মতের প্রতিধ্বনি করিতে আমরা অতিমাত্রায় ব্যগ্র হই—অলক্ষ্যে তাঁহার মতামত সময়ে আমরা কার্য্য করিয়া থাকি। আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে তাঁহারই নিকট বলি দিই। সমালোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিবার সময় তাঁহারই চক্ষু দিয়া আমরা দেখিয়া থাকি, তাঁহারই চিন্তার প্রভাবিত হইয়া আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। তিনি যে ধারাবেশে চিন্তা করেন, আমরাও সেই ধারার খাতে চিন্তাশ্রোত প্রবাহিত করিয়া দিই। তাঁহার ভুল-ত্রুটির দিকে আমরা অবহিত হই না। তাঁহার চিন্তার সূত্রগুলিকে আমরা তর্ক ও রসশাস্ত্রের আইনামুসারে বিচার করি না। এরূপ ক্ষেত্রে সমালোচক আমাদের সহায়ক না হইয়া আমাদের স্বাধীন চিন্তার প্রতিবন্ধক হন। লেখকের ভাবের সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় করিয়া না দিয়া, সমালোচক তাঁহারই স্বকোণোলম্বিত চিন্তার ধারার সহিত আমাদেরকে পরিচিত করিয়া দেন। লেখকের ভাবের সহিত পরিচিত হওয়া পাঠকের প্রথম কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি এবং বিশ্লেষণ

সাধাবো যে সমালোচক এই কার্য্যে আমাদের সহায়তা করেন, তিনি আমাদের ধন্যবাদার্থ। আর যে দূরদর্শী সমালোচক লেখকের দোষগুণ দেখাইয়া সত্যের পথ নির্ধারণ করিয়া দেন, লেখকের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করিবার চেষ্টা করেন, আমাদের নিকট তিনি অধিকতর ধন্যবাদের পাত্র। দোষ গুণ দেখাইয়া দেন, তাঁহার, মত বস্তু আমাদের আর কে আছে? ত্রুটি-বিচ্ছাদিত ভুল-ত্রুটি মানুষেরই হয়। লেখকেরা যে অজ্ঞান এ ধারণা কি করিয়া তাঁহাদের মনের ভিতর যে জাগ্রিতা উঠে তাহা বলিতে পারি না। অল্প কেহ যে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক জানিতে পারেন না, বা তাঁহাদের অপেক্ষা বোধ-শক্তি অস্ত্রের প্রথম হইতে পারে না, এ কথাটাই বা তাঁহাদের স্ববুদ্ধি হয় না কেন, তাহাও বলিতে পারি না। জানী, বহুদর্শী সমালোচকদের নিকট হইতে তাঁহারা যে উপকৃত হইতে পারেন, ইহাও তাঁহাদের বিশ্বস্ত হওয়া উচিত নয়। আমাদেরই দেশের কবি বহুদিন পূর্বে উপদেশরূপে বলিয়া গিয়াছেন—‘বেথানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখে তাই, গেলেও পাইতে পার লুকান রতন।’ লুপ্তরতনের সন্ধান করা সকলেরই উচিত। সমালোচকের লেখনীর ভিতরও যে ‘লুকান রতন’ থাকিতে পারে না তাহা কে বলিতে পারে? যুক্তিযুক্ত কথা যিনিই বলিবেন, তাঁহার কথাই শ্রবণ করা ও বিচার করিয়া দেখা লেখক মাজেরই কর্তব্য।

মনে রাখিতে হইবে, শিষ্ট সমালোচনার উদ্দেশ্য নূতন আলোক-সম্পাত করা—লেখকের অসুসঙ্গ ধারণাকে নূতন তথ্য ও জ্ঞানগর্ভ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা উজ্জল করা—লেখকের রচনা, বিশ্লেষণ করিয়া সৌন্দর্য্য ও রসাত্মকতার পরিচয় দেওয়া। এক কথার বলিতে গেলে লেখকের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে পরিচিত করিয়া দেওয়া প্রকৃত সমালোচকের কাব্য। লেখকের অন্তর্নিহিত ভাবের সন্ধান করাই কিন্তু সমালোচকের একমাত্র কর্তব্য নয়। লেখকের অপূর্ণ ভাবকে পূর্ণতা দান করা, স্রষ্টা চরিত্রকে উজ্জল করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত করা, লেখকের চিন্তার পুষ্টি ও প্রবৃদ্ধি-

সাধন ও তাঁহার কর্তব্য বুদ্ধিকে উদ্ভুদ্ধ করা সমালোচকের অবশ্য করণীয়। সুশ্লেষক ও প্রসিদ্ধ বরেণ্য সমালোচক অধ্যাপক হড্‌সন সাহেব এই কথাই বলিয়াছেন—
 “The chief function of criticism is to enlighten and stimulate.” তিনি আরও বলিয়াছেন, বড় কবি যেমন তাঁহার হৃদয়ের অল্পভুতির সহিত আমাদের পরিচয় করিয়া দেন, বড় সমালোচকও আমাদেরকে তেমনই সাহিত্যের রসবোধ করাইয়া দেন ও সত্য—শিব—সুন্দরের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। বিশেষজ্ঞ সমালোচক তাঁহার অধীত বিভা ও জ্ঞানের প্রসার-কালে যে কথা প্রচার করেন তাহার সত্যতা ও আন্তরিকতা সন্দেহ সন্নিহান হইবার কোন কারণ কোন লেখক মহাশয় কি দিতে পারেন? বিচার বিশ্লেষণ করাই বাঁহাদের কার্য, তাঁহারা যে ঐ বিষয়ে কালে অধিকতর দক্ষ হন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অস্থমাজ কারণ নাই। ভাবুক বিশ্লেষণ শক্তিসম্পন্ন উদারহৃদয় বহুদর্শী সমালোচকের কথা কি বিনা যুক্তিতে অগ্রাহ্য করা যুক্তিসঙ্গত? এ সম্বন্ধে আমি মনীষী হড্‌সন সাহেবের যুক্তিপূর্ণ রচনা হইতে জ্ঞানগর্ভ কয়েক ছত্র তাবাওরিত করিয়া আমরা যত্নব্যাকে স্মৃটতর করিব। তিনি বলেন, “আমরা কোন পুস্তক পাঠ করিয়া বাহা বুঝিব, প্রকৃত সমালোচক যে তাহা অপেক্ষা বেশী বুঝিবেন, একথা স্বীকার করা শিষ্টাচার সঙ্গত; এবং একথা মনে চিন্তা করা কি নিবুড়িতার পরিচায়ক নয় যে, একজন শক্তিশ্বর সমালোচকের সাহায্যে আমরা অধীত পুস্তক হইতে মৌলবী ও শক্তির উৎস অনায়াসে বাহির করিতে পারিব না? এ কথা খাঁটি সত্য যে তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা একরূপ অন্ধই থাকিয়া বাই। অনেক সময় সমালোচক আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন ভাবের সন্ধান দেন। লেখকের ভাবকে সৃষ্টি দান করিয়া তাহার ভিতর জীবনীশক্তি স্ফারিত করিয়া দেন। আমরা লেখকের নিকট হইতে যে সম্পট ধারণা লইয়া আসি তাহাকে তিনি সম্পট করিয়া দেন। কোন কোন সময়ে সমালো-

চক আমাদের পথ-প্রদর্শক, বিপথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আমাদেরকে নূতন পথে চালিত করেন। আবার অনেক সময় তিনি আমাদের মনোপকারী বন্ধু। পরিচিত বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিয়া আমাদের সংসারপথে কতকটা অগ্রসর করিয়া দিবার পক্ষে সাহায্য করেন। লেখকের রচনাবলী নূতন করিয়া পাঠ করিবার প্রযুক্তি তিনিই দান করেন। আবার যখন তিনি লেখকের মতকে খণ্ডন করেন—
 তাঁহার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হন, তখনই তিনি তাঁহাকে অধিকতর সাহায্য করেন। লেখকের ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও ধারণার মূলে কুঠারঘাত করিয়া সমালোচক তাঁহাকে শিক্ষা দেন ও সত্যপথে চালিত করিবার জন্য উদ্ভুদ্ধ করেন। তাঁহার সহিত আমাদের মত-পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সাহচর্যে আসিয়া আমরা শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি যে লাভ করিব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”—কথাগুলি আমি সকলকেই অবহিত ভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

প্রকৃত সমালোচক সাধারণ ক্রটির পরিবর্তক। যুগে যুগে ক্রটির যে পরিবর্তন হইয়া থাকে, তাহার মূলে সমালোচকের মজল হস্ত সম্পট বিভ্রম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন বাঙ্গালা দেশের রঙ্গালয়ের কথা। পান্চাত্য জগতের রঙ্গালয় গুলির ভার আমাদের দেশের রঙ্গালয়গুলি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের পদব্যাচ্য না হইলেও, প্রকৃত সমালোচকদিগের সমালোচনার ফলে ঐ গুলি সংস্কৃত ও পরিমার্জিত হইতেছে—নাট্য সমালোচকগণের আলোচনার ফলে দেশের লোকের ক্রটি সংনাটক দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। আদর্শ নাটকের পরিকল্পনা, স্থান-কালোপযোগী বেশভূষা, স্থানোপযোগী দৃশ্যপটাদি-সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে রঙ্গমঞ্চের অধিকারীরা সমালোচকদের লেখনীর ফলে অবহিত হইতেছেন। শুকারজনক নৃত্যগীত স্থলে মনোমোহকর লীলাবিত দেহভঙ্গির সচল গতি ও রসপূর্ণ সঙ্গীত দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া বাইতেছে। পূর্বে রঙ্গমঞ্চের কর্তব্যকারীদের

নিজ টীহার। যে বিকৃত কচির পোষকতা করিতেছেন, এ অভিযোগ করিলে টীহার। হাসিয়া উত্তরে বলিতেন, “সাধারণ বাহা চার, আমরা তাহাই দিতেছি।” তখনকার সমালোচকগণের ভীত ভর্তুকি টীহারিগকে বুঝাইতে পারিত না যে সাধারণ কচির পরিবর্তন টীহার। অক্লেশে করিতে পারেন ও পূর্বে বহুবার করিয়াছেন। কবির গিরিশচন্দ্র যখন ধর্মমূলক নাটক বাহির করিয়াছিলেন তখন কি রঙ্গমঞ্চগুলি লোকাভাবে শূন্য থাকিত? বাহা হটক, সময় করিয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত নটেয়া ও রঙ্গমঞ্চের অধিকারীরা একথা এখন বুঝিয়াছেন যে, টীহার। সাধারণের কচির পরিবর্তন করিতে পারেন এবং বুঝিয়া, টীহার। কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। আশা করি আমরা অচিরে বঙ্গরঙ্গমঞ্চগুলিকে শিক্ষার অঙ্গুল গ্রন্থিষ্ঠানরূপে দেখিতে পাইব। নাট্যসমালোচক রঙ্গমঞ্চের কচিকে উন্নত করিতে ও রঙ্গালয়ের গতিকে উচ্চ আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে পারেন।

সাহিত্যে সর্বদা কিছু স্তূর্ন সমালোচনা পাওয়া যায় না। স্তূর্ন সমালোচনা প্রাচীনকালের তালের রসের ভার মধুর দ্বিধ, তুষ্টিবর; আর বিবেচ্য প্রণোদিত একদেশ-দর্শী সমালোচনা মধ্যাহ্নে ঐ রসের বিকৃতি, উগ্র মদ্যির ভার প্রথর, আগামর। কল-সমালোচক বিশ্ববিজ্ঞত রাস্তিন সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, মল সমালোচকের ভার অনিষ্ট অগতে কেহ করিতে পারে না। কিন্তু এ কথাটাও মনে রাখা উচিত, যে কোন কারণেই হটক না কেন, যদি কোনও সমালোচক লেখকের প্রতি দ্রাব্য ধারণা পোষণ করেন—সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া নিছক নিন্দা বা স্তুতি করেন, বা অনাবশ্যক ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কুৎসা প্রচার করেন, তাহা হইলে, কিংবা ক্ষমতাশালী লেখকের শক্তির অপব্যবহার দেখিলে কি বলিতে হইবে সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা নাই? হু চারিজন অক্ষম সমালোচকের হস্ত-কণ্ঠ্য দেখিয়া কি আমরা সমালোচক-শ্রেণীর উপরে ঞ্জাহত হইব, কিংবা সমালোচনা-প্রথাকে উঠাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিব?

অশ্রান্ত মানব জগতে পাওয়া যায় না। সমালোচনাতত্ত্ব এখনও পরীক্ষিত বিজ্ঞানের স্তরে উঠে নাই সত্য। তাই বলিয়া কি সমালোচনা-কার্য এখন বন্ধ থাকিবে? আর কখন কখন একমুগের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি অল্প মুগে ভ্রমাত্মক বলিয়া স্থির হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের ত কোনদিন নিশ্চেষ্ট থাকিতে কেহ দেখে না। টীহার। সত্য-নির্ধারণের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করেন, ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন বলিয়া কোন বৈজ্ঞানিকের গৌরব কোন দিন হ্রাস হয় না। সমালোচকদের অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তমতের জন্য টীহারদের গৌরবও কোন দিন হ্রাস হইবে না। মল সমালোচকের সমালোচনার দোষ যথেষ্ট আছে সত্য, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সেগুলি চিন্তাশীল সমালোচকের স্তূর্ন সমালোচনাকে কোন দিন চাপিয়া রাখিতে পারিবে না।

সাহিত্যে সমালোচনা উঠিয়া গেলে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। বিশ্বের তাবথারার সহিত পরিচিত হইবার বাহাদের সময় ও সুবিধা নাই এমন পাঠকদের, মহামনীষীদের তাবথারার সহিত পরিচয় কি করিয়া অকুর থাকিবে? উত্তরের মধ্যে তাবের যোগস্বয় স্থির হইয়া যাইবে। মৌল্য ও রসবিশ্লেষণাত্মক সমালোচনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পাঠক সম্পূর্ণ রূপ উপভোগ করিবার জন্য—তথা শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পুস্তক পাঠ করিবেন। সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী মনোবীরা সমালোচকদিগের অতি-মত না চাহিতে পারেন, কারণ টীহার। জানেন সংবাদপত্র-পরিচালকেরা টীহারদের পুস্তকের পরিচয় যে কোন ভাবে দিবেনই; কিন্তু যশের উচ্চশিখরে বাহারা এখনও উঠিতে পারেন নাই, সেই সকল নবীন সাধকের সিদ্ধির যোগ্য কে করিয়া দিবে? লেখকের গুণ-ব্যাখ্যান দেখিলে টীহার। স্বয়ং যে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন একথা সত্য। আবার অনেক নবীন সাহিত্যিকের মুখে শুনিয়াছি, পত্রিকা সম্পাদক বা সমালোচকেরা যদি টীহারিগকে অগ্রাহ্য না করিয়া টীহারদের পুস্তকের বিকল্পে সমালোচনা করেন, টীহারদের দোষ ও ত্রুটিগুলি দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে টীহারদের উপকার করেন; সাধারণ পাঠক নূতন লেখকের নামের সহিতও

পরিচিত হইবার সুযোগ পান। তাঁহারা বলেন, নীরবতা ও উপেক্ষা তাঁহাদের ঘৈষ্যের সীমাকে লঙ্ঘন করে। কথাটার ভিতর যে সত্য আছে তাহা অব্যবহার করিবার উপায় নাই।

সাহিত্য, জাতীয় জীবনের সুকুর—জাতীয় জীবনের চিত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রতিকলিত হয়। সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির সত্যতা ও 'অহুশীলনের' (culture) ধারা সহজে বুঝিতে পারা যায়। আগকাল কিন্তু আমাদের সাহিত্যে বেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও সংঘের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া মর্দবাপী হইতে হয়। অধুনা যে সকল চিত্র ও "সমস্তা" কথা-সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশ বিদেশীর অঙ্কুরণে চিত্রিত ও লিখিত। উহাদের ভিতর অনেকগুলি যে কাল্পনিক বা আমাদের দেশোপযোগী নয়, তাহা চিন্তাশীল পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। এই সকল অনাগত সমস্তা আমাদের দেশের ধাতুতে সহিবে কি না তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। নৱোৎপাদিত বাঙ্গালীর চিরন্তন সমস্যা সকলকে চাপিয়া কেলিবে। এগুলি পাঠ করিয়া মনে হয় বাঙ্গালী বুঝি আপনাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া কেলিয়াছে। তাই হৃৎকের সহিত বলিতে হয়, যে দেশে বক্ষ্মচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, পূর্ণচন্দ্র, ঠাকুর দাস, কালীপ্রসন্ন, যোগীন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্রের

জ্ঞান কুশাগ্রবৃদ্ধ তীক্ষ্ণবী সমালোচকের সমালোচনার ফলে ও শেবোক্ত হই অনেকের অন্তঃপ্রসারী ক্ষিত্তি-বাণে সাহিত্যিকেরা সত্যের পথ হইতে দূরে সরিয়া বাইতে পারিতেন না, আজ তাঁহাদের অহর্জনে সাহিত্যিকেরা কোন্ পথে চলিতেছেন? সাহিত্যের অববর্জনা তাঁহারা দূর করিয়া দিতেন। আজ তাঁহাদের অভাবে বঙ্গ-সাহিত্য কর্ণধারহীন তরুণের জ্ঞান উদ্বেগহীন ভাবে কি ভাসিয়া বাইবে? তাঁহাদের পদ'ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী কি প্রকৃত সমালোচনা করিতে শিখিবে না—ওপের আদর করিবে না—প্রকৃত মনোবীর পুণ্যের মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিবে না—অঙ্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্তম্ভের উপাসনা করিবে না—অসত্যকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে দৃঢ় বন্ধনে ধরিয়া রাখিতে শিখিবে না—আপাতমনোঃম লালসা বর্জক চিত্রের স্থলে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য দ্যোতক ভাবোদ্বেগকরী চিত্র স্থাপিত করিবে না? বাঙ্গালী কি আর্টের অজুহাতে অলীক অবাস্তব-কর চিত্র অঙ্কিত করিবে? বাঙ্গালী কি সং সাহিত্যের প্রচার করিয়া সমাজ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবে না?" *

ঐচ্চারচন্দ্র মিত্র ।

* বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে পঠিত ।

নারী

ফুল বধা ফুটি বনে সুগন্ধ বিলার—
নিজ বন্ধ মধু দিয়া মধুপে বাঁচার,
রূপে করে অগতের চিত্ত বিনোদন,
ঝরে বার অবশেষে আগিলে মরণ ।
নারী তথা গৃহে গৃহে ফুলের মতন
স্নেহের মধুর ধারা করিয়া ক্ষরণ,
দিয়া নিজ বন্ধ-কীরে তনয়ে বাঁচার,

কমলার সম গৃহে লক্ষ্মীজি ফুটার ।
হৃদিকে প্রেম কল্লু বহে পতি-তরে,
শুধুজনে সেবা ভক্তি প্রাণপণে করে ।
যবে তার সব কাঁচ হয় সমাপন,
মৃত্যু রচি দেয় চির বিশ্রাম শরন ।
আত্মবী তাহারে বন্ধে ধরি সবতনে
গাহিয়া সত্যীর কব বহে কলধনে ।

ঐবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য ।

ঋগ্বেদের মর্মবাণী

[২]

আমরা এই প্রবন্ধের বিগত সংখ্যার বলিয়াছি যে, আমরা প্রকৃত বস্তুটিকে ভুলিয়া, ‘অন্ত’ একটা বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি; সেই ‘অন্ত’ বস্তুতেই মজিয়া রহিয়াছি। আমার যেটা প্রকৃত ‘স্বরূপ’ তাহাকে ভুলিয়া গিয়া, আমার এই সুখ-দুঃখ-সমাকীর্ণ, জরা-রোগ-প্রসূত দেহটাকেই সার বস্তু ভাবিয়া লইয়া, উহারই সেবার উহারই পরিচর্য্যা, উহারই সুখ-দুঃখে একেবারে মজিয়া গিয়াছি। এইরূপ, বাহা নিত্য, বাহা সার, বাহা প্রকৃত বস্তু—সেই ব্রহ্ম-তত্ত্বকে ভুলিয়া গিয়া—এই দৃশ্য-স্পর্শ-সমাহুল, শত-বাতনা-মুখারিত সংসারটাকেই সার বস্তু বলিয়া উহাতেই আসক্ত হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু কৈ, উহাকে ত ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। এই যে ধন-জন, কামিনী-কাকন, বিবর-বিতব, পদ-মান-গৌরব;—কৈ উহার ত চির-স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। এই যে দেহ-মন,—বাহার পুষ্টি-বিধানার্থ, বাহার সুখ-বৃদ্ধির জন্য, বাহার ভোগের নিমিত্ত,—আমরা নিরন্তর ব্যাপৃত ও একান্ত বস্ত্র-পরায়ণ রহিয়াছি;—কৈ সেই দেহটিকে চিরদিন ধরিয়া ত রাখিতে পারিতেছি না। আমাদের শত বস্ত্র-চেষ্টা সত্ত্বেও, উহার আশ্রয়কে কঁাকি দিয়া চলিয়া বাইতেছে। এ সকল বস্তুর অবস্থাই এইরূপ; ইহার চকল, পরিবর্তনশীল, অস্থির। অর্থাৎ আমরা এমনই মোহান্ত যে উহাদিগকেই সার ভাবিয়া, উহাতেই মত্ত হইয়া রহিয়াছি। এই সংসারই আমাদের বধা-সর্ব্বস্ব; এই দেহটাই আমাদের বধা-সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। ঋগ্বেদ আমাদের বলিয়া দিতেছেন যে,—বাহা প্রকৃত-পক্ষে অসার, তুমি তাহাকেই বধন সার ভাবিয়া লইয়াছ, তখন তোমার ত এ দশা হইবেই! উহা ত তোমাকে ছাড়িয়া পলাইবেই! উহার অন্তরালে

যেটা রহিয়াছে, সেইটাই প্রকৃত বস্তু, সার বস্তু। সেটাকে বধন তুমি ভুলিয়াছ, তখন তোমার ত এ দশা হইবেই! বাহা নশ্বর, বাহা বিনাশী,—তাহাকে কি ধরিয়া রাখা যায়?

এতোক বস্তুরই দুইটা অংশ আছে। ইহা ভুলিলে চলিবে কেন? এতোক বস্তুরই একটা অপরিবর্তনীয়, স্থির, নিত্য অংশ আছে। অপর একটা উহার পরিবর্তনের অংশ। যেটা অপরিবর্তনীয় অংশ—সেইটাই প্রকৃত বস্তু যেটা উহার পরিবর্তনের অংশ,—সেটা কখনই স্থির থাকে না; উহা সর্ব্বদাই অবস্থান্তরিত হয়;—এক অবস্থা ছাড়িয়া মিশ্রিত অপর অবস্থা গ্রহণ করে। প্রথমটাই প্রকৃত বস্তু; আর অপরটা—সেই বস্তুর গুণ-ক্রিয়াদি। কোন দ্রব্যেই গুণ ও ক্রিয়া-গুলিকে, দ্রব্যের যেটা প্রকৃত স্বরূপ তাহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে—পৃথক করিয়া লইতে পারা যায় না। দ্রব্যের এই যে গুণ ও ক্রিয়াগুলি,—ইহার এক অবস্থা ছাড়িয়া অন্য অবস্থা গ্রহণ করে; উহার এক ভাবে কখনই স্থির থাকে না; ইহাদের রূপ বা আকারের সর্ব্বদাই পরিবর্তন হয়। আমরা কিন্তু দ্রব্যের এই গুণ ও ক্রিয়াগুলিকেই, দ্রব্যের এই অবস্থা-ভেদকেই ‘দ্রব্য’ বলিয়া মনে করি। এইখানেই আমাদের ভ্রম। এই স্থানেই আমরা ভুল করি। এই গুণ ও ক্রিয়াদি ছাড়া যে দ্রব্যের একটা স্থির স্বরূপ আছে, সে কথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া বাই।

একটা বস্তু, এক অবস্থা ছাড়িয়া অপর একটা অবস্থা গ্রহণ করিল। আমরা পূর্বাৱস্থাটাকে ‘কারণ’ (cause) বলিয়া নির্দেশ করি এবং পরের অবস্থাটাকে তাহার ‘কার্য’ (effect) নামে নির্দেশ করি। সোণার একটা ডেলা বা পিণ্ডকে গড়িয়া পিটির স্বর্ণকার একটা সুদৃষ্ট বলর নির্মাণ করিল। আমরা ঐ ডেলাটাকেই বলরের ‘কারণ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। ডেলাটা,

বলরের পূর্ববর্তী অবস্থা ; এবং বলরটা, সেই ভেলারই পরবর্তী অবস্থা। সুতরাং আমরা সেই পূর্ব-গামী অবস্থাটাকেই, পরবর্তী অবস্থার কারণ বলিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া বাইতেছি যে, ঐ ছইটাই সুবর্ণেরই ছইটা অবস্থা ভেদ মাত্র। পিণ্ড এবং বলর—এই ছইটা, সুবর্ণেরই অবস্থা-ভেদ। সুতরাং এ স্থলে সুবর্ণই প্রকৃত 'কারণ'। এক সুবর্ণই ঐ ছই অবস্থা ধারণ করিয়াছে। সুতরাং সুবর্ণই এস্থলে প্রকৃত বস্তু ; এই সুবর্ণই উহার পিতৃবস্থা ত্যাগ করিয়া, বলরাকার ধারণ করিয়াছে। অবস্থার ভেদে, বস্তুর যেটা প্রকৃত স্বরূপ তাহার কোন ভেদ হয় না। সুবর্ণের যেটা প্রকৃত স্বরূপ, উহা আপন স্বরূপে ঠিক থাকিয়া, নানাবিধ অবস্থা গ্রহণ করে। ইহাই প্রকৃত কথা। সেই স্বরূপটাই হইতেছে প্রকৃত 'কারণ'। অবস্থাগুলি কেহই 'কারণ' নহে। অথচ আমরা বস্তুর স্বরূপটীর কথা ভুলিয়া, ঐ অবস্থাগুলিকেই বস্তু বলিয়া মনে করিয়া লই এবং ঐ অবস্থা-গুলিরই একটিকে 'কারণ' এবং অপরটিকে তাহার 'কার্য্য' বলিয়া নির্দেশ করি। এই স্থানেই আনাদিগের ভুল। এইরূপে, অবস্থাগুলিই আনাদিগের নিকটে বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। যেটা প্রকৃত স্থির বস্তু তাহাকে ভুলিয়া, এই নিরন্তর পরিবর্তনশীল অবস্থাগুলির উপরেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। বস্তুর প্রকৃত যেটা স্বরূপ তাহার উপরে দৃষ্টি না রাখিয়া, আমরা বস্তুর 'গুণ ও ক্রিয়াদির উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ফেলি এবং ঐ গুণ ও ক্রিয়াদিকেই আমরা বস্তু বলিয়া ধরিয়া লই। এই প্রকারেই আমরা এক বস্তুকে 'অন্ত' বস্তু বলিয়া মনে করি। ঋগ্বেদ আনাদিগকে সংক্ষেপে এই কথাটাই বলিয়া দিয়াছেন। শঙ্কর এই কথাটাই বিস্তৃত ব্যাখ্যা বোঝাতে করিয়া দিয়াছেন।

আর একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই যে আমরা বস্তুর গুণ ও ক্রিয়ার কথা বলিয়া আসিলাম, এই সকলের মধ্য দিয়াই কিন্তু বস্তুটা আপন স্বরূপের পরিচয় দিয়া থাকে ; নিজের স্বরূপটিকে বুঝাইয়া

যের। গুণ ও ক্রিয়াদির দ্বারা, আমরা বস্তুর স্বরূপটীর কিছু কিছু পরিচয় পাই। বস্তুটা, এই সকল গুণ ও ক্রিয়া দ্বারা আপন স্বরূপের আংশিক পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

অগতে যে সকল 'নাম-রূপাদি' বিকাশিত রহিয়াছে, এই সকল নাম-রূপ ত্রৈলোক্যই স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নতুবা তাঁহার স্বরূপ কিছুই বুঝা বাইত না। সুতরাং এই সকল নাম-রূপ, ত্রৈলোক্যকে ছাড়িয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, থাকিবে কি প্রকারে ? অথচ আমরা নাম-রূপাদি লইয়াই নিরন্তর আচ্ছন্ন রহিয়াছি। ইহারা তাঁহারই পরিচায়ক ; ইহারা তাঁহারই স্বরূপের বিকাশ ;—একখাটা আমরা মোটেট মনে রাখি না। আমরা এই নাম-রূপ গুলিকেই স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়াই ধরিয়া লই এবং উহাদিগকে লইয়াই সারাজীবন ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। উহারা যেন এক একটা স্বাধীন, স্বতঃ-সিদ্ধ বস্তু,—ইহাই আনাদিগের বোধ। এই ধানেই আনাদিগের ভ্রমের বীজ।

নাম-রূপাদি কোন বস্তুই, ত্রৈলোক্য স্বরূপের পূর্ণ-বিকাশ নহে ; ইহারা তাঁহার আংশিক বিকাশ মাত্র। সুতরাং, ত্রৈলোক্য, এই সকল নাম-রূপাদি হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু নাম-রূপাদি কোন বিকাশই ত্রৈলোক্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে না। কেন না, বাহ্য তাহাকেই বিকাশ করিতেছে, তাহার তাহাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র-ভাবে থাকিবে কি প্রকারে ?

ত্রৈলোক্য প্রকৃতপক্ষে অনন্ত, অব্যয় (Inexhaustible), তাহার ঐশ্বর্যের অন্ত নাই, ক্ষয় নাই, লীনা নাই। এই পূর্ণ-ঐশ্বর্যের পূর্ণ বিকাশ কদাপি সম্ভব নহে। বাহ্য অব্যয়, বাহ্য অনন্ত ; তাহাকে ক্ষয় করিবে কে ? কোন বস্তুই, কোন বিকারই, কোন অবস্থাই, কোন নাম-রূপাদি,—সেই পূর্ণতাভাবের ক্ষয় করিতে সমর্থ নহে ; কেহই সেই অক্ষয়্য তাহার ব্যয় সাধনে সমর্থ নহে। কেহই, কোন বস্তু, সেই পূর্ণ-ঐশ্বর্যের পূর্ণ-বিকাশ করিতে পারে না। গীতা আনাদিগকে কি বলিতেছেন, শুধুন—

“অব্যাক্তং ব্যক্তিমাপন্নং বস্তুত্বং মামবুদ্ধ্যঃ ।

পরঃ তাবদজানন্তো মমাব্যয়মসুতবং ॥”

ভগবান বলিতেছেন—

‘এই নির্কোথেরা মনে করিতেছে, আমি, এই জগৎ রূপে অতিব্যাক্ত হইরাছি। তাহারাই এইরূপে মনে করিয়া নয়, তাহারাই প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না। আমি প্রকৃত-পক্ষে অব্যাক্ত-ই রহিয়াছি, কেননা আমি অব্যয়, অনন্ত। জগতে আমার অতিব্যাক্তি কতটুকু? এই দেশ কালে বস্তু জগৎ—আমার অনন্ত অব্যয় ঐশ্বর্যের কতটুকু বিকাশে সমর্থ? আমি অব্যয়; সুতরাং আমি জগতের অতীত হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমার অতি সামান্য মাত্র অংশ, এই জগৎ-রূপে অতিব্যাক্ত রহিয়াছে। সুতরাং তাহারাই আমার পূর্ণ-স্বরূপের কোন খবর রাখে না। তাহারাই ভাবে যে, এই জগৎই আমার বিকাশ। তাই এই সূত্রের এই জগতের বস্তু-গুলি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। হায়! ইহারা জানেননা যে, এ জগতের কোন বস্তুই মানবাত্মার পূর্ণত্বলি জন্মাইতে পারে না।’

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, এই জগৎ তাঁহার আংশিক অতিব্যাক্তি। সুতরাং এ জগতের কোন বস্তুকেই স্বতঃসিদ্ধ, স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, তাঁহারই বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঋতি বলিয়া দিয়াছেন যে, ব্রহ্মবস্তু অন্তরালেই রহিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি বাহ্য, তিনি তাহাই আছেন; তিনি ‘অন্ত’ কিছু হন নাই। এই জগৎ দেখিয়া, তোমরাই ভুল করিয়া মনে করিতেছ যে ‘অন্ত’ একটা কিছু তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, এজগৎ ‘অন্ত’ কোন বস্তু নহে। এজগৎ তাঁহারই স্বরূপের বিকাশ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন—

“ন হি বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্তুত্বং ভবতি ।”

বিশেষ একটা আকার ধারণ করিল বলিয়াই যে বস্তুটা ‘অন্ত’ একটা কিছু হইয়া উঠিল তাহা নহে। উহা পূর্বেও যে বস্তু ছিল, এখনও সেই বস্তুই রহিয়াছে। বস্তুর আকার বা বস্তুর গুণ ও ক্রিয়াদি ত বস্তু নহে।

উহাদের সমষ্টি নিলেই ত বস্তুকে পাওয়া যায় না। বিশেষ আকারের মধ্যে, নানাবিধ গুণ ও ক্রিয়াদির মধ্যে,—বস্তুর যেটা প্রকৃত স্বরূপ, সেটা আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। গুণ ক্রিয়াদির মধ্য দিয়া সেই স্বরূপেরই পরিচয় পাইয়া থাকি। জগতের প্রতি বস্তু, প্রত্যেক নাম রূপ, তাঁহারি অতিব্যাক্তি, তাঁহারি বিকাশ, তাঁহারি পরিচায়ক। জগৎ কোনও বস্তু, স্বাধীন বস্তু নহে। জগৎ—ব্রহ্ম বস্তুরই অতিব্যাক্তি, জগৎ ক্রমোচ্ছিন্নভাবে তাঁহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুতরাং এজগৎ একটা ‘অন্ত’ কোন বস্তু, একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র পদার্থ;—এরূপ মনে করিতে পার না। এরূপ মনে করিলেই ভুল হইল। শঙ্কর ইহাকেই ‘ব্রহ্ম-জ্ঞান’ শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম এই জগতের অন্তরালে আপন স্বরূপে ঠিক থাকিয়া, প্রতি বস্তুর মধ্য দিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন; আপন স্বরূপের বিকাশ করিতেছেন। সুতরাং তিনি বাহ্য তাহাই আছেন; তিনি ‘অন্ত’ একটা কিছু হইয়া উঠেন নাই। তিনি বাহ্য তাহাই রহিয়া, আপনাকে নানাভাবে অতিব্যাক্ত করিতেছেন। কোনও অতিব্যাক্তি, তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষতি করিতে পারিতেছে না।

এইরূপে, এই জগতে ব্রহ্মদর্শন করিতে হয়। ঋতির ইহাই উপদেশ। জগৎ যদি ব্রহ্মের কথা ভুলাইয়া দিয়া কেবল শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদির কথাই চিন্তে অহরহঃ জাগাইয়া তোলে, তাহা হইলেই জগতে ব্রহ্মদর্শন হইল না; তাহা হইলে শব্দ-স্পর্শ, রূপ-রসাদির দর্শনই হইল। ঋতি বাহাকে ‘অন্তঃস্ব-বোধ’ বলিয়াছেন, তাহাই হইল। শঙ্কর বলেন, এরূপ দর্শনকেই আমি ব্রহ্ম-জ্ঞান শব্দে নির্দেশ করিয়াছি। এ ত ব্রহ্মদর্শন নহে; ইহা ‘অন্ত’-দর্শন। তুমি জগৎকে একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র বস্তু,— একটা ‘অন্ত’ বস্তু, বলিয়া দেখিতেছ। এ জগৎ ত স্বাধীন নহে; ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এ জগৎ থাকিতে পারে না। এ জগৎ ত ব্রহ্মের বিকাশ, ব্রহ্মেরই অতিব্যাক্তি। সুতরাং জগতে ব্রহ্মকেই দেখিতে হইবে, তাহা হইলে আর জগতের স্বাধীন সত্তা থাকিবে না। জগৎ

তাহা হইলে ব্রহ্মেরই অলীকত্ব—ব্রহ্মেরই পরিচায়ক হইয়া উঠিবে। সর্ব্ববস্তুর মধ্য দিয়া এক ব্রহ্মসত্তাই দৃষ্টিগোচরে পতিত হইবে। তখন, অগৎকে একটা ‘অন্ত’ বস্তু বলিয়া প্রতীতি থাকিবে না। বতকণ অগৎ তোমার নিকট একটা ‘অন্ত,’ বস্তু; ততক্ষণ ব্রহ্ম এবং অগৎ—উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু অগৎ বখন ব্রহ্মের অ’ভব্যাক্তি বলিয়া, বিকাশ বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে, তখন আর বিরোধ কোথায়? কেন না, তখন ত আর ব্রহ্মব্যতীত কোন কিছুই ‘অন্ত,’ একটা বস্তু বলিয়া বোধ থাকিবে না। তখন সর্ব্বত্র সকল বস্তু ত একমাত্র ব্রহ্মবস্তুরই

বিকাশ বলিয়া দৃঢ় বোধ উপস্থিত হইবে। স্মরণ্য বিরোধ কোথায়?

অগৎকে ‘অন্ত’ বলিয়া বোধ করিলে, ব্রহ্মের সঙ্গে কিরূপে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং সেই বিরোধের সংধানই বা কিরূপে সম্ভব, ভাষ্যকার তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেটা না বুঝিলে, অগতে ‘অন্তত্ব’ দর্শনের স্থলে, ব্রহ্ম দর্শনের যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া পরিস্ফুট হইবে না। আমরা, ভাষ্যকারের সেই ব্যাখ্যার কথা আগামীবারে পাঠক-পাঠিকাকে শুনাইব।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্ত্তীকালের মথুরা

মথুরা অতীত প্রাচীন নগর। বৈদিকযুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও রামায়ণ বা মহাভারতীয় যুগের কোনরূপ বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, বধা-মন্দিরাদির প্রাচীর বা ভিত্তি, ব্রাহ্মণ ভগ্ন দেবমূর্ত্তি, শিলালেখ, অথবা তৎকাল প্রচলিত কোন প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি এখানে আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে মোঘা সম্রাট্ আশোকের সময়ের দুই চারিটা ও কুশান সম্রাট্‌গণের সময়ের তুরি তুরি নিদর্শন (Relic) পাওয়া গিয়াছে ও হাইতেছে। মথুরার দক্ষিণে অবস্থিত মধুবনে কয়েকটা গ্রীক-প্রভাব-পরিষ্কৃত গান্ধার শিল্পের নমুনাও মিলিয়াছে। এইসকল প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ হৈল ও বৌদ্ধদিগের ভগ্ন বা অভগ্ন নিদর্শন মাত্র; তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণ্য দেবতাদিগের কোন সম্পর্ক নাই। তবে, মথুরার বাহুবরে বিষ্ণু, সূর্য্য, ব্রহ্মা, শিব, হর-পার্কতী, মহিবর্ম্মদীনী, লক্ষ্মী, ইন্দ্র, গিরিধারী, বলদেব, প্রভৃতি যে কতকগুলি ছোট বড় ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা দর মধ্যে বিষ্ণু ও সূর্য্যের সংখ্যাই অধিক। সেই মূর্ত্তিগুলির গঠন-প্রণালী ও লিপি প্রভৃতি দেখিয়া পশ্চাত্য ভাস্কর ও শিল্পবিজ্ঞান-বিদ্যার

এবং প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অস্বাভাবিক করেন যে, সেইগুলি গুপ্ত সম্রাট্‌গণের সংরে বা তৎপরবর্ত্তীকালে নির্মিত, কোন কোনটা বা মুসলমান আমলেও গঠিত। *

* কেহ বলেন নাই করেন যে গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তির অস্তিত্ব ছিল না। বৃট্ট পূর্বে ৩শ শতাব্দীতে চণক ভনয় কোটিল্য বিষ্ণুভক্ত প্রণীত অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে গ্রাম নগর বা দুর্গাদির চারিদিকে কুয়ারী প্রভৃতি কয়েকটি ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। গ্রীক শিল্পী হেলিওডোরস গঠিত একটি বিষ্ণুভক্ত আভিও বিনিশা নগরীতে বিদ্যমান আছে সেটি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গঠিত। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে শক-সম্রাট সৌম্যাসের মুদ্রার এক্ষুণ্ড কবলের উপর উপবিষ্ট একটি নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, হুই পার্শ্ব হইতে হুইটা হস্তী তত্তে কৃত ধরিয়া সেই রমণীকে অভিষেক করিতেছে। কেহ এটিকে বিষ্ণু শক্তি বহালক্ষী বা ঐ বলেন, কেহ শিবের শক্তি কল্যা বলেন, আবার কেহ এটিকে বুদ্ধদেবের জননী মারী দেবীর মূর্ত্তি বলেন। বৃট্ট প্রথম শতাব্দীতে শক সম্রাট কদলীশ বিজয়ের মুদ্রার বুড়ো-রুদ্র ত্রিমূলধারী শিবমূর্ত্তি মুদ্রিত অঙ্কিত আছে। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে নিঃসংশয়ে জানা যায় যে, বৃট্ট জন্মের বহুশত বৎসর পূর্বে হইতেই সকলগুলি না হটক, কতকগুলি ব্রাহ্মণ্য দেবতার রূপ-কল্পনা ও মূর্ত্তি গঠন আরম্ভ হইয়াছিল।

একটি প্রশস্ত করতল, বা ২'৩ ফিট উচ্চ বুদ্ধদেবের মূর্তি, স্থলীর্থ ওয় হতগদাধি বাহা বাহুবরে সংগৃহীত হইরাছে তাণ দেবিয়া অনুমান হয় যে, যদি সেই ওলা দণ্ডারমান মূর্তির তদ্রূপশেষ হয় তবে সেই মূর্তিওলা উচ্চে ২'০১২৫ ফিটের নূন হইবে না। তখনকার তাকরেরা অতি বিশালকার প্রস্তর নির্মিত মূর্তিসকল গঠন করিতে পারিত।

টৈনিক পরিব্রাজকদিগের বর্ণনা হইতে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি যে, খ্রীষ্ট ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মথুরা প্রদেশে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বিলক্ষণ প্রাধান্য ছিল। তৎপূর্বেরও যে, এখানে ঐ দুই ধর্ম প্রবল ছিল তাহা সহজেই অনুমের। প্রত্যক্ষদর্শী টৈনিক পরিব্রাজকদিগের লেখা ও তৎসঙ্গে বাহুবরে রক্ষিত আবিষ্কৃত বিভিন্ন ও বিভিন্ন গঠনের ধ্বংসাবশেষগুলি মিলাইয়া আমরা করনা নরনে মথুরার এইরূপ একখানি চিত্র দেখিতে পাই—

মথুরার উত্তরতীরে সুচারু কারুকার্য-খচিত পাৰাণ-বিরচিত সুরম্য-ছত্রবিমণ্ডিত পতাকা পুষ্পমালায় বিভূষিত জৈন ও বৌদ্ধমূর্তি স্থানে স্থানে সমুন্নত রহিয়াছে। সুগত সেবকেরা দলে দলে সোপান পথে উঠিয়া রেলিং বেষ্টিত ছই তিন তলা পরিক্রমাগমে পূজো-পহার হস্তে বিচরণ করিতেছে। নিকটবর্তী কল-পুন্স বেষ্টিত সভ্যারামের ভিতর অঙ্গনের চারিদিকে বহিঃ-গণের বাসের জন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ বা প্রকোষ্ঠ (Cell) তদ্ব্যপেক্ষ পাথরের সুস্ত্রশ্রেণী-গোড়িত বারান্দা, কোন কোন অঙ্গনের ভিতর সুরম্য মন্দির মধ্যে বুদ্ধদেবের বা তাঁহার শিষ্যবর্গের অথবা মঠ প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বা সম্রাজ্ঞ জনগণের প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। • বিভিন্ন মঠে পীঠ বসন পরিহিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা কোথাও অভিক্ষর, স্তম্ব বা বিনয়পীঠক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে নিরত। কোথাও বা বিরাটকার দণ্ডারমান বা উপবিষ্ট

বুদ্ধ মূর্তির পাৰ্শ্বেশে মূর্তিতীর্থ অর্হঃভরা অবনত মন্তকে প্রণাম করিতেছে। কোথাও বা শ্রমেরো তিক্কা-ভাষন স্বন্ধে লইয়া তথাগত-পাখা গান করিতে করিতে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। কোথাও বা তাকরেরা সুরম্য পাৰাণ খণ্ড লইয়া বিংশলকার মূর্তি ও তত্ত প্রভৃতি শিল্পকর্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। কোথাও বা তত্তবায়েরা স্তম্ব রেশম ও কার্পাস স্ত্রী লইয়া স্তম্ব বসন বসন করিতেছে। কোথাও বা নগরের বহির্দেশে কৃষিকাজে কৃষকেরা সর্বজ্ঞ গীতি গাহিতে গাহিতে হল চালন করিতেছে। সকলেই যেন হিংসা বিদ্বেষ বিহীন। সর্বত্রই যেন স্তম্ব সাম্য শান্তি বিম্বাজ করিতেছে। প্রভেদ কেবল বৌদ্ধেরা মূর্তিতীর্থ ও পীঠবাস, জৈনেরা কেশ শোভিত ও শেখাধরধারী।

এই চিত্রের সহিত বৈষ্ণব পুণ্য বর্ষিত “গোপ গোপী গবাবৃত” শ্লোক বেণু নিনাদিত, ঐক্লব সঙ্গীত সুধরিত কালিন্দীকূলে কদম্বমূলে, কুন্তলকে বা গোরস পসরা-শিরে হরিদর্শন-চকলা প্রেমভক্তি বিজ্বলা ব্রহ্মাঙ্গনা সমলঙ্কৃত ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেবমন্দির শোভিত, জন-সাধারণের চিরপরিজ্ঞাত মথুরা বা ব্রহ্মাবন দুজের কোনই সাদৃশ্য নাই।

এই প্রভেদ কেন হইল, কবে হইল, এখন আমরা তাহারই অনুদ্যানে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু তৎপূর্বের গুপ্ত সম্রাটগণের ও তৎপরবর্তী যুগের ইতিহাস দিতে হইবে, নতুবা বিবরণী ব্যুৎপত্তির সুবিধা হইবে না।

খ্রীষ্ট ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত ভারতে গুপ্ত সম্রাটগণের অভ্যুদয়। ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবং হিংসাংহুণ অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেই জন্ত ইহাদের সময় হইতে ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান হইতে লাগিল এবং জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি অপরাপর ধর্মগুলি নবজাগরিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবীণ প্রভার দ্বানতর হইয়া বাইতে লাগিল।

৩১২ খ্রীষ্টাব্দে ১ম চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট

১০ বাটমান ও দুর্ভাগ্য প্রভৃতি কয়েক স্থানে এইরূপ ধরনের মঠ দেখা গিয়াছে। সেইগুলি এখন ভগ্ন, মূর্তিকা-বিহীন ও বন জঙ্গলাকীর্ণ।

হইয়া গুপ্তাক প্রচলন করেন। পাঠকগণ স্বয়ং রাধি-
বেন অপেক্ষের পিতামহ কোটীলা চাপকোর শিষ্য,
মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ও এই গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত নামক
রাজারা পৃথক বংশের ও বিভিন্ন সময়ের লোক।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০—৩৭৪) ইনি ১ম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র
ও উত্তরাধিকারী। স্বয়ং দিগ্বিজয়ী বীর, সুশক্তিত কবি,
ও শিল্প সঙ্গীতানুভূক্ত সম্রাট।

ইনি বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া পাঞ্জাবসীমা
হইতে দক্ষিণে নন্দীয়ার পর্য্যন্ত জয় করিয়া রাজচক্রবর্তী
হইয়াছিলেন। দিগ্বিজয় করিয়া মধুরানগরী ইহার
অধিকার ভুক্ত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ভূজবিক্রম
জন্ত সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলিলেও বলা
চলে। ইনি কোণারীর অশোক নির্মিত স্তম্ভগাত্রে
পালি ভাষায় গিথিত অনুশাসনতলে নিজের বীরত্ব কীর্ত্তি
সংকুত শ্লোকে খোদিত করিয়াছেন। সেই স্তম্ভটী এখন
এয়াগ জুর্গের অভ্যন্তরে রহিয়াছে। অনেক অনুমান
করেন কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে রঘুর যে দিগ্বিজয়
কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বি-
জয় ব্যাপার হইতে সংগৃহীত। দিগ্বিজয়ের পর ইনি
মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধান করেন। যজ্ঞান্তে
ইনি দক্ষিণাধিকার প্রাক্কণ দিগকে যে লক্ষ লক্ষ স্তব্ধবৃক্ষ
বিতরণ করিয়াছিলেন তাহাতে যজ্ঞের যুগ ও অশ্ব
অঙ্কিত আছে। ইহার অপর স্তব্ধবৃক্ষ স্তম্ভগুলি সাহিত্য
ও সঙ্গীতানুভূতের পরিচায়ক, সম্রাট বীণ হস্তে সিংহা-
সনে উপবিষ্ট।

সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ৩৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহলের
অধিপতি মেঘবর্ষানান মণিরত্ন উপহার দ্বারা একজন
রাজদূতকে ইহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং
ঊর্ধ্বাহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে সিংহল
ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি ভারতের বহির্দেশ হইতে তীর্থ
যাত্রীরা যুগপয় বাইরা থাকিবার স্থান পায় না, সেই
জন্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত যেন বোধিক্রমের নিকট সিংহল
রাজের ব্যয়ে একটি মঠ বা পান্থশালা নির্মাণ করিবার
অনুমতি দেন। সমুদ্রগুপ্ত মানসচিত্তে অনুমতি দিলে

সিংহল রাজের অর্থে বোধিক্রমের উত্তর দিকে একটি
ত্রিভুজ ও তিনটি সমুদ্র চূড়াবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পান্থশালা
নির্মিত হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত মণিরত্ন বিজয়িত যুদ্ধক্ষেত্রের
কনক প্রতিমাও স্থাপিত হইয়াছিল। এখন, কাল
প্রভাবে সে মঠটা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কেবল উহার
তিথিটা মাত্র কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়।
সমুদ্রগুপ্তের বহুবাহু নামে একজন বৌদ্ধগ্রন্থ রচয়িতা
অমাত্যের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই সকল
হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে সমুদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্য
ধর্মাবলম্বী হইয়াও বৌদ্ধদিগের প্রতি বিরূপ ছিলেন না।
সমুদ্রগুপ্তের পর, কুমারগুপ্ত ও আদিত্য সেন প্রভৃতি
আরও কয়েকজন গুপ্ত সম্রাট ইহার দেখা দেখি
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান
দেবতা শিবু। সেই জন্তই বুদ্ধি ঐতিহাসিকেরা গুপ্ত
সম্রাটদিগকে বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভক্ত বলিয়া অভিহিত
করিয়াছেন। গুপ্তবংশীয় অনেক সম্রাটেরাই আদিত্য
পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন যথা—তৃতীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত
(২য়)—বিক্রমাদিত্য; ৪র্থ সম্রাট কুমারগুপ্ত—মহেন্দ্রা-
দিত্য; ৫ম সম্রাট স্বল্পগুপ্ত—বিক্রমাদিত্য; ৬ষ্ঠ সম্রাট
পুরগুপ্ত—প্রতাপাদিত্য; ৭ম সম্রাট নরসিংহগুপ্ত—বাণা-
দিত্য; ৯ম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (৩য়)—বাদশাদিত্য; ১০ম
সম্রাট বিষ্ণুগুপ্ত—চন্দ্রাদিত্য নামে খ্যাত ছিলেন। ঋগ্বেদ
বিষ্ণু ও হর্ষ কোথাও এক দেবতা, কোথাও বা পৃথক
দেবতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। উভয়েরই নাম আদিত্য।
পু্রাণে ইহারা বিভিন্ন আকৃতি ও সম্পূর্ণ পৃথক দেবতা।
গুপ্ত সম্রাটগণের এই আদিত্য পদবী দেখিয়া, কিংবা
বিষ্ণু প্রধান অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন বলিয়া কি কারণে
ঐতিহাসিকেরা ইহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়াছেন তাহা
বলিতে পারিলাম না। তবে চন্দ্রগুপ্ত (২য়) এবং স্বল্প-
গুপ্ত উভয়েই এক একটা করিয়া বিষ্ণুধর্ম স্থাপন
করিয়াছিলেন, তাহা আদিও বর্তমান রহিয়াছে, সে
কথাটা ক্রমে বলিতেছি।

ক্রমশঃ

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

প্রাণের দরদ

ওরে মরদ ! এতই দরদ এখনো এই প্রাণের তরে আছে ?

যে প্রাণ লুটে পারের তলে দিবস নিশি আপন মরণ বাচে !

নিত্য বে প্রাণ খেৎলে হুঁপায়

রক্তে তোদের আঁকছে লগাটিকা ;

বক চুবে সজীব রসে

আলছে ভালো দারুণ গরু শিখা !

তোদের মরণ-কাঁদন পেশায়

কাগছে তারা বিতব বেশার ;

রিক্ত তোদের প্রাণ শিয়াল শুকিয়ে ওঠে

তোদের আঁশন আঁচে !

— দরদ এতই এখনো কি আছে ?

তোদের সুখা কঠে পুরে,

দিচ্ছে শুধু কেউটে সাপের চোঙরা—

অনাদরের গোরবেতে

ভাবিল কোথা অমন আদর ধোঁয়া !

মাতৃপরাণ নষ্ট করে,

পুত্রে বারা হস্তে ধরে ;

আঁশন আলা ছাড়া আবার কি আশা আর আছে

তোদের কাছে ?

—দরদ এতই এখনো কি আছে ?

চক্ষু বাদেই উকি সন্ধান

মলম, দেহে দহন পরশ জানে—

শীত বরষার অভিসারে

বনের প্রাণে নিহুঁয় বেদন হানে !

হুঁহাত পাতি অন্ন বলে

ভাসায় ধরা নয়ন জলে !

তোদের মরণ বাপের ছোঁয়াচ শূণ্য মাসি নিত্য-মরণ বাচে

—দরদ এতই এখনো কি আছে ?

মা, যেহে আর পরী বাদেই

ধরছে সলা অপমানের বোঝা ;

ওরে নিলাজ ! ও অপহার !

মিছেই তাদের ভগবানে খোঁজা !

হোঃ হোঃ তাদের বাঁচাই কি আর ?

লোপ পেরে বাক চিহ্ন সবার !

বিশ্ব আঁদ এ বক চাপা অপমানের বোঝার শোষণ বাচে !

ওরে মরদ ! এতই দরদ এখনো এই প্রাণের তরে আছে ?

শ্রীগীতাসমোহন চট্টোপাধ্যায় ।

পরিচয়

(গল্প)

কাঁদন মাপের মাঝামাঝি, দোণ-পূর্ণিমা, হুই এক দিন থাকিতে যেসের রনিক ভটাচাধ্যকে সঙ্গে লইয়া অনাধবাবু গিরিডিতে আসিয়াছেন । রনিক এবার বি-এ

পাশ করিয়া উকিল হইবার আশায় ল-কলেজে বাতায়াক করিতেছে । উকিল হইতে পারিলে, একদিন হাইকোর্টের জজ হইবার আশাও যে আছে, তর্কের সময় এমন

কথাও রনিকের মুখ হঠাতে মাঝে মাঝে বাহির হয়। স্ততরাং তার আশাটা “এরারোগেনে” চড়িয়া যে খুব উচু দিয়া চলিতেছিল তার কোনও সন্দেহ নাই। কোন দিন নীচের দিকে চাওয়ার যে কোনও প্রয়োজন আছে—একথাটা রনিক সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল।

রনিকের ভগিনীপতি নরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, এখানে অস্ত্রের কাণ্ড করেন। অনেক দিন হইতে এখানে স্থায়িতাবেই বসবাস করিতেছেন। বন্ধুধর নরহরি বাবুর ব:টীতেই উঠিয়াছেন। পেন্ডিন সন্ধ্যার পর বধন তাঁহার। সহর বেড়াইয়া বাসার কিরিলেন, তখন নরহরি বাবু তাঁহার বৈঠকখানার বসিয়া একখানি বই পড়িতে-ছিলেন, এবং অত্যন্ত তগ্নরভাবে সর্ব্ব অবসাদ অপ-হরণকারী চুকট টানিতেছিলেন। সুবন্ধুকে আসিতে দেখিয়া তিনি বইখানি থোলা অবস্থায় টেবিলের উপর উপড় করিয়া রাখিলেন। আঙ্গুলের টোকা দিয়া চুক-টের ছাই বাড়িয়া লইয়া একটীবার বেশ ভাল করিয়া টানিয়া লইলেন। একমুখ ধোঁরা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—“রনিক দেখছি খুব হাঁটতে পার। সেই খেয়ে বেরিয়েছিলে, জলটল খাবার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছে। এরিকে আমাকে, তোমরা কোথায় গিয়েছ, তার জবাবদিহি করতে করতে হাররান হতে হয়েছে।”

রনিক বলিল, “আমরা ত ছেলেমানুষ নই যে পথ হারাবো—স্ততরাং এত বেশী চিন্তা কেন?” বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

নরহরি মুহূ হাসিয়া বলিল, “তুমি না হয় আজ বাদে কাল উকীল হবে, জবাবদিহি, তর্ক, কৈকিরত দেওয়া তোমার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবসা। ঠাঁড়াবে—কিন্তু আমরা হলান্ডাই ব্যবসাদার নাহুব, অত সভ্যতার ধার ধারি না। জবাবদিহি বড় একটা কারও কাছে করতে হয় না। তবে কি জান, আজ খাগ গবর্ণমেন্ট থেকে বন্টার বন্টার কৈকিরত তগব হচ্ছে কি না—তোমার পাশকরা বুদ্ধির বোত এখনও দেখান পর্য্যন্ত পৌছবার নোতাগ্য-লাভ করেনি। আর বড় দেয়ীও নেই, ছেলের বাজার বেরকম গরম, তাতে তোমার যে হাতে এবং পায়ে

শীগগির শিকলের বেড়ী পড়বে তার কোনও সন্দেহ নেই।” বলিয়া বেহারাকে ডাকিলেন এবং রনিকের বন্ধু অনাথ বাবুকে হাত পা ধুইবার জল দিতে আদেশ করিলেন। অনাথ হাসিয়া বলিল, “রনিক যে প্রতিজ্ঞা করেছে, উকিল না হয়ে বিয়ে করবে না। সে খবর বুঝি আপনি জানেন না?”

২

নরহরি বাবু বেশ দশ টাকা মৌজগার করেন, স্ততরাং মনটা সর্ব্বদাই প্রগল। লোকটি খুব সৌখীন। তাঁহার বৈঠকখানা স্ততরভাবে স্ততজিত—কতকগুলি মূল্য-বান বিনিমের আড়ম্বরে বরটা মোটেই ভারাক্রান্ত নয়। বিনা প্রয়োজনে একটা অব্যও সেখানে স্থান পায় নাই। সমস্ত আসবাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ঘরের একটা প্রান্তে একখানি স্ততর ছইটী মাহুর শুইবার উপবৃত্ত মেহদির খাট, তাহার উপর দ্বন্দ্ব কেননিত একটা শয্যা তাহাতে একটা নেটের মশারী বাধা রহিয়াছে। ঘরের মাঝখানে একটা লেক্রেটারিয়েট টেবিল। চারিখানি স্ততর চেয়ারে টেবিলখানি ঘেরা। পূর্ব্বদিকে দেওয়ালের গারে একটা কাপড় রাখিবার আলনা। তাহার পার্শ্বে একটা টুপী ও ছড়ি রাখিবার ট্যাঙ। ইহাতে তিনটী টুপী রহিয়াছে—ছইটী ছাট ও একটি নাইট ক্যাপ। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের নিকট একটা আলমারী। উত্তরাদিকে তিনটী বড় বড় মাসকেস, তাহার ভিতর কেবল বই। বইগুলি বেশ স্ততর বাধান। ইংরাজি খালনা ও সংস্কৃত বই আছে। সমস্ত বরটা মাহুরে মোড়া, তাহার উপর একখানি স্ততর কার্পেট বিস্তৃত। দেওয়ালের গারে অনেকগুলি চিত্র, কিন্তু প্রায় সকল গুলিতেই প্রাকৃতিক দৃশ্য। কেবল একখানি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের, একখানি বিবেকানন্দের, এবং একখানি বকিম বাবুর মূর্ত্তিচিত্র। টেবিলের উপর একটী বিহুকের কাগজ চাপা। একটী কোণে একটী টাপর আছে, সেটী

জরি কাব করা একখানি স্তম্ভর বেশী কাগজে ঢাকা। গৃহের কোথাও এতটুকু খুলা বা মরলা পড়িয়া নাই। বরটা গৃহবাসীর চিত্ত প্রসন্নতার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

নরহরি রসিকের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া একটু মোর গলার হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, “প্রতিজ্ঞা করাই ত পুরুষের লক্ষণ! কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলেই যে তা রক্ষা করতে হবে এমন কোন লেখা পড়া করে’ যদি কোন দিন প্রতিজ্ঞা করতে হত, তা হলে রসিক কেন, অনেকেই এই অসম্ভব শব্দটিকে কোন দিন মনের কাছে আসতে দিতেও রাজী হত না।”

এমন সময়ে কি আশিয়া রসিককে অঙ্গর মহলে ডাকিয়া লইয়া গেল। অনাথ হাত মুখ খুইয়া নরহরি বাবুর পার্শ্বের চেয়ারখানিতে উপবেশন করিলে নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন “গুনলাম আপনিও নাকি বি-এ পাশ করে এম-এ পড়ছেন?”

অনাথ বলিল, “একটা বাঁহোক ত করতে হবে।”

এই সময় বেহারী চা ও মিষ্টান্ন আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। নরহরি বলিলেন, “অম্মুন চা খাওয়া বাকি।” চা খাইতে খাইতে তিনি প্রশ্ন করিলেন, “একটা বাঁহোক করতে হবে বণে কি বাণের টাকা গুলোর এম-এ পাশের পড়া পড়তে হবে? এরূপ প্রশ্ন করার আপনি হয়ত আমাকে অসম্ভব মনে করছেন। আমিও জানি এরূপ প্রশ্ন করার আমার কোন অধিকার নেই, কিন্তু যেখান আপনি রসিকের বন্ধু স্ততরাং আমি আপনাকে ছোট ভাইয়ের মনে করছি বলেই এতটা সাহস করছি।”

অনাথ বলিল, “যখন ছোট ভাই মনে করেন, তখন এ প্রশ্ন আপনি নিশ্চয়ই করতে পারেন। এম-এ পড়ে বিশেষ কোন লাভ নেই একথা খুব সত্য। শেষে প্রোক্সারী বা হেড মাস্টারী ছাড়া যদি কিছু জোটে তা বিশেষ সুপারিশের জোর থাকলে।”

নরহরি বলিলেন, “আপনার সত্য অথচ অসুষ্ঠি অভিমত শুনে আমি বিশেষ আনন্দিত হলাম। এম, এ পাশ করতে যে টাকা ব্যয় হয়, সে টাকার একটা

ভাল স্বাধীন ব্যবসা করে দেশের, নিজেরও মধ্যে উন্নতি করতে পারা যায় না কি?”

অনাথ বলিল, “ব্যবসা করতে যত টাকা লাগে, এবং ব্যবসা করার অভিজ্ঞতা এ দুইয়ের আমার কোনটিই নেই, স্ততরাং আপনার কথার সম্পূর্ণ স্বাধীন উত্তর দিতে পারলাম না। তবে একথাও স্মৃতে পাই, মাদোরারী নাকি লোটা ও কবল এবং সাহেবেরা ছাট ও কোট নিয়ে বাঙ্গলা দেশে এসেছিল। আজ তাদের কেউ কেউ অপরজন রাজার সমতুল্য ঐর্ষ্যবান।”

নরহরি বলিলেন, “ঠিক বলেছেন। একজন দেশের রাজা, অপর রাজার সমতুল্য—কেবল ব্যবসার খাতিরে। ক’জন ইংরাজ বিলাত থেকে এম এ পাশ করে এ দেশে ব্যবসা করতে এসেছে? কয়জন মাদোরারী ইকুল, কলেজের গেট পর্যন্ত গিয়েছে? কিন্তু তাঁদের ব্যঙ্গা বুজি দেখে বণিকের জাত ইংরাজ পর্যন্ত আজ বিন্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেছে। এক একজন মাদোরারী পাগড়ীর ভিতর হতে লক্ষ টাকা অক্লেশে ব্যয় করে দেবে; কিন্তু এ দেশে খুব নামজাদা জমিদার বা রাজাকে এক সঙ্গে লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হলে বিষর বন্ধক বা ধার করা ভিন্ন তাঁর অন্য উপায় নেই। কাদের অবস্থা ভাল বল? যদিও লেখা-পড়া শেখার বিরোধী কোন দিন আমি নই, কিন্তু লেখাপড়া কেবল শিক্ষার জগেই—মনের উন্নতি, জাতির উন্নতি এবং মহত্ব লাভের জগেই একান্ত প্রয়োজন।”

এই সময় রসিক আশিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অনাথের পাশে বসিয়া তাহাকে বলিল, “বলি ব্যাপার কি, দাদাবাবুর সঙ্গে যে খুব তর্ক জমিয়ে তুলেছ?”

অনাথ রসিকের কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, “আপনি যে লেখাপড়ার কথা বলছেন, সে রকম লেখা পড়া শেখার যত স্কুল কলেজ কোথায় পাবেন বলুন? আদিকালকার শিকা হচ্ছে কোন রকমে ইউনিভার্সিটির শীল-বোহর করে ছাড়-পত্র পাওয়া—যে যেমন ছাড়-পত্র নিয়ে যেতবে, সে সেই রকম একটা কাবের জন্ত উদ্বেগারী করার অধিকার পেতে

পারবে। নতুবা উবেদারী করলেও কেউ তার কথার কর্ণপাত করে' অনর্থক সময় নষ্ট করতে রাজি হবে না।"

নরহরি বলিলেন, "আপনি ঠিক বুঝেছেন। তথাপি এমনি পাশ করার নেণা যে, এতগুলি টাকাও জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এই পাশের পশ্চাতে অমন বদনে ব্যয় করছেন। এই পাশ করার এমন শক্তি নেই যে কোন দিন আপনাকে সে একটা বাবীন উপার্জনের পথ দেখিয়ে দিতে পারে।"

অনাথ বলিল, "কথাটা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু উপায় কি? সকলের ত আর ব্যবসা কস্ব্যার মত শিক্ষা বা মূলধন নেই।"

নরহরি বলিলেন, "একথা মানতে পারলাম না। কোন দিন কি শেখার জন্তে বা মূলধনের জন্তে চেষ্টা করেছেন? বতখানি বস্ত্র, পরিশ্রম বা অর্থব্যয় উকিল ডাক্তার হবার জন্তে করেন, তার শতাংশের একাংশও কি নিজের পায়ে তর দিয়ে স্বাধীন হবার জন্তে করেছেন?"

রসিক এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। ন বলিল, "ব্যবসা করলেই যে লাভ হবে এমন কোন কথা নেই, বা ব্যবসা করেই সকলে বড়লোক হ'চ্ছে একথাও খুব সত্য নয়। অনেকে ব্যবসা করতে গিয়ে একেবারে পথের ভিখারীও হ'চ্ছে। কিন্তু লেখাপড়া শিখলে সেটা আর এ জীবনে বাবার নয়। তাই লেখাপড়ার পিছনে বত টাকাই ব্যয় করুন না, সেটা একেবারে নষ্ট হবার কোন আশঙ্কা নেই।"

নরহরি মুহু হাসিয়া বলিলেন, "হু উকিলের পূর্বরাগটী মন্দ হয় নি বটে। কিন্তু যে বিত্তা প্রয়োজন মত অর্থ উপার্জনে অক্ষম, সে বিত্তার ব্যবসাকেই কতটুকু মূল্য? সকলেই কি লেখাপড়া শিখে উকিল, ব্যারিষ্টার বা ডাক্তার হয়? যদি না হয় তবে বাকী ভালোর অটুটে কি দাঁড়ায়? তাহাদের বিত্তা কি কাবে আসে? শেবে দাসত্ব ভিন্ন অন্য কোন পথ

ত নেই। বাকী বেত্তলি, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হন, তাঁরা সকলেই কিছু টাকা যোগ্যতার করিতে পারেন না। যাঁরা পারেন, তাঁদেরও এই ব্যবসাদার ধনীদেয় অহুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়। রীতিমত শিখে ব্যবসা করলে কোন দিন ফেল হতে হয় না। একবার ব্যবসা শিখতে পারিলে তার মূলধনের জন্তেও আটকায় না।"

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কতদিন এই অত্রের কাব করছেন?"

নরহরি বলিলেন, "আজ আঠারো বৎসর। বি-এস-সি পড়তে পড়তে আমার অন্ত্র হর—হাওরা বদলাতে বাবা আমাকে এখানে আনেন। এখানে প্রায় আমাকে এক বৎসর থাকতে হয়। সেই সময় আমার একজন নাড়োরারীর সঙ্গে এখানে পরিচয় হয়। তাঁর কাছে আমার অত্রের কাব শেখা।"

এই সময় একটা ১৩.১৪ বৎসরের বেরে আসিয়া বলিল, "বাবা, এখন কি আপনাদের খাবার দেওয়া হবে?"

নরহরি বাবু বৃকক্ষের মূখের দিকে তাকাইলেন। তাহার নীরব প্রশ্ন বুঝিয়া অনাথ বলিল, "এখনো ত বেশী রাত হয়নি? আপনারা কি সকাল সকাল খান?" —বলিয়া একবার মেয়েটির মূখের দিকে সে চাহিল। প্রশ্নট শুনিয়া বালিকার অধরপ্রান্তে একটা মুহু হাসি লুকাইয়া কিরিতেছে। তাহার মুখ খানি খুব সুন্দর। সর্কাদে বাহ্যের অপূর্ণ লাবণ্য অদম্য উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কৌকড়ান কালো চুলের রাশি নিবিড় ঘন মেঘের মত পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া, বিছাৎফুরণের মত তাহার সংযত হাসিটি নরন-পথে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। নরহরিবাবু উত্তর দিবার পূর্বেই রসিক বলিল, "এটা আমার বড় ভাগ্যনী। দাদাবাবু লেখাপড়ার বতই নিন্দা করুন কণিকাকে বাতীতে বেশ লেখাপড়া শিখিয়েছেন।"

বাতুলের প্রশংসার কবিকা মাথা নীচু করিয়া

তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। একটা ৭।৫ ১ লক্ষা অকস্মাৎ কণিকার সমস্ত সাহস যেন রণ করিয়া গেল।

রসিক আদর করিয়া ভাগিনেরীকে নি বাহুে নৈর ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, “কেমন রে এত ভাড়া ? তুই বুঝি আজ ঘেঁষেছিস্ ?”

কণিকা লেখা পড়া শিখিলেও নবাপ্ত অতিথির সম্মুখে মুখ তুলিয়া অসঙ্কোচ কথা বলিতে পারিতেছিল না, ক্ষুণ্ণতা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, “তা বলবো কেন ?”

অনাথ বলিল, “তা না বললে আমরা খাব কেন ? কে রেখেছে না কেনে খেতে আছে ? তোমার মামা আমাকে বলেছেন কণিকা খুব ভাল রাখতে শিখেছে।”

কণিকা মামার দিকে ক্রিয়ায় মুহূ হাসিয়া বলিল, “মামা আমার হাতের রান্না খেয়েছেন একখা আমার ত মনেই পড়ে না।”

এ কথা শুনিয়া সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অনাথ বলিল, “তুমি যদি রান্না করতে না জান, তবে কেন বলছ তোমার হাতের রান্না তোমার মামা খেয়েছেন কিনা মনে পড়ে না। এই খানেই ত নিজেকে খা দিলে।”

কণিকা মুহূ হাসিয়া বলিল, “আপনিও কি মামার মত উকিল হবার চেষ্টা করছেন ?”

আবার সকলে হাসিয়া উঠিলেন। মেয়েটির বিবাহোচিত বয়স হইলেও তাহার বালিকা-স্বলভ নির্মল সরল হাসি ও শিশু-ভাবটী তাহাকে অনাত্মাত কুস্বপ্নের পবিত্রতার স্পর্শোদ্ভিত করিয়া রাখিয়াছে।

কণিকা এই সময় একখণ্ড অল্প পিতার হাতে দিয়া বলিল, “আজ আমি খাদ্ দেখতে গিয়েছিলাম, দেখুন বাবা কেমন অল্প বেয়িমেছে। আমার বোধ হয়, এদিকটার কেবল লালই আছে, আর খুব বড় বড় ধান পাওয়া যাবে।”

সকলের দৃষ্টি তখন সেই অল্প খণ্ডের উপর আবদ্ধ

হইল। নরহরি অজুটী হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলেন। “রায়ে ঠিক বোঝা বাচ্ছে না” বলিয়া কণিকাকে মাঝের আলোটা জালিয়া দিতে বলিলেন। কণিকা খেওয়ারলের গায়ের একটা সুইচ টিপিয়া দিতেই দিনের মত আলো হইয়া উঠিল।

অনাথের এতক্ষণ আলোর দিকে ঘোটেই খেয়াল ছিল না। সহসা দিনের মত আলো হইতে দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “একি ! আপনাদের এখানে কি ইলেকট্রিক্ লাইট আছে ? আমি যেন পথে কেরাসিন তেলের আলো দেখে এলাম বলে মনে হাচ্চ।”

কণিকা মুহূ হাসিতে খসটি আরও প্রশ্ন করিয়া বলিল, “বা দেখেছেন তাও সত্যি, এবং এটা বে ইলেকট্রিক্ আলো এটাও সত্যি—আর এখানেও বে ইলেকট্রিক্ লাইট নাই এ কথাও সত্যি।”

অনাথ বলিল, “বুদ্ধিমান সবই সত্যি। কিন্তু বুদ্ধিমান না, এ আলো কোথা থেকে আসছে।”

কণিকা বলিল, “এটা আমাদের নিজের বাড়ীর আলো।”

নরহরি বলিলেন, “সে ব'ক্—কণিকা, ম্যানেজার এ অল্প সম্বন্ধে কি বলেন ?”

কণিকা বলিল, “তিনি বলেন তাঁরও খুব বিশ্বাস এদিকটার লালই বেকবে।”

নরহরি অত্যন্ত উৎক্ল হইয়া বলিলেন, “আমার প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার অর্ডার হাতে। তা আর বাজার থেকে কিনতে হবে না।”

অনাথ ও রসিক উভয়েই একটা অর্ডার ২৫ লক্ষ টাকার—তিনিরা কণিকাল নির্ভাক হইয়া এই শিতা পুত্রীর সুখের পানে হর্ষবিহ্বল বিশ্ব দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের মনের মধ্যে বহুবিধ চিন্তার তড়িৎ-প্রবাহ মুহূর্তের ভিতর সহস্র কল্পনার রংমশাল জ্বলাইয়া দিল। রসিক জানিত না যে তাহার ভগিনীপতি কত বড় ব্যবসা করেন। অস্ত্রের ব্যবসা করেন, হুই পরমা উপার্জন করেন, ইহার অধিক

তাহার জানা ছিল না। তাহার ওকালতী পাশ করার অহঙ্কার ও গর্ব বেন যুগী-বাভাসের সুখে শুক পাড়ার মত কোন অভ্যাস দেশে নিষেধে উড়িয়া গেল। গাংস করিয়া রসিক বেন আর নরহরি বাবুর দিকে তাকাইতে পারিতেছিল না।

অনাথ বলিল, “আপনার নিজের বাড়ীর অল্প ইলেকট্রিক রাখতে ত অনেক ব্যয় পড়ে?”

নরহরি বীর বরে উত্তর করিলেন, “এ আলো বাড়ীর ভাঙে নয়, কারবারের ভাঙে। এখন কারবারে কিছু পড়ে তখন সারাগাজি কাষ চলে। তেলের আলোর অল্প চেনা যায় না। কাল সকালে আপনাকে কারখানা দেখাব। দেখুন না, এই অল্পটী থেকে নানা রকম সূতার অল্প বেরবে। এই একখণ্ড থেকে ৫০০০ টাকা মণের অল্পও বেরতে পারে! যারা অল্প চেনে এমন লোক এদেশে খুব কম পাওয়া যায়।”

অনাথ অল্পটী হাতে করিয়া, বানরের কণ্ঠে সুতার মালার অবস্থার মত তাহার কোন সূতাই বুঝিতে পারিল না। সে হজ্জার সেটী টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, “অল্পের এত দাম?”

কপিকা বলিল, “আপনি অবশ্য জানেন যে অল্প তারতবর্ষের একচেটিয়া ব্যবসা?”

পরাজিত সৈন্তাধ্যক্ষের মত সে অভ্যাস চাপা গলায় উত্তর দিল, “না।”

কপিকা আবার বলিল, “আর আশ্চর্য্য যে, তারত-বর্ষের এই অকলেই উৎকৃষ্ট অল্প পাওয়া যায়। চলুন না, একদিন খনি দেখে আসবেন।”

রসিক এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই। তার মনে হইতেছিল একি স্বপ্ন?

৩

অনাথ বাহিরের ঘরে মেহনতির খাটখানির উপরে শুইয়া ছিল। রসিক আহাঙ্গাদির পর তাহার দিঘির সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গল্প করিতেছিল। বোধ হয় অনেক রাত হইয়া গেছে বলিয়া অনাথকে আর সে বিরক্ত

করতে বাহিরে আসে নাই। অনাথ অনেকক্ষণ পর্যন্ত শব্দায় পড়িয়া রহিল। নিজাদেবী জানি না কি কারণে তাহার প্রতি বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। নিজা-বিহীন মননে শব্দায় পড়িয়া থাকা কবেই তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে বীরে বীরে পশ্চিম দিকের জানালার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। একটি শিথল অথচ মধুর বাতাস গুল্মগন্ধে হিল্লোলিত হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে এমন একটা সুখ-স্পর্শ বুঝাইয়া দিতেছিল যাহা তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া একটা আনন্দ স্নানীকে গুণ গুণ করিয়া জাগাইয়া তুলিতেছিল। জানালার বাহিরে সূর্য্যর একটা পুষ্পোদ্ভান। সেখানে গোলাপ, বেগ, সুই ও চামেলীর তিড় লাগিয়াছে; তাহার উপর জ্যোৎস্না সেদিন বেন নিজেই সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ঢালিয়া দিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। বতদূর দৃষ্টি চলে, মেঘ লেশ-হীন নির্মল অন্ধরে স্বাদশীর চন্দ্র নক্ষত্র-রাজি পরিবৃত্ত হইয়া দানসজ্জ খুলিয়া বসিয়াছেন। নীরব নিশ্চর রজনী। মাঝে মাঝে ছুই একটা কুকুরের চিংকার এবং থাকিয়া থাকিয়া বায়নের কণ্ঠস্বরও শ্রুত হইতেছিল। অদূরে পরেশনাথ পাহাড় ও অজ্ঞাত পর্ব্বতশ্রেণী প্রকৃতির পাহারার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কি গভীর নিশ্চরতা! কি বিপুল জ্যোৎস্না-প্রাণন! ক্ষণ, মন, নয়ন সব বেন নিম্পন্দ হইয়া এক সঙ্গে এই সৌন্দর্য্য সাগরের অতল তলে ডুলাইয়া যায়।

জীবনটা যে সত্য সত্যই উপভোগের বস্তু এবং সেটা যে কেবল ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট লাভের অশান্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বন্দি নয় এ কথাটা আজ অনাথ বেন অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর ভাবে বুঝতে পারিল। নানা প্রকার চিন্তা এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া তাহার মনটাকে ঘেরিয়া ফেলিল। সে আবার শব্দায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। নানা প্রকার চিন্তার পর মনে মনে বলিল, আজ! আমি এম-এ পড়ছি কেন? আমার লেখা পড়া শেখার মধ্যে কিছু করার কোন একটা নির্দিষ্ট পথ নেই। পড়তে হয়, সকলে পড়ছে আমিও সেই সঙ্গে ঠিক ব্রোডের সুখে গা ভাঙ্গান দিয়ে চলেছি? আমার যারা

অর্থ উপার্জন কি সুবিধা হইতে পারে? আমি দেশের কোন ক আশিতে পারি?

অর্থকরী বা কার্যকরী বুদ্ধি বা বিজ্ঞা এ উত্তরের কোনটাই ত আমার নেই। কণিকা বলিকা, সেও বা নিখেঁছে আমার বিজ্ঞা তাহার কাছে অতি তুচ্ছ; নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সে তত্ত্ব সম্বন্ধে কেমন তার বাপের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। কণিকা স্থিতহাস্তে ও আনন্দ নরনে বধন মাঝে মাঝে আমার মুখের প্রতি চাহিতেছিল, সে দৃষ্টি যেন তাঁর মত আমার উচ্চ-শিক্ষার অঙ্কার ও গুরুকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিতেছিল। সে বলিল, “অল্প আমাদের দেশের একচেটির। ব্যবসা, বোধ হয় আপনি জানেন? হি! আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। অথচ আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ছাত্র।

অনাথের মনে হইল আশ্চর্য্যে রাতিতে পত্র লিখিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, নূতন জীবনের সূত্রপাত করিবে। তার পর সে বুঝাইয়া গড়িল।

নিজ্জিভাবস্থার অনাথ এক অপক্লম স্বপ্ন দেখিল যেন সে নরহরি বাবুর কারখানা দেখিতে গিয়াছে কণিকাও তার পিতার সঙ্গে আছে। কারখানা সম্বন্ধে তাহার এতখানি জীবনে কোন অভিজ্ঞতাই ঘটে নাই। সুতরাং কারখানা পরিদর্শনের সময় তাহাকে নিছক আত্মমুগ্ধ বনিয়া বাইতে হইয়াছে। কারখানা দেখা ব্যাপারে কণিকাই যেন অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আর সেই গুরুগাঢ় ম্যানেজার তাহার সহকারিতা করিতেছে। নরহরিবাবু তাহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে চলিয়াছেন, অনাথ যেন কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গাধাবোটের মত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। হাজার হাজার কারিকর তাহার মুখের প্রতি একটা

কৌতূহল উদ্দীপ্ত করণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাকাইয়া আছে। এক একটা অল্পখণ্ড কণিকা কারিকরগণের হাত হইতে লইয়া বধন তাহাকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছে, অনাথ যেন তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিতেছে না। সমস্ত কারখানাটা যেন তাহার চক্ষের নিকট বিজ্ঞপ্ত বনিয়া বোধ হইতেছিল। দৌড়-কিরণ সম্পাতে অল্পখণ্ডগুলি উজ্জ্বল পরিহাস যেন লুটুপুটি খাইতেছিল। অনাথ আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। ছুটিয়া পলাইয়া আসিবে মনে করিয়া যেমন একটা পা বাড়াইয়াছি, অমনি আগ্রহ ভরে কণিকা যেন তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল, “কোথা যাচ্ছেন, এখনও ত কিছু দেখা হয় নি!” তাহার স্পর্শে অনাথের সমস্ত শরীর যেন হোমাঙ্কিত হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি তাহার হাত হইতে যেমন বলপূর্ব্বক হাতখানি টানিয়া লইতে বাইবে অমনি তাহার খুব ভাবিয়া গেল।

নিজ্জা ভদ্রে অনাথ দেখিল পুর্বের জানালার কাঁক দিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়াছে। পশ্চিমের জানালা দিয়া প্রভাতের শীতল বায়ু ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিতেছে। তখন তাহার কপালে ও নয়নের কোণে বেদ জমিয়া রহিয়াছে। সে শয্যার উঠিয়া বসিতেই দেখিল, কণিকা টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কণিকা বলিল, “মামা বেড়াতে বাবার সঙ্গে প্রস্তুত হইছেন, আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনি উঠেছেন কিনা দেখতে। আপনি ততক্ষণ তৈরী হোন, আমি চা পঠিয়ে দিচ্ছি।”—বলিয়া কণিকা চলিয়া গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
শ্রীকবিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

তুলবে এস !

আপের দোলায় আপের ঠাকুর

তুলবে এস !

আজ যে তুলন হাজার দোলন—

তুলবে এস !

অশ্রু হাসির আলোক ছায়ার,

হর্ষ ব্যথার মিলন মেলার,

দুঃখ স্তব্ধের লীলার খেলার,

তুলবে এস !

আজীর বাংলার চরণ নুপুর

বাঁধে না হেথার মধুর মধুর,

নীরব নিখুঁত সারা মন-পুর—

তুলবে এস !

নিবিড় নীরবে সত্য ঢাকা আল,

ধরে নি ধরণী মোহিনীর সাজ,

পথ চেয়ে তবু আছি রসরাজ,—

তুলবে এস !

আমার সকল শরন স্বপনে,

আমার সকল বচন মননে,

আমার সকল জীবন মরণে,

তুলবে এস !

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

বিপ্লবপন্থী

(গল্প)

“এ কাণ্ডে ত্রুটি হ’লে রীতিমত একাগ্রতা থাকে ।
দরকার !” পিছনদিকে মুখ কিরাইয়া ধনঞ্জয় দেখিল,
বিপিন তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ।—নগর-
প্রান্তে একখানি বহুকালের পুরানো বাড়ী । তাহারই
নীচের একখানি অন্ধকার স্তম্ভসেঁতে ঘরে একটা
ভক্তগোবর্ধন উপর অর্ধগোল অবস্থায় ধনঞ্জয় বসিয়া
ছিল । সামনে একটা ছরিকেন জলিতেছিল, তাহার
চিম্নির অর্ধেকটা আর জ্বলার ভয়না গিয়াছে ।

বিপিনের এই কথার ধনঞ্জয় একটা বেশ বড়
রক্তবের দীর্ঘশ্বাস চাপা দিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া
তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “বোস ।” পরে বিপিন
বসিলে জিজ্ঞাসা করিল, “কি একাগ্রতার অতাব
তোমরা দেখলে আমার কাণ্ডে ?”

সে-প্রশ্নের কোনরূপ জবাব না দিয়া বিপিন
কহিল, “তবে, এমন করে’ বসে’ তাবছিস্ কি ?
বেথলেই মনে হয়, তরের চাপে তুই বুঝি ভেদে
পড়ছিস্ ।”

তর ?—ধনঞ্জয়ের চোখ হুঁটা মুহূর্তের ভিত্ত দীপ্ত
হইয়া উঠিল । পরমুহূর্তেই আবার অতি ম্লান
একটু হাসিয়া সে কহিল, “তরকে গলা টিপে
অনেকদিন বেয়ে কেলেচি । অথচ, তার চেয়েও
লঘু একটা জিনিষকে যেন আমি কোনোমতেই
মন থেকে উপড়ে কেলেতে পাচ্ছি, —কিছুতেই
না ।”

“কি বল দেখি ?”

“মতি ।”

“গ্রেবে পড়েচিস্ বুঝি?”—বলিয়া বিপিন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিতে ধনঞ্জয় বিরক্ত হইয়া কহিল,—
“না বুঝতে পারিস্, চুপ করে’ থাক্ বিপিন। কিন্তু অমন অট্টহাসি হেলে এর পবিজ্ঞতাটুকু নষ্ট করিস্ নে।”

বিপিন গভীর হইয়া কহিল, “আচ্ছা, চুপ করলুম।
তনি এবার তোমার গ্রেবের গুজনটা—”

ধনঞ্জয় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—
“না। তা শুনে বা শুনিয়া কোন লাভ নেই। সেই চিরদিনের একঘেয়ে ইতিহাস। তগবান্ আমার পরমা দেন নি, কিন্তু তাই বলে’ স্বপ্নের তৃকাও কিছু কম করে’ পাঠান নি। ঐখানেই এক মত্ত অবিচার।

তাদের মোব কি? সে ধনীর ঘরের রূপসী মেয়ে, ধনীর ঘরেই তার বিয়ে হ’য়ে গেল। তার তাই প্রবোধ ছিল আমার সহপাঠী। না-বুঝে সেও আমার আশ্রয় করে’ তার বাড়ীতে নিরে গিয়েছিল; না-বুঝে আমিও তাদের সঙ্গে বনিষ্ঠভাবে বিশেষছিলুম।”

বিপিন কহিল, “বোব হু’পকেয়ই।”

ধনঞ্জয় মুহূৰ্ত্তে কহিল, “মানতে চাইনে। তোমরা বলবে, আমার হতে পড়লে সে অল্পে থাকতো; আমি বলবো তা নয়। সব মাত্ৰ কিছু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই সৌভাগ্যকে টেনে আনে না। আমার ভবিষ্যৎ কতবড় ছিল, তা কে বলবে? কিন্তু সে ভবিষ্যৎের মুখে আজ এক প্রকাণ্ড হিমালয়ের আড়াল ঢুলে দিয়েচি।” বলিয়া সে কেমন এক অদ্ভুত স্বরকমে হাসিতে লাগিল। বিপিনের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

টিং টিং টিং। দেওয়ালে আঁটা ঘণ্টাটা তিনবার বাজিয়া উঠিল। ধনঞ্জয় ও বিপিন হু’গনেই বরাবর উপরে উঠিয়া গেল।

ঘিটলের একখানি বড় ঘরে কেরোসিনের উজ্জল আলো জলিতেছিল। চোরাদের উপর উপর হেলান্ দিয়া উপরের কড়িবরগার দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া একটা বলিষ্ঠ বুবা বসিয়া। তাহার গায়ে একটা টুইলের জাকজমকটা পিরাণ। ইহাদের দেখিয়া সুবক

খাড়া হইয়া বসিল। বলিল, “দরজা বন্ধ করে’ দিবে বোস।” ধনঞ্জয় ও বিপিন মেঝের-পাতা মাছরের উপর বসিয়া উৎসুক হইয়া এই সুবকের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুবক বলিল, “কুকনগরের দল ধরা পড়েছে।”

বিপিন ও ধনঞ্জয় উভয়েই কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু সে শুধু মুহূৰ্ত্তের জন্ত। দলপতি সুবক কহিল, “পুলিশ এখন রীতিমত তদন্ত চালাবে। আমাদের এ আশ্রানা ছেড়ে ছাড়াইতে হতে হবে। কিন্তু, খুব দীরবে।”

২

বাল্যায় বিপ্লব-বাদীদের উচ্ছেদ করিবার জন্ত তখন সরকার মহলে মহা ইংকডাক পড়িয়া গিয়াছে। একদিকে বিদ্রোহীদের লোমহর্ষণ কার্যাবলী, অপর দিকে পুলিশের কড়াকড়ি, এই দু’য়ের মাঝে পড়িয়া বেচারী নিরীহ গৃহস্থের দল একেবারে গুটী হইয়া পড়িয়াছে।

ধনঞ্জয় এবং বিপিন উভয়েই বিপ্লবপন্থী। কুক-নগরের দল ধরা পড়িয়াছে তনিরা তাহারা তাহাদের পূর্ব-অভ্যাস ছাড়িয়া—বাল্যায় দেশ ছাড়িয়া—একেবারে বিহার অঞ্চলে পলাইয়া গেল। সঙ্গে আর বড় কেহ রহিল না, মাত্র এই দুইজন। বিপিন দেখিতে শীর্ণ ছিল। বরাবর রাঁচীতে আসিয়া ধনঞ্জয় পরিচয় দিল, তাহার রূপ বন্ধুকে লইয়া সে বায়ু-পরিবর্তনে আসিয়াছে। সেখানে বসিয়া তাহারা প্রতিনিরত খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল; এই সমস্ত বিদ্রোহীদের সংস্পর্শে বে-বথানে আছে, তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত পুলিশ দোবী নির্দোষ নানান্ লোকের উপর কত জোর-জুলুমই না করিতেছে।

তখন সবে বর্ষা কাটিয়া শরৎ পড়িয়াছে। শীতের আমেজের সঙ্গে সঙ্গে ছোটনাগপুরের স্বাস্থ্যকর বাতাস বড় মধুর হইয়া বহিতে শুরুর করিয়াছে। সেদিন লাওগার বসিয়া ধনঞ্জয় ও বিপিন গল্প করিতেছিল। আকাশের উপর সপ্তমীর চাঁদ ম্লান জ্যোৎস্না ছড়াইতে

ছিল। ধনঞ্জয় বলিতেছিল, “তুমি কিছু ভাল কর নি। আমি যরা পড়ি, কানিতে খুলি, হুঃখ করবার কেউ নেই—কিন্তু, তোমার না—”

বিপিন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; পরে গলা নামাইয়া বলিল, “দেখ্‌চি, দেশের কবি তোমার জন্তে নয়। বুকের ভিতর প্রেমের কোরার নিরে এখানে এসে তুমিই ভাল কর নি। তাই আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, যদি এখনি একটা বড় রকমের কাবের হুকুম এসে পড়ে, তুমি হয়ত’ একেবারে আড়ষ্ট হ’রে উঠবে।”

ধনঞ্জয় হাসিয়া কহিল, “তার পরিচয় একদিন নিশ্চয়ই পাবে। বড় ঠাণ্ডা; চল, ভিতরে বাই।”

চ’লনে উঠিয়া ভিতরে বাইবে, এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। পরসূহুর্ভেই ডাকহরকরা একখানা চিঠি দিয়া গেল।

ঘরের ভিতর আসিয়া হরিকেনের আগের ছইজনে উৎসুক হইয়া চিঠি খুলিয়া পড়িল। এবং পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ছইজনেই হিম—নির্ঝাক হইয়া গেল। চিঠিতে মাত্র এই করছ লেখা ছিল;—

“নামজাদা টিক্‌টিকি বোগেন সরকার হাজাণীবাগ থেকে কলকাতার তদন্তে আসছে—তাকে শেব কর। নইলে অনেক গল্প বেরিয়ে পড়বে।”

চিঠিতে কাহারও নাম সহি নাই; নীচে শুধু একটা সাক্ষেতিক চিহ্ন। চিঠি পড়িয়া কেহ কথা কহিতে পারিল না। শুধু একবার পরস্পরের সহিত দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া ছইজনে তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে ধনঞ্জয় হঠাৎ যেন অতিরিক্ত রকম উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিল, —“ব্যস; হুকুম এসেছে। এইবার দেখ্‌ তোমের চেয়ে আমি কাবের লোক কর, কি বেশী।”—বলিয়া ধনঞ্জয় নিজের ট্রাক খুলিয়া রিভলভারটা বাহির করিয়া পরীক্ষা করিতে বসিয়া গেল।

৩

তারপর পাঁচদিন কাটিয়াছে।

কলিকাতার কলেজ কোয়ারের বোড়ে একজন কেরিওয়াল হাঁকিতেছিল,—হাজাণীবাগের খুনের নুতন খবর বেরল বাবু—টেটুন্‌ম্যান—ইত্যাদি। মলে-মলে লোক আসিয়া ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র কিনিয়া লইতেছে। সেই ভিড়ের ভিতর হইতে একটা কিট্‌কাট তক্ত বুঝ একখানি টেটুন্‌ম্যান কিনিয়া বরাবর ফুটপাথ দিয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আপনার মনে অগ্রসর হইল; কোনওনিকে দৃকপাত করিল না। ইহারই নাম ধনঞ্জয়।

কোন এক হিন্দু বোর্ডিংএর একখানি ঘরে ধনঞ্জয় একাকী আসিয়া উঠিয়াছে। নিজের ঘরে কিয়দা সে জামা কাপড় বদলাইয়া টেটুন্‌ম্যান কাগজখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। নুতন সংবাদের ভিতর তাহাতে কিছুই ছিল না; কেবল এখানে সেখানে কতকগুলো তদন্তের খবর। কাগজ মুড়িয়া ধনঞ্জয় খাটের উপর শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল। এবং তাহার সেই নিম্নলিখিত চোখের অন্ধকারের ভিতর হইতে সেদিন রাত্রেই সেই তর্যাবৎ অন্ধকারের সৃষ্টিখানাই যেন স্পষ্ট হুটিয়া উঠিল। রেল লাইনের নিকট সেই নির্জন রাত্তির যখন সে বোগেন সরকারের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া প্রথম গুলি ছুটাইল, তখন সেই বিকট গর্জনে তাহার নিজেরই আত্মা যেন বুকের নীচে সূঁজিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। চারিদিকে শুধু শব্দ হইল, পাগা—পাগা—। সকলে বে-বেদিকে পারিল পলাইল। গাড়ীর ভিতর হইতে বোগেন সরকার ছুটিয়া বাহিরে আসিল; এবং সেই সূহুর্ভে উপস্থাপরি গুলির আঘাতে সেইখানেই পড়িয়া গেল। গাড়ীর ভিতর হইতে আরও কে যেন বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিল; যেন নারীকণ্ঠের একটা কীপ আর্দ্রনাদ সেই নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিল বলিয়া মনে হইয়াছিল। কে জানে, হয়ত ঠিক, হয়ত’ বা

ভুল!—ভাবিতে ভাবিতে ধনঞ্জয়ের সর্বস্বত্বের কীটা দিয়া উঠিল।

কিন্তু থাক। জীবনে যে ব্রত লইয়া সে বসিয়াছে, তাহার সাধনার সে একটা অসমসাহসিক কার্য করিয়াছে। কিসের দুর্ভাগতা? এ কাণ্ড সে ছাড়িয়া দিবে? কেন ছাড়িয়া দিবে? বিগিন তাহাকে সেদিন অকর্ণপা বলিয়া স্নেহ করিয়াছিল; ধনঞ্জয় প্রমাণ করিয়াছে, তাহাদের অনেকেরই চেয়ে সে সাহসী এবং কৰ্মঠ।

আর বেশীকণ এমনি তাই পড়িয়া পড়িয়া চিন্তা করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। ঘরের দ্বার খুলিয়া বায়নার উপর সে একটু পারচারি করিতেছে, এমন সময় অপর একটা লোকের অতি দৃষ্টি পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। দ্বিতীয় লোকটাও কিছুকণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—“আপনার নাম ধনঞ্জয়বাবু না?”

ধনঞ্জয় হাসিয়া কহিল—“আজ্ঞে হ্যাঁ প্রবোধবাবু, সেই ‘ধনঞ্জয়’। তা তুমি এখানে যে?”

প্রবোধ বলিল—“এই বরখানা তোমার বুঝি? এস না, ভিতরে গিয়ে সব বলছি!”

হুইজনে আলিয়া ঘরের ভিতর বলিল। প্রবোধ কহিল,—“আমি এইমাত্র এ বোর্ডিংএ এসে উঠছি। উঃ কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি!”

ধনঞ্জয় অভ্যন্তরিত উত্তর দিল,—“হ্যাঁ।” পূর্বস্মৃতির চাপে তাহার বুকখানা বেন মত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার সহপাঠী এবং সতীর্থ এই প্রবোধই একদিন তাহাকে তাহাদের পরিবারে বনিষ্ঠভাবে মিশিতে দিয়া তাহার প্রাণে আশার টাননী ফুটাইয়াছিল। সে মুখ তুলিয়া চাহিল,—ইহার মুখের উপর এখনও যে সেই কচি মুখখানির ছাপ স্পষ্ট ফুটিয়া রহিয়াছে।

ধনঞ্জয় কহিল, “তোমার বড় শুকনো দেখাচ্ছে।”

“শুকনো?”—রান হাসি হাসিতে গিয়া প্রবোধের

চোখ দিয়া হুঁকোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল—“কেন, তুমি শোন নি বুঝি, আমাদের বড় আয়ের বোন্ প্রতিমার শোণনীয় মুখ?”

ধনঞ্জয় স্তম্ভিত হইয়া গেল।

প্রবোধ কহিল,—“বোগেন্স সরকারের ছেলের সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে হ’য়েছিল কিনা! সি-আই-ডি’র বোগেন্স সরকার হে! সেদিন রাজ্যে হাজারী-বাগ থেকে প্রতিমাকে সঙ্গে করে’ তিনি কলকাতার আসছিলেন, তারপর পথে”—বলিয়াই প্রবোধ ক্রমাগত মুখ চাপিল।

—ধনঞ্জয়ই তবে সহজে প্রতিমাকে খুন করিয়াছে!

মিনিটখানেক সমস্ত নিস্তব্ধ। চঠাৎ ধনঞ্জয়ের কণ্ঠস্বরে প্রবোধ চমকিয়া উঠিল। তাহার মূর্তির পানে চাহিয়া প্রবোধের আপাদমস্তক কাঁপিয়া গেল। সে ভয়ে খাট ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। ধনঞ্জয় হাতের রিতলতারটা প্রবোধের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল,—“কি, পারবে? এই শুনি; আর লক্ষ্য কর—এই বুক। নাও!”

প্রবোধ কহিল,—“কি বলছ ধনে?”

ধনঞ্জয় হেঁ-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে বলিল,—“না, তোমার কাণ্ড এ নয়। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও ঘর থেকে—”

প্রবোধ সতরে চীৎকার করিয়া বাহিরে আলিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিকট শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে রিতলতারের ধুমে সেই ছোট ঘর আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বোর্ডিংএর সমস্ত লোক ছুটিয়া আলিয়া দেখিল, ধনঞ্জয়ের বিশাল দেহ রক্তপ্রোতে ভাসিতেছে।

সন্ধ্যাবেলার কলিকাতার রাত্তার রাত্তার ধবনের কাগজওয়ালারা হাঁকিতে লাগিল—“মেসের বাসার বিবদ কাণ্ড বাবু—রেবালবারে আত্মহত্যা—”

ঐ প্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

শিকার ও শিকারী (পূর্বানুস্মৃতি)

হাওলা শিকার

অনেক শিকারী মনে করেন, শিকার করিবার সময় জানোয়ারের খাড়ের উপর গিয়া না পড়িলে বাহাচরী কিছু কম হয়। কিন্তু বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত, কোন সময়েই কোন শিকারের একেবারে খাড়ের উপর গিয়া হাতী লইয়া পড়া উচিত নয়। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা তো আছেই, অধিকতর হাতীর উপর হইতে খাড়া তাবে, ঘাস কি ঝোপ জরলে, নীচের দিকে কিছু দেখা যায় না বলিয়া শিকার করা চলে না। একটু দূর হইতেই বসে তেজ্জ্বা তাবে ভাল দেখা যায়; কাষেই শিকারীর একটু দূরে থাকাই ভাল। একবার এই তাবে বাঘের খাড়ে গিয়া পড়াতে, আমাদের সঙ্গীর এক শিকারীর বেক্রম বিপদ ঘটয়াছিল, তাহা বলিতেছি।

বাজালা ১৩০৪ সনের তীব্র তুমিকম্পের পর, কিংবা তৎপরে বৎসর আমরা “হুং এর খলে” (খল একটা জল সমাকীর্ণ বহুদূর বিস্তীর্ণ জঙ্গলে) শিকার করিতে যাই। সেবার আমাদের পার্টিতে মহুবার, মহেশবাবু ও আমি ছিলাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল, খলে শিকার করিবার পর, তৎৎএর মধ্য দিয়া, পূর্বোক্তদুখে সিলেটের দিকে কতকদূর অগ্রসর হইব। আমাদের বাহাজুরপুর কাছারীর নিকটবর্তী গোড়াপুঠিয়া গ্রামে, একটা অতি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের ধারে, আমরা প্রথম ‘ক্যাম্প’ করি। এই জলাশয়টা এককালে বহতি নদী ছিল, পরে উহার স্রোত বন্ধ হইয়া ডোবার পরিণত হইয়াছে। ঝাংরা হাওয়ারিবাসের লেক (Lake) দেখিয়াছেন, ঝাংরা ইহার বেশ ধারণা করিতে পারিবেন।

আমরা বরাবরই ‘খলে’ বাইবার পথে, এই স্থানে

২১০ দিন হন্ট করিয়া (খাকিয়া) বাইতাম; কারণ ইহার নিকটেই লেপার্ডের খুব ভাল ভাল কয়েকটা জঙ্গল আছে। বহুদূর বিস্তৃত বস্তাবনুন্দর এই জলাশয়ের তীরে সারি সারি তাঁবু পড়িয়া, হানটকে আরও জ্বন্দর করিয়া তুলিত। আমরা এই স্থানে দুই দিন খাকিয়া ৩৪৪টা বাঘ মারিয়া, ‘খলে’ চলিয়া গেলাম। আমাদের অকলে ‘খল’ Hog-deer শিকারের একটা প্রসিদ্ধ স্থান।

খলে বাঘের (tiger) বড় বড় প্রিয় জঙ্গল আছে। ঐ সব জঙ্গলে অনেক সংখ্যে টাইগার পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ‘খলের’ নিকটবর্তী ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে অনেক ছোট ছোট জঙ্গল আছে, তাহাতেও সময় সময় দুই একটা লেপার্ড পাওয়া বাইত। কিন্তু সেবার কি জানি কেন, বহু লেপার্ড আসার, এই সব জঙ্গল ভর্তি হইয়া গিয়াছিল। যে জঙ্গলেই বাইতাম, ২১০টা করিয়া লেপার্ড পাওয়া বাইত। একদিন ৫টা পর্যন্ত পাইয়াছিলাম। সেবার বাঘের এত আমদানী দেখিয়া, আমরা বেধবয়েই নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের জঙ্গল ঠেসাইয়া বেড়াইতাম এবং প্রতিদিনই ২৩টা করিয়া লেপার্ড পাইতাম। সেবার এই স্থানে ৪৫ দিনে :৪.১৫টা লেপার্ড শিকার হয়।

এইরূপে একদিন ‘চালিতাখালি’ গ্রামের নিকটবর্তী কোন জঙ্গলে গিয়া একটা লেপার্ড পাই। ঐস্থান আমাদের ‘ক্যাম্প’ হইতে ৫৬ মাইল দূরে ছিল। জঙ্গলটা বেশ ঘন এবং একটা শুক নাগার মধ্যে অবস্থিত ছিল। লবার প্রায় ২ কাণৎ এবং চওড়ার কোন কোন স্থানে ১ কাণৎ কোথাও বা কিছু কম হইবে।

সেদিন আমাদের কি অবাধা ছিল যে, বাঘটাকে

কিছুতেই মারিতে পারিতেছিলাম না। আমরা তিন জনে উহার উপর বহু গুলি বর্ষণ করিয়াও কিছুই করিতে পারিলাম না; কারণ একে ঘন ঘন ঘন ওয়ার বোম্ব বিয় জমাইতেছিল। (ওরা একরূপ বুন্দো কাটা গাছ। ইহার এক একটা বোম্বের মত হয় ও সাদা সাদা ফুল হয়। ইহাকে ইংরাজীতে Bush rose বলে।) এক বোম্ব হইতে আর এক বোম্বে লাকাইয়া বাইবার সময়, Snap shot ছাড়া অন্য কোন রকম উপায়ই ছিল না। (যে সব আগারার সময় বন্দুকের নল জনোয়ারের দিকে ফুৎ করিয়া চোক না বুজিয়াই আগরার করা হয় তাহাকে snap shot বলে। ইহাতে অনেক সময় বন্দুক বুকে লাগান যায় না। খুব অত্যন্ত না থাকিলে এইরূপ shot মারা যায় না।) ক্রমাগত বাঘের পাছে পাছে পাছে দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে জঙ্গল অনেকটা পাট হইয়া আসিয়াছিল। বতই জঙ্গল পাট লইতে লাগিল, বাঘের বিক্রম বেশ তত বাড়িতে লাগিল। তখন আর সহজে তাহার এক বোম্ব হইতে অন্য বোম্বে বাহির হইতে চার না। বোম্বের নিকট হাতী গেলেই, ‘চার্জ’ করিয়া একেবারে হাতীর পাখার লাকাইয়া উঠে। এইভাবে বাঘেরা ক্রমাগত ‘চার্জ’ করিয়া ৫-৭ টা হাতীকে বেশ ‘বা’ল’ করিল। ইহার পর লাইনের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল; মাহুতদের মনেও প্রবল ভ্রাস উপস্থিত হইল। কোন কোন মাহুত ‘পীরের বাঘ, মারিয়া কাব নাই,’ কেহ বা ‘ইহা নেবান্ধী, ইহাকে মারা বাইবে না,’ ইত্যাদি বাহার মুখে বাহা আসিল, তাহাই বলিয়া কিরিতা বাইতে উপদেশ দিতে লাগিল। ফুল কথা মাহুতেরা অত্যন্ত ভীত হইরাছিল বলিয়াই, এইরূপ নানা উপদেশ দিতেছিল। আমাদের নিশানার উপর উহাদের বিশেষ আস্থা ছিল, কিন্তু এখানে ক্রমাগত বিফলতার ‘বোধ’ হয় উহাদের মন দমিয়া গিয়াছিল। এর পর আমরা ছিন্ন করিলাম, ‘বীটর’ হাতী ছাড়া আমাদের তিন হাওদা নিম্নাই

চেষ্টা করিয়া দেখিব। তদনুসারে হাওদা তিনটা পাশাপাশি করিয়া, আমরা এ বোম্ব সে-বোম্ব দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

মহেশ বাবুর হাওদা, রাজা জগৎকিশোরের ‘শঙ্খ প্রসাদ’ নামক দাঁতলার (tusker) উপর ছিল। বাঘ হয় ‘শঙ্খপ্রসাদ’ বাঘের বাড়িই পাড়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল, অথবা কি কারণে বলিতে পারি না, হঠাৎ বাঘের ডাক শুনিয়া মহেশ বাবুর হাওদার দিকে তাকাইয়া দেখি, বাঘ ‘শঙ্খপ্রসাদের’ পাখার উঠিয়া কামড়াইয়া ধরিয়াছে; কিন্তু শরীরটা হাতীর কাপের পাশ দিয়া ঝুলিতেছে। হাতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহার প্রকাণ্ড কাণ দুইটা ফাঁক করিয়া মেলাইয়া দিয়াছে। (এইভাবে হাতীর কাণ ফাঁক করিয়া দাঁড়ানকে, কাণ ফাঁদাইয়া দাঁড়ান বলে।) সেই সঙ্গে সঙ্গে মহেশ বাবু, হাওদার সমুখে ফুঁকিয়া, 500 Express rifle দিয়া বাঘকে নিশানা করিতেছিলেন। হাতীর কাপে বাঘ ঢাকা পড়িয়া গেলেও তিনি মনে করিতেছিলেন, বাঘকেই নিশানা করিতেছেন। আমরা এই অবস্থা দেখিয়া ক্রমাগত চেষ্টাইয়া গুলি মারিতে নিবেদ্য করিতেছি; কিন্তু তাহার সেদিকে ভ্রূক্ষণ নাই। মহেশ বাবু এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আমাদের চীৎকার তাহার কাপে পৌঁছে নাই। তিনি মনু করিয়া হাতীর কাপেই গুলি করিয়া বলিলেন। বন্দুকের আগরাজে বাঘ হাতী ছাড়িয়া দিয়া লাকাইয়া আর এক বোম্বের ভিতর ঢুকিল। এদিকে মাহুতও “আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছে” বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। দেখা গেল যে Express এর shell গুলি, হাতীর কার্বে লাগিয়া, ফাঁটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে ও তাহারই কয়েক টুকরা মাহুতের পায়ে বিঁধিয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্য যে মাহুতের অধম মাজ চন্দ্রভদ্র করিয়াছিল, কিন্তু হাতীর কাণ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থা দৃষ্টে মহেশ বাবুর মুখ চুপ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতী সরাইয়া দিয়া, হাওদা থলিয়া কেনা

হইল। হাতীর কাণের বড় বড় শিরা হইতে কিস্কি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল। হাওয়া বহলাইতে যে সময় লাগিল আমার মনে হইল, ইহাতেই বুঝি ২৩ ঘণ্টা রক্ত পড়িল। ইহার পর হাতীকে 'ক্যাম্প' দিয়া নদীতে কেলিয়া লোহা পোড়া দাগ দিয়া, তবে রক্তস্রাব বন্ধ করা হয়। অল্প রক্তস্রবে হাতীকে সেদিন একটু অবসর বোধ করার, এক বোতল No. ১ ব্রাণ্ডি একেবারে খাওয়ারইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু পর দিন হইতে, হাতীর আর বিশেষ কোন দুর্বলতা অনুভব করি নাই। রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া পর্যন্ত খুব কম হইলেও এক কলসী রক্ত পড়িয়াছিল। এত রক্তপাতেও কনিক দুর্বলতা ছাড়া, আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। হাতী ছাড়া রক্ত কোন জানোয়ার হইলে, মুকু অবশ্যতাবী ছিল।

সাতটাকে ৫৭ দিন ক্যাম্প হাঁসপাতালেই থাকিতে হইয়াছিল। বেচারী আরোগ্য লাভ করিয়া, আড্ডাহিত অস্তিত্ব সুসলবানদিগকে, খুব বড় একটা 'খোদার' সিরি' দিয়া জোন দিয়াছিল। তবে এই অর্ধ মহেশ বাবুর পকেট হইতে বাহির হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না।

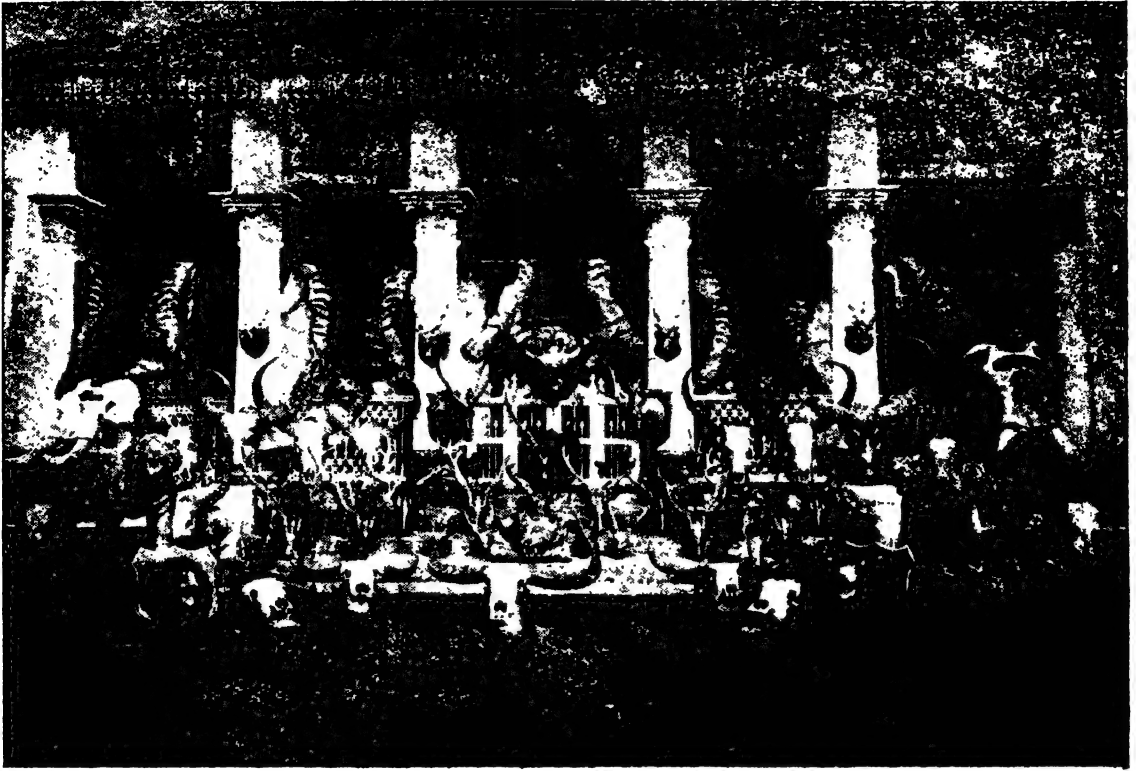
বাঘটা এই তাবে আমাদিগকে 'নাফাল' করিয়া, পরে আর কিছু মোটেই কষ্ট দেয় নাই। বোধ হয় সে তখন মনে করিয়াছিল "আর কেন, তোমাদের মত কমতা দেখা গেল, এখন অল্প ত্যাগ করিলাম।" তবে ভীষ্মবেবের মত সে কাহাকেও 'শিখতি' বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না। লোপার্ড হইলেও, ইহা মাপে আর ৮ ফিট ছিল। এত বড় লোপার্ড সচরাচর খুব কমই দেখা যায়।

সচরাচর গ্রামে শিকার করিবার সময় এত দক্ষ কুটীরা যায় যে, তাহাদের বস্ত্রাশর শিকার করা সুক্লি হইয়া পড়ে। ইহাদের দুই হাতে ঠেলিয়াও সরান যায় না। অধিকন্তু কোমরে হাত দিয়া, হাঁ করিয়া ঠাড়াইয়া, তাহারা দেখিতে বিশেষ পটু। যদিও হাতী দিয়া একদিক হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যায়, তখনই

আবার দৌড়িয়া অস্ত্রদিকে বাইরা ভিড় করে। অধিকন্তু জমলে কোন কিছু নড়িয়া উঠিলেই "ঐ বাব, ঐ বাব" করিয়া টোচাইয়া উঠে, আবার কোন কোন সময় হঠাৎ 'বাগজাশা' কি 'শেরাগ' জমল হইতে বাহির হইয়া পড়িলে, "বাব বাব" বলিয়া সবলে মিলিয়া উর্জ্বালগে দৌড়াইতে থাকে; তখন কে কাহার বাড়ে পড়ে ঠিক থাকে না। ইহার পর তখনই আবার ভ্রম বুঝিতে পারিরা, হাসিয়া অস্থির করিয়া তোলে, ও পুনরায় আসিয়া ভিড় করিতে থাকে। ইহাদের দ্বারা শিকারের কোন সাংঘ্য হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় নাগুব এড়াইয়া গুলি করা কঠিন হইয়া উঠে। এই অবস্থার কোন কোন সময় ২১ জনকে জখমও করে।

একবার আমাদের বাড়ীর অধিবর্তী 'বাটুরী' গ্রাম হইতে একটা লোপার্ডের খবর পাইয়া, ২টা 'বাচ্চা' হাতী লইয়া শিকার করিতে বাই; তখন আর অল্প হাতী বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না। গ্রামে পৌঁছিলে, একটা অর্ধওক পুত্রহীন পাড়ে কতকগুলি বাঁশ কাড়, কাঁটা বন ও আগছার পরিপূর্ণ জমলে বাঘ আছে বলিয়া ভনিতে পাইলাম।

বাহা হটক, অতি অস্বাভাবিক উহার খোঁজ পাওয়া গেল। এক গুলিতেই উহার পিছনের এক থানা পা খোঁড়া করা গেল। ইতি মধ্যেই ঐ জমলের আস পাশ ৭৪শত লোকে ভর্তি হইয়া গিয়াছিল। কাঁটা জমলের মধ্যে দুইটি নাজ হাতী দিয়া আমি কিছুতেই বাঘটিকে কাগদা করিতে পারিতেছিলাম না। অথচ এই সব লোকের চীৎকারে বাঘও একস্থানে স্থির থাকিত না। তখন বাহা হয় হটক মনে করিয়া বাই একটু অগ্রসর হইব, খানিক দূরে বনের একেবারে নিকটেই এক ধোপা প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের বোচকা পিঠে লইয়া উকি বুকি দিয়া "ঐ বাব ঐ বাব" বলিয়া টোচাইয়া উঠাযাত্রই দেখিলাম যে বাঘটি বিছাদের মত উহার বোচকার উপর লাফাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সেই থাকার ধোপা,



আমাদের টোপিক্স অপরাধ

বোটকা ও বাঘ সমেত উপুড় হইয়া পগাত ধরনীতলে।
বাঘের পেছনের পা, ধোপার উরুদেশে ও সম্মুখের পা,
কাঁধের উপর ছিল। উহার এইরূপ বিপদের সময়ও
অতি কষ্টে হাত সংবরণ করিয়াছিলাম। চতুর্দিক
হইতে “ধোপারে বাঘে খাইল, ধোপারে বাঘে খাইল,”
বলিয়া চীৎকার শোনা যাইতেছিল। কিন্তু সৌভাগ্য
যে ইহার পরই বাঘটা ধোপাকে ছাড়িয়া পুনঃ জঙ্গলে
যাইবার সময় আমার দ্বিতীয় গুলিতে তবলীলা সাক্ষ
করিল।

আমার মাহুত কিন্তু মহা খুশী হইয়া বলিতেছিল,
“যেমন শালা অবাক! ধোপাকে বারবার নিষেধ
করিয়াছিলাম, তেমনই উহার খুব আকেন হইয়াছে।”
সত্য কথা বলিতে কি ধোপার সহিত মাহুতের এই

নতুন সম্পর্ক স্থাপনে আমার বিশেষ ক্রোধের কারণ
হয় নাই। ইহাকে সুজাগাছা আনাটয়া চিকিৎসা
করাইতে আমার ১০।১২ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বাঘ যে অত বড় হিংস্র জন্তু ইহারও শিকারের সময়
প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে অত্যন্ত
হারশাণ হইয়া, কোন কোন সময় বা ভীত হইয়া একরূপ
অস্বাভাবিক চরিত্রের পরিচয় দেয়, যাহাতে নিজেদেরই
অবাক হইয়া যাইতে হয়। নিম্নের গল্প তিনটি হইতে
তাহা বিশেষরূপে বুঝা যাইবে।

১। বাঙ্গলা ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে আশা-
বের সুজাগাছাহ সর্বলের বাড়ীই চূরনার হইয়া যায়।
তখন পর্যন্তও কাহারও বাড়ী সংস্কার হয় নাই। ইহার
কিছুদিন পরে সুজাগাছা টাউনের উপর আনাটয়া

বাড়ীর অতি নিকটে
সামান্য একটু জঙ্গলে
একটি লেপোর্ড আসিয়া-
ছিল, প্রাতে রাজা মগৎ-
কিশোরের এক কর্মচারী
৮গিরিশচন্দ্র রায় আসিয়া
সংবাদ দেন যে, তিনি
তাঁহার বাসা হইতে
আসিবার সময় উহাকে
ঝোপের মধ্যে দেখিয়া
দৌড়িয়া আসিয়াছেন।



আমি রাজাকে খবর

দিলাম। তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন
হইতে পারেন নাই কিন্তু তাঁহার “চমকতারা”
নানী প্রসিদ্ধ শিকারী বন্তিনীটা আমার অস্ত পাঠাইয়া
দেন। ঐ একটি মাত্র হাতী নিরাই আমি শিকার
করিতে বাই।

সেখানে গিয়া দেখি বাঘ থাকিবার মত কোন জঙ্গল
নাহি, কেবল কতকগুলি আটসেঙা, কচু ও তাটি
গাছ স্থানটি পরিপূর্ণ। দূর হইতেই বাঘ দেখিতে
পাইয়া গুলি কতি, কলে উহার পিছনের একটি দাবনা
তাকিয়া বাঘর বাঘ ও কুকুরের মত লেংচাইও লেংচাইতে
মিউনিসিপাল রোড দিয়া দৌড়িয়া বাইতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, সুতাপাছা টাউনের উপর বাঘ আসি-
রাছে আমি শিকার করিতে বাইব ইহা পূর্বে হইতেই
প্রচার হওয়ায় ৩৪ শত লোক ঘটনাস্থলে আসিয়া
উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা রাত্তা দিয়া বাঘের পিছনে
খানিক দূর গিয়াই দেখিতে পাইলাম, বাঘটি
এখানকার অত্যন্ত ভূমিকারী আমার দাবা মহাশয়
৮বোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের অন্তর
বাড়ীর তথ্য প্রাচীরের মধ্য দিয়া ঢুকিয়া পড়িল। পিছনে
পিছনে আমরাও ১৫ ১৫ করিয়া বাইরা অন্তরে প্রবেশ
করিলাম। ভূমিকম্প স্থানে স্থানে প্রাচীর ধসিয়া
পড়ায় প্রবেশ করিতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয়

হাতী চারা আনিতেছে

নাই। আমাদের সনে সঙ্গেই ২৪ শত মর্শ্বকেও বাড়ীর
ভিতর পূর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংবাদ
চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়ায়, বাড়ীর মেয়েরা—যে
বাঁহার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার শিষ্ট
শাস্ত দাবা মহাশয় বাহির বাড়ীতে এই সংবাদ পৌঁছিয়া
মাত্রই এমন ভাবে তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন
যে, তদন্তে বাঘ প্রবেশ করা দূরে থাকুক বাঘ প্রবেশ
কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। “চাচা আপন বাঁচা” নীতি
অবলম্বন করিয়া বোধ হয় তিনি বাড়ীর আর কাহারও
খবর নেওয়ার অবসর পান নাই। এই তো গেল
বাড়ীর কর্তার অবস্থা। এখন বাঘের অবস্থা কি হইল
তাহা দেখা যাক।

আমরা আজিয়ার ঢুকিয়া আর বাঘ দেখিতে পাই-
লাম না। তবে বাঘ গেল কোথায়? তখনই স্থির
করিয়া লইলাম, আজিয়ার দক্ষিণ দিকের ভালা দোতালা
দালানেই বাঘ ঢুকিয়া থাকিবে। ঐ দালানের সব
কোঠারই দরজা বন্ধ ছিল, কেবল একটি
লোহার গরাদ দেওয়া জানলার গাট শিক ছিল
না; ঐ স্থান দিয়াই ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকিবে
মনে করিয়া, কিরণে উহাকে বাহির করা
যায় তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কোন্ বীর
প্রকব দরজা খুলিয়া আহত বাঘের মুখে বাইবে?

অথচ বাঘ সত্য সত্যই তথ্য
আছে কি না, তাহা খোঁজ
করিতেও বাওয়া দয়কার।
বাহা হউক, অনেক দেশাশা
ভরসা দিয়া, আমরাই এক
ভৃত্য দীক্ষকে এক লাঠি
হস্তে, দরজা খুলিয়া ঢুকাইয়া
দিলাম। দরজা খুলিবামাত্রই
বহু দিনের আবদ্ধ ঘর
হইতে, দুর্গন্ধে ও চামড়িকা
উড়িবার বটু কটু শব্দে,
অস্থির করিয়া তুলিল। একটু
পরেই, অন্ধকারে চক্ষু মতান্ত
হইয়া আসিলে, ভিতর
হইতে দীক্ষ বলিল যে, কিছুই
দেখা যায় না; কেবল

তুপাকারে কতকগুলি 'চাটাই' ও পাট কাঠি পড়িয়া
আছে, এই মাত্র। ইহা বলিয়াই ভাদ্রা 'চাটাই ২১৩
খানা উন্টাইয়া, লাঠি দিয়া আন্দাজেই খোঁচা দিতে
লাগিল। একটু পরেই চোঁচাইয়া বলিল যে, কিসের উপর
খোঁচা লাগে বুঝা যায় না, কিন্তু বেন বেশ নরম তুলু তুলু
করে। বাহির হইতে আমরা "বাঘের গারে খোঁচা
লাগিলে কি সে চুপু করিয়া বসিয়া আছে? ভাল
করিয়া দেখ" বলার, দীক্ষ 'চাটাই' গুলির ভিতরে হাত
প্রবেশ করাইয়া দিয়া, কি বেন একটা কিছু হাতে নিয়া
বাহির হইয়া আসিতে আসিতে বলিল "কি বেন একটা
শুইয়া আছে, উহার লোম ছিঁড়িয়া আনিয়াছি।" আমি
আমি লোম দেখিয়াই অবাক! বাস্তবিকই কতকগুলি
পীত ও কালো রংএর লোম। তবে কি বাঘ ওখানে
চুকিয়া সরিয়া গিয়াছে? নচেৎ অথবা ক্যান্ড বাঘের লোম
ছিঁড়িয়া আনিয়া দীক্ষ সশরীরে ফিরিয়া আসিবে, ইহাই বা
বা কেমন কথা? আবার মনে করিলাম ঐ রংয়ের
কোন কুকুর বোধ হয় ওখানে শুইয়া আছে। কিন্তু
তাহাই কি একটা কথা?



হাতী দ্বান করিতেছে।

বাহা হউক, অঃঃপর দরজার সম্মুখে, আমি বন্ধক
নিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। ২১৩ টা লম্বা বাশ, তাগা
জানিয়ার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া, ২১৩ জনে
ক্রমাগত খোঁচাইতে লাগিল। একটু পরেই হড় মড়
করিয়া বাঘটা আমার হাতীর সম্মুখে দরজা দিয়া লাকাইয়া
পড়িল। সুহৃৎ মাত্র অবসর না দিয়া উহাকে আবার
গুলি করিলাম, কিন্তু জুর্ভাগ্য যে, এবারও সে স্বল্প
কালের জন্য অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু উহার নীচের
চোঁচাল একেবারে উড়িয়া গেল। গুলির সঙ্গে সঙ্গে
সঙ্গেই, ডাক দিয়া বাম দিকে একটু গিয়াই, দোতালার
সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু সিঁড়ির ঘোড়েই
আমার ২৩ জন পদাতিক, লাঠি হস্তে শূন্য দোতালার
পাহারা দিতেছিল। অত্যধিক সাহসী কি না, নতুবা
এত লোক প্রাণে থাকিতে, উহার পূর্ব হইতেই
ওখানে থাকিবে কেন? বাঘটা কিন্তু মোড় পর্যন্ত
উঠিয়া, দোতালার নিরাপদ নয় তাবিয়া, উহাদের
একজনকে আঁচড়াইয়া, ওখান হইতে এক লাফে আমার
অস্থল শ্রীমান বতীন্দ্রনারায়ণের বাড়ীর ভিতর গিয়া

পড়িল। তখন সেখান হইতেও চৌকামেটি স্তনা বাইতে লাগিল। আমরা ভোঁ আর হাতী সহ সিঁড়ির উপর উঠিতে পারি না, কি ভাঙ্গা দেয়াল ডিঙাইতেও পারি না। কাষেই ঘুরিয়া বাইতে একটু বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে বাঘটা, সেখান হইতে খানিক দূরে গিয়া কতকগুলি কলাগাছের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

যাহা হউক, ইহার পর আমরাসেই উহার ভব বজ্রণা দূর করিয়াছিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যার পর, দাদা মহাশয়ের ওখানে বেশ কিছুকাল অলযোগ করা গেল এবং ৩৪ দিন পর, দ্বিদি ঠাকুরাণীর নিকট হইতেও আমার এই বাহাছরীর পুরস্কার স্বরূপ, একটা ভোগ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে দাদা মহাশয়কে এক ঘরে করিয়াছিলাম; যেহেতু তিনি সময়কালে দ্বিদি ঠাকুরাণীকে, বাঘের হাতে দিয়া, নিজে দরজা বন্ধ করিয়া, আশ্রয়লা করিয়াছিলেন।

২। অনেকদিন আগেকার কথা, তখনও ময়মনসিংহ—আম'লপুর 'রেল' হয় নাই। আমরা সেবার জামালপুর হইতে স্নান করিয়া, ক্রমাগত ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে আসাম গোরালপাড়া অংশে শিকার করি। বাড়া হইতে বরাবর গাড়ীতেই জামালপুর বাইরা, পরে সেখান হইতে ক্রমাগত হাতীতে বাই।

ইসলামপুর নামক স্থানে ক্যাম্প করিয়া, আমরা কয়েকদিন শিকার করি। আমাদের দিলার এই ইসলামপুর, কীসার বাসনের জন্তে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

একদিন কোন জঙ্গলে, হঠাৎ দুইটা বাঘের সন্ধান পওয়া গেল। জঙ্গলটা খুব বড় না হইলেও, ঘন-সন্নিবিষ্ট নলবন ছিল। ২১৩ বার বীট করিবার পরই, মাছতেরা ২টা বাঘ দেখিতে পাইল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমাদের অদৃষ্টে দর্শন লাভ ঘটে নাই। মাছতদের 'ঐ বাঘ' 'ঐ বাঘ' চীৎকারে একটা বাঘ হঠাৎ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া, মাঠের মধ্যে দিয়া ভোঁ দৌড় দিল।

এখানে একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

এই জঙ্গলটির চতুর্দিকেই প্রকাণ্ড মাঠ ছিল ও আমরা শিকারে গিয়াছি বলিয়া, বহু দর্শক তখন তথায় তাহাঙ্গা দেখিতে জুটিতেছিল; যেমন সর্বত্রই হইয়া থাকে মাঠে বহু দর্শক ছিল বলিয়া, আমরা আর তখন তাহাকে গুলি করিতে পারিলাম না; দাঁড়াইয়া তাহাঙ্গা দেখিতে লাগিলাম। বাঘের দৌড় দেখিয়া, দর্শকগুলিও সকলে এক বেগে 'ঐ বাঘ' 'ঐ বাঘ' বলিয়া চৌকাইয়া উঠার, বাঘ আরও জোরে দৌড়াইতে লাগিল। ঐ মাঠের বহুদূরে এক খানী বাধা ছিল, বাঘটা দৌড়াইতে দৌড়াইতে গিয়া খানীর বাড় মটকাইয়া আর এক জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। এত বড় মাঠ থাকিতে যে কোন খানীর উপর বিক্রম প্রকাশ করিল বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমরা স্থির করিলাম যখন আর একটা এই জঙ্গলে আছে, তখন উহাকে শেষ করিয়া ইহার খোঁজ করা বাইবে। আমরা লাইন করিয়া ক্রমাগত জঙ্গল ভাঙ্গিতে লাগিলাম, কিন্তু হয়! সকলই বিফল হইল। বন সমভূমি করিয়া ফেলিলাম, তথাপি বাঘ বাহির হইল না। শেষে একরূপ অবস্থা হইল যে বনের চিহ্ন মাত্র রহিল না। সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেলাম, বাঘ কোথায় গেল? কেহ বলে এটাকেও মাঠ দিয়া বাইতে দেখিয়াছি, কেহ বলে জঙ্গলের মধ্যে গর্ত আছে তাহাতে ঢুকিয়াছে। এই ভাবে বাহার বাহা মনে আসিতেছিল সে তাহাই বলিল।

জঙ্গলের মধ্যে গর্ত থাকাই সম্ভব মনে করিয়া, নিকটবর্তী দর্শকদের জঙ্গল উন্টাইয়া দেখিতে বলা হইল। তাহার উৎসাহের সাহিত্য বন উন্টাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ ওলট পালট করিতে করিতে হঠাৎ একজন 'বাঘ' 'বাঘ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর সেখানে গিয়া দেখা গেল, বেচারী মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

গুলি করা হইল না, অথচ বাঘ মরিয়াছে—ইহাই তখন সমস্তার বিষয় হইয়া উঠিল। সমস্তা তখন পূরণ করে কে?

বাঘটাকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখা গেল যে, উহার

মাথার খুলি শুঁড়া হইয়া গিয়াছে, নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে

তাহার পর শ্রীযুক্ত রাধা ভগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুরের ‘চন্দনভারা’ নামী এক হস্তিনীর পারে রক্তের দাগ দেখিয়া সমস্তা পূরণ হইয়া গেল। ‘চন্দনভারা’র পদতলে পিষ্ট হইয়া বেচারা ইহা জীবনের সকল সাধ মিটাইয়াছে। সমুখ যুদ্ধে আমাদের হস্তে নিহত নহিলে স্বর্গলভের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু জঘাত্যাত্মীন কর্মকল তাহাকে অস্ত্র দিকে টানিয়া নিয়া গেল।

তাহার পর আমরা ইহার সন্নিহিতকোণে ইহার পঞ্চ-বর্তী করিয়া, তাহার বৈধব্য শোক দূর করিয়াছিলাম।

৩। আর একবার আমাদের বাড়ীর নিকটবর্তী বেগুন-বাড়ী নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের চরে করদিন হইতে বাঘের খুব দোরাখ্যা শোনা বাইতেছিল। আমাদের ২৩ দিন সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও হাতীর অভাবে শিকারে বাইতে পারিতেছিলাম না। করদিন পরে তিনটীমাত্র হাতী সংগ্রহ করিয়া শিকারে বাহির হইলাম। এই তিন হাতীর মধ্যে কোনটাই হাওদার মজবুদ ছিল না। বাহা হটক, একটার উপর হাওদা দিয়া বাইরা দেখা গেল, ব্রহ্মপুত্রের চরে খড় ও বাঁট জঙ্গলে বেশ পাকা-পোক্ত হইয়া বসিয়া অনেক গো-বংশ ধ্বংস করিয়াছে।

সেখানে মাত্র দুই টুকরা জঙ্গল ছিল। একটির ২৫।০ গজ দূরেই আর একটি ছিল। আমাদের সঙ্গে মোটেই হাতী তিনটি, তাহার দুই হাতী দিয়া জঙ্গল বীট করিয়া এক হাতী stopএ রাখিলে, জঙ্গল ভাল চলে না। বাহা হটক, কিছুদূর চেষ্টার পর বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল। আমরা বীট করিতে আরম্ভ করিলে দূর হইতেই এক জঙ্গল হইতে অপর জঙ্গলে চলিয়া যায়; কাষেই, মারার কোন সুবিধা হইতেছিল না। যদি কখনও আমি দুই জঙ্গলের মধ্যে stopএ (নাকার) দাঁড়াইয়া অস্ত্র হাতী দুইটিকে জঙ্গল বীট করাই, তখন আর বাঘ বাহিরই হয় না। আমরা আবার সেই জঙ্গলে গিয়া তিন হাতী দিয়া বীট করা

আরম্ভ করিলেই অস্ত্র জঙ্গলে চলিয়া যায়। এইরূপ ক্রমাগত বোরাবুরিতে অত্যন্ত বিরক্ত ও হারহাণ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু বাঘ মারিতে পারিলাম না। আর একটু চেষ্টার পরই দৈবাৎ একটিকে একবার সুবিধামত বাহির হইতে দেখিয়া, এক দ্র্যাপ-শটেই নিঃশেষ করিলাম। কিন্তু আরও ২৪ বার চেষ্টা করিয়া অপরটিকে কিছুতেই মারিতে পারিলাম না।

পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে বনের চতুর্দিকে শুকনা খড়ে আগুন ধরাইয়া দিলাম। দশ বাজা মিনিটের মধ্যেই সমস্ত খড় পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বাঘ বাহির হইতে দেখা গেল না। আমার বিশ্বাস ছিল, আগুন দিলেই কোন একদিক দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। এই সময় কোন একজন লোক বলিয়া উঠিল ‘ঐ যে বাঘ পড়িয়া আছে।’

সেখানে বাইরা আমরা কালো ছাল্ নাই কুকুরের মত কি একটা দেখিলাম। খুব নিকট গিয়া দেখিলাম, ব্যাজ্রধবর পুড়িয়া ঝুলিয়া গিয়াছে; শরীরে লোনের চিকুমাঝ নাই, সর্কীল পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে, উপড় হইয়া পড়িয়া আমার দিকে মিট মিট করিয়া চাহিতেছে ও নিঃশব্দে দাঁত বাহির করিতেছে। আমি তো দেখিয়াই অবাক্। উহাকে তখন মারিতেও স্থগা বোধ হইল। পরে চরের উপস্থিত দর্শক মুসলমান-গণের লগুড়ঘাতে উহার দাঁহ বজ্রগার অবসান হইল।

এই সকল ঘটনা হইতে আমার বেশ ধারণা হইয়াছে যে, নিকটবর্তী স্থানে ভাল জঙ্গল না থাকিলে অধিকাংশ সময়ই ইহার হাতীর পদতলে পিষ্ট হইয়া বা আগুনে পুড়িয়া মরিতে রাজী, তবু কাঁকার বাহির হইতে চায় না। কিন্তু কঁকাচিং ইহার বিপর্য্য যে না দেখা যায় তাহা নহে। কিন্তু তাহার সংখ্যা কম।

ক্রমঃ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

অজন্তা

গোধূলির সময় আমরা এলোরার
পরিত্যাগ করিলাম। উর্কে নিকটে
ও ঘুরে, এব দিক্‌চক্রবালে ছিন্ন ভিন্ন
মেঘপুঞ্জ লক্ষ্যহীন তরীর মত বচ্ছল-
পতিতে ইতস্ততঃ তালিরা বেড়াইতেছি।
তাহার উপরে অস্তাচলশারী সুস্ব-
স্বর্ষ্যের কিরণপাতে রঙের যে অপরূপ
খেলা চলিতেছিল তাহা অবর্ণনীয়।
ঘুরে গিরিকূটে মূচ্ছিত তপনের শেষ
রশ্মিটুকু দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া
গেল। বেধঙলিও পাণ্ডুর হইয়া
আসিল।

নববীর শশী আকাশে উদ্ভিত
হইলেন; সেই মধুর আলোকে শর
কিরীটস্থিত চন্দের ভাষা অর্ধসম্রাস্ত



কারলি চৈত্যের অভ্যন্তর দৃশ্য

এলোরার সৌন্দর্য্য মনকে কেমন একটা বেদনামিশ্র মোহময়
আনন্দে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শিরীর শিন্ন রহিয়াছে,
কিন্তু এলোরার সেই গরিমা কোথায়? মানবের
লুপ্ত গরিমা আবার কিরিয়া আসিবে কিনা কে জানে?
অতাব কিন্ত তাহার সৌন্দর্য্য হারায় নাই। চলিতে
চলিতে নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আবার দৌলতাবাদের
জুর্গাদনে প্রবেশ করিলাম। শারদ জ্যোৎস্নার মণ্ডিত
গিড়িচুর্গকে দক্ষিণে রাখিয়া অগ্রসর হইলাম। ট্রেনে
কিহিতে কিছু রাতি হইল।

তবঘুরে প্রাণিবর্গের প্রাণাদ 'ওয়েটির কম'। আমরা
সেই প্রাণাদে অশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ঋইবার হাদা
ছিল না। কাবেই নিশ্চিতভিত্তে ট্রেন মাষ্টার মহাশয়ের
সঙ্গে আলাপে বণ্টা খানেক কাটাইয়া দেওয়া গেল।
তিনি রাজ্যাদী গুঠান, বেশ সৎলাপী। তাহার নিকট
হইতে কতকগুলি আবশ্যক জিনিষের তালিল তাহার
প্রতিশব্দ জানিয়া লইলাম, দক্ষিণ বেশ ভ্রমণে তাহা কাঁদে
লাগিয়াছিল।

প্রাতের গাজীতে আমরা মানমন্ডে কিরিয়া আসিলাম।



● Pachora Jamner

Branch line এ গাছের নামক ঠেঁনে সন্ধ্যার সময় নামিলাম। যদি বলেন এ কর্মভোগ কেন? বাইবার পথে গাছেরে নামিরা অজন্তা দেখিরা গেলেই তো হইত? তাহার উত্তর—এহের ফের!

প্রায় সমস্তদিন এক প্রকার অভুক্ত অবস্থায় কাটাইয়াছি। আজ মহারাষ্ট্রের দশমীর উৎসব করিতেছে—সব ছুটি, তাতে দোকান বন্ধ—অন্ন-ভোজী বাজারীর চক্ষুস্থির। চা ও পুরীতে বতটা সরস রাখিতে পারে, আমরা ততটাই সরস ছিলাম।

দেহ ও মনের মধ্যে যে অবিলম্বে সম্পর্ক আহে তাহা প্রতিপন্ন করিতে ছাত্রগাঠ্য

পুস্তক-প্রণেতৃগণ অন্ন আশাস বীকার করেন নাই। আজ প্রায় অনেকটা তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। অদারীভূত অস্ত্রের ধ্বংস যে বিচারশক্তিকে কলুষিত করিয়া বীতংস কল্পনা জাগাইয়া তোলে তাহা পূর্বে অবদিত ছিল। যখন ঠেশন মাষ্টার বলিলেন যে অজন্তা পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, তবে লেনার (গুহা) এক ক্রোশের ভিতর, রাস্তা জঙ্গলের মধ্যে দিয়া গিয়াছে, তখন এক বন্ধুবরের কল্পনা উদ্ভাস হইয়া পড়িল। কল্পনা নরেন বেশিলাম—প্রথম দৃষ্ট—জুর্জিত বনরাজি অজ্রম্পনী গাছগুলি বড় বড় হাত বাড়াইয়া অভ্যাজি করিয়া কুস্তি করিতেছে। দেখিরা, আমাদের কেন, স্বর্ধোরও সেখানে ঢুকিতে ভয় হইতেছে। সব চেয়ে জুর্জিত, সবে টাকা কড়ি রহিয়াছে—এবং আমরা সব ছিন্নমূল হইয়া পড়িয়া আছি! পট পরিবর্তনে আর এক দৃষ্ট—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বগা গগা গাল



অজন্তা। দশাবতারে শিবের তাম্র নৃত্য

পাটীগালা গুণ্ডা গাড়ী আটক করিয়া গলার পা দিয়াছে আর আমাদের সাত হাত জিত্ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বলিলাম—“আপনি জ্যোতিবজ্র, যদি জিত্ বাহির করিয়া মরার কথাই কপালে লেখা থাকে, তবে কে তাহা রোধ করিবে? আপনি আশ্রয়কার নিমিত্ত সেই অজ্ঞকার বনপ্রবেশের জন্য দেশলাই নোমবাতি ও মাখনের কোটা কাটা ছুরি লউন; আমার কপালে বাহা আছে তাহা হইবেই!”

ঠেশন হইতে বাহির হইয়া একটা ক্ষুদ্র শ্রোত্রস্থিনীর উপরস্থিত সেতু অতিক্রম করিয়া বাজলার আসিলাম। প্রকাণ্ড হাতা, অনমানবহীন, বসতিহীন, নির্জন প্রদেশ। চৌকিয়ার গ্রামে গিয়াছে উৎসব করিতে—গাড়োয়ান সেন তাহার সন্ধানে একেবারে অগত্য বাজার। বাজলা বন্ধ। এই অবচ্ছন্দতা আরও বৃদ্ধি পাইল বন্ধুবরের রোমাক

কর গবেষণায়। এইরূপ ফলই
হত্যাকাণ্ডের পক্ষে প্রকট-
রূপে উপযোগী, সাবধানে
না থাকিলে পিতৃদেবের পবিত্র
নামোচ্চারণ করিবারও অব-
কাশ মিলিবে না। পরে
অবিকৃত হইল যে সব
ঘর গুলিই খোলা, কেবল
ডেজান ছিল। অনেক
বৎসর অধ্যাপনার প্রকৃত
পরিচায়ক।

আজ বিজয়া। এতক্ষণ
বাগলার ঘরে ঘরে শুধু
সন্মিলন হইতেছে। যারের
পূজা শেষ হইরাছে, প্রতিমা

বিসর্জিত হইরাছে, ছেলেরা রাঙতা মুকুট সংগ্রহ করিয়া
বাড়ী ফিরিয়াছে। কোথাও হরতো বেলপাতার আলতা
দিয়া দুর্গা নাম লেখা হইতেছে; হরতো বা বাজা করিয়া
শঙ্করন প্রণাম করিতে সকলে বাহির হইরাছেন। আজ
আর দম্ব, কোলাহল নাই; প্রেম প্রীতি ঘেহের উৎস
খুলিয়া গিয়াছে; প্রণাম, আলিঙ্গন, বোতুক আজ
সকল বৈভব সকল হৃৎথকে পরাভব করিয়া বিজয়ী
হইরাছে। এই দূর দেশে আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন
করিলাম।

মধুপান করিয়া যখন চৌকিদার ফিরল তখন দশটা।
সেই রাত্রিতেই, পরদিন ভোর চারিটার সময় বাহির
হইবার জন্ত, টোঙা বোগাড় করিয়া আনিলাম। দুধ ও
সামান্য সবজীও লইয়া আসিল। আমাদের মস্তকে
পুনস্কল তুল করিয়া ও সামান্য প্যাচ খেলিয়া গাড়ীত্যাঁড়া
কিছু অতিরিক্ত আদায় করিয়া লইলেও আমরা তাহার
মিকট বাস্তবিক কৃতজ্ঞ; এই নির্ভর্য্য দেশে যে এত
শীঘ্র বানের আয়োজন হইবে তাহা আমাদের অগাধীত
ছিল।



বুদ্ধের প্রণোত্তন (২৬ নং চৈতন্য)

ভোর সাড়ে তিনটার সময়ে উঠিয়া সকলে তৈয়ার
হইয়া লইলাম। বারান্দার টোঙাওয়ালা ও চৌকিদার
ঘুমাইতেছিল, প্রাঙ্গণে গাড়ী ঘোড়া ছিল। কাখেই
আর কোন দেবী হইল না। তিনজনে এক গাড়ীতে
ঠাসাঠাসি হইয়া বসিয়া চড়াই উৎসাহ করিতে করিতে
যখন প্রায় ৭টার সময় গুহা হইতে দেড় ক্রোশের
ব্যবধানে আসিয়া পৌছিলাম তখন “ত্রিসূক্তির শুধু
“কেবলাত্মা” হইতে বাকি ছিল। দক্ষিণদিকে ছোট
পথ দিয়া কারদাপুরের ডাক বাজলার বাওয়া বার, সাধারণ
ভদ্র গুহাবাজী এইখান হইতে গুহাদর্শন করিতে পারেন।
ইহার সন্নিকটেই নিজাম দরবারের নির্মিত স্মরণ
প্রাঙ্গণোপম আশ্রম আছে—তাহা বোধহয় অ-সাধারণ
ব্যক্তিগণের নির্মিত।

কিন্তু ঘুরে বামদিকে রাস্তা পাঁহাড়ের উপর দিয়া অলসতা
প্রায়ে চলিয়া গিয়াছে। আমরা দক্ষিণ দিকে ‘লেনার’
(গুহার) চলিলাম। এক এক জায়গা এত উচু নীচু যে
গাড়ী হইতে নামিতে হইল। পাঁহাড়ের কোলে কোলে
চলিতে হইল। এইখান হইতেই ষ্টেশন মাঠার বর্ণিত

ধর্ম-অরণ্য প্রবেশ আরম্ভ। কোথায় সে দিনকর-রশ্মি-
লগ্নী পথিক-স্বপ্ন-ভ্রাসী বহীষ্কৃত শ্রেণী? তাহার
স্ববর্তে দেখিলাম বনোরম স্বপ্নহারী প্রাকৃতিক দৃষ্ট।
ই পার্শ্বে ক্ষেত্র তরলারিত হইয়া চলিয়াছে, ক্ষুদ্র জাতীর গীত
ত্র লোহিত নানা বর্ণের কার্পাস ক্ষুদ্র ও অভাবিত শব্দের
স্বিত পথ মিলিয়া এক অপক্লপ বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে;
পাতার পাতার মূলা বিন্দুগন শিশিরবিন্দু পাখীদের অন্তরালে
ক্ চক্ করিতেছে; কোথাও রবিকর-সম্পাতে কল্লর-
ফলিতেছে;—মনে হইতেছে আকাশের ইন্দ্রধনুক
ধ্বংস করিয়া তাহারই রেণুমাণি বেন সকল দিকে ছড়াইয়া
দিয়াছে। এই পথে আর কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আমরা
মণিগাম, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ছারোহ একটা পর্বত-তাহার
নৈর দিয়া উপলব্ধ-সমুদ্র ক্ষুদ্র এক শ্রোতবিনী
গিরে প্রবাহিত হইতেছে। ইহা অতিক্রম করিয়া বৃক্সশ্রী
তলার তলার আরও কিছুদূর গিয়া ওয়ার নিকট আসিলাম।
এমন সুন্দর, নীরব, নির্জন, স্বভাব-শোভার সমুদ্র স্থান
পূর্ব কন্দি দেখিয়াছি। এ বেন কোনও স্থির তপোভূমি।
উচ্চ পর্বত একেবারে খাড়া তিনশত ফুট উচ্চ উন্নীয়া
গিয়াছে; পরস্পর সম্মুখীন দুই পর্বত ৭৩ অর্দ্ধবৃত্তাকারে
পৃথিবীর সমস্ত কোলাহলকে বেন অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।
রক্তপথে কেবল তক্ত সাধকেরই বেন প্রবেশ-বিহার।
শ্রোতবিনী পর্বতের উপর দিয়া আসিয়া ধারা দিয়া সেইখান
হইতে পড়িয়া প্রবাহিত হইতেছে। বনজাত সস্র পাদপ
ও লতাবিতানে বেগা এই প্রদেশটা ধ্যান ও উপাসনার জন্যই
বেন রচিত হইয়াছে। একটা কোমল বনজ গন্ধে বাতাস
ভরিয়া রহিয়াছে। কত ভক্তের ভক্তি-নিবেদন, কত
সাধকের প্রাণের আরাধন, কত পুণ্যময়ের আর্থনার লীলা-
ক্ষেত্র এই পুণ্যভূমি। কত শত শিরীর ভক্তি ও জ্ঞানের
শ্রেষ্ঠ উপচার মূর্ত হইয়া এই গিরিগুহা গুলির অভ্যন্তর
ভাগ চিজিত করিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? হার,
ভারতের যে শিল্পকলা তুঙ্গস্থান অধিকার
করিয়াছিল, তাহা বৃষ্টি তক্ত শিরীর একান্ত আশ্র-
নিবেদন, তাহাতে বৃষ্টি অহংকার নাম গন্ধও
ছিল না; তাই বৃষ্টি ব্রহ্মত্যা-প্রচার-মূর্ত শিরী

লোকচন্দ্র অন্তরালে এই পুত প্রবেশে আশ্রপোশন
করিয়াছিলেন।

কোন সুদূর অতীতে, খৃষ্টের আবির্ভাবের বহু-বহু
পূর্বে, মহত্ত্বাবাস সম্পর্কবিহীন গিরিকন্ডের এই নিম্নত
প্রদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত নৈসর্গিক গিরিগুহার
হরতো কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু সাধন ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন
করিয়া গিয়াছিলেন। হরিহারে গঙ্গা যেমন পর্বতের উপর
বিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রান্তর বিদীর্ণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে,
এখানেও অনেকটা সেইরূপ দেখা যায়। কন্ডের অভিন্ন
ভাগে সু-উচ্চ গিরিপ্রপাত; শ্রোতবিনী উচ্চ বনপ্রবেশ
হইতে বেগে আসিয়া প্রপাতে আহত হইয়া সপ্তবর্ণী
মত সপ্তধারার বিতক্ত হইয়া পতিত হইতেছে। এ বেন
দ্বিতীয় গঙ্গা, হিমালয়ে শব্বরের জটা উড়ির করিয়া উন্নীয়া
হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্রমে এই স্ববিকর ভিক্ষুগণের
মহিমা গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। অনুভূতি, শিকার
ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। কত ভক্তের দানে এই কঠিন
শৈলের কোলে কোলে কোলে চৈত্য ও বিহার পুঙ্খ
উঠিল।

চৈত্য ও বিহার সম্বন্ধে দুই একটা কথা এখানে বলা
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৌদ্ধদিগের ধর্মসম্বল ছিল,
এবং সেই সম্বল এতদূর সম্মানিত হইত যে, তাহা বুদ্ধ
ও ধর্ম, অপর দুই রত্নের (অথবা শরণ্যের) সহিত সমান
আসন অধিকার করিয়াছিল। ইহাদের ধর্মোচরণ ভ্রামণ
ও জৈনদিগের মত ব্যক্তিগত ছিল না; পরন্তু সাত্ত্বিক
(Congregational) ছিল; সকলে একসঙ্গে মিলিয়া
উপাসনা করিতেন। এই ধর্মসভারই (Assembly Hall
অথবা Chapter House) নাম হইতেছে—চৈত্য গৃহ।
আপনারা জানেন যে অনেক গৃহস্থ জিশরণগত হইয়া
বুদ্ধদেবের অলুপাসন মানিয়া চলিতেন—তাহাদিগকে 'উপাসক
বলা হইত। ইহার 'আগার' পরিচায়ক করিয়া 'অনাগারী'
হইতেন তাহাদিগকে ভিক্ষু বলা হইত।—ইহারা একেবারে
ধর্ম জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতেন। অতএব একই

১। Havell's Ancient and Mediaeval Architecture of India—পৃ: ১০১—১০২ প্রভৃতি।

উপাসনা গৃহে নিষিদ্ধ হইলেও উপাসক ও ভিক্ষুদের ভিতর বাতায়ন স্থচিত করিবার প্রয়োজন হওয়ার, চৈত্যাগৃহের নির্মাণ পদ্ধতির ইতরবিশেষ ঘটিয়াছিল। লব্ধা একটি হলবর করনা করন। ইহার একপ্রান্ত অর্ধবৃত্তাকার। ভিতরে তন্তের উপর ছায়া। তন্ত ও বহির্ভাগ ভিত্তিগোত্রের মধ্যে একটি পথ অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়া আসিয়াছে। ইহাকেই প্রাচীন পথ কহে—এই পথে উপাসক বাসাবর্তে প্রবেশ করিয়া ধর্মকথা শ্রবণ করে ও শ্রবণান্তর বাহির হইয়া যায়। ইহা তন্ত্রশ্রমীর অন্তর্ভুক্ত হইল ভিক্ষুগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। তাহাদের সম্মুখে 'চৈত্যা' (Shrine) থাকে। অতএব এই চৈত্যাগুলি হইতেছে সন্মের উপাসনা মন্দির। বিহার গুলিতে সন্ম-ভুক্ত ভক্তগণ বাস করিতেন।

এলোহা, অজন্তা, আকাই, মানিক এবং অজান্ত হলেও পাথর খুদিয়া গুহামন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহা জানি। এই সব মন্দির পর্বতগোত্রে খনিত করিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে হ্যাডেল বলেন যে—পাশ্চাত্যদের নিকট এই মন্দিরগুলি অদ্ভুত (grotesque) ঠেকিলেও, ভারতে ইহা স্ফুট করিত—ভোগীর বিলাসস্পৃহা, শিল্পীর তপস-কুশলতা, ব্যক্তি অথবা সন্মের বিশিষ্ট ভক্তিপ্রবণতা। গৃহনির্মাণকৌশল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পরও বধন গুহামন্দির নির্মাণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তখন তাহার কারণ দেশের আবহাওয়া ও ভূতত্ত্বের সহিত সম্পর্কিত। এ দেশের জোত্র এত তীব্র যে স্নাতাই স্নাত্ত্বের প্রাণ চায়—সূর্যের তীব্রতা ও উত্তাপ কমাতে। যদি আলো ও বাতাস প্রবেশের কোন অন্তরায় না থাকে তবে গুহামন্দিরগুলি একাধারে ছায়া ও সন্ন্যাসীদের পক্ষে আশ্রয় আশ্রয়। বর্ষার অনবরত ধারা নিবারণ অথবা প্রায়ের দেহবাহী উত্তাপ নিরোধ করিতে ইহা অবিচীর। ধর্মের কর্তার সাধনার দিকটাই যে এই আশ্রয় গিরিগুহা ও বিহার গুলিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে; —পরন্তু যে ভক্তি মানকে ভগবানের স্মরণে, তাহার প্রেত, প্রেত, পট্রিটকে—নিবেদন করিতে বলে, সেই ভক্তির

হীনবান পনের সৌখিন সয়ল, অনাঙ্কর, অলঙ্কার-বিহীন। সম্রাট অশোকের সূত্রার প্রায় এক শত বৎসর পরে বৌদ্ধগণ তাহাদের চৈত্যা গৃহ ও বিহারগুলির আলঙ্কারিক সৌষ্ঠব বর্ধন করিবার নিষিদ্ধ প্রাচীন বৈদিক বিধি অনুষ্ঠান প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পে নিরোচিত করিয়া ছিলেন—হ্যাডেল এই মত পোষণ করেন। ববে ও পুনার নিকট কাশির চৈত্যাগৃহ হীনবানদিগের স্থাপত্যবিভার চরম নিদর্শন। একটি প্রতিকৃতি দিলাম।

চৈত্যের প্রধান প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে যে খিলানযুক্ত বাতায়ন দৃষ্ট হয়, তাহাকে সূর্য-বাতায়ন (Sun window) কহে। ইহার অপর নাম পদ্ম-পত্র-খিলান (lotus leaf arch)। হ্যাডেল ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন—“বৈদিক ভোজগুলির কাব্যসৌন্দর্যের দ্বারা উদ্দীপিত যে প্রতীক এই বাতায়ন নির্মাণ শিল্পে নিরোচিত হইয়াছিল তাহা সূর্যের অথবা পদ্মের প্রতীক। ইহা অনন্ত নির্মল আকাশে ছুর চক্রবালে সমুদ্র, ছুর অথবা নদের উপরে সূর্যের উদয় অথবা অস্ত স্ফুট করিতেছে। ধর্মতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে ইহা ব্রহ্মা, বুদ্ধ, অথবা শিবের প্রতীক; এবং বধন সূর্যপুলা ক্রমে প্রবর্তিত হইল তখন ইহা আগনে উপবিষ্ট দেবতার তামগুল বলিয়া গৃহীত হইল। তন্মের চক্রে এই আকার পদ্মপত্রের বলিয়া মনে হইল। বুদ্ধদেব অশ্বখবৃক্ষের নিম্নে তাহার সাধনার কললাত করিয়াছিলেন; বৌদ্ধগণ তাহাতে অশ্বখপত্রের সাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

পূর্বে এই সূর্যবাতায়ন অলঙ্কারহীন ছিল। পরে —যেমন অজন্তার ও অজান্ত হানে—তাহাতে অলঙ্কার যুক্ত হইল। খিলানের বহির্ভাগের ইহা অস্ত মকরের মুখ হইতে নির্গত হইতেছে; এই মকরের দ্বারা স্ফুট-সমুদ্র স্ফুট হইতেছে—যে সমুদ্র হইতে প্রাতে সূর্যদেব উদিত হইয়া সন্ধ্যার পুনরায় নিমজ্জিত হন। বাতায়নের সূর্য-গাছ পৈশাচিক হস্ত করিতেছে—ইহা শিবের তামস ওপের প্রতীক। কখন কখন ইহার পরিবর্তে কেবল অলঙ্কারিত-ধর্মের মস্তক দৃষ্ট হয়।

কখন কখনও চৈত্যের ভিতরেই, কিন্তু সাধারণতঃ

চৈতন্য বাহিরে সংস্রব হইয়া তিন্মুখের আবাসগৃহ বিহার নিশ্চিত হইত। চৈতন্যের ভিতরে বিহার, চৈতন্যকে বেঠেন করিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষের সমষ্টি তিন্মুখ আর কল্পিত নহে। বিহার কখনও বিভল বিভল এমন কি সপ্ততল করিয়াও (তুলবিনয়—সত্যভূমক পাসাদো) নিশ্চিত হইত। সীম পরিব্রাজক নালন্দাস্থিত চারিতল বিহারের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অলঙ্কারে ওহা নং ৯, ১০, ১১ ও ২৬ হইতেছে চৈতন্য। বাকিগুলি বিহার। ৮ হইতে ১৩ নং পর্যন্ত ওহা হীনবান নিগের; এবং গ্রীঃ পৃঃ ২০০ হইতে পৃঃ ১৫০ : বৎসর অর্থাৎ সার্ব্ব তিনশত বৎসরের ভিতর এগুলি রচিত হইয়াছিল। বাকি ওহাগুলি মহাবান বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সম্পর্কিত। ৬ ও ৭ নং ওহার রচনা কাল পৃঃ ৪৫০ ও ৫৫০ এর অন্তর্ভুক্ত। ১৪ হইতে ২০, ২১ হইতে ২৯ এবং ১ হইতে ৫, ৫০০ ও ৬৪২ খৃষ্টাব্দের ভিতর নিশ্চিত হইয়াছিল।

হাতেলও বলেন যে, সর্ব্ব প্রথমে ১৩, ১২, ১১, এবং ৮ নং বিহার এবং পরে ৯ ও ১০ নং চৈতন্য নিশ্চিত হয়।

ইহাদের নির্মাণকাল খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দী। এই ওহাগুলির অক উত্তর এবং উত্তরপূর্ব্ব দিকে রহিয়াছে। এই বৌদ্ধ তিন্মুখণ আদি হীনবান সম্ভারভুক্ত, কঠোর মন্ত্রের সাধক, তাঁহার বুদ্ধদেবকে উদীয়মান সূর্য্যাহিসাবে পূজা না করিয়া তাঁহার পরিনির্বাণকে ধ্যেয় করিয়া লইয়াছিলেন, সেই পরিনির্বাণ রাজির আকাশের সূচক উত্তর দিকের সহিত সম্পর্কিত। তাঁহাদের কঠোর সাধনা চৈতন্যগৃহের অলঙ্কারবিহীন তত্ত্বগুলিতে দোষিত হইতেছে।

৯ ও ১০ নং ওহার চিত্রের সহিত সাক্ষির তোরণে উৎকীর্ণ তক্ষশিল্লের নাকি সম্পর্কে আছে। উত্তর আক্, নৃপতিগণের দ্বারা প্রতিপালিত শিল্পগণ কর্তৃক রচিত। বেশীর ভাগ চিত্র চালুক্য নৃপতিগণের আমলে রচিত হইয়াছিল। কতকগুলি বাক্যাতক নৃপতিগণের আমলের।

আগামী সংখ্যার আমরা চিত্রগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

(আগামী সংখ্যার সমাপ্য)

শ্রীকালীপদ মিত্র।

সত্যবান।

(উপভাস)

একাদশ পরিচ্ছেদ

নানা চিত্র।

বাহিরে বৃষ্টি ও ঝড় সমান বেগে চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মেঘের বিকট গর্জনও শোনা যাইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, ইহাই নিনার রজন্যকার্যের সময়—ওহাক্ষের একটি মাত্র দ্বার বন্ধ করিয়া, ভিতরে উন্মান ধরাগো চলে না, নিনা বরাবর বাহিরেই ঐ কাণটি সমাধা করিয়া থাকে। তাই সে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বলিল, “তাই ত! এ দুর্ঘোষণে রান্না বাটার কি উপায় করি? আমি বাড়ী ছিলাম না, আজ বিকালে তোমার

চা পর্যন্ত খাওয়া হয় নাই;—তোমার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে বোধ হয়? আমার ত পাইয়াছে।”

কিশোরী বলিল, “পাইলে আর উপায় কি? বৃষ্টি ধামুক, তার পর রান্না বাটার বোগাড় করিলেই হইবে। এখন হুইলনে গল্প করা বাক এস।”

নিনা বলিল, “খালি গেটে কি আর গল্প ভাল লাগে? ঠিক হইয়াছে। হাট হইতে কিছু কল কিনিয়া আনিয়াছি—তাংই কাটিয়া দিই তুমি খাও।”—বলিয়া নিনা উঠিয়া, কক্ষকোণে রক্ষিত তাহার সেই বাজারের কুড়িটি হইতে গোটাকতক আপেল ও ত্রাপপাতি বাহির

করিয়া আনিল। কিশোরী সেই তালা সরস কলগুলি হাতে করিয়া নাড়িয়া দেখিতে লাগিল—কলিকাতার পেশোয়ারি কলওয়ালার দোকানের দীর্ঘকাল পূর্বে আহরিত অর্দ্ধশতক কল নহে—সম্ভবতঃ সেই দিন প্রাতেই সেগুলি তাহাদের বৃক্ষজননীর বন্ধুত্ব হইয়াছে। প্রদীপের আলোকে একটি আপেলের রক্তিমচ্ছটার প্রতি প্রাশংসাপূর্ণ নৃষ্টিপাত করিয়া কিশোরী বলিল, “রঙটি কি সুন্দর! এমন সুন্দর জিনিষটি কাটিয়া খাইতে মারা হয়!”

নিনা একটি স্তাসপাতির ঘকে ছুরি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, “আচ্ছা, যে সুন্দর নয়, তার প্রতি তোমার কোনও মারা মরা হয় না, নয়?”

কিশোরী এ প্রশ্নের গুঢ় ইঙ্গিত বুঝিল। বলিল, “তা জানি না; কিন্তু জৈবর বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর জিনিষগুলিই আমার চোখের সামনে আনিয়া দেন।”—বলিয়া এমন ভাবে নিনার মুখ পানে সে চাহিল, বাহাতে সেই সুন্দর জিনিষগুলির মধ্যে সম্প্রতি কোনটি তাহার চোখের সামনে উপস্থিত সে বিষয়ে নিনার মনে কোনও সংশয় না থাকে।

কলতরুণ এবং এইরূপ কথোপকথনে কিয়ৎকণ অতিবাহিত হইবার পর, নিনা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, বৃষ্টির বেগ অনেকটা কম হইয়া গিয়াছে, বড় আর নাই, আকাশে মেঘের রঙও বিলক্ষণ ফিকা হইয়া আসিয়াছে, কিছুকণ মধ্যেই বৃষ্টি বড় হইবার সম্ভাবনা। হইলও তাহাই। নিনা তখন উজুন ধরাইয়া চারের ওস্ত গরম জল চড়াইয়া দিয়া, রন্ধনের উত্তোপে মনোনিবেশ করিল।

আহারাদি শেষ হইলে, স্নান প্রায় ১০টার সময়, কিশোরী নিনার নিকট বিদায় লইয়া, পার্শ্ববর্তী গুহা-কক্ষে শয়ন করিতে গেল। নিনা সে ঘরে গিয়া, বিছানা কখন ঠিক করিয়া দিয়া, কিশোরীর অস্ত্র পানীর জল, মালা আলিবার উপকরণ প্রভৃতি বখাছানে রাখিয়া দ্রুত কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দ্বারবন্ধ করিল।

কিশোরী শয়ন করিয়া অনেককণ পর্য্যন্ত ঘুমাতে পারিল না। নিদ্রের অর্দ্ধ-বৈজ্ঞানিক কথা এবং নিনার

কথা—পর্য্যায়ক্রমে এই দুইটি বিষয় তাবিতে লাগিল। প্রথমেই নিনার বিপুল ধনরত্নের কথা তাহার মনে হইল। উহা লাভ করিতে পারিলে, চিরজীবনের জন্য—এবং বংশাবলীক্রমেও—দারিদ্র্য মুক্তির দ্বার। এ কি সাধারণ প্রলোভন? এ প্রলোভনকে জয় করা কি সহজ কার্য? যে দিন কিশোরী নিনার গোপন ধনভাণ্ডার নন্দনগোষ্ঠের করিয়াছে, সেইদিন হইতেই এই প্রলোভন হৃদয়নীর হইয়া উঠিয়াছে। আর শুধুই কি নিনার ধনরত্ন? তাহার অকল্পিত সেবা বস্ত্র, তাহার তরুণ জন্মের অকপট ঐকান্তিক ভালবাসা—এ সকলের চিন্তাও ক্রমে তাহার মনে আধিপত্য বিস্তার করিল। সে মনে মনে বলিল, “আমি একদিন দেশে ছিলাম, —ইংরাজের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসী ছিলাম—সে সব কি সত্য, না স্বপ্ন? এ জন্মে? না, সে সব আমার বিগত জন্মের কথা? এখন মনে হয় আমি এই হিমালয় বক্ষেই জন্মিগছি ও মাতুষ হইয়াছি। অন্ততঃ ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে এই হিমালয় বক্ষেই আমরণ আমাকে কাটাইতে হইবে। সত্যবালাকে ভালবাসিয়া ছিলাম—তাহাকে বিবাহ করিব আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম—সে সবও যেন সেই পূর্বজন্মেরই কথা—এজন্মে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নহে। তবে আর কেন? পূর্বজন্মের সে স্মৃতি ধরিয়া থাকিলে আর কল কি? এজন্মে বাহা কণীর তাহাই করা ভাল। আমি নিরাশ্রয়—পাশে জঙ্গলেই অবশিষ্ট জীবন আমার কাটাইতে হইবে, কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিব তাহার কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাই না,—বোধ হয় জৈবর দয়া করিয়া, নিনাকেই আমার সহায় স্বরূপ আনিয়া দিয়াছেন। নিনা তার জন্ম মন দিগা আমার চাহিতেছে—আমিও তাহার সেবা বস্ত্রে, মুগ্ধ হইয়াছি—তবে আর কেন? আর বিধা করিয়া কল কি, নিনাকে বিবাহই করি।

অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রমে কিশোরীর মনে হইল, আমি যে নিনাকে বিবাহ করিবার অস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছি, আমি কি তাহাকে ভালবাসি? ভালবাসা যে কি পরার্থ, তাহার জ্ঞান এখন আর কিশোরীর “পুঁথিগত” মাত্র নহে—দার্জিলিঙে দুই মাসকাল সে আসল জিনিষটিরই

আবার লাভ করিবার সুযোগ পাইরাছিল। সেই অসুখের
সময়, নিজ বর্তমান মনোভাবের তুলনা করিয়া দেখিল,
ইহা অনেক ভুল—ইহা তুলনাই হয় না—একটি যেন
আকাশের চন্দ্র—অপরটি যেন মাটির প্রদীপ। এ অবস্থার
নানাকে বিবাহ করা তাহার উচিত কিনা, সে ভুলও
কিশোরীর মনে উঠিল। ইংরাজি ও বাংলা উপভাস
কিরা এ সম্বন্ধে যে ধারণা তাহার মনে স্থান লাভ
করিয়াছিল, বর্তমান অবস্থার তাহা বেশীকণ টিকিল না;
শাবলীক্রমে যে ধারণা রক্তের সঙ্গে নানিয়া আসিয়াছে,
হা তাহার অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া আছে—তাহাই কর-
ণা করিল। আগে প্রেম করিয়া পরে বিবাহ—এ ব্যবস্থা
যে আর এ দেশে ছিল? বিবাহের পর, একজ বসে,
পরল হৃদয় সুরচরিত্র নরনারীর মনে প্রেমসংকার স্বাভাবিক
নিরবের বর্ণেই হইয়া থাকে—অধিকাংশ স্থগেই তাহা হয়।
মল্লংগ বাহাদুরের হয় না, তাহার ব্যতিক্রম, এবং সম্প্রতীর
হর্ভাগাই উহার কারণ। কিশোরী মনে মনে বলিল, আমি
যদি নিজ সম্পদের লোভে রাজ উহাকে বিবাহ করিয়া,
ক্রমে কোশলে উহার বধাসর্ব্ব নিভারিত করিয়া গইরা,
উহার প্রতি স্বামীর কর্তব্যাপালন না করি, উহার সহিত
অসৎ ব্যবহার করি, তবে বটে আমি পাপে লিপ্ত হইব।
কিন্তু তাহা তো আমার উদ্দেশ্য নহে। না—না—আমার
মনের কোনও অঙ্গকার কোণেও সে ভাবের লেশমাত্র
নাই।

সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিশোরী স্থির করিল,
নিম্নকে বিবাহ করিয়া এই দেশে বসবাস করাই সুকিসমত।
এইরূপে মনস্থির হইলে, বধন সে সুখাইরা পড়িল,
তখন রাজি তৃতীয় প্রহরের মধ্যভাগ।

স্বাদশ পরিচ্ছেদ

কে তুমি?

পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, গভ্যবাসীর নিজস্বতা
বশতঃ, কিশোরী নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া সুখাইরা
পড়িয়াছিল।

“নালালা! নালালা!”

কবাটে মখন কমসন্ধ্যাক্ষণ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নিজার
কর্তব্যের কিশোরীর নিজাতক হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া
বসিয়া বলিল, “কে, নিম্ন?”

“যুম কি তোমার ভাবিবে না? বেলা পড়িয়া গেল
যে।”

“এই যে উঠি”—বলিয়া কিশোরী গাছোখান করিয়া
নিজ বস্ত্রাদি সংযত করিয়া লইল; তারপর ঘর ঘুরিয়া
দেখিল, সূর্য্যদেব পশ্চিম পশ্চমে একবারে চলিয়া
পড়িয়াছেন।

নিম্ন বলিল, “তুমি বাও, স্বর্ণার গিন্না হাত মুখ
সুইরা এস; আমার উত্তর ধরিয়াছে, এইবার চারের
জল চড়াইরা দিই?”

“নাও!”—বলিয়া কিশোরী ঘরে ঢুকিয়া তাহার
তোয়ালে প্রোত্ৰি বাহির করিয়া আসিল। নিম্ন নিজস্বতা
করিল, “কিভাবে বেশী দেয়ী হইবে না ত?”—“না,
দেয়ী হইবে না,” বলিয়া কিশোরী প্রস্থান করিল।

অনেকটা নানিয়া গেলে তবে পূর্ব্বকথিত বরণা পাওয়া
যায়। নানিতে নানিতে কিশোরী দেখিল, গভ্যবাসীর সেই
স্বর্ণকারীর দল, এখনও সেই স্থানেই রহিয়াছে।
লোকজন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রাতে এই
ছাউনি নিম্নও দেখিয়াছিল। কাহাদের ছাউনি, উদ্দেশ্যই
বা কি তাহা নিম্নও কিছু অনুমান করিতে পারে
নাই।

ক্রমে কিশোরী বধন বরণার পৌছিল, তখন
নিরন্তরিত্র হস্ত আর একটু স্পষ্ট হইল। উপর হইতে
মাজবুলিকে কুহুর বিভালের মত ছোট দেখাইতেছিল,
এখন ছাগল-ভেড়ার মত দেখাইতে লাগিল। তাহাদের
পানে চাহিতে চাহিতে কিশোরী হস্তসুখাদি ধৌত
করিতে লাগিল,—এবং ভাবিতে লাগিল, যদি উহার
ইংরাজ পুনিই হয়—আমার ধরিবার জন্যই আসিয়া থাকে,
তবে ত, উহার এ অকলে থাকা পর্যন্ত আমার যুব সাবধানে
থাকিতে হইবে। কিন্তু আমাকে উহার চিনিবে কি
করিয়া? তা, সে উপায় না করিয়াই কি উহার বাহির

হইয়াছে? সম্ভবতঃ মর্দুক তাহার বা ঘোষ সাহেবদের কোনও ভৃত্যকে, আবার সম্ভবতঃ করিবার অন্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে পাঠাইয়াছে।—কিশোরী তাড়াতাড়ি কান ধেব করিয়া গইরা, অনেক ছোট বালভীটি তরিয়া পর্ত্তারোহণ করিতে লাগিল।

কিরদূর উপরে উঠিয়া একটা বাকের নিকট পৌছিবার সময় দেখিতে পাইল, অন্ন কিছু উপরেই টাটুঘোড়ার পূর্বে একজন খেতকার পুরুষ, বীরে বীরে পর্ত্ত হইতে নামিতেছে। লোকটাকে দেখিবার সময় কিশোরীর আপাদ-বস্তক তরে শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল, যেখানে আমি থাকি, সেই দিক হইতেই ত নামিতেছে! এখন পালাই কোথায়? সুকাইবার হান ত কাছে কোথাও দেখিতেছি না। কিন্তু বুধা চেষ্টা। অব্যাহত কিশোরীকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, “হেয়ো লামা! দাঁড়াও দাঁড়াও।”

কিশোরীর বুকটি তরে গুরুগুরু করিয়া উঠিল—কিন্তু তখন আর না দাঁড়াইয়া উপায় নাই। স্তম্ভরূপে দাঁড়াইল।

সাহেব আরও কাছে আসিল, সম্ভবতঃ বহু সিকিরা তাহার কতকগুলো কি বলিল, কিশোরী তাহা বুঝিতে পারিল না। সে ইংরাজীতে বলিল,—“ও তাহা আমি বুঝি না।”—বলিয়াই তাহার মনে হইল, হি হি, এ কি করিলাম? ইংরাজি কেন বলিলাম? এ যে নিজের গলায় নিজেই কঁালি পরাইলাম।

অব্যাহত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর ইংরাজীতে বলিল, “বাই জোভ! এই দুই হিমালয়ে, একজন দেশী লোকের মুখে ইংরাজি ভাষা শুনিব, ইহা ত অপ্রত্যাশিত। তা, লামাজী। তুমি কি এ প্রদেশের লোক নও, সিকিরা তাহা বোঝ না? তুমি কোন্ দেশের লোক তবে?”

কিশোরী এ প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া বলিল, “আমি ভিক্টোরী তাহার কথা কহি।”

সাহেব আরও নিকটে আসিয়া বলিল, “ও, তবে তুমি ভিক্টোরের লোক? ভালই হইল। তোমার কাছে ভিক্টোরের অনেক খবর জানিতে পারিব।”

কিশোরী বিজ্ঞানিল, “কেজ, তুমি কি ভিক্টর বাজী? তোমার সঙ্গে আর কে আছে?”

সাহেব নিরবধি তুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, “ঐ দেখ, আমাদের ছাউনি। ওখানে আমাদের দলের সকলে আছে। আমরা তিনজন খেতকার পুরুষ—বাকী সকলে দেশীর লোক, মোতাবী, পদপ্রদর্শক, বাবুটি, কুলি প্রভৃতি।”

সাহেব তখন আরও নিকটে আসিয়া পৌছিরাহিল; কিশোরী বিজ্ঞানি করিল, “তোমাদের উদ্দেশ্য কি জানিতে পারি কি? তুমি কি সখের ভ্রমণ?”

সাহেব বলিল, “আমরা আমেরিকাবাসী,—ভৌগোলিক পরিদর্শনের সভ্য। আমরা ভৌগোলিক আবিষ্কার জন্য বাহির হইরাছি—ভিক্টর তেজ করিয়া আমরা চীনদেশে বাইব।”

এ কথা শুনিয়া কিশোরীর দেহে প্রাণ আসিল—চলিত কথার বলিতে গেলে, যার দিরা তাহার অর ছাড়িল।

“তোমার নাম কি?”

“নাকালাম।”

“আমার নাম জন রটেনহাম। আমি ফিলাডেলফিয়ার লোক। তুমি ভিক্টর, কিন্তু এমন ইংরাজি শিখিলে কেনন করিয়া?”

কিশোরী সংক্ষেপে উত্তর দিল, “আমি দার্জিলিঙে গিয়াছিলাম। তোমরা এখানে কতদিন থাকিব?”

“কাল সাগদিন আমরা আছি। পৰ্ব্ব প্রান্তরায়ের পর আমরা ঠাব তুলিব। নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতে কিছু খাদ্য জমা সংগ্রহ করা উদ্দেশ্য—তারবাহী মাল্লু ও পতঙ্গকে কিছু বিশ্রাম দেওয়াও উদ্দেশ্য বটে। এখান হইতে কিছু দূরে যে গ্রামখানি আছে, কি নাম তাহার, কাংগাচেন বুঝি? সেখানে খাদ্যজমা করিয়া পাওয়া বাইতে পারে অল্পসংখ্যক বস্ত্র আদি তথায় গিয়াছিলাম, এখন ছাউনিতে করিতেছি।”

বলিয়া সাহেব টাটু চালাইল। দুই চারি কদম গিয়া, আবার টাটু দাঁড় করাইয়া মুখ করিয়া বলিল, “তুমি এখানে

নাছেই কোথাও থাক বোধ হয়? কাল সকালে আমা-
র তাঁবুতে আসিগা তুমি যদি চা পান কর, তবে আমার
অত্যন্ত খুশী হইবে। আসিবে?”

কিশোরী বলিল, “চেষ্টা করিব—যতদূর।”

“আসিও। শুভ্ বাই।”—বলিয়া সাহেব ঘোড়া চালা-
ইয়া গেল।

কিশোরী ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত করিতে লাগিল।
সাহেব ক্রমে তাহার দৃষ্টপথের অতীত হইয়া গেল।
কিশোরী মনোমধ্যে নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে মঠে
আসিয়া উপস্থিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুখ খুলিল।

কিশোরী মঠে আসিয়া পৌছিতেই নিম্না বলিল,
“দেখ, এই কিছুক্ষণ পূর্বে একজন বেতকার পুরুষ, টাই
ঘোড়ার চড়িয়া ঐ দিকে গেল। নিম্নে ঐ যে তাঁবু
পড়িয়াছে, সে বোধ হয় ঐ তাঁবুরই লোক।”

কিশোরী জলের বালভী নামাইয়া রাখিয়া বলিল,
“হ্যাঁ, তাই বটে। তুমি বাহার কথা বলিতেছ, তাহার
সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সে কাংগাচেন গ্রামে
গিয়াছিল, সেখান হইতে ফিরিতেছে।”

নিম্না অত্যন্ত কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,
“কোথায় দেখা হইল? কি কথাবার্তা হইল? তুমি উহার
তাঁবা বুঝিতে পারিলে?”

কিশোরী তখন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ নিজের
কাছে প্রায় সমস্তই বলিল—কেবল প্রকাশ করিল না,
সাহেবকে দেখিয়া প্রথমটা তাহার মনে কি ভয় হইয়াছিল,
এবং কেন হইয়াছিল।

নিম্না পেরালার চাঁচালিয়া বলিল, “ঐক্লম শালা মাহু
আমাদের এ দিকে মাঝে মাঝে আসে বটে আমি শুনিয়াছি,
কিন্তু পূর্বে কখনও দেখি নাই। উঃ—কি শালা! মাপো!
দেখিলে ভয় করে। তাহার কি চরিত্রের লোক

তাঁহাই বা কে জানে! তুমি কি বীর করিলে? কাল
উহাদের তাঁবুতে বাইবে নাকি?”

কিশোরী বলিল, “বাইবার ইচ্ছাই ত আছে।”

নিম্না বলিল, “তোমার এই দুর্বল শরীর, অত পর
নাশিয়া আবার উঠিয়া আসিতে তোমার বড় কষ্ট
হইবে যে!”

কিশোরী কিছু বলিল না—দীরবে চা পান করিতে
লাগিল। বাগরা সবচে তাহার মনেও একটা আশঙ্কা
উপস্থিত হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, সাহেব যাহা বলিল, সে
কথা যদি সত্য না হয়—উহার যদি ভৌগোলিক আবিষ্কারক
না হয়—যদি ইংরাজ পুলিশই হয়—আমাকে ধরিবার এই
কৌশল যদি অবলম্বন করিয়া থাকে—তাঁবুতে গিয়া যদি
দেখি যে মল্লিকের অথবা ঘোষ সাহেবের একজন কৃত্য
উপস্থিত আছে—সে যদি বলে, এই ব্যক্তিই আসামী,
ইহাকে আমি চিনি। তখন কি হইবে?

চা পান শেষ হইলে নিম্না বলিল, “তুমি বল। আমি
করণীয় গিয়া মুখহাত মুইয়া আসি।” বলিয়া সে তাহার
বস্ত্রাদি ও জলের বড়াটি বাহির করিয়া আনিল।

কিশোরী হাসিয়া বলিল, “নিম্না, ঐদিকে বাইতেছ,
ঐ ছাটনির সাহেবেরা যদি তোমার একা পাইয়া ধরিয়া
লইয়া যায়?”

নিম্না দাঁড়াইল। বলিল, “ঠিক বলিয়াছ। আমি তবে
অন্ত লইয়া আসি।”—বলিয়া সে আবার ঘরে গিয়া এক
খানি বৃহৎ চক্চকে ছোরা বাহির করিয়া আনিয়া, তাহা
আন্দোলিত করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে বলিল,
“আমার এই ছোরা, শালা মাহুদের রক্তের আবাদন কখনও
পার নাই। উহার যদি আমার ধরিতে আসে, তবে সে
আবাদন পাইতে পারিবে।”—বলিয়া ছোরাখানি কটিবন্ধে
সংলগ্ন করিয়া বড়াটি লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

কিশোরী বসিয়া বসিয়া কেবলই সেই ভাব-বিহারীদের
কথা চিন্তা করিতে লাগিল। বাস্তবিকই যদি উহার
ভৌগোলিক আবিষ্কারক হয়, তবে উহার কিশোরীর মন
থানেক পরে দার্জিলিং ছাড়িয়াছে। উহাদের নিকট
সেই সময়কার, কলিকাতা ও দার্জিলিং প্রকাশিত কতক-

ভূমি সংবাদ পত্র খাঁকা খুব সম্ভব। সেই কাগজগুলিতে হরত বা সেই খুন ও তাহার ভাব্যক সম্বন্ধে কোনও খবর পাওয়া বাইতে পারে। তাহা দেখিবার জন্য কিশোরীর মনটা খুঁজি চকম ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু, মন্দের বিধাও ঘুচে না। উহার ইংরাজ পুলিশ হইবে ইহা কি সম্ভব? ইংরাজ ও আমেরিকা বাসীর উচ্চারণ ও বচনভঙ্গির পার্থক্য বিষয়ে কিশোরী কিছুই জানিত না—সুতরাং শৈথিল্য দিয়া সে কোনও সাহায্য পাইল না। তবে তাহার মনে হইল, তাহার ভ্রাতা সানাত সত্যিকার ধরিবার জন্য ব্যর্থ হইলে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট যে এত টাকা খরচ করিয়া এতদূরে পুলিশ অভিযান পাঠাইবে, ইহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

মিনা বলিলে হইতে কিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অতদিন যেমন তাহার হানিধুরী ভাবটা থাকে, আজ আর তাহা নাই—আজ তাহার সুখখানি গভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। কিশোরীও আজ অন্তরঙ্গ—তাহারও চিত্তচাক্ষুণ্য তাহার মুখে স্পষ্টভাবে প্রতিকলিত।

আম শুভ্রা দাবনী—পাঁহাড়ের অন্তরাল হইতে চন্দ্রোদয় হইল। পার্শ্বত্যাগ প্রদেশ বিমল জ্যোৎস্নায় যেন হাসিয়া উঠিল। কিশোরী বলিল, “চল মিনা, বাহিরে গিয়া আমরা একটু বসি।”

উভয়ে গিয়া এক প্রান্তর খণ্ডের উপর পাশাপাশি বসিল। দুই চারি কথার পর কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল “মিনা, আজ তুমি এমন গভীর কেন? তোমার কি হইয়াছে?”

মিনা বলিল, “তোমারই বা সুখ এতখানি গভীর কেন?”

ইহার উত্তর দেওয়া কিশোরীর পক্ষে কঠিন। এ পর্য্যন্ত কোনও কথা মিনাকে ত জানিয়া বলা হয় নাই—এখন কি তাহা বলা যায়? পাছে উহার ইংরাজ পুলিশ হয়, আমাকে ধরিতে আসিয়া থাকে, বলিলে আমূল স্তম্ভভ্রম হইবে বলিতে হয়,—সত্যবাণীর কথা বলিতে হয়। কিন্তু সত্যবাণীর সমস্ত বিবরণ জানিলে, মিনা যদি বলে, “তবে আর তোমার আমি চাই না—তুমি যেখানে ইচ্ছা বাইতে

পার”—তখন কি হইবে? এই স্তূর হিমালয় বক্ষে, অনাহারে অনাপ্রস্নেহে ত প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অতএব কিশোরী স্থির করিল, মিনাকে সে কথা খুলিয়া বলা সুক্টিসমত নহে। অথচ একটা কিছু উত্তর দিতে হইবে; তাই সে বলিল, “কিন্তু তুমি আজ এমন গভীর কেন তাহা ত বলিলে না?”

মিনা বলিল, “তুমি উহাদের তাঁবুতে বাইবে তনিরা অবধি আমার মনটা কেমন খাড়াই হইয়া গিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, ওখানে গেলে তুমি আর কিরিয়া আসিবে না, উহাদের সঙ্গে জুটরা, চলিয়া বাইবে।”

কিশোরী বলিল, “চলিয়া বাইবে কেন?”

“উহাদের সঙ্গে জুটিলে, তুমি অনারাগে কত দেশ দেখিতে পাইবে। উহার ইংরাজ সরকারের পাশ লইয়া আসিয়াছে, কেহই উহাদের আটকাইতে পারিবে না—যে দেশে বাইবে সে দেশের রাজাই উহাদিগকে খাতির করিবে, কোনও বিষয়ে কোন অসুবিধা হইবে না—এই প্রলোভনে যদি তুমি উহাদের সঙ্গী হও? তখন আমি কি করিব বল? আর ত আমি তোমার দেখিতে পাইব না।”—বলিতে বলিতে মিনার চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার সে বর বর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ইহা দেখিয়া কিশোরী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। মিনার একখানি হাত নিজ হুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, “ছি ছি মিনা, তুমি কি পাগল হইলে? তুমি কাঁদ কেন? আমি তোমার ছাড়াই চলিয়া বাইব? না—না, তাহা কখনই বাইব না।”

মিনা মুখ তুলিয়া তারি গলায় বলিল, “এ কথা কি সত্য বলিতেছ? তুমি কোনও দিন আমার ছাড়াই বাইবে না?”

“হাঁ মিনা, আমি সত্যই বলিতেছি—আমি কোনও দিন তোমার ছাড়িব না, যদি—যদি—চিরদিন তোমার নিকট থাকিবার অধিকার আমি পাই।”

শেষের কথাগুলি মিনা ভাল বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সে কি? কোন অধিকারের কথা তুমি বলিতেছ? কে তোমার সে অধিকার দিবে?”

কিশোরী বলিল, “অধিকার বুঝিতে পারিলে না নিনা? হুঁমি যদি আমার বিবাহ করিতে—আমার ধর্ম—তুই হইতে—স্বত্ব হও, তবুই ত চিরদিন আমার হইতেনে একজ পাকিতে পারি। নচেৎ, কেমন করিয়া থাকিব?”

নিনা বলিল, “ওঃ, বিবাহের কথা বলিতেছ? তা, আমি ক কোনও দিন বলিয়াছি যে তোমার বিবাহ করিব না?”

কিশোরী নিনার এই সরল প্রত্যুত্তরে মুগ্ধ হইয়া, হঠাৎ তাহাকে বকে বাধিয়া বলিল, “তবে তুমি আমার বিবাহ করিবে? তুমি আমার হইবে নিনা?”

“আমি ত তোমারই আছি।”—বলিয়া নিনা কিশোরীর হৃদে মুখ লুকাইল।

কিশোরী নিনার মুখখানি তুলিয়া ধরিল। জ্যোৎস্না-লাকে দেখিল, তাহার চক্ষু দুইটি মুগ্ধিত। “চোখ জিয়া আছে কেন? চোখ খোল—চোখ খোল”—বলিতে লিতে কিশোরী তাহার ওষ্ঠে ও উত্তর গণ্ডে বারবার চুষন করিতে লাগিল।

বাদ্যীয় চন্দ্র তখন আকাশের বেশ উজ্জ্বলানে আয়ো-ণে করিয়া পূর্বতের শিখরে শিখরে আলোক বর্ষণ করি-তছে। নিনা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলিয়া, নড়িয়া চড়িয়া সাজা হইয়া বলিল—তথাপি উত্তরের কর-সন্নিগনের বচ্ছন্ন ষাটঃ না।

কিশোরী বলিল, “আমাদের বিবাহে, এ বেশের ধর্ম পাত্রদের কোনও আপত্তি হইবে না ত নিনা?”

নিনা বলিল, “না, আপত্তি হইবে কেন? বুদ্ধদেবকে হুঁমি ত মান?”

“মানি বৈকি। হিন্দুশাস্ত্র অঙ্গুণ্যে তাহাকে ঈশ্বরের একজন অবতার বলিয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি।”

নিনা কিশোরীর হৃদে হস্তার্পণ করিয়া, মুখখানি তুলিয়া বলিল, “সে সমস্তই ঠিক হইয়া বাইবে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা, কতদিন হইতে তোমার মনে জন্মিয়াছে বল দেখি?”

কিশোরী বলিল, “আমার অঙ্গুণ্যের পর হইতে। আর, তোমার?”

“আমার ইচ্ছা হইয়াছে—তোমার অঙ্গুণ্যের সমর

হইতেই। আরের ঘোরে তুমি প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতে; আমি তোমার কাছে বলিয়া তোমার রাখিয়া, পায়ে হাত বুলাইতাম, সে সময় হইতেই আমার মনে মনে সাধ যে তুমিই আমার স্বামী হও।”

“ভাগিনা, নিনা, আমার পীড়া হইয়াছিল।”—বলিয়া কিশোরী, নিনাকে বকে জড়াইয়া তাহার মুখচুষন করিল।

নিনা নিজেকে জড়াইয়া লইয়া বলিল, “চল, ঠাণ্ডা পড়িতেছে—ঘরে গিয়া বস। বাবা।”

“চল”—বলিয়া কিশোরী উঠিল। ওহাৎকেনে প্রবেশের সময় উত্তরেই দেখিতে পাইল, উপরের রাতা হইতে কে একজন লোক, মঠের দিকে নামিয়া আসিতেছে। দেখিয়া হজনেই ঝাঁড়াইল। লোকটা মঠের দিকেই আসিতেছে। নিকটে আসিতেই চেনা খেল সে ছুরটিং।

কিশোরী বলিল, “কি ছুরটিং—এত দেয়ী?”

ছুরটিং বলিল, “সর্বনাশ হইয়াছে নান্দা-নান্দা। ঘোড়া কিনিবার জন্য যে টাকাগুলি লইয়া গিয়াছিলাম, সাইবা ভাগাচুরি করিয়া লইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।”

কিশোরী ও নিনার প্রায়ের উত্তরে ছুরটিং ক্রমে ক্রমে সব কথাই বলিল। বেদিন সেই প্রাণে পৌঁছে, সেদিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। পরদিন অনেকগুলি ঘোড়া দেখা হইল, কিন্তু কোনটিই পছন্দ হইল না। লোকে বলিল, দিন দুই অপেক্ষা করিতে পারিলে, গ্রামান্তর হইতে ভাল ভাল ঘোড়া বিক্রয়ার্থ আসিবে। পরদিন সন্ধ্যার ছুরটিং হুর্কুছি-বশতঃ একটু অতিরিক্ত মজার চ্যাং পান করিয়া, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। প্রাতে নিদ্রাতক্কে দেখে, তাহার কোষের টাকার বলিও নাই, সাইবাও অদৃশ্য। দুই দিন ধরিয়া অনেক অঙ্গুণ্যলোকে তাহাকে না পাইয়া, অবশেষে কিরিয়া আসিয়াছে।

নিনা বলিল, “নাহা, বাবা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন তুমি বিজ্ঞান কর।”—বলিয়া সে রন্ধনের আয়োজনে ব্যাপৃত হইল।

ক্রমঃ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

হাস

হাসি ! তোমার শুভ্রবুকে অপরাধের বাস,
 বর্গলোকের তুমি,
 সোণার কাঠি ধরার তুমি, আনলে আলোর হাস।
 আগলো মর্ত্য তুমি ।

এলে তুমি, আগলো আলো অসীমকালের বুকে,
 সূর্য্যভারার দলে
 ছড়িয়ে গেল আলোর বানী ; শিশুর কচিবুখে
 আলোর ধারা চলে ।
 শুভ্র তোমার পরশখানি, নীল আকাশের গরে
 জ্যোৎস্না বসনখানি
 ছড়িয়ে দিল ; কুলের দলে বিলে কোমল করে
 রঙিন রেখা টানি ।
 মোহন শুভ্র তুলির রেখা সাদাগগনগটে
 আঁকলো সোণার ছবি ;
 তোমার আলো পূব সাগরের ধূসর উষার ওটে
 ছড়িয়ে দিল রবি ।
 তরুণীদের কালো চোখের কাল-ভরা দিটি
 তোমার পরশ পেয়ে;

উঠলো অলে ; সাক্ষ্য-ভারা হাসল মিটি মিটি
 তোমার পানে চেয়ে ।
 তুমি বেখার আসনখানি পাত নাই গো রাশি ।
 সেখার অঙ্ককার,
 অশানখাতে মনোমোহন করছে কাণাকাণি,
 উঠছে হাহাকার ;
 তোমার বানী নাইগো বেধা, সেখার অশখনাখে
 পেচক কেঁদে মরে ;—
 পোড়ো বাড়ীর ভাঙা প্রাচীর-বাতাস তারই কাঁকে
 কাঁদে হাহা মরে ।
 তুমি বেখার নাইগো, সেখা পুকুর পাড়ের বনে
 কাঁদে শিবির দল ;
 বাঠের মাঝে শকুন সেখা পথের কুকুর সনে
 বাধায় কোলাহল ।

অন্ধকার প্রবীর কালো পাবাণ হিরার মত
 হাতধীরের মূখ ;
 পরভানেরই লীলা সেখার চলছে অবিরত
 —মরক তাহার বুক ।

ঐবিক্রমলাল চট্টোপাধ্যায় ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

রাণাকুন্ত

ঐতিহাসিক নাটক। ঐশ্বর্য ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা কিনিং প্রিটিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ১৯১০, আনবার্ণ' স্ট্রীট হইতে ঐশ্বর্য মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেমি ১৫৪ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ১০।

নাটক হিসাবে মন্দ হয় নাই, তবে ঐতিহাসিক নাটকের ঘটনা গ্রহণ ও রচনা প্রাণী হিসাবে খুব ভাল বলিতে পারি না; আরও কিছুদিন সাধনার পর দেখিরা তুমিরা লিখিলে নাটকখানি হয়ত বেশ ভাল হইত। পাদ-পাঞ্জীর সংখ্যা নাটকে যথেষ্ট আছে, কিন্তু এই অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে কুটরাহে অল্প। মানুষ না, রাণাকুন্ত, বীরাবাই ও রমাবাই ছাড়া উল্লেখ যোগ্য চরিত্র খুঁজিরা পাইলাম না। বিজলী চরিত্র নিতান্ত অস্বাভাবিক হইরাছে। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য, নাটকীয় দৃশ্য হিসাবে হয়ত খুব অঁকাল মনে করিরাই লেখক এক মতপক্ষে শব্দেবের পাশে দাঁড় করাইরা তাহার দ্বারা একজন কণ্ঠিতা স্ত্রী যুবতীর মুখ চুপন করাইরাছেন। দৃশ্যটি নিতান্ত অস্বাভাবিক ও বীজবৎ। চতুর্থ অঙ্ক বর্ষ দৃশ্যের নীলসিংহের বিজলীকে চুপন দৃশ্যও অস্বাভাবিক। নাটকান্তর্গত গানগুলিরও প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

মা—কাব্য

ঐশ্বর্য অমলিন্দোরন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। হিন্দুস্থান প্রেসে প্রিন্ট লিথো মোহন ওপ্ট দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৪৩ পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধা, মূল্য ১০।

উজ্জ্বলময় কাব্য, পাঠে আনন্দিত হইরাছি। প্রথম কবিতা—

যুগান্তে ছিল সাধ সুমিরে গেল তাই,
যুগেছে রোগ শোক আর ত বাধা নাই।

শান্ত অমলির বসে রেখে পা,

মৃত্যু কোল আঁধার সুমিরে পল না।

—মহেশ্বরী।

গৃহবৈভ

চিকিৎসা পুস্তক। ১৯১৩ ও, হারিসন রোড হইতে এস, রায় এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেমি, ৪২ পৃষ্ঠা মূল্য ৬/০।

লেখক আমাশয় ও ওলাউঠা রোগ বিবরণ ও তাহার প্রতিবেদক ঔষধের বর্ণনা সহজ ও সরল ভাষায় করিয়াছেন। পল্লীবাসী গৃহস্থের ঘরে একখণ্ড এই বই থাকিলে, সময়ে অনেক কাঁপে লাগিবে।

অর্থ সমস্তা ও সমবায়

বণ্ডুয়া রায় প্রেসে মুদ্রিত। ১৫ পৃষ্ঠা মূল্য—৬/০।

অর্থ সমস্তা সাধনের কোন বিশেষ উপায় বা ইন্ডিক্ট ইহাতে দেখিতে পাইলাম না। বইখানি আরও বৃদ্ধ করিরা বিস্তৃত ভাবে লিখিলে ভাল হইত।

মনুস্মৃতি লাভ

ঐশ্বর্যজ্যোতী প্রণীত ও হিমাইতপুর-পাখনা শান্ত সৎসার কার্যালয় হইতে অধ্যাপক ঐশ্বর্যকামিনী নিজ কর্তৃক প্রকাশিত। হিমাইতপুর-সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। ছোট আকারের ২৫২ পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধা মূল্য—১১/০।

পুস্তক খানিতে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রবন্ধাবলী সংগৃহীত হইরাছে। মানব জীবনের লক্ষ্য, কর্ম ও কর্তব্য কি, প্রেতের সর্বজন্মে তাহা স্বরূপী তাহার আলোচিত হইরাছে, স্মরণীয় ব্যক্তিগণের জীবনের আদর্শের সঙ্গে মানুষকে মহত্ত্ব লাভের জন্য আকৃষ্ট করা হইরাছে। সকল প্রবন্ধই সুশিক্ষিত, সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। পুস্তকখানি পাঠে আবরণ আনন্দিত হইরাছি। শান্তিকামী, কল্যাণকামী ব্যক্তি যাহেই এই পুস্তক পাঠে আনন্দিত হইবেন।

ধর্ম

ঐশ্বর্যকামিনী চট্টোপাধ্যায়-বিভার প্রণীত ও কলকাতা নার্সিং, আর্থ পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা মেট্রিক্যাল প্রেসে মুদ্রিত। ১৬ পেজী-৩০ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ৮০

এখানি ধর্ম-সম্পর্কিত প্রবন্ধ-সমষ্টি। মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য কী, প্রাণীতে সম্পাদিত হওয়া উচিত, ভারতীয় ধর্মের আদর্শ, আশ্রম-ব্রহ্মচর্য, প্রকৃতির বর্ণনামূলক সমালোচনা সরল ভাষায় করা হয়েছে। ধর্মগ্রাণ ব্যক্তি যাকেই পাঠে তৃপ্ত হইবে।

সালোমন

অনুবাদক-জি.মেলেশনাব বিসি বি, এল। প্রকাশক বি বুক কোম্পানী, ৪৪ এ কলেজ রোড। কলিকাতা সৌরভ প্রেসে মুদ্রিত। ১৭ পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধা, মূল্য লেখা নাই।

অন্ধার ওয়াইল্ডের নাটক সালোমনের অনুবাদ। অনুবাদ, স্তম্ভায় পুস্তক সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা হয়নি। তবে এটুকু বলিতে কতি নাই যে, বইখানি বাংলা পাঠক সমাজকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দান করিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

স্বরাজ্যের পথে

শ্রীযুক্ত মলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। ২২নং ছবিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা প্রেসে মুদ্রিত ও প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, চম্পননগর হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ১১৫ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য লেখা নাই।

পুস্তক খানিতে ১০টি প্রবন্ধ আছে, সব প্রবন্ধই অতিরিক্ত, কিন্তু সব বিষয়ে লেখকের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না।

স্বরাজ্যের পোড়ার মেরা দিতে দিতে অনেকে যে সব বড় বড় কথা বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই বাস্তবহীন কথা। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক স্বরাজ্যের ইতিহাস জামিয়ার অন্তর্ভুক্ত প্যাঁটা রোম প্রকৃতির

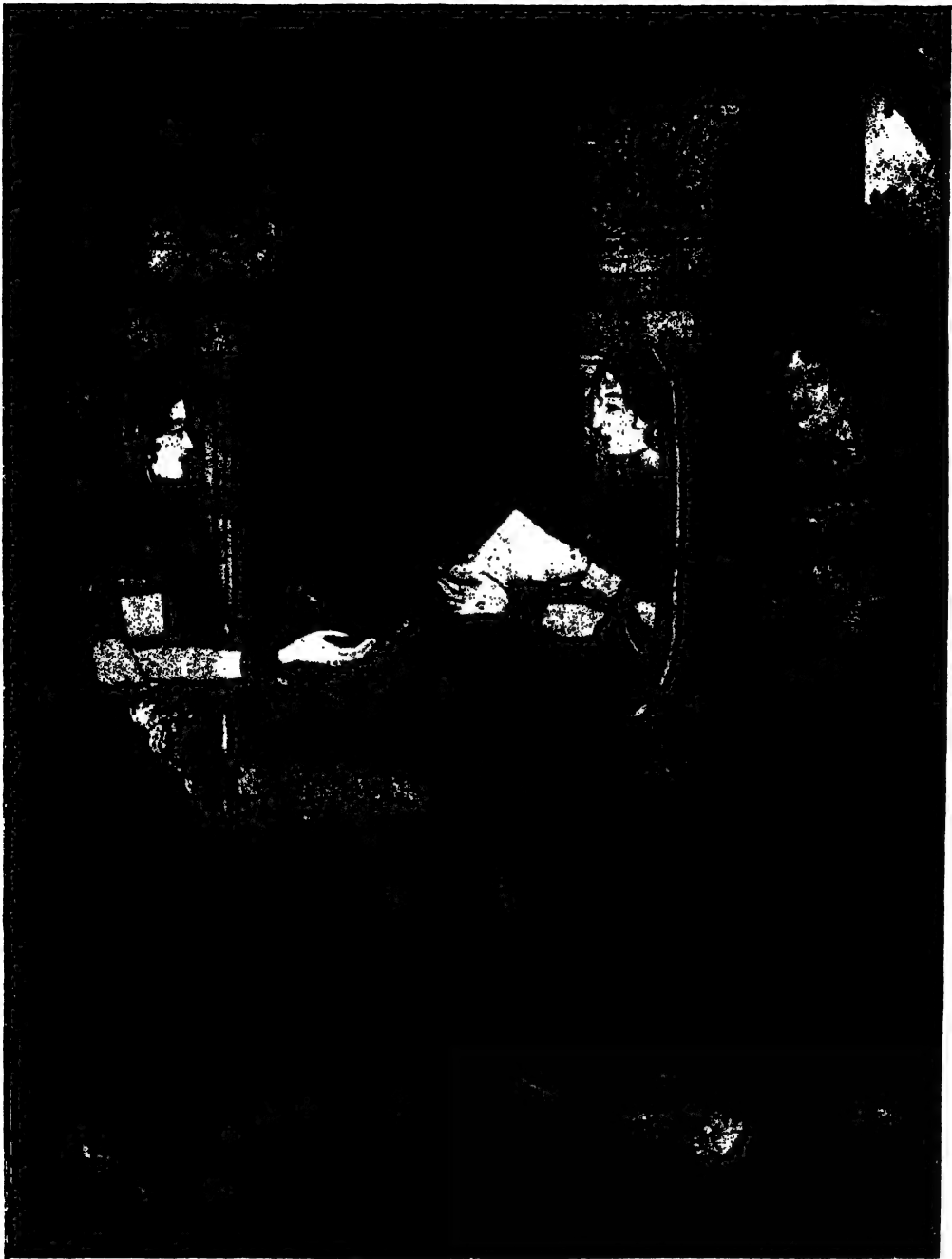
ইতিহাস চর্চা খুবই করিয়াছেন, কিন্তু যার কথা ভারতের ইতিহাস চর্চার সময় তিনি পান নাই, কারণ ভারতের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এক ভানে লেখক বলিয়াছেন, “জীও আগুন সত্যকে বজার রাখুক নিজের নিজস্বকে ফুটাইয়া তুলুক।” সে কেমন করিয়া? যে দেশের বালিকাতন্ত্রের মত সীতায় মত সত্য হই, পৃথিবীর মত বৈরাণীনা হইবার অন্ত যে দেশের ছোট ছোট মেয়েরা প্রার্থনা করে, যে দেশের মেয়েদের জৌপনীর মত “রাধুনী” হইবার কামনা, “রাধের মত পতি” পাইতে বাহারা উৎসুক, তাহাদের কর্মস্বপ্ন ও চরিত্র গঠনের জন্য কোন আদর্শ লেখক দেখাইতে চান? মিস্ নাইটিঙ্গেল, মেরি কার্পেন্টার, মিসেস প্যাথার্টের আদর্শে, তাহারা নিজেকে ফুটাইয়া তুলিবে, না,—মূলতা, গার্গী, বৈজয়ন্তী, অপলা, অদিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে? ২৮ পৃষ্ঠার লেখক বলিয়াছেন,—“ভারতবর্ষ আজ আর রোগী নয়,” কিন্তু আমরা যখন চারিদিকে চাফিয়া দেখি,—ভোগ আমাদের কোথায়, দুঃখ কিসের, দৈত্য কতখানি; তখন তরে শিহরিয়া উঠি। সুখসিপাগার মৃতকর, ককাল-সার অগণ্য নরনারী দৈত্যের ডাঙনার জাহি জাহি করিতেছে, তবু কি আমরা নীরোগ? লেখক কেপলার সেক্সগীর হোমর আলোচনা করিয়াছেন, কালিদাস পাঠান্তে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার চিত্তা-শক্তির দৈন্য এইখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভারতীয় আদর্শের তুলনার জন্য এই প্রেমীর লেখকেরা কথার কথার ইউরোপ আমেরিকার ছোট্টন, আদর্শ মানব দেখানরা দরিদ্র দেশবাসীকে বিদ্রোহিত করিবার জন্য সেক্সগীর, ইবসেন, সেনী, কার্লস্ট্রোমের টানিয়া আনেন,—ইহারা যে প্রেট মনীষী একথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের আদর্শ কি কিছুই নাই?

“কান্তি”।

কলিকাতা

১৬।১এ বিত্তম স্ট্রীট মানসী প্রেস হইতে শ্রীমতলতপ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



মন্দির-পথে

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ }
১ম খণ্ড }

আষাঢ়, ১৩৩১

{ ১ম খণ্ড
{ ৫ম সংখ্যা

আন্তোভ মূখোপাধ্যায়ের অকাল মরণে

দিবা দ্বিপ্রহরের দীপ্ত কিরণে নিশ্চল নীল নভস্তল উদ্ভাসিত, নিগন্তের শেষ সীমারেখার সন্নিকটেও বিন্দু-মেষর ক্ষীণ সন্দেশ পর্য্যন্ত নাই, এমন সময়ে গগন-বন্ধ বিদীর্ণ করিয়া ভীমদাক্ষী বজ্র যদি কোনও মানুষের মাথার উপরে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে, কি হইল, কেমন করিয়া হইল, বুঝিবার পূর্বেই সে মানুষের যেমন মুহূর্ত্তে সমস্ত শেষ হইয়া যায়, সমগ্র বাঙ্গলার আজ সেই অবস্থা। বাঙ্গলার বুকভরা ধন, বাঙ্গালীর মাথার মণি, স্নহকার সবলেন্দ্রিয় আন্তোভ মহাকালের ঝড়িতালানে নিমেষেই উর্দ্ধলোকে প্রাণ করিয়াছেন, বিনা মেঘে এই বজ্রাঘাতে বাঙ্গলার আজ সব শেষ হইয়া গিয়াছে, কি হইল, কেমন করিয়া হইল, বুঝিবার সময় টুকুও বাঙ্গালী পায় নাই! বিধাতা এমন কঠিন বজ্র কি আর কখনও কাহারও বৃকে হানিয়াছেন? আমাদের বাহা কিছু ছিল ধীরে ধীরে সন্ত হারাইয়া আমরা আজ নিঃশ, কাঙ্গাল হইয়াছি। সেই কাঙ্গালের কুটীরে সাত রাজার

ধন একটি মণিকই ছিল; আজ, কাল আসিয়া অতর্কিত ভাবে সেই অমূল্য নিধি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এ ছাড়া রাখিবার স্থান নাই। বাঙ্গলার আন্তোভ, ভারতের আন্তোভ আর নাই—এ ‘নাই’ বেকি ‘নাই’ তাহা বলিবার ভাষা নাই; চন্দন-চিতার উপরে বাঙ্গালীর সর্ব্ব্ব সেদিন দগ্ধ হইয়া গেল। চিতা নির্কাপিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর বৃকের চিতানল কে নিবাইবে, কবে নিবাইবে? কখনও কি নিবাবে?

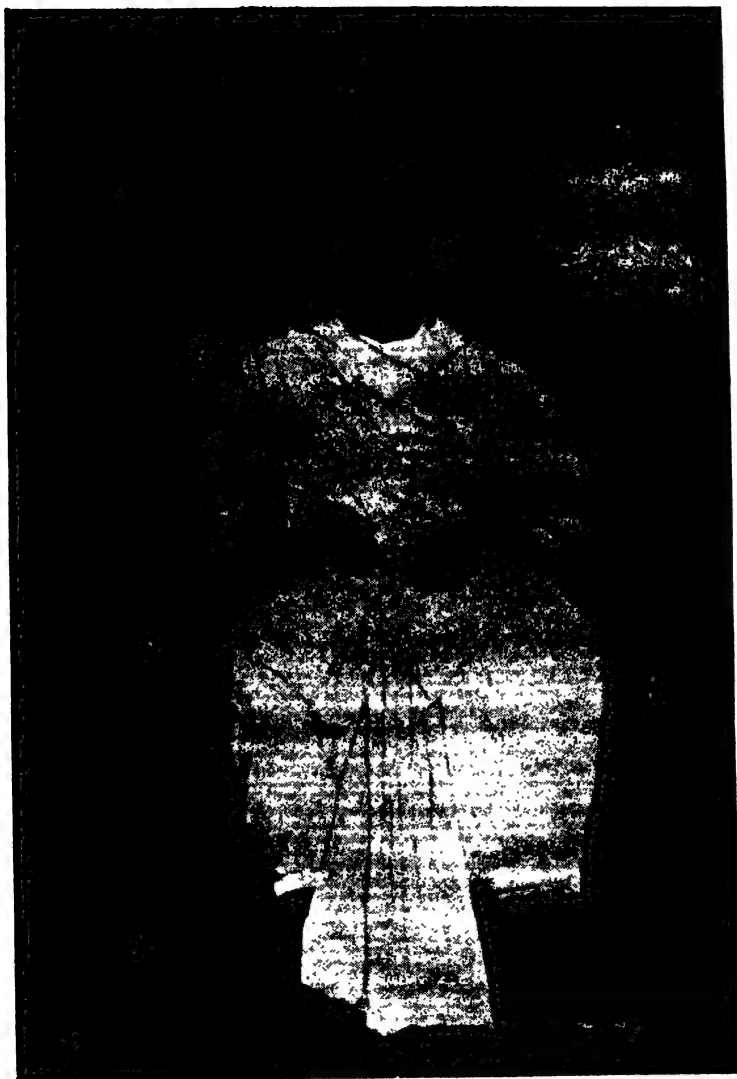
জীবলোকে জন্ম জীবন, জয়া মরণ, আবির্ভাব তিরোভাব—তিরতন নিয়ম; রাশিভাষ্যের প্রাসাদ প্রাঙ্গণ হইতে তিথারীর উটল সংলগ্ন তৃণাতীর্ণ তৃণও পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই জন্মজনিত আনন্দরোগ এবং বিষোগের হাহাকার নিত্য ঘটনা। হাত ও যোজন দৈন্দিন ব্যাপার। কিন্তু যে চলিয়া গেলে দেশের সকলের সব ফুরাইয়া যায়, তাহার বাওয়া কি সাংঘাতিক ব্যাপার তাহা সেই হতভাগ্যেরাই জানে, বাহাদের বন্ধ পঙ্কর

বিদীর্ণ করিয়া দিয়া, দেশজননীর ক্রোড় স্পৃহ করিয়া সেই সারাংশার, বৈতহীন, লোকোত্তর মাহুটি চলিয়া গিয়াছে। আবার সে বাওয়া কি আকস্মিক, কি জগদবিদারী! যখন আজন্ম কর্মবীর হুহ সবল বেহে বোগিননোচিত একাগ্রতার সহিত কর্মের মধ্যে আকর্ষিত, তখন ওস্তরোচিত নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে বজের অঙ্গের কালকিঙ্কর আসিয়া বাজলার কোহিনুর অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, বাজলী জানিতে পারিল না, কখন তাহার কর্মজালার মহামণি অপহৃত হইয়াছে, কখন তাহার গৃহের স্বত্বদীপ নিবিয়া গিয়াছে, কখন তাহার জগৎগনের পূর্ণ চক্রেমা কাল বেধে চিঃমিনের জন্ত ঢাকা পড়িয়াছে, কখন বাজলার পঙ্কজ-রবি অন্তর্ভূত হইয়াছে! এমন বুকভাঙ্গা দুঃখ আর কখনও কেহ কি পাইয়াছে? হার হুর্ভাগ্য দেশ, বিধাতার সকল গুণি বজ্র কি তোরই শিরে তাড়িয়া পড়িবার জন্ত সর্বগা উত্তত হইয়া আছে?

আন্তোব বাগ্যাবিধি সকলগুলি পরীক্ষার উক্ত স্থান অবিকার করিয়াছিলেন—কেবল তাহা হারা তাঁহাকে বুঝা যাইবে না, বর্ষে বর্ষে একজন করিয়া পরীক্ষার প্রথম হর; ব্যবহার-শৃঙ্খলের ব্যঙ্গায়ে তিনি কৃতী ছিলেন, কেবল তাহাছাড়া আন্তোবের পরিমাপ হইবে না, ব্যবহারজীব আরও ছিলেন বা অছেন; ধর্মাবিকরণে ভাবাবীশরূপে তাঁহার অনেকের উর্দ্ধে স্থান ছিল, মাত্র তাঁহাতেও তাঁহাকে বুঝা যাইবে না—তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার বিকে দৃষ্টি দান করিতে হইবে। কিন্তু দীপ্ত দিবাকর-সমুদ্র : অমলিন বুদ্ধিশালী, অণৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন তেজস্বী পুরুষের বিকে চাকিয়া দেখিতেও আমাদের চক্ষু বলসিয়া যায়। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার প্রশস্ত বন্ধ-কবাক্টের অন্তরালে যে বিশাল হৃদয় ছিল, যান নরনে তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে,—যে হৃদয়ের স্বত্বপ্রবাহ অনাচার অতি-আচার দেখিলে ঝটিকা তাড়িত প্রবাহিনীর তরঙ্গতলের জ্বল উন্নত নর্তনে ক্ষীত হইয়া উঠিত—আবার যে

হৃদয় পীড়িতা দেশজননীর হৃদয়, দেশবাসীর নিয়ম অবহা, তাহার সমস্ত শোণিত প্রবাহকে নরনের ঘার দিয়া অশ্রুরূপে প্রবাহিত করিয়া দিত, সেই লোকোত্তর জনের হৃদয়, বজ্র-কঠিন এবং পুষ্প-পেলব হৃদয় খানিকে মানস নরনে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; উপাদেয় অস্তর মন হৃদয় মস্তকের সমষ্টিতে যে মহামূর্ত্তি ধ্যান নরনের সম্মুখে সহুপস্থিত হয়, আন্তোবের স্বরূপ তাহাই। একদেশ দেখিয়া তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা অন্ধের হস্তী-দর্শন চেষ্টার জায় নিখল।

বিষম-বরণ্য, বিমল বিপুল বুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্মবৎ ভবিষ্যদর্শী আন্তোব বুঝিয়াছিলেন, দেশের এবং দেশ বাসিনদের সর্বদুঃখ বিমোচন করিতে হইলে কুন্দেরু-কান্তিমতী, জুয়ার-হার-ধবল, বোগদণ্ডমণ্ডিতভূষা, জ্ঞানাবি-ঠাজী দেবী সন্ন্যস্তীর আরাধনার দেশহৃদয়ের অক্লান্তমগ-জ্ঞান হৃদয়কন্ডর আলোকোভাসিত করিয়া তুলিতে হইবে, বিচার প্রভাবে জনমনের অবিভা বিদূরিত করিতে হইবে, তাহা হইলে সকল ভয় সকল বিধা, সর্ব সঙ্কোচ সকল বন্ধন বিমুক্ত হইয়া শ্রামা বজজননীর বহু কোটি সন্তান মাহু হইবে, তাগাদের দুঃখ দূর হইবে। এই মঙ্গলময় কার্যে আন্তোব জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের এই মঙ্গলব্রত পালন করিতে তাঁহাকে কত দুঃখ সহ করিতে হইয়াছে, কত বিবাদ বিতণ্ডা যুদ্ধ বিগ্রহে নিজেই নিরত নিরোজিত রাখিতে হইয়াছে তাহার সীমা নাই। কিন্তু এই অসাধ্য ভেজস্বী, অণৌ-কিক প্রতিভাশালী, কর্তব্যনিষ্ঠ বীর্ষাবান মহাপুরুষ একদিনের জন্তও কর্তব্যাপথ হইতে ভিলমাত্র বিচলিত হন নাই। একলা এক দুঃস্বর আসিয়াছিল যে দিনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে ভারতের প্রধানতম রাজ-পুরুষের জুড় দৃষ্টি আপতিত হইল—বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার হলে তাহার স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টার এক পরিবৎ গঠিত হইয়াছিল, লর্ড কর্জনের ভার মন্থী জনের মস্তক প্রস্তুত এই ব্যাপার; আমাদের সৌভাগ্যবলে বজের প্রতিনিধিরূপ আন্তোব সেই পরিবদ আসন



পরলোকগত স্ত্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
(১৩২৩ সালে মানসীর লগ্ন বিশেষভাবে গৃহীত ফটো হইতে)

গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভারতের উচ্চতম রাজপুরুষের সহিত প্রতিযোগিতার সে দিনে আশুতোষ বাহ্য করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বিবৃতির প্রয়োজন নাই, শিক্ষিত মাজেরই তাহা পরিজ্ঞাত। আশুতোষের হার স্বাধীন-চেতা, স্বদেশের মঙ্গলকামী, তর্ক বিচারে কুশাগ্রযী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য সে দিনে বিভাগীঠের শুভকামনায় প্রাণ পাত না করিলে, বাঙ্গালার সারস্বত তীর্থের কি ভূগতি হইত কে জানে? সে দিনে রাজপুরুষগণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয়গণের পরিবর্তমান অতৃপ্ত ও অসন্তুষ্টির শ্রেষ্ঠতম কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা!—তাই সেই শিক্ষার মূলে, নিত্যসপক্ষে কুঠাঠাবাত করিতে না পারিলেও, ছুরিকার আঘাতে তাহা ক আহত এবং দুর্বল করিয়া রাখা বাঞ্ছনীয়! দেশের একান্ত কল্যাণকামী আশুতোষের বীরবাহু সে দিনে গাণ্ডীব ধারণ করিয়া আশুতোষগণকে নিরস্ত না করিলে সম্ভবতঃ চরণান্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদ্মের কতগুলি দল অরিয় পড়িয়া আজ তাহাকে কতখানি রিক্তদীন শোভাহীন করিয়া তুলিত সে কথা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। আশুতোষ সব্যাসচী অর্জুনের হার এক হস্তে সারস্বত কুঞ্জের শত্রু সংহার করিয়াছেন, অপর হস্তে নিপুণ উত্তানপালের হার নানা বৃক্ষ রোপণ এবং তন্মূলে জল সেচন করিয়া সে নিকুঞ্জের অল্পম শোভা সঞ্চর্জনার্থ প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। একদিন ছিল এই বিভাগীঠে শিক্ষিত বঙ্গসন্তান স্বীয় পিতার নিকট মাতৃভাবার পত্র লিখিতে লজ্জাবোধ করিতেন, সতীর্থের সহিত বাক্যালাপ করিতে মাতৃভাবাকে যথাসম্ভব বর্জন করাই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আশুতোষ এই বিকৃত শিক্ষার বিষময় ফল মানসনেত্রে অবলোকন করিয়া প্রতিপ্রসবের জন্ত বত্সবান হইলেন, এবং ধীরে ধীরে সংস্কার আরম্ভ করিয়া আজ বঙ্গসম্রাজ্যের গৌরবান্বিত স্বর্ণ সিংহাসন রচনা করিয়া দিয়াছেন; পরীক্ষার্থী আজ বঙ্গভাবার পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষতম উপাধি গ্রহণ করতঃ নিজেকে ধন্ত ও কৃতার্থ মনে করিতেছে। বতদিন নিখিল

শাস্ত্রাধ্যাপনের জন্ত বঙ্গের বিভাগীঠ বাঁচিয়া থাকিবে, বাঙ্গালীর ভাষা থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী আশুতোষের এই কীর্ত্তিস্তম্ব তাহার সমুন্নত শীর্ষ উর্দ্ধে তুলিয়া বিশ্বব্রহ্মের নিকট প্রচার করিবে—আশুতোষ বাঙ্গালার কি ছিলেন, বাঙ্গালীর কি ছিলেন এবং চির উপেক্ষিতা বঙ্গভাবার জন্ত কি করিয়া গিয়াছেন।

একদিন ছিল, যে দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত, উপাধিধারী যুবজনকে অন্ন সংস্থানের জন্ত কোন কষ্ট করিতে হইত না, শিক্ষা সমাপনান্তে সমাবর্তনের পরেই ইংরাজ রাজপুরুষগণ এই সকল শিক্ষিত তরুণ-বৃন্দকে সমাদরের সহিত রাজকাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া শিক্ষার সম্মান রক্ষা করিতেন এবং দুঃস্থ ভ্রমণপ্রিয়ারের উদরারের চিন্তা দূর করিয়া দিতেন। ক্রমে যখন শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শিক্ষিত যুবকেরা যখন রাজপুরুষগণের দপ্তরে দপ্তরে ভীড় করিয়া অবশেষে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ক্রিান্তে লাগিল, তখন আশুতোষের অন্তর করুণায় কাঁদরা উঠিল। নিরন্তর যুগে অন্নপ্রাণ তুলিয়া দিতে তিনি বেক্রমে ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষা এবং প্রথম উপাধি পরীক্ষার পরে শিক্ষণীয় বিবিধ বিষয়গুলি: নিমিত্ত, অভিনব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সকলের অপরিস্রুত; ইহাতে অন্ততঃ কতকগুলি শিক্ষিত তরু সন্তানের কিছুকালের জন্ত অন্নচিন্তা বিদূরিত হওয়া তাহারা নিজের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পাইল এই কার্য্য করিতে আশুতোষকে বহু লোকের বহু গল্পন সহ্য করিতে হইয়াছে, অর্থ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে ক্রেশ পাইতে হইয়াছে, কিন্তু দেশবাসী শিক্ষিত জ্ঞান সন্তানের অন্নকষ্টে বাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, সে আশুতোষ নিজের দুঃখ কষ্ট লাহুনা গল্পনার দিকে দৃষ্টি পাত করিবেন কেন? স্বদেশ-প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, স্বদেশীর হিতার্থ এই প্রকার নীরব কর্ম্ম আকরজন করিবে বা করিতে পারিবে জানি না। আশুতোষের অভাবে সদ্যঃসমাবৃত্ত বঙ্গের শিক্ষিত যুবকগণে যে কি অভাব ঘটিল, তাহারা কি অন্তরঙ্গ বন্ধ হারাষ্ট আজ কি গভীর বেদনায় তাহাদের হৃৎকর্ম্ম মথিত হইতে

তাহা তাহারাই জানে। কেব, কেমন করিয়া, কে আসিয়া তাহাদের ব্যথিত হৃদয়ের উপরে মেহহস্ত বুলাইবে, সে কথা অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন আর কে বলিবে ?

সংসারে অনেক সময়েই বেধিতে পাওয়া যায় যে, উচ্চ পদাঙ্কত ব্যক্তি নিজে দৃষ্টিগত করিতে চাহে না; অভ্রান্তেই সৌধ শিখরে বাহার বসতি, কুটীরবাসী দহিত্র তাঁহার প্রাসাদ প্রাঙ্গণের প্রথম প্রাচীর পার হইতেও পারে না। কিন্তু সন্মানার্থ উচ্চপদে সমারূঢ় কালান্বিত্যের আন্ততোষ, আন্ততোষের ভার কাঁচালের বন্ধ ছিলেন। বালক বৃদ্ধ যুবা দীন হুণী আর্জিত ক্লিষ্ট অত্যাচার পীড়িত—বে কেহ যে সময়ে তাঁহার শরণাগত হইয়াছে, আন্ততোষ তাঁহার প্রীতিজ্ঞবাসিত বিরাট বক্ষলে উদার পরিব্রজে সকলকেই গ্রহণ করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়াই থাকিতেন, বখাযোগ্য শান্তি সাধনা দয়া সকলেই লাভ করিয়াছে। “নাঈপাজঃ পরীক্ষাঃ স্ত্রায়কালঃ নিরমঃ চিৎ” এই শাস্ত্রবাক্য আন্ততোষের জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাই আজ সমগ্র বঙ্গদেশ অশ্রুনিরে অন্ধ হইয়া হাহাকার করিতেছে।

ইংরাজী শিক্ষার কি উপাদেয় কল ছিলেন বাল্যলার এই আন্ততোষ। ইংরাজী বিদ্যালয়ে তাঁহার বিদ্যাসুন্দ, ইংরাজী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম পরীক্ষাসমূহে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তাঁহার শিক্ষা শেষ হয়। ইংরাজের বাহা ভাল, ইংরাজী শিক্ষার বাহা উত্তমতম, তৎসমুদয় আন্ততোষ পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার দূষিতাংশ তাঁহার জিসানীর আসিতে পারে নাই। ইংরাজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাহাদের নির্ভীকতা, ইউরোপীয়গণের স্বদেশহিতৈষণা, একান্ত কর্তব্যনিষ্ঠা, নিরলস একাগ্রতার সহিত বৈদগ্ধ্য ত্বরিত কৰ্ম সমাপনের অলৌকিক ক্ষমতা, সমস্তই আন্ততোষের ছিল এবং এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, ইউরোপীয় কোন এক ব্যক্তির মধ্যে এরূপ গুণবিশিষ্ট একজ সমবায়ের দৃষ্টান্ত আছে কি না সন্দেহ। পক্ষান্তরে অশনে বসনে আচারে ব্যবহারে ধর্মে কর্মে এরূপ বিত্তক বাল্যলী ব্রাহ্মণ

আর একটিও আছে কি না তাহা আমি জানি না। ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠাসম্পন্ন স্বদেশপ্রেমিক আন্ততোষকে কেহ কোন দিন বিদেশীর পরিচ্ছদ ধারণ করিতে দেখে নাই। বিভাগীঠের কর্ণোপলকে এক সময়ে ইউরোপীয় বহু বিশ্বাসনের সহিত আন্ততোষকে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল; নিশি-দিন ইউরোপীয়গণের সহিত একজের কাঁধা করিতে হইয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণের পরিধানে ধৃতি ভিন্ন অন্য কোন পরিচ্ছদ দেখা যায় নাই। বঙ্গজননী একান্ত মাতৃভক্ত শ্রেষ্ঠতম সন্তান আন্ততোষ যে একাগ্র নিষ্ঠার সহিত দেশজননীকে সমগ্র অন্তর দিয়া ভালবাসিতেন সেই নিষ্ঠাবশেই স্বদেশের আচার ব্যবহার, অশন বসন সমস্তই সবলে সংরক্ষণ করিয়া জীবন বাপন করিয়া গিয়াছেন—ব্রাহ্মণ কোন অবস্থাতেই কাহারও অনুরোধে উপরোধে স্বীয় গন্তব্য পথ হইতে ত্রুট হইয়া উৎপথগামী হন নাই। তিনি জানিতেন বাহা আমার নিজস্ব তাহাতেই আমার গৌরব, অপরের নিকট হইতে ঋণবাহী প্রাপ্ত বসন-ভূষণ সাজ-সজ্জা বীনতারই পরিচায়ক, উহা দ্বারা ঋণদাতা উত্তমর্ণের নিকট হইতে গৌরবলাভ অসম্ভব।

যে বিভাগীঠ সংগঠনে, শিক্ষার সংস্কারে, আন্ততোষ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার বড় সাধের সেই শিক্ষা ব্যবহার উপর কেহ আঘাত করিতে উদ্ভত হইলে এই বীৰ্যবান বীর ব্রাহ্মণ অস্বস্ত-শাবক শাঙ্গুলের ভার গর্জন করিয়া উঠিতেন এবং হৃদয়ের শোণিত-তুল্য প্রিয় তাঁহার সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ করে অতি প্রচণ্ড শক্তি সমূহের সহিত সংগ্রামার্থ সমরালক্ষে অবতীর্ণ হইতে বিন্দুমাত্র ঘোষা করিতেন না এবং যে পর্যন্ত তাঁহার ভারপক্ষের অরহুত্বিত বাজিয়া না উঠিত, যে পর্যন্ত তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী গগন-গাজে বর্ণ বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল না হইত, ততক্ষণ এই ব্রাহ্মণ বীরের জ্যা-নির্বোধের নিবৃত্তি ছিল না। সম্পূর্ণ শিক্ষার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই যোগকর বীর ব্রাহ্মণ আন্ততোষ অকালে অকস্মৎ স্বর্গপুরে প্রয়াণ করিলেন, বাল্যলার ভাবের ভাবের মধ্যগগনে পুঙ্খমুখি অন্তর্গমন করিল।

যে অন্ধকারে বাঙ্গলা দেশ আজ নিমজ্জিত হইল, সে অন্ধকারে পথ দেখাইবার উপযোগী জ্যোতিষ আবার কবে বজ্রের গগনদ্বন্দ্ব উদ্ভিত হইবে, মহাজিবিষ্ণুহারীন্দের ভার শাসনশাস্ত্র-বিশারদ আশুতোষ আবার কবে আসিবে, বৃহস্পতিভুল্য জ্ঞানী ব্রাহ্মণগুরু আবার আমরা কবে পাইব তাহা তিনিই জানেন, যিনি বিশ্বের সকল বিধি-বিধানের বিধাতা।

হে পরলোক-নব-প্রবাসী আশুতোষ, নন্দনের আনন্দ বনজাত মন্ডার মাংসে তোমার ললাট বিভূষিত করিয়া স্তম্ভপুণ্ড্র মনীষার রক্ত সিংহাসনে তোমাকে বসন করিয়া লইবার ভক্ত স্তম্ভললনাগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে; বাও আশুতোষ, তোমার উপযুক্ত আসন অধিকার করিতে পুঙ্ক

আয়োজনে গমন কর। কিন্তু আমরা তোমাকে আবার চাই। হিন্দু আমরা—মুক্তি বিশ্বাস করি এবং জন্মান্তরেও আমরা আস্থাবান। তোমার নিকট মুক্তি আমরা কামনা করি না, জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া নব-কলেবরে নবীন তেলোদীপ্ত বীর মূর্তিতে আমরা আবার আমাদের কাঙ্গাল বাঙ্গলার তোমার পুনরাবর্তন প্রার্থনা করি। তুমি না আসিলে তোমার অসমাপ্ত কর্তব্য সম্পূর্ণ করিবার দ্বিতীয় জন ত আমাদের আর নাই। বাঙ্গলার “ইন্ডপাত” হইয়া গিয়াছে, সেই ইন্ডের পুনরাগমনের পথের প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া সমস্ত বাঙ্গলা নরনরলে ও নিকটবাসে অপেক্ষা করিবে, এই কথা তোমার স্বর্ণপুণ্ড্র বসিরা তুমি স্মরণ করিও, এই আমাদের শেষ মিনতি।

শ্রীজগদীশ্বরনাথ রায়।

৮ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিরোধে

জননি বদ আজি যা তোমার ঘোর হৃদয়—দাক্ষিণ্য হুথ,
আশুতোষ তব বংশ প্রদীপ নাই যে, তাবিতে বিদরে বুক।
বৃদ্ধোক্ত বৃদ্ধক নিটোল স্বাস্থ্য কুশাগ্রাণী
ভীষ্ম সমান দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বীর্যেতে যুগ-সব্যসাচী;
ভেঙ্গে কজির, জানে ব্রাহ্মণ, বিশ্বামিত্র-শক্তিমান,
ভারতের চির সনাতনী বাণী পেরেছিল হেথা মূর্তি প্রাণ।
বিশাল ভারতে বিজ্ঞতম যে বিভাতিমান ছিল না তাঁর,
বিপুল অর্থ অর্জন করি বিলাস বাসনা হয়নি তাঁর।

দেশ-সেবা আর পর উপকার জীবনের বার আছিল ব্রত;
জানের আলোক আলিঙ্গ্য, দেশের হিতসাধনেতে সদাই রত।
কুসুম হইতে ছিল স্নানার্থ কোমল মধুর চিত্তখানি,
বজ্র-কঠোর বিশ্বাস ছিল, অবিকল্পিত সরল বাণী।
উপেক্ষা এ বদভাবার শিরে পরাইল সুকূট কেবা,
বদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কেউ হেন করেছে সেবা?
বাঙ্গালী জাতির হিমালয়, ওগো, জান মনীষার তাজমহল,
তেজের সূর্য, স্কন্ধগার শশী, পবিপ্রতার তুলসী হল।

জানযোগ আর কর্তব্যোপেক্ষে

বিপুল সিঁড়ি লাভিলে তুমি।

তব আদর্শ হৃদয়ে পড়ুক

— ধন্য হউক ভারতভূমি।

শ্রীবলসুন্দর চট্টোপাধ্যায়।



সার আশুতোষ চৌধুরী

গত ২৩শে মে কাছারিতে গিয়া শুনিলাম আশুতোষ নাই—তাঁহার পার্শ্বভৌতিক নশ্ব দেহ তন্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সেই সদালাপী, অমারিক, তীক্ষ্ণদী, বিচার-বিশ্লেষণপটু ব্যবহারজীবীর মধুর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাক্যাদি আর শুনিতে পাইবে না। সেই সৌম্য, শান্ত, অজাতশত্রু স্বভাবের প্রণবধনি আর উল্লসিত হইবে না। বাক্যাদি—সুধু বাক্যাদি বলি কেন—সমগ্র ভারতবাসী আর শুনিতে পাইবে না সেই মহা পুরুষের ভাবব্যঞ্জনা। দেশের ও দেশের উপকারের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা বাঁহারা করিয়াছেন—দেশকে স্বাধীনতার অমৃত আশ্বাদ দান

করিতে বাঁহারা ব্যগ্র, তিনি তাঁহাদের অগ্রণী। সেই চিত্তাশীল ভাবুকের ভাব-প্রেরণায় দেশ উদ্ধৃত হইত। দেশের দুর্দিনে যখন দেশবাসী তাঁহার দ্বারস্থ হইত, তখন আগ্রহের সহিত তিনি সৎপরামর্শ দান করিতেন। উত্তম হিমালয়ের জায় চরিত্রের দৃঢ়তায় তিনি অটল ছিলেন, আবার দুঃখীর দুঃখ মোচনে, অত্যাধিকারের অত্যাধ দূরীকরণে, সহানুভূতির শীতল বারি-সেচনে তাপিত প্রাণ নিষ্কৃত করিতে তাঁহার মঙ্গলহস্ত সর্বদাই ব্যগ্র ছিল। দেশের মঙ্গল-কামনার ধ্যানরত যোগীর জায় তিনি আত্ম-জীবন সর্বদা

নিয়োজিত করিতেন। শক্তি তাঁহার অপরিমিত ছিল, উৎসাহ তাঁহার অদম্য ছিল—চরিত্রের বল প্রকৃত ছিল; আর সর্বোপরি ছিল তাঁহার তাঁকা সরল প্রাণ।

দেশের ও দেশের মঙ্গলের জন্ত যে সকল অসুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির উন্নতির জন্ত তিনি সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। রত্নগর্তী বঙ্গজননী বাঙ্গালীর গৌরব আশুতোষকে হারাইয়া আজ রোক্তমানা; বিবরা। তাঁহার দেশবাসী জাতারা আজ স্মরণ—হৃদয়ে উদ্ভিষ্টমন। বাঙ্গলার আজ বড় হৃদ্বিন। শোকের সুহৃদমান তাঁহার বাঙ্গালী জাতারা আজিকার দিনে তাঁহার পুত্রপবিজ্ঞ চরিত-কাহিনী বিবৃত করিতে পারে না—তিনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে প্রতিনিরত উপস্থাপিত করিতেন, সে চিত্র ও বাঙ্গালী আজ ক্রমতঃ সম্মুখে ধরিতে পারিবে না। দেশের সামাজিক, রাষ্ট্র-নৈতিক, শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য, আর্ট ও সঙ্গীতের উন্নতি-কল্পে তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন—সাক্ষ্যকে করায়ত্ত করিবার জন্ত যে চেষ্টা করিয়াছেন, আজ তাহারই একটু আভাস দিবার প্রয়াস পাইব।

শিক্ষার কথাই প্রথমে বলা উচিত। শতকরা দুই তিন জনও যেখানে শিক্ষিত নহে, সেখানে শিক্ষার বিস্তার জন্ত বিনি চেষ্টা করেন, তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। ইংরেজী শিক্ষা-দীকার দীক্ষিত হইরাও তিনি ভারতের চিরন্তন শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি বিশেষ অহরাসী ছিলেন। বহুদিন ধাবৎ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিরা, আশুতোষ ইহার উন্নতির জন্ত প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাননীয় সার আশুতোষ সুখোপাধ্যায়ের সহকর্মীরূপে আমরা তাঁহাকে অনেকবার কার্য্য করিতে দেখিয়াছি। বঙ্গ-বিভাগের সময় জাতীয় শিক্ষার আলোচনার তাঁহাকে যোগদান করিতে দেখিয়াছি—আহার নিজা ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত একযোগে, কি করিয়া আমাদের জাতীয় শিক্ষা-পরিবর্তন গঠিত করিতে পারা যায়—কি করিয়া বাঙ্গালীকে শিক্ষার বিষয় আনন্দ দান করিতে পারা

যায়—কি করিয়া বাঙ্গালী যুবককে কৃতবিত্ত ও বাহুব করিতে পারা যায়,—তাঁহার চেষ্টার মনোযোগী হইতে দেখিয়াছিলাম। ব্যবহারালোকের অবসর খুব অল্প সত্য; কিন্তু সেই অল্প অবসরের মধ্যেও তিনি শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত বাহা দিয়া গিয়াছেন, সে প্রচাৰ দান বড় কম নয়। জাতীয়-শিক্ষা-পরিবর্তন অসুষ্ঠানের তিনি প্রাণবন্ত ছিলেন। সার রাসবিহারীর মৃত্যুর পর তিনি ঐ পরিবর্তন-সমিতির সভাপতি পদে বৃত্ত হন। বাঙ্গালী দেশে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রচলন জন্ত যে সকল মনোবী চেষ্টা করিয়াছেন, সার আশুতোষ তাঁহাদের অন্ততম। ১৩১১ সালে বিদ্যুৎ সরল দেবী মহোদয় আমাদের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটা প্রশ্ন আশুতোষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, এখানে তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলামঃ—“যদি আমরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চাই, আমাদের গুটিকতক কার্য্য করা উচিত। দেশে ভাল স্কুল চাই। দেশের স্কুল দেশীয় লোকের দ্বারা চালান উচিত। নিম্ন-শ্রেণীতে বাঙ্গলার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। স্কুলেই মন ও চরিত্র গঠন হয়। একটা কি দুইটা ভাল স্কুল স্থাপন করা সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয়। তবে আমরা সেদিকে কোন চেষ্টাই করি না। স্কুলেই এইরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, বাহাতে পরে উচ্চশিক্ষার পথ সহজ হইতে পারে। বহু সংখ্যক ছাত্রের পক্ষে উচ্চশিক্ষা হ্রাশা যাত্র। বিলাতের আদর্শ দেখ। সেখানে সুনির্ভরশীল অতি অল্প সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করিতে যায়। মনে রাখা উচিত যে, বিলাতে ধনী লোকের অভাব নাই—ধনের অভাব নাই। ইউনি-ভার্সিটিতে এক একটা কলেজ প্রচুর অর্থশালী। তাহা-তেও অধিক ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্ত আসে না। উচ্চশিক্ষা সৌধীন শিক্ষা নহে। তাহার জন্ত অনেক বিবরে বিশেষ জ্ঞানলাভ ও শিক্ষা প্রয়োজন। তাহা সবিশেষ কষ্টসাধ্য। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ত বহু অর্থও প্রয়োজন। আমাদের সে অর্থ নাই। সেইরূপ শিক্ষা

দিবার উপকরণও নাই বলিলে চলে। কিন্তু ভাল স্কুল কেন হয় না বলিতে পারি না। জাতীয়তার স্কুল জাতীয় শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষা স্কুলে আরম্ভ হয়। উচ্চ শিক্ষা বিশেষ কোন জাতি কিংবা প্রদেশের নহে। আমরা অর্থলাভের জন্য উচ্চ শিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সে পথ দিন দিন অবরুদ্ধ হইতেছে। অর্থলাভ উচ্চশিক্ষার দ্বারা সহজে হয় না। সেইজন্য আমাদের Technical Education এর দিকে মন দিতে হইবে। Technical school শুটকতক স্থাপন করিতে পারিলে—অনেকটা পথ পরিষ্কার হইয়া আসে। আমার বিশ্বাস উচ্চশিক্ষা কঠিন বলিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে। ডাক্তার সরকারের Science Association আছে। এখানে কতকগুলি বড় বড় কলেজ আছে। সকলে একজু হইয়া একটা বড় বিজ্ঞান্য স্থাপন হয় না কি? শিক্ষা শিক্ষকের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আজকাল এ দেশে অনেক ভাল উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায়। শিক্ষার জন্য তাঁহাদের সাহায্য প্রয়োজন। তাঁহাদের একজু করিয়া এ দেশে এখন শিক্ষা সম্বন্ধে কি করা উচিত, তাহা সাব্যস্ত করা প্রয়োজন।” (ভারতী তাজ ১৩১১) আর তিনি বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারই বক্তব্য ও আগ্রহের ফলে জগদ্বৈরব্য রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে শিক্ষাপ্রতিবেদ জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা কয়েকটা সুন্দর শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমরা পাইয়াছিলাম।

রাষ্ট্রনীতিতে তিনি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সার সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্ত স্বরূপে তিনি জাতীয় মহাসমিতিতে ২২ বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়াছেন। তিনি ‘নরম’ দৃষ্টিভুক্ত ছিলেন। সে বৎসর কলিকাতার ১০ গ্রামের বিশেষ সম্মিলনে অসহযোগনীতির বিকল্পে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার তর্কশক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বহন তিনি দেখিতেছেন পরামর্শ অনিবার্য্য,

অনসম্মত বাহা চায়, তদ্বারা জাতীয় বাধীনতা প্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত, তখনও নির্ভীক আন্তরিক মর্মে মর্মে যে সত্য অন্তর করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে কুঠাবোধ করেন নাই, বা কাহারও অপ্রীতিকর হইবে বলিয়া সে কথা বলিতে নিরত হন নাই। এই ঘটনার পর হইতে রাজনীতি ক্ষেত্রে ছুই দলের সৃষ্টি হইয়া যে বিরোধের দ্বন্দ্বভাষা প্রাচীর উঠিয়াছিল—যে বাবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহা তাদ্ধিবার ও দূর করিবার জন্য আন্তরিকের চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসার্য্য। শান্তি স্থাপনকল্পে সে সময়ে তিনি বাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, বাস্তবিকই বাহারা জগতে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী, তাঁহারা হই যুগ্ম (“Blessed are the peace-makers”) জাতির নব-আগরণ দিনেও তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যুগ্মদের দ্বারা উৎসাহের বজা ছুটাইতে কোনদিনই কেহ তাঁহাকে বিরত দেখে নাই। ‘গরম’ দলের লোকেরা বহনই কোন আকস্মিক বিপদে পড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সংস্কার চাহিতেন, তখনই তিনি সরলপ্রাণে সহজ দিতেন। সর্ব্বত্রই তিনি দানবীর ছিলেন। আধুনিক জাতীয় সঙ্গলনের অহুতানের সহিতও তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ১৯০৪ সালে বর্ধমানের বন্দীর প্রাদেশিক সভার সভাপতি রূপে তিনি যে সভ্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সে কথাটির উল্লেখ এ প্রসঙ্গে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথাটা এই, “পর্য্যাপন জাতির রাষ্ট্রনীতি নাই।” (A subject nation has no politics.)

১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পত্নী বাসন্তী দেবী বহন পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন, তখন আন্তরিক বঙ্গজাতীয় স্বরে কাউন্সিল সভার পুলিশের অবিস্মৃতিয়ারিতা ও হঠকারিতার ফলে যে কি ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইবে, তাহার চিত্র সুন্দর তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে পশ্চাদগম হন নাই।

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অহরাগ ছিল। পুরাতন ‘ভারতী ও বালক,’ ও ‘ভারতী’র পৃষ্ঠা খুলিলেই

তাহার লিখিত প্রবন্ধাবলীতে তাহার চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। দার্শনিক প্রবন্ধগুলি তিনি বেশ সরল করিয়া লিখিতে পারিতেন। এই সরলতা ও সজীবতা তাহার জীবনের সহচর ছিল বলিলে অত্যাক্তি হয় না। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্বের লিখিত, 'হিন্দু আর্থা কি না' প্রবন্ধে তাহার গবেষণার গভীরতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১২ সালে দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিত্বপে তিনি যে অতিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাহার বক্তাব্যব প্রাতি অকুজিব নিষ্ঠা ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কিছুদিন বিলাতের 'ঈগল' পত্রিকা দফতর সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সামাজিক উন্নতি-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, বোধ হয় তিনিই প্রথমে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাগীর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা প্রতিভাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া, রাত্রি ও বরেন্দ্র সমাজের মিলন স্থাপনের স্বরূপাত করেন।

সঙ্গীত বিজ্ঞান তাহার বখেট অমুরাগ ছিল। তাহার সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠিত "সংগীত সভা" তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং ছই বৎসর পূর্বে যখন তাহার পত্নীর-বিয়োগ হয়, তখন হইতে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সজীব রাখিবার জন্য তিনি আগ্রহে চেষ্টা করিতেন। পত্নীর মৃত্যুর ইহা অত্যন্ত উপায় বলিয়াই বোধ হয় তিনি মনে করিতেন।

আশুতোষের শিল্পমুরাগ—বিশেষতঃ ভারতীয় শিল্পের প্রতি অমুরাগ—অনন্তসাধারণ ছিল। ভারতীয় শিল্পের প্রচারের জন্য তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ শিল্পের বৈশিষ্ট্যও তিনি বহুবার বকে সর্বদা বুঝাইতে প্রয়াস পাঠতেন। ১৯২২ সালে কাউন্সিলে যখন ভারতীয় শিল্পের প্রচারের জন্য নির্দ্ধারিত অর্থ কনাইবার প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, তখন তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে বিরুদ্ধবাদীদের মত খণ্ডন করেন। তাহার

কয়েক ছত্র এখনও আমাদের কর্ণে বেন বাজিয়া উঠিতেছে। তাহার ভাবার্থ এই :—“সকল সংস্কারবশে সকল জিনিষ লিখিতে পারা যায় না। স্বপ্নের সহিত অনুশীলন না করিলে, সাধনার সমাহিত না হইলে, অনেক জিনিষ আরম্ভ করিতে পারা যায় না। সেই সকল জিনিষের ভিতর শিল্প অন্ততম। ভারতবাসীকে শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য Society of Oriental Art যে চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন এবং কাউন্সিলের সে অর্থ সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য।”

ব্যবহারাজীবরূপে ও কলিকাতা হাইকোর্টের জজীরতী করিয়া তিনি যে বণ অর্জন করিয়াছেন, তাহাও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। ব্যারিষ্টারীতে তাহার বৈয়াক্য অর্থাগম হইত, তাহা ছাড়িয়া যখন তিনি জজীরতী গ্রহণ করেন, তখন যে ভাগ্যবীকার করিয়াছিলেন, তাহাও অনেক ব্যবহারাজীবের আদর্শ হইবার উপযুক্ত।

ধর্ম্মে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। মানবতার পূজা ভগবানের আরাধনার নামান্তর, ইহা তিনি জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি মানবের সেবার অধিকার পাইলে আপনাকে ধর্ম্ম মনে করিতেন। ধর্ম্মে তিনি মেকী আদৌ পছন্দ করিতেন না—সত্য বলিতে কি, মেকীর উপর তিনি সর্বদা খড়্গাঙ্ক ছিলেন। অনেক তথ্য-কথিত ধার্ম্মিক তাহার সংশ্রবে আসিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

মৃত্যুর দুইমাস পূর্বে আশুতোষের মাতৃবিয়োগ হয়। তখন তিনি অসুস্থ অবস্থার ওয়ালটেয়ারে ছিলেন; ডাক্তারের পরামর্শ মতে তখন কলিকাতার উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার পর শরীরের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ার কলিকাতার আসিতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পূর্বে তাহার অবস্থা একটু ভাগ বলিয়াই সকলেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু কে জানিত, নির্ঝাণোন্মুখ দীপের ক্ষণবিকীর্ণ উজ্জল আভার ভায় তাহার জীবন-দীপও ক্ষণেকের জন্য উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। হঠাৎ স্ব-ব্রহ্মের কার্য্য বন্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

অনন্তরান রাজী আন্তোব, বাও অমরধামে চির-শান্তি লাভ করিতে। বাহার জন্ত সারা বাঙ্গালদেশ হুঃখিত, তাহার অভাব মোচন হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য, বাহা বার, তাহার স্থান দীর্ঘ পূর্ণ হয় না। আন্তোব! তোমার শান্ত প্রহরচিত্ত, তোমার মুক্ত উদার পরহঃখকাতর প্রাণ, তোমার বিনয়, তোমার আদর্শ পুত পবিত্র চরিত্র, তোমার সহিষ্ণুতা, তোমার বিপক্ষ-মত-সহনশীলতা, তোমার ধৈর্য ও উদারতা, দখৌচির মত তোমার স্বাধ-

ভ্যাগ, তোমার অনাবিল স্বদেশ-প্রেম বাঙ্গালীর আদর্শ হউক। এ সকল সদগুণ বাঙ্গালীকে মাহুয় করিবার পক্ষে সহায়তা করুক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। *

শ্রীচারুচন্দ্র দ্বিজ।

* ১৩০১, ২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গঠিত।

আশাহত

(গল্প)

বিপ্লবীক পরম বাগ্দী গরবীকে ঘরে আনিল কেবল হুই বৎসরের কণ পুত্র গোবরাকে রক্ষা করিবার জন্ত। নতুবা এই পরিণত বরসে আবার নতুন করিয়া সংসার পাতিবার ইচ্ছা তাহার আনো ছিল না।

প্রায়ে লোকে বলিল, পরম খুব জিত্তিরাছে। গোবরার আসল মার চেয়ে গরবীর মুখ চোখের ঐ অনেক ভাল। রঙটাও বেশ কর্দ।

প্রতিবেশীদের এইরূপ আলোচনার পরম কদরের কোণে একটু গর্স অহুতব করিলেও, ছেলেটা নতুন মার মধ্যে বিশেষ কোন মাদুর্ধ্য উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে কিছুতেই তাহার কাছে বেসিতে চাহিল না। পূর্বে খেলিবার মোহে যদিও এক আধবার ভূমিতে পদার্পণ করিত, কিন্তু নতুন মা আসিবার পর হইতে সে বাপের জীর্ণ পঞ্জর ক'থানাকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল করিয়া তুলিল।

এক পরবার বাতাসা কিনিয়া দিয়া, নানাবিধ খেলনার প্রলোভন দেখাইয়া, দৈত্য, দানী জুজু প্রভৃতি বীতংস দুর্জির আবির্ভাবের ভয় প্রদর্শন করিয়াও গরবী

যখন সেই একরতি ছেলেটাকে কোনক্রমে বশীভূত করিতে পারিল না, তখন গোবরাকে তাহার নিকট কেনিয়া রাখিয়া মাছ ধরিতে বাইবার জন্ত স্বামীকে পরামর্শ দিল। গরবীর পরামর্শ সমীচীন বলিয়া পংমগ্রহণ করিতে পারিল না। কোন উত্তর না দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গরবা স্বামীর প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, “আমাকে বুঝি বিশেষ করতে পারিলি নে?”

পরম বিশেষ কুষ্টিত হইয়া উত্তর করিল, “তুই কি গোবরার মা নস, গরব?”

গরবী স্বেপূর্ণ হয়ে বলিল, “কি আনি!”

গরবীর খোঁচাটা পরমের হাতের হাতে বিধিল। ছেলেটার একমাত্র উপায় স্থির করিয়া বাহাকে স্বগৃহে বরণ করিয়া আনিয়াছে, তাহারই নিকট গোবরাকে রাখিয়া বাইতে তাহার অবিদ্যাগ?

পরম সমস্ত রাজি মনে মনে সঙ্কল্প করিল, কাল যেমন করিয়াই হউক সে মাছ ধরিতে বাহির হইবে—গোবরা কাঁদিলে সে কোনও প্রকারে তাহাতে কান

দিয়ে না। কতকণ কাঁদিয়ে? বাপকে না পাইলেই তাহাকে বাধ্য হইয়া চুপ করিতে হইবে।

সকালে উঠিয়া পরম দেখিল, তখনও গোবরার ঘুম তাগে নাই। নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গরবীকে বলিল, “গোবরা হইল, দেখিস্।”

গরবী একটু সূচকি হাসিয়া বলিল, “তর নেই।”

পাছে কি বলিতে কি বলিয়া কেল, গরবী কিছু মনে করে, এই ভয়ে পরম আর বাক্যব্যয় না করিয়া জালখানি খাড়ে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘর হইতে গোবরার কান্নার শ্রু শোনা গেল, “বাবা, বাবা গো—”

“ঐ রে, হতভাগা ছেলে আবার বারনা ধরেছে।” বলিয়া গরবী পরমকে সম্বরণ প্রদান করিয়া ইসারা করিল।

পরম অনেককণ ইতস্ততঃ করিয়া চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া জালখানা নামাইয়া রাখিয়া ডাকিল—“গরব।”

গরবী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “আবার কি হ’ল?”

“একবার চাঁলের হাঁড়িটা বের কর ত।”

“কেন রে?”

“কর না।”

গরবী ঘর হইতে চাঁলের হাঁড়িটা বাহির করিয়া আনিয়া। পরম উপড় করিয়া সমস্ত চালগুলি দাঁওয়ার উপর ঢালিয়া কেলিয়া বলিল, “এই যে, এখনো আট দশ সের মজুদ।”

“তবে আর তাবনা কি?” বিজ্ঞপন্থে কথাগুলো বলিয়া, চাঁলগুলি পুনরায় হাঁড়িতে পুরিয়া লইয়া গরবী গৃহে প্রবেশ করিল। পরম গোবরাকে কোলে লইয়া বেড়াইতে গেল। সেদিন আর তাহার মাছ ধরিতে বাওয়া হইল না।

২

গরবী তাবিয়াছিল, গোবরাকে সে শীঘ্র আপনায় করিয়া লইবে। অনন্তর পুরুষহস্তের বিশৃঙ্খল পরি-

চর্যায় শিশুর ক্রমতা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছিল। নিরবিত মানাহার ও ঔষধ পথ্যে তাহার শারীরিক দৌর্জগ্য বিদূরিত করিয়া একটি সবল পুষ্টকার সন্তানের মাতৃস্থান অধিকার করিবার তাহার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ছেলেটা যখন নূতন মায়ের নান শুনিতেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল এবং শিশুর অসুস্থ দেহ-বেটনী অনাবিল মাতৃ-স্নেহকে শিশুর নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন গরবী মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইল। শৈশবে ক্রীড়াপুতলির কৃত্রিম জননীর অভিনয় করিয়া নারী আপন হৃদয়ে গোপনে যে স্নেহভাষার সঞ্চিত করিয়া রাখে, প্রাপ্ত বয়সে তাহা উন্মাদ করিয়া বিলাইয়া দিবার প্রভ সে একটি যোগ্য পাত্রের অঙ্গুসঙ্গানে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। গরবীরও তাহাই হইয়াছিল। তাহার সঞ্চিত স্নেহ সন্তান পরমের অক্ষর স্নেহাবরণে প্রতিলিত হইয়া বতই ফিরিয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহা জমাট বাঁধিয়া হৃদয় মধ্যে শক্ত হইয়া বসিতে লাগিল। গরবী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর এ অনধিকার চর্চা করিতে বাইবে না। এত বড় ঝগড়া খাড়ে করিয়াই বা তাহার লাভ কি?

গরবী সকালে উঠে, ঘর দ্বার কাঁচ দেয়, গৃহ-কর্মগুলি নীরবে সম্পন্ন করিয়া বার, কিন্তু গোবরার সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ উদাসীন।

পরম অনেকবার ছেলেকে সম্পূর্ণরূপে গরবীর হাতে সমর্পণ করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছে। তাহার অঙ্গুসঙ্গিতে গোবরার সম্বন্ধে “রাঙা মায়ের” অসংখ্য গুণবর্ণন করিয়াছে, তাহার কাছে থাকিলে প্রতিদিন অপরিমিত সন্দেশ পাইবার তরঙ্গা দিয়াছে, কিন্তু তবুও সেই বালখিল্য জীবটার মনটা কোন মতেই নমন করিতে পারে নাই।

নিরুপায় পরম অবশেষে গরবীর প্রস্তাবেই সম্মত হইবে স্থির করিল। গোবরাকে তাহার মায়ের কাছে রাখিয়া সে কাঁবে চলিয়া বাইবে। কিন্তু

বধন মনে হইল যে, গরবী ছেলেমানুষ, সন্তান প্রতিপালনে এখনও অশীর্ষ, বিশেষতঃ গৃহকর্মে তাহাকে সমতদিন একরূপ ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় যে ছেলোটায় উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের বঞ্চে অবসর তাহার নাই, তখন তাহার মনের অভিপ্রায়টা কার্যে পরিণত করিবার আশা দূরে চলিয়া গেল।

গোবরাকে গরবীর নিকট হইতে পৃথক করিয়া একান্ত নিজে করিয়া রাখাটাও সে ক্ষুদ্র বিবেচনা করিল না। সে গরবীর স্বামী, তাহার সব কিনিসেই বধন গরবীর সমান অধিকার, তখন যেটি নিত্য আপ-নার সেটি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে তাহার অন্তর লজ্জিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার নির্মল, গোবরাকে তাহার মায়ের কাছে রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় পরমের পা যেন কোন মতেই চলিতে চাহিত না।

গরবীর মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হইতে না পারে এমনকি সে বোকা ছেলোটায় নারীকরণ কালনিক ঘোষের উল্লেখ করিয়া নিজের অপরাধ কালনের বিদ্যত চেষ্টা করিত। প্রকৃত ব্যাপারকে মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া কেলিবার চেষ্টা করিয়া পরম গরবীর নিকট কেবলই উপহাসাঙ্গল হইয়া পড়িতে লাগিল। গরবীর তাজিল্য ব্যক্তক মুহূর্ত্ত হাসিতে পরম নিজের লজ্জা ও কুণ্ডা আরও বাড়াইয়া তুলিল।

গোবরা কোন মতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না দেখিয়া, পরম গরবীকে ভরসা দিল যে ছ'টার দিন পরেই গোবরা নিজের মাকে চিনিয়া লইতে পারিলে আর ভাবনার কারণ থাকিবে না। কিন্তু গোবরা নিজের না চিনিবার পূর্বেই হজুর চাউলের কলসীটা একেবারে শূন্য হইয়া আসিল।

প্রতিবেশীর উঠানের বীম বেগুন কাঁচালকা অবলম্বন করিয়া গরবী এতদিন স্বামীপুত্রের অমের উপকণে সম্বৃত্ত করিয়া দিয়া, নিজে কেন তাতেই কাটাইয়া দিয়া আসিতেছিল। এইবার তাহারও অর্থাৎ হইল।

সেদিন তখনও তাল করিয়া প্রত্যন্ত হয় নাই, শ্রীতের কুমারায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

গরবী ধরে ধীরে শয্যাভাগ করিয়া উঠিয়া, নিজের গায়ের কাঁধাখানা তুলিয়া রাখিল। নিশ্বাসের শব্দে বুঝিল পরম ও গোবরা অকাতরে ঘুমাইতেছে। ঘরের আগড়খানা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেই শীতের প্রভাতের এক ঝলক ঠাণ্ডা পরমের উন্মুক্ত মুখখানার গিয়া লাগিল। পরম চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, গরবী বাহিরে চলিয়া গেল।

গোবরার ঘুম তানিয়া যাইবার ভয়ে পরম চাপা স্বরে ডাকিল—“গরব।”

কোন উত্তর না পাইয়া গাঢ়াবরণখানা গোবরার উপর ভাল করিয়া চাপাইয়া দিয়া পরম বাহিরে চলিয়া আসিল। দেখিল, গরবী আলখানা ঝাড়ে করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে।

পরম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। এ গৃহে আসিবার পর গরবীর জাগ্রদর্শ এই প্রথম। নিজে ঘরে বসিয়া থাকিষ্ঠা, গরবীকে পরপুরুষের সহিত মাছ ধরিতে পাঠাইবার লজ্জাকর কলনাটা তাহার প্রাণে একটা দারুণ অপমান জাগাইয়া তুলিল। ক্ষুব্ধবরে বলিল, “মাগে হতভাগাটাকে মরতেই দে।”

গরবী করিয়া দেখিল পরম উঠিয়া আসিয়াছে। সেও ইহাই চায়। মাছ ধরিতে যাইবার ইচ্ছা গরবীর মোটেই ছিল না। ইচ্ছা করিলে পরমের উঠিয়া আসিবার অনেক আগেই সে চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু নানা ছলে বিলম্ব ঘটাইয়া এবং ভাল গোছাইতে অনাবশ্যক দ্রব্য তুলিয়া পরমের উঠিয়া আসিবার অপেক্ষা করিতেছিল। অতাবের কথাটা মুখে না বলিয়া কার্যে জানাইয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য।

বাস্তবিক পরম অত্যন্ত মর্শ্বাহত হইয়াছিল। তাহার মন বলতেছিল, গায়ের লোক তনিলে বলিবে কি? একটি স্ত্রী ও একমাত্র রোগা ছেলে পুত্রিবার বাহির কমতা নাই, তাহার আবার এ বরসে বিবাহের সাধ কেন?

একরূপ জোর করিয়াই গরবীর হাত হইতে আল খানা ছিনাইয়া লইয়া পরম বলিল, “ঘুম হয়েছে, বলা

বাগ্দির ছেলের মাথাটা আর হেঁট করিসনে। কিরে বা।”

গরবী মুখখানা কিরাইরা লইয়া বলিল, “ঘরের জীকে কেন তাত খাইরে রাখলে বুঝি মাথাটা খুব উচু হয়?”

পরমের এতকণে জানের স্ফার হইল। ঘরে ঢাল ছিল, অস্ত্র উপকরণগুলি কোথা হইতে যোগাইতেছে, সে এতদিন তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই। গরবীর মুখে কেন ভাতের কথা শুনিয়া তাহার সব পরিষ্কার হইয়া আসিল। মিনতির স্বরে বলিল, “কিছু মনে করিসনে গরব, এই আমি চন্দাম।”

পরম চলিয়া গেল। কিন্তু একরশি পথ অতিক্রম করিবার পূর্বে, সে বখন তিনবার কিরিয়া আসিয়া গরবীকে গোবরার সাঙ্গনা সব্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিয়া গেল, তখন গরবীর অন্তরটা অভিমানে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সে কি সত্যান পালনে এতই অক্ষম? ছেলেকে কিরূপে সাঙ্গনা দিতে হয় সে বিবরে সে কি এতই অজ্ঞ? ডাক দিয়া বলিয়া উঠিল, “আমি কিন্তু এত বড়োটা ঝাড়ে নিতে পারব না, বলে রাখছি।”

পরম পলাইয়া গেল। তাহার পা ছুঁখানা পুনরায় বাড়ীর দিকে কিরিবার উপক্রম করিলেও, সে প্রাণের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া তাহাতে বাধা দিল। পালেঘের বটতলার আসিয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। বেন একটা একঘেরে তালা গলার কায়ার স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—“বাবা, বাবা গো—” সে প্রাণপণে উত্তর কর্তৃক রুদ্ধ করিয়া বিলের পথে ছুটিয়া চলিল।

৩

মাছ ধরিয়া, বেড়িয়া, হাট হইতে চা'ল তরকারি সংগ্রহ করিয়া পরম কিরিতে বেলা প্রায় পড়িয়া আসিল। কাছে আসিয়া সে একবার কাণ পাতিয়া শুনিল কেহ কাঁদিতেছে কিনা। কোনও শব্দ না পাইয়া বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, সমস্ত বাড়ী-

খানা গম্‌গম্‌ করিতেছে। গরবী দাওয়ার এককোণে বসিয়া মাথা নত করিয়া ভাল আয়না ও চিরণীর সাহায্যে কেশ রচনা করিতেছে। এতদিন এতকণ গোবরার চীৎকারে সমস্ত পাড়া মুখরিত হইয়া থাকিত। কঠরের শূভতা বতই বাড়িয়া বাইত, তাহার ক্রন্দনের স্বর ততই উচু উঠিত। আজ এখনও উনানে হাড়ি না চড়িলেও গোবরার সাড়া শব্দ নাই।

জিনিসগুলি গরবীর সম্মুখে নামাইয়া দিয়া পরম চোরের মত জিজ্ঞাসা করিল, “গরব, গোবরা ঘুমিয়েচে নাকি?” গরবী মুখখানা না ফুলিয়াই বলিল “আমি তার কি জানি।”

পরম আগড়টা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে মাথা গলাইয়া দেখিল, গোবরা নিশ্চিন্ত নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। সে নিজের বালিশটার শুইয়া আছে, পিঠ তাহার মায়ের বালিশটা স্তম্ভপূর্ণে ঠেকান। কঁথাখানা এমন পরিপাটি ভাবে চাপান রহিয়াছে যে, ছেলেটার গায়ে তাহার বিন্দুমাত্র তার নাই, অথচ এমন নিশ্চিন্ত যে, শীত প্রবেশের এতটুকু পথ নাই। চোখে কাজল, কপালে ধরেরের টিপ, নাকে রসকলি পরিয়া গোবরা রাজপুত্রের জায় আরামে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিসের স্বপ্ন দেখিয়া এক এক বার হাসিয়া উঠিতেছে।

পরমের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, “না নইলে কি ছেলের বদ্ব হয়।”

নিশ্চিন্ত চিন্তে পরম তামাক সাজিতে বলিয়া গেল। গরবী হুম্‌ হুম্‌ করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার সম্মুখে এক বাটা তেল রাখিয়া দিয়া আয়না চিরণী গুলি গুটাইতে লাগিল।

নির্দোষিত-কলিকাটি নামাইয়া রাখিয়া, থানিকটা তেল নাসারক্কে প্রবেশ করাইতে করাইতে, পরম জিজ্ঞাসা করিল, “গরব, ছেলেটা আজ একবারও কাঁদেনি, নর?” বামীর বিকে শিছু কিরিয়া গরবী উত্তর দিল, “না, আজ সে পণ্ডিত হয়েছে।”

“তার রাকুসে কিসে আজ কোথা গিয়েছে বল দেখি?”

গরবী কথা কহিল না।

গরম চাহিয়া দেখিল, একটা বাটীতে ছুখের দাগ। সে বুঝিল, আজ এখনও গোবরার স্মৃধার উদ্দেশ্য হয় নাই কেন। জিজ্ঞাসা করিল, “গরব, ছুখ কোথায় পেয়েছিলি রে?”

গরবী গভীর হইয়া বলিল, “নদীর মার গাইএর ছুখ। আমাকে খেতে দিবেছিল।”

গরম চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, “তাই বুঝি সবটাই খেয়ে কলেছিস?”

“আমার ছুখ, খাই আর কলে দিই, তা নিয়ে লোকের কাষ কি?”

গরম তৈল মর্দন শেষ করিয়া পুতুর বাটে দান করিতে চলিয়া গেল। সেদিন তাহার বেকরূপ তৃপ্তি সহকারে ভোজন হইল, বহুদিন সেরূপ হয় নাই। তাহার কর্মজীবন অবসর জীবন একটা স্নিগ্ধ শান্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া গেল। গরবীর প্রতি প্রজ্ঞার তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

গরবী কিছু ধরা দিতে চাহিল না। পরমের অতি সতর্কতার ফলে তাহার মাতৃহত্যার অবিবাসের গুরু অপমানে বেকরূপে লাহিত হইয়াছিল, সে তাহা কিছুতেই তুলিতে পারিল না। তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া গরম তাহার প্রতি এতদিন বেগুতর অবিচারটা করিয়া আসিয়াছে, কিরূপে সে তাহার প্রতিশোধ লইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

গরম কাষে চলিয়া গেলে, গোবরা ছুর ধরিল—
“খাবা, আমি খাব!”

গরবী বলিল, “না না, কে তোকে ধরে রেখেছে?”

চতুর্দিকে চাহিয়া, গোবরা বাপের কোন সন্ধান না পাইয়া চুপ করিল।

গরবী ডাকিল “গোবরা!” গোবরা চমকিয়া উঠিয়া মায়ের সুখের দিকে সতরে চাহিল।

“ছুখ খাবি?”

গোবরা করদিন হইতে ছুখের আশ্বাস বুঝিয়াছিল। সে নিজের পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “কিঁদে।”

গরবী হাসিয়া, উঠিয়া গোবরাকে টানিয়া কোলে লইল। গোবরা তাহার কোল হইতে নাখিয়া পড়িবার জন্য বিধিযত চেষ্টা করিতে লাগিল। গরবী জোর করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া খানিকটা বাসি ছুখ আল দিতে বসিয়া গেল।

গোবরা সম্মুখে ছুখের বাটী দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। গরবী বলিল, “বদি না কাঁদিস, রোজ তোকে ছুখ খেতে দেব।” রোজ ছুখ খাইতে পাইবার আশায় গোবরা আগাততঃ চুপ করিল। ছুখের বাটীটার চুপু দিখাই গোবরা একগাল হাসিয়া গরবীর সুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল—“মা!”

গোবরার সুখে বহুদিন বাহিত মা শব্দ শুনিতে পাইয়া গরবীর পদাঙ্ক হইতে দত্তক পর্যন্ত একটা আনন্দের বিছাত্তরন খেলিয়া গেল। গোবরার মসী-মগিন গণ্ডগরে সে অজল চুবন আঁকিয়া দিল।

গোবরার আনন্দোত্তরিত অভিলাষে নদীর মার উপহারের বেনামে, পরমের কণ্টার্কিত চাউলের কিয়ৎংশ বিনিময়ে, গরবী যে ছুখটুকু সংগ্রহ করিতেছিল, তাহার সাহায্যেই আজ মা ও ছেলের মধ্যে একটা আগোব হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদীশ বাজপেন্সী।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

আজকাল সুখী-সমাজে মাঝে মাঝে এক নতুন বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। এই আলোচনার উদ্দেশ্য East এবং West অর্থাৎ প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সন্ধান প্রদান করা। বাহারী বলেন যে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের কোন কালে অসম্ভাব ছিল না এবং থাকিবেও না। আমার বিবেচনার তাঁহারী সমাজ, ধর্ম এবং রাজনীতি সম্পর্কীয় ব্যবধান সমূহ উপেক্ষা করতঃ কেবল তাব-রাজ্যেরই বিচার করিয়া থাকেন। দেশগত, জাতিগত এবং সমাজগত পার্থক্যের সুদৃঢ় প্রাকার উন্নয়ন পূর্বক কেবল তাব সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে সর্ব-দেশ, সর্বজাতি এবং সর্ব লোকের একটিমাত্র সাধারণ সংযোগস্থল দৃষ্ট হইবে, তাহা আর আশ্চর্য কি? এই ঐক্য বা সমন্বয় মানবজাতির আত্মিক অবস্থা এবং ইহাই মানবের জাতীয় ভিত্তি। কবির দৃষ্টিতে আমি তুমি ভেদ নাই, দেশ কাল ভেদ নাই, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ভেদ নাই। ভাবুক এবং সাধারণ লোকের অভেদ এই যে, ভাবুক তাঁহার জ্ঞানবীণার একটি মাত্র বন্ধারে তাব-সমুদ্রে যে হিম্মল তুলিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা অসম্ভব। এই অগ্রই কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth) এর কবিতা পড়িয়া প্রাচ্যের লোকের মনে হয়, তিনি তাহাদিগের মতই একজন; আবার কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রসায়ানন করিয়া প্রতীচ্যের লোকেরও তাঁহাকে তাহাদিগের মতই একজন তাহা স্বাভাবিক। সর্বতোমুখী প্রতিভার নিকট বিশ্ব-মানবের যে একই জ্বর ধরা পড়িবে, তাহাতে বিশ্বের কারণ কিছুই নাই।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলিতে চাই। ধর্মশাস্ত্রে Revealed religion এবং Religion of the Church নামে ধর্মের দুইটি বিভাগ আছে। পাশ্চাত্য-ক্ষেত্রে এই দুই বিভাগের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া সংঘর্ষ চলিয়াছিল। ভারতবর্ষেও উপনিষদ ও গীতার ধর্ম এবং

হিন্দুধর্ম নামে প্রচলিত দেশাচারের মধ্যে ঐক্য সংঘর্ষ বহুল পরিমাণে বিস্তারিত। বাহারী revealed religion বা প্রত্যাশেশমূলক ধর্মের উপদেষ্টা, তাঁহাদের পরম্পরের মতগত পার্থক্য সামান্য। গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ, বাইবেলের উপদেষ্টা যীশুখ্রীষ্ট এবং কোরাণ শরীফের উপদেষ্টা মহম্মদ, সকলেরই মূল শিক্ষা এক। Religion of the Church এর পক্ষে কিন্তু তাহা নয়। এইখানেই ধর্মের নামে বিবাদ বিষয়, উচ্চনীচ ইত্যদ-ভয় জ্ঞান,—এইখানেই হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-খ্রীষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ ভেদ। এই ভেদ-জ্ঞানের বশবর্তী হইয়াই Rudyard Kipling বলিয়াছেন যে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সন্ধান অসম্ভব। আর, আমাদের মনসী রবীন্দ্রনাথ কবির অন্তর্দৃষ্টিতে ইহারই প্রতিবাদে বলিয়াছেন, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মিলন অবশ্যস্বাভাবিক। তাঁহার পক্ষে এই বিশ্বাস স্বাভাবিক, এবং স্বাভাবিক বলিয়াই দেশ-বিদেশে তিনি এই মতের প্রচার করিতেছেন।

অগতে আমরা তিন প্রকারের সাধক দেখিতে পাই— বাহারী কবি, বাহারী দার্শনিক এবং বাহারী ধর্ম-সংস্কারক। তিনজনে তিন বিভিন্ন পথের পথিক হইলেও তিনেরই উদ্দেশ্য এক,—মঙ্গলময়ের মহিমা কীর্তন। যিনি কবি হইয়া বলেন “আমি দার্শনিক নহি” তিনি আত্মবঞ্ছনা করেন; আবার যিনি ধর্ম-সংস্কারক হইয়া বলেন যে, তিনি কবি বা দার্শনিক নহেন, তিনিও ভুল বলেন। ইহাদের তিন জনকেই Seer আখ্যা দেওয়া যায়। তিন জনেই প্রত্যাশিষ্ট। কবি Seer না হইলে তাঁহার কাব্য-কলা নিফল, দার্শনিক তর্ক-শাস্ত্রের অন্তরালে চিন্তার অনন্ত সন্ধান উপগন্ধি করিতে না পারিলে তাঁহার তর্কের জালও বৃথা। আর, ধর্ম-সংস্কারকের ত কথাই নাই। প্রত্যাশেশ ব্যতীত ধর্মো-পদেষ্টা হওয়ার স্পর্ধা বিড়ম্বনা। শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মহম্মদ ইহারী সকলেই Seer। তাবনের

অনন্ত ভাব-সমুদ্রে কাঁপ দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা অবতাররূপে গণ্য হইরাছেন। প্রাচ্য এবং প্রাচ্যের যে যোগের কথা বলা হইতেছে, তাহার মূলেও কবি, দার্শনিক ও ধর্ম-সংস্কারের অন্তর্দৃষ্টি দেখিতে পাই। এই দৃষ্টির কাছে সাম্য ছাড়া বৈষম্য নাই, যোগ ছাড়া বিরোধ নাই, harmony ছাড়া discord নাই। শুধু প্রাচ্য এবং প্রাচ্য কেন, চর্যার বিশ্ব এখানে এক। কবি রবীন্দ্রনাথ এই মহামিলন মন্ত্রের প্রচারক। ধর্মের দিক দিয়া নয়, সংস্কারের দিক দিয়াও নয়, কাব্যের ভিতর দিয়া তিনি যে অনন্তের সাক্ষাৎ (vision of the eternal) পাইরাছেন, তাহার বলে তিনি প্রাণের কথা মর্শ্বস্পর্শী ভাষাতেই বলিতে পারেন এবং সেই ভিত্তিই পৃথিবীর লোক আল বিস্তৃত ও সুদৃষ্টিতে তাঁহার কথা ভাবিতেছেন।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ একাই যে বিশ্বমানবতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত তাহা নয়। পাশ্চাত্য ক্ষেত্রে তাঁহার পৌরষরবি ভাবের হওয়ার পূর্বে আর এক মহাত্মা, স্বামী বিবেকানন্দ, উপনিষৎ ও বেদান্তের গূঢ় তত্ত্বসমূহ ব্যক্ত করিয়া প্রাচ্যের লোককে—আমেরিকাবাসীকে—বিস্তৃত ও ভক্তিত করিয়াছিলেন। এ ত গেল এ কালের কথা। প্রাচীন কালেও প্রাচ্যের রক্ত-স্রাব লাভ করিয়া প্রাচ্যের লোক যে পুনঃ পুনঃ বিস্তৃত ও ভক্তিত হইরাছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ বর্ধেই পাওয়া যায়। যখনই প্রাচ্য জাতি প্রাচ্যের সম্পর্কে আসিয়াছে, তখনই তাহা নবজীবন লাভ করিয়াছে। প্রাচ্যই এক সময়ে জ্ঞানের অকুরন্ত ভাণ্ডার ছিল। অনেকের বিশ্বাস, আত্মজরিতার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যজাতি সমূহ ভারতবর্ষের জ্ঞান পরিমাকে স্বীকার করিতে চাহেন না, পরন্তু ভারতবর্ষকে বর্ণাসাধ্য চাপা দিতেই চাহেন। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই উক্তিভেদে আত্মজরিতা প্রকাশ পায়। জার্মান দার্শনিক Professor De Wulf তাঁহার History of Medieval Philosophy গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“The tenth century was indeed the brightest in the

Byzantine world, as it was the darkest in the west. Still the spirit that moved the Byzantine culture of this century had not the fresh promise of originality. Its scholars had no higher ambition than to save from oblivion the grand literary legacy they inherited from the ancient world by collecting all the works in existence in their own time. And needless to say, philosophy, no less than other human sciences, profited much from this preserving care.”—p. 224

—অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা উন্নতির সর্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিলেও ঐ শতকে পশ্চিমদেশ সকল গাঢ় অজ্ঞান-ভিমে আবৃত ছিল। তথাপি যে আলোক পাইরা উক্ত সভ্যতার এতদূর জ্বলি হইরাছিল, তাহা হইতে ভবিষ্যতে কোন নূতন মত প্রতিষ্ঠার উপযোগী মৌলিকতা প্রকাশ পায় নাই। প্রাচীন যুগ হইতে পণ্ডিতেরা যে অমূল্য সাহিত্য-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার রক্ষায়ই তাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থগুলির উদ্ধার সাধন করেন, তত্ত্বের তাঁহাদের অপর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ছিল না। বলা বাহুল্য যে তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যে কলে অসংখ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত ধর্মশাস্ত্রও রক্ষা পাইরাছিল।

এই স্থলে “ancient world” বলিতে যে প্রাচ্য ভগৎ বুঝাইতেছে, তাহা বলা নিম্নরোজন। উক্ত গ্রন্থের অপর এক স্থলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ধর্মশাস্ত্র উপলক্ষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—“The sudden and widespread outburst of philosophical speculation which lights up the opening years of the thirteenth century is traceable to three main causes (1) the introduction of the western intellectual world to a rich and hitherto unknown philosophical literature

etc. For the second and even for the third time, the West discovered a portion of the philosophical treasure of ancient Greece. At the same time it came into contact with the genius and works of a strange race."—p.243.—অর্থাৎ জরোদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দার্শনিক চর্চা প্রসূত যে আলোকরশ্মি অকস্মাৎ দিগ্-দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল, অল্পদূর করিয়া দেখিলে তাহার ভিত্তি প্রধান কারণ দুই হয়। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য-জ্ঞান-জগতের সহিত এপর্যন্ত অপরিজ্ঞাত এক পূর্ণ ও পরিণত দার্শনিক সাহিত্যের পরিচয় ইত্যাদি। এইবার লইয়া, ছই, এমন কি ভিনবারের মত প্রাচীন গ্রীসের তত্ত্বভাণ্ডারের সহিত প্রতীচ্যের পরিচয় হইয়াছিল। আবার ঐ সময়েই উহার সহিত এক নূতন জাতীয় লোকের প্রতিভা এবং গ্রন্থাগার সংস্পর্শ ঘটে।

উক্ত অংশে "rich and hitherto unknown philosophical literature" কথায় প্রাচীন গ্রীক জাতির দার্শনিক সাহিত্য এবং "strange race" বা নূতন জাতীয় লোকের কথায় আরব জাতিই বুঝাইতেছে। বাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রাচ্যের জ্ঞান-সম্পত্তি লাভ করিয়াই প্রতীচ্য যে পুষ্টি হইয়াছিল, তাহা ঐ গ্রন্থ এবং অজ্ঞাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ যে কেবল একদেশ-দর্শী অথবা আভিজাত্যের বশবর্তী হইয়া প্রাচ্যের এসঙ্গে ভারতবর্ষের উল্লেখ করেন না, তাহা নয়, ভারতবর্ষের উল্লেখ না করার কারণও বশেষ। জ্ঞান বিস্তারের পক্ষে দৃষ্ট সামান্য অন্তরায় নয়, তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাব। এবং আচার ব্যবহারও এ বিষয়ে বাধা জন্মায়। বর্তমান সভ্যতার বহুপূর্বে যে জ্ঞানবর্জিত পূর্বদেশ সমূহে প্রদীপ্ত হইয়াছিল, তাহার মূল যে ঠিক কোন্ দেশে ছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষেই উহার আদি উৎপত্তিস্থল এবং বৈদিক সভ্যতাই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল। হইতে পারে, কিন্তু প্রতীচ্যও যে

ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে ইহার সন্ধান পায় নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা বাইতে পারে। সম্ভ্রান্তি ইজিপ্ট, ইটালী এবং প্যালেষ্টাইনের কোন কোন স্থান হইতে যে সকল পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে জানা যায় যে, ঐ সকল দেশের প্রাচীন সভ্যতা বড় কম দিনের নয়। অন্ততঃ ছয় সহস্র বৎসর পূর্বেও কুম্ভ সাগরের পূর্বতীরবর্তী দেশ-সমূহে সভ্যতার বহুল বিস্তার হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে, এশিয়া মাইনরের মাইলেটাস্ (Miletus) নামক স্থানে পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল বেন সর্বপ্রথম শিকড় গাঢ়িয়া বসে। তৎপরে ক্রমান্বয়ে উহা পশ্চিমে গ্রীস এবং ইটালী, পূর্বে সিরিয়া, আর্মিনিয়া এবং পারস্ত, দক্ষিণে আরব এবং মিশর, কুম্ভসাগরের বীণপুঞ্জ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে স্পেন, ফ্রান্স এবং জার্মানি প্রভৃতি দেশে প্রসারিত হইয়াছিল। ইংলও একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রান্স হইতে এই শিক্ষার সন্ধান পায়। তখন ফ্রান্সে Chartre, Melun এবং Paris প্রভৃতি বিভাগে জ্ঞানের প্রভূত চর্চা হইতেছিল।

অন্যদিক দিয়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় জরোদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এবং উহারই অন্তর্যয়ে উক্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে বর্ণাক্রমে অল্প-কোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্যারিসের অধ্যাপক ও কৃতী ছাত্রগণই অল্পকোর্ড এবং কেম্ব্রজে শিক্ষাদান করিতেন এবং শিক্ষার প্রধান বিবরণ ছিল, জীৱতত্ত্ব। জীৱতত্ত্ব যে কি বস্তু, উহা বাঁহারা ইউরোপীয় শিক্ষা ও বাণীনার ইতিহাস অবগত আছেন, তাহারাই জানেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে এই তত্ত্বেরও আলোচনা একান্ত আবশ্যক। জীৱের আদি উৎপাদকগণ, বিশেষতঃ তাহার পার্শ্বচরণণ তদীয় অলৌকিক কীর্তিকালাপ ও সাধুজীবন দর্শন করিয়া তাহাকে কেবল আদর্শ চরিত্র বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু তাহাকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার কলে, অবতারের সহিত

সাধারণ মানবের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে এবং তাহা হইতে Trinity তত্ত্বের উদ্ভাবন করিতে হইল। God the father, God the son and God the Holy Ghost, তিনের পরস্পরের সম্বন্ধ এবং তাহার সহিত জগৎ ও মানবের সম্বন্ধ বিচার লইয়া নানাদিক আটপাশ বৎসর অতিবাহিত হয়। এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী অন্বেষণের ইতিহাসেরই অপর নাম বাবীন চিন্তার ইতিহাস বা History of the Freedom of Thought। কিন্তু সংক্ষেপে বলিতে গেলে trinity সংক্রান্ত তর্কযুদ্ধের মূলে খ্রীস্টীয় শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। খ্রীস্টীয় শিক্ষার অভাবে পশ্চাত্য খণ্ডে এই তর্কনীমাংসার স্রোত প্রবাহিত হইত না। প্রেটো এবং অ্যারিষ্টটলের প্রেতাআ দেশকালগাত্র নির্বিশেষে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, চিরদিনই আচ্ছন্ন করিয়া আসিয়াছে। প্রেটোর মতের অমুকরণে প্লোটিনাস্ (Plotinus) নিউ-প্লেটনিক্ মতের প্রচার করিয়া-ছিলেন, সেই নিমিত্ত প্লেটনিক্ মতই রূপান্তরিত হইয়া trinity তত্ত্বে পরিণত হয় এবং উহাই আদি খ্রীষ্টতত্ত্বের মূল ভিত্তি। সেন্ট আগষ্টাইন্ প্রমুখ সাধুগণ এই মতের পরিপোষক ছিলেন। পরবর্তী খ্রীষ্টীয় সাধকগণ বরাবরই উহার অমুবর্তন করিতেন। কিন্তু গোল বাবিল অ্যারিষ্টটল্কে লইয়া। অ্যারিষ্টটলের অসুস্থ জ্ঞানভাণ্ডার, তাহার অকাট্য বুদ্ধি ও নীমাংসা পদ্ধতি, তাহার বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক গবেষণা সমস্ত এক সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন একটা বিরাট বৈতোর্য মত আদি খ্রীষ্টীয় দার্শনিক (Early Christian scholastics) গণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অ্যারিষ্টটলের প্রতিভা ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে পুনরুদ্ধার হওয়ার পূর্বেই উহা আরবীয় এবং ইহুদী দিগের শিক্ষার অন্তর্ভূত হয় এবং তথা হইতে উহা মুসলমান বিদ্বান-দিগের দ্বারা স্পেন দেশেও নীত হইয়াছিল। ক্রমশী পণ্ডিতগণ টোলেডোর অমুবাদকদিগের নিকট হইতে গ্রীক প্রতিভা এবং অ্যারিষ্টটলের গ্রহাবলীর পরিচয়

পাইয়াছিলেন। অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থসমূহের অমুবাদের কালে কতিপয় দার্শনিক তাহার দর্শন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ গুরুপাত্রী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু চার্ক কিংবা খ্রীষ্ট সমাজের কর্তৃপক্ষগণ ইহাতে প্রবাদ গণিয়া-ছিলেন। Free thinking অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তার প্রসার হইতে পাছে খ্রীষ্টের অবতারবাদে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় তাহার অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থ সমূহ, বিশেষতঃ তাহার দর্শন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা রহিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জরোদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঐ সকল গ্রন্থ বর্জিত হয়। পরে অত্রান্ত বিদ্যাকেন্দ্র হইতেও হইয়া-ছিল। কিন্তু প্রতিভার আড়ন অধিক দিন চাপা থাকিল না। শিক্ষিতগণ সম্বন্ধেই তাহার জয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ অ্যারিষ্টটলের স্বর্ণ সম্বন্ধীয় ধারণা খ্রীষ্টতত্ত্বেরই অমুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে পোপ নবম গ্রেগরী অ্যারিষ্টটলের অভি-শপ্ত গ্রহাবলীর পুনরুদ্ধারের জন্ত আদেশ করেন; শুধু আদেশ করা নয়, কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই কার্যের ভারও দিয়াছিলেন। তাহারই চেষ্টায় পুনরুদার ইউনিভার্সিটি সমূহে দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। তখন হইতে স্বাধীন চিন্তার পথ অনেকটা পরিষ্কার হইল বটে, কিন্তু তর্কযুদ্ধ একেবারে মিটিল না। মধ্যযুগের একজন প্রাথমিক দার্শনিক সেন্ট টমাস্ (St. Thomas) ও তাহার শিষ্যগণ অ্যারিষ্টটলের মতাবলীর সহিত খ্রীষ্টীয় ট্রিনিটি তত্ত্বের সম্বন্ধ করিয়া দর্শন শাস্ত্রের পুনর্গঠন সম্পন্ন করেন। তাহার পর হইতে Reformation বা ধর্মসংস্কারের সূত্রপাত হয়। Reformationএর প্রধান কারণ স্বাধীন চিন্তার প্রসার। লোকে এখন আর চার্চের বিধিনিষেধ (authority) এবং ক্যাথলিক ধর্মবাহক-দিগের উপদেশে বড় একটা কর্ণপাত করিত না। সকলেই স্বয়ং মতের প্রতিষ্ঠা ও পরিপোষণের জন্ত ব্যত হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরবাদে, অবতারবাদে, trinity তত্ত্বে সাধারণের বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিল।

রোমান ক্যাথলিকগণ এই ব্যাপারে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; তাঁহারা এই নূতন চিন্তা প্রোতের প্রতিরোধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ধর্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লবও দেখা দিতে লাগিল। ইহার যে আগাত বিবরণ ফল হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাঝেই অবগত আছেন। এই বিপ্লবধর্মিতে ক্যাথারিন্ ডি মেডিচী (Catherine de Medici) ফরাসী এন্টোঁপোন্ট, দিগের প্রতি অসহনিক নির্ভরগতরণ করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহারই কালে রোমীয় ধর্মবিশ্বাসভঙ্গী (Papacy) সংস্কার, ক্যাথলিক ধর্মবাস্তবকরণ কর্তৃক জেহুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা, রোমের ইন্কুইজিশন্, ট্রেন্টের কাউন্সিল প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ দার্শনিক Giordano Bruno, ইটালীয় গণ্ডিত Lucilio Vanini, কবি মার্লে (Marlowe) প্রভৃতি বহু ব্যক্তি এই মহাব্যক্ত জীবনহুতি দিয়াছিলেন। বার্বোলোমিউ লিগেট নামক এক ব্যক্তিকে রাজা প্রথম জেমস্ দ্বারা অবমানিত করিয়া গৃহবহিকৃত করিয়াছিলেন।* তাঁহার অপরাধ যে তিনি জীবনের শেষ সাতবৎসর খ্রীষ্টের উপাসনা করেন নাই। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কোপার্নিকাস তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ভোতিষ শাস্ত্র প্রকাশ করার পর হইতে Reformationএর বহিঃ আরও সতেজ হইয়াছিল। কোপার্নিকাসের মৃত্যু না হইলে তাঁহার শোচনীয়

পরিণাম ঘটিত। আয়ারিষ্টলের geo-centric পতন পরবর্ত্তে কোপার্নিকাস helio-centric পতন প্রচার করেন। পৃথিবী সূর্যকে আবর্তন করে, সূর্য ভ্রমণ প্রহ এবং উপগ্রহের কেন্দ্র বক্রণ, এই মতের প্রচার হইতে সমগ্র ধর্মবিশ্বাসীয় মতাবস্থা হুলস্থূল পড়িয়া যায়, বোধ হয় যেন ইহারই কালে খ্রীষ্টধর্মের মূল পর্বাত উৎকলিত হইয়া বাইবে। সূর্যই যদি প্রহাদির কেন্দ্র, পৃথিবীই যদি সূর্যকে পরিভ্রমণ করে, তবে “মিরাকেল” বা অলৌকিকের স্থান কোথায়? তাহা হইলে সমস্ত বাইবেল প্রহই ত মিথ্যা, এবং চার্চেরও কোন ভিত্তি নাই। পৃথিবী অপরাপর গ্রহের জায় একটি প্রহ হইলে ত স্বর্গেই তাহার গতিবিধি সম্ভব, পৃথিবী তাহা হইলে স্বর্গের বিপরীতার্থক কোন সম্ভব নহে, পরন্তু স্বর্গ এবং মর্তে কোন পার্থক্যই রহিল না। শুধু তাহাই নয়, আয়ারিষ্টলের মতের বিরুদ্ধে, স্বর্গকে পৃথিবীর অতীত কোনও বস্তুরূপে স্বীকার না করিয়া অগতঃ যদি অসীম বলিয়াই গণ্য করা যায়, তবে অগতঃ বহির্ভাগে স্বর্গের বিস্তারিততা অসম্ভব। তাহা হইলে অলৌকিক ব্যাপার সকলের সম্ভবন হওয়াও অসম্ভব, এমন কি, “স্বর্গীয়” লেখকেরও করুণা অসম্ভব।

চার্চের কর্তৃপক্ষগণ এই সকল বুদ্ধির অবতারণা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত তর্ক ও নীমাংসা, প্রাখ্যাত্ত রক্ষার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, নব জ্ঞানালোকে মনে নূতন নূতন ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। জ্ঞান পিপাসার লোকে যেন দিন দিন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়েই আবার সুপ্রসিদ্ধ এবং কম্পাসময় ও টেলিস্কোপের আবিষ্কার জ্ঞানবুদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল। আরও এক কথা, পৃথিবীর আরম্ভ ও পরিধি সম্বন্ধে লোকের অতি সূক্ষ্ম ধারণা ছিল। ক্যাথলিকগণ মনে করিতেন যে, রোম সাম্রাজ্যের বাহিরে অগতঃ অস্তিত্বই নাই। কিন্তু কলম্বাসের

* The king summoned him (Bartholomew Legate) to his presence and asked him whether he did not pray daily to Jesus Christ. Legate replied he had prayed to Christ in the days of his ignorance, but not for the last seven years. "Away, base fellow" said James, spurning him with his foot. "It shall never be said that one stayeth in my palace that hath never prayed to our Saviour for seven years together."—History of Freedom of Thought (H.U.L.Ed.) p. 86. by J.B. Bury.

নূতন মহাদেশ আবিষ্কার, তাত্কা ডি গামার কেপ্ (Cape of Good Hope) বেট-এতে ভারত আবিষ্কার এবং ম্যাগেলানের (Magellan) সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণের পর হইতে পৃথিবীর বিশালত্ব সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান অগ্রে। অস্ত্র জগতের বিশালতা সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক মনীষীরা যে না ভাবিয়াছিলেন, তাহা নয়, কিন্তু অজ্ঞান যুগের (Dark age) অব্যবহিত পরে ইউরোপ খণ্ডে চিন্তার উদারতা না থাকায় পূর্বেকার ধারণা সমূহ ক্রমশঃ লোপ পাইয়া গিয়াছিল। বিজ্ঞানের দিক দিয়া আরও কত কত নূতন তথ্যের আবিষ্কার ও চর্চা হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব—কয়েকটি মাত্রের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। বোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে Leonardo de Vinci এবং ফ্রাকাস্টর (Fracastor) কতৃক আর্কিমিডিসের তথ্যের পুনরাবিষ্কার এবং পুরাকালে আলেকজান্দ্রিয়ার আলোচিত জড়-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান এবং বস্ত্র-

বিজ্ঞান প্রভৃতির পুনরুদ্ধার এবং উন্নতি সাধিত হয়। ফরাসী পণ্ডিত ভাইরোঁতি বীজগণিতের সংস্কারসাধন করেন। লর্ড নেপিয়র (Lord John Napier) “লগারিথম্” তথ্যের প্রচার করেন। Vesale নামক এক বেলজীয় পণ্ডিত কর্তৃক ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্থি-বিজ্ঞানের (Human anatomy) স্ফূরণ সাধিত হয়। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ডাঃ হার্ভি রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার অভিযন্ত্র সমগ্রাণ করেন। উপর্যুপরি এই সকল ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারে চতুর্দিকে একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু সকলের অপেক্ষা বেশ কাব করিয়াছিল কোপার্নিকাসের জ্যোতির্বিজ্ঞান। তৎপ্রণীত Celestial Revolutions নামক গ্রন্থই ইউরোপীয় চিন্তার ইতিহাসে যুগান্তর আনিয়ন করিয়াছিল। ইহার প্রভাবে মানবের চিন্তা-একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যায়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীদিখিজয় রায় চৌধুরী।

সন্ধান রক্ষা

(গল্প)

ভ্রমর শুভ্রন ধামিরা গেল, প্রভাতের মিষ্ট মায়ী
অন্তহিত হইল, শান্ত পবন নিদ্রাধ স্রবীর প্রথর স্পর্শে
উদ্ভাসের মত দিকে দিকে ছুটিয়া চলিল, তৃণশতহীন
নগর প্রান্তরে ঢকল মরীচিকা কাঁপিয়া ছলিয়া
উঠিল।

সুগন্ধি তামাকের গন্ধে বালাখানা ভরপুর। প্রসাধ-
প্রার্থীরা কক্ষণ সজ্জমনরনে শ্রাবস্থানর, বাবুর সুখবিবর
নির্গত ধূমরাশির দিকে ঘন ঘন চাহিতেছিল। মাসিক
সর্দার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই শ্রাব-
স্থানর বাবু গড়গড়ার নলটা সুখ হইতে একদিকে

অপসৃত করিয়া জুড় গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,
“মাপকে, এই চাঁদপুর থেকে কিরে আসতে তোর
এত বেলা হল কেন রে?”

মাসিক সর্দারের অন্তরায়্যা কাঁপিয়া উঠিল। খতমত
খাইয়া ভীতস্বরে বলিল, “আজ্ঞে কি করবো কর্তা,
বাড়ী বাড়ী ঘুরতে বেলা হয়ে গেল। কোন মোরাল্লাই
হুধ দই দিতে স্বীকার হল না; আমাকে বেদখল করে’
তাড়িয়ে দিলে।”

ক্রোধে শ্রাবস্থানর বাবুর প্রণত সুখমণ্ডল আরক্ত
হইয়া উঠিল। তাঁহার সজোর কম্পিত নিধান সমস্ত

দরটাকে সম্মত করিয়া তুলিল। কখনকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, “তার পর ?”

“আজ্ঞে—তার পর বলে, জমিদারের কালীপুজো হলো। তাতে আমাদের কি ? আমরা কেন বছর বছর জিনিসপত্তর বেগার দিতে বাব ?—কুমোরদেরও ঐ এক কথা।”

বিকট গর্জনে কক্ষ কাঁপাইয়া তুলিয়া শ্রামস্থল্যর বাবু বলিলেন, “আমার কালীপুজোর জিনিসপত্তর দেবে না ব্যাটারের এতদূর আশ্পর্ক ? সব ব্যাটাকে দেখে নিচ্ছি আমি এখন।”

তারপ চক্রবর্তী সুখখানা গভীর করিয়া বলিলেন, “কালীপুজোর জিনিস দেবে না—দিন দিন এ যে বড় অরাজক হয়ে উঠল। মায়ের পুজোর ভণ্টে বা বাৎসরিক পার্শ্বী আছে তা তো জমিদারকে দিতেই হবে। এ বেগার কি এবার নতুন ? পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।”

বিশিন চৌধুরী উচ্চ গলায় বলিলেন, “গুড়ে মরবে, পপে ব্যাটার। একেবারে রসাতলে বাবে। মায়ের সঙ্গে ও ঢালাকী।”

বুদ্ধ নীলু রায় বলিলেন, “জমিদারের কথা থাকে না, তাতে আবার মায়ের কাঁধ—আমরা কোন ছার।”

তারপ চক্রবর্তী দক্ষিণ হস্তের ওজ্জ্বলী আলোকিত করিতে করিতে বলিলেন, “ঐ ইন্দির হোঁড়াটাই বত গোলমালের গোড়া। বাবু নাইট স্থল করেছে, কৃষি শিক্ষা ঘের, খবরের কাগজ পড়ে শোনার। আরে ! তুই হলি ভজ্রলোকের ছেলে, তোর অত দরকার কি ? ছোট লোককে এই রকম আত্মারা দিলে যাড়ে চড়ে বসবে না ?”

শ্রামস্থল্যর বাবু গোলা হইয়া বলিলেন। তাঁহার বাৎসল্য সুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল, প্রশস্ত লগাট কুণ্ডিত হইয়া গেল, রোষকষাণ্ডিত চকু দুইটি অগ্ন অগ্ন করিতে লাগিল। তিনি কঠোর কঠে ডাকিলেন, “মাণিক সর্দার !”

মাণিক সর্দার সম্মুখে আসিয়া শ্রামস্থল্যর বাবুর

ক্রোধবহির্দীপ্ত সুখখানার দিকে ভীত কাতর নমনে চাহিয়া বলিল, “বাবু।”

“কানাই সিংকে সঙ্গে নিয়ে এখনই ইন্সপেক্টরকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আর ; বা, আর সেরী করিস নে।”

“বে আজ্ঞে”—বলিয়া মাণিক সর্দার তাহার বশে বহিধানা বগলে করিয়া বাহির হইতেই, শ্রামস্থল্যর বাবু ঘর কিঞ্চিৎ নমন করিয়া বলিলেন, “এই মাণিকে।”

মাণিক সর্দার ত্রস্তে কিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “বাবু।”

“দ্যাখ, তুই একাই বা, গিয়ে বলিস বাবু আপনাকে একবার ডেকেছেন, বিশেষ দরকার, একুশি বেতে হবে।”

ইন্সপেক্টর আসিলে শ্রামস্থল্যর বাবু কুটিল কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি মনে করছ কি বল ত ইন্সপেক্টর ? আজ্ঞে, আমাকে দেশে থাকতে দেবে কি দেবে না ?”

উত্তপ্ত বাতাস ধূলা বালি উড়াইয়া বৃক্ষরাজির হরিৎ পত্র কাঁপাইয়া ছ ছ করিয়া বহিয়া গেল। নাতিদূরে আত্মবীথি হইতে কোকিলের কুহতান তাসিয়া তাসিয়া আসিতে লাগিল।

ইন্সপেক্টর বিন্ধরাবিষ্ট নরনে শ্রামস্থল্যর বাবুর সুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আমি ত আপনার কোন অমিষ্ট করি নি যেসোমশাই।”

শ্রামস্থল্যর বাবুর ঠোঁট দুইটি কঠিন হইয়া উঠিল। দস্তে দস্ত চাপিয়া তিনি বলিলেন, “তুমি আমার কেবল মান সম্মানে হাত দিতে বগেছ, আর কিছু করনি। কেন, তুমি আমার বাৎসরিক কৌলিক কালী পুজোর জিনিস পত্তর বন্ধ করনি ? প্রজাকে নানা কথার উত্তেজিত করনি ?”

ইন্সপেক্টর দৃপ্ত কর্তে বলিল, “মাগ করবেন যেসো মশাই, সেজন্য আমি বিন্দুমাত্রও দায়ী নই। ওদের ভ্রাত্য দাবী ওরা বুকে বেবে তাতে আমার কি ? আপনাদের ভ্রাত্য পাওনা আপনি দেখে নেন, ওরা হাসিমুখে দেবে ; কিন্তু এটা জানবেন, জোঁজুলুদের কাল চলে

সেহে।” সোঁজ তরা আকাশের দিকে চাহিয়া একটু পরে বলিল, “আর এ সত্যি যে আপনার কালীপুন্ডরিক ওয়া বহুরের পর বহুর ধরে ওরকম বিনামূল্যে ভিলাগ বেবে কেন? এটা নিতান্ত অর্থেষ ও অর্থহী তির—”

শ্যামসুন্দর বাবু ইন্দ্রকুমারের প্রতি কঠোর বুদ্ধিতে চাহিয়া স্তম্ভনীর ঘুরাইয়া বলিলেন, “আমি তোমার কাছে সে উপদেশ শুন্তে প্রস্তুত নই। কিন্তু কোনো ইন্দ্রকুমার, এটা তোমার পক্ষে বোটেই সম্ভব নয়।”

২

বেলা চারিটার পর বড় বৃষ্টি ধামিয়া গেল। আবার চারিদিক নিবিড় নীলিমার রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সূর্যের মধুধারার নত কিরণ স্পর্শে প্রকৃতির অধরের হাসি উপছিয়া উঠিতে লাগিল। সুহ মন্ড পবনে তাগা বনজুলের গন্ধ বিহগকুলের আনন্দকাকলী আবার কুটীরে কুটীরে শান্তির বার্তা বহন করিয়া আনিল।

ইন্দ্রকুমার কর্দন বুদ্ধিতে সিক্তপ্রায় হইয়া খিড়কী দরজা দিয়া শ্যামসুন্দর বাবুর অভঃপুরে প্রবেশ করিল। দেখিল সেখানে অস্ত্র কেহই নাই; কিন্তু রায়ার সা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় একটা তাঁৎ সোঁতে ঘরের মেঝের মাঝরের উপর শুইয়া গভীর নিদ্রার মধ্য। আর কতকগুলি গায়রা বক বকম শব্দ করিয়া মনের আনন্দে কার্ণিশের উপর খেলা করিতেছে। চিলাকোঠার পার্শ্বের কুঠরীটার খোলা জানালার ভিতর দিয়া সূর্যের স্বর্ণরশ্মি একটা বেগোয়ারী বাকের কাছে প্রতিফলিত হইয়া চারিদিকের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

ইন্দ্রকুমার ঘোড়ালার বারান্দার আশিয়া ডাকিল, “মাসীমা!”

ঘরের ভিতর হইতে মানকুমারী ডাকিলেন, “কে, ইন্দ্রকুমার? এস।”

ইন্দ্রকুমার ভিতরে গিয়া একখানা কোচের উপবেশন করিয়া বলিয়া উঠিল, “উঃ! তরানক বড়বৃষ্টি! অনেকের ঘর ছয়োর বে কোখার উড়ে গিয়েছে! ছেলেপুলে নিরে ওদের মাথা লুকোবারও একটুকুও স্থান নেই!”

মানকুমারী ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, “আহা! তাহলে তো ওরা বড় নিরুপায় হয়েছে!”

একটা দমকা বাতাস হু হু শব্দে ককে প্রবেশ করিয়া মানকুমারীর শিথিল বেশপাশ ছুলাইয়া পরিধানের শাক্তী কাপাইয়া বহিয়া গেল। তিনি যেশনী ঝালর শোভিত একটা উপাধানের উপর হেলিয়া পড়িয়া ইন্দ্রকুমারের সিক্ত বসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “কাপড় চোপড় জল কাখার বে একবারে বেখে গিয়েছে। বড় বৃষ্টির মধ্যেই বুঝি কোথাও বেরিয়েছিলে? ও কাপড়টা ছেড়ে কেল এখন। অমলা, একখানা শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তো।”

ইন্দ্রকুমার বলিল, “আর কাপড় দিতে হবে না মাসীমা! আমাকে একুশি বাড়ী বেতে হবে, কতকগুলি কাব আছে।”

নবোদ্ভিগ বোবনের সুবমার কক উজ্জল করিয়া রূপমাধুরী মণ্ডিত দেহ তদীর দোলার সুখা, ছড়াইয়া অমলা একখানি ধৌত বস্ত্র হাতে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার ওঠের কোণে হস্তের অবলম্প, চোখের চাহনিতে আনন্দের দীপ্তি।

মানকুমারী ইন্দ্রকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভিজে কাপড়টা ছেড়ে কেল, নইলে অল্প কয়েতে পারে। হাঁ একটা কথা—আচ্ছা ইন্দ্রকুমার, কাল তুমি আমার সাবিজী ব্রতে নেমস্তন্ন রক্ষা কর নি কেন?”

ইন্দ্রকুমার বলিল, “করিস সেখের ছেলোটায় অবস্থা খুব খারাপ দাঁড়িয়েছিল, নিউননিয়ার ধরেছে। সেই হুপুয়েই সেখানে বেতে হল।”

“খাগা ছেলে তো তুমি! বেশ ওজর শিখেছ! কেন, সন্ধ্যার পর এলে হত না? অমলা, অচলার কাছ থেকে ইন্দ্রর অস্ত্র একটু জলখাবার নিয়ে আয় তো। আচ্ছা থাক, তুই পারবি নে, আমিই যাবছি।” বলিয়া মানকুমারী সিঁড়ি বাহিয়া জিহ্বতলে নামিয়া গেলেন।

বড় হংসের মল বাতল, দুষ্টির আনন্দে কলরব করিতে করিতে উড়িয়া গেল। উপরে বীর সসীরপে পেরা তুলার নত খণ্ড বেধ সকল তালিয়া তালিয়া কোখার চলিয়াছে। অমলা সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ

রাখিয়া একটু নৈরাশ্য-ব্যাকুলতা মিশ্রিত করে বলিল, “ইজ্ঞা না, আর তোমাকে আমাদের বাড়ী বেশী আসতে দেখি না কেন?”

ইজ্ঞাকুমার মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া অমলার গভীর দৃষ্টি নয়নে নয়ন মিলাইয়া বলিল, “কাব নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয় বলে বেশী আসতে পারিনে।”

“ওঃ তারি তো কাব! সারাদিন কেবল এ পাড়ার ওপাড়ার ঘুরে বেড়াও—এই তো? আচ্ছা বল তো ইজ্ঞা, ইজ্ঞা থাকলে কি উপায় হয় না?”

“তা হয় বটে; কিন্তু ছুদিন না এলেই যে মানুষের প্রতি মানুষের ভেতরকার প্রীতির আকর্ষণ কমে যায়, তা বলা যায় না। বরং আরও বেড়েই ওঠে।”

বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে অমলা ইজ্ঞাকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “তোমার বেড়ে উঠতে পারে, কিন্তু আর কারও যদি কমে যায় সেটা কি তোমার পক্ষে একটু ক্ষোভের কারণ হবে না?”

ইজ্ঞাকুমারের মুখখানা প্রীতি সঙ্গমে তরিতা উঠিল। অমলার লাবণ্য-চলচল মুখখানার দিকে চাহিয়া বলিল, “সে হুঁজুগ্যা আমার হবে না বলেই তো জানি।”

অমলা লজ্জার রাঙা হইয়া উঠিল। ইজ্ঞাকুমার অনিমেষ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চোখ দুইটির সরল স্নিগ্ধ ছাতি, চিত্তাশেষশূন্য স্বেচ্ছা মুখখানার লাবণ্য রেখা, স্নানব স্ফুটোমুখ দেহের আনন্দ-কল্পিত গতিভঙ্গী, কিরোজা সাড়ীর রং ঘরখানির মধ্যে একটা অপক্লপ সৌন্দর্যের ইজ্ঞাকুমার সৃষ্টি করিয়াছিল। মুগ্ধ বিভোর ইজ্ঞাকুমারের চিত্তমন্দিরের নিজিতা প্রেমময়ী আদরিণী আগিয়া হাসিয়া উঠিয়া যেন তাহার প্রাণে পুলক যারা বুলাইয়া দিল।

অলবোপান্তে ইজ্ঞাকুমার যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যার ধূসরতার চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, আকাশের রক্তিমছটা মিলাইয়া বাইতেছিল, অসীমের গোয়ে নক্ষত্রালোক ফুটরা ফুটিয়া ধরিত্রীর বুকে যেন শিহরণ হানিতেছিল।

৩

কক্ষে কক্ষে আলো জলিয়া উঠিয়াছে। খোলা জানালা দিয়া আলোকরশ্মি পথের ধারে কুঞ্জবনের মাথার পড়িয়া আবছারার সৃষ্টি করিয়াছে।

দোতলার একটি কক্ষে আলোকের সম্মুখে বিধবা-বেশিনী অচলা কি একখানা বই পড়িতেছিল। তাহার উন্মুক্ত কেশরাশি ছই গণ্ডের পাশ দিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিসের একটা অনির্দিষ্ট চিন্তায় যেন তাহার যৌবনজীমিত মুখখানাকে মাঝে মাঝে মলিন করিয়া তুলিতেছিল। পার্শ্বে উপবিষ্ট অমলা। তাহার শিথিল কবরী প্রীবার উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, পরিধনের শাড়ীর আঁচল লুটাইয়া গিয়াছিল। তাহার যৌবনোমুখ দেহভঙ্গীর সৌন্দর্য নিটোল গণ্ডে রক্তরেখার খেলা আলোর উজ্জলতা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল।

অচলা তাহার ঝুলিয়া পড়া কেশগুলি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অমলার দিকে চাহিয়া বলিল,—“কি করে অমলি, অমন ব’লে রইলি যে? একটু পড়াশুনা করুবিনে আজ?”

অমলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—“বড্ড খুন পাচ্ছে দি’দ, পড়তে ভাল লাগছে না।

মানকুমারী আসিয়া কড়াঘরের নিকটে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—“অচলা, আমারখানা কোথায় আছে, নিয়ে আর তো যা।”

অচলা মাতার দেহমণ্ডিত মুখখানার উপর ছই চক্ষু তুলিয়া ধরিত্রী বলিল,—“আচ্ছা মা, সীতা তো লজ্জার অংশ, তবু তাঁর এত হুঃখ কষ্ট ভোগ করবার কারণ কি?”

জুতার সজোর শব্দে বাহিরটা শব্দিত হইয়া উঠিল। মানকুমারী চকিতে চাহিয়া দেখিলেন, ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া দাবী স্বরং, মুখখানা তাহার গভীর, ক্রোধব্যগ্রক। ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি চাপা ক্রোধের স্বরে বলিলেন,—“ঐ ইজ্ঞা

ছোঁড়াটাকে আর তোমরা ওরকম প্রেমের দিওনা,—
এলে দরোয়ান ডেকে তাড়িয়ে দিও।”

মানকুমারী তাঁহার করুণ-নয়নের তীব্র দৃষ্টি স্বামীর
মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন,—“কেন, সে
এতই কি ঘোব ক’রেছে যে দরোয়ান ডেকে তাড়িয়ে
দিতে হবে?”

ক্রোধে শ্রামস্বন্দর বাবুর মুখমণ্ডল লাল হইয়া
উঠিল। তিনি বলিলেন,—“ও ছোটলোক—ছোটলোকের
সঙ্গে মেলে। এই তো ওর প্রেরোচনাতেই প্রোজা
এবার আমার কালীপুজোর বার্ষিক পার্বণী ঘের নি।”

মানকুমারী বলিলেন, “হায় হায়! তোমার
কথার আমি হাসবো কি কাঁদবো কিছুই ঠিক
ক’রে উঠতে পার্ছনে। তুমি জমিদার, তোমার
সিন্দুকে টাকা আছে, তোমার লোক জন আছে
—তোমার অতাব কি? তুমি মারের পুজোর
জন্তে অভায় অভ্যাচার করতে বাবেই বা কেন?
আর ভিক্ষকের মত হাতই বা পাতবে কেন? দেবতার
দোহাই দিয়ে গরীবের মুখের গ্রাস আর কেড়ে নিও
না।”—বলিতে বলিতে মানকুমারীর চক্ষুর পাতে অশ্রু
দেখা দিল, নতদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—
“বিধাতার অভিসম্পাত কিনা জানিনে, অচলায় আমার
বিয়ের গারে হলুদের গন্ধ না যেতেই কপাল পুড়ুল।
সংসারের সব দয়কারই যে তার মিটে গেছে। আর
তো আমার এক অমল। তার বিয়ে দিলেই তো
আমরা সংসারের সকল দার থেকে মুক্তি পাই।”

বাবু বলিলেন, “শুধু কি এই পুজোর ব্যাপারই?
ছোঁড়াটা কত রকমে লোককে উত্তেজিত ক’রে তাদের
আম্পর্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। তত্ত্বলোকের মান সম্মান
রক্ষা ক’রে চলাই যে দায় হ’য়ে পড়েছে।”

মানকুমারী দৃষ্টান্তে বলিলেন, “দেখ, মাহুকের
ধৈর্যের একটা সীমা আছে। এই তোমরাই ত এসব
মুর্থ নিরক্ষরের পুনঃ পুনঃ আঘাত ক’রে আর কাঁক
দিয়ে উত্তেজনার পথ তৈরী ক’রে রেখেছ। দেব
কায় বল তো? আর এটা কোনো যে গায়ের

জোরে ধনের জোরে মাহু মাহুকের কাছ থেকে প্রকৃত
সম্মান লাভ করতে পারে না।”

শ্রামস্বন্দর বাবু ক্রুদ্ধ হয়ে বলিয়া উঠিলেন, “বাও,
তোমার ওসব মেয়েলী নীতি কাহিনী আমি শুনে
চাইনে। জমিদারী রাখতে হলে, ছোটলোকদের কাছ
থেকে মান সম্মান পেতে হলে, লাটির জোর চাই।”
বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে মুখে হিংসার আগুন
জলিয়া উঠিল, পদশব্দে চারিদিক কম্পিত করিয়া তিনি
সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

মানকুমারী তার-তরা আকাশের দিকে চাহিয়া নীরবে
বসিয়া রহিলেন। শিবাকুল গ্রহর ঘোষণা করিয়া গেল।
মানকুমারী অকস্মাৎ চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন,
পার্শ্বে অচলা অমলা দুমাইয়া আ’ছ। অচলায় তরুণ করুণ
মুখখানির দিকে চাহিয়া আবার তাঁহার চক্ষুর কোণে
অশ্রু বকবক করিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,
—এই আমার অচলা এই আমার অমলা। এদের জন্ত
কি এত?

৪

আকাশ বাষ্প ঢাকা—সূর্য দেখা যায় না।
আগ্নয় বৃষ্টির আকাজ্যের প্রকৃতি বেন তিমিত লোচনে
শুক্লাবে দাঁড়াইয়া আছে।

বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। ইন্দুকুমার এই
মাত্র কেবলা বৃষ্টিদের জাতি-বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া
আসিয়া স্নানাহার করিয়া বাহির ঘরের বারান্দায়
একটা কদল পাতিয়া একা বসিয়া আছে। আদ
তাহার মনটা বড় ভাল নয়—উষিগ, নিরানন্দ। ঐ
রাপসা আকাশের দিকে চাহিয়া কত কি যে ভাবনা
তাহার মনের মধ্যে আসিতে লাগিল, তাহার সুম্পট
ধারণা সে নিজেই করিতে পারিল না। ক্রিয় সেখেকে
আসিতে দেখিয়া তাহার মনের কুরাসা বেন কতকটা
কাটিয়া গেল। একখানা মাহুর পাতিয়া বসিতে দিয়া
পরম প্রীতি-ভরা কণ্ঠে ইন্দুকুমার বলিল, “ক্রিয় চাচাকে
ক’দিন দেখতে পাইনি যে?—ভাল ত?”

করিল সেখ আনত মন্তকে সেলাম জানাইয়া হাসিবার চেষ্টায় মুখখানা বিকৃত করিয়া দীর্ঘ শ্বশ্ব-
রাগিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে গদগদ বক্তে বলিল,
“আজ্ঞে দাদাবাবু—ক’দিন বাড়ীছাড়া—যেদের বাড়ী
গেছছ।”

“তারপর, ধান পেলে কতগুলি? বছরের খোরাক—
কেও রাধু?—এস, বোস।”

রাধু মণ্ডল সভক্তি প্রণাম জানাইয়া ইন্দ্ৰ-
কুমারের পার্শ্বে উপবেশন করিল। তার পর
বিপিন গ্রামাধিক, রাধু সরকার, রসক তট্টাব
প্রভৃতি অনেকে আসিয়া সেখানে সমবেত হইল।
গ্রাম্য রীতিনীতি এবং পারিবারিক স্বথ হুণ্ধের কথার
ও হাসির কলরোলে স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিল।
ইন্দ্ৰকুমারের দ্বিষ্ট সরল ও স্তম্ভাশ-শূত্র অমায়িক
ব্যবহারে তাহাদের মধ্যে একতার বন্ধন দিন দিন
দৃঢ় হইয়া আত্মীয়তার পরিণত হইয়া উঠিতেছিল। বদিও
ইন্দ্ৰকুমার সামাজ্য অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে, তবুও
তাহার আসন অনেক শিক্ষাভিম্বানী, ধনগর্ব্বিতের
চেয়ে উর্দ্ধে।

সন্ধ্যার পূর্বে আকাশের বাষ্পবন ধূসরতা কাটিয়া
গেল—অন্তঃগমনোন্মুখ স্বর্ষ্যের সোণালী কিরণ দেবতার
আশীর্ব্বাদের মত ধরিজীর বক্ষে গুলিয়া পড়িতে লাগিল
—দিগদমনার নীলাকলে রক্তের ছোপের মত সিন্দূর-
রঞ্জিত মেঘসকল ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

শ্রামহুন্দর বাবু উজ্জান পরিদর্শন করিয়া কিরিবার
সময়ে ইন্দ্ৰকুমারের বাড়ীর সমুখের রাস্তা ধরিলেন—
পশ্চাতে তারণ চক্রবর্তী। কাহারও কোন কথা
নাই, লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে উত্তরে চলিয়াছেন। ইন্দ্ৰকুমার-
দের বাড়ীর সমুখে আসিয়া শ্রামহুন্দর বাবু হঠাৎ
ধামিয়া গেলেন—ক্রোধে তাঁহার কর্ণমূণ লাল হইয়া
উঠিল—চক্ষু দিয়া হিংসার আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে
লাগিল।

সেজের আলোর কক আলোকিত। বাহিরে
আকাশ পূর্ণ করিয়া ঘোতিলোক সকল তরু হইয়া

আছে। শ্রামহুন্দর বাবু একা গভীর মুখে বসিয়া
আছেন—একটা বির্রাট অশান্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া
ধরিল। ক্রোধ, হিংসা, স্তম্ভা তাঁহার মুখতলীর রেখার
ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাকিয়ার উপর হেলিয়া
পড়িয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, “এই বিলাসপুর গ্রামের
অমিদার—আমি, না ঐ ইন্দ্ৰ ছোঁড়াটা?—ঐ ছোটলোক
গুলো অমিদার ব’লে কি আমার একটুও সম্মান করলে?
অথচ ঐ হতভাগা ছোঁড়াটারই হ’ল এত বেশী!—
সেই-ই হল সব? যেমন করে হোক ওকে জব্ব করতেই
হ’বে; আর ঐ ছোটলোক গুলোকে—আমি যদি ওদের
ভিটে ছাড়া না করি তো, আমার নাম শ্রম রায়-ই
নয়।”

তিনি সোজা হইয়া বসিলেন—তাঁহার শিরায় শিরায়
তড়িৎ খেলিয়া গেল—দেহ-বষ্টি আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

অমিদারের লোক লাক্ষিত ও বিকৃত। পাইক
প্রহরী আর তেমন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গ্রামাঙ্গার
ভীতি উৎপাদন করিতে পারে না—তাহাদগকে বেশ
সজ্জিত হইয়া চলাফেরা করিতে হয়।

শ্রামহুন্দর বাবু শূত্র কক্ষে পারচরী করিয়া ঘুরিতে
লাগিলেন—অধীর, অশান্ত, উত্তেজিত ললাটের বেদ-
বিলু হই গড়ের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। বাহিরের
দিকে চাহিয়া হঠাৎ তিনি ধামিয়া গেলেন—বাহুধর
সুদৃষ্ট হইল—মুখখানা কঠিন হইয়া গেল—চক্ষুর কোণ
দিয়া ঘেন আগুন ছুটিতে লাগিল। তিনি আবার
ঘুরিতে লাগিলেন—দস্তে দঃ নিশ্চেষ্ট হইল—তাঁহার
কর্ষ স্পষ্ট ঘোষণা করিয়া উঠিল—চরম শান্তি! খুন!
খুন!

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেছে। মন্ড পথন ধীরে
ধীরে বহিয়া গেল, বিহগকুণ গাছের শাখার শাখার
ডাকিয়া উঠিল।

শ্রামহুন্দর বাবু বারান্দার আসিয়া অধীরকর্ষে
ডাকিলেন, “মানিক সর্দার!”

মানিক সর্দার আত্মনি প্রণত হইয়া সমুখে আসিয়া
দাঁড়াইল।

“এই দাখ, সবীন পাইককে সঙ্গে নিয়ে আজই কাব শেষ করে কেলেবি।”

মাণিক সর্দারের বৃকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল— চক্ষু ছুইটা জ্যোতিঃহীন হইয়া গেল। সে শ্যামসুন্দর বাবুর হিংসা-ঘের প্রদীপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্যামসুন্দর বাবু নিরবরে কহিলেন, “বা, আর দেয়ী করিসনে—নব্বুনেকে আমার কথা বলাই আছে। হুঁশো টাকা বখশিশ্।”—বলিয়া তিনি পকেট হইতে দশটাকার পাচখানা নোট বাহির করিয়া মাণিক সর্দারের হাতে শুঁকিয়া দিলেন।

ধরাবন্ধ নিবিড় অন্ধকারে সমাজের—শান্ত শুকতার বিলীন। পেচকের কর্কশ শব্দ, বিল্লীর কিঁ কিঁ রব সেই অন্ধকারের বীভৎসতা আরও বাড়াইয়া তুলিল—মাথার উপর মল্লজের কীর্ণ আলোক মিট মিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

বাহির ঘরে একটা কোচের উপর ইন্সকুমার উপবিষ্ট, সেজের আলোটা জ্বলিতেছিল। হঠাৎ শাফীর খসখস ও চুড়ীবালায় টুং টাং শব্দে সে চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া অমলা।—তাহার মস্তক জ্বলন্ত ললাটে কেমন একটা ছিন্ন সফরের চিহ্ন—গণ্ডের আৱজিত আভার মধ্যে কেমন যেন বিবর্ণ ভাব। একটা বিষন্ন ইন্সকুমারের মুখ চক্ষে ঘনাইয়া আসিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

সে ভাব তাহাদের বেশীক্ষণ রহিল না। অমলা অকস্মাৎ ইন্সকুমারের ডান হাতটা তাহার কুসুমপেলব হাত ছুইখানি দিয়া ধরিয়া কেলিল—ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, “পালাও ইন্সকুমার, তোমার পুন কর্ত্তে লোক আসছে।”

চাকলো উত্তেজনার ইন্সকুমারের মাথাটার ভিতর যেন বন বন করিয়া উঠিল। অণুকাল শুক থাকিয়া সে অমলার তোলোদুপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া বলিল, “পুন ? পুন কর্ত্তে আসছে ?”

অমলা ভেমনি কণ্ঠে বলিল, “জেনো ইন্সকুমার, পুন শুধু তুমি একা নও। ই সঙ্গে আমাকেও—”

পদশব্দ ও অধীর নিশ্বাসে বাহিরটা সজ্জ হইয়া উঠিল। অমলা চকিতে কিরিয়া দাঁড়াইল—মুহূর্ত্তের মধ্যে দ্বারের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, “পুন কর তোমরা আগে আমাকে—বার বল্তে এত গোলমাল, এত অশান্তি।”

শুণ্ণদের হতবৃত্ত তরবারী খলিত হইয়া গেল, তাহার সতবে সসন্ত্রমে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

৫

অশান্তি ও অসন্তোষে সারা গ্রামখানি যেন বিবাক্ত হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, গুণ্ডগোল। মানুষ বধন ধৈর্যের সীমারেখার বাহিরে গিয়া পড়ে, তখন তাহার শুভ অন্তত বিচার করিবার শক্তি হারাইয়া যায়।

রাজি ছিপ্রহর প্রায়—চারিদিক নিরুন্ম নিস্তব্ধ। বৃকের শাখার শাখার, কুজবনের মাথার মাথার খজোৎ বিকাশ হইয়া অন্ধকারের গাঢ়তা একটু হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, কৃষ্ণা নবমীর চাঁদে তখনও পূর্বাকাশ রাভা হইয়া উঠে নাই।

জমিদার তবন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন—চতুষ্পার্শ্বের বাড়ীগুলিরও সেই অবস্থা। অকস্মাৎ একটা হুড়হুড় শব্দে শ্যামসুন্দর বাবুর নিজের ঘোর কাটিয়া গেল—তিনি চমকিয়া উঠিয়া শয্যার উপর বসিলেন। জানালা দরজার উপর হুড়ুম হুড়ুম শব্দে শিলাবৃষ্টির মত ইষ্টক রাশি পতিত হইতে লাগিল—বিজ্রোহীণের বিকট চীৎকার অন্ধকারের বন্ধ ভেদ করিয়া দিকে দিকে ছুটিয়া চলিল। মানকুমারী ব্যগ্র বাহুর মেহময় আবরণে তাহার অঙ্গা অমলাকে ঘিরিয়া ধরিয়া, আলোর সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। কি রামাণ মা. বরদা, নিত্য উটকঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। শ্যামসুন্দর বাবু উদ্বিগ্নের মত ছুটিয়া আসিয়া ভীত-কাতর নরনে স্ত্রীর পানে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “সব বুধি বার! উপায় কি হবে এখন ?”

মানকুমারী ইদিতে উর্ক দিকে দেখাইয়া দিয়া তেমনি তাবে বলিয়া রহিলেন—তাঁহার সুখ দিয়া কথা সন্নিগ না।

সদয় দরজা ভাঙিয়া গেল -- বিকট শব্দ কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল।

শ্যামসুন্দর বাবু সতরে জনন-জড়িত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “গব বুঝি বার।” এই সময় একটা গভীর বেদনা বঠে লইয়া কে একজন ডাকিয়া উঠিল, “মেসো মশাই।”

শ্যামসুন্দর বাবু চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিলেন, বিজ্রোহী প্রজাগণের সম্মুখে ইন্দুকুমার।

“বতক্ষণ দেখে একবিন্দু রক্ত আছে—বতক্ষণ এই হাত ছুঁটো সম্পূর্ণ অক্ষয় না হয়, ততক্ষণ কারও সাধ্য হবে না আপনাদের অজ সম্পূর্ণ করিতে;”—বলিতে

বলিতে ইন্দুকুমার আলোর উজ্জলতা বাড়াইয়া দিয়া বাহিরের দিক্‌কার জানালা খুলিয়া দিল। উদ্ভূত প্রজাগণ ইন্দুকুমারকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

শ্যামসুন্দর বাবুর চক্ষু দিয়া হ হ করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, “আমার মান সম্মান, বা কিছু সবই আমার এই অমলা,—তাকে তোমার সমর্পণ করলাম, তুমি রক্ষা কর।” বলিতে বলিতে অমলার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া ইন্দুকুমারের হস্তের মধ্যে পুরিয়া দিলেন।

সমস্ত গুণগোল নিশীথিনীর নীরবতার বিনীন হইল, শান্তির স্রবাতালে ভুবন ভরিয়া গেল।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভৌমিক।

অজন্তা

(পূর্বানুবৃত্তি)

অজন্তার শ্রেষ্ঠ সম্পৎ তাহার অপূর্ণ চাক চিত্র। সে চিত্র ভগতে অতুলনীয়! একাধারে চিত্র, তক্ষণ শিল্প, ও স্থপতিস্বকীয় পরিবর্তনের অদ্ভুত মিলন, অদৃষ্টপূর্ব সাবজ্ঞতা। এই চিত্রগুলির সম্বন্ধ ইউরোপীয়েরা ১৮১৯ খৃঃ প্রথম সংবাদ পান। মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের খরচে মেজর গিল ততকালি প্রতিলিপি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা বিলাতে Crystal Palace এর দক্ষিণাংশ পুড়িয়া বাইবার সময় একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। গিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া বাহা নকল করিলেন, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাহা তত্ত্বগুণে পরিণত হইল। পরে বোধে স্কুল অব আর্টের মিটার প্রিকিঞ্চ ও তাঁহার ছাত্রগণ ১৮৭২ হইতে ১৮৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিলিপি লন। সেগুলি লণ্ডন সাউথ কেন্সিংটনে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে সংরক্ষিত ছিল। পরে মিসেস হেরিংহাম ও

কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী চিত্রের নকল করেন। কয়েকজন প্রথিতযশা বাঙ্গালী শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর—অজন্তা চিত্রাবলীর প্রতিলিপি লইয়াছেন। বোধে স্কুল অব আর্টের দ্বারা চিত্রিত প্রতিলিপিতে প্রাণ নাই; তাহা হইতে অজন্তার শিল্পীগণের প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না।—“The uninspired copies made by the Bombay School of Art, where the minds of the Indian students are still drugged with the dull academic formularies of Europe give no indication of the technical power and transcendent genius of the Ajanta painters.”—Havell—Ancient & Medieval Architecture of India, p. 150.

। ও বিকটাকার চিত্রগুলি সেই উদ্দেশ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। অজন্মভে ভাবচক্রের একটি ছবি ডাক্তার ওরাদেল আবিষ্কার করেন। এই চক্র এক বিকটাকার কিছুত-কিম্বাকার দৈত্যের কবলগত। এতৎসম্বন্ধে তিনি "Buddhism in Thibet" এবং "Lhasa and its Mysteries" নামক পুস্তকদ্বয়ে ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিব্বতদেশে এই ভাবচক্র বিহার-গাজে চিত্রিত হয়। তাঁহার মত উদ্ধার করিয়া দিলাম—“..... The Wheel of life when I first discovered it in a fresco in the ancient cave Temples of Ajanta and brought it to the notice of western readers. ...It looks like a large painted spoked plate held in the clutches of a monster and depicts in concrete symbolic form round the rim the chain of abstract conceptions upon which Buddha hung his doctrine of delivery from the cycle of rebirths and all their entailed misery, ...” —*Lhasa and its Mysteries*, pp, 222, 223; এবং আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী প্রণীত—জিজ্ঞাসা, পৃ: ২১৩—২১৫; Rudyard Kipling প্রণীত Kim অষ্টব্য।

ছোট ছোট ছেলের মন ভুলাইবার জন্য আলকালকার 'হাসি খুঁ' ধরণের পুস্তকে দেখা যায়, হাতীর খড়ে বকের মলা জুড়িয়া অথবা মুরগীর খড়ে সাপের কণা বোগ করিয়া কিংবা ঐরকমের উদ্ভট ছবি দিয়া ছেলের নাকী ছিঁড়িয়া কলিবার বড়বড় করা হইয়াছে। এই ধরণের ছবি অজন্মের বরণ নহে। মানবের অবয়বের সহিত পশুর অবয়ব যথোপযুক্তে কিম্বদন্তি ও অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। রূপাহিনিস বখন এদেশে আসেন, তখন তিনি উত্তর-হৃদিত অদ্ভুত জীব ও ভূত প্রেতের গল্প শোনেন। কোনও ক্ষেত্রে পা ছুইটা উন্টা, কাহারও খড়ে মাথা নাই, সে মাথা আছে পেটটা দখল করিয়া, মাছ বর মুখওয়ালা জীব মুরগীর ঠোঁটে ভর দিয়া বেড়াইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ই সব গল্প লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতীচ্যের মনীষিগণের নিকট তিনি মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রায় প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন।

কিন্তু আমাদের পিতামহের গল্পে এইরূপ জীবের অপ্রাচুর্য্য নাই। এই বিকট বীভৎস কল্পনার ছবি এখানেও দেখা যায়। এই অদ্ভুত ছবিতেও শিল্পীর রচনা-কৌশল বর্ণিত আছে। মাহুচ চিরকাল গভীর থাকে না, তাহার তরল দিকটাও আছে। কল্পনার এই খোরালের দিকটাও স্থল্যর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐহিক, পারমার্থিক; তরল, গভীর; কোমল, কঠিন; কল্পন, হাত্তাকৌশল; বিকট, বীভৎস—সর্ববিধ রসের ব্যঞ্জনার সমৃদ্ধ অজন্মের শিল্প অঙ্গতের শিল্পরাজ্যে চক্রবর্তীর আসন অধিকার করিয়াছিল বলিলে অত্যাুক্তি হয় না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ব্যতনামা করানী পণ্ডিত ফুশে (A. Foucher) ১৮২০ খৃষ্টাব্দে একসপ্তাহ, ১৯১৯ তে তিনসপ্তাহ ও ১৯২০ (জানুয়ারী—মার্চ) আট সপ্তাহ অজন্মের কাটাইয়া অতি বহু সহকারে চিত্রগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে সব চিত্রকে ঐতিহাসিক বলিয়া এ পর্যন্ত ধরা হইয়াছে, বাস্তবিক সেগুলি ঐতিহাসিক নয়, পরন্তু জাতকবর্ণিত আখ্যায়িকারই অঙ্কন। বিজয়সিংহের সিংহল আক্রমণ চিত্রিত হয় নাই; পরন্তু সিংহল জাতীর একজন সদাগর রাক্ষস রাক্ষসী অধ্যবিত লকাবীপে আসিয়া কি বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে (সিংহলাবাদ,—বলাসঙ্গ নামক জাতক কথা, * দিব্যাবদান ৩৬ ও মহাবল্লভ অষ্টব্য)। ফুশে বলিয়াছেন—

“Long ago it was realized that decoration of Ajanta is one of the most precious mines for the history of Indian civilization in its humblest as well as in its most sumptuous aspects. But having made myself clear on that point, I must declare that, to my regret, we must decidedly give up the hope cherished by many admirers of Ajanta, of

finding there a sort of historical gallery telling us about the great events and showing us the great personages of the Indian past, the subject of all the depicted scenes is borrowed from one or other of the two great parts of the Buddhistic legend, the jatakas and Buddha's career."—অতএব সব চিত্রগুলিই পরমার্থিক; নিছক ঐহিক নহে। পারসীক দৌত্যসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, শুধু যদি এই ছবিটিতে মাত্র পারসীক-দৌত্যের সামন্তসম্বন্ধের নিদর্শন থাকিত, তাহা হইলে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত; কিন্তু অজন্তা বহু চিত্রে পারসীকগণকে দেখা যায়। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, অজন্তা ভারতের পশ্চিম উপকূল হইতে বেশী দূর নয়—ওতমানীতন আন্তর্জাতিক ব্যবসারে পশ্চিম উপকূল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ফলে বৌদ্ধগাহিত্য ও বৌদ্ধমূর্তি-শিল্পতত্ত্ব ভাল করিয়াই অধ্যয়ন করিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং অনেকদিন ধরিয়া চিত্র-শিল্পকে পরীক্ষা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার মত আমাদের প্রশিধানযোগ্য।

ববে স্কুল অব্ আর্টের অধ্যক্ষ জীযুক্ত সলোমন সাহেব Women of Ajanta নামক স্কুলের পুস্তকে অনেক বিষয় লিখিয়াছেন—পড়িবার উপযুক্ত। কি গভীর জ্ঞান, কি বিভিন্ন শিল্প-শিকাই যে শিল্পীদের ছিল, তাহা চিত্রিত নর-নারীর নানা ভঙ্গী ও মূর্তির প্রকাশ পাইতেছে। নন্দিকেশ্বর প্রণীত ‘অভিনয়দর্পণ’ের ইংরাজী অনুবাদ—Mirror of Gestures নামক পুস্তকের সূচনার আচরণ জীযুক্ত আনন্দ-কুমার বাবী লিখিয়াছেন—“The Ajanta frescos seem to show unstudied gesture and spontaneous pose, but actually there is hardly a position of the hands or of the body which has not a recognised name and precise significance.” গতাকা, শুকতুণ্ড, হংসাখ্য প্রভৃতি মূর্তির চিত্রিত নারীকে দেখা যায়। (ভারতের নাট্যশাস্ত্র, জীযুক্ত বাবী প্রণীত শিল্পরত্ন; চিত্রলক্ষণ ও বিমূখ্যোক্তরত্ন প্রভৃতি)।

Hyderabad Archæological Surveyor ১৯১৪—১৯১৫ সালের বার্ষিক রিপোর্টে ডেনমার্কদেশীয় অধ্যাপক শ্রীমতী Axel Jarl-এর মতব্য ভারতীয়দের ভাল করিয়া গড়া উচিত। আমি স্থানে স্থানে তাহার উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

“The water-paintings in the rock-cut caves at Ajanta exhibit the classical art of India. That is to say they represent the climax to which genuine Indian art has attained, and they show the way to be followed by Indian artists....The painters were guided by a highly developed sense in their blending of colours with a view to the total impression to be produced.

“This technique which reaches its climax in a Bodhisatwa figure in Cave I bears a striking resemblance to that of Michael Angelo. If one placed a good photograph of this Buddhahead by the side of a photograph of a figure from the Capella Sixtina, one might be inclined to think, if no attention were paid to the different types of the figures, that they were painted by the same master.

“This perfect freedom in the painter's handling of the human body places Ajanta one thousand years ahead of all other paintings that we know.

“Great and thorough study of Nature and a patient and industrious training in tradition made it possible for the artist to transcend reality as he does so often to express what is the distinctive aim of all oriental art, the soul, the spiritual side of existence.

"India will get her Renaissance if she turns to Ajanta and goes to school there.

Whoever wants to serve the cause of pure Indian Art will find his masters here whose steps he must strive to go. He will do as they did, first of all to study Nature to master the secrets of form, volume and movement. But then he will go to Ajanta to cultivate his sense of deep and harmonious colours, of distinct and full composition, of expressive and pleasing lines, and last and not least, of genuine Hindu figure and style.

As he lives and studies among their works, he will catch something of their sacred fire, until in him he feels the heart vibrating while the hand draws a clear and bold outline. This is why those old Buddhist masterpieces so often leave upon the observer the impression of a prayer or a hymn of praise."

ভারতের সেই সমুদ্রত শিল্প আর কি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে না ? ভারতীয় শিল্পীর নিকট বিদেশীয় শিল্পীর আহ্বান কি ব্যর্থ হইবে ?

শ্রীকালীপদ মিত্র ।

প্রয়াগে কুন্তুমেল

অর্ধকুন্ত উপলক্ষে এবার প্রয়াগে মাঘমেলার মহোৎসব দেখিবার জন্য অগ্রহারণ মগ্ন হইতেই সন্ধ্যা ছিন্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু সময় যখন উপস্থিত হইল তখন পথের অসম্ভব জনতার কথা শুনিয়া সংকল্প ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিল। তারপর কলিকাতা হইতে প্রান্ত ক্লাস্ত দেহমন লইয়া যখন গিরিডি কিরিলাম, তখন প্রয়াগ বাইবার বাসনা মন হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইল। এদিকে কিন্তু এক উপসর্গ জুটিয়াছিল, ছিন্নতার বছরের বৃদ্ধা দ্বিদিমাটি তাঁহার জীবনে পুণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য অর্ধকুন্ত যোগে প্রয়াগে জীবনী সঙ্গমে দান করিবার বাসনা লইয়া কলিকাতা হইতে আমার সঙ্গে লইয়াছিলেন। যেমন করিয়া হউক তাঁহাকে প্রয়াগে পৌছাইতেই হইবে। কিন্তু গিরিডি হইতে প্রয়াগ বাজী কংহারও সন্ধান পাওয়া গেল না। একজন সহযাত্রী বয়স জুটিয়া বাসলেন, তাঁহারও বয়স বাটের নীচে নয়। অগত্যা ইহাদের লইয়া ও ছুটি শিশু সন্ধান লইয়া আমরা

২০শে মাঘ রবিবার সকালে প্রায় আটটার সময় গিরিডি হইতে রওনা হইয়া বেলা নবটার সময় মধুপুর ঠেঁশনে পৌছিলাম। এলাহাবাদ বাজী ট্রেন অপেক্ষা করিতেছিল, গাড়ীতে স্থানও নাই। তবে ইন্টার ক্লাশ মহিলাদিগের কামরার বাজিনীর সংখ্যা বেশী ছিল না—সুতরাং সহজেই আমাদের সন্ধান হইয়া গেল। বিনি আমাদের তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন তিনি অন্তর দিলেন, মহিলাদিগের কম্পার্টমেন্টে ইন্টার ক্লাসে ভিড় কোথাও খুব বেশী হইবে না। আমরা আশ্বস্ত হইয়া বসিলাম।

সারাদিন এবং রাত্রি ১২টা পর্যন্ত একরকম মন্দ কাটিল না। বাজিনীদিগের সংখ্যা ছই পাঁচজন বাড়িতেও থাকে, আবার কমিয়াও যায়। খার্ডক্লাস বাজিনীর দল মধ্যে মধ্যে আসিয়া ট্রেন ঘেঁরাও করিয়া কেলিবাঁজ। আমরা ভীত হয়ে প্রতিবাদ করি—দেড়া তড়া—উদার বাও। দিনের আলোর বতকণ অন্তর ছিল ততক্ষণ এই বলিয়াই উহাদের ঠেকাইতেছিলাম,

কিন্তু রাজি হইবামাত্র আর ঠেকান হুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কামরার স্থান বারো জনের জন্ত নির্দিষ্ট— কিন্তু ক্রমে পনেরো জন বাজিগী সে স্থান পূর্ণ করিয়া কেলিল। তারপর হঠাৎ একটি ট্রেনে আট জন পুরুষ জোর করিয়া কামরার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আমরা সমকর্মে তারত্বের প্রতিবাদ করিতে লাগিলাম, —ইরে কেনানা কামরা—নিকাল বাও। তিনজন পর্দা-নশীন দিল্লী-বাজিগী মুসলমান মহিলা ছিলেন, দুইজন কলিকাতা হইতে আসিতেছেন একজন বাকীপুর হইতে কামরার ডুলি লাগাইয়া এবং তাহার উপর চারিদিক হইতে চার চাকা দিয়া বোরখার মুখ ঢাকিয়া ট্রেনে উঠিয়াছেন। এমন কি সঙ্গী পুরুষগণ আমাদেরকে কিছুক্ষণের জন্ত কামরার সমস্ত জানালা গুলি একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত অহুরোধ করিয়াছিলেন; সহ-বাজিগীগণ কিন্তু দমবদ্ধ হইবার ভয়ে এ প্রস্তাব অহু-মোদন করেন নাই। একটি প্রৌঢ়া মহিলা বয়ঃ বলয়-ছিলেন, বহুজনের সঙ্গে চলিতে হইলে এ ভাবে আত্ম রক্ষা করা অসম্ভব, কেন না প্রতি ট্রেনেই তো ট্রেন থামিবে; সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানালাগুলি তুলিয়া দিয়া অস্থূল্যপ্তার সম্মান রক্ষা মোটেই সম্ভব নয়। বাহা হউক, হঠাৎ করে কজন পুরুষ বাজীর আবির্ভাবে আমরা অত্যন্ত চকিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলাম। দিল্লী বাজিগী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহাদিগের অন্তঃপুরে একটি পাঁচবৎসরের বালকেরও প্রবেশ নিবেদ, এবং এমন কি একটি পুরুষ কুকুরও তাহাদের পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পায় না, আর কি না “বে-সমক” পুরুষগণ ইহাদেরই সম্মুখে আসিয়া মান ইচ্ছাৎ এক কালে সব নষ্ট করিয়া দিতেছে! কিন্তু—চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী—আমাদের প্রতিবাদের মধ্যেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনে নিত্যন্ত স্থানান্তর। আমরা সেই পুরুষগুলিকে বারবার তাহাদের এই বোধহীন কার্যের জন্ত বোধে ভিন্নকার করিতে লাগিলাম। বলিলাম, পরের ট্রেনে পুলিশ ডাকিয়া ধরাইয়া দিব। তাহারা কিন্তু নির্বিকার—

সহজ ভাবেই বলিল, “কাল কুস্তমেল—সুতরাং এই ট্রেনে আমাদেরকে প্রয়াগে পৌছাইতেই হইবে, কোনও কামরার তিলান্ন স্থান না পাইয়া আমরা এই ট্রেনে উঠিতে বাধ্য হইরাছি।” ব্যাপার সঙ্গীন বুঝিয়া মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে মোগলসরাই ট্রেনে নামিয়া বাইবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলাম। অনিরাহিলাম, কলিকাতা হইতে স্পেশাল আসিতেছে, সেই ট্রেনে বাইবার পরামর্শ দিলাম, তাহারা তখন সম্মত হইল।

এদিকে রাজি একটার সময় মোগলসরাই ট্রেনে ট্রেন থামিবামাত্র সে কি ব্যাপার—লাঠি সোঁটা লইয়া আবার একদল পুরুষ সেই কামরার উঠিয়া পড়িল। দরজার বিবম ধাক্কাধাক্কি চলিতে লাগিল। তবে হতবুদ্ধি হইয়া সেদিকে চাহিয়া আছি, এদিকে জানালা গলাইয়া খুপকাপ ও “মাইরা হো” শব্দে চমকিয়া চাহিয়া দেখি প্লাটফর্ম হইতে সঙ্গী পুরুষগণ বৃদ্ধা সঙ্গিনীগুলিকে পুঁটুলির মতো করিয়া জামালা দিয়া ভিতরে ফেলিয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে উপরে নীচে মানুষে ভর্তি হইয়া গেল। মানুষের উপর মানুষ—এতটুকু দাঁড়াইবার স্থান নাই। তখন চীৎকার করিয়া বলিলাম, বাহারা ঢুকিয়াছে তাহারা এখন দরজা বন্ধ কর, আর যেন কেহ না ঢুকিতে পার। সৌভাগ্যের বিবর সে লোকগুলি তৎপর হইয়া তখন লাঠি লইয়া দরজা বন্ধ করিতে লাগিল। গণিরা দেখিলাম, বারজন নির্দিষ্ট আরোহীর স্থানে পদতাল্লিণ জন আরোহী হইরাছে। গ্রীষ্মকাল হইলে সর্দিগর্ভিতে মানুষ ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই মরিয়া বাইত। অল্পকূপ হত্যার কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। এদিকে এক হস্ত পরিমিত স্থানে দুই বৃদ্ধা আমার শিশু কন্যাটিকে কোলে লইয়া তবে কাঁপিতেছে।—পাঁচমিনিটের স্থানে কুড়ি মিনিট ট্রেন ট্রেনে দাঁড়াইয়া রহিল। এক ভীষণ কোলাহল কাণে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। বুঝিলাম, বাজীদের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির জন্ত এই ব্যাপার বাধিয়াছে। বাহা হউক, এখন ট্রেন ছাড়িল তখন বাজীদের উদ্ভ্রত কর্তব্যের “জয় প্রয়াগ মহারাজ” শুনিয়া যেন কাঁপিয়া উঠিলাম।

এখনও গন্তব্য স্থানে পৌছিতে সাত ঘণ্টা বাকী—

আইন কানুনের দোহাই এ ক্ষেত্রে কিছুই খাটিবে না, ন্যূনতম করিয়া এখনও অসংখ্য রাজী ট্রেনে ট্রেনে উঠিবার জন্য তৈলার্তলি হুড়াহুড়ি করিবে। বাহাহউক সত্তরে শুধু দেবতার নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম। কিছুকণ পরে অন্য ট্রেনে আবার থামিবারাজ সেই একই ব্যাপার—মানালা গলিয়া লোক ঢুকিবার চেষ্টা করিবারাজ এবারে রাজীর খড়খড়ি তুলিয়া দিয়া সেই অতি শীতল শীতের রাজেও থামিরা উঠিতে লাগিল। বসিবার এতটুকু স্থান নাই। লোকের পর লোক শুধু দাঁড়াইরা আছে রাজ, উদ্ভত রাজীর দল তাহা দেখিরাও কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য ভাবে এই কামরার উঠিতে চায়। বাহাহউক, এখন হইতে বখনই ট্রেনে ট্রেন থামিতে লাগিল, খড়খড়ি তুলিয়া দিয়া আমরা আর নূতন রাজী দলের চড়াও হইতে অব্যাহতি পাইতে লাগলাম।

এইভাবে কারাকুদ্ধ অবস্থার বেলা আটটার সময় ট্রেন বখন এলাহাবাদ পৌছিল তখন খুকীর সে কি আনন্দ! প্রভাতের শান্ত শীতল নূতন বাতাস বেন সেই সর্ব্বদেহে নবীন স্পর্শ দিয়া নূতন জীবন সঞ্চার করিল। অগণ্য জন কোলাহলে ট্রেন ভরিয়া গেল। নামিবারাজ তুলিলাম, আর বিশ লক্ষেরও অধিক নর নারী আসিরা উপস্থিত হওয়ার গতপথেই স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কার চারিদিকে ভাব করিরা এলাহাবাদ রাজীর টিকিট বন্ধ করিরা দিয়াছেন এবং স্পেশালও আর আসিবে না।

বাহাহউক আমাদের লইবার জন্য ট্রেনে আত্মীয়গণ উপস্থিত ছিলেন এবং এই ভীড়ের মধ্যে অক্ষত দেহে পৌহিতে পারিব কি না ইহাও সন্দেহ করিতেছিলেন। আমাদিগকে নিরাপদ দেখিরা তাঁহাদের সব সন্দেহ দূর হইল। আমরা বাড়ী আসিরা জিনিবগড় গুছাইরা প্রাণ কেজে বাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আজ এলাহাবাদের একাওরাগাদের পোরাবারো—সহর হইতে মোটর লার, মোটা পাড়ী, ট্রেন, একা দলে দলে সদস্যদে মৌড়িতেছে, তবু রাজীর আর শেষ নাই, স্ত্রতরাং চতুর্গণ ভাড়া দিয়াও আজ নিস্তার নাই।

বাহা হউক আমরা মেলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। গলার বেড় কোশ ব্যাপী প্রশস্ত বন্ধে চড়া পড়িরাছে, বর্ষার হুইকুল প্রাণিনী জাহবী আর শীর্ণভোরা—আজ তাঁর ধু ধু বন্ধে শুধু অসংখ্য নর নারীর বেলা—বতবুর দৃষ্টি চলে কেবল অগণ্য নরনুও। মোকানী পসারী মেলায় উপযুক্ত সামসজ্জা লইরা জমকাইরা বসিরাছে। কুটারের পর কুটার বাধা হইরাছে, তাঁবুরও সীমা নাই। বাঁধের উপরে ছই দিকে পুলিশেরও ছাউনি পড়িরাছে। মেলাস্থলে জলের কল, ডাকঘর, আলো সব কিছুই উপযুক্ত ব্যবস্থা হইরাছে। প্রায় দশ হাজার নাগা ও সাধু সন্ন্যাসী এই বোগে দান করিতে আসিরাছেন। মহাত্মা শকরাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত দশনামীর দশ সস্ত্রদারের কেহই অল্পপস্থিত নাই। গিরি, পুরী, উদাসী, বৈরাগী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সস্ত্রদারের ভিন্ন ভিন্ন আখড়া স্থাপিত হইরাছে। উট, গাভী, বোড়া, প্রভৃতি বাহনও অসংখ্য। অনেক সাধু ট্রেনে মোটেই গতায়াত করেন না, তাঁহারা স্ত্রদর ঘরকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, হরিদার প্রভৃতি স্থান হইতে দল বল লইরা বাহনে চড়িরা আসিরাছেন। সস্ত্রতি ৭ই কাল্‌এন চতুগ্রহণ হইবে, পূর্ণগ্রহণ উপলক্ষে কান্দীধামে মহাদান হইবে, স্ত্রতরাং সাধুগণ সকলেই মেলা শেষে সেই স্থানেই রাজী করিবেন।

হরিদার উজ্জয়িনী কুরুক্ষেত্র ও প্রাণ, এই চারিখানে কুন্তযোগ হয়। প্রতি ছয় বৎসরে অর্ধকুন্ত, এবং বারবৎসরে পূর্ণযোগ অর্জিত হয়। এই বোগে দান সাধুগণ কামনা করিরা থাকেন এবং সেই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ নর নারীও সাধুদর্শন কামনার ও দানাদি করিবার জন্য তীর্থক্ষেত্রে সমবেত হইরা থাকেন। এইটাই খুব অশুভ্যের বিষয় যে, বিজ্ঞাপন নাই, নিয়ন্ত্রণ নাই, প্রাণ্ড বিতরণ নাই, অথচ বেন উপযুক্ত সময়ে কোন্ অদৃষ্ট অঙ্গুরির সন্ধেতে নিয়মিত স্থানে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সাম্মলন হয়, মোকানী, পসারী কেহই আসিতে ত্রুটি করে না। তুলিলাম, চারিটি কুন্তক্ষেত্রের মধ্যে প্রাণই প্রধান। এত বড়

বিস্তৃত মহাক্ষেত্র ভারতের আর কোনস্থানে নাই। সেজন্য বিশ্ব লোকেরও অধিক বাড়ী সমাগম এই মহাক্ষেত্রে কেন্দ্র করে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। প্রায় এক সংস্রব স্থল বলিক খেচ্ছাসেবক সাজিয়া সাধামত দানার্থী বাড়ীদলকে সাহায্য করিতেছিল। আজ সকালে নয়টার পর হইতে অমাবস্তা যোগে কুন্তমেনা আরম্ভ হইয়াছে, কাল ভোর হইতে সাধুদের দান আরম্ভ হইবে। স্তত্রায় ভিড়ের আর অন্ত নাই। আজ ভিড়ের মধ্যে একটি খেচ্ছাসেবক ও একটি শিশু শিখিয়া মরিয়া গেল। সকলেই সেই হতভাগ্যদের জন্ত হা ছত্যাশ করিতে লাগিল।

২২শে মাঘ মঙ্গলবার—কাল বেলা নয়টার পর হইতে আজ বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অমাত্যের স্থিতি কাল। আজ সর্ব-প্রথমেই সাধু দান—সন্ধ্যায় প্রথমেই ইহাদের দান পূর্ণ শেষ হইলে তবেই সাধারণের দানাদিকার বর্তিবে। পদব্রজে, হস্তী আরোহণে, উষ্ট্র আরোহণে শত শত সাধু ভোর হইতেই দানে চলিয়াছেন। সর্বত্রই পদাতিক বা অখারোহী সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী শান্তি রক্ষার জন্য ব্যস্ত। বড় বড় দলপাত মোহান্ত এবং আধড়াধারী সাধুদিগের সহচরগণ স্বর্ণ রৌপ্য মণ্ডিত গড়কী ও দণ্ড লইয়া আশ্চর্য্য ক্রোড়া নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে দানে চলিয়াছে। নাগা সন্ন্যাসী, বা সংসার বিরাগী সাধুদিগেরও এই প্রকার আশ্চর্য্য আড়ম্বর দেখিয়া আমার একজন সঙ্গিনী বলিয়া উঠিলেন, পুণ্য ক্ষেত্রে এ কি বিসদৃশ ব্যাপার!

একজন দানার্থী সাধু আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, ধর্ম্মের নামে এ আড়ম্বর অবহেলার বস্তু নয় না, তুল বুঝিও না। ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। সংসার বিরাগী, চির উদাসীন সন্ন্যাসী শব্দরের সম্মুখে যুক্তপাণি নভজ্ঞান কুবেরের মূর্ত্তি দেখিয়াছ কি? ইহার বার্থ অর্থ ইহাই যে, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই ঐ মহা ত্যাগীর চরণ ধূলায় সংলগ্ন। আমি বলিলাম, কিন্তু এই হাজার হাজার গৈরিক ধারীর মধ্যে বার্থ সত্যকার ত্যাগী মহাপুরুষ কয়জন আছেন?

তিনি কহিলেন, “তা তো জানি না না, তবে একথা খুব ঠিক যে, আসল আছে বলিয়াই মেকী চোখে পড়ে। এই পুণ্যভূমি মহাতীর্থ প্রয়াগ ক্ষেত্রে একদিন সর্বত্যাগী প্রেমের ঠাকুর ঈশ্বরানন্দ প্রভু রূপসনাতনকে অপূর্ণ তত্ত্ব তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। আরও অতীতের কথা, এই ক্ষেত্রে মহা মহাবিগণ অনেক তত্ত্ব আলোচনা করিয়া, উচ্চাদের ধর্ম্ম সাধন করিয়া তাঁহাদের সাধনার বীজ এখানে বপন করিয়া গিয়াছেন। বোদ্ধ যুগে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন এই পুণ্যক্ষেত্রেই বলিয়া তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য সমস্ত অকাতর চিত্তে দান করিয়া দীনতা অবলম্বন করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। আজ শুধু সেই কথাই স্মরণ করিয়া ধন্ত হও না যে লক্ষ তত্ত্বের পদরেণু আজও এই পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রের প্রতি রেণুতে মিলিয়া আছে, এবং এই সমাগত বহু লক্ষ জনের একমুখী ডাব আজও এই পুণ্য ক্ষেত্রে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছে।

এই সকল বিশ্বাসপূর্ণ কথাগুলি আগে বেন অমৃতের স্পর্শ বুলাইল। ইচ্ছা বড়ো ছোট শিশু লইয়া সেই জনতা ঠেলিয়া দান করা সাহসে কুলাইল না, বাড়ী ফিরিলাম। মাতামহীগণ তীরস্থ কুটারেই রহিয়া গেলেন।

২৩শ মাঘ—আজ শরীর অসুস্থ বলিয়া আর বাড়ীর বাহির হইলাম না। এলাহাবাদে নুতন করিয়া দেখিবার কিছুই নাই, এবার শুধু কুন্তমেনা দেখিবার জন্যই আগমন।

২৪শে মাঘ—আজ সকালে উঠিয়াই শুভ সংবাদ শুনিয়া আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। মহাআত্মীর আজ সুক্তি হইবে। কেহ বা বলিতেছে কাল হইবে। বাহা হউক শুনিবামাত্র মন প্রফুল্ল হইল। অবশ্য মহাআত্মীর জ্ঞান সাধকের কাছে বাহিরের সুক্তের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। অন্তর বাহ্যর স্বাধীন, একগতে তাহাকে বন্ধন করে কে? কিন্তু তাঁর মত শান্তির ও সত্যের উপাসককে শক্তির গর্বে অন্ধ হইয়া বাহারা বন্দী করিয়াছে, তাহাদের হীনতা স্মরণ করিয়া সর্ব মানবের অপমানে মহামুগ্ধ যে শিহরিয়া উঠিতে চায়! এ মানি তো শুধু জাতি বিশেষের নয়—এ যে সর্ব মানবের মানি—এ মানি ছুই হইলেই মঙ্গল।

আজ বেলা একটার সময় মেলাস্থল একবার ভাল করিয়া দর্শন করিবার জন্ত গেলাম। আজ ভিড় নাই, অনেক বাজী ইতিমধ্যে বহানে প্রস্থান করিয়াছে। সাধুদিগের ছই তিনটি বড় বড় আখড়াও আজ প্রাতে বেনারস বাজা করিয়াছে। তবে দোকানী পসারীর আড়ম্বর তেমনই আছে।

মেলাস্থলে ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের সভা, আর্ধ্য সভা, ব্রাহ্মবিভাগ সভাও স্থান গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। খ্রীষ্টান মিশনারিও বাদ পড়েন নাই। একটি মিষ্টভাবিনী, হস্তধুখী ইংরাজ মহিলা হিন্দী ও ইংরাজীতে স্তম্ভমাচার বিক্রয় করিতেছেন। একগুণ মেলা যে প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই

আমাদের কোন প্রকল্পের বস্তুর নিকট খাড়া বাবাজীর নাম শুনিরাছিলাম। তিনি দ্বারকার বাস করেন। চৌদ্দ বৎসর বাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া কুচ্ছসাধন করিতেছেন বলিয় তাঁহার নাম হইয়াছে খাড়া বাবাজী। অন্তরের একাগ্র সাধনার পক্ষে এই কঠোর শারীরিক নির্ধ্যাতনের কোন বিশেষ মূল্য আছে আমার মত অন্ত লোক তাহা না বুঝিলেও, কোন অজুত চিন্তাবলে এতখানি সহিষ্ণুতা তাঁর আরম্ভ হইয়াছে তাহা স্বরণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ত শ্রদ্ধা মিশ্রিত কৌতুহল আমার মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। স্তত্রাং তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিলাম। তাঁহার সম্মুখে একটি বোলা টাণান ছিল, তিনি সেইটির উপর তর দিয়াই শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করেন। বয়স পঞ্চাশের উপর হইলেও যুৎপ্রী বেশ দীপ্তিপূর্ণ। তিনি সাধুরে আমাদিগকে বসিতে বলিয়া আমার শিশুদেরও কুলি হইতে কিছু সন্দেশ বাহির করিয়া থাইতে দিলেন। এই সময় একজন ভারতধর্ম মহামণ্ডলের প্রচারক সেই স্থানে আসিয়া সাধুকে কহিলেন,—“বাবা—হঠ বোগকা ইৎনা ক্লেণ কাহে কো কনুতে হৈর, শরীর কো ইৎনা ক্লেণ বেনা ধর্ম বাহি হার, সিধা রাস্তা ভী তো পড়া হার।”

খাড়া বাবাজী যে উত্তর দিলেন তাহা লাগিল ভাল। তাঁহার উত্তর এই—পণ্ডব্য হান এক হইলেও অনন্ত

বাজীর জন্ত অনন্ত পথ সম্মুখে পড়িয়া আছে। পর্বত আরোহণ ব্যাপার সমতল ভূমিচারীর পক্ষে কষ্ট-কর বা হুঃসাধ্য হইলেও, পাহাড়ীয়ার পক্ষে বেশ সহজ ব্যাপার—স্তুতরাং কেমন করিয়া জানিলে যে, আমার কুচ্ছসাধন আমার পক্ষে সহজ হয় নাই? প্রত্নর নামে আমার কোন কষ্ট নাই।

বাহা হউক—সত্য মহাশয়ের হাতে কয়েক খানি পুস্তিকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের পুস্তক? তিনি কহিলেন “সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে কিছু প্রচার করিতেছি। ভারতে বহু জাতি পূর্বে হিন্দু ছিল, পরে মুসলমান হইয়া হিন্দু সমাজ হইতে অনাবৃত্তক ভাবে বিচ্ছিন্ন রহিয়া রহিয়াছে। রাম নামে মহাপাপী শুদ্ধ হয় আর ইহারা শুদ্ধ হইবে না। আমরা শুদ্ধির মাধ্যম প্রচার করি।” কিরিতেছি। ভারতবর্ষের মোহনিনী তাজিরাছে, এখন এই যে বিশাল সাধু সন্তের সমাজ—ইহারা ইহাতির প্রাণ—ইহারা এখনও ভাগেন নাই—ইহাদিগের নিকটই নিবেদন করিয়া কিরিতেছি যে, সময় থাকিতে আপনারা দেশবাসীর কল্যাণে মনোযোগী হউন—সামাজিক কল্যাণ বিঘ্নত ভাবে না চইলে এ জাতির ধ্বংস অবশ্যস্বাবী।”

অন্তঃপর আশাগিри হাতাকে আমরা দেখিতে গেলাম। তাঁর বয়স আশীর কম হইবে না। এই সাধিকা নারী বহুবায় বহুদেশ পর্যটন করিয়াছেন। সমাগত সাধু সম্ভার তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ভক্তি করেন দেখিলাম। তিনি আমাদিগকে সন্দেশে অভ্যর্থনা করিলেন এবং নিতান্ত শিশুহুলত সরলতার সহিত ধর্মালোচনা করিতে লাগিলেন। ভক্তিমতী মীরাবাইয়ের পবিত্র কাহিনী তাঁহার মুখে নুতন করিয়া শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। ব্রাহ্ম ভক্ত বর্গীর প্রকাশভঙ্গ রার মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ভক্তের ভগবদাহ্বয়ক্তি, ও সর্বজীবের প্রতি অগাধ প্রেমের কথা তিনি অত্যন্ত অজ্ঞানগের সহিত আমাদিগের নিকট কীর্তন করিলেন।

২৯শ মাঘ—আজ আবার সন্ধ্যা ক্ষেত্রে দান করিতে

গেলাম—ভিড় অনেক কমিয়া গিয়াছে, অনেক আঁড়ার আর চিহ্ন নাই, আমাদের সম্মুখেই প্রায় চারিশত সাধুর শোভা-যাত্রা দেখিলাম।

দোকানী পশারীরাও তাহু গুটাইতেছে।

আজ কল্লবাসের শেষ দিন—কল্লবাসিনী বাজীরা আজ পূজা, হোম প্রভৃতি যথাসাধ্য সমারোহে শেষ করিতেছেন। আমাদের কোনও আশীরও আজ সাধু ভোজনের অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন, প্রগাথ দিয়া আমা-দিগকে আপ্যায়িত করিলেন। স্নানের দক্ষিণা বিলিল ভাল।

আজও ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে সেই খাড়া বাবাজী ও আশাগিরি মাতারও সংবাদ জানিতে গেলাম। তাঁহারা আজ কাশী বাইতেছেন। আজ স্থানীয় সাধু নাগা বাবার দর্শন পাইলাম। বাঁধের উপরেই কুটার নির্মাণ করিয়া তিনি বাস করিতেছেন। মাঘ মেলার এই একমাস সময় ভিন্ন অল্প সময়ে এখানে উলঙ্গ থাকা কোনও সাধু সন্ন্যাসীর পক্ষেও ইংরাজ সরকারের রাজবিধিতে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নাগাবাবার পক্ষে সরকার বাহাদুর সে নিয়ম রহিত করিয়াছেন। সাধুর প্রসন্ন সৌম্য মুষ্টি, নগ্নকার শিশুর মত অনবস্ত্র সরল কান্দি—স্থানীয় সকলেই তাঁর প্রতি বিশেষ অহুরক্ত। অনেক উদ্ধত যুবক বাহারা সাধুযাত্রকেই “ভণ্ড” বলিয়া থাকে,

তাঁহারাও দেখিলাম নাগাবাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমাদের এক সঙ্গী নাগাবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুবাদ অত্রান্ত কি, না। ইহাতে তিনি কহিলেন—“মানবজীবনে প্রতি পদেই গুরুর আবশ্যক হয়, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যখন নীকার আবশ্যক হয়, তখন গুরুকরণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান ও বিচারশীল হওয়া উচিত। বাহ্যর প্রতি তোমার সম্যক শ্রদ্ধা আছে, বিনি গুণে, জ্ঞানে যথার্থই গরীবান্—এমন ব্যক্তিকে গুরুরূপে স্বীকার করিলে সর্বাংশেই তোমার কল্যাণ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে যদি তোমার বিধা বোধ হয়, তাহা হইলে ভগবানে শ্রদ্ধাপূর্বক ধ্যান ধারণায় অবহিত হইলেই কল্যাণ লাভ হইবে।”

নাগাবাবার এই সার কথাটি আমাদের মনে বড় লাগিল। অতঃপর আমরা বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া আর একবার সেই বিস্তীর্ণ গঙ্গাবক্ষের অপূর্ণ দৃশ্যের প্রতি এক্ষমিত্রিত দৃষ্টিপাত করিয়া বিদায় লইলাম। উর্ধ্বমালিনী বহুনার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কবির সেই গানটা বার বার মনে পড়িতে লাগিল—

“কতকাল ধরি বহিছ তুমি

নীল সলিলে বসুনে।”

ক্রীসরসীবালা বসু।

নীলকণ্ঠের ভাই ওলকণ্ঠ

(গল্প)

“কি বড় ঠাকুরণ!—এসেছ?”

মিজদের পুজার দালানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি শারদীয়া দেবী প্রতিমার পানে রহস্ত-বিলোল নয়নে চাহিয়া এই কথা করটি বলিল। আগন্তকের মুক-

কচ্ছ বেশ, গ্রীবাগবী বেশ, কর্ণদেশে একগুচ্ছ তুলসী-মালা, হরিনামাকিত অহুরত লগাট।

আগন্তক যখন দেবী-প্রতিমাকে সম্বোধন করিতেছিল তখন পুরোহিত বা কুলগুরু

সেখানে ছিলেন না, কেবল বাটার কর্তা বনমালী বাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আগন্তকের এই ব্যবহারে তিনি বিস্মিত হইয়া তাৎক্ষণিক এইরূপ সম্বোধন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈষ্ণব প্রবর তখন গৌরব-প্রভুর বদনে বলিলেন, “উনি আমাদের ভাঙ্গ হন যে।”

কর্তা গভীর ভাবে বলিলেন, “কি রকম?”

তখন বৈষ্ণবব্রত বাখ্যা আরম্ভ করিলেন—
“উনি শিব-পত্নী; আর হরি এবং হর এক আত্মা—
সুতরাং ভ্রাতৃত্ব—অতএব দুর্গা হরির ভ্রাতৃত্বাধার।”

কর্তা বনমালীবাবুর বুদ্ধিবৃত্তি বোধ হয় তেমন ধারাল ছিল না; তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—“উনি না হর হরির ভ্রাতৃত্বাধার হ'লেন, কিন্তু আপনারও ভাঙ্গ হলেন কেমন করে?”

বৈষ্ণব একগাল বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিলেন,
“তাকে আর ভগবানে প্রভেদ আছে?”

কর্তা বনমালীবাবু বৈষ্ণবের পদতলে প্রণত হইয়া বলিলেন, “আমার সূচতা মাগ করবেন।” বৈষ্ণব প্রসন্নদৃষ্টিতে কর্তার পানে চাহিয়া স্বীয় পদধূলি দান করিলেন।

তখন কর্তা তাঁহাকে সমস্ত উপবেশন করাইয়া তাঁহার জন্ত কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিতে উপরে গেলেন। গমনের উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন রাস্তা শুধু বলিয়া গেলেন—
“দাসের অপরাধ মার্জনা করবেন—আমি এখনি আসছি একটু অপেক্ষা করুন।” বাবাজীর বুদ্ধিতে বাকী রহিল না যে তাঁহারি একটা বড় রকম সং-কারের আরোহণে কর্তা অন্ধরে গেলেন। তখন তিনি তাঁহার কালিকাটি বাহির করিয়া বলিলেন—
“ওহে—হিমমতা তৈরী করে দাও তো, হুঁ-হুঁ দিও না যেন।”

স্বযোগ মত বাবাজী কর্তার নাম জানিয়া লইয়া ছিলেন। তামাক সেবনান্তে বাবাজী বলিলেন, “বনমালীর আমার সাধু সজ্ঞনের প্রতি খুব ভক্তি। প্রতিমাকে ভাঙ্গ বলাতে প্রথমটা একটু অসন্তোষ হয়েছিল, কিন্তু

আমার ব্যাখ্যা শুনে একেবারে ভক্তিভরে পদধূলি নিয়ে কত বিনয় প্রকাশ করে।—আহা, গুণ্যবান্ পিতামাতার সন্তান—ও! নামটিও কি সুন্দর—বনমালী। বাবার সময় কি ভক্তি বিনয় প্রকাশ করে, দেখলে ত। আহা হবেনা কেন!—হরিহে!—গোবিন্দ বলুন।”

বাবাজীর প্রতি বনমালীবাবুর এরূপ ভক্তি দেখিয়া বাবাজীর লোকেরাও বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। কারণ তাহার তাঁহার এরূপ বৈষ্ণব ভক্তির পরিচয় ইতিপূর্বে কখনও পায় নাই। তাহার ভাবিল, বোধ হয় লোকটার কোন বিশেষ গুণের পরিচয় পাইয়াই কর্তার মনে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। সুতরাং সকলের মনেই একটু ভক্তির সঞ্চার হইতেছিল।

সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিল—“বাবাজী আপনি কতবার বৃন্দাবন গেছেন?”

প্রশ্ন শুনিয়াই বৈষ্ণব প্রবরের চক্ষুর্দ্বারা ভক্তিবীরি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ভাবগদগদকণ্ঠে বলিলেন—
“আহা বৃন্দাবন, বৃন্দাবন! আহা, মহাপ্রভুর লীলাঙ্গন ... সেখানে বাগদার অহংকার কি করতে আছে? হরি হে! গোবিন্দ বলুন!”—মহাপুরুষ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এমন সময় বনমালীবাবু সেখানে উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, “মহাপ্রভু! একবার উপরে পদধূলি দিতে হবে।”

বাবাজীর মন সুখসেবা খাণ্ড সামগ্রীর কল্পনায় নৃত্য করিয়া উঠিল। সহাত বদনে বলিলেন “বনমালী, তুমি-বে এমন একটা কি কর্তে গিয়েছ তা বুঝতেই পেরেছিলুম! সাধু সজ্ঞনের প্রতি তোমার এ ভক্তি প্রচা আশ্চর্য্য নয়। তা চল!” এই বলিয়া বৈষ্ণব, কর্তার অনুগমন করিলেন।

জিতলের এক সুসজ্জিত প্রাণত কক্ষে বৈষ্ণব প্রবর উপনীত হইলেন। কক্ষতলে কারুকার্য্য খচিত বিচিত্রবর্ণ সুকোমল আসন। সমুখে স্বর্ণপাঞ্জে রৌপ্যাবরণ মধ্যে খাণ্ড সামগ্রী তত্ত্বপ্রবরের রসনা সম্পর্শের আশায়

অবস্থিত! খেতপ্রান্তর জলপাত্রে ক্ষটিকস্বচ্ছ গলোদক বৈকবকুলভিলকের পুতকরম্পর্শাকাজায় তরলিত হুয়ে বিরাজমান! দারদেশে ভূত জলপূর্ণ ভূনার হস্তে ভক্ত অতিথির চরণ প্রকালন অপেক্ষার দণ্ডার-মান। ভক্তিরস সম্পৃক্ত ঐশ্বর্যের এক্সণ অস্তিতা উৎসবময় সেবাহুষ্ঠান দর্শনে বৈকবাবতংশ বিন্মিত চকিত হইয়া গেলেন। অতঃপর ভোজনের উত্তোগ-পর্ক শেষে, আসনপ্রবেশ করিয়া হুয়র বধাহু লীলারিত অনন্দ রসের হেতুভূত পদার্থের উপভোগাশায় স্বর্ণ-পাভচুর্বি রোপ্যাবরণ উন্মোচন করিলেন। হরি! হরি! সযন্ত্র পালিত কল্পনার কি শৌচনীয হর্ষিবহ পরিণাম—ললিত আশায় শিরে নিরাশায় কি নির্মম বজ্রাঘাত—বর্ধাবারি-বধৌত শস্ত্রশ্রামল উর্ধ্বর ক্ষেত্রের কি চকিত সাহার্য-সম্ভব উবর পরিণতি—প্রগাঢ় শান্ত ভক্তির ব্যঙ্গ বিকৃত কি অনলদাহী কুৎসিৎ মুখভলী!

বৈকবের মুখখানা সুহৃৎ কালী হইয়া গেল। তৎপি সে জীবৎ হাসিতে চেষ্টা করিয়া কর্তার মুখপানে চাহিয়া বলিল, “রহস্ত করেছেন?”

কর্তার মুখে ব্যঙ্গ বিজ্রপের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। তাঁহার মুখ আড়ষ্ট কঠিন—যেন ধুমারিত আগ্নেয়গিরি। তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, “রহস্ত করিনি।—খেতে হবে ওটা।”

কর্তার মুখের সে ভীষণ কঠিন ভাবে, কণ্ঠহরের দুঢ়তার বৈকবের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল, “আজ্ঞে, কাঁচা ওল কি মাহুবে খায়?”

কর্তা গর্জিয়া উঠিলেন—“মাহুবে খায় না সত্য—কিন্তু তুমি না খাবে কেন?—তোমার ভাই শিব বিব খেয়ে নীলকণ্ঠ হতে পাজেন, আর তুমি একটা কাঁচা ওল খেয়ে ওলকণ্ঠ হতে পার্কে না?—খেতে হবে ওটা। খাও—বলচি।”—এই বলিয়া কর্তা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ভক্তরস সে মূর্তি দেখিয়া বধাকৃমিনীত অজানিশুর ভায় কাঁপিতে লাগিল। কর্তা সেই সন্ত-উত্তোলিত আরক্ত শূরণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া

বজ্রগভীর স্বরে আবার বলিলেন “নাও—খাও বলচি—নয়ত এখনি তোমার টুকরো টুকরো করে ফেলব—এখান থেকে চীৎকার করেও কেউ ভঁনুতে পাবেনা—তোমার নিস্তার নেই—খাও বলচি।”

বৈকব বেচারা হতাশ ভাবে সেই ভীষণ পদার্থের পানে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অশ্রুস্রোতের কঠিতে লাগিল। কর্তা তখন প্রহরীকে ডাকিলেন। পূর্বসঙ্কেত অনুসারে উন্মুক্ত ভয়বাগি হস্তে প্রহরী উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, “তিন দফে উস্কে। খানে বোলো। নেহি খার তো উস্কে। শির লেকর অন্দরকো কুরেমে ফেক বেনা।”

সেই ভীষমমূর্তি প্রহরীহস্তে কোবনুস্ত শাণিত কুপাণ দর্শনে মুক্তকণ্ঠ বাবাজীর প্রাণবায়ু আর্দ্রক বিংগিত হইয়া গেল। তখন বেচারা ঐহরি শ্রমিয়া সেই সজোখিত তলের একখণ্ড লইয়া বারজর চর্কণমাজ, তারার হুয়রের ভূতপূর্ব আনন্দরস ধনীভূত হইয়া লাগারূপে নির্গত হইতে লাগিল। বিষয় কতুরনে ভক্তপ্রবরের গর্ভহর রক্তপুষ্ট অলৌক্য সন্থন হইয়া উঠিল।

তখন বেচারা “দোহাই ধর্মবাপ রক্ষে কর।” বলিয়া কর্তার চরণম্পর্শ করিতে আসিলে কর্তা বাধা দিয়া ভীষ ব্যঙ্গভরে বলিলেন, “কেমন, ওলকণ্ঠ বাবাবী, আর মা হুর্গার দেওয়ার হবে?”

বৈকব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল “না বাবা, জন্মে আর ওকথা মুখে আনব না—তিনি আমার মা।”

কর্তা জ্বলন্তরে বলিলেন, “চল বাটা নীচে চল—কাণমলা খেয়ে নাকেক ৭৭ দিবি চল।”

বৈকব নীচে নামিতে পারিলে বাঁচে—বলিল, “চলুন বাবা এখনি চলুন।”

দৈবাৎ সেই সময় কক্ষের দ্বারদেশে কুলগুহ নকুলম্বর স্বর্ণপাত্রেয় দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন “কি, কাঁচা ওল কেন?” তারপর বৈকবের ক্ষীত-গর্ভ শোভিত অগ্রসর মুখমণ্ডল দোখরা বলিলেন “তোমার কি হয়েছে?”

হৃদয় অঙ্গ স'ঙ্গে নির্ঝাক হইয়া রহিল।
তখন ঠিকই নিজেই সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া পরিশেষে
বলিল—“আমার পাণের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে—এখন আমার
মুক্তি দিন।”

দেখিতে দেখিতে নকুলেশ্বরের সেই ঐকান্ত্য
প্রশান্ত সৌম্য সূৰ্ত্তখানি বিবর হইয়া উঠিল।
তিনি ব্যথিত হৃদে বিশ্বের পানে চাহিয়া বলিলেন,
“ওঃ কেড়ে দাও।” তারপর তাঁর নিকে অঙ্গের হইয়া
বলিলেন “বনমাণী, আজ বড় মর্মান্বিত হলাম। পূজার
দিনটে দিনও মনটাকে শিথিল রাখতে পারি না?”

বনমাণীবাণী আনত মন্তক বলিলেন, “দেবীর
প্রতি হস্ত বস্ত্র সম্বন্ধে কতই পারলাম না প্রভু।”

নকুলেশ্বর বলিলেন, “বেশ তো। ভাল করে তাকে
বুঝিয়ে বলিয়ে ত হ'ত—তা না করে তুমি কিনা তাঁর
উপর এই ঘোর নির্ভরতা করে—আহা কত কষ্ট

হয়েছে ওর, তাব দেখি। যাও, ওকে সন্মুখ করে,
বেশ পরিতৃপ্ত করে আবার করিয়ে বিদায় দাও—
আর তা না পার, বল আমি তোমার হয়ে ওর
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।”

কর্তা বনমাণীবাণী অমৃতপ্ত হইয়া বলিলেন, “প্রভু,
আর আমার অপরাধী করবেন না,—আপনার আদেশ
শিরোধার্য।”

নকুলেশ্বর সন্মুখ হইয়া বলিলেন, “বেশ বাবা
তাই কর। আর দেখ, দেবতার অপমান আর
কেউই কর্তে পারে না, অপমান যদি হয় তবে সে
তত্ত্বের হাতেই। তত্ত্ব যদি খাঁটি থাকে, তবে
এ বিশ্বের কেউই তাঁর অপমান কর্তে পারে কি? —
দেবতা মন্দিরে থাকেন না,—থাকেন তত্ত্বের
মনে।”

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

কুলস্বর

সমুদ্রে প্রান্তর ভ্রাম, হৃদ্যে বনানী,
উজ্জ্বল তপন বিতা তরু দ্বিপ্রহর দিবা
ব'সু বহে দিকে দিকে তপ্ত কর হানি।

সিঁদু ডারে বনপ্রান্তে প্রান্তকার ধেজ
নিম্নগিরা হ'নরন করে তৃণ রোমন্থন,
কতু দূরে বেজে উঠে রাখালের বেণু।

ধাবন কুর্দন করি করে বসগণ।
কতু চলে সূর্য পার, চলিতে আছাড় খায়
নেচাতী জননী চিত হরবে মগন।

অকস্মাৎ পূর্ণ করি নিখিল অধর
কোথা হতে সমীরণে ভেসে আসে এ বিজনে
স্ববর-উদ্ভাসকর কুহ কুহ বর।

নয়ন কিরাই—মুখে কারো দেখা নাই।
পঞ্চমে তুলিয়া তান পাগল করিয়া প্রাণ
কে কোথায় গাহে গান খুঁজিয়া নাই।

কতু বা দক্ষিণে বামে, কতু বা পশ্চাতে,
কতু বা নিকটে দূরে, একই গান এতই সুরে
কে গায়? ধ্বজিত ডারে চাই হাতে হাতে।

আলোড়ি কাননস্থানী দিগ্‌দিগন্তর
ভেদি নীল নভঃতর সেট কুহ কুহ স্বর
মধিরা চলেছে কোথা ধরার অধর।

বসন্তের সহচর এল কি কোকিল
প্রাণ তারা কুহতানে বত্বাতে নিখিল প্রাণে
আনন্দ সঙ্গীত ধারা চির অনাবিল।

কোথায় লুকায় থাকে নিরুদন না দেখি।
পজ মাকে অন্ন চাতি কুহাঃছে থাকি থাকি,
সত্য কি বিহীন? কিংবা বর শুধু একি?

জীবনে নরনে ডারে কতু দেখি নাই।
বর মাজ অন্নসরি কত বন পথ ধরি
খুঁজিয়াছি, এখনও খুঁজিয়া বেড়াই।

পাই নাই, পাইব না এ জীবনে আর।
নাহি বর্ণনাহি রূপ, কে অদৃষ্ট, কে অরূপ
একটি অংশ গীতি গাহে অনিবার।

বুঝিয়াছি এ বিরাট রহস্য ব্যাপার।
স্বপ্ননের দিন হতে তাসিরা কালের স্রোতে
আসিছে এ গান কোন্ আত্মীর আত্মার।

মাসে মাসে দিশে দিশে দেশে দেশান্তরে
অন্নসরি কাল প্রথা তাসিরা চলিছে কোথা
যুগ হতে যুগান্তরে কল্প জন্মান্তরে।

বুঝাই ফান তার লাবণ্যে ব'ই।
জানের সীমার বন্দী— সত্য-খুঁজি অন্ধ সন্ধি
কার্যকারণের বলে কিছুই নী পাই।

চিন্তার অধীর চিত্ত ক্লান্ত হয়ে আসে।
অবসাদ ধীরে ধীরে চারিদিক আসে ঘরে
স্বপ্নময় এ অগ্নি আঁধার পরে আসে।

এক কোণে নিরুদনে বিদ্ধ চারে ব'স
হেরি মাঠ করে ধু ধু অগ্নি নরন শুধু
তারে তারে তবু আদি পড়তেছে খস।

আজ যুগলের গন্ধে দিক্ মাতোয়ারা,
দূরে দূরে চরে ধেয় পবন উড়ায় বেগু
পলে পলে করিতেছে চিত্ত দিশাহারা।

চৌদিকে অনলকণা বর্ষে বিপতর।
কেবলি পশিছে কাণে একটা সীত তানে
অনাদি কালের সাক্ষী কুহ কুহ বর।
ত্রিযোগেশ্বরনাথ সরকার দেবশর্ম্মা।

ঋগ্বেদের মর্মবাণী

[৩]

একই বস্তু, বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কে আসিয়া
‘অন্ত’রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে বস্তুটা
আপনার স্বরূপকে হারায় না। সত্তা হারাইয়া সে,
অন্তরূপ ধারণ করে না। পুত্রের সম্পর্কে আমি
পিতা; পত্নীর সম্পর্কে আমি স্বামী; আবার
আবার পিতার সম্পর্কে আমিই পুত্র। একই আমি—
বিবিধ ব্যক্তির সম্পর্কে পড়িয়া, নানা রূপে প্রতীয়মান
হইয়া থাকি। আমার যেটা প্রকৃতই আমি, আমার

যেটা প্রকৃত স্বরূপ—তাহার কি বাস্তবিক-পক্ষে
কোন কতি বৃদ্ধি হইতেছে? এই যে আমি নানা
ব্যক্তির সহিত সংঘর্ষে আসিয়া তির তির রূপ ধারণ
করিতেছি, তির তির নামে পরিচিত হইতেছি;
এই যে আমি কখনও পিতা, কাচারও স্বামী, কখনও
বা পুত্র রূপে নানা অবস্থা, নানা রূপ, নানা সম্বন্ধে
পরিচিত হইতেছি,—ইহাতে কি আমার স্বরূপটা,
আমার আত্মত্বটা, আমার সত্তাটা লুপ্ত হইয়া
বাইতেছে? এই সকল বিবিধ নাম ও বিবিধ রূপ

ও বিবিধ অবস্থান্তরের মধ্যে—আমি যে-আমি, সেই আমি-ই কি রহিয়া বাইতেছি না? আমার যদি কোন স্বরূপ না থাকে, আমার যদি কোন স্থির অপরিবর্তনীয় সত্তা না থাকে, তাহা হইলে কে, নানা বস্তুর সংসর্গে আসিয়া, এই সকল বিবিধ অবস্থান্তর ধারণ করিবে? কাহার তাহা হইলে নানা বস্তু বা নানা ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক হইবে? সুতরাং বুঝা বাইতেছে যে, কোন বস্তু বা ব্যক্তির স্বরূপটী বধন, অস্ত্র একটা বস্তু বা ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক আইসে, তখনই সেই স্বরূপ হইতে নানাবিধ অবস্থার উদ্ভব বা অভিব্যক্তি হইয়া পড়ে। অতএব এই যে আমার অবস্থান্তর-গুলি, এই যে আমার পর-রূপ গ্রহণ,—ইহা বাহ্য বস্তুর সহিত সম্পর্কের ফল। সুতরাং, বহুবস্তুর উপরেই এই সকল অবস্থান্তর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু আমার স্বরূপটী—কাহারও উপরে নির্ভর করে না। সুতরাং আমার পর-রূপটী—আমার অবস্থান্তরটী, নিরন্তর পরিবর্তন-শীল। কেন না, যে বস্তুর সঙ্গে বধন আমার স্বরূপ সম্বন্ধ হইবে, আমার অবস্থাও ভিন্ন হইবে; কিন্তু আমার যেটা স্বরূপ, সেটা অপরিবর্তনীয়, স্থির। এই পর-রূপের মধ্য দিয়াই স্বরূপটী নিজের পরিচয় দিয়া থাকে। আমার দোষ এই যে, আমি আমার পর-রূপটীকে স্বরূপের স্থলাভিষিক্ত করিয়া লই। পর-রূপ ছাড়া আমার যে একটা স্বরূপ আছে; একথা ভুলিয়া যাই।

বাহ্য বস্তুর সম্পর্কে পড়িয়া আমরা, কতপ্রকার শব্দ-স্পর্শাদির জ্ঞান, হর্ষ-শোকাদির অহুত্ব লাভ করিতেছি। কাহার সঙ্গে সম্পর্ক হইবে, সেটা যে প্রকারের,—আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়াদির অহুত্ব ও তদনু-রূপ ভর্তবে। বুদ্ধের সম্পর্কে আসিলে আমাদিগের চিত্ত বুদ্ধের জ্ঞান উপাংশ হইবে; কোন হৃৎকলক পদার্থের সম্পর্কে আসিলে, আমার হৃৎকলক আসিয়া উঠে। কিন্তু এই সকল জ্ঞান-ক্রিয়া অহুত্বের অন্তরালে, আমার আপন স্বরূপটী অবিকৃত রহিয়া

যায়। কেবল যে ইহা অবিকৃত থাকে তাহা নহে! ইহা ঐ সকলের মধ্য দিয়াই আপন স্বরূপের পরিচয় কুটাইয়া তোলে। এইরূপে, আমরা যে—জ্ঞান-স্বরূপ, সাক্ষাৎ-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ—তাঁহার আমরা পরিচয় পাই। কেন না, বুদ্ধ-জ্ঞান, হৃৎকলক, শব্দ-স্পর্শাদির সহস্র প্রকার জ্ঞানের মধ্য দিয়া, আমরা যে জ্ঞান স্বরূপ—আমাদের সেই অবিকৃত জ্ঞানটী—পরিচুত হইয়া উঠে। সহস্র প্রকার সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদের মধ্য দিয়া, আমাদের অবিকৃত আনন্দ-স্বরূপটী ভাসিয়া উঠে। সহস্র প্রকারের ক্রিয়ার মধ্য দিয়া, আমাদের সাক্ষাৎ কুটিয়া উঠে। বাহ্য-বস্তুর সহিত সম্পর্কের সময়েই, এই প্রকারে, আমরা আমাদের স্বরূপটীর পরিচয় পাইয়া থাকি। ব্রহ্মবস্তুও,—নাম-রূপের সহস্র প্রকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া, আপনায় অপরিবর্তনীয়, স্থির স্বরূপটীকে কুটাইয়া তুলিতেছেন। সুতরাং নাম-রূপাদি তাবৎ বস্তুই, পরমাঙ্গার স্বরূপের অভিব্যক্তি বা পরিচায়ক ব্যতীত, উহার ‘অস্ত’ কোন বস্তু নহে।

অজ্ঞ লোকেরাই মনে করে যে, আমার অবস্থান্তর বা পর-রূপটীই আমার সর্বস্ব। উহার তাৎপৰ্য্য যে, স্বরূপটী যেন আপনাকে হারাইয়া, পর-রূপ গ্রহণ করিয়া, ‘অস্ত’ একটা কিছু হইয়া উঠিয়াছে! এই-রূপে অজ্ঞ লোকেরা, জগৎকেই ধরিয়া থাকে এবং জগতের ধন-জন বিষয় বিভবে একান্ত মত্ত হইয়া অবস্থান করে। ইহাদের নিকটে ব্রহ্ম, আবৃত হইয়া পড়েন; ‘অস্ত’ একটা বস্তু (জগৎ) যেন ব্রহ্মকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। কিন্তু তত্ত্ববিশিষ্ট বুদ্ধেন যে, ব্রহ্মকে আবৃত করিবে কাহার সাধ্য? জগৎ—ব্রহ্মের আবরক ত নহেই; জগৎ—তাঁহার পরিচয়ের ক্ষেত্র; জগৎ তাঁহারি সংবাদ বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে; সুতরাং, অজ্ঞ লোকের দৃষ্টি ও তত্ত্ববিশিষ্ট-গণের দৃষ্টির মধ্যে, এই প্রকারে আকাশ গাভাল প্রভেদ হইয়া পড়ে।

ভাস্কর্য্য, অজ্ঞের দৃষ্টি লইয়া জগৎকে দেখিবার

নিবেদ্য করিয়া দিয়াছেন। তিনি, পরমার্থ-দৃষ্টি হইতেই জগৎকে দেখিতে হইবে, ইহারই নির্দেশ করিয়াছেন। অজ্ঞ, সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে, জগৎ একটা স্বতন্ত্র বস্তু, ‘অন্য’ বস্তু। সুতরাং ব্রহ্ম একেবারে আবৃত্ত হইয়া পড়েন। সংসারের ধনজন, কামিনী কাকিন প্রভৃতিই নিরন্ত চক্ষু উপরে তালিতে থাকে। অতঃ পরে যে ব্রহ্ম আছেন, সে তখন একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তখন, এই নাম-রূপ, শব্দ-স্পর্শাদি বস্তুগুলিই একমাত্র বস্তু হইয়া উঠে। ইহাই অজ্ঞ লোকের দৃষ্টি। বেদান্ত দর্শনে ইহারই নাম, জগতের ‘ব্যবহারিক সত্তা’। কিন্তু ভাব্যকার, তত্ত্বদর্শী চক্ষু ইহা জগৎকে দেখিবার অন্য সর্বজনীন অনুবোধ করিয়াছেন। এই দৃষ্টি লইয়া জগৎকে দেখিতে শিখিলে তখন আর জগতের কোন বস্তুকেই স্বাধীন, স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া অনুভব থাকে না। এক ব্রহ্ম-স্বরূপই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। জগতের তাবৎ বস্তু ব্রহ্মেরই বিকাশ—এই প্রকার অনুভূতি তখন প্রবল হইয়া উঠে। কোন বস্তুকেই তখন আর বস্তু বলিয়া বোধ করিতে পারা যায় না। তখন সর্বত্র কেবল ব্রহ্মেরই মহিমা, ব্রহ্মেরই অনন্ত ঐশ্বর্য, ব্রহ্মেরই বিকৃতি চিত্তে ফুটিতে আরম্ভ করে। বেদান্তের ভাব্য ইহাকে “পরমার্থিক দৃষ্টি” বলে। এই দৃষ্টিতে জগৎ উড়িয়া যায় না; জগতের কোন বস্তুই অলীক অসত্য হইয়া * উঠে না। থাকে সমস্তই। কেবল দৃষ্টিটা অন্যরূপ হইয়া উঠে। সর্বত্র সকল বস্তুই তখন, সেই পরম সূক্ষ্ম পরমেশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্যের পরিচায়ক হইয়া উঠে। কোন বস্তুই: স্বাতন্ত্র্য-বোধ থাকে না। সকলের মধ্যে, সেই অনন্ত সূক্ষ্মের সৌন্দর্য্য-লহরী, একে একে, স্তরে স্তরে, ফুটাইয়া তোলে। জগৎ তখন ব্রহ্মের অভিব্যক্তির ক্ষেত্ররূপে দৃষ্টির সম্মুখে তালিয়া উঠে।

ব্রহ্ম এবং তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত এই জগৎ—এই উভয়ের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ? প্রিয় পাঠক, প্রিয় পাঠিকা, আপনারা অবশ্যই দেখিতেছেন যে, বেদ ও বেদান্ত, তত্ত্বদর্শীর চক্ষুদ্বারা, সেই সম্বন্ধের নির্ণয় করিয়াছেন। সে সম্বন্ধ কিরূপ? শব্দ ইহার নাম দিয়াছেন—‘অন্য’ সম্বন্ধ। আপনারা আমাদের পূর্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছেন যে, অজ্ঞ সাধারণ লোকের জগৎকে একটা অন্য ‘বস্তু’ বলিয়া, একটা স্বাধীন বস্তু বলিয়াই ধরিয়া লয়। ভাব্যকার বলিয়া দিয়াছেন যে, এ জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ‘অন্য’ কিছু বলিয়া মনে করা নিতান্তই ভ্রম। ইহা অন্য কিছু নহে; ইহা ব্রহ্ম হইতে ‘অন্য’।—অর্থঃ এই জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করিও না; ইহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত ‘অন্য’ কোন বস্তু নহে। ইহা ব্রহ্ম বস্তুরই পরিচায়ক; কেন না, ইহা ব্রহ্ম স্বরূপেরই আংশিক অভিব্যক্তি। তবেই জগতের স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতেছে না; উহা কোন ‘অন্য’ বস্তু হইতেছে না। উহা ব্রহ্মেরই বিকাশ, তাঁহারই অভিব্যক্তি, তাঁহারই পরিচায়ক। যে বস্তু বাহ্যের পরিচায়ক, সে বস্তু কি তাহার আবরক হইতে পারে? যে, স্বরূপের পরিচয় বহন করিয়া আসিতেছে, সে, সেই স্বরূপের আচ্ছাদনকারী হইবে কি প্রকারে?

ভাব্যকার এই জন্যই বলিয়াছেন—

“তৎ ব্রহ্মদর্শনোপায়শ্চেন বিনিবৃত্ত্যতে”।

ব্রহ্মই আমাদের জ্ঞেয় বস্তু; জগৎ আমাদের জ্ঞেয় বস্তু নহে। জগৎ, সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তুর দর্শনের ‘উপায়’ মাত্র। ঋগ্বেদ জগৎকে এই রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।—বেদান্তের ভাব্যকারও সেই রূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগৎ,—ব্রহ্মদর্শনের, ব্রহ্ম জ্ঞানের উপায়; উহা ‘অন্য’ কোন বস্তু নহে। অতএব তত্ত্বদর্শী সেজ লইয়া, জগৎকে সর্বদাই উপায়-রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। পাঠক-পাঠিকা দেখিবেন, এই প্রকারে গ্রহণ করিলে, অঘর-তত্ত্বের কোনই ক্ষতি হইতে পারিল না। জগৎ—ব্রহ্মের আবরক হইল না; জগৎ

* ইহা না বুঝিয়া লোকের মনে করে, বেদান্তদর্শন জগৎকে নিখ্যাত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

বলিয়া ‘অন্য’ একটি কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইল না। সুতরাং উহা ব্রহ্মের একত্বের বিরোধী হইতে পারিল না।

অগতঃ যদি, তোমার বুদ্ধির দোষে, কোন স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া বোধ কর, তবেই উহার সঙ্গে ব্রহ্মের বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। কেন না, তখন ব্রহ্ম একটা বস্তু, আবার অগতঃ আর একটি বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অগতঃ তাঁহার বিকাশ বলিয়া বুদ্ধিতে পারিলে, অগতঃ ‘অন্য’ * হইয়া উঠিল; অগতঃ ব্রহ্মেরই নিত্যত্ব অঙ্গুগত হইল; তাঁহারই একান্ত অন্তর্ভুক্ত হইল। সুতরাং বৈত (Dualism) রহিল না; বিরোধ থাকিল না। বেদান্তের ইহাই সিদ্ধান্ত; এবং এই সিদ্ধান্তটী ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত।

একটা বৃক্ষ বীজের, পর-পর-উৎপন্ন অঙ্গুহাদি অবস্থান্তর সেই এক বৃক্ষই পরিচয় প্রদান করে। সুতরাং উহার কোন অবস্থাকেই বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না। কেন না, সকল অবস্থার মধ্য দিয়াই বৃক্ষটী, আপনাকে বিকাশিত করিতেছে। বীজাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবধি শেষ ফল-পুষ্পাদি অবস্থা পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে; তবে তুমি বৃক্ষটীর পূর্ণ বিকাশ বুদ্ধিতে পারিবে। এই প্রকারে, ব্রহ্মই যখন আপনাকে অতিব্যক্ত অগতঃ আনি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ

পর্য্যন্ত, সকল অবস্থার মধ্য দিয়া, আত্ম-বিকাশ করিয়া চলিয়াছেন, তখন কোন অবস্থাকেই তাণ্ডা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারা যায় না। অথচ আবার তাণ্ডা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া ছাঁটিয়া লইয়াই,— অবস্থান্তরগুলি ধরিয়া নিরন্তর ব্যাপৃত থাকি। নিরন্তর হইতে আত্ম করিয়া, ‘ক্রমোচ্ছ্রাবণে’, অগতঃ তাবৎ বস্তুই, তাঁহারই পরিচয় দিতেছে; তাঁহারই রূপকে কুটাইতেছে, তিনিই উহাদের মধ্য দিয়া আত্ম বিকাশ করিতেছেন। অগতঃ এইরূপে পূর্ণতার দিকে ধাবিত হইতেছে। মানবের মতোও, ব্রহ্মের পূর্ণবিকাশ হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং জীবকেও, তাণ্ডা হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না। জীবের মধ্য দিয়া ব্রহ্মই আপন ঐশ্বর্য্যের বিকাশ করিতেছেন; জীব স্বতন্ত্র, স্বাধীন, ‘অন্ত’ বস্তু হইবে কিরূপে? জীব, সেই পূর্ণতা প্রাপ্তির নিমিত্তই ছুটয়া চলিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জীবকে পৃথক্ করিয়া লইবে কি প্রকারে? ইহাই বেদান্তের বিশ্বাস-কর সিদ্ধান্ত। ইহাতে ব্রহ্মের সঙ্গে অগতঃ বা জীবের কোন বিরোধ হইতেছে না; আবার উভয়ে এক বা অভিন্নও হইতেছে না। ব্রহ্মের অঐশ্বর্য্য-ভাবেরও কোনরূপ হানি হইতেছে না।

কিন্তু এই বিরোধ পরিহার সম্বন্ধে ঋগ্বেদ নিজে কি বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আরো কিছু বলিবার বাকী আছে। আগামী বারে তাহা বলিব।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

* পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করিবেন, ‘অন্য’ বলাতে, ব্রহ্ম এবং অগতঃ উভয়ে একত্ব হইতেছেন। “ন চৈক্যাভি-প্রায়েন”—আদ্যাদিগিরি টীকা।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস *

আজকাল বাঁগালী বাঙ্গালানেশের ইতিহাস আলোচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক দীক্ষাগুরু। ১২৮৭ সালের “বঙ্গদর্শনে” বঙ্কিমচন্দ্র যে লিখিয়াছেন—

“বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরণ নাই। কে নিবিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।”—

এই প্রাণ্প্রার্থী কথা পড়িয়া অনেক কবিবিশংগে বাঙ্গালী যুগের মন ইতিহাসের দিকে ঘুরিয়াছে। সুতরাং এই গুরুপণ্ডিত ইতিহাস আলোচনার আরম্ভতা করিতে আরম্ভ হইয়া আমি জীবন ধন্য এবং এ পর্য্যন্ত যেটুকু পরিশ্রম করিয়াছি তাহা সকল জান করিতেছি।

সাহিত্যসেবার স্মরণাত হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনার বিরূপ নিবিষ্ট ছিলেন, “দুর্গেশনন্দিনী”তে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। “সুশাসিনী” বাঙ্গালার ইতিহাস-মূলক উপজ্ঞাস। তার পর “বঙ্গদর্শনে” ধারাবাহিক রূপে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯৩ সালে (মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে) প্রকাশিত বিদ্যার খণ্ড “বিবিধ প্রবন্ধে” পুনর্মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন—

“বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বেশী নহে। এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ভাষার অল্পসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্তের শাণাঘোর অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্তকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস

সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিয়া যাই। যেমন কুল মজুর পথ খুলিয়া নিলে, দুর্গের কানন বা শান্তির মধ্যে সেনাপতি সেনা লটকা প্রবেশ করিতে পারেন আমি সেইরূপ সাহিত্য সেনাপতিত্বের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দবার চেষ্টা করিয়া যাই। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমারদের সেই মজুরদারির ফল এত কয়েকটি প্রবন্ধ। ইতার প্রণয়ন জন্য অবসর বশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছামুত্থাপ অল্পসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইতার দর বেশী। দর বেশী হউক আর না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোণা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস বাহাই লিখুক না কেন—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু তৈ, আমি কুল মজুরের কাজ করিরাছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন বর্তীত হইল না।”

এই বিজ্ঞাপন লেখার পর আরও ৩০ বৎসর কাল চ'লিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র “মজুরদারী” করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের যে পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সে পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন বর্তীত আমরাতঃ এখনও শুনিতে পাই নাই। কিন্তু বিগত ১৮৯০ বৎসর বাবৎ সেনাসংগ্রামের দসব সংগ্রামের, হাতিয়ার সংগ্রামের সোরগোল শুব শোমা বাইতেছে। এই কার্যে অনেক কর্মী লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন; উপকরণ সংগ্রহও বেশ হইতেছে। সংগৃহীত উপকরণের মধ্যে কুমার শরৎকুমারের অত্যন্ত অর্থগাবে এবং অসাধারণ পরিশ্রমে প্রাতিষ্ঠিত, হাতসাতার বহুস্ত্র অল্পদল-সম্বন্ধে চৈতন্যলা আজ

* কাঁটালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনে বঙ্কিম-সাহিত্য-সংগলনের এখন আবেশনে (২য় আষাঢ়, ১৩৩০) ইতিহাস-পাথার বিবৃত :

বক্সিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই মহানন্দে মাতৃপদে বনকাজলি বলিয়া অভিনয়িত করিতেন। বক্সিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাসের যে পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন প্রত্নতাত্ত্বিকগণের পরিশ্রমের ফলে তাহা কোন্ দিকে আর কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে আজ তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিব।

(১) বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব।

ইতিহাসের গোড়ার কথা জাতিতত্ত্ব (Ethnology)। যে জনগণের ইতিহাস অ'লোচিত হইবে সেই জনগণ কোন্ কোন্ বিভিন্ন গণের মিশ্রণজাত, তাহারা বংশ-মুক্রমে কিরূপ আকৃতির এবং কিরূপ প্রকৃতির উত্তরাধিকারী, তাহার আলোচনা ইতিহাসের প্রথমতাপের বিষয়। ১২৮০ সাল হইতেই বক্সিমচন্দ্র বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করেন। 'বঙ্গ ব্রাহ্মণাধিকার' নামক ছুটি প্রস্তাব বখাজ্রমে ১২৮০ ও ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তার পর আবার ১২৮৭ ও ১২৮৮ সালের 'বঙ্গদর্শনে' 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' শীর্ষক আরও সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বক্সিমচন্দ্র জাতিতত্ত্ব-আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার পরে জাতিতত্ত্ব-অ'লোচনা রীতির নানা পরিবর্তন ঘটয়াছে এবং অনেক উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং বক্সিমচন্দ্রের জাতিতত্ত্ব বিষয়ক রচনার বিচার করিতে হইলে এখনকার হিসাবে না করিয়া সময়সময়ের হিসাবে করিলেই সুবিচার হইতে পারে। জাতিতত্ত্বের একটা প্রধান কাজ মানব সমাজকে বিভিন্ন বর্ণে বা জাতিতে (race) বিভাগ করা। সমগ্র মানবজাতি সম্ভবতঃ একই পরিবারভুক্ত, অর্থাৎ একই ক্রম হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত এবং বি'কশিত হইয়াছে। স্থানমাধ্যম্য এবং অভ্যাস কারণে বিভিন্ন স্থানে বিকশিত বিভিন্ন শাখার মানুষের মধ্যে প্রকৃতিতে নানা প্রকার তেজ উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রকারে উৎপন্ন বিভিন্ন জাতির মানুষ আবার ঘটনা চক্রে

পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হওয়ার নূতন নূতন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এই মেশামিশির ফলে আদিম জাতির বা বর্ণের মানুষ অমিশ্র অবস্থার কোথাও প্রায় দেখা যায় না। মানুষের এখনকার সকল বিভাগই অল্পাধিক পরিমাণে বর্ণগত। গুসত্য জাতির সঙ্কর্য দেব অধিকতর। কেননা বিভিন্ন স্থানে মানবের হিতকর বিভিন্ন পদার্থের রীতি নীতির আবিষ্কারক বিভিন্ন জাতির মিলন ও মিশ্রণের ফলে সত্যতার উৎকর্ষ। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী মানবসম্মানচরের পরস্পরের মধ্যে জাতিতত্ত্বের ঘনিষ্ঠতামূলক জাতি বিভাগ জাতি-বিজ্ঞানের (Ethnology) উদ্দেশ্য। বক্সিমচন্দ্রের সময়ে এরূপ জাতিবিভাগ করা হইত তাহার বিভাগ অল্পমাত্রায়। তাহার হিসাবে তৎকালে পণ্ডিতেরা আর্ধ্য এবং অনাৰ্য্য-ভেদ স্বীকার করিতেন। আবার তৎকালে বাহারা বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন তাঁহারা আদিমশূর কর্তৃক পুঞ্জোষ্টিবাদ করিবার জন্য কাতকুল হইতে রাষ্ট্রীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়নের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; রাজেন্দ্রলাল মিত্রও বিশ্বাস করিতেন, বক্সিমচন্দ্রও বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার মৈত্রেয় এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কুলীন ব্রাহ্মণ বংশীয় ঐতিহাসিকেরাও আর সে কথা ঐ আকারে অবিচারে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন।* তাহার

* কয়েক বৎসর পূর্বে সম্রাট হর্ষবর্দনের সব সময়ের (৬০৭—৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ) কালরূপের রাজা ভাস্করবর্দার এক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের প্রথম তিনখানি কলক জিহুট জেলার অন্তর্গত নিধনপুরে আবিষ্কৃত হয়, এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক তাহা এপিগ্রাফিয়া ইতিকা পত্রের দ্বারা তাপে (৭০-৭৫ পৃঃ) প্রকাশিত হয়। উক্ত তাত্ত্বিকগণের এই অংশে ভাস্করবর্দার বংশপ্রতি ছিল এবং ভাস্করবর্দা কর্তৃক-সুর্ঘ (বর্তমান সুর্দিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাজাবাদী) সমাবাসিত অক্ষরদ্বারা (রাজ্যনীতে) এই শাসন সম্পাদন করিতেছেন এই পর্য্যন্ত ছিল। এই তাত্ত্বিকগণের আরও দুইখানি কলক সম্রাট আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কলকর

কারণ, একপক্ষে ইদানীং কুল পঞ্জিকার আদিশূর সম্বন্ধীয় অংশে যেমন ভাল ভেজাল ধরা পড়িয়াছে, তখন তেমন সংশয়ের কারণ ছিল না। অপর পক্ষে, এখন ইতিহাস সেবকেরা নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-মূলক জনশ্রুতি ছাড়া অন্য কোন কথা ঐতিহাসিক তথ্য অথবা প্রাচীন ঘটনার অবিকৃত বিবরণ বলিয়া খীকার করিতে এস্তত নহেন। কিন্তু দেশ কাল পাত্র হিসাবে বিচার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব বিবরণ নিবন্ধন উৎকৃষ্ট পুস্তক। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালার বাঙ্গালী

তাবার জাতিতত্ত্বের আলোচনারও শুরু; কেন না তাঁহার প্রথম প্রস্তাব লালমোহন বিজ্ঞানিধির “সম্বন্ধ নির্ণয়” গ্রন্থের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এ দেশে জাতিতত্ত্ব আলোচনার নূতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। রিজলি সাহেব দ্বারা ছাড়িয়া মন্তকের, নাসিকার, এবং দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাপের তেদাহুসায়ে জাতি বিভাগ করা হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এবং তাবাত্ত্রী জাতিতত্ত্ব-বদ্বগণের মতে আৰ্য্যজাতীর বা আৰ্য্যবংশীয় আক্রমণকারীরা উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে আৰ্য্যাবর্তে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ বাঙ্গালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিলেন। রিজলি সাহেব হিন্দুহানী ব্রাহ্মণাদি জাতির এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদি জাতির মন্তক মাপিয়া দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুহানীদের মন্তক হু’দিকে চাপা এবং চওড়ার অল্পপাতে দেখিতে লম্বা; পক্ষান্তরে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদি জাতির মন্তক ওরূপ চাপা দেখায় না, লম্বার অল্পপাতে খুব চওড়া মনে হয়। এই কথাটা কতটা ঠিক তাহা জানবার জন্য এই লেখকও একবার মাপযোক করিয়াছিল। পণ্ডিত ঐযুক্ত বিনোদবিহারী বিজ্ঞানবিনোদ মহাশয়ের সহায়তার ভাটপাড়ার ভট্ট চার্য্য মহাশয়দিগকেও মাপা হইয়াছিল। আমার পরিমাণ কল মোটামুটি রিজলি সাহেবের কলের অল্পরূপই দেখা যায়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের এবং হিন্দুহানী ব্রাহ্মণদিগের মন্তকের আকারে যে অনেকটা প্রভেদ আছে তাহা অনেক সময়ে চোখেও ধরা পড়ে। এই প্রমাণ হইতে রিজলি সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদি জাতি মূলতঃ এবং মূলতঃ হিন্দুহানীদিগের জাতি নহে, তাহারা মোঙ্গল-দ্রাবিড়-সঙ্কর। বাঙ্গালীর প্রাতিবেদী জাতিনিচয়ের মধ্যে মোঙ্গলীয় হইল গারো, কাছারী, মিকির, কুকি প্রভৃতি; এবং রিজলি সাহেবের মতে দ্রাবিড় হইল সাঁওতাল, ওড়ার, কোল প্রভৃতি দুইভাগে মোটা কথায় মোঙ্গল-দ্রাবিড় সঙ্করের অর্থ হইল গারো সাঁওতাল সঙ্কর। রিজলির পরিমাণ কণ প্রমাণ হইলেও তাহার এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা কঠিন।

হইতে জানা যায় মহারাজাবিহাজ ভাস্করবর্ধার বুদ্ধপ্রতিভার মহারাজ ভূতিবর্ধা এই ভূমি ভাস্করশাসন সম্পাদন করিয়া আদৌ কয়েকজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। সেই ভাস্করশাসন হারাইয়া বাওয়ার ঐ ভূমির উপর কয় বসান হইয়াছিল। ভাস্করবর্ধা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বর্তমান ভাস্করশাসন সম্পাদন করিয়া ঐ ভূমির মথলকারিগণকে পুনরায় নিজের ভোগদখলের অবিকার দিতেছেন। এই সম্বন্ধিত ভাস্করকলকষের ভূমির প্রতিগৃহীতাদিগের মধ্যে যেসব বিভিন্ন শাখাব্যাপী বিভিন্ন গোত্রের ১১১ জন ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভাস্করশাসনের যে কলকথানি এখনও পাওয়া যায় নাই তাহাতে হস্ত আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণ প্রতিগৃহীতার নাম গোত্রাদি ছিল। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে বাৎস্য, ভারদ্বাজ, কাস্ত্য, শাভিলা, গৌতম প্রভৃতি গোত্রেরও ব্রাহ্মণ আছেন। গুটীনের সপ্তম শতাব্দে ভাস্করবর্ধার সময়ে কামরূপের একটা গ্রামেই যদি এত ব্রাহ্মণের বসতি থাকিয়া থাকে, এবং তাহার চারি পুরুষ আগে ভূতিবর্ধার সময়ে এই সকল ব্রাহ্মণের পূর্বপুরুষগণ যদি এই ভূমি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে তাহার অনেক পরে বাঙ্গালার নাম সপ্তমত বর ব্রাহ্মণের থাকার কথা, এবং বজ্রের জন্য আদিশূর কর্তৃক কান্তকূজ হইতে বর্তমান সমস্ত রাষ্ট্রীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণের বীজপুরুষ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আদ্যবানীর কথা বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে কি? মহাবহোপাধ্যায় ঐযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সম্বন্ধিত ভাস্করকলকষ সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি হইতে তাহার অল্পবতি অল্পসারে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আমি প্রকাশিত করিলাম। এই অল্পবতি দানের জন্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট আভ্যন্তরীণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইহার প্রধান কারণ, যদি বাঙ্গালীর চণ্ডা মাথা মৌলভীজাতীর পূর্বপুরুষের দান হয়, তবে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদি উচ্চতর স্তরের জাতির মধ্যে মৌলভীজাতির নাক চোখ আদি আর কোন চিহ্ন দেখা যায় না কেন? গারো প্রভৃতি মৌলভীরাগির গৌক দাড়ি খুব কম গম্ভীর, সাঁওতাল ওড়াও প্রভৃতি জাতির গৌক দাড়িও কম। বাঙ্গালী যদি প্রধানতঃ মৌলভী-ত্রবিড় সত্ত্ব হয়, তবে বাঙ্গালীর প্রচুর গৌক দাড়ি আসিল কোথা হইতে? এই নিমিত্ত অনুমান হয়, বাঙ্গালীর চণ্ডা মাথা মৌলভীর শোণিতের মিশ্রণের ফল নহে, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বহির্ভাগ-বাসী চণ্ডা মাথা এবং দাড়িওয়ালা গালচা ও তাজিক প্রভৃতি জাতির সহিত দূর জাতিস্ব স্বচিত করে। বাঙ্গালীর শরীরে তথাকথিত ত্রবিড় বা কোলের শোণিত আছে; কিন্তু আদিম বৈদিক আর্ষ্যেরও মৌলভীর আগন্তকের শোণিতের অংশ বেশী নয়। বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব সীমান্তবাসী কোচ পলিরা ও মগজাতির মধ্যে মৌলভীর শোণিতের ভাগ বেশী।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে তিন প্রকার মত উল্লিখিত হইল তাহার কোনটিই এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না, এবং জাতির উৎপত্তি বিষয়ে hypothesis বা অনুমানের সীমা ছাড়াইয়া কখনও যে আর বেশী দূর—“ইদমেবতস্মৎ” পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া বাইবে এরূপ ভরসা করা সুকঠিন। ভাষাভেদে জাতিবিভাগের অনুমানের দোষ এই, ভাষা সকল সময় বংশোদ্ভূত নহে; ভাষা অনেক সময়ে শোণিতমিশ্রণ ব্যতীতও বিভিন্ন জাতির মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। পক্ষান্তরে আকৃতিভেদে জাতিভেদ করণের দোষ এত অসংখ্য যে এক সময় বংশোদ্ভূত নাও হইতে পারে; আকৃতিভেদে জাতিভেদে রূপান্তরিত হইতে পারে না এমন কথাও কারণী বলা যায় না। সুতরাং জাতিভেদের ক্ষেত্রে বাণ্যের আকৃতিভেদে ভাষাভেদ বহিঃসত্ত্বের জাতিভেদ বিষয়ক নিবন্ধের অনাদর করিতে পারেন না। জাতিবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ সময়ের

স্বতন্ত্র ভিন্ন বেশী কিছু মনে করা কর্তব্য নয়। এইরূপ রচনাতে প্রমাণবিচারের ও প্রমাণবিজ্ঞানের পারিপাট্যই রচনার উৎকর্ষ স্থচিত করে। প্রমাণবিচারে এবং প্রমাণবিজ্ঞানে বহিঃসত্ত্বকে অতুলনীর বলিলে বোধ হয় বিশেষ অত্যাক্তি হইবে না।

ভাষার হিসাবে বা আকৃতির হিসাবে বাঙ্গালী প্রধানতঃ যে যে জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্ধারিত হউক না কেন, বাঙ্গালার সভ্যতার সঙ্গে হিন্দুস্থানের সভ্যতার যে কতকটা প্রভেদ আছে একথা অস্বীকার করা কঠিন। হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণের জাতিবিভাগ এক ছাঁচে গড়া, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের জাতিবিভাগ আর এক ছাঁচে গড়া। হিন্দুস্থানের ধর্ম্মে কর্ম্মে বৈদিক ঋতীর প্রাধান্য; বাঙ্গালার ধর্ম্মে কর্ম্মে তাত্ত্বিক ঋতি প্রতিযোগিতা-রূপে বিস্তারিত। বাঙ্গালার কস্মিন্ কালে বৈদিক ঋতির একাধিপত্য থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার হস্তলিখিত বেদ ছগুণ্ড। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলানুধ “ব্রাহ্মণ সর্কস্বের” স্থানীয় লিখিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বেদ পড়ে না, পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণেরা কিছু কিছু আলোচনা করে। সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্বে বাঙ্গালার বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল। জনশ্রুতিও সাক্ষ্য দেয়, প্রাচীনকালে পুণ্ড্রেশ্বরের বা শকুনসত্ত্বের অন্তঃ হিন্দুস্থান হইতে ঋত্বিক আমদানী করিতে হইত। সভ্যতার এই প্রভেদে যে কতক পরিমাণে বংশভেদ স্থচিত করে এমন অনুমান অসঙ্গত নহে। একটা সংস্কৃত প্রবচন আছে—

অগবজকলিজেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।

তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমহঁতি ॥

বৌদ্ধধর্ম্মের ধর্ম্মস্বত্রে এইরূপ বচন আছে এবং অঙ্গমগধাদি দেশের অধিবাসিগণকে সঙ্গীর্ণযোনি বলা হইয়াছে, মিতাক্ষরার দ্বিতীয় দিবলের একটি বচনেও এইরূপ কথা পাওয়া যায়। মহুগংহিতার বর্ণিত মধ্যদেশবাসীরা যে এক সময় অঙ্গ মগধের অধিবাসিগণকে দ্বিগুণরূপে দেখিতেন এমন প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যেও বিয়ল নহে। সৌতম বুদ্ধ যে দেশের এবং যে বংশের লোকই হউন না কেন, বেদধর্ম্মোদী সৌগত মত উৎপ

হইয়াছিল মগধে। পালি বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্গে দেখা যায়, বোধিলাভের পরে ব্রাহ্মা গৌতম বুদ্ধকে ধর্ম প্রচারের জন্য অমর্যোধ করিতে বাইয়া বলিতেছেন—

পাতুরহোসি মগধেযু পুবে
ধম্মো অম্মক্কো সমলেহি চিত্তিতো
অপাপুরেত্তং অমতঙ্গমহারং
সুসত্তি ধম্মং বিমলেনাহুবিদ্ধং ॥

ললিতবিস্তরে (২৫ অঃ) অম্মরূপ সংস্কৃত বাংলা পাওয়া যায়। যথা—

বাদো বভূব সমটল বিচিচ্ছিতো
ধর্মোহ বিত্তক্কো মগধেযু পূর্বেং ।
অমৃতং মূনে তত্ত্বিবুণীষ হারং
সুখন্তি ধম্মং বিমলেন বদ্ধং ॥

ইহার তাৎপর্য, মগধের জন্তই আদ্যো বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রপাত; সুতরাং প্রাচীন মগধকে প্রাচীন অষ্টাদিক আর্য সভ্যতার কেন্দ্র মনে করা বাইতে পারে। সকল শাস্ত্রানুসারেই বাঙ্গলা অর্থাৎ বঙ্গ, সূত্র ও পুণ্ড্রের সহিত মগধ, অজ ও কলিঙ্গের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বাঙ্গলা তাহা মাগধী প্রাকৃত মূলক। সুতরাং সকল রকম প্রমাণ সম্বরণ করিয়া সিদ্ধান্ত করা বাইতে পারে যে, সভ্য বাঙ্গালী মূলতঃ অষ্টাদিক মাগধগণের জাতি এবং মগধ হইতে বাঙ্গালার আসিয়াছে। ১২৮০ সালে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

“অতএব এই পর্য্যন্ত সিদ্ধি, যে বখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয় তখন এদেশে আর্য জাতির অধিকার হয় নাই, বখন মহাসংহিতা সঙ্কলিত হয় তখনও হয় নাই, এবং বখন মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোন খানি কোনকালে সঙ্কলিত বা প্রণীত হয়, তাহা পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে বখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল তখন এদেশ ব্রাহ্মণশূত্র অনার্য্য ভূমি।

খ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্বে বা তদনু কোন কালে এদেশে আর্য্যজাতির অধিকার হইয়াছিল, বলিলে কি অন্তায় হইবে? তাহা বলা যায় না।” (বঙ্গদর্শন, ১২৮০, ২৩৩ পৃঃ)

যদি আর্য্য শব্দটা মাগধ অর্থে গ্রহণ করা যায় তবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত অব্যাহত মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তের অন্তর্কূল প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। পালি বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্গে (৫।১৩।১২) বৌদ্ধগণের পূজিত মন্ত্রম দেশের পূর্বসীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে কজ্জলা নামক নিগম এবং মহাশালা। এই সীমাবহ্নি দেশকে বলা হইয়াছে ‘মক্কে’ বা ‘মধ্যদেশ’ এবং ইহার পূর্বদিগবর্ত্তী দেশকে বলা হইয়াছে পচ্চত্তিমা বা প্রত্যন্তদেশ। মহাবগ্গে প্রত্যন্তদেশ বিভাগের এইরূপ কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে :—গৌতম বুদ্ধ প্রথমতঃ নিয়ম করেন যে দশজন ভিক্ষু মিলিত হইলে তবে কোন ব্যক্তিকে ‘উপসম্পদা’ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর পূর্ণ অধিকার দান করিতে পারিবেন। অনেক দেশে তখনও আবশ্যিক মত দশজন ভিক্ষু একত্র করা কঠিন হইত। এই জন্য বুদ্ধদেব ব্যবস্থা করেন—

“সব পচ্চত্তিমেসু জনপদেষু বিনয়ধর পঞ্চাশেন গণেন
উপসম্পদা।”

“সমস্ত প্রত্যন্ত দেশে বিনয়ধর এবং আর চারিজন ভিক্ষু একত্র হইলে উপসম্পদা দান করিতে পারিবেন।”

তারপর প্রত্যন্তদেশের সীমা নির্দেশ উপলক্ষে বলা হইয়াছে, কজ্জলের এবং মহাশালার পূর্বদিকে প্রত্যন্ত দেশ। কজ্জল রাজমহলের নিকটবর্ত্তী কাঁকজোল; মহাশালা এখনও অজ্ঞাত। বুদ্ধ বয়ঃ এই অংশের বন্ধা হইলেও যে সময় এই অংশ রচিত হইয়াছিল তখন মহুর মধ্যদেশ অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত বৌদ্ধগণের মধ্যদেশের সকল অংশেই এত বৌদ্ধভিক্ষু ছিল যে, উপসম্পদার জন্য দশজন ভিক্ষু একত্র জুটান কঠিন হইত না; অথচ তখন বাঙ্গলা দেশ প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া গণ্য

হইত। ইংরেজ অস্বীকৃত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তই মোটের উপর ঠিক। হয়ত ঐতিহ্যের ছয়শত বৎসর পূর্বে মগধ হইতে ঔপনিবেশিকগণ বাঙ্গালা দেশে আসিতে আরম্ভ করেন। বিনয়শিষ্টকের মহাবঙ্গ রচনার সময়, অস্বাভাবিক ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্য্যন্ত মগধবাসী বৌদ্ধেরা বাঙ্গালা দেশকে মধ্যদেশ বহির্ভূত প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া গণ্য করিতেন। কিন্তু ‘দিব্যাবদানে’র ‘কোটি কর্ণাবদানে’ দেখিতে পাওয়া যায় মধ্যদেশের পূর্ব সীমা বঙ্গদেশ হইতে সরিয়া পুণ্ড্রবর্ধন পর্য্যন্ত পড়াইয়াছে। যথা, “পূর্বোণালি পুণ্ড্রবর্ধনং নাম নগরং ততঃ পূর্বণ পুণ্ড্রককো নাম পর্বতঃ, ততঃ পরেণ প্রত্যন্তঃ” (২১ পৃঃ)। পুণ্ড্রকক বোধ হয় পারো পাণ্ড্যের নামান্তর। ‘মহাবঙ্গ’ স্থবিরবাসী সম্প্রদায়ের বিনয়শিষ্টকের অন্তর্গত। ‘কোটি কর্ণাবদান’ সর্বাঙ্গিবাসী সম্প্রদায়ের বিনয়শিষ্টক হইতে ‘দিব্যাবদানে’ উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘কোটি কর্ণাবদান’ যদি খ্রীষ্টাব্দের প্রাকালের রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তবে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টাব্দের সূচনা কাল মধ্যে বাঙ্গালা দেশ মগধাদি দেশ হইতে আগত আগন্তুকগণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা বাইতে পারে।

(২) আর্য্যাবর্তের কলঙ্ক।

জাতিতত্ত্ব ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত ঐতিহাসিক প্রবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার, কলঙ্ক মোচন। ১২৭৯ সালে বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় ‘ভারত কলঙ্ক’ শীর্ষক প্রবন্ধের গোড়ায় তিনি লিখিয়াছেন—“ভারতবর্ষের পূর্ব সোঁতব লইয়া আমরা স্পর্ধা করি। বাস্তবিক, স্পর্ধা করিবার বিষয় অনেক আছে। এক্ষণে ইউরোপীয় জাতিগণের পাণ্ডিত্য, শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনাদিতে ব্যাৎপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু আমরা কখন প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের হীনপন্থা লইয়া গৌরব করি না। এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের চিরকলঙ্ক ; ভারতবর্ষীয়েরা

রগনিগুণ বলিয়া কল্পিনকালে সূচ্যাত নহেন। এই অজ্ঞ, তাঁহারা বাহুবলদর্পিত তির-জাতীয়দিগের কাছে কতকদূর স্থগিত।”*

তৎকালে প্রচলিত ভারতবর্ষের এবং বাঙ্গালার ইতিহাসে মুসলমান বিজয়ের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে হিন্দুদিগকে একান্ত ভীত বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিবরণ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এবং বিশ বৎসরকাল, ‘ভারত কলঙ্ক’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘বাঙ্গালার কলঙ্ক’ পর্য্যন্ত, নানা সময়ে নানা প্রবন্ধে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, এই অপবাদ অমূলক। যে কলঙ্কজনক পরাজয়কাহিনী হিন্দুর ভীকতা অপবাদের মূল, তাহার সহিত ভারতবর্ষের একাংশ, আর্য্যাবর্ত মাত্র জড়িত। ইংরেজ অধ্যায়ের পূর্ব পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের দ্বারা অনেকটা স্বতন্ত্র। দাক্ষিণাত্য যেমন মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল, তেমনি কয়েকবার পুনর্জিতও হইয়াছিল। আরাবল্লীর এবং বিজ্জোর শাখা প্রশাখা দ্বারা সুরক্ষিত রাজপুতানার এবং মালবের অংশ বিশেষের ইতিহাসও সেই প্রকার। মুসলমান আক্রমণ জনিত কলঙ্কের কালিমার একমাত্র আর্য্যাবর্তের অঞ্চল সমতলের সর্বত্র আচ্ছাদিত। কিন্তু আর্য্যাবর্তের ভূসংস্থানের হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে অপ্রকাশিত অথচ এখন আমাদের হস্তগত প্রমাণ সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহাই সত্য। মুসলমানের আর্য্যাবর্ত বিজয়কাহিনী অতিশয় দুর্ভাগ্যের কাহিনী হইলেও কলঙ্কের কাহিনী নহে। যদিও এই প্রস্তাবের বিষয় ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস,’ বাঙ্গালা বিজয় ব্যাপারের সহিত আর্য্যাবর্তের অজ্ঞাত ভাগের ইতিহাসের এমনই

* এখন খণ্ড “বিবিধ প্রবন্ধে” পুনর্মুদ্রিত ‘ভারত কলঙ্ক’ প্রবন্ধে এই অংশ এই প্রকারে পরিবর্তিত হইয়াছে—“ভারতবর্ষ এককাল পরাবীন দেশ। এ দেশের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল এই অজ্ঞ। Effeminate Hindoos ইউরোপীয়দিগের মুখেই সর্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক।”

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে সমগ্র আর্ধ্যাবর্তের বিজয় বৃত্তান্ত একত্র আলোচনা না করিলে বাঙ্গালার ইতিহাস বুঝা কঠিন।

আর্ধ্যাবর্তের অঞ্চল সমতল ক্ষেত্র চতুর্দিকে পর্বতমালায় ঘারা আবৃত্ত। কিন্তু ইহার ভিতরে এমন কোন পর্বত বা বিস্তীর্ণ জলাশয় নাই বাগা খণ্ডরাজ্যের সীমান্তের প্রাচীর পরিখার কাজ করিতে পারে। সুতরাং আর্ধ্যাবর্তে স্বতন্ত্র খণ্ড খণ্ড রাজ্যের অভাব হইলেই অশান্তি এবং বিপদ অবশ্যভাবী। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে হর্ষবর্দ্ধনের সময় পর্যন্ত আর্ধ্যাবর্তে বরাবরই প্রায় এক একজন সার্কটোম সম্রাট দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই এইরূপ শক্তিসম্পন্ন সার্কটোম নরপতির অভাব হইরাছে, তখনই বিদেশীর আক্রমণকারী আসিয়া আর্ধ্যাবর্তের পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়াছে; তারপর আবার প্রাচ্যভাগে কোন সার্কটোম অভিযুক্ত হইয়া সমস্ত দেশ পুনরধিকৃত করিয়াছেন। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের পরে এইরূপ সার্কটোম আর দেখা যায় না। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের এখানকার কান্দীররাজ ললিতাদিত্যের আক্রমণের কালে কাঞ্চকুজের বশোবর্ষার দ্বিধিলয় বিকল হয়। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দে গৌড়েশ্বর বর্ষপালের এবং পরে গুর্জর প্রভীতার প্রথম ভোজের ও মহেন্দ্রপালের সার্কটোম অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দের আরম্ভ হইতে আর্ধ্যাবর্তের খণ্ড রাজ্যের অধিপতিগণ পরস্পরের সহিত বিরোধে ব্যস্ত থাকিয়া অধঃপতনের লব্ধি প্রস্তুত হইতেছিলেন। দশম শতাব্দের শেষ ভাগ পর্যন্ত আর্ধ্যাবর্তের সিংহবার খাইবার পরিপথ উদ্ভাগপুরের (Ohind) সাহিরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। একদিকে পাঞ্জাব, আর একদিকে কাবুলসহ আফগানিস্থানের পূর্বাঙ্গ সাহিরাজগণের পদানত ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষভাগে গজনীর আর্মীর সবুজতগিন্দ সাহিরাজ ভয়পালকে পরাসিত করিয়া কাবুল এবং

খাইবার পথ সহ উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পর্বতমালা অধিকার করিয়াছিলেন। সবুজতগিনের পুত্র জুলতান মামুদ সাহিরাজ ভয়পাল, আনন্দপাল ও জিলোচনপালকে বধাক্রমে পরাসিত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়া ছিলেন। তারপর হইতে দ্বাদশ শতাব্দের শেষ পাদে সুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ পর্যন্ত এই সার্কটোম শতাব্দিকাল পাঞ্জাব মানুষের উত্তরাধিকারিগণের অধিকারভূক্ত ছিল। সুইজুদ্দীন ঘোঁরা ইহাদেরই উত্তরাধিকারী। এই সুবীর্ষ সময় মধ্যে হিন্দুরা যদি আর্ধ্যাবর্তের সিংহবার পুনরায় হস্তগত করিতে পারিতেন তবে বোধ হয় ইতিহাসের ধারা অন্যভাবে প্রবাহিত হইত। হিন্দুরা সেই কার্য সাধন করিতে পারেন নাই ইহা স্থির। কিন্তু তাঁহারা যে পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষের উত্তরাধিকারিগণকে বিতাড়িত করিবার লব্ধি কখনও কোন চেষ্টা করিয়াছেন এমন কথা প্রচলিত ইতিহাসে নাই। এবং যদি প্রকৃত ঘটনাও তাই হয় তবে ভীকৃত। তিন্ন একরূপ নিশ্চেষ্টতার আর কি কারণ হইতে পারে? মানুষের পুং মানুষের সমসময়ের পারস্পরিক ভাবের লিখিত একখানি ইতিহাস আছে। কিন্তু মানুষের পরবর্তী গজনবীবংশীর জুলতানগণের কোন সমসময়ের ইতিহাস নাই। জয়োদশ শতাব্দের মধ্যভাগে লিখিত মিন্হাজুদ্দীনের ডবাকাং-ই-নাসিরিতে পাঞ্জাবের গজনবী জুলতানগণের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইরাছে। প্রচলিত ইতিহাস সেই বিবরণ মূলক। কিন্তু এখন হিন্দু পক্ষের যে সকল শিলালিপি আমাদের হস্তগত হইরাছে তাহা পাঠ করিলে দেখা যায়, দ্বাদশ শতাব্দের শেষ পাদে সুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের অনেক পূর্বাধি হিন্দুরাজগণ ভয়কের কবল হইতে আর্ধ্যাবর্ত উদ্ধারের চেষ্টার মত ছিলেন।

(আগামী সংখ্যার সমাপ্য)

জিন্না প্রসাদ চন্দ।

সবই ছিল, সবই ছিল !
 গুরু বলে মানুছ বাঁদের,
 নুতন তারা কি আর দিল ?
 রেল ইন্টিয়ার টেলিগ্রাফী
 ছিল ছিল ভারতব্যাণী,
 ছিল মোদের কটোগ্রাফী,
 ছাপাখানা, পেপার দিলও ।
 ওদের যা, তা' সবই ছিল
 বেশী ছিল মোদের বরং—
 প্রমাণ করে, ভেঙে দিতে
 পারি আমি ওদের ভক্ত্য ।
 সাব্‌মেরিন কি বুদ্ধ বাঁহাজ
 ছিল মোদের, নেই বটে আজ ।
 জাহাজ ছাড়াও বীর হুম্মান
 লক্ষ্যে সাগর ডিঙাইল ॥
 এরাই প্রাণ ত ছিলই মোদের
 নরক শুধু হাওয়ার ওড়া—
 চলত লড়াই আসমানে তাই,
 রথের সঙ্গে উড়ত ষোড়া ।
 মাঝার প'রে পাছাড় ধরা,

বুথের হুঁরে তন্ন করা,
 নরক সোলা— বর্গে বাঁহার
 গিঁড়িত তাই বিরচিত ।
 সবাই ছিল, বরং বেশী—
 ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হলো
 নেইক এখন, সুযোগ গেলে,
 মিথ্যে সবাই বলবে—বলো !
 মহাবেনাক সত্য তাতে,
 করব প্রমাণ হাতে হাতে,
 মোদের ওরা প্রমিত্যধন—
 মোদের কাছেই নিধেনিলো ।
 বসন্তরু ছিল হাজার,
 পরশমণি বুড়ি বুড়ি—
 গণ্ডুবে পান করত সাগর,
 আসক্ত বেত পাঁহাল হুঁড়ি ।
 কি আর ওরা করলে বাঁহর,
 করছে যে সব বিভে জাহির ?
 মোদের বা' বা' ছিল তাহার
 পারনি ওরা একটি তিলও ।
 শ্রীকালিদাস রায় ।

পরিচয়

(গল্প)

সেদিন মোটরে করিয়া অনাথ প্রভৃতি গিরিডি সহরটা বেড়াইয়া আসিল। রসিক ও কণিকাও তাহার সঙ্গে ছিল। নরহরিবাবু বিশেষ কাণে তাহাদের সঙ্গী হইতে

পারিলেন না। তিনি সেদিন একটা ইংরাজের সহিত খাদে গিয়াছিলেন। কণিকার আগছোট ভাবটা অনাথের চক্ষে বড় হৃদয় লাগিতেছিল। গিরিডির বাঁকালী-পল্লী, রাজার করলার খনি এবং বরা-কর নদীর

ধার পর্যন্ত তাহারা ঘুরিয়া আসিল। কণিকা কতকগুলি করলার খনি দেখাইল। পরিভ্রম্য করলার খনি পরিভ্রম্য বৃদ্ধ ভৃত্যের মত নীরবে পড়িয়া রহিয়াছে। কণিকা বলিল, “এই যে বড় বাড়ী আর বাগান দেখছেন এটা একটা ধনী মাফোয়ারীর। এঁর কাছেই বাবা অস্ত্রের কাষ শেখেন। গিরিডির মধ্যে এঁর চেয়ে বড় অস্ত্রের কাষ কারও নেই।”

রসিক জিজ্ঞাসা করিল, “এঁদের কারখানার তোমাদের মত ইলেক্ট্রিক লাইট, কলের জল, টেলিফোন সব আছে?”

কণিকা একগাল হাসিয়া উত্তর করিল, “মামার এক কথা! এসব বুঝি খুব বড় জিনিষ? এসব থাকা বুঝি খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার? এ সব নইলে কারবার চলবে কেমন করে? ইংরাজদের প্রত্যেক কারখানাতে এসব আছে, তা বুঝি দেখেন নি?”

অনাথ আর কণিকার দিকে না ফিরিয়া বা কোনও প্রশ্ন করিবার বার্ষ সাহস না দেখাইয়া রাস্তার ধারে একটা মাঠের উপর কতকগুলি বঙ্গালীর ছেলে-বালক চাকরদের সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়াছে, তাহাদের দিকে তাকাইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথাটা চিন্তা করিতে লাগিল।

রসিক জিজ্ঞাসা করিল, “টেলিফোনের কি প্রয়োজন?”

কণিকা উত্তর করিল, “কারখানার সঙ্গে সর্ব্বদা কথাবর্ত্তা না কইলে চলে না। সময় সময় সারা রাজি কাজ হয় কিনা।”

রসিক বলিল “এঁদের কারখানার কত লোক কাষ করে?”

কণিকা বলিল, “আমাদের কারখানা চেয়ে ২০০০ হাজার বেশী। প্রায় ১২০০০ হাজার লোক।”

“বলেন কি” বলিয়া অনাথ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে কণিকার মুখের প্রতি চাহিল।

কণিকা কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া খুব সহজ ভাবেই বলিল, “আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কোন কারণ

নেই। কাষ করলেই লোকের প্রয়োজন। কাষ যত বড় করবেন, তত বেশী লোকের আবশ্যক হইবে। নেই। চলুন, দেখবেন আমাদের কারখানা। আজ কাল কাষ কিছু কম, তবু প্রতিদিন দশ হাজার লোক কাষ করছে।”

একটা বাঙ্গালী-পরিচালিত কারখানার এতগুলি দেশবাণী দরিরের অন্ন-সংস্থান হয় তিনি অনাথের অন্তরের ভিতর বিপুল আনন্দ হইল। এক একটা ইংরাজের কারখানার অনেক লোক কাষ করে, তাহা সে দেখিয়াছে। কিন্তু বাহা কোন দিন যন্ত্রেও তাহা নাই, তাহার করলারও কোন দিন আসে নাই, আজ তাহা সবক্ষেপে দেখিতে যাইতেছে মনে করিয়া যে কতখানি উৎসাহ, শক্তি ও হর্ষ এক সঙ্গে তাহার হৃদয়ে তরিয়া উঠিতেছিল তাহা বলা যায় ন। যথাসময়ে তাহার কারখানা বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অনাথ বাহা ভাবিয়াছিল তাহাই ঘটিল। গুজরাটী ম্যানেজার আসিয়া তাহাদের মধ্যবোগ্য অভিনন্দন করিয়া লইয়া গেলেন। কণিকা তাহাদের উত্তরের মধ্যস্থলে অভ্যস্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া চলিতেছিল। সে-ই সমস্ত বিষয়গুলি বুঝাইতে লাগিল। ম্যানেজার তাহার সহায়তা করিতেছিলেন। কারখানাটির চারিদিকে বড় বড় হল ঘর এবং সমুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বারান্দা। এই বারান্দার উপর এক একটা বিভাগ, সহস্র সহস্র বালক-বালিকা বুঝা-বুঝা হিন্দু-মুসলমান কাজ করিতেছে। ইহার একধারে একটা বড় হল-ঘর ম্যানেজারের অফিস। সেখানে অনেকগুলি কর্মচারী লেখাপড়ার কাষ করিতেছে। ম্যানেজার লোকটা বড়ই অম রিক ও শাস্ত-ভাবাপন্ন। তাহার কথা-বার্ত্তা অত্যন্ত তজ্র। সমস্ত ব্যাপারটি যেন তিনি নশ্বকগণকে সুহৃদের ভিতর বুঝাইয়া দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল।

সব চেয়ে উল্লেখ করিবার মত ব্যাপার, এত লোক এক সঙ্গে কাষ করিতেছে কিন্তু এতটুকু বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ নাই। সকলেই যে যার কাষ লইয়া ব্যস্ত।

কণিকা এক জায়গায় বসিয়া বলিল, “এরা অল্প sort করছে। এরাই একরকম অল্পের ভাল-মন্দ বেছে এফ একটা standard ঠিক করে’ দেয়।”

রসিক জিজ্ঞাসা করিল, “সে কি রকম?”

কণিকা বলিল, “এরা হচ্ছে অল্পের ‘বাচনদার’— অল্পের কাষ করে’ করে’ এমন একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে গিয়েছে যে, কোন্ অল্প কোন্ শ্রেণীর আর কি মূল্যে বিক্রী হবে তা এরাই নির্ধারণ কবির দেয়। তারপর ম্যানেজার পরীক্ষা করে মনোনীত করে নেন। আর দেখা গেছে এদের সঙ্গে ম্যানেজারের মতের খুব কষই অমিল হয়ে থাকে। কি বলেন ম্যানেজার বাবু?” বলিয়া কণিকা ম্যানেজারের সমর্থন প্রার্থনা করিল।

ম্যানেজার বখেটে বিনয় দেখাইয়া উত্তর করিলেন, “এ সবই অভিজ্ঞতার ফল। এদের নির্বাচন শক্তি প্রশংসারোগ্য। যদিও এসব লোকের লেখা-পড়া জ্ঞান নেই বললেই হয় তবু অল্পসম্বন্ধে এদের অভিজ্ঞতা বখেটে সে বিষয় স্পর্ধা করে’ বলা যেতে পারে।”

অনাথ ম্যানেজারের প্রতি একবার বক্তৃতা দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল। সে দৃষ্টির অর্থ—লেখাপড়া জ্ঞান নাই ত, কি হইয়াছে? ইহা কিছু ক্ষুদ্রতর অপরাধ নয়। আর লেখাপড়া জ্ঞান থাকিয়া ত সব বুঝিতেছি! রসিক জিজ্ঞাসা করিল, “ইহাদের কিরূপ বেতন দিতে হয়?” ম্যানেজার উত্তর করিলেন, “৮০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্যন্ত।”

অনাথ শুনিয়া একটু চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, তাহাদের প্রায়ের বি-এ পাস হেডমাষ্টারের সাহিনা আগ দশ বৎসরে ৮০ টাকা মাত্র দাঁড়াইয়াছে।

কারখানার মাঝে একটা বৃহৎ “প্রস্তুত-মালের” গুদাম। সেটা অল্পে পরিপূর্ণ। তাহার ভিতর নাকি ৮০ লক্ষ টাকার মাল জমা রহিয়াছে। বিলাতে এখন অল্পের খুব জোর প্রয়োজন নাই, সে জন্ত মাল পাঠান বন্ধ আছে। দর মন্দা বলিয়া বিক্রয় করা হয় নাই। বিলাতের অকিসে নাকি এক কোটি টাকার মাল জমা

রহিয়াছে। সমস্ত কারবারটা ঘুরিয়া দেখিতে আর হুই বস্তার অধিক সময় লাগিল।

৬

নরহরি বাবু হাসিয়া বলিলেন, “অনাথ বাবু খান বেখে এসে বেন খুব গভীর ভাবে, কি একটা বিষয় চিন্তা করছেন?”

রসিক বলিল, “কিলজকার মাহুব কিনা, চিন্তাই হচ্ছে ওদের কাষ।”

এমন সময় কণিকা জল খাবারের আয়োজন হইয়াছে সে সংবাদ লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

সকলে এক সঙ্গে জল খাইতে বসিলে কণিকা পরিবেষণ করিতে লাগিল। বাগানের পেঁপে, কলা, ডালিম হইতে স্নক করিয়া ঘরের ছুখের ছানার প্রস্তুত রসগোল্লা, সন্দেশ, ছানার জিলিপি প্রভৃতি বথন একে একে আসিতে লাগিল, তখন রসিক হাসিয়া বলিল, “এখানে এ সবেরও খনি আছে নাকি? তাহলে আমি ওকালতী পড়া আজই ছেড়ে এই ব্যবসার লেগে যাই।”

কণিকা বোধহয় কিছু উত্তর দিবে এমন তাব তাহার সুখের উপর কুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা সামলাইয়া অনাথের সুখের প্রতি সুহ হাসিয়া চাহিতেই অনাথ বলিল, “এ সবই সেই এক অল্পের খনিতে পাওয়া যায়। বা খাজ, সবই হচ্ছে অল্পের রূপান্তর মাত্র। দেখ্‌চ না, বত খাজ, ততই ঠোঁটের কিনারায় অল্পের মত হাসি চিক্‌ চিক্‌ করছে।”

নরহারি বলিল, “সবই অল্পের রূপান্তর সে বিষয় কোন ভুল নেই।”

কণিকা হাসিয়া কেলিল। তাহার হাসিতে সে বুঝাইল, সে অনাথের উত্তরে খুব খুশী হইয়াছে।

অনাথ নরহারির দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমার একটা প্রস্তাব আছে।”

নরহারি বাবু বলিলেন, “কি প্রস্তাব, বলুন; আমার সাধ্য হলে আমি তা গ্রহণ করবো।”

কপিকা মনে মনে বলিল, “বাবার অবস্থা করবো বলা কি সম্ভব হ'ল?” তাহার মাথার মধ্যে বারম্বারের চিত্রের মত সহস্র সহস্র চিত্রা ভড়ি পড়িতে প্রবাহিত হইয়া গেল।

অনাথ বলিল, “আমি মনে করছি, বুঝা টাকা নষ্ট করে আর এম-এ পড়ব না, আজই এখান থেকে চিঠি লিখে দিই।”

নরহরি। উপস্থিত কি অন্তে লেখাপড়া ত্যাগ করিতে চান?

অনাথ অত্যন্ত দৃঢ় কর্তে বিনা উত্তেজনার উত্তর করিল, “লেখাপড়া শিখে কোনও লাভ নেই বুঝতে পেরেছি।”

নরহরি। একথা যদি বলেন, তবে এতদিন কেন ত্যাগ করেন নি?

অনাথ তেমনি স্থির কর্তে উত্তর করিল, “এতদিন অল্প পথ দেখতে পাই নি, আর দেখবার কোন চেষ্টাও করি নি।”

নরহরি। এখন কি পথ দেখতে পেরেছেন? আর যে পথ দেখতে পেরেছেন সেটা মরীচিকা নয় ত?

অনাথ। এতদিন পাই নি, আজ পেরেছি। এতদিন কেবল মরীচিকা করি পিছনে ছুটেছি। কোনদিকে চাই নি, চাইবার অবসর পাই নি।

নরহরি। যদি সত্য সত্যই পথের সন্ধান পেয়ে থাকেন, তবে সে পথে চলাই আপনার কর্তব্য। কিন্তু আপনার পিতামাতা কি আপনার সে পথ গ্রহণ অনুমোদন করবেন?

অনাথ পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া নরহরি বাবু হাতে দিল এবং বলিল, “উাদের অনুমতি পেরেছি। এখন আপনার অনুমতি পেলো আমি বিশেষ অনুগ্রহীত হই। আপনি আমার এ পথে কি সহায় হবেন না?”—বলিয়া অনাথ নরহরি বাবুর সুখের প্রীতি চাহিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

নরহরি বলিলেন, “আমার কি করতে হবে বলুন?”

অনাথ বলিল, “আপনার কাছে আমাকে ব্যঙ্গা শিখতে অনুমতি দিন এই আমার প্রার্থনা।”

নরহরি বলিলেন, “দেখুন অনাথ বাবু, আপনার ব্যবসা দেখবার উৎসাহ, আগ্রহ আমাকে যে কি পর্যন্ত মুগ্ধ করেছে তা বলতে পারি নে। আপনারদের মত ছেলেরা বতদিন পর্যন্ত ব্যবসার দিকে ন' চাইবে, ততদিন সহস্র চেষ্টাতেও দেশের আত্মশক্তি বোধ মেগে উঠবে না। কবি, শিল্প ও বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে দেশের জীবনী শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নতুবা এক মুষ্টি অন্ন আর একখানি বস্ত্রের জন্যে দেশ হাহাকার করে মরবে, সে বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।”

অনাথ বলিল, “এ বিষয়ে আর কোনই তর্ক নেই।”

নরহরি বলিলেন, “উত্তেজনার মুখে আমরা না ভেবে অনেক সময় এগিয়ে পড়ি; তারপর একটু থাকা খেলেই পেছিয়ে পড়ি। এতে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। আজ আপনি উত্তেজনার মুখে হয়ত বতখানি অধ্যবসায় আপনার আছে বলে মনে করছেন, ছুদিন পরে তার সম্পূর্ণ অভাব দেখে হয়ত আপনি অসুতপ্ত হবেন। বেশ করে চিন্তা করে তারপর যদি আসতে রাজি হন, আমি আপনাকে নিজের ছেলের মত কাঁধ পেঁচাতে প্রস্তুত আছি।”

অনাথ বলিল, “আপনার আশ্বাসবাণী আমাকে যে কি পর্যন্ত উৎসাহিত করেছে, যদি কোন দিন কৃত-কার্য্য হই, তবেই তার পরিত্য দেবো।”

রসিক এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই। সে বলিল, “দেখছি শেষটা তুমি পাশ করার মারা কাটাতে? বেড়াতে এসে ব্যবসাদার হতে চললে। মন্দ নয়, কিন্তু এত সব কষ্ট কি তোমার শরীর সহ্য করতে পারবে?”

নরহরি অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিলেন, “দেখ রসিক, দুই থেকে তিন পেয়ে পাঁচালে কোন দিন কোন কাঁবে সকলকাঁব হওয়া অসম্ভব। সওয়া না সওয়া সবই আমাদের মনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছে। আজ অল্পক্ষণ রৌদ্রে দাঁড়ালে তোমার মাথা ধরবে, অল্পখ করবে, একথা খুব সত্য। কিন্তু কিছুদিন অত্যাঁস হ'লে,

সেই রোজে না ঝাঁড়ালে আবার অসুখ করবে। সাহস নেই বলে' রোগ নেই নেই করলে সাহস কোনদিন আর আসবার পথ পাবে না। এ সব হচ্ছে কেবল অত্যাগ। আমাদের জাতটা ক্রমাগত নিজেদের কোন শক্তি নেই ভেবে ভেবে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কপিকা বালিকা, ছেলেবেলা থেকে ও আমার সঙ্গে সঙ্গে এই কাবের মধ্যে থেকে যেমন কাব শিখেছে, তেমনি সাহস ও মায়া-নির্ভর শক্তিও লাভ করেছে। এখন আমি বলতে পারি, আমার অবর্তমানে কপিকা আমার কাব বেশ চালাতে পারবে, কেউ তাকে ঠকিয়ে এক পরগাও নিতে পারবে না।

পিতার মূখে কপিকা নিজের প্রশংসা শুনিয়া লজ্জার সংকুচিত হইয়া গেল। মরহরি পুনরায় বলিলেন, "আমার ছেলে নেই, কিন্তু সেলভ সত্য বলছি, আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ আমি জানি, কপিকা আমার ছেলের কাব খুব কর্তে পারবে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা অনাথ, তুমি এই কাব শেখ এবং আমাদের ক্যান্ট্রীর ভিতর একটা স্কুল খোল; এবং দেশের ছেলেদের বিনা বেতনে এই কাব শেখাও। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা, এই রকম একটা স্কুল খুললে দেশের লোকের অনেক উপকার হবে। তুমি যদি আমার এ কার্যে সহায় হও তবে তোমার সঙ্গে কপিকাও সে কার্যে যোগ দিতে পারে।"

ইহাতে কপিকা যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিল। অনাথ সেদিন বিপ্রহরে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া তাকে পাঠাইয়া দিল। কপিকা দেখিল, একখানি কলেজের প্রিন্সিপালের নামে লেখা।

৭

তারপর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কপিকার বিজ্ঞানর হইতে এখন দেশের অনেক ছেলে অন্ত্রের কাব শিখিয়া স্বাধীন ভাবে নানা স্থানে কারখানা খুলিয়াছে। অনাথ গত বৎসর বিলাতে গিয়া নিজেদের একটা অফিস খুলিয়া আসিয়াছে। এখন পূর্বে অপেক্ষা অনেক বেশী

লাভ হইতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে নানারকম নূন কারবার আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন অনেক ব্রহ্ম বাবসারী এই দেশীয় লোকের ঐতিহাসিক বিলাতের অফিসে অত্র বিজ্ঞানার্থে পাঠাইয়া যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন। অনাথকে মরহরি বাবু অত্যন্ত মেহ করেন। তাহার প্রতি তাঁহার অসীম বিশ্বাস। অনাথকে নিজের কারবারের অর্দ্ধেক অংশীদার করিয়া লইয়াছেন। গিরিজিতে অনাথের বাড়ী এখন একটি দেখিবার মত ভিঁরি। অনাথের পিতামাতা এখন বৎসরের প্রায় অনেক সময় এখানেই থাকেন। মরহরি ইদানীং বড় একটা কাবকর্ম দেখেন না। তাঁহার বাগান বাটীতে আজ এক বৎসর বাবৎ একটি সাধু আসিয়া আছেন, তাঁহার সহিতই সর্বদা ধর্ম্মালোচনা হইয়া থাকে। সাধুকে মরহরি বাবু গুরুর ভাৱ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। মরহরি বাবুর স্ত্রী মেহমতীও সেখানে সন্ধ্যার পর গিয়া বসেন।

একদিন সম্যাসী বলিলেন, "মেয়েটির বিবাহ দিয়ে তারপর তোমাদের সংসার ত্যাগ করা কর্তব্য। মেয়েটি হাজার বুদ্ধিমত্তী ও কাবের লোক হলেও, যখন কাব কর্ম ও গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করতে হবে, তখন তার বিবাহ দেওয়া একান্ত কর্তব্য।"

মেহমতী বলিলেন, "দেখুন, মেয়েকে আমরা একটু অন্তভাবে মাহুষ করেছি। তা ছাড়া, আমাদের সমাজে যে বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া রীতি, সে বয়সও অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। এখন মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি সহজ হবে?"

সম্যাসী মুহূ হাসিয়া অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "পাগলী না আমার কি বলছ? কপিকা তোমার একটি রত্ন। এমন মেয়ে বাদে যার যার থাকে তাঁদের অত্যন্ত ভাগ্য, এ বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তারপর এ জগৎটা যে না অন্ধ হ'লে কেবল তাঁকার উপাসনা করছে। স্ত্রীর কপিকার বিবাহের জন্যে কিছুমাত্র চিন্তার কারণ নেই। অনেকেই ছুটে আসবে, কিন্তু তা' বলে যার তার হাতে কপিকাকে দিতে আমি বলি না। আমার মনে হয় অনাথ ছেলেটি বেশ সচ্চরিত্র

এবং সাধু প্রকৃতি। কেবল তাই নয়। গরীব হুণীর প্রতি ওর বিশেষ বন্ধ আছে। ওর হৃদয়ের পরিচয়ও অনেকবার আমি পেয়েছি।”

সেহমরী বলিলেন, “এ প্রস্তাবে কি অনাথ রাজী হবে? অনাথের পিতামাতা এতবড় বৌদ্ধের নিতে যদি অসম্মত হন, তা হলে বড়ই একটা কষ্টের কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে।”

৮

অনাথের পিতামাতা আপত্তি করেন নাই। আজ শুভ বিবাহ।

অনাথের বাড়ী হইতে নরহরির বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তাটি কুলি মজুর গণ অল্পে একরূপ সুড়িয়া দিয়াছে। সূর্য্য অস্ত্রের উপর পড়িয়া সহস্র সহস্র হীরক খণ্ডের ঔজ্জ্বল্যে পথিকের দৃষ্টিবিন্দন প্রস্রাইতেছিল।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। ফুলশবার দিন প্রভাতে, অনাথ ও কণিকা নিভৃত কক্ষে বসিয়া কথো-পকথন করিতেছিল।

অনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, “কণিকা, অস্ত্রের কাব তোমার কাছেই ত আমার শেখা! আমাকে কি গুরুদক্ষিণা দিতে হবে, এবার তার হুকুম হোক।”

কণিকা হাসিয়া বলিল, “হুকুম কি একবার বলিই সহজে হয়? এখনও বিলম্ব আছে।”

অনাথ বলিল, “এখনও বিলম্ব কেন কণিকা?”

কণিকা বলিল, “গুরুদক্ষিণা দেওয়া সহজ হতে পারে, কিন্তু নেওয়া যে অত্যন্ত কঠিন।”

অনাথ বলিল, “কঠিন কেন?”

কণিকা বলিল, “সর্ব্বস্ব না দিতে পারলে ত আর দক্ষিণা নেবার অধিকার হয় না।”

অনাথ বলিল, “তবে কি দেওয়ার মধ্যে এখনও কিছু ঘিণা আছে?”

কণিকা বলিল, “নাহে।”

অনাথ সম্মুখের চেয়ার খানির উপর হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল।

কণিকা একখানি অত্যন্ত সুন্দর হীর উপর একরাশ ফুল আনিয়া অনাথের সম্মুখে রাখিল এবং বলিল, “সর্ব্বস্ব দেওয়া কিছু বেশী কথা নয়—সে ত দিয়েছি; তবে একটা জিনিস দিতে পারিব না। সে জন্ত ক্ষমা কর্ত্তে হবে।”

অনাথ বলিল, “সেটা কি?”

কণিকা বলিল, “তোমার কাছে আমি ঘোমটা দিয়ে কেনেবো সেপে বেঁকতে পারব না। এই অজুমাতিটি তুমি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ আমার দান কর।”

“দোহাই তোমার—কেনেবো তুমি সেজ না।”—
—বলিয়া অনাথ তাহার নবগরিণীতা পত্নীকে চুম্বন করিল।

এমন সময় বাহির হইতে রসিক চিংকার করিতে করিতে আসিতেছিল, “কোথার হে অনাথ, আমি ওকালতী একেবারে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।”

অনাথ অভূত পূর্ব্ব আনন্দে দৌড়িয়া গিয়া রসিককে টুই বাহু দিয়া প্রগাঢ় প্রেমে বক্ষ মধ্যে আলদনে আবদ্ধ করিল।

সমাপ্ত

শ্রীকবিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দারার ছরদৃষ্টি

(পূর্বানুস্মৃতি)

দারার এই ছঃসময়ে ঔরঙ্গজেবের হোযরক্ত নরন
এবং বাদশাহী অগ্নিবর্ষী কাহানকে সমভাবে তুচ্ছজ্ঞান
করিয়া, তাঁহাকে আশ্রয় এবং সাহায্যদান করিবে এমন
লোক কে আছে, দারা সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন।
তারতের উপান্তভাগে, বেলুচিস্থানের আ.স্ত সীমার,
মালেক জিউরান নামক একজন সামন্ত সর্দারের কথা
দারার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল। এক সময়ে বিশেষ
অপরাধের জন্ত মালেক জিউরানের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা
বাদশাহ শাজাহান দিয়াছিলেন; বখশ শূঙ্খলাবদ্ধ মগরাণী
সম্রাটের নিকট আনীত হই, রাজকুমার দারা তাঁহার
স্বভাবসিদ্ধ দয়ার বশবর্তী হইয়া পিতার নিকট
জিউরানের প্রাণতিকা প্রার্থনা করেন এবং তাহাকে
পুনরায় তাহার রূপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সম্রাটের
নিকট বিনীত নিবেদন জানান; স্নেহশীল পিতার
নয়নানন্দ নন্দনকে অদেয় কিছুই ছিলনা; স্মৃতরাং দারার
দয়াতেই জিউরান বম্বলন্দরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াও
জীবলোকে কিরিয়া আসিতে পারিয়াছিল। দারার
মনে হইল এই মালেক জিউরান, প্রাণদানের বিনিময়ে
তাঁহাকে আশ্রয় এবং সাহায্য দিয়া সাধ্যানুসারে
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। মালেকের বাসস্থান নিকটেই
ছিল, দারা তখার বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন এবং
তাঁহার আগমন সংবাদ দিবার নিমিত্ত একজন অশুচরকে
জিউরানের নিকট প্রেরণ করিলেন।

মুহূর্ত্ত নাদিরার প্রাণ লোকান্তরে বাইবার জন্ত
যাত্রা করিয়াই বসিয়া ছিল, রোগবীর্ণ দেহের অবশেষ
আর কিছু ছিল না; সামান্ত সামন্ত সর্দারের গৃহে
আতিথ্য গ্রহণের অসম্মান রাজরাজেশ্বরী বুরি সহ্য
করিবেন না বলিয়াই, মালেক জিউরানের আবাসে
পর্দাখিয়ার পূর্বেই তাঁহার দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণ-

বিহীন পরীলোকে উড়িয়া চলিয়া গেল। নাদিরা সকল
ছঃখ বেদনা, কোষ্ঠ কতি, ক্লেশ অপমানের অতীত লোকে
চলিয়া গিয়া শান্তির শীতল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিলেন,
কিন্তু তাঁহার প্রিয়-দয়িত দারার মস্তকে যে বজ্র হানিয়া
গেলেন তাহার বেদনা যে ভীষণ! যে দিন কুন্তুমাল্যের
দ্বারার উত্তরের প্রকোষ্ঠ বন্ধন করতঃ মোদা মন্ত্রপাঠ
করিয়া দিয়াছে, সেই 'দন হইতে স্মৃতে ছঃখে, সম্পদে
বিশ্বদে, রোগে স্বাস্থ্যে, কর্মে নশ্বে, উৎসবে বাসনে,
এক মুহূর্ত্তের জন্তও পরম্পরের বিচ্ছেদ ঘটে নাই।
আজ মরণ আসিয়া যে বিরহের সৃজন করিল, দার,
তাঁহার অবসান কবে, কেমন করিয়া হইবে? দারার
সকল ছঃখের সাধন, সকল ব্যাধির সেবা, সকল কর্মের
মন্ত্রণ, সকল নশ্বের সঙ্গিনী এক মুহূর্ত্তে কোন্ মুহূর্ত্ত
লোকান্তরে চলিয়া গেল, রহিল কেবল ছঃখের চিরন্তন
হাহাকার, আর অকুরুৎ অকুরুৎ অবশ্রাম বর্ষণ! দারার
চক্রে সূর্য্য নিবিয়া গেল, সমগ্র ধরণী অন্ধকার মরুভূমিতে
পুণ্ডিত হইল, জীবিত প্রয়োজনও শেষ হইয়া গেল।
ইহলোকে অনেকের ললাটেই বিধাতা বিরোগ-ছঃখ লিখিয়া
থাকেন, কিন্তু জীবন থাকিলে বিরহাতুর জনের অন্তরের
অন্তরতম নিভৃত প্রদেশে বোধাও না কোথাও আশার
কোণ দীপ শিখা মুহু মুহু অগ্নিতে থাকে, মনে হয়
কখনও এমন দিন আসিতেও পারে বখন বিরহ
বেদনার অশ্রুজল শুষ্ক হইয়া বাইবে, প্রসারিত আলিঙ্গনের
মধ্যে চির-আকাজিকিত প্রিয়জন আসিয়া ধরা দিবে।
কিন্তু মুহূর্ত্ত আসিয়া বখন প্রিয়তম জনকে লোকান্তরে
লইয়া যায় তখন এক নিমেষে সকল আশা চূর্ণ
চূর্ণিত হয়, দেহমন-অন্তরাত্মা সমস্তই ধূল্যবলুপ্তিত হইয়া
পড়ে—দারার তাহাই হইয়াছিল। নাদিরা কেবল
যাত্রা দারার পরী ছিলেন না, তিনি গৃহিনী, সচিব,

শিষ্টা, সবী সমস্তই হিলেন, নতুবা স্বীয় শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মৃত্যুবাধিগ্রস্তা নাদিয়া স্বামীর দীর্ঘাগোর দিনে তাঁহার সহিত ভ্রাবহ মরণে বাজা করিয়া নির্ঝঞ্ঝব স্থানে পথশ্রান্তে নিভান্ত দীনজনের ভায় এই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেন না; দারার সমস্তই গিন্নাছিল, ধনজন, রাজ্যসিংহাসন, আশা ভরসা কিছুই তাঁহার ছিল না, কেবল তাঁহার কর্তৃত্ব এই নাদিয়া কোহিনুর মাজ ছিল, বাহার দিকে চাহিয়া দারা অলীম ক্লেশ সহাস্রবদনে সহ করতঃ বিমুখ ভাগ্যকে পুনরায় প্রসন্ন করিবার অস্ত্র অশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু অপ্রসন্ন অদৃষ্ট-দেবতার প্রসন্ন হওয়া হুঃখের কথা, দারার শিরে এই নির্দিষ্ট অশনি নিক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহার নির্মমতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

দারার আগমন সংবাদ পাইয়া মালিক জিউরান প্রত্যক্ষদর্শন করিয়া বহুদূর পর্যন্ত আসিল; কিন্তু কি জানি কেন বালক সিপার পিতাকে বারম্বার জিউরানের বাস ভবনে বাইতে নিষেধ করিলেন। বালকের হৃদিত্ত দেবতা তাবী অমঙ্গলের কি ছায়াপাত তাঁহার অন্তরে করিয়া ছিলেন, তাহা সেই দেবতাই জানিতেন; কিন্তু সিপার বুঝিয়াছিলেন যে, অতিথ্য গ্রহণের কল বিষময় হইবে। হইলও তাহাই। কিন্তু শোকে হুঃখে দারা তখন বাহজ্ঞান শূন্য, সত্য শব্দেহবাহী ভোলানাথের ভায় নাদিরার শব বহন করিয়া দারা চলিয়াছেন, কোথায়, কিজন্ত, সে জান তাঁহার নাই।

মুলমান ধর্ম-শাস্ত্রানুসারে চতুর্থাৎ মৃতের এক প্রকার ঔর্দ্ধৈবিক ক্রিয়া করিতে হয়, হয়ত দারার মনে সেই কথা উদয় হওয়ার মালিক জিউরানের গৃহে তিন দিবস অবস্থান করিয়া, চতুর্থীর প্রাক্ শেব করতঃ পুনরায় বাজা করিবেন ভাবিয়াছিলেন। মালিক জিউরান অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার কোন অনিষ্ট করিবে হয়ত একথাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; কলতঃ যে কারণেই হউক পুত্র সিপারের নিষেধ সবেও দারা নাদিরার শবদেহ লইয়া, জিউরানের গৃহেই প্রবেশ

করিলেন। শোকে, হুঃখে, বেদনার হতজ্ঞান, মৃতকর দারা, জিউরানের বাসভবনে কোন প্রকারে হই দিবস অতিবাহিত করিলেন। পুত্র অতিথির বখাসাধ্য-সংকার মালিক জিউরান করিতেছিল, কিন্তু অন্তর্গত বেদনার অতিভূত দারার সেদিকে মন দিবার মত অবস্থা তখন নহে। নিভান্ত প্রয়োজনীয় পান-ভোজনটুকু তিনি যৌন ভাবে নিষ্পন্ন করিয়া বাইতেছিলেন। চক্ষুর নিমেষপাত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দেখিয়া বুঝা বাইত যে, রাজকুমার দারা তখনও জীবিত; মাতৃহীন বালক পুত্র সিপারের মুখ চাহিয়াই হয়ত দারা আত্মহত্যা করেন নাই, নতুবা রাজ্যনাশ, সর্বাঙ্গাঙ্গ, পরাকর, পলায়ন, অনশন, চির-বসন প্রভৃতি রাজকুলজাত জনের হুঃসহ পুঞ্জীভূত হুঃখের উপরে চির-প্রয়ের চির-বিরহের বজ্র বেদনার আত্ম-হত্যার সম্ভাবনাই সমধিক ছিল।

নাদিরা মৃত্যুকালে শেষ সাধ প্রকাশ করিয়া গিন্না ছিলেন যে, তাঁহার শবদেহ যেন নদী নির্ঝরবহুল, চির-ভ্রামণ ভারতবর্ষেই সমাহিত করা হয়, ভারত সীমান্তের বহির্ভাগে, কান্দাহারের গিরি-সঙ্কটে বা মরু-প্রান্তরে তাঁহার শেষ শরনের ব্যবহা না হয়। দারা ভাবিয়া-ছিলেন তাঁহার তাত্‌কালিক হুঃখ চির-দিনের নহে, এমন দিন আসিবে যখন ভুবন বিস্তৃত মণিময় ময়ূর সিংহাসনে নাদিরার সহিত একজো উপবেশন করিয়া ভারতের রাজমণ্ড পরিচালন করিবেন এবং সে দিনে, বর্তমানের বত হুঃখ ক্লেশের অবসান হইবে; দারার অদৃষ্টে সে শুভদিন আসিল না, মৃত্যু আসিয়া নাদিরার হুঃখের অবসান করিল। এত হুঃখের মধ্যে বাহার জীব-লীলার শেষ হইয়াছে, সেই প্রাণ-প্রিয় দমিতার শেষ ইচ্ছা পরিপূরণ, দারা প্রাণপণ করিয়াও করিবেন, ইহা নিশ্চিত কথা।

নাদিরার শব দেহ, প্রসিদ্ধ সাধু পুরুষ কাকির মিক্রা মীরের সমাধির সন্নিকটে লাহোরে সমাহিত করিবার ইচ্ছা দারার মনে উদয় হইল। তখন দারার সহিত সপ্ততি সংখ্যক অসারোহী সৈন্ত ছিল; তাঁহার এবং পুত্র সিপারের শরীর রক্ষী স্বরূপ এই কয়টি মাজ সৈনিক

পুরুষই দারার শেষ সখল। যদি কোন আগর উপস্থিত হয় এই করজন পুরাতন প্রভুত্ব বীরপুরুষ তখন প্রাণ দিয়াও ঐক্য রক্ষার চেষ্টা করিবে, ইহা দারা জানিতেন। কিন্তু আনিরাও শোক-সন্তপ্ত দারা নিজের সহায়হীন নিঃসঙ্গ অবস্থার প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া, নাদিরার শব-দেহের প্রহরায় সেই সপ্ততি সংখ্যক অখারোহীকে লাহোরে পাঠাইলেন এবং খাজা মাকুল ও গুল মহাম্মদ নামক যে দুইজন সেনানায়ক তাঁহাকে তখনও পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই তাহাদিগকেও সেই অখারোহী দলের সহিত রাজ্যের সমাধির ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত লাহোরে বাইতে বলিলেন। নিরস্ত্র সৈনিক হইতে সিপার পর্যন্ত সকলেই এই ব্যবহার বাধা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিধোগ বেদনার উন্নত প্রায় দারা কাহারও কোন কথাই শুনিলেন না। পথে প্রাণাধিক প্রিয় দ্রুতির শব-দেহের কোনরূপ অবমাননা কেহ করে, সেই ভয়ে নিজের বিস্ময় বিপদের প্রতি দৃকপাত না করিয়া সন্দের সকলগুলি লোকের এই শবের সহিত পাঠাইয়া দিয়া বহুবিপদপূর্ণ বোলানের গিরিসঙ্কট পথে পুজসহ পারশ্রান্তিমুখে বাজা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নাদিরাবাহুর মৃত্যুর পূর্বসূর্য্য পর্যন্ত বারবার রণ-নির্জিত দারা পুনরপি সিংহাসন উদ্ধারকরে কি উপায় উদ্ভাবন করা বাইতে পারে সেই চিন্তাতেই নিবিষ্ট ছিলেন, বৎসরাধিককালের নিরস্ত্র পথশ্রম, অনশন, নিশা আগরণ, ধনক্ষয়, পরাজয় প্রভৃতি কোনরূপ ক্লেশেই দারার মাজোড়িত দৃঢ়-চিত্তকে সুস্থর্তের জন্তও দুর্বল করিতে পারে নাই; কিন্তু আজ এক আঘাতে বিপুলবল-সম্বিত সেই বীর জ্বর, ধূলিতলে অবলুপ্তি হইয়া পড়িয়াছে, সাম্রাজ্যের জন্ত সময়-সজ্জা দূরের কথা, একটি মাত্র সহচরও আজ সঙ্গে রাখিবার তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। ঔরঙ্গজীব প্রেরিত দল্লান্ধতাব সম্পন্ন সৈনিকদল আসিয়া আজ তাঁহাকে বন্দী বা বিনষ্ট করিতে উদ্ভত হইলেও বাধা দিবার মানসে দারা তাঁহার কনিষ্ঠাঙ্গুলী পর্যন্ত উত্তোলিত করিবেন কি না সন্দেহ। বহু হুঃ কষ্টেও তাঁহাকে অবনতি করিতে পারে নাই, নাদিরার মৃত্যু

তাঁহাকে মৃতকর করিয়া দিয়াছে—প্রিয়-বিচ্ছেদ-বেদনা, মাহুবকে এমনই করিয়া মারিয়া রাখিয়া যায়। বিরোগাতুর হতভাগ্য জনে অবশিষ্ট জীবনকাল কেমন করিয়া কাটার তাহা সেই জানে, সে কথা অপরকে বলিয়া বুঝাইবার নহে; দারা কি হুঃখে নিজের জীবন মরণের দিকে পর্যন্ত চক্ষু বের নাষ্টে, সকলগুলি অল্পচরকে বিদায় দিয়া আগদকে কি হুঃখে এমন করিয়া বেজার আহ্বান করিয়া আনিরাহিলেন সে কথা তিনি ভিন্ন আর কে বুঝিবে? জনহানে সীতার স্মৃতি চিত্তে আসিয়া শ্রীমান-চন্দ্রকে বারবার হতচেতন করিয়া ফেলিতেছিল, আবার ছায়া-সীতার মেহের অমৃতস্পর্শে সেই রানচন্দ্রের বিনষ্ট চেতনা ফিরিয়া আসিতেছিল,—প্রিয়জনের কর-স্পর্শের এমনই অপূর্ণ মহিমা। যে প্রাণ প্রিয়জনের স্পর্শ, নিপীড়িত হরিচন্দন-পল্লবরস বা বসন্ত চন্দ্রমার ক্ষরিত স্রুখা বিন্দুর ন্যায় দেহে অমৃত সিক্ত করে, দারা আজ সেই প্রিয়তমার একান্ত বিচ্ছেদের মর্শ্বস্তব্দ বেদনার অভিভূত, নিজের ইষ্টানিষ্ট, জীবন মরণের কথা চিন্তা করিয়া কার্য করিবার শক্তি তাঁহার নাই। যে কোন প্রকারে বিরহাতুর জীবনের অবশিষ্ট কালকে সংক্ষিপ্ত করিয়া, লোকান্তরে বাহিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। ঔরঙ্গজীবের অল্পচর কর্তৃক মৃত হইয়াই যদি বাধিত জীবনের শেষ হইয়া যায়, তাহাতেও দারা আজ ভীত নহেন। তাই তিনি আশ্রয়কার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই; একজন মাত্র অল্পচরও সঙ্গে রাখেন নাই। এই উদাসীন্য হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রিয়বিচ্ছেদ বেদনার দারার দেহ-মন অন্তর আজ কিরূপ ভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

অরসিংহ ঔরঙ্গজীবকে জানাইরাছিলেন যে, দারাকে হয় বন্দী বা হুঃ বিনষ্ট কিংবা ভারত সীমার বাহিরে বিভাঙিত না করিয়া তিনি দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিবেন না। দারাকে বন্দী বা বিনষ্ট করিতে অরসিংহ স্বত-কার্য হন নাই; কিন্তু যখন দেখিলেন সিদ্ধনদ পার হইয়া দারা কান্দাহারের পথে বাজা করিয়াছেন, তখন জর-

সিংহ ঔরঙ্গজীবের নিকট জানাইলেন যে, নিরত পথশ্রমে বহু বাদশাহী কোজ বিনষ্ট হইয়াছে, হতী অথ প্রভৃতি বহু সমরোপযোগী পশু ধ্বংস হইয়াছে, দারাত প্রাণতরে ভারতসীমান্ত পার হইয়া দেশান্তরে চলিয়া বাইতেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার আর পশ্চাৎদান করিবার প্রয়োজন নাই, আদেশ পাইলে তিনি রাজ-সমীপে উপস্থিত হইতে পারেন।

বাদশাহের আদেশের আশায় বখন তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নাদিরার সূত্মার পরে চতুর্থ দিনের ঔর্দ্ধনৈমিক ক্রিয়া কোন মতে সম্পন্ন করিয়া, পুত্র সিপার ও ছই কন্যাসহ সঙ্গী-হীন দারা মালিক জিউরানের নিকট বিদায় লইয়া বোলান গিরি-সঙ্কটের দিকে যাত্রা করিলেন।

একদিন দারার নিকট মালিক জিউরান প্রাণ তিকা পাইয়াছিল, কিন্তু আকগান জ্বরে ক্রতজ্ঞতা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না; দারাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গ-জীবের নিকট লইয়া গেলে, বাদশাহ তাহাকে বহুরূপে পরিত্রস্ত করিবেন সেই আশায়, দুর্য্যুত কৃত্রিম নরশিশাচ জিউরান, তাহার রাজ-অতিথি এবং তাঁহার অসহায় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যাগণকে অহুচরবর্গ দ্বারা চতুর্দিকে বেঁধেন করাইয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। বখন দারার নিকট সংগৃহীত সংখ্যকও অস্বারোহী সৈন্য ছিল, তখন এই নর-রাক্ষস দারার রাজ-অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু দারা এখন নিঃসঙ্গ একক, নাদিরার সূত্মার শোকে মৃতকর, স্তম্ভরাং পাবণ ছরাচার এখন নির্ভরে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে দ্বিধা করিল না। বাহার একদিন প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি সামান্য অর্থলোভে বা পদমর্যাদার আশায় এতদূর ক্রতজ্ঞতা করিতে পারে এ কথা দারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই; অন্যে বাহাই করুক, জিউরান তাঁহাকে সূত্মাসুখে সমর্পণ করিবার জন্য বন্দী করিবে না ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের মূলে জিউরান নির্ধন কুঠায়াবান্ড করিল। খোজা, অহুচর, সঙ্গী, সৈন্য, রক্ষী, ভৃত্য কেহই নাই—একজন মাত্র লোকও নাই

যে এই ছরাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সামান্য চেষ্টাও করিতে পারে। চতুর্দশবর্ষীয় বালক সিপার পিতার এই ছরবন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া, দুর্য্যুতগণের করজলকে আঘাত করিয়া পিতাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বালক একাকী বহু লোকের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিবে? তাহাও সকলে মিলিয়া বালকের হাত বাধিয়া ফেলিল, দারাত নিষ্ফল চেষ্টা হইতে সিপারকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন।

সামুগ্ধের সময় পরাজিত হইবার পর হইতে যে বন্ধনতরে দারা পথ বিপথ জ্ঞান না করিয়া মরু, পর্বত, সরিৎ সাগর, উন্নত্বন করতঃ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নিরত পরিশ্রমণ করিয়াছেন, ভারত সীমার প্রান্তে আসিয়া সেই বন্ধনই তাঁহার অমুণ্ডে ঝটিল। আর অতি অল্প পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই বোলান গিরি-সঙ্কটে পৌঁছিতে পারিতেন। খোজা বসন্ত তখনও তাঁহার আশায় কান্দাহার দূর্গে প্রাণপণে রক্ষা করিতেছে। গিরিপথ উত্তীর্ণ হইয়া কান্দাহারে পৌঁছিলে নিরাপদ হইবার সম্ভাবনাই সমধিক ছিল, কিন্তু কৃত্রিম আকগানের পাণচরণে তাহা ঝটিল না—“ব্যক্তিত্বতঃ তদ্বিহ দুঃস্তরং প্রারতি” ইহাই বুঝি বিধাতার নিয়ম। নতুবা প্রকৃতবে যে রাম-চন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবে, সেই রাম সেই প্রকৃতবে জটিল তপস্বী বেশে বনযাত্রা করিবেন কেন? পাবণ নরাধমের গৃহে অতিথ্য গ্রহণের পূর্বে, নরশিশাচের কলুণিত করে অঙ্গস্পর্শের পূর্বে, রাজ রাজেশ্বরী নাদিরাবাহুর যে সূত্মা হইয়াছিল ইহা দারা এবং নাদিরার প্রতি বিধাতার অসীম কৃপা। নতুবা কৃত্রিম পশুকৃত নারীর অবমাননা কতদূরে গিয়া পৌঁছিত কে বলিতে পারে; এবং তাহার প্রতীকার করে উপায় বিগীন দারা ও সিপার কি করিতে পারিতেন? শাহজাহান বাদশাহের কারাগারে জিউরানের ভার কত শত সহস্র বন্দী পৃথল্যাবদ্ধ অবস্থার সমস্ত জীবন বাপন করিয়াছে, কতশত জিউরানের জীবিতাবস্থার দেহ হইতে চর্ম উৎপাটিত করিয়া তাহাদের মাংস শীকারী ভেন

পক্ষী এবং কুকুরের খাটরূপে ব্যংহত হইরাছে, আন সেই শালাহানের মরন ভায়া, বন্ধের মণিক, আনন্স ফাল জোঠ পুত্র, জিউরান কর্তৃক শৃঙ্খলিত হইয়া তাহার গৃহে নীত হইতেছে। প্রতীকারের কোন উপায় করিবার কেহই নাই, নিকরূপ বিধাতার এক নিশ্চয় অভিলাষ।

মালিক জিউরান দারা ও সিগারকে বন্দী করিয়া তাহার গৃহ আনিয়া। অবশিষ্ট বৎসানাত্ত ধনরত্ন বাহা কিছু ছিল তাহা বল পূর্বক অপহরণ করিল, অসাবরণ কাড়িয়া লইল, এবং ক্রতগামী দূতবারা জরসিংহ এবং বাহাছর খাঁকে সংবাদ দিল এবং বলিল যে তাহার যেন শীঘ্র আসিয়া বহু আশ্রাসে ধৃত, এই মহামূল্য বন্দীগণের যথোচিত ব্যবস্থা করে। জরসিংহ এবং বাহাছর খাঁকে সংবাদ দিয়াই নিরন্তর হয় নাই, জিউরান বাদশাহ ঔরঙ্গজেবকে স্বয়ং দূতবারা সংবাদ দিরাছে যে, যে কার্য তাহার বিচক্ষণ সেনানায়কগণ কর্তৃক সাধিত হইতে পারে নাই, সে উহা সম্পন্ন করিরাছে এবং বন্দীগণ সহ রাজ-প্রসাদ লাভার্থ বাদশাহের চরণ চুম্বনের জন্য শীঘ্রই দিলী রাজধানীতে পহুঁছিতেছে।

জিউরানের প্রেরিত চরদুখে দারার বন্দী হইবার সংবাদ পাওয়া মাত্র, বাহাছর ও জরসিংহ সটপ্পে ক্রতবেগে জিউরানের গৃহাভিমুখে কুচ করিয়া চলিল। হরন্ত্র স্রোতের আতপঠাণ, বজ্রবাত, উত্তপ্ত দহু বালুকা, কিছুই তাহার প্রাণ করিল না। দিবা রাজি সমভাবে পথ চলিয়া তাহার বখাসম্ভব সম্মততার সহিত মালেকের গৃহে পহুঁছিল এবং বাহাছর খাঁ স্বয়ং বন্দীগণের তত্ত্বাবধানের এবং নিরাপদে দিলী পহুঁছিবার ভার গ্রহণ করিল। দিলী রাজধানীতে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের সম্মুখে সমানীত হইবার পূর্বেই দারা ও তাহার পুত্র কত্যাগণের কারাবাস আরম্ভ হইল। এই মহার্ঘ বন্দীগণ পাছে পলায়ন করে সেইজন্য বাহাছর, বাদশাহী কোষের প্রাচীর একত করিয়া ফেঁই চলিছু প্রাকারের মধ্যস্থলে বন্দীগণের শিবিকা প্রকৃতি স্থাপিত

করতঃ ক্রতবেগে দিলীর অভিমুখে বাজা করিল। উল্লুত তরবারি এবং অগ্নেরাজ হন্তে সশস্ত্র প্রহরীগণ শিবিকা বেটন করতঃ সাবধানে চলিতে লাগিল; পলায়নের সামান্য চেষ্টা মাত্র বন্দীদিগকে বধ করিবে ইহাই বোধ করি উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু দারা, পলায়নের উদ্ভব করিবে কে? নাদিরার মৃত্যুর পরে দারার ভাণ্ড কোন ইচ্ছা থাকিলে তাহার সমভিব্যাহারী স্বয়ং সংখ্যক অশ্বারোহী দল ও তাহাদের নায়ক ওলু মহামন্ত্রকে তিনি বিদ্যায় দিয়া একান্ত নিঃসঙ্গ হইবেন কেন? সিগারের সনির্ভর অগ্নিরোধ শুনিয়া তাহার সেই সপ্ততি সংখ্যক অশ্বারোহী সঙ্গে রাখিলে মালিক জিউরানের সাধ্য ছিল না যে দারাকে বন্দী করে, তিনি হরত নিরাপদে বোণানের গিরিপথ পার হইয়া কান্দাহারে পহুঁছিতে পারিতেন এবং তথায় পহুঁছিয়া পারস্তের শাহের সহায়তার, পুনরায় হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করতঃ ঔরঙ্গজেবের সম্মুখীন হইলে, সেই বল পরীক্ষার কলে ভারতের মোগল ইতিহাস পরিবর্তিত ভাবে লিখিত হইত কিনা কে বলিবে? সহোদর মুরাদকে হত্যা করা এবং পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার জন্য পারস্তের শাহ ঔরঙ্গজেবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন স্ত্রতয়াঃ দারার পক্ষে পারস্তাধিপতির সাহায্য লাভও কঠিন হইত বলিয়া মনে হয় না। শেষের কবল হইতে জমায়েন দিলী-সিংহাসন উদ্ধার করিয়াছিলেন পারস্তের সহায়তার, স্ত্রতয়াঃ ইতিহাসচক্রের সেইভাবে পুনরাবর্তন একেবারেই অসম্ভব ছিল না। পারস্তের তরে ঔরঙ্গজেব বহুদিন পর্যন্ত কল্যাণিত কলেবর ছিলেন; বখন তাহারই দৃষ্টান্তে ওদীর পুত্র আকবর বিজোহ করিয়া অবশেষে পারস্তের পথে বাজা করিয়াছিল, তখনও ঔরঙ্গজেব তীত জন্ত কল্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জিউরান প্রেরিত দূত বখন দারার বন্দী হইবার সংবাদ বচন করিয়া দিলীতে উপস্থিত হইল, বাদশাহ আন দরবারে সে সংবাদ প্রবণ করিলেন, কিন্তু কলটির শিরোমণি ঔরঙ্গজেবের মুখ দেখিয়া হর্ষ বিবদ

কোনরূপ ভাবের ইঙ্গিতই কেহ পাইল না, আনন্দোৎসবের কোনরূপ আয়োজনের আদেশই তিনি দিলেন না, এমন কি বাহাদুরী নহবতে বিজয়-সঙ্গীতও শ্রবিত হইয়া উঠিল না। অনেকে ভয়ত মনে করিয়াছিল, অগ্রজের পরামর্শ, অগমান, বন্ধন ও ভূতির দুর্গতিতে কনিষ্ঠের দ্বারা ব্যথা বাজিয়াছে, স্বার্থের জন্য বাহা করিতে হয় তাহাই করিয়াছেন, তাঁহার বন্ধন সংবাদে উন্নতি হইয়া, উৎসবের আয়োজন নিতান্তই দুর্য্যবসায়ের পরিচায়ক, সেইজন্য ঔরঙ্গজীব সে সকল ব্যবস্থা করেন নাই। পিতৃমোহী প্রাতঃহস্ত পাবণের মনে দয়া, মেহ, প্রেম কোন দিনই স্থান পায় নাই। দারার খুত হইবার সংবাদে তিনি প্রথমে যে উৎসব-আয়োজন করেন নাই তাহার কারণ, জিতুরানের সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বখন বাহাদুর খাঁর নিকট হইতে দূত আসিয়া জানাইল যে সত্যই দারা খুত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দিল্লীতে আনা হইতেছে, তখন পুনরায় আম দরবার করিয়া সে সংবাদ ঘোষিত করা হইল এবং দিল্লী নগরীতে ও সাম্রাজ্যের সর্বত্র উৎসবের বিপুল আয়োজন করিবার আদেশ প্রচারিত হইল। বাহাদুরী নহবত ও রশন চৌকীতে বিজয়ের আনন্দ সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল, নিশীথে দিল্লী নগরী দীপমালায় সজ্জিত হইল। আতশ বাজির দীপ্ত আলোকে নৈশ আকাশের অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গেল; দরবারের আমীর ওমরাহ স্ত্রী সেনাপতি সকলেই এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তির আনন্দ উপভোগের জন্য অবাধ ও পর্বাপ্ত পান ভোজন নৃত্য গীতে মনোনিবেশ করিলেন। খাতোয়ার যুদ্ধে স্ত্রী পরাভূত হইবার পরে, মীরজুমলা কর্তৃক পশ্চাৎসংঘটিত হইয়া, আরাকানের দিকে চলিয়া গিয়াছে; সুবাদ ফর্ত্তে গোরাণির ফর্ত্তের অন্ধকারাগারে আবদ্ধ—কেবল দারাই ছিল ঔরঙ্গজীবের হস্তিয়ার হেতু। সেই দারা খুত হইয়া দিল্লীতে বন্দীরূপে আনীত হইতেছে, —এ হেন শুভ সংবাদ পাইয়া ঔরঙ্গজীব উৎসবের আয়োজন করিবেন না ইহা নিতান্ত উগ্রাদ সঙ্গনারও

অভীত; কেবল মাত্র সত্য সংবাদ পাইবার অপেক্ষার বাহাদুর প্রথমে হর্ষের লক্ষণ কিছু দেখান নাই। বিশ্বাসী সেনাপতি বাহাদুর ও জয়সিংহের নিকট হইতে নিশ্চিত সংবাদ পাইয়া, নিশ্চিন্তমনে আনন্দোৎসবে যত হইয়া উঠিলেন। প্রজাপুঞ্জ চক্ষে দারাকে নিতান্ত হের করিবার নিমিত্ত, কি ভাবে তাঁহাকে দিল্লী রাজধানীতে আনা হইবে তাহার বিদ্যুত উপদেশ সহ, নজরবেগ নামক সর্বাধিপ পাগে কুর্ভা-হীন, জন্মদের চিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে বাহাদুর খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং রাজ্যদিন পথ চলিয়া বত শীত সম্ভব পহাঁছিবার জন্য তাহাকে আবেশ করিয়া পাঠাইলেন। ঔরঙ্গজীবের ভয় ছিল, কি জানি যদি পরিবর্তন হইতে বন্দী পলায়ন করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে তিনি বর্তমানে নিরুদ্ভিগ হইতে পারিবেন না, এবং ভবিষ্যতে কোনদিন দারা যদি সমর সজ্জা করিয়া সিংহাসনের দিকে হস্ত প্রসারণ করে, তাহা হইলে সে সময়ের কলও অনিশ্চিত। দারা শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সিংহাসনের বখাৰ্ঘ অধিকারী, তাঁহার দেহ এবং মনের সৌন্দর্য্যে প্রজাপুঞ্জ তাঁহার বিশেষ অমুগ্ধ ছিল, তিনি ধর্ম নিরীক্শেবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হিতাহিতানে ব্যাপৃত থাকিতেন, বিজ্ঞান প্রতি তাঁহার বিশেষ অমুগ্ধ ছিল, বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহার নিকট আদর লাভ করিত, মুসলমান সাহিত্যকে সংগৃহীত করিবার জন্য তিনি উপনিষদের অমুগ্ধ এই রচনা করিয়াছিলেন, কলতঃ রাজোচিত বহুগুণে গুণবান দারা সেকো জনসাধারণের শ্রিয় রাজকুমার ছিলেন, এবং প্রজাপুঞ্জ বখাকালে এই দারাকে সিংহাসনে সমারূঢ় দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সিংহাসনের এ হেন প্রতিশ্রুতি, কবলগত হইয়াও যদি পলায়ন করে সেই তরে বাহাদুরকে শীঘ্র দিল্লী পহাঁছিবার আদেশ দেওয়া হইল।

সামুগ্ধের যুদ্ধের পূর্বে বখন “বেওয়ারে আমের” প্রাপ্ত প্রাপ্তে সম্রাট শাহজাহানের আজ্ঞাসারে দারা বখায়োগে রণবাজা করেন, তখন তিনি স্বপ্নেও

তাহেন নাই যে রণনির্জিত ও শৃঙ্গাব্যবহর-চরণ হইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে ফিরিয়া আনিতে হইবে। তিনি মনে করিয়াছিলেন, বাদশাহী-বিপুল বাহিনী এবং সেই বাহিনীর অধিনায়ক রূপদক্ষ বহু সেনাপতি-সহায় করিয়া তিনি যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন, ঔরঙ্গজীবের সূত্রেই সেনা কটিকাঞ্চে তুপের ভায় কোথায় উড়িয়া বাইবে, তিনি বিজোহী জাতাকে বন্দী করিয়া আনিয়া পিতৃপথে সমর্পণ করিবেন; সত্রাট বিজোহী পুত্রকে বধোচিত ভিরসার করতঃ তবিস্তেজের জন্ত সর্বাধান করিয়া দিয়া দাক্ষিণাত্যের জ্বার বা অস্ত্র কোল স্থানে পাঠাইয়া দিবেন, উত্তর কালে একরূপ ঘটনা আর কটিতে পারিবে না, ময়ূর সিংহাসনে জ্যোতের আসন অটুট রহিয়া থাকিবে। কিন্তু কি ক্রমণে জাহাঙ্গীর শাহ পিতা আকবরের জীবমানে বিজোহীর ধন্য ভুলিয়াছিলেন, সেই হইতে মোগল-বংশের রাজ-কুমারগণ সকলেই প্রায় সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের বিজোহী নিশ্চল হইয়াছিল সত্য; কিন্তু তাঁহাদের রোপিত সেই বিবস্ত্র, কল প্রসব করিল শাহজাহানেরই শেব জীবনে। আবার বিজোহী সকলকাম ঔরঙ্গজীবের অপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহার পুত্র আকবরও পিতার পন্থার চলিয়াছিলেন; পিতার সৌভাগ্য যে পুত্র সকল মনোরথ হইতে পারেন নাই, হইলে বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানের প্রেতাত্মা-লোকান্তরে বসিয়া ঔরঙ্গজীবের অবস্থান্তর দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিত।

সামুগ্ধ কেন্দ্রের পরাময়ের সবেই দারার আশাশুভা উজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তথাপি “বাবৎ খাস তাবৎ আশ” এই প্রসিদ্ধ বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি আশাও ত্যাগ করেন নাই এবং চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই। দৈব তাঁহার প্রতিকূল, পুরুষকারকে আশ্রয় করিয়া তিনি প্রাণপণে কর্ণের অর্জুনি করিতেছিলেন, এমন সময়ে নাদিরের সূফা দারার নরনে অশ্রয় বজা বহাইয়া দিল, আর সেই অশ্রু সাগরের উত্তাল তরলাভিঘাতে কর্ণচেষ্টা কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল, অসিযুষ্টি হতশক্তি হইয়া পড়িল, প্রকোষ্ঠ বেঠেন করিল অকৃতজ্ঞ জিউরানের লৌহ শৃঙ্খল।

বাহাজুরের বন্দী হইয়া নিগড়বদ্ধপদে আজ তিনি দিল্লী চলিয়াছেন। ঔরঙ্গজীব বিচোর করিয়া তাঁহার বিরূপ দণ্ডের বিধান করিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই সত্য, কিন্তু বোধ করি শান্তকের ঋণস্রাবাতে বধের ব্যবস্থা হইবে এ কথা মুহূর্তের ভ্রমও দ্বারা মনে করিতে পারেন নাই। আশ্রয় অনেক সময়ে নিজের মন দিয়া অপরের মন বুঝিবার চেষ্টা করি; দারা লোহণের সূক্ষ্মদণ্ডের বিধান কোন অবস্থাতেই করিতে পারিতেন না, সেইজন্য ঔরঙ্গজীব যে ওরূপ কার্য করিবে এ কথা দারার মনে একবারও বোধ করি উদ্ভিত হয় নাই। তিনি হয়ত মনে করিতেছিলেন, প্রিয়বিচ্ছেদ-বেদনা ভোগ করিতে করিতে যে করটা দিন কাটাইতে হইবে, তাহা অপূর্ণ কাক্সনম্বিত বেগরানে খাসের সত্যকৃষ্টিময় ময়ূর সিংহাসনে বসিয়াই কাটুক, বা কারা প্রাচীরের অভ্যন্তরে কদম্ব কূটায়ের কাটিয়া কাটুক, তাঁহার পক্ষে উত্তরই তুল্য। নৈরাশ্রপীড়িত হইয়া, সর্ক চেষ্টার বিরত হইবার বয়স কিশোর সিপারের নহে, সেইজন্য পিতা বধন সকলগুলি অবাচোহী সেনাকে বিদায় দিয়া নিঃসঙ্গ অবস্থার আক্শান গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতেছিলেন তখন সিপার বারবার নিবেদন করিয়াছিল; আবার বধন দারার অলম্পর্শ করিতে জিউরানের অমুচরণ উত্তত হইয়াছে, তখন পিতাকে রক্ষা করিবার জন্ত বাণুকের অসি পলকে কোবদ্রুত হইয়াছিল। তাই মনে হয়, বাহাজুরের বন্দীরূপে একান্তই বধন দিল্লীর পথে বাইতে হইয়াছে, তখন দারার ভায় হৃৎ হৃৎ সমান উদগীর্ন ভাবে, সিপার-ঈশ্বরেজাকে মাঞ্চা ফুলিয়া গাইতে পারেন নাই, সূক্তির উপায় কিছু করিবার সুযোগ থাকিলে: সমালম-বোধের সিপার নেকো সে উপায় করিতেন, বেজার খুজতাতের কলগত হইতেন না।

ময়ূর বেগের নিকট প্রাপ্ত, ঔরঙ্গজীবের উপদেশ: মত, বাহাজুর দারাকে যে ভাবে মগ্ন প্রবেশ করাইয়াছিল তাহা মোগল রাজবংশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। হস্তি-পুষ্ঠে দারাকে নগ্ন প্রবেশ করাইতে হইবে, বাহাজুরে নগরের আবাণ বৃদ্ধ বনিতা দেখিতে পার যে সত্য সত্যই

দারার হৃত হইয়াছে, তাহা হইলে তবিন্দে অপর কেহ দারার নামে নিজেই অভিহিত করিয়া সিংহাসনের দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে পারিতেন না। সন্ধ্যাট বা সন্ধ্যাটের পূজাপন কেই হস্তিনীর পূর্বে আরোহণ করিতেন না, উহা নিত্যই অপমান হইত বলিয়া দুগলমান সমাজে পরিপণিত হইত। দারার একটা সূত্রাকার, চক্ৰবর্তী, গুলি-বলিনা হস্তিনীর পূর্বে অতি কর্ণা বলিন বসন পরিয়া বসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—তাহার চরণের নিগড়বৎ, শিরোপরি কুকর্ণের জীর্ণ উকীল, পশ্চাতে উন্নত তরবারি হস্তে ভীষণবর্ন-জন্ম নকর বেগ উপবিষ্ট, হস্তিনীর উত্তরপার্শ্বে, পুরোতাপে ও পশ্চাতে উন্নতবর্নের অসংখ্য অধারোহী সেনা, তাহাদের কঙ্কত স্তম্ভ বর্ণাকালক নিদ্রা মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যকিরণে কলসিরা উঠিতেছে। দিল্লীর সন্ধ্যাট বা রাজকুমারগণের সৈন্তে দুর্গম এবং শোভা বাজা করিয়া নগর পরিভ্রমণের যে বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাহা বিশ্বের দিমর উৎপাদন করে। সর্বাঙ্গে উদ্ভোপরি ডঙ্কানি, তৎপর হস্তিপূর্বে রণবাহু; পশ্চাতে বাদশাহী নববত; হস্তাধঃপদাতি সংগঠিত চক্ৰবর্তী বাহিনীর পদাঘাতোদ্ভিত গুলি পটলে গগন লম্বাঙ্গ, কিন্তু সেই গুলি নিবারণ জন্ত গজবারি সেচনে পথ কর্ণাঙ্ক, বাজা পথে সর্কগ্রকার হর্ষক নিবারণকল্পে দৃষ্ট সর্করস-ধুম, উটকঃপ্রবার গর্ক কর্ণাকারী ইরাণ তুরাণ আরবের নর্তনশীল স্তম্ভন অধের সারি—সারি—সারি; তাহাদের পক্ষে অর্ণ-নুপূর; কণ্ঠে স্তম্ভবর্ণটিকা; মধ্যস্থলে ঐরাবত-নিন্দী বিশালকার গজরাজ-পূর্বে সন্ধ্যাট সমাধীন, অর্ণ-হস্তের অর্পূর্ণ কারুখচিত বিস্তৃত আভরণে গজপূর্বে সমাঙ্গর, কর্ণাকারে চাক্ৰজি, শিরোপরি অর্ণবিশাল মুকুট, কর্ণ-বিলম্বী স্থল-সূত্রাদান। সন্ধ্যাটের মণ্ডকোপরি স্তম্ভ চক্ৰাঙ্গণ, দেব শিখর তার প্রিয়বন্দী অজলকারী বলভূতা চামর হস্তে পশ্চাতে দণ্ডারমান, বাদশাহের বৃহৎ বারপকে বেঠন করিয়া শরীর বন্ধী অধারোহী অধরী সেনা। দিল্লীর শোভাবাজার সমারোহের বধাধ বর্ণন করিবার সাধ্য কাহারই

নাই, বাহার সে দিনে সে সমারোহ চক্রে দেখিয়াছে তাহাদের চক্ৰ সার্থক। রাজকুমার দারার ঐরাপ অভিযনের সঁহিতই সর্করা নগরপথে ভ্রমণার্থ বাহির হইতেন। আজ তাহাকে উন্নতবর্ন যে ভাবে নগরের মধ্য দিয়া লইয়া চলিয়াছে তাহা অপেক্ষা সুকৃষ্টি দারার পক্ষে শতগুণে প্রাধান্য ছিল এবং তিনি সে মুহূর্ত্তে বোধ করি কায়মনে ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনাই করিতেছিলেন; সম্ভাবিতের অপমান মরণের অধিক, ইহা শাস্ত্রের বাণী।

দারার হৃত হইবার সংবাদ উন্নতবর্ন আম দরবারে বসিয়া পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন, স্তম্ভাঙ্গ সাম্রাজ্যের কাহারই সে সংবাদ জানিতে বাকি ছিল না। দারার মগরে পহুঁছবার দিন বধন নিকটবর্তী হইতেছিল, দিল্লীর চক্ৰবর্তী বহু দুর্গম হইতে অসংখ্য নরনারী তখন-রাজধানীতে সমাগত হইতে লাগিল। উন্নতবর্ন জানিতেন, দারার জনপ্রিয় রাজকুমার, এই বিশাল জনসম্মুখ বহু পথিমধ্যে হইতে দারাকে মুক্ত করিয়া তাহার সাহায্যার্থ বহুপত্রিকর হয়, তাহা হইলে বিপদ ওকতর হইবে। একটি সুচ্যমান বাহিনীকে সংগ্রামে পরাস্ত করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার না হইতে পারে, কিন্তু একটি সমগ্র জনপদের আবালবৃদ্ধবনিতার একান্ত জেপিত বাহা, তাহার প্রতিরোধ করা অতি বড় ক্রমতাপালী সন্ধ্যাটের পক্ষেও সহজসাধ্য নহে। গোপনে রাজনীর আঁকুকারে দারাকে রাজধানীতে আনিতে প্রচেষ্টা তাহাকে দেখিতে পাইবেন না, সত্য সত্যই যে দারার হৃত হইয়াছেন, একথা বহুলোকে হস্ত বিশ্বাসই করিবে না, সেইজন্য দিবালোকে দারার মগর প্রবেশ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহার বিপদও কম নহে। সেই বিপদ না বটিতে পারে, দিল্লীর অধিবাসিবৃন্দ তাহাদের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দারাকে পথিমধ্যে বল পূর্বক মুক্ত করিতে না পারে, সেই হেতু অসংখ্য অধারোহী সৈন্ত অল্প হস্তিনীর পূর্বে দারাকে বেঠন করিয়া চলিয়াছে। ইহাও উন্নতবর্ন নিশ্চিত হইতে পারেন নাই, মুক্ত-উন্নতবর্ন হস্তে জন্মের প্রকৃতি

বিশিষ্ট পিণ্ডোক্ত্য নজরবেগ দ্বারার পশ্চাতে বলিয়া আছে, যদি দিল্লীবাসী বল প্রয়োগ করিতে উদ্ভত হয় তাহা হইলে পাক্ত জমাদ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক দেহ-বিছাড করিয়া কেচিবে, ইহাই ঔরঙ্গজীবের আজ্ঞা। বিধাতার বিধানে বাহারা জগৎরূপে এক মাতৃগর্ভে স্থান পাইয়াছিল, তুমিষ্ট হইবার পরে বাহারা একই জননীর বক্ষ-নিঃস্থত গীবু দ্বারার পুটে হইয়াছে, পৈশবাবধি বাহারা একই গৃহে জুখ ছঃখ, আনন্দ নিঃশব্দে মধ্য একইভাবে পালিত হইয়াছে, সেই সহোদর সহোদরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বধন শাপিত তরবারি উত্তোলন করে, তখন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না যে, এই বিশ্বরচনার অন্তরালে এক দরবার পরম পুরুষের মনোচ্ছিন্ন নিরত কার্য্য করিতেছে। স্বার্থের অস্ত সংসারে নিঃস্বয় নৃশংস ব্যাপার অনেক ঘটিয়াছে, কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালে দিল্লীর রাজতত্ত্ব লইয়া যে সকল পৈশাটিক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা পৃথিবী অন্বেষণ করিলেও পাওয়া বাইবে কিনা সন্দেহ। আবার ধর্ম্মধ্বজী ঔরঙ্গজীব বাহা করিয়াছেন সেরূপ কুক্রিয়া অগৎ সংসারে আর কেহ করিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই; সিংহাসনের পাদপীঠ তলে সকল গুলি জ্বালা এবং জ্বালুপুত্রকে বলি দিয়া তাহাদের রুধির-রঞ্জিত হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন ঔরঙ্গজীব, পিতাকে কারাকন্ড করিয়া তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের রুগ্ন দিন গুলিকে সংক্ষিপ্ততর করিয়াছিলেন ঔরঙ্গজীব, পুত্রকে কারাকন্ড করিয়া তাহার জীবনান্ত করিয়াছেন ঔরঙ্গজীব, অপর পুত্রকে ভারত বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন উৎসর্গ পুত্র করিয়াছেন ঔরঙ্গজীব, নিজ চুহিতাকে চিরজীবনের অস্ত বশিনী করিয়াছিলেন ঔরঙ্গজীব,। কলতঃ পিতা পুত্র কন্যা জাভা জ্বালুপুত্র আত্মীয় স্বজন বন্ধ বান্ধব বাহাকেই তিনি তাঁহার স্বার্থের অন্তরায় বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহারই বধ, বন্ধন, নির্দাসন কিছুতেই তিনি বিধা বোধ করেন নাই। সাম্রাজ্যের বাস্তবিক প্রজাপুত্রকে প্রতারিত করিবার

অস্ত পশ্চিমাত্ত হইয়া দ্বিষ্টকের অপমানা হস্তে, পরিজ্ঞানার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সর্ববিধ পাপাচরণের পন্থা উদ্ভাবনের চিন্তা করাই ছিল হুজুরা ঔরঙ্গজীবের বিশেষত্ব। পাপিষ্ঠ যে বহুর্ভে নতকার হইয়া নমাজে প্রবৃত্ত হইত, সেই পবিত্র বহুর্ভে কেমন করিয়া পিতার বন্ধন, জাতায় বধ, তির ধর্ম্মাবলম্বীর দেবমন্দির চূর্ণের উৎকট পাপ চিন্তা অন্তরে স্থান পাইত ইহাই পরম বিশ্বয়ের বিষয়।

দিল্লীর অগবিস্থাত চাঁদনি চকের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া, প্রহরী বেষ্টিত শৃংখলাবদ্ধ দ্বারা চলিয়াছেন। দিল্লীবাসী অসংখ্য নরনারী পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি দণ্ডায়মান হইয়াছে; অতঃপুর্বাচারিণী মুসলমান রমণীগণ বাতায়নে, গবাক্কে, সৌধশিখরে দাঁড়াইয়া সর্বজন-প্রিয় রাজকুমার দারা ও তাঁহার কিশোর-বরষ কনিষ্ঠ পুত্র সিপারের পরম চুর্গতি ও চরম অপমানের কল্পন দৃষ্ট দেখিয়া উঠেঃখরে রোদন করিতেছে। কিন্তু এই রাজপথই বিশাল জনসত্ত্ব, কাষ্ঠ পুত্তলিকার দ্বার নিশ্চল, একটি মহুঘোর একখানি হস্তও দারাকে যুক্ত করিবার নিমিত্ত উত্তোলিত হইল না; একটি কণ্ঠও প্রতিবাদের বাণী উচ্চারণ করিল না। ভারতবাসী জনের হৃদয় মন স্বেপ্রবণ, উৎসীড়িতের ছঃখ সহজেই অব্যবৃত্ত হইয়া যায়, কাতর প্রাণে নীরবে অজ্ঞ বিশর্জন করে, কিন্তু ভারের জন্য প্রসীড়িতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, অত্যাচারীর দমন করে কর্ম্মের উত্তম তাহাদের প্রকৃতিতে নাই। আমরা বিধাতার উপরে সকল দারিদ্র্য নিক্ষেপ করিয়া হা হতোম্বি করিতেই শিখিয়াছি—“বঙ্গী আগর বাসরে” নিখিত লগাট লিপির স্বক্কে সকল দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই, সে লিপির ৭৩মার্ধ পুরুষকারের সহায়তা গ্রহণে আমরা নিতান্তই অবিজ্ঞ। লক্ষ লক্ষ লাপ্তিকের চক্ষুর উপরে প্রকারজ্ঞক সম্রাট শালাহানকে কারাকন্ড করিয়া, দারা, জুলা, সুবাদের বধ সাধন করিয়া, ভারতবর্ষ বলিয়াই ঔরঙ্গজীব নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারিয়াছিল। অস্ত কোন দেশ হইলে এসকল

অমায়িক অত্যাচার করিয়া পায় পাইয়া বার, এমন
কমতালানী সন্ন্যাসীর জন্ম আগত কোথাও হয় নাই।
যে মুহূর্তে হুগত দায়ার হুগ দেখিয়া দিলীবাসী দর-
বিগলিত ধরে অশ্রু বিসর্জন করিতেছিল, হরত তখন
হবিত অন্তরে, নিরুদ্ভিগ চিত্তে ঔরঙ্গজীব কণ্ট নমাজে
নিবিষ্ট হইয়া, কত নীত্র দায়ার হত্যাকাণ্ড শেষ করিতে
পারিবেন সেই চিন্তা করিতেছিলেন। রাবানেশ পূর্বেই

প্রচারিত হইয়াছিল, তদন্তসারে দায়াকে সমগ্র নগরী
পরিভ্রমণ করাইয়া বাহাদুর খাঁ “খাওয়ার পুরা” প্রাসাদে
উঁহাকে অবরুদ্ধ করতঃ বাসশাহের নিকট সে সংবাদ
জ্ঞাপন করিল। বৎসরাধিক কালের নিদারুণ হুস্তিতা
দূর হওয়ার ঔরঙ্গজীব স্বস্তির নিবাস ত্যাগ করিলেন।

ক্রমণঃ

ঐজগদিশ্রনাথ রায়।

মানসী

ভূমি,

পুষ্প হয়ে লুকিয়ে ছিলে আমার বনের মাঝখানে,
মানস বনের মানসী গো, আনলে প্রাণের আঁজ প্রাণে।
নীহার কণা—হীয়ার দানা—মালা, স্তম্ভায় ঐ গলে,
অলকপুরীর পুলকস্তরা নলিন নরন মন ছলে।
অন্তরীক্ষে তোমার দেখে দেব-বালারা লাজ মালে,
বেরিরে এলে, লুকিয়ে ছিলে আমার বনের মাঝখানে।

অলকগুলি নৃত্য-চপল কোমল কপোল তুলতুলে,
নখর ছুটি অধর মাঝে বাঁধল কুণার বুলবুলে।
শীতল বায়ু শিথিল খেলার দোলার তোমার অকলে,

রক্ত রাঙা ললাট ঘেরি হৈম মুকুট জলজলে।

চতুর মিঠু চপল কালো চকু ছুটি চুলবুলে।
নইলে সারা অলখানি টুকটুকে লাল তুলতুলে।

আঙুল হেলাও বেদিক পানে সেখান সবুজ রঙ ধরে।
নিখাসে ঐ কুহন কোটে, স্পর্শে সুধার ধার করে।
হাওয়ার পরে পড়ছে চরণ, ছোঁরনা যেন স্তম্ভিকা—
মানস বনের গোপন জনের প্রকাশ ভূমি রূপশিখা।
শুক ধরা সরল হল তোমার হরষ মন্তরে,
জয়ার বুকে ঘোবনেরি নোহন সবুজ রঙ ধরে॥

ঐরামেন্দু দত্ত।

নগবালা

(উল্লেখ্য)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রামপ্রাণ বাবুর হুর্ভাবনা।

সেই দিন রামপ্রাণবাবু সন্ধ্যার প্রাকালে বাটা ফিরিয়া
উঁহার বন্ধের মণি, বন্ধের ধন, আশার প্রদীপ পুত্রকে,
কিছু বিচলিত ভাবে আহ্বান করিলেন। কিন্তু কোনও

উত্তর পাইলেন না।—সে তখন তার পরম বন্ধু কৃষ্ণকমলের
মহাশয়ের সমুদ্র বাহ প্রবেশ করিতেছিল।

বামীর কণ্ঠের তনিনা গৃহিণী উঁহার সম্মুখে আসিয়া
উঁহার হস্তপদ ঘোঁত করিবার জন্য জল রাখিলেন, উঁহার
হস্ত হস্ত হইতে ছিন্ন ও মলিন হস্তী প্রবেশ করিলেন, এবং

সংবাদ দিলেন যে, পুত্র বেড়াইতে গিয়াছে, এখনও প্রত্যাগত হয় নাই।

সেই সংবাদে রামপ্রাণবাবুর মরিয়া প্রাণটা ধকধক করিয়া উঠিল, তাঁহার অবসানক্রমে, তবু সুখে উদ্বিগ্নতার ক্রকছারা পতিত হইল। সেইদিন, আকিস হইতে বাটী ফিরিবার পথে তিনি এক যুবককে, এক ক্ষতগামী মোটর গাড়ীর তল্লয় পড়িয়া প্রাণ হারাইতে দেখিয়াছিলেন। বহিঃ তিনি আপন মননে নিরীকণ করিয়া নিশ্চিত হইয়া আসিয়াছিলেন যে, যুত যুবক, তাঁহার নয়নমণি জ্যোতিঃ-প্রকাশ নহে, তথাপি তাঁহার পিতৃ-জন্ম মধ্য আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, সেইরূপ বিপদ তাঁহার পঞ্চাশী পুত্রেরও ঘটতে পারে। তাই তাহাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য অভিযত ব্যস্ত হইয়া বাটী আসিয়াছেন, এবং তাহাকে আশ্বাস করিয়াছিলেন।

একদা গৃহিণীর সুখে পুত্রের বেড়াইতে বাইবার সংবাদ পাইয়া, তাঁহার দেহের অন্তর মধ্যে অভিযত ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহার ভয়ের কারণের কথা তিনি গৃহিণীকে নিকট বিবৃত করিলেন।

তিনি গৃহিণী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “বাটী জ্যোতিঃপ্রকাশের আমার ভেদন বিপদ হবে কেন? আমরা ত ভগবানের কাছে কোন অপরাধ করিনি, তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি কাণ্ড ছেড়ে, হাত সুখ-ধুয়ে, জলখাবার খেতে বস। তুমি জলখাবার খেতে খেতেই সে বাড়ী এসে পড়বে।”

কতকটা আশ্বস্ত হইয়া রামপ্রাণবাবু হাত সুখ ধুইয়া জলখাবার খাইতে বসিলেন, কিন্তু সেই সামান্য সামগ্রীও উদয়স্থ করিতে পারিলেন না। ষড়জন্ম সুখে তুলিতে বাইয়া কেবল তাঁহার সেই লোমহর্ষণ বীতংস দৃষ্টের কথা মনে পড়িয়া বাইতে লাগিল। আহার ত্যাগ করিয়া তিনি সেই প্রসঙ্গ আবার উত্থাপন করিলেন। নিকটোপবিষ্ট গৃহিণীকে সম্মল মননে কহিলেন, “বাবের ছেলে—উঃ—তাদের আজ কি সর্বনাশই হয়ে গেল। এখন তখন, তাদের বুক কেটে বাবে। জলজ্যান্ত ছেলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, এখন খিরে দেখবে, তাদের সেই ছেলের কি

দশা হ’য়েছে, তখন—উঃ। সে কথা ভাবতেও মন আটকে যায়। কি ভয়ানক! কলকাতার রাত্তার ঢলা প্রাণ হাতে করে যাওয়া।”

গৃহিণীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি বজ্রাকলে তাঁহা মর্জনা করিয়া কহিলেন, “জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার হেঁটে আসবে না। বাবার গমর, ট্রাম ভাড়ার ভতে, আমার কাছ থেকে আট আনা পরশা চেয়ে নিয়ে গেছে।”

তিনি, রামপ্রাণবাবু হৃদয়ে কতকটা শান্তি লাভ করিয়া, গৃহিণী প্রবৃত্ত কলিকা খেলো হকার মাঝার বসাইয়া ধূমপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইত্যবসরে তরকারির পেতে এবং বঁটা লইয়া গৃহিণী কতীর সম্মুখে বসিয়া রাজের আহ্বানের ব্যজন কুটিতে লাগিলেন; এবং এক একবার পুত্র প্রত্যাগমন আশায় বিহর্ষারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তরকারী কেটা সমাপ্ত হইলে, তিনি উঠিয়া সন্ধ্যা প্রদীপ জালিলেন এবং দেবতা সকলকে বার বার প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন, “হে ঠাকুর! জ্যোতিঃপ্রকাশকে কুশলে দেখ; আর আজ, মোহাই তোমার, তাকে শীগ্গির করে বাড়ী এনে দাও।”

কিন্তু কলির দেবতাগণ নির্বীৰ্য্য; সহজে তাঁহার কথা শুনিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যাপ্রদীপ জলিতে দেখিয়া, রামপ্রাণবাবুর শঙ্কিত হৃদয় অত্যন্ত উত্তলা হইয়া উঠিল। তিনি ব্যাকুল মনে গৃহিণীকে কহিলেন, “ঠেক, সন্ধ্যা হ’য়ে গেল, এখনও ত সে এল না। সে একদিনও ত এত রাত করে আসে না, সে ত আমার ভেদন ছেলে নয়।”

গৃহিণীর মনোমধ্যেও অত্যন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বিহ্বল স্বামীকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, “এখনও রাত হয়নি; এক এক বার বাড়ী ফিরতে এর চেয়ে একটু দেরী হ’য়ে যায়। আর দেরী হ’বে না; এই এল বলে।”

রামপ্রাণবাবু কাতরমুখে বলিলেন, “বাই, দরজার দাঁড়িয়ে একটু দেখি, রাত্তার আসছে কি না।”

গৃহিণী কহিলেন, “তুমি বস। আমি গিয়ে দেখে

আসি।" এই বলিয়া গৃহিণী কাছিরের দ্বারে গিয়া, পুত্রস্ব-
সন্ধানরত্নাভার তীক্ষ্ণ নয়ন দিয়া গ্যাসলোকিত রাস্তার
সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু লোক-
সমারোহ মধ্যে জ্যোতিঃপ্রকাশের চিহ্নমাত্র দেখিলেন না।
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে তথ্য মনোরে হইয়া
জিজ্ঞাসু-স্বামীর নিকট কিরিয়া আসিলেন।

গৃহিণীকে প্রত্যাপত্তা দেখিয়া রামপ্রাণবাবু উৎসুকমনে
তাহার দিকে চাহিলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখতে
গেলে?"

গৃহিণী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "না, সে ত কখনও এত
দেখি করে না।"

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রাত্রির অন্ধকারে
পরিণত হইল, দেখিয়া রামপ্রাণবাবুর ভাবনা অসহ্য হইল।
তিনি অস্থির হইয়া কাতর কণ্ঠে গৃহিণীকে বলিলেন,
"দাঁড়াও, আমি রাস্তাটার একটু বেগিরে দেখে আসি,
আসছে কি না।" এই বলিয়া দারিদ্র্যাক্রান্ত রামপ্রাণবাবু
পরিশ্রমজীর্ণ অবসর দেহ লইয়া রাস্তাপথে বাহির হইলেন।
সেখানে গ্যাসের আলোকে প্রত্যেক পথকের মুখ নিরীক্ষণ
করিয়া কিয়ৎকাল পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু সকলই
বৃথা হইল; স্রীমানের মুখের কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন
না।

কোথায় সন্ধান পাইবেন? স্রীমান তখন বন্ধুর কৃক-
কমলের সহিত একজ বসিয়া, কলেজ কোয়ার্টারের নুতন
হোটলে, চপ্ নামক এক অজানিত দ্রব্য, এবং সম্ভবতঃ
গলিত মাংস এবং অল্প অস্বাস্থ্যকর জ্বয়ের দ্বারা প্রস্তুত
কট্টলেট্ মহানন্দে আহার করিতেছিল; আর মনে মনে
ভাবিতেছিল, কি উপায়ে সামগ্রীই উদরস্থ করিতেছে।
বাস্তবিক সে, সেই আনন্দের মাঝে ভাবেই নাই যে, তাহার
অদর্শনে, তাহার পিতা এতটুকু চিন্তিত হইতে পারেন।
জ্যোতিঃপ্রকাশ বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত বটে; কিন্তু পিতা
যাতার সুখ বা অসুখের কথা কখনই সে ভাবে নাই;
তাঁহা শিক্ষা করিবার কখনই তাহার সুযোগ ঘটে নাই।
ইহা কেবলমাত্র তাহার দোষ নহে; আমাদের দেশের
আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর দোষ।

রামপ্রাণ বাবু আরও কিছুক্ষণ চিন্তিত মনে ৩৩ ক্লাক
দেখে রাস্তার রাস্তার ঘুরিয়া বেড়াইলেন। পরে অত্যন্ত
অবসর হইয়া মনে করিলেন, বুঝি এতক্ষণ অল্প পথ দিয়া
স্রীমান বাটা কিরিয়া আসিয়াছে। তিনি আশাবিত্ত হইয়া;
কুলপ্রাণীপকে দেখিবার জন্য দ্রুত পদে বাটাতে প্রত্যগত
হইলেন। কিন্তু তাহাকে বাটাতে না দেখিয়া, অস্বাভাবিক
চারিদিকে নিরাশার অন্ধকার দেখিলেন; এবং
গৃহিণীর উদ্বেলিত চিত্তকে আরও উদ্বেলিত করিয়া
তুলিলেন।

রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল; গৃহ অন্ধকারে বাটা
আচ্ছন্ন হইল। তথাপি জ্যোতিঃপ্রকাশ ফিরিল না। রাম-
প্রাণ বাবু ও তাহার গৃহিণীর মনে উৎসর্গার সীমা রহিল
না। পুত্রের—বিশেষতঃ একমাত্র কৃতবিদ্য পুত্রের—বিপদ
আশঙ্কার তাহাদের বিতর্ক মুখ, রজনীর মতই, অন্ধকার
হইয়া গেল। তাঁহাদের লোচনস্থর কেবল অশ্রুধারা তরিয়া
আসিতে লাগিল। সন্ধ্যা নয়নে, বিহ্বল চিত্তে, সেই
অন্ধকারে বসিয়া তাহার ভাবিতে লাগিলেন। জ্যোতিঃ-
প্রকাশ যদি আগে কখন কখনও ফিলে, বাটা আসিত,
তাহা হইলে, সে বিলম্বেই আশ্রিত হইয়া মনে করিয়া, তাহার
নিশ্চিত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু পুত্রের সে ত কখনও
বাটা ফিরিতে এমন অবস্থা বিলম্ব করে নাই। এ বিলম্বের
অবশ্যই কোন কারণ আছে। তাহার সেই বৃত্ত সুকের
কথা মনে করিয়া ভাবিলেন যে, সেই কারণটা অবশ্যই
তাহার কোনও বিপদ। প্রাণাধিক পুত্রের বিপদে তাহার
কি রূপে নিশ্চিত থাকিবেন? তাহার চিন্তা করিয়া স্থির
করিলেন যে, প্রথমেই নিকটবর্তী পানার খবর লওয়া তাহা-
দের কর্তব্য।

কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইবামাত্র রামপ্রাণ বাবুর জীর্ণ ও
অবসর দেহে যেন তড়িৎ সঞ্চারিত হইল। তিনি মহা
অস্থিরতা দেখাইয়া, অতি সঘর একটি সঠক আলিঙ্গ
লইলেন; এবং লাঠিটি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন;
এবং গৃহিণীকে বলিলেন, "তাহ'লে আমি থাকা থেকে
খবরটা নিরে আসি।"

গৃহিণীর তখন আর স্বামীর অবসর দেহের কথা মনে

ছিল না। তিনি সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, “তাই বাও, থানার একবার খোঁজ নিয়ে এস।”

কিন্তু রামপ্রাণ বাবুর থানার বাইবার দরকার হইল না। তাঁহাদের ঠিক কি আপন কার্য সারিয়া বাটী বাইতেছিল; সে দারবেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিল, “ঐ যে গো, দাদাবাবু বাড়ী আগছে। তোমরা কেমন একটুতেই বাড়াবাড়ী কর।”

ঝির বাক্য শেষ হইবার পূর্বেই, অল্পসন্ধানের ধন, দ্বারের বাহিরে, মুখ হইতে সিগারেটের ধূম ত্যাগ করিয়া, এবং সিগারেটের তুচ্ছাবশিষ্ট টুকরাটুকু ফেলিয়া দিয়া, বাটীতে প্রবেশ করিল। তাহার চন্দ্রসুখের উদয়ে মাতা-পিতার হৃদয়ে আবার শান্তির জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরিচয়।

ইহার পর, কয়েকদিন, জ্যোতিঃপ্রকাশ, জ্যোতির্শ্রীর কিংবা কৃককমলের স্তম্ভ সন্দর্শন লাভ করিতে পারে নাই। কাবেই সকালে সকালে বাড়ী কিরিয়া সন্ধ্যাবেলাটা তাহাদের ধ্যানেই অতিবাহিত করিয়াছিল। পিতানাতাও ঘরের ছেলেকে ঘরে দেখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আজ আবার সে সেই ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে আসিয়াছিল। আজ তাহার সহিত রমেশ কিংবা অন্য কোন বন্ধু আগমন করে নাই।—নবীন প্রেমিকগণ বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গ পছন্দ করে না; নিঃসঙ্গ থাকিয়া, একাকী প্রেম বিঘ্নে বা প্রেমস্রীর ধ্যানে সময় কাটাইতে ভাল-বাসে। জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্শ্রীকে দেখিয়া অবধি বন্ধুদের সঙ্গ সাধ্যমত ত্যাগ করিত।

উভান মধ্যে ইউত্তম: সত্বক দৃষ্টি সকালন করিয়া সে কৃককমল বা জ্যোতির্শ্রীকে কোনও স্থানে দেখিতে পাইল না; তাহার কি উভান ভ্রমণ ত্যাগ করিল? নিরাশায় হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া আশ্রিত কি বাড়ী কিরিবে? ভগবান, দয়াময়! সেই জুবনমোহিনীকে আবার দেখাও; তাহার রূপালোকে নবীন প্রেমিকের নিরাশাচ্ছন্ন অন্ধকার বন্দ:

আবার আলোকিত কর; এই স্তম্ভকমলকে আবার স্বর্গের স্রুতা খাওয়াইয়া সজীবিত কর।

দয়াময় ভগবান তাহার হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা শুনি-লেন, এবং তাহা আশ্রিত পূর্ণ করিলেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ চারিদিকে দৃষ্টি সকালন করিতে করিতে দেখিল যে, গেটের ভিতর দিয়া এক প্রৌঢ়া, অতি তল্ল বগনে তাহার স্রুত দেহ আবৃত করিয়া, অতি মন্থর গমনে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; তাহারই পশ্চাতে সালফার জ্যোতির্শ্রী, একখানি কিরোজা রংএর রেশমী শাড়ী পরিয়া এবং ফুটা মোটা প্রভৃতি আঁটিয়া, সাধা মেঘের অন্তরালে পূর্ণিমার চন্দ্রের মত, বাগানের প্রেমময় পথে ধীরে—অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

দেখিয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ আপন টেরীতে হাত বুলাইয়া চুলগুলি স্রুবিন্যস্ত করিয়া গেল; পাঞ্জাবীর গলায় হাত দিয়া, তাহার সোণার বোতামগুলি ঠিক লাগান আছে কি না পরীক্ষা করিল; চন্দ্র হইতে সোণার চশমা খুলিয়া রুমালে তাহা মুছিল; কাপড়ের কোঁচান্ধে হাত বুলাইয়া তাহা ঠিক করিয়া গেল; লগেটা রুমালে ঝাড়িল; এইরূপে আপনাকে স্রুগুস্ত করিয়া, তাহাদের অপেক্ষার, তাহাদের আগমন পথের পার্শ্বে একটা বেঞ্চে বসিয়া রহিল।

ক্রমে তাহার নিকটবর্তিনী হইল; ক্রমে তাহাদের পরিধেয়ের সৌরভ জ্যোতিঃপ্রকাশের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল; ক্রমে তাহাদের কথোপকথনের মধুর ধ্বনি তাহার উৎকর্ষ কর্ণে মধু বর্ষণ করিল। কথোপকথন কালে জ্যোতির্শ্রী প্রৌঢ়াকে একবার ‘মা’ বলিয়া সম্বোধন করায়, জ্যোতিঃপ্রকাশ বুঝিল যে এই তল্লবেশধারিণী প্রৌঢ়াই জ্যোতির্শ্রীর দনবতী জননী। তাহার বেঞ্চার নিকট সমাগতা হইলে, জ্যোতিঃপ্রকাশ সমস্তই বেঞ্চ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তল্লপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে তাহাদিগকে অতিবাচন করিল।

জ্যোতির্শ্রী এবং তাহার মাতা গভীর মুখে ঈবৎ হান্তরস মাধিয়া এবং ঈবৎ মস্তক সকালন করিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া আরও অগ্রসর হইলেন। জ্যোতিঃ-প্রকাশের প্রাণ সীমা অতিক্রম করিয়া জননী কন্ডাকে

মুহুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছোকরাও বেশ সত্য; আর দেখতেও মন্দ নয়। তুই ওকে চিনিস?”

অপর যুবতীরা কি করে আমরা তাহা অবগত নহি। কিন্তু জ্যোতির্শ্রী কোন যুবকের স্তম্ভর মুখ দেখিলে আপন মনে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইত; এবং সেই চিত্রের উজ্জল বর্ণসহজে মলিন হইত না। তাই জ্যোতিঃপ্রকাশকে একবার মাত্র অবলোকন করিয়া সে তাহাকে ভুলে নাই। মাতার প্রশ্নে সে বলিল, “সাত আট দিন আগে ওকে এই বাগানে বসে থাকতে দেখেছিলাম।”

মাতা ক্রকৃকিত করিয়া কহিলেন, “সাত আট দিন আগে তুই এই বাগানে এসেছিলি; ঠিক, সে কথা ত আমারে বলিস্নি; কার সঙ্গে এসেছিলি?”

সে কৃষ্ণকমলের সঙ্গে খেমলীয়া করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু সে কথা ত মাতার কাছে প্রকাশ করিতে পারেনা; তাহার সহিত ভ্রমণে যে মাতার বিশেষ আপত্তি ছিল। সে মনে করিল, বাগানে আসার কথা মাতার নিকট প্রকাশ করা ভাল হয় নাই। এখন কথাটা সংশোধন করিয়া লইতে হইলে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে সে কখন পরাধু্য হয় নাই; আজও হইল না। মিথ্যা-বাদিনী কহিল, “আমি বাড়ী থেকে যায়নি ত, তুমি জানবে কেমন করে? আমি একবারে কলক থেকে ক’জন মেয়ের সঙ্গে ট্রামে গিয়েছিলাম। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ঐ ছোকরাটাকে একটা বেঞ্চে একলাটি বসে থাকতে দেখেছিলাম। এর বিষয় আর কিছু আমি জানিনে।”

যদি পরিচয়ই নাই তবে নমস্কার করিল কেন, সে সম্বন্ধে জননী কতাকে কোনও প্রশ্ন করিলেন না। অপর গভীর চিন্তা তাঁহার স্বয়ং অধিকার করিয়াছিল। তিনি ভাবিতে-হিলেন ঐ শিষ্ট যুবকটিকে জামাতা করিতে পারা যায় কি না। ছোকরা স্তম্ভর বটে, কত্তার পছন্দ মত স্তম্ভর কি না জানিয়া লইতে হইবে; উহার পরিচয় লইয়া, উহার কুল শীল ও গুণগণনার খবর লইতে হইবে। তাঁহার অর্থ আছে, তিনি কত্তার জন্ত কোন পছন্দমত জামাতা পাইবেন না? টাকার যে কুলশীল সৌন্দর্য গুণগণনা সকলই কিনিতে পারা

যায়। কৃষ্ণকমলটা জ্যোতির্শ্রীকে বিবাহ করিতে চায়; কি স্পর্ধা! রাত্তার কুকুর দেবতার মাথার মণি চায়। চিন্তিত মনে তিনি কতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই ওর নাম কি বসতে পারিস?”

জ্যোতির্শ্রী বলিল, “না। আমি ত বলেছি আমি ওর বিষয় কিছুই জানিনে। সেদিন কেবল বসে থাকতে দেখেছিলাম।”

মাতা ওত্তর মন বুঝিবার জন্ত প্রশ্ন করিলেন, “ছোকরাটি বেশ দেখতে; নয়?”

ছন্দা শাজে মাতা অপেক্ষা কতক কম পারদর্শিনী নহে; সে মাতাকে নিজের মনোভাব কোনরূপে জানিতে দিল না। কেবল দ্ব্যর্থবোধক একটা ছোট শব্দে মাতার প্রশ্নের উত্তর দিল, “হবে!”

মাতা কত্তার মনোভাব বুঝতে চা পারিয়া, কহিলেন, “ওর পরিচয় নিতে হবে।”

জ্যোতির্শ্রী সন্দেহব্যাঞ্জক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন করে নেবে?”

মাতা দ্বিধা কর্কে মুখমণ্ডল গভীর করিয়া কহিলেন, “তা পরে বুঝতে পারবি। এখন চল, এই পথে আবার তাঁর সমুখ দিয়ে কিরে যাই।”

কতাসহ মাতা কিরিলেন। ধীর পাদবিক্ষেপে আবার পূর্বগণ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। ক্রমে জ্যোতিঃপ্রকাশের বেঞ্চের পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার গৃহে প্রত্যগমন করিতেছেন মনে করিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ আবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিল; তাঁহার আবার পূর্বোক্ত প্রকারে প্রতিনমস্কার করিলেন। কি জানি কেন, মাতা আপন পতিস্বত মুখ ও নির্মল বর্ণহীন ললাট, কটিদেশে হইতে রেশম রচিত অতি শুভ্র ক্রবাল লইয়া মার্জন করিলেন। পুনরায় কটিদেশে ক্রমাগত রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বেঙ্চার চেষ্টা সফল হইল না। যেন অসাবধানে তাহা রাত্তার পড়িয়া গেল। যেন ক্রমাগত পতনের বিষয় কিছুমাত্র জানিতে না পারিয়াই মাতা কতাসহ অগ্রসর হইলেন।

বলা বাহুল্য, ইহা একটা ছলনামাত্র। সূর্য সাগর পার

হইতে আমরা এই হলনা আমদানি করিয়া, আমাদের মাতৃভূমির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতেছি।

হলনাময়ীর ক্রমালের চৌপ ফেলা সার্থক হইল। আমাদের জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবাজীবন সে চৌপ সহজেই গলাধঃকরণ করিল। অসাধারণে পড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়া, ঈমান মাতার হস্তচূত ক্রমালখানি রাত্তা হইতে কুড়াইয়া লইল, এবং উহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অস্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশের পদশব্দে হলনাময়ী মাতা ও কস্তা উভয়েই পশ্চাৎ কিরিয়া দেখিলেন। উভয়েই হল বিনয় ও ভীতি বিক্ষারিত লোচনে প্রকটিত করিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশের দিকে তাকাইলেন। জ্যোতিঃপ্রকাশের হস্তে আপন পরিচিত ক্রমালখানি দেখিয়া মাতা প্রমত্তপূর্ণ কটাক করিলেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ একবার মাজ প্রেমপূর্ণ নয়নে জ্যোতিঃপন্নীর উজ্জল সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্তই মাতা-ঠাকুরানীকে কহিল, “আপনাদের বিরক্ত করার অস্তে আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনার এই ক্রমালখানি রাত্তার কি রকম ভাবে পড়ে গিয়েছিল। দেখতে পেয়ে আমি আপনাদের দেবার অস্তে কুড়িয়ে এনেছি।”

মাতা প্রথমে একটা ছোট “ওঃ” বলিয়া ক্রমালখানি আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন। পরে উহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “হী, এখানি আমার ক্রমালই ত। অতি সামান্য ভিনিষ; হারিয়ে গেলে কিছুই ক্ষতি হত না। কিন্তু এরই অস্তে আগনি—তুনি যে কষ্ট বীকার করেছ, এবং ভয়তা দেখিয়েছ তা অতি মহৎ। এর অস্তে আমরা তোমার নিকট চিরঞ্জী ও কৃতজ্ঞ থাকব। তোমার নামটি কি, বাবা?”

জ্যোতিঃপ্রকাশ বলিল, “আমার নাম ঐজ্যোতিঃপ্রকাশ সুখোপাধ্যায়।”

মাতা ভীষণ হস্তরসে আপনার গাভীয়া কিছু নরম করিয়া বলিলেন, “বেশ! বেশ নামটি তোমার। এ নাম আমার চিরকাল মনে থাকবে।—আমার যে মেয়ের নামও জ্যোতিঃ—জ্যোতিঃপন্নী।”

নিজের নামের উল্লেখ হওয়ার, এবং জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত তাহার নামের মিল হওয়ার, জ্যোতিঃপন্নী তাহার দিকে লজ্জাবিজড়িত কটাকপাত করিয়া আপন লজ্জারক্ত আনন অবনত করিল; তাহার ক্রকপন্ন-বিশিষ্ট লোচনধর তুনিতে আবদ্ধ রহিল।

সেই লজ্জাবনত সুখের অরুণিমা দেখিয়া, সেই ক্রকচক্ পল্লবের মধুরিমা দেখিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশের মনে হইল, এ সুখের তুলনা নাই; ইহা নিশ্চয় বর্গস্থধা গাঢ় করিয়া, দেবহস্তে দেব আদর্শে গঠিত হইরাছে।—এ সুখের সুবহার বিরাট আকাশ পূর্ণ হইয়া যায়।

মাতা দেখিলেন মুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ কন্যার সুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে; তাহার রূপ সুবহার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মাতা এই সুখোপ অবহেলা করিলেন না। তিনি প্রেমের পর প্রমত্ত করিয়া তাহার বাড়ী কোথায়, সে কি কাঁচ করে, কতদূর পড়িয়াছে, বিবাহ হইরাছে কি না, তাহার মা বাপ বর্তমান আছেন কি না, উত্থাপক তাহার সমস্ত পরিচয়ই গ্রহণ করিলেন। বিবাহ সম্বন্ধে কথাটা বন্ধুবান্ধবের নিকট বেমন গোপন রাখিয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহা সেইরূপ গোপন রাখিল। তাহার পরিচয় পাইয়া, মাতৃদেবী মনে মনে তাহাকে জামাতৃপদে বরণ করিলেন। এবং তাহাকে আপন বাড়ীর ঠিকানা দিয়া, মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

নিমন্ত্রণ-রক্ষা।

মাতা ঠাকুরানীর মধুর আহ্বানের কথা, ঈমান জ্যোতিঃপ্রকাশ, রক্ষাকবচের ভায়, জ্বরে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল।

পর দিন প্রত্যাত হইতেই নিমন্ত্রণ রক্ষার উত্তোপ চলিতে লাগিল। নিজের যে সকল পরিচ্ছন্ন ছিল, তাহার উৎকৃষ্টগুলি, জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রত্যাতে পাড়োখান

করিয়াই বাহির। ওহাইরা রাখিয়াছিল। খণ্ডরবাড়ী হইতে আগত, পুজার করিপাড: কাপড় ও উত্তরীয় কুঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল; খণ্ডরবাড়ীরই সিকের পাঞ্জাবীতে তৎস্থান হইতে প্রাপ্ত, বর্ণের বোতাম গুলি সাজ্জিত করিয়া লাগাইয়া রাখিয়াছিল; খণ্ডরবাড়ীর আমদানি ময়ূরকণ্ঠি রঙের লপেটাটি পালিশ করিয়া, দর্পণের মত করিয়াছিল, বিবাহ উপলক্ষে প্রাপ্ত হীরকাসুত্রীয়, রিট বড়ী এবং তাহা ধারণের সুবর্ণ গঠিত কঙ্কণটী, সাবান, খড়িমাটি ও শাবর চর্মের দ্বারা পরিমার্জিত করিয়া রাখিয়াছিল; এবং তদুপলক্ষে ক্রীত কনক স্ৰেণবিশিষ্ট চশমার স্ৰেণটি সাধ্যমত পরিষ্কৃত করিয়াছিল। দীর্ঘ প্রভাত সময় কেবল এই কার্যেই অতিবাহিত হইল।

বিধাতার দারুণ বিড়ম্বনা এই যে, জ্যোতিঃপ্রকাশ নবপ্রণিনীর সাক্ষাৎকারে বাইবার অস্ত্র যে সকল সম্ভা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, এৰ্ন কি যে গন্ধজ্বাও রাখিবার অস্ত্র বাহির করিয়াছিল, তৎ সমুদায়ই পূৰ্ণ খণ্ডরবাড়ীর অৰ্ধে ক্রীত, কিংবা তৎস্থান হইতে প্রাপ্ত। কিন্তু সে কথা সে তাবে নাই। তাবিলে, তাহার হৃদয় মধ্যে কোনও অসুশোচনা আসিত কি? না; আমরা জানি, তাহার হৃদয় স্নেহরূপ উপাদানেই গঠিত হয় নাই।

বিগ্রহের সময়টী, জ্যোতিঃপ্রকাশ দেহখানি সাবান দ্বারা সার্জন ও পুনর্সার্জন করিবার অস্ত্র অতিবাহিত করিয়াছিল। তৎপরে আহাৰাদি করিয়া শরীরের গুটি সাধন করিয়াছিল; এবং আরও পরে কিঞ্চিৎ দিবানিত্যের পূৰ্ব্বাহ্নের শ্রমকান্তি বিদূরিত করিয়া দেহসৌষ্ঠব বর্ধিত করিয়াছিল।

অপরাজে রোজতেল ঈষৎ মন্দোভূত হইলে, সময়ের ধীর ময়র গতিতে জ্যোতিঃপ্রকাশ একান্ত অধীর হইয়া, সে তাহার কেশাবভাষণ করিল; সন্মুখের অতিদীর্ঘ কেশগুলি পশ্চাৎ ভাগের অতি ক্ষুদ্র কেশের উপর বিস্তৃত করিয়া, গন্ধজ্বায়ের সাহায্যে, করলা মৎস্তের শিরাকণ্টকের জ্বা, কিংবা নীরব মধ্যে সরল দামিনীছটার

জ্বা, স্কন্ধ এবং উজ্জল সিঁধি কাটিল; বলাবাহুল্য, একটা কেশও তাহার স্মৃগটু হস্তের কোশলে স্থানান্তরিত রহিল না। তৎপরে কিঞ্চিৎ গন্ধজল মুখমণ্ডলে সিক্ত করিয়া, ঐমুখ তোয়ালের দ্বারা মুছিয়া সে আগুন বরদেহ সজ্জিত করিল।

উপরিত্তক্ত চরুহ কাৰ্য্য সমাধা করিয়া সে নিজে মাতার নিকট নামিয়া আসিল; এবং ইনিভাড়া (প্রকৃতপক্ষে সিগারেট কিনিবার) পরগা চাহিল।

মাতা পুত্রের বেশবিস্তার দেখিয়া, দৃষ্ট হইয়া ভিজাসা করিলেন, “কোথায় বাবি, জ্যোতি?”

মাতার সরল প্রশ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশ দৃষ্ট হইয়া কক্ষস্থরে কহিল, “সে কথায় তোমার দরকার কি? ইনিভাড়ার পরগা দেবে কিনা বল?”

মাতার প্রতিবুদ্ধিমান অশিক্ষিত পুত্রের এই কি ভাষা? উচ্চশিক্ষার অভিমান লইয়া, বাহিরে স্নানভা বসিয়া পরিচয় দিয়া, এবং পরসার অস্ত্র প্রার্থী হইয়া পুত্র কিরূপে আগুন জননীর প্রতি এই ভাষা প্রয়োগ করিল? হার বিধাতা! তোমার গঠিত মানব হৃদয়ে কি এতটুকু মাতৃভক্তি দাও নাই, এই স্নানর মুখে কি এতটুকু বিনয় বচন দাও নাই? কিন্তু এইরূপ মানব কি বিধতার সৃষ্টি? তাহা হইলে, কি তাহার বিশ্বরাজ্য এখনও চলিত?

জননী নির্দীক বদনে পুত্রের প্রার্থিত অৰ্ঘ আনিয়া দিলেন, এবং কলিকাতার বিপদ-সঙ্কুল রাস্তার কথা ভাবিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে স্নেহপূর্ণ বরে ভিজাসা করিলেন, “কখন আবার কিরে আসবে?”

সুসজ্জিত ও স্নানভা পুত্র, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, আগুন গর্ভধারিণীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। পমনোমুখ হইয়া পশ্চাৎ কিরিয়া, চলিতে চলিতে কর্কশ কণ্ঠে কহিল, “আগে তা’ বলে বেতে পারি নে।”

মাতা আর কিছু বলিলেন না। কেবল দেহভা-দিপের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিলেন যে, পুত্রের পমন ও প্রত্যাগমন পথ বেন তাঁহাদিপের কৃপার নিরঙ্কুশ হয়; বেন প্রতিপাদক্ষেপে পুত্রের পদ কোবল কুন্তনের উপর পতিত হয়।

মাতার প্রার্থনা অমূল্যবায়ী দেবতার মিলিয়া, ঈশান জ্যোতিঃপ্রকাশের প্রথমপথ নিরুপ্ত ও কুসুমাকীর্ণ করিয়াছিলেন। সেই পথে, সে কোনও স্থানে অগেফা না করিয়া একবারে উৎসাহিতপ্রেরণার আবাস বাটীতে পৌঁছিয়াছিল।

বহির্ভাৱের সমুদ্রের রাতার দিকে জ্যোতির্শ্রীর একটি চক্ষুর দৃষ্টি সর্বদাই নিবদ্ধ থাকিত। সেই পথে কেহ আগমন করিলে সে সর্বপ্রায়ে তাহার নয়নপথের পথিক হইত। সে জ্যোতিঃপ্রকাশকে সেই পথে আসিতে, এবং তাহারদের গৃহদ্বারে প্রবেশ করিতে দেখিল। দেখিয়াই সে ঝরিত বেগে মাতার নিকট সংবাদ দিল, “কালকার সেই লোকটি, সেই বাগানে বার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এর মধ্যেই হাজির হয়েছে।”

মাতা কহিলেন, “খাড়াই যে আসবে, তা’ আমিও মনে করিনি। কিন্তু যখন এসেছে, তখন একটু পরে, আমি বসবার ঘরে ওর সঙ্গে দেখা করব। আর আমাদের কথাবার্তা আরম্ভ হ’লে, তুমি একটু সেজে শুভ্র, কোনও একটা অছিলা করে, সেই ঘরে আসিস। মনে রাখিস, ঐ ছোকরার সঙ্গেই তোর আমি বিয়ে দেব। যেন কোন রকমে হাতছাড়া না হয়।”

জ্যোতির্শ্রী বলিয়া বলিল, “আর ওকে যদি আমার পছন্দ না হয়?”

মাতা কহিলেন, “তবে কাকে পছন্দ হবে, তুমি? কেটাকে?”

জ্যোতির্শ্রী ক্ষুব্ধিত করিয়া কহিল, “মা, তুমি মনের ভিতর এই একটা ভুল করে রেখেছ। কৃষ্ণকমল দানাকে আমি বড় ভাইয়ের মত দেখি; তাকে কখনই আমি বিয়ে করব না।”

মাতা বলিলেন, “আর বিয়ে করব বল্লো, আমি সে বিষয়ে কখনও মত দেব না; একখাটা ঠিক জেনে রাখিস। আর ওই ছোকরা নিজের বা পরিচর দিয়েছে, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ওর সঙ্গেই আমি তোর বিয়ে দেব;—ওকে তোর পছন্দ হোক আর নাই হোক।”

জ্যোতির্শ্রী মাতার কথার কোনও উত্তর দিল না। সুখখানা গভীর করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে, একজন পরিচারিকা আসিয়া গৃহিণীকে আগন্তকের আগমন সংবাদ দিল।

গৃহিণী আদেশ করিলেন, “আগে দেখ, বসবার ঘরটা কোনও রকম অগোছান আছে কিনা। যদি একটুও অগোছান থাকে, তবে সে ঘরটা বেশ করে শুষ্কিয়ে নে। তার পরে, ছোকরাকে ডেকে এনে সেই ঘরে বসাবি। আমি কাপড় চোপড় একটু শুষ্কিয়ে প’রে, একটু পরে তার সঙ্গে দেখা করব।”

দাসী কর্তার আদেশ পালন জন্ত চলিয়া গেল। কর্তা গাজোখন করিয়া, আপন দেহের ও পরিচ্ছদের পরিপাট্য সাধন জন্ত প্রসাধন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে ঈশান জ্যোতিঃপ্রকাশ দ্বারবানের নিকট একখানা চেয়ারে বসিয়া, ছক ছক বক্ষে পরিচারিকার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আর পনের মিনিট কাল পরে দাসী প্রত্যাগতা হইয়া কহিল, “আমুন।”

জ্যোতিঃপ্রকাশ দাসীর অমূল্যবায়ী হইয়া, মর্ম্মরসোপনাবলী অতিক্রম করিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ উপরে উঠিল;—তাহার মনে হইল, সে ধাপে ধাপে স্বর্গে উঠিতেছে। তথায় সে অসম্ভিত অনতিবৃহৎ বসিবার ঘরে গিয়া বসিল;—তাহার মনে হইল, সে যেন পারিজাত শোভিত, স্বর্গীয় গন্ধানোদিত নিরুজ্জ্বল বসিয়াছে। কিন্তু সে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে তথায় স্বর্গের রাণী জ্যোতির্শ্রী নাই।

পরিচারিকা তাহাকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে দেখিয়া বলিল, “আগনি একটু বসে থাকুন। মা এখনই আসবেন।”

জ্যোতিঃপ্রকাশ দাসীর বাক্যে আশ্রিত হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

ঈশানোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্বানুস্মৃতি)

রাজা রবীন্দ্রনাথ মাস্তুল অঞ্চলের লোক। মাস্তুল বলিয়া মাস্তুল ? একেবারে জিবাকুর মাস্তুলের মাস্তুল, তাঁহার দ্বারবানটিও সেই দেশের। এই দ্বারবান প্রবর তাঁহার দেশের ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষাই জানেন না। আমি বাংলা, হিন্দী, ইংরাজি এই তিন ভাষা দ্বারা আমার আগমন প্রয়োজন জানাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই কল হইল না; সঙ্গে 'কার্ড' ছিল না, থাকিলে উহা তাঁহার হাতে দিয়া ইঙ্গিতের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে আমি রাজা রবীন্দ্রনাথের দর্শন-প্রয়াসী। অবশেষে ইঙ্গিতের সাহায্যই লইলাম। হস্তদ্বারা কাগজ কলম বা প্লেট পেনসিল বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে রজনী উকীষদ্বারা, কামিজ কোট এবং তত্ত্বপরি উত্তরজ্জদে অঙ্গাবৃত গুপ্তবিশিষ্ট একটি তত্ত্বলোক বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, এবং আমার সুকবৎ অতিনয়ের চেষ্টা দেখিয়াই বৃষ্টিতে পারিলেন আমি কি বিপদে পড়িয়াছি। আগন্তুক তত্ত্বলোকটির এ বাড়ীতে বাঙলা আসা আছে, তিনি দ্বারবানটিকে জানেন, ইহা তাঁহার নিকট পরে শুনিরাছিলাম। তত্ত্বলোকটির সূক্তি দেখিলেই অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং সর্বা প্রকুর বলিয়া মনে হয়। তিনি স্তম্ভের ইংরাজিতে আমাকে আমার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমার আগমনের কারণ শুনিবামাত্র আমাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। কহিলেন আমি রাজা রবীন্দ্রনাথের পুরাতন বন্ধু, আমি সঙ্গে করিয়া আপনাকে লইয়া গেলে রাজা কিছুই মনে করিবেন না, এবং রবীন্দ্রনাথ অভিশর তত্ত্ব, তাঁহার শিষ্টাচারের অবধি নাই, তবে আপনি সেখানেও বিপদে পড়িবেন, কারণ তিনিও হিন্দী বা ইংরাজি ভাল বলিতে পারেন না, তবে কাজ চলিয়া যার। বাহা

হটক আমি দোতাবীর কার্য করিব।—এই করটি কথা বলিবার সময়ে তাঁহার হাতোদীপ্ত মুখমণ্ডলে প্রতিভা এবং বুদ্ধির অসামান্য কোটিঃ দেখিরাছিলাম, বিশেষতঃ তাঁহার চক্ষুর দীপ্তি অনন্তসাধারণ বলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই ধারণা জন্মিয়া গেল, পরে তাঁহার সহিত বন্টি পরিচয়ে সে ধারণা আমার জাতমূল হইয়া গিয়াছিল।

আগন্তুক তত্ত্বলোকের নাম ছিল পুরুষোত্তম রাও তেলাঙ্গ। ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের পরলোকগত জজ কানীনাথ জ্যাক তেলাঙ্গের জ্যতিভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার কথা বলিতেছি সেই পুরুষোত্তম আন লোকান্তরে, তাঁহার মৃত্যুতে একজন বর্ধা অস্তরঙ্গ বন্ধু আমি হারায়েছি।

পুরুষোত্তম আমাকে সঙ্গে করিয়া দোতাবীর বেখানে রাজা রবীন্দ্রনাথের চিত্রগৃহ (Studio) সেই কামরায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ ইজলের (Easel) নিকট দাঁড়াইয়া একমনে চিত্রকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা রামবর্মা (?) নিকটে দাঁড়াইয়া আমার অবোধ ভাষার চিত্রসম্বন্ধেই কি আলোচনা করিতেছেন। পুরুষোত্তম মহীশূরী ভাষার কি বলিল বুঝিলাম না, রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতা আমাকে অত্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং তাঁহাদের ভাষা ভাষা ইংরাজীতে কুশলপ্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। কষ্ট হইতেছে দেখিয়া পুরুষোত্তম যেচ্ছার দোতাবীর কার্য করিতে চাহিলে দেখিলাম ভ্রাতৃবর আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। পুরুষোত্তমের কৃপার আলাপ অবোধে চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যের তটপ্রান্তে রাজার বাড়ীটি স্তম্ভের, গৃহসজ্জার পারিগাট্য খনিজনমূলত, এবং চিত্রগৃহে সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ নানাবিধ ছবি, নানাহাস্য, নানাতাবে রক্ষিত আছে।

কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া জীবিকার্জন সম্ভব নহে। কিন্তু আমার পাঠক পাঠিকাগণ তুমিরা বিম্বিত হইবেন যে, পুরুষোত্তম ডেলাল মাত্র এণ্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী অবধি পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বাহা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা সে সমস্তই স্কুলের বাহিরে এবং তৎ-সমুদয়ই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার বিন্দুরকর ফল। তাঁহাকে যে দেখিয়াছে সেই তৎক্ষণাত্বে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং যে কোন বিষয়েই কথা উত্থাপন হউক না কেন, পুরুষোত্তম সে সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিবেনই এবং বাহা বলিবেন তাহা সারগর্ভ। পর-লোকগত বিচারপতি রাণাডের মত অসামান্য বীণ-সঙ্গার নাগবের মুখে শুনিয়াছি, “পুরুষোত্তম যদি ইচ্ছা করিত : তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম উপাধি তাঁহার অমার্যসম্বল হইত এবং সংসার-ক্ষেত্রে অর্থে ও পদ-সৌন্দর্যে শীর্ষস্থান অধিকার করা তাঁহার নিকট বাগকের ক্রীড়া।” আমার সহিত তাঁহার প্রথম দর্শনাবধি বাক-ব-স্তার স্মরণাত হক এবং সেই স্মৃতির বলে তাঁহাকে আমি স্মরণ বোধই নব্বী হইতে কলিকাতার আমার আবাসে আনিতে পারিয়াছিলাম। বতকাল জীবিত ছিলেন; বৎসরে অন্ততঃ তিন মাস কাল তিনি কলিকাতার আমার বাড়িতে কাটাইতেন। এখানে অবস্থান কালে তাঁর আড়ত্যাক-চৌধুরী, তাঁহার ভ্রাতা মিঃ সি, চৌধুরী প্রভৃতি প্রতিভা-সম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তিগণের সহিত পুরুষো-ত্তমের পরিচয় হয়, ইহারাত তাঁহার উচ্চল প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমার প্রথমবারের বোম্বাই বাসের পরম লাভ এই মিত্র লাভ এবং রবিকর্ণার চিত্র দর্শন। আর এক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম—তাহা নৌ-সেনা ও স্থল-সৈন্তের যুদ্ধাভিনয় (Army & Navy tournament) তৎপূর্বে সৈনিকগণের ক্রীড়াসময় আমি দেখি নাই। বোম্বাইয়ের ওড্যাল নামক মরদানে এই ক্রীড়ার যুদ্ধের ব্যবস্থা হইয়াছিল। টিকিট করিয়া দেখিবার মনোবস্ত কর্তৃপক্ষগণ করিয়াছিলেন। রাজিতে যুদ্ধাভিনয় হইবে, আমরা সঙ্ঘার অব্যবহিত পরেই আহায়াদি

শেষ করিয়া টিকিট হস্তে নির্দিষ্ট আসন অধিকার করিয়া বসিলাম। অভিনয় চলিতেছে, এমন সময়ে দেখি একজন ইউরোপীয় বেশধারী লোক আমার আসনের নিকট বীরপদে অগ্রসর হইতেছে। দূর হইতে চিনিতে পারিলাম না লোকটি কে। সে নিকটবর্তী হইয়া বলিয়া উঠিল, “Hallo Roy, you are here!” আমি তৎক্ষণাত্বে চিনিতে পারিলাম, আগন্তক আমার একজন পূর্বপরিচিত আমেরিকাবাসী বন্ধু। অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্ধুকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। একজনে বসিয়া যুদ্ধাভিনয় দেখিলাম, অভিনয়ান্তে বন্ধু আমার সহিত আমাদের বাসার আসিলেন। সে রাজি তথায় আমার “পারলামা হুট” পরিয়া আমার শয্যাতেই শয়ন করিলেন। পরদিবস তাঁহার জিনিষ-পত্র হোটেল হইতে আনাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার জাহাজ ছাড়িবার দিন পর্যন্ত আমাদের বাসাতেই রহিলেন। বন্ধুর সহিত একজনে আসার আনন্দের সীমা ছিল না; কিন্তু আমার সঙ্গে বাহারা ছিলেন তাঁহারা ইংরাজের সম্বন্ধে অনাবৃত শরীরে থাকিতে না পারার মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেছিলেন, কিন্তু মুখে কেহই কিছু বলেন নাই। বন্ধুর অমার্যিক ব্যবহারে তাঁহাদের পূর্ব অসন্তুষ্ট কাটায়া গিয়াছিল এবং যে দিন তিনি সন্দের নিকট একে একে বিদায় লইয়া জাহাজে চড়িলেন, তখন মুখ দেখিয়া মনে হইল যে সকলেই যেমন আসার বিরহের আশঙ্কার বিষয় হইয়াছেন—আমি যে বন্ধু-বিক্ষেদ-বেদনার কাতর হইয়াছিলাম একথা বলাই বাহুল্য।

গোপালবাবুর গীড়ার এবং দর্শনীর সকলগুলি পদার্থ দেখিতে অনেক সময় লাগিল। পুণা, হায়দ্রাবাদ, গোলকুতা, বরোদা প্রভৃতি দেখিতে দীর্ঘ সময় লাগিবে, সেই জন্য রবিকর্ণার চিত্রাঙ্কন শেষ হইয়া গেলে ছই এক দিনের মধ্যেই আমরা বোম্বাই ছাড়িয়া “ডেকান-রাণী” পুণার অভিমুখে বাজা করিলাম।

পুণার রেল-পথ অতি সুন্দর। বোম্বাই হইতে বাহির হইয়া লৌহবন্দর কিছুদূর পর্যন্ত সবতল ভূমির

উপর দিয়া বিসর্পিতভাবে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চ-তর বেশে উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে কঠিন শৈল-গাত্র ভেদ করিয়া অদ্ভুতপথে (টানেলের মধ্য দিয়া) রেল-গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, সে দৃষ্ট জীবনে প্রথম যখন দেখা যায় তখন এক প্রকার ভীতি-মিশ্রিত বিষয়ে অভিভূত না হয় এমন ব্যক্তি বোধ করি জগতে কমই আছে। আমি রেল টানেলের কথা পূর্বে পড়িয়া-ছিলাম এবং লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু রেল অদ্ভুত প্রত্যক্ষ দেখিবার এবং অদ্ভুত পথে রেলগাড়ীতে বসিয়া বাইবার সুযোগ আমার তৎপূর্বে ঘটে নাই—সেই প্রথম।

বোম্বাই হইতে প্রাতঃকালের গাড়ীতে রওনা হইয়া-ছিলাম, উদ্দেশ্য দিনমানে পুণায় পহুছিলে থাকিবার স্থান প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিবার সুবিধা হইবে। বেলা প্রায় সাত ঘটিকার সময়ে জিটোরিয়া ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িয়া প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে কল্যাণ নামক ষ্টেশনে পহুছিল। এ পর্বটুকু সমতল। কল্যাণে গাড়ী কিছু দীর্ঘ সময় দাঁড়াইল এবং দেখিলাম সেই বেলা নয়টার সময়ই গাড়ীতে বাতি জালিয়া দিতেছে, কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, অবাক হইয়া রহিলাম।

আমার সহিত বালের সহাধ্যায়ী শশিশেখর চক্রবর্তী নামক এক তত্ত্বলোক ছিলেন, তিনি কিছু রহস্যময় এবং কথাবার্তা কহিবার তাঁহার এমনিই ধরণ ছিল যে, সামান্য কথাতেও লোকে না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহাদের গ্রামে কানী চৌধুরী নামধারী এক তত্ত্বলোক ছিলেন, তাঁহার মস্তাসক্তি সর্বজন বিদিত ছিল; চৌধুরী মহাশয় মস্তগানান্তে প্রাতঃকালে দুইটি মোমবাতির লণ্ঠন জালাইয়া দুই একবার পথে বাহির হইয়াছেন; সেই কথার উল্লেখ করিয়া শশিশেখর আমাকে কহিল, “ওহে, এখানেও দেখি কানী চৌধুরী আছে, নতুবা এরা এই মেমলেশ-হীন স্বর্বাণালোকিত প্রাতঃকালে গাড়ীর মধ্যে বাতি জালার কেন?” বাস্তবিক বিষয়কর ব্যাপার বলিয়া আমাদের সকলেরই মনে হইয়াছিল।

কানী চৌধুরীর কথা লইয়া হাসি তামাসা হইতেছে এমন সময় বাতি জালা হইয়া গেলে, নিশান দেখাইয়া বাঁশি বাজাইয়া গার্ড সাহেব গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেত করিলেন; গাড়ী চলিল। কানী চৌধুরীর কথা শেষ হইবার পূর্বেই দেখি অকস্মাৎ গাড়ীর মধ্যে হঠাৎ অন্ধকার, নিজের শরীর পর্যন্ত দেখা যায় না, হতভাগা অসুস্থত্ব করিতে হয় যে, আমি গাড়ীতে আছি। এন্ধিনের অপৰ্য্যাপ্ত ধূমে বাসগোধ হইবার উপক্রম, রেল গাড়ীর মধ্যস্থ লণ্ঠনের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই। তখন সকলে বুঝিলাম যে গাড়ী অদ্ভুত পথে চলিয়াছে, এবং দিবাভাগে প্রদীপ জালিবার



পুণা—পার্কভী দেবীর মন্দির

বধেই এবং সঙ্গত কারণ আছে, গার্ড বা ড্রাইভার কানী চৌধুরী মহাশয়ের আচরণের অসুস্থত্ব করণ করে নাই। অদ্ভুত ছাড়িয়া গাড়ী যখন অনাবৃত আকাশের নীচে বিস্তৃত বায়ু সেবিত স্বর্বাণালোক পরিপূর্ণ স্থানে জালিল তখন যেন নিঃশাস কেহিয়া বাঁচিলাম এবং

বিস্তৃত চিত্তে ও সুখনেও চারিদিকে চাহিয়া দেখি, সমতলভূমি ছাড়িয়া পাশ্চাত্যের উপরে অনেকখানি উর্দ্ধে গাড়ী উঠিয়াছে। পথ প্রান্তকারী ইঞ্জিনিয়ারের তারিক করিতেছি, এমন সময় পুনরায় নিবিড় অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল—কি বিপদ! একবার অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে আসিবার ক্লেদই বিদূরিত হয় নাই আবার সুড়ঙ্গ—“একত হুংসত ন বাবতঃ” এ যে দেখি তাহাই হইল। এক হুই তিন করিয়া সেবারে গণিয়াছিলাম, বোম্বাই হইতে পুণা পর্যন্ত পথটুকুর মধ্যে আর শতাধিক সুড়ঙ্গ আছে। এক একটি এত দীর্ঘ যে সত্য সত্যই খাসরোধ হইয়া



পুণা—এন্ড্রোপ গার্ডেন

আসিবার উপক্রম হয়। ক্রমে সুড়ঙ্গপথে গাড়ী বাইতেছে ক্রমে আমরা উর্দ্ধে উঠিতেছি এবং উর্দ্ধদেশে হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে সমতল ভূমির শতক্ষেত্র, বুদ্ধলতা, নদী ওড়গ প্রভৃতির দৃশ্য বড়ই সুন্দর মনে হয়, ঠিক যেন হার্ডিংএর পার্কভ্য রেলপথের ক্ষুদ্র সংস্করণ। ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছি, ক্রমে শীত বাড়িতে লাগিল, এবং খানাতলী নামক স্থানে যখন পহুছিলাম তখন বিলক্ষণরূপে শীতানুভব করিতেছিলাম, ওড়ার কোট দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত না করিয়া পারা গেল

না। শুনিলাম পুণা বোম্বাইয়ের মধ্যে ঐ স্থানটিই সর্বোচ্চ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। বোম্বাই সহরের অনেক ঘনী লোকের গ্রীষ্মাবাস খানাতলীতে রহিয়াছে, তাহার অনেক সপ্তাহান্তে কাবকর্ণের অবসরে একবার করিয়া খানাতলীতে গিয়া থাকেন। তথা হইতে রেলপথ কিছুদূর পর্যন্ত নীচে নামিয়াছে, তাহার পরেই পুণা পর্যন্ত সমতল ভূমির উপর দিয়া লৌহবস্ত্র চলিয়া গিয়াছে। পুণায় পহুছিবার পূর্বে কারকী ষ্টেশন পাওয়া যায়, অধুনা এই কারকীতে ইংরাজ গৈল্ডের স্মৃৎসং ছাউনি হইয়াছে—এই কারকীর মুক্কেই দ্বিতীয় বাজিরাও-এর সময়ে পেশওয়ারগণের গৌরব স্মৃতি চির অন্তরিত

হইয়া অতল অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। পুণা হইতে আটক পর্যন্ত যে পেশওয়ারগণের অপ্রতিহত প্রভাব একদিন ছিল, যে মহাদাঙ্গীরগণের ভুল বীৰ্য্যে একদিন রাজপুত ও মুসলমান সমভাবে কম্পাঙ্কিত কলেবর হইয়াছে, যে বারঙ্গীরের (বর্গীর) অশ্বপদধ্বনি শুনিয়া সমগ্র বঙ্গা একদিন ভীতভ্রস্ত হইয়া উঠিত, আজ তাহারা কোথায়?

ষাট পর্কতশ্রেণী পার হইয়া সমতল ক্ষেত্রের উপর

দিয়া রেল গাড়ী চলিতে লাগিল। কারকী ষ্টেশনে অল্পক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইবার পরে পুনরায় গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষতবেগে ফৈণ চলিলে, সুবিধান আর অন্ধকার রক্তপথে গাড়ী বাইবে না, কারণ সে সম্ভাবনা থাকিলে ক্ষতবেগে চলিত না এবং গাড়ীর অত্যন্তরের বাতিভলিও নিবাইয়া দিত না। কারকী হইতে গাড়ী একেবারে পুণা ষ্টেশনে দিয়া দাঁড়াইল, তখন বেলা প্রায় তিনটা হইবে। সেদিনে গাড়ী আজকার দিনের মত ক্ষত বাইত না, সেই অন্ত



মহাবালেশ্বর—গভর্ণমেন্ট হাউস

প্রাতে রওনা হইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে পঁহুঁছিতে হইল। আজ কাল Race special নামক একখানি ট্রেন হইয়াছে, ইহা প্রতি শনিবারে ঘোড় ঘোড়ের দিনে বেলা সাড়ে দশটার বোম্বাই হইতে রওনা হইয়া দেড়টার সময়ে পুণায় পঁহুঁছে—Restaurant Car ট্রেনের সহিত সংযুক্ত, ঘোড়ঘোড় বিলাসী ইংরাজ ও ভারতীয়গণের পানাহার সেই কারেই নির্বাহ হয়, সে ভ্রম পথ-মধ্যে আর বিলম্ব হইবার কারণ ঘটে না। দৈনিক ডাক গাড়ী এবং বাজীর গাড়ীও (প্যাসেঞ্জার ট্রেন) সেদিনের ভুলনার আজ ক্ষততর বেগেই বাইরা থাকে।

ছত্রপতি শিবাজীর বাধীনতা লাভ-প্রচেষ্টার পূণ্য-পুত এই পুণ্যকে, সহ্যদ্রি শৈলমালা পরিবেষ্টিতা নগর-রাজী এই পুণ্যকে দেখিবার অভিজ্ঞতা বহুকাল হইতেই আমার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। মহা-রাষ্ট্রের ইতিহাস বতই পড়িয়াছি, সে বাসনা আমার ততই বলবতী হইয়াছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণ করিবার সুযোগ এককাল হয় নাই, সে সুযোগ যে

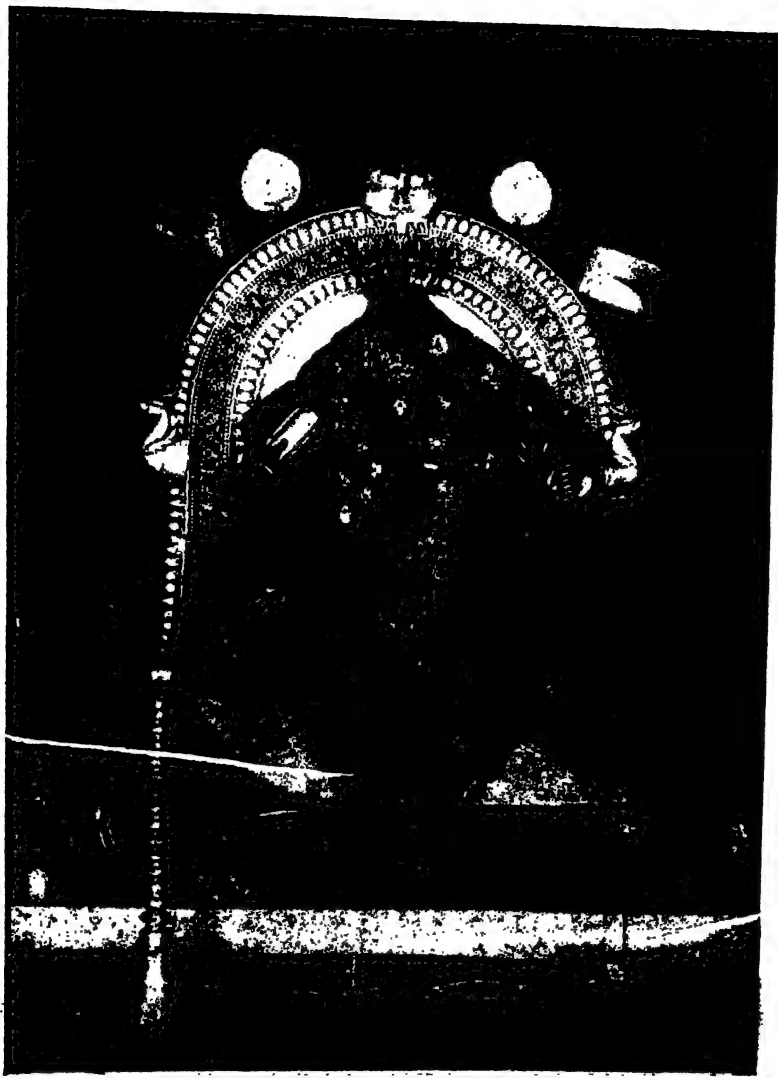
দিনে আসিল সে দিনটি আমার পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। পুণায় গাড়ী পঁহুঁছিলে দেখিলাম ষ্টেশনে লোক-রণ্য। কেহ আশ্রয় বন্ধকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া বাইতে আসিয়াছে, কেহ বা সেই ট্রেনে আনীত দ্রব্য সামগ্রী লইতে আসিয়াছে, কেহ বা অনাগত বন্ধুর অদর্শনে স্মিয়মান হইয়া চারিদিকে সেই অনাগতেরই সন্ধানে কিরিতেছে, যদি আসিয়াই থাকে, এই দূর-পরাহত আশার মোহে। আর এক দল লোক আসিয়াছে হোটেলের—ইংরাজী হোটেল এবং দেশীয় “আহার গৃহ” এবং “উপাহার গৃহ”র লোক। মহারাষ্ট্রে দেশীয় হোটেলগুলির বিদেশী নাম পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে—উপাহার-গৃহ বলিলে বুঝিতে হইবে সেখানে জলবোজের (Light Refreshments) ব্যবস্থা আছে, তুরী ভোজনের ব্যবস্থা নাই। আমাদের আগমনে বা অনাগমনে হর্ষামর্ষ বোধ করিবার মত দ্বন্দ্ব সেখানে কেহই ছিল না, আমরা সেই দূর দাক্ষিণাত্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত। দাঙ্গালী বলিয়া আমাদেরকে চিনিতে পারিলেও হয়ত বা কৌতূহল পরবশ হইয়া কেহ

কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও পারিত, কারণ সে দেশে বাঙালীর সংখ্যা কম, কেবল পুণার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছই একজন বাঙালী ছাত্র তখন এবং তাহার কিছুদিন পর পর্যন্ত ছিল, এখন আছে কিনা জানিনা। আমাদের পরিচ্ছন্ন ইংরাজী ধরনের, সুতরাং নিতান্ত কৃককার কিরিনী কিংবা দাক্ষিণাত্যে যাগকে “সুধার লোলা” অর্থাৎ reformed বলে, সেইরূপ কিছু তাবির লঙ্কাই সম্ভব, সেই ভক্ত কেহই আমাদের দিকে কিরিনী চাহিল না, কেবল ইংরাজী হোটেলের মাল্য ধরার হল আসিয়া টানাটানি করিতে আরম্ভ করিল। যে পাটাধারী চাপরাশীর পরিচ্ছন্ন অধিক জাঁকাল, আমরা তাহার সঙ্গে বাঙরাই স্থির করিলাম। কিনিষ পত্র গাড়ীতে উঠাইয়া আমরা সেই চাপরাশীর সঙ্গে চলিলাম। যে হোটেল গেলার তাহার নামটি তুলিয়া গিয়াছি। দেখিলাম হোটেলের ঘর দ্বার একতঃ ব্যবহৃত ভাল, কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হইল না। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ইংরাজী আহারে বাধা ছিল, সেই ভক্ত স্থির হইল, হোটেলের পরিচ্ছদের পরিবর্তন করিয়া “হিন্দু আহার গৃহে” ব্যবহার ভক্ত একজন বাইবে। বিনি গেলেন তিনি পাঠক পাঠিকা গণের পূর্ব পরিচিত শশীবাবু; এই শশিধেবরই রেল-পথের পর্বতরুদ্ধে, প্রবেশ কালে আলোর ব্যবস্থা দেখিয়া পূর্ণাভিব্যক্তি বামাচারী কানী চৌধুরীর দিবাভাগে লর্ডন আলিবার প্রসঙ্গ লইয়া রত্নরস করিয়াছিলেন। “হিন্দু আহার গৃহে” ব্যবস্থা করিতে গিয়া যে রত্নরস করিয়াছিলেন তাহাতে সে রাজ্যে ভোজ্যরস প্রায় কাহারই অর্থে ঘটে নাই, সে কথা বলিতেছি।

শশীবাবু হুতি গিরান চান্দর পরিয়া খাঁটি বাঙালী বাবু সাজিয়া গাড়ী করিয়া গাড়ারানের সাহায্যে এক মারাঠী হোটেল গেলেন এবং প্রস্তরের উত্তরে জানিলেন যে, আহার পাওয়া বাইবে। আহার প্রাপ্তির আশার আনন্দে, কুখার্ত ব্রাহ্মণ, তেজ্য সামগ্রীর সন্ধানে নানা প্রশ্ন করিতেছিলেন। সকল কথাই হিন্দীতে

চলিতেছে, কারণ শশীবাবু মারাঠী ভাষা জানেন না, এবং হোটেলের মালিক ইরোজী ভাবার অনভিজ্ঞ। কথা শ্রবণে শশীবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “যেখো জি, মজি উজি হার তো?” এরূপ হিন্দীকে বিভ্রত হিন্দী না বলা গেলেও “মজি উজি” শব্দের অর্থ বোধ হইতে ব্রাহ্মণের সুহৃৎ সময়ও লাগে নাই। ব্রাহ্মণ ছই চকু কপালে তুলিয়া “মজি! মজি! তুম্ মজি খাতে হো, তুম্ ব্রাহ্মণ হো? কতি নাই, তুম্ ইহাঙ্গে যাও, যাও, আতি যাও, চলা যাও।” ইত্যাদি বলিতে বলিতে শশীবাবুকে এক প্রকার অর্ধচন্দ্রে দিয়া বাহির করিয়া দিল। কুখার্ত ব্রাহ্মণ রানমুখে আসিয়া আমাদের হোটেলের বখাবৎ বর্ণনা করিলে অপর সংলগ্নের মন যে আনন্দ্যসে পরিপ্লুত হয় নাই, একথা বলাই বাহুল্য। আমাদের সেক্রেটারী বাবু বখাওঁই জুড় হইয়া বলিলেন, “কে তোমাকে মাছের কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিল হে? তোমার মত নিকোঁথ ত খুঁজিয়া পাওয়া যায়।” শশী কহিল, “মহাশয়, ঈশানের রাঁধা মাছ ত অনেক খাইয়াছি, তাবিলাম মারাঠী ব্রাহ্মণের কাণ দেওয়া মাছটা কেমন একবার দেখিতে হইবে, যদি মাছ না রাঁধিয়া থাকে তাহা হইলে ইচ্ছা ছিল রাঁধিতে বলিব, সেই ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এলি মজি উজি হার?” সেক্রেটারীবাবু কহিলেন, “এখন খাও তোমার মজি উজি।” বাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, উপার নাই, সে রাজিতে পুনরায় এক “উপহার গৃহে” গিয়া কথকিং জলযোগ করতঃ সকলে কোন মতে রাত কাটাইলেন, পরদিবস ব্যবস্থা করিবার ভক্ত শশীকে বিশ্বাস করিয়া পাঠান হয় নাই।

পুণার পূর্ব গৌরব অন্তর্হিত হইয়াছে। বেদিন বাজিরাও পেশওরে তাঁহার লক্ষ “বোড় চক্কর” কাণ্ডারাজ দেখিবার সময়ে সগর্বে বলিয়াছিলেন “এখন যদি আকাশও তাবিয়া পড়ে তবু কিছুকাল আমার অখারোহী নৈস্তের বর্ষাকলকে তাহাকে ধরিতা রাখা বাইতে পারে।” সে কাজবীর্ষ্যপর্কিত সৌভাগ্যশালিনী পুণা নগরী আজ স্থতিমাত্রে পর্য্যবসিত, মহারাষ্ট্রসুহৃৎমনি পুণা আজ



মহাবালেশ্বর—নিগাজীর ইষ্টদেবী ভবানীমূর্তি

নামসাজাবশিষ্ট। পুণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী “পার্বতী” কেবল অতীতের সাক্ষী স্বরূপেই হইয়া শৈল শিখরস্থিত মন্দিরাত্যন্তরে বিরাজমানা, আর কিছুই নাই; নন্দন-নিব্বা হীরাবাগ, ইন্দ্রতবনতুল্য পেশওয়ার গ্রাসাদ, সমস্তই আজ অগ্ন-কাহিনী! সুবিশাল নগরীর প্রান্তর নির্মিত ক্ষুদ্র এবং সুদীর্ঘ রাজ-পথ টকাবোগে অতিবাহন করিয়া পার্বতী থেলের পানমূলে দর্শককে নামিতে

হয়। তাহার পরেই পর্বতারোহণ অত্র প্রান্তর বিনির্মিত বিশাল সোপান-শ্রেণী; সেই সোপান বাহিয়া পর্বত-চূড়াহ মন্দিরের নিকটে পহুছিতে মাল্লবের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। সুনিরাছি পেশওয়ারগণ পার্বতী দর্শনার্থ প্রতিদিন হতিপুষ্ঠে বসিয়া সেই সোপান আরোহণ করিতেন,—প্রত্যেকটি সোপানের পরিসর এবং গঠন প্রণালী দেখিলে মনে হয় সত্যই হস্তী উঠিবার

জন্য এই সোপানাবলী প্রস্তুত হইরাছিল। পেশওরে-
গণ সকলেই আজ স্বর্গগড়, বংশ লুপ্ত হইরাছে, মহা-
রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-স্বর্বা বহুকাল অন্তর্ভুক্ত হইরাছে,
“মাউলী” সৈন্যের কাজবাহু পুনরায় হলকর্ষণে নিযুক্ত।
কিন্তু অত্যাচার দিনের এই শৈলসোপানাবলী আজও
মানুষকে পার্শ্বতীর পাদমূলে প্রণামার্থ লইয়া বাইতেছে
—মানুষ বার কিন্তু তাহার করচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে বহু
সময়ের প্রয়োজন।

পার্শ্বতীর মন্দিরের চতুর্দিশে অল্পচক্র প্রাকার-
পরিবেষ্টিত এস্তর নির্মিত বিস্তীর্ণ অলিন্দ। এই
অলিন্দে দাঁড়াইলে সমগ্র পুণানগরী দেখিতে পাওয়া
যায় এবং চতুর্দিকস্থ নতোরত প্রস্তুত প্রান্তরের উপর
দ্বিরা চক্ষু দিক্‌চক্রবৎ প্রসারিত হয়। শুনিরাছি পুণার
অধিষ্ঠাত্রী পার্শ্বতীর দেবীর মন্দিরের বহির্ভাগে সর্গারবদ
মণ্ডারমান হইয়া দ্বিতীয় বাজিরাও পেশওরে কার্শ্বকীর
মুদ্র দর্শন করিয়াছিলেন।

ছত্রপতি শিবাঙ্গি মহারাজ, মহারাষ্ট্রকেশরী তানাজি
মানসুয়ে ওড়তি বীরেন্দ্রবর্গ জীবন তুচ্ছ করিয়া অসি
হস্তে রণক্ষেত্রে সৈন্তচালনা করিয়াছেন; বেদপত্রারণ
ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য শাস্ত্রত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির উদ্ধার-
কল্পে একদিন শত্রুহস্তে দৈন্তপরিচালনের তার গ্রহণ
করিয়াছিলেন, উগবীতধারী ব্রাহ্মণ বাজিরাও লক্ষসৈন্তের
অধিনায়ক হইয়া বিজয় গর্ভে বিপুল বাহিনীর নেতৃত্ব
করিয়াছেন; ভাস্কর পণ্ডিতের অথগদ্যধ্বনি সুরশোভাবাদের
মঙ্গলমশারী আলীবর্দীর স্তম্ভতন্ত্রাতুর চক্ষুকে বারবার
উজ্জ্বলিত করিয়াছে; আর সেই বাজিরাওয়ের স্বর্ণ-
সিংহাসনে সমুপবিষ্ট, তাঁহারই নামধারী দ্বিতীয় বাজিরাও
অসিহস্তে সমুখবৃদ্ধে সৈন্ত পরিচালনা না করিয়া নিরাপদ
পর্শ্বতীর্থেরে দাঁড়াইয়া নারকহীন বীর সৈন্তের পরাক্রম
নীরবে দর্শন করিয়াছেন, কালের কি অদ্ভুত মহিমা!

নির্ধাক্ষিতপ্রায় হিন্দুর বীৰ্য্যবহি মহারাষ্ট্রে আত্ম-
লাভ করিয়া একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কোকণ
গিরিমালার শৃঙ্গে শৃঙ্গে সমুপস্থিত “হর হর, বম্ বম্”
রব হিমশৈলের সন্নিহিত স্তম্ভ প্রকম্পনের গিরিগাজে

একবার প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্ররূপের হৃদয়-
শোণিতের তর্পণে পানিপথ ক্ষেত্রের বাসুকীরামি
একদিন লোহিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সেই
মহারাষ্ট্রের অধীশ্বর শেষ পেশওরের কাপুরুষতার সব
শেষ হইয়া গিয়াছে, ছত্রপতির প্রাণাহতিগুটি হিন্দুবীর্ষের
পবিত্র হোমায়ি আধ নিঃশেষে নির্ধাক্ষিত হইয়াছে।
এই পুণার বিবাহের শোভাযাত্রার ছলে স্বর সংখ্যক
মাউলী সৈন্ত সহ শিবাঙ্গি মহারাজ একদিন মোগল
সৈন্তাধ্যক্ষ শায়েস্তা খাঁর শিবির আক্রমণ কর্ত্ত প্রবেশ
করিয়া ছুনিবার পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন; নৈশ
আক্রমণে, নির্ধাক্ষিত নিজার ব্যাঘাতে পলারনগর স্তম্ভো-
ধিত শায়েস্তার করাঙ্গুলী ছিন্ন হইয়াছিল এই পুণার।
হিন্দু বীরত্বের, কাজবীর্ষের লীলাভূমি এই পুণানগরী
হিন্দুর পক্ষে যথার্থই পুণ্যভূমি। কিন্তু সে ভূমির গৌরব-
চিহ্নগুলি আজ নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে; দেখিবার,
দেখাইবার আজ আর কিছুই নাই। সেই পুণ্যক্ষেত্রের
রক্তরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া, কীর্ত্তি গৌরবের কাহিনী
স্মরণ করতঃ অশ্রুমোচন কবিবার ক্ষমতা হিন্দুর আছে
—তাহাই বা আজ করজনে করে?

পুণার অনতিদূরে মহারাষ্ট্রসিংহ শিবাঙ্গির সিংহগড়
ভূগর্ভ—মেঘমুক্ত দিনে দিগন্তের দিকে সচেষ্ট দুটি নিক্ষেপ
করিলে শুনিরাছি সিংহগড় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু
আমি পারি নাই কারণ আমার দুটি ক্রীণ। শুনিলাম
সিংহগড়ে বাওয়া যায়, কিন্তু পথ ভ্রম, বান বাহনের
সুবিধা সেদিনে ছিল না। স্তম্ভরাং চেষ্টা করিয়াও
কৃতকার্য হইতে পারি নাই। বোম্বাই প্রদেশে আমি
বহুবার গিয়াছি কিন্তু সিংহগড় দর্শন করা আমার
ভাগ্যে ঘটে নাই। শুনিলাম পথের ভ্রমতা পূর্ববৎ
রহিয়াছে এবং সরকারি “আর্কিয়লজিক্যাল” বিভাগের
সহায়তা না পাইলে সে বিজন বলে গমনাগমন এবং
তথ্য অবস্থান কালের ভোজ্য পানীয় সংগ্রহ সহজ
সাধ্য নহে। বহুবর ঐশ্বর্য্য রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়
মহাশয় বোম্বাই প্রদেশে আর্কিয়লজিক্যাল বিভাগের কর্ম-
কর্ত্তা হইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আকিস এবং

আবাসস্থান ছিল পুণার, বহুবর সিংহগড় দেখিরাছেন এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া দেখাইবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে প্রদেশে অবস্থান কালে আমার পুণার বাওরা ঘটে নাই, গেলে নিশ্চয়ই বহুবর কৃপার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইত। পুণার “বাঁধবাগ” (Bund garden), এস্টেটস গার্ডেন প্রভৃতি বাহা কিছু দেখিবার সামগ্রী সমস্তই আধুনিক। পুরাতনের মধ্যে কেবল সর্বকালে বিস্তারিত, মহাকাল মহাবী, পর্বত-হ্রিতা পর্বতী, পার্কতোণরি আজও সমভাবে সমাসীন।

মহাবালেশ্বর পুণা হইতে অধিক দূর নহে, এবং এই কোকণ গিরিমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উপরে বোম্বাই গভর্ণমেন্টের গ্রীষ্মাবাসের প্রাসাদ সংস্থিত। গিরিশৃঙ্গ বলিলে বাহা বুঝায় মহাবালেশ্বর ঠিক তাহা নহে—পথ ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিয়া সর্বোচ্চ শিখরে পহুঁচিয়াছে। কিন্তু উহার শীর্ষপ্রদেশ প্রায় সমতল, গাড়ী ঘোড়া চলে এবং আজকাল মোটর গাড়ীও অনায়াসে সেখানে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। ঘোড়ার গাড়ী ও মোটর চলিবার মত পাহাড় ভারতবর্ষে কমটি মাত্র আছে, বোম্বাই প্রদেশে মহাবালেশ্বর, মজ্জালা উটকামণ্ড এবং আসামে শিলং। আজ পুণ হইতে মহাবালেশ্বরে মোটর যোগেই বাওরা যায়, অনেক গির্জাও থাকেন এবং আমরাও গিয়াছি। কিন্তু যে দিনের কথা এখানে বলিতেছি সে সময়ে ভারতে মোটর আকাশ-কুসুমবৎ ছিল। পুণা হইতে রেলযোগে ওরাটার নামক ঠেসনে গিয়া তথা হইতে চল্লিশ মাইল পথ টাঙ্গার বাইতে হইত। মহাবালেশ্বরের সম্মুখিত অপর একটি শৃঙ্গের উপরে শিবাজির “প্রতাপগড়” দুর্গ, এবং সেই চুর্ণ

আলও শিবাজির ইষ্টদেবী, তাঁহার সর্বাভিষ্টমাজী, মহামহেশ্বরী তবানীর মূর্তি বিরাজমান। শিবাজি এবং বিজাপুরের ইতিহাস-বিভাজিত এই প্রতাপগড় দেখিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সেবারে বাইতে পারি নাই, পরে গিরাছিলাম, কিন্তু সেবারে পুণা হইতে হারজাবাদে গিরাছিলাম, সেই কথাই পূর্বে বলি।

পুণা শেব করিলাম। কিন্তু বহুদিনের সঙ্কিত আশা লইয়া গিরাছিলাম, তাবিরাছিলাম ভারতের শেব স্বাধীন হিন্দুনরপতির রাজধানী পুণা নগরী দেখিরা নিরতিশয় আনন্দ পাইব। কিন্তু তাহার পরিবর্তে মন বিবাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দর্শনীর পদার্থ বিশেষ কিছু নাই বলিয়া এই বিবাদ তাহা মনে হয় না, কারণ হিন্দুর বহুতীর্থে আজ প্রাচীন মন্দির দেবারতন প্রভৃতি কিছুই নাই, মোক্ষদারিকা সপ্তপুরীর মধ্যে অবোধ্যা, কাকী, অবতী, মায়া প্রভৃতি পবিত্রতম তীর্থভূমিতে দেখিবার মত উন্নতশীর্ষ প্রকাণ্ডকার দেবারতন নাই বলিলেও হয়; কিন্তু সে সকল স্থানে মন বিবাদ-ভারাক্রান্ত হয় না, অন্ততঃ আমার হয় নাই। পুণা নগরী দেখিবার পরে মনে হইতে লাগিল, অল্পদিন পূর্বেই কি ছিল, আর আজ কি হইয়াছে! বোধ করি বিবাদে অবসন্ন-মন হইবার ইহাই কারণ। সিংহগড়, মহাবালেশ্বর, প্রতাপগড় প্রভৃতি স্থানে বাইবার সুবর্ণা বধন আপাততঃ হইল না, তখন আজ পর্য্যন্ত জীংগু মুসলমান রাজ্যের রাজধানী দক্ষিণ হারজাবাদ দেখিবার জন্য পুণা হইতে বাজা করিলাম।

ক্রমশঃ

ঐজগদিস্ত্রনাথ রায়।

শিকার ও শিকারী

(পূর্বানুবৃত্তি)

হাওলা শিকার

সব শিকারেই—বিশেষতঃ মহিষ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকারে আর একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। এইসব শিকারে সর্বদাই নূতন টোটা (cartridge) ব্যবহার করা কর্তব্য। পুরানো হইলে তাহার ব্যাপের রং খারাপ হইয়া যায় ও তিতরের বাকন কমিয়া থাকে। সে অবস্থায় অনেক টোটা আগুলাই হয় না। কোন কোন সময় এই রূপ পুরানো কার্তুসের কাপ ফুটিয়া এক আধ সেকেণ্ড পরে হঠাৎ আগুলাই হয়; ইহাকে hang fire বলে। ইহাতে নিশানা ঠিক থাকে ন'। Miss fire ও hang fire উভয়েই তুল্য বিপদের আশঙ্কা আছে। চাক্ষুর সময় এরূপ হইলে বিপদের গুরুত্ব যে কত হয় তাহা ভুক্তভোগী মাঝেই জানেন।

হাটিয়া শিকারে এরূপ হইলে সময় সময় শিকারীকে নিজের জীবন দিয়াও ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এরূপ ঘটনা বিরল নহে। সামান্য ক্লগণতা করিয়া ধনের লোভে প্রাণ দিয়া লাভ নাই। যদিও অনেক সময় প্রাণ যায় না বটে, তবু আশঙ্কার স্থলে অল্পের জন্ত ক্লগণতা না করাই ভাল। যে শিকারের উদ্দেশ্যে এত আয়াস ও অর্থব্যয়, সঙ্গে সঙ্গে বিপদ সম্ভাবনাও আছে, সেই শিকারও এই কার্পণ্যের কলে 'মিস' করিতে হয়।

'মিস্ কারার' হইয়া আমি নিজে হৃদশাশ্রিত না হইলেও, বহুস্থানে ভাল ভাল শিকার 'মিস্' করিয়াছি। হরত ভবিষ্যতে সেরূপ সুযোগ পাইবার সম্ভাবনা আর নাই।

আর এক রকমে আমি ২৪ বার খুব জখ্ম হইয়াছি। একবার তীতিমত বিপদেই পড়িয়াছিলাম,



১ জুলাই ১৯৩৪ চাট্টাবনকারী মহিষ আহত হইয়া পলারমান

অনেক ঘোড়াওয়ালা বন্দুকের অথবা রাইফেলের দুইটিকে চাপের lock-এর উপর ঝুঁকিয়া special safe দেওয়া থাকে। উহা বন্ধ থাকিলে কিছুতেই বন্দুকের 'ঘোড়া' পড়ে না ও double cock (হুইয়া'র) উঠান যায় না। আগরাজ করিবার সময় এই safe টানিয়া খুলিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই duplicate safeই একবারান্তরে অনেক সময় তরানক unsafe হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় ভুলে ইহা খোলাই হয় না। অথবা খুলিয়া রাখিলেও, কোন কোন সময় হাওদার কাঁকি লাগিতে লাগিতে বন্ধ হইয়া যায়।

আমার একটা রাইফেলের এই রকম safe ছিল। একবার আসামে এইরূপ safe লাগানো অবস্থায় আমি একটা বাঘের উপর 'লব্‌লবি' (trigger) টিপিতে টিপিতে উহা তালিয়াই ফেলিলাম; তবু আগরাজ হইল না। একাঙ বাঘ মিনিট খানেক হাতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। তখন অপর বন্দুক তুলিয়া মারিবার বুদ্ধিও বোগাইল না। কাবেই বাঘটিকে হারাইতে হইল। Safe যে বন্ধ ছিল তাহা আমার খেয়ালই ছিল না। এ সময় বাঘটা চার্জ করিলে কি-বে বিপদ হইত তাহা কল্পনা করিলে ছৎকল্প উপস্থিত হয়। সে বুদ্ধি ঘটে আসিলে অপর বন্দুক উঠাইয়া ফারার করিলাম; কিন্তু বাঘ তখন বহুদূর চলিয়া গিয়াছিল।

আর একবার—তখন আমি নূতন শিকারী, সেই আমার প্রথম শিকার,—আমাদের পার্টিতে অনেক শিকারী ছিলেন। তখনও নূতন ধরণের নানা শ্রেণীর বন্দুক বাহির হয় নাই, আমারও ছিল না। আমার পৈতৃক সম্পত্তি যে কয়েকটা ছিল তাহা দিয়াই শিকার করিতাম। এই সব বন্দুকের মধ্যে safe দেওয়া ১৬নং একটা hammer rifle ছিল, উহা নির্যাই তখন শিকার করিতাম।

একদিন আমরা হরিণ শিকারে বাহির হইরাছি; খানিকদূর জঙ্গল বাঁট করিয়া বাওয়ার পর আমার সম্মুখে একাঙ এক বয়র (পুং মহিষ) হড়মড় করিয়া

বাহির হইল। তখন হরিণ মারার জন্য প্রস্তুত ছিলাম বলিয়া আমার হাতে একটা snider rifle ছিল, তাহাও আমার একনলা। মহিষ দেখিবামাত্রই গুলি করিলাম। গুলির সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য হইয়া শিং নিচু করিয়া সে এত বেগে আমাকে চার্জ করিল যে, আমি আর তাড়াতাড়ি অস্ত্র বন্দুক লইবার অবকাশ পাইলাম না। হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া হাওদা হইতে ১৬নং রাইফেল উঠাইয়া লইলাম; কিন্তু তখন মহিষ আমার হাতীর পেটে শিং বিধাইয়া দিয়াছে। আমার প্রিয় হস্তিনী 'মনমতী' শূন্যাবাস্তে কাতর হইয়াও, পাছে তাহার প্রভুর বিপদ হয় এই আশঙ্কায় এত দীর তাবে দাঁড়াইয়া ছিল যে, আমার হাতের বন্দুক দিয়া পুনরায় গুলি করিবার কোন অস্থবিধা বোধ করি নাই। কিন্তু হার, সমস্তই বৃথা হইল। সেই safe দেওয়া বন্দুকের 'লব্‌লবি' টিপিতে টিপিতে এবারও বাঁকাইয়া ফেলিলাম। সেই সময় আমার অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, হরত আর একটু হইলেই হাতী শুদ্ধ উন্টাইয়া পরিতাম। অস্ত্র হাতী হইলে নিঃসন্দেহ ইহার বহু পূর্বেই পড়িয়া বাইতাম।

সৌভাগ্য ক্রমে আমার হাওদার পাশে আর এক শিকারী ৬টমেশচার সেন মহাশয় ছিলেন। ইনি আমাদের camp ডাক্তার, তিনি উপযুক্তপরি ছুই গুলি করিয়া 'মহিষাসুর' বধ করিলেন।

পরে সেই বন্দুকের safe একেবারে বন্ধ করাইয়া আনাইয়াছিলাম এবং তদবধি উহা আর বড় ব্যবহার করিতাম না। তাহার পর আমি নানা শ্রেণীর ভাল ভাল বন্দুক কিনিরাছি; এই সব ছোট বন্দুক আর আমার পছন্দ হইত না।

সত্য কথা বলিতে হইলে—লোকে বলে "নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা"—আমার বর্গীর পিতৃদেব এই সকল বন্দুক দিয়াই কত যে হরিণ, মহিষ ও বাঘ ভালুক মারিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। আর আমি 'লায়েক' হইয়াই এই সকল ছোট বন্দুক অপছন্দ করিয়া ফেলিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি কেবল ভাল

ridic হইলেই শিকার হয় না—শিকারীরও ক্রমতা থাকা চাই।

আরও ২১১ বার মহিষের মুখে পড়িয়াছি; কিন্তু তাহা এত সাংঘাতিক হয় নাই। ইহারা হাওনা শিকারে প্রায়ই চার্ক করে না। কদাচিৎ কোন কোনটা ভয়ানক হইয়া উঠে।

বর্গীর মহারাজ সুর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় একবার ঠিক এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মহিষ তাহার হাতীর vagina চিরিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর হইতে ঐ হাতী মহিষ শিকারে অত্যন্ত ভয় পাইত; কিন্তু অন্য শিকারে পূর্ব্ববৎ দৃঢ় ছিল।

আম্র একবার আমি বর্ষাকালে নৌকা করিয়া মহিষখলা শিকার করিতে বাই। ইহা ৭৮ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। সেবার পাটিতে কেবল আমার স্বেহাম্পদ বন্ধু ত্রীহট্টের জমিদার পরলোকগত মহীউদ্দিন চৌধুরী ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না।

একদিন ‘কালাগড়’ নামক এক জঙ্গলে একপাল মহিষের সংবাদ পাইয়া আমরা শিকার করিতে বাই। অল্প কালেই মহিষের সন্ধান হইল। প্রকাণ্ড বরারকে আমি গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই সে চার্ক করিয়া এত বেগে আসিয়া আমাদের সন্নিহিত ‘খুঁজি’ আম্রজঙ্গলী মুন্সী যে হাতীতে ছিল তাহার পেছনের ছই পারের ভিতর দিয়া শিং ঢালাইয়া এত কোরে ওঁতাইতে লাগিল যে হাতী প্রায় উল্টাইয়াই পড়ে। বয়স্কাতর হস্তিনীর বিকট চিংকারের সঙ্গে সঙ্গে মুন্সীর “এ আল্লা মহিলাম! এ আল্লা মহিলাম!” (মরিলাম) ও জঙ্গলের ‘হড়, হড়’ শব্দে আমি বত সত্তর সত্তর তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, মুন্সী গদির দড়ি ধরিয়া এক দিকে ঝুলিয়া পড়িয়া ঐরূপ চোঁড়াইতেছে। ও দিকে হাতীর ত এই অবস্থা! আমার হাওনা মতিশাল নামক এক মাকনার উপর ছিল। আমার গুলি করিবার পূর্ব্বই মাকতার ইন্দিতে সে এত বেগে ওঁড়

দিয়া মহিষকে ধাক্কা দিল যে, মতিশাল চিট্‌কাইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল। এদিকে আক্রান্ত হাতীও উর্ধ্বদানে মৌড়াইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে মুন্সী ঝুলিতে লাগিল। মুহূর্ত্তবিশেষ না করিয়া উপস্থাপরি আমি ছই ফারার করিলাম। ইহার পরই আমার বন্ধু চৌধুরী সাহেব আসিয়া উহাকে নিঃশেষ করিলেন।

অনেক সময় মহিষ বিলা কাঃপেও চার্ক করে। বাঘের হাতে রক্তা পাইলেও, মহিষের চার্ক খুব পূর্ব্ব পূণাকল না থাকিলে রক্তা পাওয়া কঠিন। বাঘ অনেক সময় থাথা দিয়া বা আঁচড় কামড় দিয়াও ছাড়িয়া যায়; কিন্তু মহিষ, একবার ধরিতে পারিলে শেষ না করিয়া ছাড়ে না।

একবার আসামে, ‘চুনারিঘাট’ নামক স্থানে আমরা camp করি। সেখানে একদিন শিকারে বাহির হইয়া সেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহাই লিখিতেছি।

একদিন শিকার করিয়া আমরা তাঁবুতে ফিরিতেছি, কতক শিকারী ও হাতী আগে চলিয়া গিয়াছে, কতক পাছে আসিতেছে এইরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে আমরা বাইতেছিলাম। মজুবাবু, রাজা জগৎবিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও আমি পাশাপাশি তিন হাওনার নানা রূপ গল্পগব্ব করিতে করিতে বাইতেছিলাম। ব্রহ্মপুত্রের ‘চরের’ মধ্যে কাশবনে একটা Florican (চরণ) পাখী উড়িতে দেখিয়া, মজুবাবু আর লোভ সত্তর করিতে পারিলেন না, একটা হস্তার বন্দুক হাতে লইয়া নামিয়া পড়িলেন। পাখীটা এক একবার উড়িয়া খানিক দূরে গিয়া বলিতেছে, আর তিনি উহাকে পাছু লইতেছেন। এইরূপে তিনি আমাদের হাতী হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছিলেন। আমরাও ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। তখন কেহ বলিতেছিল “আমরা চলিয়া বাই”, কেহ বা আর একটু অপেক্ষা করিতেও বলিতেছিল। যদি আমরা সভাই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া বাইতাম, তবে হয়ত উহাই চিরজীবনের জন্য ছাড়াছাড়ি হইত। এই ভাবে

কতকদূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম যে কাশ্বন হইতে এক প্রকাণ্ড মহিব উঠিয়া দাঁড়াইরাছে। আমরা প্রথমে উহাকে পালিত মহিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ নিৰ্জন স্থানে পালিত মহিব আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহাও আলোচনা করিতে লাগিলাম। মিনিটখানেকের মধ্যে দেখা গেল, মহিবটা শিং নীচু করিয়া, মজ্জাবুকে লক্ষ্য করিয়া চার্জ করিয়াছে।

সৌভাগ্য যে, তিনি মহিব হইতে অনেক দূরে ছিলেন; নচেৎ সেদিন আর তাঁহার রক্ষা পাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। আমরা তখনই সকলে মিলিয়া চোঁচাইতে চোঁচাইতে তাঁহার পিছনে উর্দ্ধ্বাসে হাতী ছুটাইলাম। আমরা হাওয়ার প্রতিকূলে ছিলাম বলিয়াই এত চীৎকারও তাঁহার কাণে পৌঁছিতেছিল না। আমার হাওনা সেদিন ‘জুলিয়া’ নামী এক অতি দ্রুতগামিনী হস্তিনীর উপর ছিল। এই হাতী এত বেগবতী ছিল যে, অনেক সময় সে তাড়াটিয়া গাড়ীর সহিতও ২।৪ মাইল রাত্তা দৌড়াইয়া বাইতে পারিত।

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আমরা মহিবের কাছে বাইতে পারিলাম না। তবে অনেকটা নিকটবর্তী হইয়াছিলাম। ইহার পর এমন সন্ধান সময় উপস্থিত হইল যে, আর একটু পরেই মজ্জাবুকে ধরিয়া কেলে আর কি! তখন নিরুপার হইয়া রাত্রা জগৎকিশোর ও আমি উভয়েই হাতী দাঁড় করাইয়া, খুব নিশানা করিয়া দূর হইতেই ছুই গুলি করিলাম। তগবানের অশেষ করুণা যে আমাদের গুলি ব্যর্থ হয় নাই; পক্ষান্তরে খুব ভাল ফলই হইয়াছিল। আহত হইয়াই দ্রুতমন্ মজ্জাবুর দিকে আর না গিয়া অল্প দিকে দৌড়াইল। আমরাও তখন উহার পাছে পাছে দৌড়াইয়া, গুলি বর্ষণ করিতে করিতে উহাকে নিপাত করিলাম। বলা বাহুল্য মজ্জাবুও পরে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

মজ্জাবু যে এইরূপ সাংঘাতিক অবস্থার পড়িয়া-ছিলেন তাহা তিনি বন্দুক আগরাজের পূর্বে টেরই

পান নাই। তিনি কিন্তু এক মনে পাখীটাকেই অনুসরণ করিতেছিলেন।

মেহের উল্লা নামক আমাদের সনের স্থানীয় প্রসিদ্ধ শিকারী ও ‘জুলি’র নিকট পরে জানিতে পারিলাম যে, এই মহিবটা ঐ অঞ্চলে ইতিপূর্বে ২০টি মজ্জবু মারিয়াছিল। নিরীহ লোকেরা খড় কাটিতে গিয়া অকালে শ্রাণ দিয়াছিল। ইহার পর হইতে মজ্জাবু আর কখনও এ ভাবে হাঁটিয়া বাইতেন না; সর্বদাই সঙ্গে একটা প্যাড হাতী রাখিতেন।

এই জাতীর খুনী মহিবকে মার্কী মহিব বলে। বাধানের পালিত কাছর মহিবের মধ্যেও এইরূপ মার্কী মহিব আছে, তাহাদের সমুখের এক পারে কাঠের কঁুদা বাঁধা থাকে, উহা নিয়া তাহার বেনী দৌড়াইতে পারে না।

এখনও আমার trophyর মধ্যে ঐ মহিবের মাথাটা রক্ষিত আছে। বখনই উহাকে দেখি, তখনই যেম উহার জীবিত কালের সেই ভীষণ দৃশ্য বারোকেপের ছবির মত আমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

এখানে অপ্রাণজিক হইলেও একটা গল্প বলিবার লোক সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

সেবার আমরা আসামের ‘খলসিয়ার তিটা’, ‘চুপানীর বাট’ প্রভৃতি অনেক স্থানে শিকার করিয়া বাড়ী কিরিবার সময়, আমাদের হাতী, গরুর গাড়ী ও অধিকাংশ লোকজন, হাঁটা পথে তুড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়া কিরিবার উপদেশ দিয়া, কতক কতক লোকজন সঙ্গে গোরাগপাড়া হইতে দীঘারে উঠিলাম। আমাদের সঙ্গে সেইবারের শিকারলব্ধ বাঘের চামড়ার মাথা ও হরিণের ভাল ভাল শিং প্রভৃতি অনেক ছিল।

শিকারপাটী কোন স্থানে বাতায়াত করিবার সময় সর্বদাই পাশ্চাত্য জাতি কর্তৃক বেশ সমাদৃত হইয়া থাকেন। অনেক সময়, বাঘ ও হরিণের কাঁচা চামড়া ও মাথা অত্যন্ত হুর্গন্ধ সত্ত্বেও তাঁহারা বিরক্ত না হইয়া বরং বখেট প্রীতির চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ইহার কারণ কেবল পাশ্চাত্য জাতির স্বভাবসিদ্ধ

শিকারপ্রিয়তা। কিন্তু কোন কোন স্থলে আবার কেহ কেহ “নেটিভ” বিষয়-বিষে এতই অর্জরিত যে, এই সব বিলাস বাসনে বা অস্ত্র কিছুতেও তাঁহারা কণিক বিধ উদ্গিরণ না করিয়া কিছুতেই শান্তি পান না।

হুর্ভাগ্যক্রমে ঐ জাহাজে ৩৪টা সাহেব ও ২০টা মেম ছিলেন। তাঁহারা পূর্ক হইতেই জাহাজের ‘ক্যাবিন’ গুলি দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। আমাদের দলবলও কম ছিল না। ৬৭টা প্রথম শ্রেণীর আরোহী ৪৫টা দ্বিতীয় শ্রেণীর। ইহা ছাড়া চাকর বাকরও ২০২৫ জন ছিল। ক্যাবিন গুলি অস্ত্রারতাবে আবদ্ধ দেখিয়াও, সাহেবদিগকে বিরক্ত না করিয়া আমরা ঈমারের সামনের ডেকে করাস বিছাইয়া গইলাম।

তখন চৈত্র মাস, ক্যাবিনের গরম ভোগ করা অপেক্ষা বরং এখানে আমরা আরামই বোধ করিতে-ছিলাম। আমরা কতকগুলি নেটিভ, জাহাজের ডেক দখল করিয়া সাহেব মেমদের আশেপাশে উপভোগ ও বৈঠকের সুবিধা নষ্ট করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় মনে মনে আমাদের উপর তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এই সমস্ত খেতকার বীরপুরুষদের মধ্যে একজন কিছুতেই মনের ঝাল না ঝাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না।

সকাল বেলা আমরা ডেকের করাসে বসিয়া চা পান অন্তে নানারূপ গল্পগুজব করিতেছি। আমাদের মধ্যে একজন তাঁহার গড়গড়াতে পরম আরামে ঘুমপান করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই খেতাব পূজব পশ্চাৎ দিক হইতে চোরের মত আসিয়া গড়গড়া হইতে ‘সরপোখ’ (চাকুন) সমেত কয়েকটা টপ করিয়া তুলিয়া গইয়া ব্রহ্মপুত্র গর্ভে বিসর্জন দিয়া উদ্ভ্রান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। এত কাণ্ড করিয়াই সে যেন বড় একটা কিছু বাহাজুরী করিয়াছে এই ভাব দেখাইয়া, অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে তাহার সঙ্গীদিগের সহিত হাসি ভাষায়া করিতে করিতে সেসুনের ভিতর দিয়া গিয়া যে বাহার কেবিনে ঢুকিয়া

পড়িল। এত তৎপরতার সহিত কাণ্ডী সম্পন্ন হইল যে আমরা সকলেই একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। কোন প্রতিকার করা দূরে থাকুক কিছু বলিবার অবসরও পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য আমরা সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া প্রতিশোধের সুযোগ-প্রতীক্ষা করিলাম।

সত্য সত্যই তখন আমার মনের ভাব যে কি হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। পরাধীন জাতি হইলেই কি এতখানি নিগ্রহ সহ্য করিতে হইবে?

ভগবান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিশোধের সুযোগ করিয়া দিলেন। ঘণ্টা দুই বাধে প্রাতরাশের অব্যবহিত পরেই ইহার পুনরায় ডেকে আসিয়া গল্প গুজব আরম্ভ করিল। কাহারও মুখে সিগার কাহারও বা সিগারেট ছিল, এবং আমাদের পূর্ক বজুটা পাইপে তাহাক ভরিয়া বেশ আরাম করিয়া টানিতেছিল। ঈমারের চিম্‌নি অপেক্ষা ইহার মুখ-গহ্বর হইতে টানে টানে বড় কম ধূম উদ্গিরিত হইতেছিল না। আমার যেন আর সহ্য হইল না। হঠাৎ উঠিয়া নিম্নেবের মধ্যে তাহার সম্মুখে গিয়া, প্রজ্জ্বলিত পাইপটা তাহার মুখ হইতে টানিয়া গইয়া তাহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলাম। বলা বাহুল্য, ইহার কল ভালই হইয়াছিল। আর মল হইলেও তাহার জন্ত আমি প্রস্তুতই ছিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে সাহেবগণ যে বার ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়াই যে দরজা বন্ধ করিল, আর বড় একটা বাহিরে আসিল না। যদিও বা কদাচিত্ কেহ আসিত, সিগার বা সিগারেট কাহারও মুখে দেখা বাইত না। কিন্তু আমাদের বজুর সেই যে ক্যাবিনে ঢুকিলেন, গোয়ালন্দ বাওয়ার পূর্ক আর তাঁহাকে বাহির হইতে দেখা যায় নাই।

এইরূপ আরও ২১ বার ইহাঙ্গিকে নেটিভ বিষয় আলার অর্জরিত হইয়া নিফল ক্রোধে আত্মকালন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু পূর্কের মত নীচা কাটার দিন এখন ক্রমেই অতীত হইতেছে—

“তেহি নো দিবণা গভাঃ”

হাতী শিকারী না হইলে, হাওদার অনেক সময়ই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। যদি কোন দিন নিরাপদে কিরীয়া আসা যায় তবে সেদিন যেন দৈবদয় রক্ষা করিল বলিয়া মনে হয়। সর্বদা সকল শিকারীর পক্ষে খুব শিক্ষিত হাতী পাওয়া কঠিন। মাঝারি শ্রেণীর হাতীও মন্দ নহে। সচরাচর ইহারা পলার না, তবে বাঘ শিকারে বড় স্থির হইয়াও থাকে না। স্থির থাকুক আর নাই থাকুক, জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বাঘের গন্ধ পাইলেই মাথা ঝাঁকিয়া ‘দে ছুট’ না হইলেই রক্ষা। কতকগুলি হাতী অভ্যস্ত ভীত। বাঘ দূরের কথা, জঙ্গলে একটা পানী বা গো-সাপ নড়িয়া উঠিলেই ইহারা আতঙ্কে নৃত্য করিতে থাকে। বাঘের গন্ধ পাইলেই ইহাদের মাথা ঝাঁকানি ও চিংকারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে; ল’হিনও নষ্ট হইয়া যায়। অনেক সময় আমরা এই আতীর ‘ভাগড়া’ বাধা হইয়া লাইন হইতে সরাইয়া দিয়াও শিকার করিয়াছি।

এই শ্রেণীর খারাপ হাতীতে শিকার করিতে গিয়া একবার যে বিরূপ বিপদ হইয়াছিল তাহা তাবলে এখনও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিপদ-মুক্ত হইয়া গেলে তাহা লইয়া অনেক সময় আমরা হহস্তালাপ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু বাহাই করিনা কেন, ইহাতেও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

সে আজ ১৪১৫ বৎসরের কথা, একবার শিলেট জঙ্গলে শিকার করিবার সময় আমাদের পার্টিতে গোবরডাঙ্গার জমিদার ৮৭৭৭ গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের ল্যেট পুত্র মেহেন্দ্র সিংহ জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ছিল। সে তখন নূতন শিকারী; তবে রাজ pig game shooting এ হাতে খড়ি দিবার জন্য সেই বারই আমাদের পার্টিতে বোগ দিয়াছিল। তখন তাহার বয়স ১৮.২০ বৎসর হইবে। ভবিষ্যৎ জীবনের অগ্নীম আকাজক ও উত্তম লইয়া, প্রথম বাঘ শিকার দেখিতে গিয়াছিল। সেবার সে নূতন শিকারী বলিয়া বাঘ শিকারের সময় সর্বদাই কোন প্রবীণ শিকারীর হাওদার পশ্চাতে স্থান পাইত। কিন্তু হরিণ শিকারে পৃথক

হাওদার স্বাধীন ভাবে তাহার শিকারের ব্যবস্থা ছিল।

আমরা নৈজিকোণা হইয়া প্রথমে ‘গারো হিল’ এর নিম্ন দিয়া শিকার করিতে করিতে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হই। ‘টুঙ্গার’ প্রকাণ্ড হাওদের গারে কতকগুলি হরিণ ও মহিষ শিকার করিয়া শিলেট ঐপুয়ের জমিদার শরৎবাবুর বাড়ীর নিকটে ক্যাম্প করি। শরৎবাবুর সঙ্গে এই শিকার উপলক্ষেই প্রথমে পরিচয় হইয়া পরে তাহা বান্ধবতার পরিণত হইয়াছিল।

এই ক্যাম্পের নিকট ‘জোড়কান্দা’ নামক স্থানে হরিণ শিকারের একটা ভাল স্থান আছে। বখনই আমরা ঐপুয়ে ক্যাম্প করিতাম ২১ দিন জোড়কান্দারও হরিণ শিকার করিয়া বাইতাম।

সেদিনও আমরা হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়াছিলাম। উপস্থাপন করেকদিনের শিকারে শ্রান্ত রক্ত আশ্রয়ের ভাল ভাল শিকারী হাতীগুলিকেও সেদিন বিশ্রাম দেয়া হইয়াছিল। কাষেই সকলের হাওদাই বাজে হাতীর উপর ছিল। জগৎপ্রসন্নও সেদিন হরিণ শিকার বলিয়া রাজা জগৎকিশোরের ‘কমল কলি’ নামক হাতীর উপর পৃথক হাওদার স্থান পাইয়াছিল। অদৃষ্টবশে তাহার হাতীটীও তত ভাল ছিল না।

আমরা জোড়কান্দার গিয়া গোটা দুই হরিণ মারিয়াছি, এর মধ্যে মাহতদের “বাঘ বাঘ, ঐ বাঘ, ঐ বাঘ” চিংকারে সেইদিকে আমাদেরগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। মাহতদের অনেক সময় অবধা বাঘ বাঘ করিয়া চোঁচাইয়া উঠা একটা স্বভাব, বিশেষতঃ আমার হাতীর দায়োগা আশ্রয়ালীর ভ্রাতার, জঙ্গলে ঢুকিয়াই টাইগার টাইগার বলিয়া চিংকার করা একটা সুস্বাভাবিক বিশেষ ছিল। নানারূপ ভেরা করিয়া আমরা বাঘ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলে, অতঃপর কি কি করা যায় সেই পরামর্শ চলিতে লাগিল। কাহারও ভাল হাতীতে হাওদা ছিল না। ভাল হাতীতে হাওদা বদল করিতে হইলে অন্ততঃ এক বণ্টা সময় নষ্ট হইবে, ততক্ষণ বাঘ চলিয়াই বাইবে। কাষেই ‘বা থাকে

কপালে' মনে করিয়া বেখানে বাঘ গিয়াছে বলিয়া দেখাইয়া দিল তাহার নিকটে বাইরাই আমরা লাইন কর্ত্ত করিয়া ফেলিলাম। খানিক বাইতে না বাইতেই বাঘ বেথা গেল; কিন্তু তখনও উহা দূরে ছিল। নূন শিকারী হইলেও অগৎপ্রসন্ন দূর হইতেই এক গুলি করিল। গুলিটা সম্পূর্ণ বিধ্বংসাতকতা না করিয়া, বাঘের পিছনের পায়ে গিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সপ্তরথীতে উহাকে ঘিরিয়া ফেলিলাম। বাঘ ও একটা ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লইয়া ক্রমাগত গর্জন করিতে লাগিল। আমরা ঘিরিলাম বটে, কিন্তু বাঘের তরানক ডাক শুনিয়া হাতীগুলি আর এক পা-ও অগ্রসর হইতেছিল না, দূরে চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু জোর করিয়া 'বাড়াইবার' চেষ্টা করিলেই মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত চিংকার ও মাথা ঝাঁকানি দিয়া হট্ করিতে লাগিল।

বদি বাঘও 'ঝোপ' হইতে বাহির না হয়, আমরাও কাছে বাইতে না পারি, তবে আর শিকার হইবে কি করিয়া? কেহ চিল ছুড়িতে, কেহ কেহ বা কতকগুলি শুকনা বন কাটিয়া আগুন ধরাইয়াও বাঘের দিকে ছুড়িতে লাগিল। ইহাতে কিছু কল হইল। হঠাৎ একবার বাঘটা ঝোপ হইতে বিছাতের মত বাহির হইয়া একটা হাতীর কাণ কামড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া পড়িল। আমরাও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম। ইচ্ছা করিলে বাঘ সেই গোলমালের সময় অনায়াসেই চম্পট দিতে পারিত; কিন্তু আমাদের হৃদশার সবে মাত্র সূক্ষ, সে এখনই বাইবে কেন? বাহা হউক, হাতীর কাড়ার বাঘ পড়িয়া গিয়া আবার সেই ঝোপেই আশ্রয় লইল। আমরাও উহাকে পুনঃ ঘিরিয়া ফেলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলাম—তীব্র হইতে হাওয়ার হাতী আনিয়া হাওদা বদলাইয়া লওয়া হউক; নচেৎ বাঘ মারা শক্ত হইবে। আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববৎ চিল ছোঁড়াও চলিতেছিল। বীণা মিনিট পর বাঘও আবার সেই রূপ হঠাৎ চার্জ করিয়া

একেবারে মহেশ বাবুর হাতীর মাথার উপর লাকাইয়া পড়িল। মাহত বেচারী গত্যন্তর না দেখিয়া ক্রমাগত বাঘের মাথার 'গজ্বাক্' দিয়া খোঁচাইতে লাগিল আর 'এ আলা—এ আলা—খাইল।' বলিয়া চোঁচাইতে আরম্ভ করিল। ইহা যে সে ইচ্ছা করিয়া বা বুদ্ধি খাটাইয়া করিয়াছিল তাহা নহে, সঙ্গীন মুহুর্তে 'বাবুড়াইয়া' গিয়া তাহার বাহা মনে হইতেছিল তাহাই করিতেছিল। এবার আর মহেশ বাবুর লক্ষ্যও ব্যর্থ হয় নাই বা তাহার গুলিতে হাতীর কাণও ছোঁদা হয় নাই। পেটে গুলি বাইয়া বাঘ হাতী হইতে পড়িয়া গিয়া, এবার আর ঐ ঝোপে না ঢুকিয়া অস্ত্রদিকে বাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এবারও আমাদের হাতীগুলি পূর্ববৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিন্তু আহত হওয়ার বাঘ খুব জোরে চলিতে পারিতেছিল না। আমরা আবার লাইন করিয়া পূর্ববৎ উহাকে ঘিরিয়া ফেলিলাম। একটু পরেই আবার চার্জ করিয়া অগৎপ্রসন্ন হাতী কমলকণির কাণ ধরিয়া ফুলিয়া পড়িল। এবার বাঘ সম্মুখের এক পা হাতীর কাণে ও অপর পা কাণের পেছনে দিক দিয়া মাহতের উরুতে বিঁধাইয়া হাতীর কাণ কামড়াইয়া ধরিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হাতীটিও হাওদা সমেত কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। বাহার হাতীর 'ভেড়ে নেওরা' দেখি রাখেন,—তাহারা এইরূপ শোয়াটা বেশ ধারণা করিতে পারিবেন। হাওদা সমেত এই ভাবে হাতীর শুইয়া পড়া জীবনে সেই একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। এ তরানক দৃষ্ট আর ভুলিবার নয়। বাঘের শরীরটা হাতীর মাথা ও তাহার বিরাট দেহের কাঁকে পড়ার বোধহয় বাঘটার কিছু হয় নাই; নচেৎ হাতীর চাপনে গিষ্ট হইয়া বাইত। হাতী ক্রমাগত ঝটাগটি করিয়া খানিক উঠিতেই বাঘটা উহার কাণ ধরিয়া টানিয়া আবার শোয়াইয়া ফেলে। হাতী খানিকটা উঠিলে বাঘের শরীর বেথা বার, আবার ওইলে হাতীর তলার ঢাকা পড়িয়া গেলে মাথাটা দেখা যায়।

এই সময় উপরের শিকারীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। হাতীর এই ভাবে ক্রমাগত কটাগটির সময় শিকারীর মাথা হাওদার শিকের সহিত ঠোকাঠুকি হইতেছিল। বন্দুক ও অস্ত্র বাহা কিছু হাওদার ছিল, আর সমস্তই মাটিতে পড়িয়া গেল। মাত্র একটি বন্দুক কেমন করিয়া যেন হাওদার আটকাইয়া ছিল। সৌভাগ্য যে বন্দুকগুলি মাটিতে ছিটকাইয়া পড়িয়াও আওয়াজ হয় নাই। শিকারী কাং হইয়া প্রাণপণ শক্তিতে হাওদার শিক ধরিয়া আছে। হাতী যখন এক একবার উঠিবার চেষ্টা করে, তখন শিকারীর মাথা বাঘের মুখের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। আবার যখনই হাতী শুইয়া পড়ে তখন বাঘের মুখ ও শিকারীর মাথা অর্দ্ধহস্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

এই অবস্থায় আমরা সকলে কিংকর্তব্য-বিস্মৃত হইয়া পড়িলাম। বাস্তবিক তখন দৈবের উপর নির্ভর করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। বাঘ মারিতে হাতী মারি কি নাহুব মারি এই আশঙ্কায় সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভগবানের আশেব করুণা, মহেশ বাবু হঠাৎ অগ্রসর হইয়া বাঘের কোমর লক্ষ্য করিয়া এক গুলি করিলেন। যদিও এই কার্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অবৈধ ও দারিদ্র্যপূর্ণ, তথাপি অনেক সময় অনেক মন্দ কাণ্ডের মধ্য দিয়াও সং উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। কোমরে গুলি লাগিয়াই বাঘ হাতী ছাড়িয়া মাটিতে পড়িয়া গেল

এবং সঙ্গে সঙ্গে সহু বাবু গুলিতে এই ভীষণ দৃষ্টের অবসান হইল।

ইহার পর হাওদা দ্বিত শিকারীকে প্রকৃতিস্থ করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। মাছতের উন্নয়ন করেক স্থানে ছুরির কাটার মত (incision) খুব প্রথম হইয়াছিল। অনেক চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের পর সে আরোগ্যলাভ করে।

হাওদার হাতী ভাল না হইলে অনেক সময়ই এইরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে। সর্বদা ভাল হাতী পাওয়া কঠিন। কিন্তু যতদূর সম্ভব অন্ততঃ মাঝারি রকমের হাতীও নির্বাচন করিয়া লওয়া উচিত। যে সে হাতীতে হাওদা দিলেই শিকার ভাল হইবে এই ধারণা ঠিক নহে। বরং মাটিতে দাঁড়াইয়া শিকার করাও ভাল, কিন্তু নিরুপহাস হাতীতে হাওদা দিয়া বিপদগ্রস্ত হওয়া সুখ্যতা। বাঘ যদি মহেশবাবুর গুলিতে হাতী ছাড়িয়া না দিত, তবে হাওদার মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া অথবা বাঘের মুখেই শিকারীর পরিণাম আরও শোচনীয় হইত।

একদিকে যেমন হাওদা শিকার অন্যান্য প্রকারের শিকার আপেক্ষা নিরাপদ ও সুবিধাজনক, অন্য দিকেও তেমনি এইরূপ ‘ভাগড়া’ হাতীতে শিকার করা সর্বাঙ্গীণে বিপজ্জনক। কারণ ইহাতে শিকারীর স্বাধীনতা মাত্রও নাই, সমস্তই হাতীর উপর নির্ভর করে। ইটী শিকারে বরং বখেট স্বাধীনতা আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

সার্বকতা

নারী কহে করবোড়ে দেবতারে তার,
কেন প্রভু, নারী প্রতি এত অবিচার।
জীবনের আব্রুহুশি নিলে যার ওই—
তার মাঝে জীবনের সার্বকতা কই?

সুখা মাথা করে, দেব হাসি কন তার,
—হে নারী, জীবন তব বৃথায় না যার।
নারীজনে মাতৃস্বের পূর্ণতা বিকাশ,
তারই মাঝে সার্বকতা করিছে প্রকাশ।

শ্রীশিলাবতী বসু

সত্যবান্ধা

(উপভাস)

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ।

রাজ্যে শয়ন করিয়া, ফুরটিং-র সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কিশোরী জানিতে পারিল, সানচং হইতে কিংবার পথে ফুরটিং ঐ সাহেবদের ছাউনি দেখিয়া আসিয়াছে— এমন কি দার্জিলিংবাসী দুই একজন পূর্বপরিচিত স্বদেশীর লোকের সঙ্গেও সেখানে তাহার দেখা হয়, তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতে গিয়াই কিরিতে অত রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। কিশোরী ফুরটিংকে সাহেবগণ সব্বদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নানা প্রশ্ন করিয়া বুঝিল, তাহার গুলিশ অভিযান ত নহেই, ইংরাজ আতিথ্য নহে; বর্ষাবর্ণিই ভৌগোলিক আবিষ্কারকের দল এবং আমেরিকা হইতে আগত। এ কথা শুনিয়া, কিশোরীর মন হইতে পূর্বসন্ধ্যা দূর হইল, এবং সংবাদপত্র-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে, নিমন্ত্রণ অনুসারে প্রাতে তথায় বাইবে বলিয়া সে স্থির করিল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, ফুরটিংকে বর্ণনার জল জানিতে পাঠাইয়া নিম্ন বসিল, “নাফালাদা, তুমি ঐ কাইলিংদের তাড়িতে চা পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাওয়া সব্বদে কি স্থির করিলে?”—কাইলিং অর্থে বিদেশী।

কিশোরী বলিল, “বাইব মনে করিতেছি।”

নিম্ন বসিল, “তবে চল, আমিও তোমার সঙ্গে বাইব। শাদা বাহুর কখনও আমি নিকট হইতে দেখি নাই, দেখিয়া আসিব। তাহাদের চালচলন কথাবার্তা কিরূপ সে সব্বদেও আমার কৌতুহল আছে। কিন্তু তাহার বখন আমার সঙ্গে কথা কহিবে, সে সকল কথা আমি বুঝিব কিরূপে?”

কিশোরী বলিল, “আমি না হয় দোতাবী হইয়া তোমার বুঝাইয়া দিব। ফুরটিং কিরিয়া আসিলেই আমরা বাই চল। তোমার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা আছে—পরামর্শ করিবার আছে—পথে বাইতে বাইতে নিরবিবলিতে সে সকল আমাদের শেষ করিতে হইবে।”

নিম্ন হাসিতে হাসিতে বলিল, “আচ্ছা, তোমার যদি তাহা জিজ্ঞাসা করে আমি তোমার কে, তুমি কি বলিবে?”

“তুমি আমার বা, তাই বলিব। বলিব; শীঘ্রই তুমি আমার তোমার পরিচয় করিয়া, আমাকে চিরজীবী করিবে।”

নিম্ন বলিল, “দেখ, তোমার কথা বলিবার প্রণালী বড় জল্পন। এদেশের কোনও যুবক হইলে, একথাগুলি, কখনই এ ভাবে শুধাইয়া বলিতে পারিত না।”

কিশোরী মনে মনে বলিল, “তাহা কি নভেল পড়েছে ছাই।”

অন্তঃপর নিম্ন, নিজ কক্ষে গিয়া, পোষাক পরিবর্তন করিল। নুতন জীভ আসি চিক্কণীর সাহায্যে, চুলগুলির পরিপাট্যবিধান করিল। একখানি পাটল বর্ণের রেশমী ক্রমাল গলার বাঁধিয়া, হাসিতে হাসিতে কিশোরীর কাছে আসিয়া বলিল, “আমার কেমন দেখাইতেছে বল দেখি?”

কিশোরী তাহার উত্তর স্বল্পে হস্তার্শ্ব করিয়া, সুখখানির দিকে বুঁকিয়া বলিল, “তোমার জল্পন —অতি জল্পন দেখাইতেছে। বেন গাহাড়ের বুকে একটি গোলাপফুল ফুটিয়াছে। কিন্তু কৈ, তোমার এ গোলাপটি ত আর কোনও দিন আমি দেখি নাই।”

নিনা বলিল, “তুমি বুঝি মনে কর আমার একটি মাত্র পোষাক? আমার আরও আছে। একটি আছে, সেটি আমি বিবাহের দিন পরিব; আমার বিবাহের জন্তই বাবা সেটি তৈয়ারী করাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমার বিবাহ হইবে, কিন্তু বাবা আমার দেখিতে পাইলেন না।”—বলিতে বলিতে নিনার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

কিশোরী নিনার দুখানি হাত ধরিয়া বলিল, “তোমার বাবা স্বর্গ হইতে দেখিবেন এবং আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন।”

কুসুচিং বরণা হইতে কিরিয়া আসিলে, তাহার উপর রক্তনাদির ভাঙ্গাপণ করিয়া, নিনা নিজ শরন গুহার প্রবেশ করিল। তাহার অন্তঃস্থার হইতে ঔপস্থিত হই খানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাছিয়া লইয়া, একখানি নিজ কটিবন্ধে ধারণ করিল, এবং অপরখানি কিশোরীর কোমরে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, “চল এইবেলা আমরা বাহির হইয়া পড়ি—নচেৎ কিরিতে বিলম্ব হইয়া বাইবে।”

উভয়ে তখন সেই অধিত্যকা লক্ষ্য করিয়া, ধীরে ধীরে পর্ব্বত অবরোহণ আরম্ভ করিল।

সূর্যোদয়ে তখন প্রভাতবায়ুর শৈত্যকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। যদিও ‘চড়াই’ নহে ‘উৎরাই’, তথাপি ইহা কিরণপরিমাণে প্রশমসাধ্য ব্যাপার। পথপ্রম্বে, প্রথমটা কিশোরী বেশী কাতর হইল না। অধিত্যকা প্রদেশে নামিবার অনেকগুলি পথ ছিল—সেগুলি সমস্তই নিনার পরিচিত—সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথটিই সে নির্বাচিত করিয়া লইয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধপথ যখন তাহারা নামিয়া আসিয়াছে, তখন নিনা বলিল, “তুমি একটু হাঁকাইয়া পড়িয়াছ, নয়? একটু বিশ্রাম করিবে?”

“করিলে মন্দ হয়না”—বলিয়া কিশোরী উত্তর পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিল। বামে কিরদূরে কয়েকটি ঝোপ দেখা গেল, তাহাদের গায়ে গায়ে কিশোরীর অপরিস্ফুট একটা সুগন্ধি ফুল রহিয়াছে। কিশোরী

বলিল, “চল, এই ফুলের ঝোপগুলির মধ্যে গিয়া একটু বিশ্রাম করা বাউক।”

উভয়ে, পথ ত্যাগ করিয়া, সেই ফুলের ঝোপগুলির দিকে বাইতে লাগিল। নিকটে পৌছিয়া, কিশোরী সে ফুলের সুহৃদ মধুর সৌরভ অম্লভব করিল। বলিল, “বাবা, গন্ধটি ত বেশ; এগুলি কি ফুল, নিনা?”

“এর নাম রিংচেন। বর্ষাকালেই উহাদের ফুলবার কাল।” বলিয়া নিনা ঝোপের নিকট গিয়া একটা ফুল তুলিয়া, কিশোরীর হাতে দিল। কিশোরী সেটির স্রবাস গ্রহণ করিয়া, সবন্ধে নিনার চুলে পরাইয়া দিল।

ফুলের ঝোপগুলির মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা ছিল; তাহারা উভয়ে সেখানে গিয়া বসিল। কিশোরী নিনার হাতটা নিজ হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, “আমাদের বিবাহ কোথায় হইবে এবং কবে হইবে, তাহা তুমি কিছু ভাবিয়াছ নিনা?”

নিনা বলিল, “ভাবিয়াছি বৈকি। কাল রাতে তোমার নিকট বিনায় লইয়া, নিজ গুহার আসিয়া লয়ন করিলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুমাতে পারিলাম না। এই সকল কথাই কেবল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার ইচ্ছা বাহা, তাহা তোমার নিকট বলি শুন—তার পর, তোমার বাহা মত হইবে, সেইরূপই আমরা করিব। এ দেশে আমরা বাস করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাদের বিবাহ প্রথা হইতে আমাদের তিব্বতীয় প্রথা বিভিন্ন; সুতরাং আমাদের বিবাহের পুরোহিত কাংপা-চেন গ্রামে মিলিবে না। কোনও বৌদ্ধমঠে গিয়া আমাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করাইতে হইবে। এখান হইতে উত্তরে, দুই দিনের পথে একটা বৌদ্ধ মঠ আছে, তাহার নাম ওয়ালাং।—সেখানে অনেকগুলি লামা বাস করেন। আমার ইচ্ছা হুজনে সেইখানে গিয়াই বিবাহ করিয়া আসিব। এখন তোমার কি ইচ্ছা তাই বল। আমরা দার্জিলিং অথবা কলিকাতার গিয়া বিবাহ করিব কি?”

কিশোরী বলিল, “না নিনা—সে অনেক দূরের পথ—সে দরকার নাই। এই ওয়ালাং মঠে গিয়া বিবাহ

করাই তাল। কিন্তু একটা কথা আছে। অত্যন্ত লামাগণ যেমন চেলা গ্রহণ করিয়া তাহাকে মঠের উত্তরাধিকারী করিয়া দান, তোমার পিতা তাহা করেন নাই—তোমাকেই নিজ উত্তরাধিকারিণী করিয়া দিয়াছেন। পুরুষাত্মকসে সঞ্চিত বহু ধনসম্পদ এই মঠে লুকানো আছে তাহা যদি অত্যন্ত লামারা জানিতে পারিয়া থাকে, তবে তাহারা, আমার সহিত তোমার বিবাহে কোনও আপত্তি করিবে না ত ?”

নিলা বলিল, “তা বোধ হয় করিবে না। তা ছাড়া বহু ধনসম্পদের কথা অস্ত্রে কিরূপেই বা জানিবে ? পূর্বপুত্র লামারা সূত্রে আসন্ন হইলে, উত্তরাধিকারী চেলাকে অতি গোপনে বলিয়া বাইতেন। এই লামাগণের ধনশালিতার কোনও ভণ্ড বা গর্ক ছিল না, তদনুরূপ ব্যয়বাহুল্য বা ধুমধাম কিছুই ছিল না—ভিক্ষাপ্রার্থীরা সন্ন্যাসীর দ্বারা তাঁহারা জীবনধারণ করিয়া গিয়াছেন—বাহিরের লোকে জানিবে কিরূপে ? জানিলে আমি একা জ্বীলোক এতদিন কি ও সমস্ত রক্ষা করিতে পারিতাম ?”

কিশোরী বলিল, “তবে ওরালং মঠেই বা ওরা থাকে। কবে আমরা বাইব বল দেখি ? আমাদের মিলনে বেশী আর দেরী করিয়া কাঁব নাই—কি বল ?” —বলিয়া কিশোরী নিজের হাতটি ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিল।

নিলা, বিনা আপত্তিতে, কিশোরীর দৈহিক হইয়া তাহার হৃদয়ে নিজ মস্তক রক্ষা করিয়া বলিল, “বেশ, চল কালই আমরা বাজা করি। কাহিলিংদের তাঁবু হইতে ফিরিয়া, আহাতিদির পর, আমি একবার কাংপাচেন গ্রামে বাইব—ছুটি টাটু ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া আনিব। ভাল ঘোড়া হইবে না—কাঁব চলা মত হইবে। কিনিব না, ভাড়া করিয়া আনিব।”

কিশোরী বলিল, “আজ যদি আমার তোমার কাংপাচেন গ্রামে বাইতে হয়, তবে এখানে বসিয়া আর দেরী করা উচিত নয়, আমরা উঠি চল,—সাহেবদের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসি।”

হুইজনে উঠিল। নিজের চুলের দুইটা পড়িয়া গিয়াছিল, কিশোরী আর একটি তুলিয়া তার কবরীতে পরাইয়া দিয়া, পূর্বেরটি নিজ আলখামার বুকে ভাঁজিয়া লইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সংবাদপত্র সংগ্রহ।

নামিতে নামিতে নিম্নে অধিত্যকা ছাউনির দৃশ্যটি ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ছাউনির সন্নিকটে ইহারা পৌছিলে, দেখা গেল, কিশোরীর পূর্ব পরিচিত সেই রুটেনহাম সাহেব, পাইপ মুখে করিয়া ইতস্ততঃ পরিলক্ষণ করিতেছে। ইহাদিগকে দেখিয়া সাহেব অগ্রসর হইয়া আসিল ; এবং ইংরাজী ভাষায় “হেলো লামা, আসিয়াছ ? বড় খুশী হইলাম।” —বলিয়া নিজ কর প্রদর্শন করিয়া দিল। কল্পমর্দন করিতে করিতে বলিল, “এই মহিলাটি কে ?”

কিশোরী বলিল, “ইনি পরলোকগত কোংপা লামার কন্যা এবং এখন আমার বাগদত্তা বধূ।”

সাহেব নিজের দিকে চাহিয়া শিরোনমন পূর্বক তাহাকে অভিবাদন করিয়া কিশোরীর পানে চাহিয়া বলিল, “বেশ বেশ। তোমাদের ছটিকে বাইয়াছে ভাল। তা, ইনিও কি ইংরাজী কহেন ?”

কিশোরী বলিল, “না, ইনি তিব্বতীয় ভাষা কহিয়া থাকেন।”

“তবে আপনি ইহাকে বলুন, ইনি আসাতে আমরা বড়ই খুশী হইরাছি ; কেবল হৃৎকের বিবরণ এই যে, ইহাকে অভ্যর্থনা করিবার মত কোনও আত্মীয় মহিলা আমাদের সঙ্গে নাই।”

কিশোরী নিজাকে সাহেবের কথাগুলি বুঝাইয়া দিল। অন্তঃপর সাহেবের আশ্বাসে, হুইজনে প্রধান ভাষুর দিকে অগ্রসর হইল। তাহা সন্ধ্যা বৃকতলে ক্যাম্প টেবিলের উপর চা প্রভৃতি সরঞ্জাম বিস্তৃত ছিল। অপর হুইজনে সাহেব আসিলে, রুটেনহাম সকলের পরিচয় সম্পাদন করিয়া দিল। অতিথিদেরকে চা কটি

মানব প্রকৃতি পরিবেষণ করিয়া দিয়া রটেনহাম তিব্বৎ দেশ পথকে কিশোরীকে নানাবিধ প্রদত্ত করিতে লাগিল। কিশোরী কতক বা নিনার নিকট জানিয়া লইয়া, কতক বা পুণ্ডিত বিদ্যার সাহায্যে, কতক বা নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া, সে সকলের উত্তর দিতে লাগিল।

চাঁপান শেষ হইলে কিশোরী সাহেবদ্বিগকে বলিল, “আপনাদের সঙ্গে পুরাতন সংবাদ পত্রাদি আছে কি? বছরদিন আমি দার্জিলিং বাইতে পারি নাই—বাহিরের পৃথিবীর কোনও খবরই পাই না।”

রটেনহাম বলিল, “বেশী নাই, কিছু কিছু আছে। দার্জিলিং আমাদের অবস্থানকালে যে কাগজগুলি পাইয়াছিলাম, তাহার কতক আমাদের সঙ্গে আছে বটে, তবে প্রায় সেগুলি জিনিষপত্রের গারে জড়ানো আছে। আচ্ছা, আমি খানকতক খুঁজিয়া তোমাকে দিব এখন।”

সাহেবেরা একে একে উঠিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে রটেনহাম করিয়া আসিয়া খানকতক খবরের কাগজ কিশোরীর হাতে দিলেন। কিশোরী বলিল, “এগুলি আমি কি লইয়া বাইতে পারি? পড়িয়া আজ বিকালেই আমার লোক দিয়া ফেরৎ পাঠাইব।”

সাহেব বলিলেন, “নিশ্চয় নিশ্চয়।”

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, খবরের কাগজগুলি লইয়া নিনা সহ কিশোরী বিদায় গ্রহণ করিল।

অবরোধ বত সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল, আরোহণ অবশ্যই তজ্জগ হইল না; তবে নিনার স্নমধুর সাহচর্য ও তাহার অনারাস ক্ষমতার দৃষ্টান্ত, কিশোরীকে উৎসাহিত করিয়া, তাহার পথারূপ বহু পরিমাণে বিদূরিত করিতে লাগিল। যাকে একবার ধামিয়া নিনা বলিল, “একে তোমার অন্ত্যাস, তাহাতে আবার যোগে দেহ হুঁসল; তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। একটু বসিবে?”

“কিশোরী বলিল, “বসিব। চল সেই রিংচেন কূলে আবার বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিব।”

কিশোরী ধামিল না—তবে তাহার গতি ক্রমে মন্দ

হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। অতি কষ্টে সে পুত্রোক্ত কূলের বোণগুলির নিকটবর্তী হইল। পাকদণ্ডি (গিরিপথ) ছাড়িয়া, সেই বোণের মধ্যে আবার হইলেন গিয়া বসিল। বাক্য বিনিময়ের ক্ষমতা কিছুক্ষণ পর্যন্ত উত্তরের কাহারও রহিল না—পরম্পরের মূখ পানে চাহিয়া, হুথের হাসি হাসিয়া, কথা কহিবার সাধ তাহার মটাইল।

নিনা অবশেষে বলিল, “ঐ যে কাগজগুলি তুমি আনিলে, ওগুলি কি?”

খবরের কাগজ যে ব্যাপাট্টা কি, কি প্রকারে তাহা তৈয়ারী হইয়া দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হয়, তাহা কিশোরী সংক্ষেপে নিনাকে বুঝাইয়া দিল। নিনা কাগজ গুলি হাতে লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিল; শেষে বলিল, “তুমি যে যে তাহা জান, সে সকল তুমি ক্রমে আমার শিখাইয়া দিও। তুমি যেখানে বাইতে পার, আমার সেখানে প্রবেশাধিকার নাই, ইহা মনে হইলে, দাম্পত্য-সম্বন্ধে আমার আদর্শ ক্ষুর হয়।”

কিশোরী বলিল, “শিখাইব বৈকি নিনা—আমি কাহা জানি সমস্তই তোমার শিখাইয়া দিব। প্রথমে আমার মাতৃভাষা বাঙ্গলা তোমার শিখাইব—তার পর ইংরাজি শিখাইব। তোমার তিব্বতীয় ভাষা আমি অল্প শিখিয়াছি বটে—আরও অনেক শিখিতে এখন বাকী—তুমি আমার তাহা শিখাইয়া দিবে,—কেমন?”

মুক্ত আকাশের নীল-চন্দ্রাতপ তলে, সেই রিংচেন-সৌরতে আঘোদিত নির্জন কুঞ্জবিতান মধ্যে বসিয়া এই তরুণ তরুণী প্রায় একঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিল; এবং সমস্ত ক্ষণই যে “খালি লেখাপড়ার কথা” কহিয়াই কাটাইল, এমন বলা যায় না। তবে সে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই।

সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ও বিগতরূপ হইয়া, নিনার বাহু কিশোরী নিজ বাহুতে শৃঙ্খলিত করিয়া কুঞ্জবিতান হইতে বাহির হইল, এবং পাকদণ্ডির পথে পৌছিয়া, আবার পরিত্যক্তারূপে অরুণ করিল।

মঠে পৌছিয়া, উত্তরে দেখিল, ইতোমধ্যে কুরটিং

পাকাদি সম্পন্ন করিয়া বলিয়া আছে। উভয়েই অত্যন্ত স্তম্ভিত ছিল; কিয়ৎকণ বিশ্রামের পর, ছুইজনে খাইতে বসিল।

আহারান্তে নিনা বোঁড়া সংগ্রহের জন্ত গ্রামে বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। বাইবার সময় কিশোরীকে আড়ালে বসিল, “ঐ ফুরচিংকে তুমি কি আমাদের বিবাহের কথা বলিয়াছ?”

“না, বলি নাই।”

“এইবার তবে বল। কারণ, ইহাকে মঠ রূপে নিযুক্ত রাখিয়া, আমরা ছুইজনে কল্যাণ প্রাপ্তি ওয়ালাং বাজা করিব।”

“আচ্ছা, তা বলি।”

নিনা চলিয়া গেলে, শরন ওহার কথল বিছাইয়া শরন করিয়া কিশোরী সংবাদপত্র :গুলি খুলিল। দেখিল, সেগুলির তারিখ, তাহার দার্জিলিং পরিত্যাগের সপ্তাহ কাল পরে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ছুইখানি “দার্জিলিং ডিজিটর” নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক, বাকীগুলি কলিকাতার টেটসম্যান, ইংলিসম্যান প্রভৃতি। কিশোরী প্রথম “দার্জিলিং ডিজিটর” খানির পৃষ্ঠার মনোনিবেশ করিল। ইতস্ততঃ সন্ধান করিতে করিতে দেখিল, সপ্তাহ মধ্যে দার্জিলিঙে বাহার। আসিয়া পৌছিয়াছেন এবং বাহার। ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, একস্থানে তাঁহাদের নামের তালিকা মুদ্রিত রহিয়াছে। পড়িতে পড়িতে, কিশোরী দেখিল, পরিত্যাগকারীদের মধ্যে, “মিসেস্ বোব, মিস্ বোব এবং মিস্ বীণা বোব” নাম-গুলি রহিয়াছে। স্মরণ্য বুদ্ধিল, ইহারা কলিকাতা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কৈ, মল্লিক সাহেবের নাম ত এই তালিকা মধ্যে নাই।

বহুদিন পরে এইভাবে সত্যবাণীর নামোজ্জ্বেল, কিশোরীর বুকটার ভিতর কি বেন আঁটিয়া ধরিল— উহা বেদনার টুটু করিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার চোখের পাতা তিঁজিয়া উঠিল। অবশেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্ষু মুদ্রিয়া, বিত্তীয় ডিজিটর খানির

পৃষ্ঠা উন্মোচিত করিল। স্থানীয় সংবাদ ভূতে দেখিল,—

“রঙ্গপুরের ছুটিগ্রাণ্ড জয়েন্ট ব্যালিফ্রেট মিটার মল্লিকের পাহাড়িয়া ভৃত্য মংলুক ছুই সপ্তাহ পূর্বে অজ্ঞান অবস্থায় ক্যালকাটা রোডের নিম্নে থদমধ্যে আহত ও অচেতন অবস্থায় কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল এবং স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক সে ব্যক্তি হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল ইহা বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। সম্ভ্রান্ত সে আরোগ্যলাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া, তাহার এক মল্লিকের কর্ণে পুনরায় বাহাল হইয়াছে, এবং বে বালাণী বাবু তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহার নামে ডেপুটি কমিশনরের আদালতে কৌশলারী মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে। আসামীর এ পর্য্যন্ত কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই।”

ইহা ছাড়া, এ বিষয়ে আর কোনও সংবাদ কোনও কাগজে নাই। পড়িয়া, কিশোরী হাঁক্ ছাড়িয়া বাঁচিল—বাক্ মাহুয খুনের মহাপাপ হইতে সে নিষ্কৃত পাইয়াছে। ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার নাশি ক্রিয়াছে?—তা সে ককক!

কিশোরী চক্ষু বুজিয়া, পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—“আর হয় না! আর হয় না! কয়েকদিন পূর্বে এ সংবাদটি পাইলে, আমি দার্জিলিঙে ফিরিয়া বাইতাম; টাকা কড়ি দিয়া, মংলুর সঙ্গে মিটমাট করিয়া, মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে তাহাকে সন্মত করিতাম, এবং—

“এবং” ভাবিয়া আর কল কি! যে কর্ম্মক্ষেত্রে নিজে এক কুড়াইয়াছি, তাহা আর ছিন্ন করিবার উপায় নাই। উপায় থাকিলেও, তাহা করা ধর্ম্মসঙ্গত হইত কি না সন্দেহ!—বাহা স্বপ্নে পরিণত হইয়াছিল, তাহা স্বপ্নই থাকিরা বাক্!—আর কেন?”

অতঃপর কিশোরী কিছুক্ষণ দিবানিদ্ৰায় চেষ্টা করিয়া, অকৃতকার্য হইয়া, উঠিয়া বসিল। ফুরচিংকে ডাকিয়া থবরের কাগজ গুলি সাহেবদের ছাউনিতে দিয়া আগিতে বসিল।

সন্ধ্যার পূর্বে নিনা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, দুইটি টাটু ঘোড়া সংগ্রহ হইয়াছে, কল্যা পূর্নাকালে সে দুটি এখানে আনীত হইবে।

ফুরচিং ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সাহেবেরা তাহাকে মাসে ৫০ টাকা বেতন ও খোরাকে চাকরি দিতে চায়, নানালার এখন ত আর তাহাকে বিশেষ প্রয়োজন নাই—অতএব অনুমতি পাইলে ইত্যাদি।

নানালার তৎক্ষণাৎ অনুমতি ও পরদিন প্রাতে

তাহার প্রাপ্য বেতন চুকাইয়া দিলেন। ফুরচিং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

বখাসময়ে টাটু দুইটি আসিল। তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া লইয়া, গুহাবারগুলিতে তালবন্ধ করিয়া, অখারোহণে দুইজনে ওয়ালং নগরের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ঋণ-বরণ

বুজের মত আসিতেছে ছুটে
কালবৈশাখী বড়।
এক হাতে তার রক্ত-বিষাণ
আর হাতে ঋণের।
হৃদয়ে তার গর্জি অশনি
নিখাসে ছুটে অগ্নি,
সৃষ্টি নাশিতে বুঝিবা আসিছে
আকাশের জয়দগ্নি।
উর্দ্ধে বিমান উল্লসিত
পিঙ্গল তার জটা,
চক্ষু খেলিছে চমকি চপলা,
বক্ষে জলদ ঘট।
জুড়ি ছই পাণি কাঁপিছে ধরণী
গণিতেছে পরমাণু;

কুকু তটিনী তট তরঙ্গে
উত্তাল উদ্গার।
তঃথৈ তঃথৈ থিরা থিরা থিরা
তৈরব তঃথৈ।
নেত্র দুদ্বিরা সুকাতোছে ভরে
গ্রহ তারকারা সব।
হে বীর, আলিকে সজ্ঞাসে তুমি
করু করো না দ্বার,
কজ্জেরে আলি বরিবারে, আনো
অর্থের উপচার।
বজ্রের বৃক ঝাঁপারে পড়ুক
ভোমার ক্রিষ্ট প্রাণ
কজ্জের সাথে ধর মল্লার
নষ্ট নারায়ণ ভান।

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার।

টিকটিকি

(গল্প)

আমার নাম রামকৃষ্ণ সিংহ, পিতা মৃত রামটোল সিংহ; আমি এই গোপালপুর সহরের ডাক্তার বহু বাবুর বাসায় চাকরি করি। অল্প প্রাতে ৬টা ৪২ মিনিটের সময় আমার সঙ্গী হরি মণ্ডল চৌকিদারের একতায় খানার হাজির হইয়া আপনায় (দারোগা বাবুর) সমক্ষে এজাহার করিতেছি যে, গত রাত্রে অজাত সময়ে কে বা কাহার আমার মনিবের পূর্বদ্বারী কোঠা ঘরে গিয়া দিবা নগদ ও গহনার আত্মা ২৫০ টাকা চুরী করিয়াছে। বাবুর নিজ লিখা ও সহি করা তালিকা দাখিল করিলাম। কাহারও উপর সন্দেহ আছে কিনা তাহা আমি জানি না। আর সমস্ত থবর বাবু নিজে বলিতে পারিবেন। আমার এই এজাহার আপন লিখিয়া লইয়া আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন, ঠিক লেখা হইয়াছে জানিয়া নিজে খেজার টিপ সহি দিলাম। ইতি।

২

উপরি বর্ণিত প্রথম এতলা কার্জন পেপার সহযোগে নোকর (duplicate) লিপিবদ্ধ করিয়া দারোগা বাবু অকুহানে গমন পূর্বক যথাস্থিতি তদন্ত আরম্ভ করিলেন। গোপালপুর সহরে বহু ডাক্তারের নাম কে না জানে? তাহার চিকিৎসা নৈপুণ্যে, জীড়া কোড়ুকে, টেনিস ও ক্রীডে, সঙ্গীত চর্চায় ক্ষুদ্র গোপালপুর সহরে বাবু বহুনাথ ঘোষ মহাজনের জায় প্রতীক্ষমান ছিলেন। স্ত্রীয়া তাহার বাড়ীর এই চুরী ঘটনার অনেকেই ক্ষণিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। স্থানীয় সাপ্তাহিক “গোপালদর্পণ” লিখিলেন, “সহরে উপর্যুপরি এত স্তম্ভিত হইয়া গেল, একটিরও কিনারা হইল না। পুলিশ কর্তব্য কি অকর্তব্য এইবার তাহার বীমাংসা হইবে।”

কিন্তু একা পুলিশের উপর দোষ চাপাইলে হইবে কেন? জনসাধারণের স্বতঃ প্রণোদিত সাহায্য না পাইলে বিলাতী স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকদেরও স্তম্ভ আবি-কার ও প্রমাণ সংগ্রহ করা দুষ্কর। স্ত্রীয়া দারোগা ললিত বাবু রেল ষ্টেশনে প্রহরী প্রেরণ, পৌদারদের সতর্কী-করণ, অনেক খানা-তলাসীতে বহু বাবুল বিদারণ, ও খান চাউন উলোট পাগোট ইত্যাদি করিলেন বটে, কিন্তু চুরীর আকারা হইল না। সন্দেহ চরিত্রের লোকদের খানার ডাকাইরা লইয়া দারোগা বাবু ক্রোধ সঘরণ পূর্বক বিনয় বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপু এই চুরীর কথা কিছু জান?” একে একে সকলেই বলিল না, সে কিছুই জানে না; সে চুরী করে নাই। ইচ্ছা থাকিলেও তার চুরী করিবার আবশ্যকই বা কি?

আবশ্যকই বা কি? এ কথার এক উত্তর—প্রহার। বিনা প্রহারে বদমাশদের পেটের কথা বাহির হয়? কিন্তু সে প্রহার সাবিকি আমল আর নাই। যে দিনকাল, কাহাকেও তুমি ছাড়া তুমি বলিবার সাধ্য নাই। অধুনা প্রহারে দারোগা বাবুর লাভ কি? বরং সবুহ বিপদ। এই তো সেদিন রতনগঞ্জের দারোগা সাহেব একটা সন্দেহকে একটুখানি কটু কাটব্য করিয়া বিনা দিয়াছিলেন। আর অমনি সে দেবার বাইরা জনৈক নবীন উকিলের সং পরামর্শে কিংবা তাঁর সুহরী বাবুর পিঠ-চাপড়ানিতে ছুইটা ইকিমোসিন্, তিনটা ক্রজ্ এইরূপ ডাক্তারী সার্টিফিকেট সংগ্রহ পূর্বক বাবুল রক্ষ করিয়া দিল। এবং সপে সপে কলিকাতার অন্ততবাগারে যে তার প্রেরিত হইল তাহার হেডিং A Sub Inspector in trouble এবং শেষ দিকটার প্রধান কথাটা এই যে বাহীপদের উকীল ঐহুত বাবু অসুখ।

এই সব দেখিয়া ভনিরাই প্রবীণ দারোগা ললিত গলোপাখ্যার ঠাঁহার ক্রোধ জ্বল কন্ডরে লুকারিত রাখিয়াছিলেন। ক্রোধ সব রিপু আর নাহি ধরাতে।

৩

দারুণ সমস্তা। সাক্ষ্য দিবার তরে কাহারও সাহায্য লাভের প্রত্যাশা নাই, প্রহার করিবার উপায় নাই; অথচ চোর ধরিতেই হইবে। নতুবা “গোপাল দর্পণ” সম্পাদক কি বলিবেন? আচ্ছা, এক কাণ্ড করিলে হয় না? শান্তি স্বত্বায়ন ও তজ্জিতরে পুণ্ডার অহুষ্ঠান করিলে, দেবতার ক্রপার চোরা মাল পাওয়া অসম্ভব নয়। নচ দৈবাৎ পরং বলং। দাঃগা বাবু ও ডাক্তার বাবুর মধ্যে গোপন পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরদিন রাতে ডাক্তার বাবুর এক নির্জন প্রকোষ্ঠে এক পুণ্ডার আরোজন হইয়াছে। তিনি ঠাঁহার বসিবার ঘরে পুলিশের সাহায্যে সহরের সন্ধিৎস লোকদের ডাকাইয়া আনিয়াছেন।

বহুবাবু গায়ে খান করিয়া গভীর ঘরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই।

“হে তাই সব, আমার এই দারুণ সমস্তে তোমাদেরই সাহায্য তরসা। তোমরা সকলে পরম হিন্দু, আমিও তোমাদের একজন। আমার গৃহে এক বৈবজ্ঞ সন্ন্যাসী পদধূলি দিয়াছেন এবং এক পুণ্ডার অহুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি পূজাতে চুরীর গুপ্ত কথা পুলিশের কাছে বলিয়া দিতে পারিবেন। আমি তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া নিরস্ত করিয়াছি এবং তাহার জড়বোধ মতে বলিয়াছি, পুলিশের হাঙ্গামা গুপ্ত কথাটি শুধু আমাকে বলিলেই হইবে। এই বোধ সন্ন্যাসী ঠাকুর পূজা শেষ করিয়া আসিলেন। (জটাজুটধারী মৌন সন্ন্যাসীর প্রবেশ) তোমরা সকলে পুণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম করিয়া এস। ঠাকুর তেল কালী বিলিপ্ত এক প্রস্তর খণ্ড; অতি আশ্রিত দেবতা। ইহার নিকট জাতি বিচার নাই; মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, সকলেরই ইহাকে স্পর্শ করিবার অধিকার আছে। বাও, স্পর্শ

করিয়া ধস্ত হও। ঠাকুরকে হুই হস্তে ধারণ পূর্বক হেটমুণ্ডে তুমিতে প্রণাম করিবে এবং তৎকণাৎ এই ঘরে আসিবে। আমি তোমাদের হস্ত কোশা-কুশির পবিত্র বারি দ্বারা ধোত করিয়া দিই। (তথাকরণ) যে নিফলক তাহার হাতে তেল কালীর দাগ লাগিবে না। আমার কথাটি তোমরা সকলে বুঝে? তুমি? তুমি? আর তুমি? (ক্রমাধারে সকলেই বুঝি ছীকার করিল) বাও, দর্শন স্পর্শন করিয়া একে একে কিরির! এস, পুণ্ডার ঘরে দেয়ী করিও না।”

বক্তৃতা শেষ হইল। একে একে উহারি কিরিয়া আসিল। সকলেরই হস্ত তেল কালীতে কলঙ্কিত, কেবল একমাত্র ভিক্রুদাস ব্যতীত। ভিক্রুদাসের হস্ত নিফলক, সাদা ধব ধবে। দস্তে কৃত্রিম হাসির বিকাশ থাকিলেও, মুখ শুক ও চরণ কম্পমান।

“ওবে রে বেটা!” এই বলিয়া রক্তবর্ণ চক্ষু বহু ডাক্তার ৮২ সিক ওজনের মুষ্টি উত্তোলন করিতেই [আহা কর কি! প্রহার যে নিবেধ!] ভিক্রুদাস সাষ্টাঙ্গে জটাজুটী সন্ন্যাসীর ঐচরণে আশ্রয় লইয়া উত্তোলিত আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিল। আর অমনি পুলিশের হাঙ্গামা হইবে না আশাস পাইয়া সে সমস্ত ব্যস্ত করিল। রাজি বেশী হইয়া গিয়াছে। সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে যখন ভিক্রুদাস ঠাঁহার বাড়ীর প্রাঙ্গণস্থ বৃক্ষতল হইতে সমস্ত অপহৃত মাল বাহির করিয়া দিল তখন সহরের বহুলোক জড় হইয়াছে এবং পুলিশেরও জানাজানি হইয়া গিয়াছে। স্মরণ্য ভিক্রুদাসকে রক্ষা করিবার উপায় রহিল না।

দারোগা ললিত গাভুলী বধ সময়ে চার্জ শীট পাঠাইয়া মোকদ্দমার জরলাভ করিলেন। পুলিশের জরখনি উখিত হইল। “গোপাল দর্পণ” সম্পাদক অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, হাঁ পুলিশ কর্ম্মণ্যই বটে। আমরা গোপন অহুসন্ধান জানিতে পারিয়াছি মৌন সন্ন্যাসীর সাজসজ্জা ও শস্ত্র কৃত্রিম; বর্ধন্যে ধরা পড়িবার তরে তিনি কথা কহেন নাই।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে

ধামাও বুধা বিলাপ-কলরব, তারতবাসী নোয়াও সবে শির,
শ্রান্ত দেহে ভবনে কিরে ওই সময়জরী গরবী মহাবীর।
সুকুটমালা নামারে রাখি ভূমে
তৃপ্ত হিরা নিবিড় দেহ-চূমে
যায়ের কোলে এলায়ে পড়ে ঘুমে, বরমনিধি স্বদেশ-জননীঃ।

নয়ন-কোণে মোহ রে আঁখিজল নিরোধি বুকে বিকল হাহাকার,
অত্যাচলে উজল হের তার ভুবন প্রাণী আঁধার গরিমার।
দিগদল দাঁড়ায় নতশিরে,
চরণতলে কমল-রেখা ঘিরে
মরণ-নদীর নীচে তীরে তীরে মহাকালের গুহ্র ফুলহার।

গগন-পথে অনেক ছিল বেল', দিনের খেরা সাদ তবু তার।
কে লুকালো মধ্য দিনের রবি ঘনিরে-আগা সঁঝের তমসার।
কাণ্ডারী গো অকুল পারাবারে
বাজী সবে লুটায় হাংকরে,
খেরার তরী স্তম্ভ পরপারে কে তিড়াবে দিনের কিনারার।

মন্দিরে ঐ তক্ত সারি সারি, ছরায় পাশে বাজী করে তিড়,
ফুলের সাজি শুকাবে আসে হার, পুকার আসন স্তম্ভ পুকারীর।
সাধন-ধামে কোন্ অমির পুরা
সাধক আজি রইলে বিগরিয়া
গড়লে দেউল বুকের পাঁজর দিয়া, তীর্থভূমি বিশ্ব ভারতীর।

বজ্রসম কঠোর ছিলে, কড় শিঙর মত সবুজ কচি প্রাণ,
জড়ার দেশে মড়ার দেশে একা মাহুয ছিলে সজীব বলীরান।
নয়ন-তটে আলোক-লেখা আঁকি
জ্ঞানের গুরু অঙ্কে দিলে আঁখি,
বিদেশ দেশে বাঁধলে মিলন-রাখী, ভুবন জুড়ি আগুন জয়গান।

—মরণ। এ তো মরণ নহে তাই, অনন্তকাল এমনি আসে বার।
অমৃতের গুহ্র কিরে আজি আঁধার-পারে দীপ্ত অমরার।
সুপের স্বর্ষি মস্ত দিল পড়ি,
সুন্দ-বিলাসীর তম্বা নিল হরি',
আলোর কুঁড়ি চরণ-রেখা ঘরি' ফুটল নবীন প্রভাত-গরিমার।

ঐপরিমলকুমার ঘোষ

কলিকাতা

১৬৮১এ বিতন ষ্ট্রীট মানসী প্রেস হইতে ত্রিশতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



মানসী ও মন্মথবাণী

১৬শ বর্ষ }
১ম খণ্ড }

শ্রাবণ, ১৩৩১

{ ১ম খণ্ড
{ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

একাত্ত কানন

অদীর্ণ বোগগ্রস্ত বাঙ্গালীর নিকট ভুবনেশ্বর খুব একটি প্রিয় স্থান হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা হইতে এখানে আসা খুব সহজ। রাজ্যে হাওড়ার মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়িলেভোর বেলা ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছানো যায়। সেখান হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দির ২৥ মাইল। রাস্তা ভাল, পোশকট প্রচলিত বান। তীর্থস্থানের চিত্র-পরিচিত পাণ্ডুর সহিত ষ্টেশনেই সাক্ষাৎকার ঘটে। মন্দিরের অনতিদূরে জটনৈক ধনাঢ্য মাড়োরাটীর স্থাপিত ধর্মশালা-বৃহৎ জিতলগৃহ। অল্প কোথাও থাকিবার বন্দোবস্ত না থাকিলে তিনদিন পর্যন্ত এখানে আশ্রয় পাওয়া যায়। একটি বাঙ্গালীর ড্রানিটেরিয়ম বা বাহ্যনিবাসও আছে।

বলা বাহুল্য ভুবনেশ্বর দেব ও তাঁহার মন্দিরই তীর্থবাজীর প্রধান জটব্য বিষয়, আর বাহ্যাদেবীর পীঠ-স্থান গৌরীকুণ্ড ও কেদারকুণ্ড। ভুবনেশ্বরের মন্দির ভারতবিখ্যাত, এখানে তাহার পরিচয় নিঃস্রোজন।

পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির ও ইহা অনেকটা এক ধরণে নির্মিত। জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণের ভায় ভুবনেশ্বরের প্রাঙ্গণও নানা দেবদেবীর মন্দিরে পূর্ণ; ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায়ের এই পন্থাটি সকল তীর্থক্ষেত্রেই সুপরিচিত।

পুরীর ভায় এখানকার মন্দিরগুলিরও অধিকাংশ বহির্দেশে নানা কারুকার্য খচিত সূর্তিতে শোভিত। ভুবনেশ্বরের ভোগ ও জগন্নাথদেবের ভোগের অমুরূপ। জগন্নাথদেব খুব সম্ভবতঃ এক সময় বৌদ্ধধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তীর তলে আগনার পূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি হিন্দুর দেবতা। বিজুতে পরিণত হইয়া জ্ঞাতা বলরাম ও ভগিনী সূতদ্রার সহিত ভক্তের পুন্সাজলি গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সাম্য, বৌদ্ধধর্মের জাতি-বর্ণ-নির্কিশেষে আহাৰ্য্য গ্রহণ স্বয়ং “কেন্দ্র” হইতে অপনায়িত হইতে যেন নাই। তাই সেখানে চণ্ডালোচ্ছিষ্ট পক্ষার প্রসাদ এখনও ব্রাহ্মণের

ভোক্তা। হিন্দু জগতে আর কোথাও এমনটি পাইবে না। ভুবনেশ্বরের মহাদেব কোন কালে অস্ত্র কিছু ছিলেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু ক্রীক্লেজের দেবতার এত নিকটে থাকায় তাঁহার প্রসাদও বিক্রয়। প্রসাদ অনেকটা একরূপ, তবে জাতিভেদের গুণী এখানে পুরীর ভায় শিখিল নহে এবং প্রসাদও ততটা প্রকাশ্যভাবে বিক্রীত হয় না।

পাণ্ডারা ভুবনেশ্বরের প্রান্তরময় দেহে গলা, যমুনা ও সরস্বতীর ধারা ইত্যাদি কত কি দেখাইতে সর্ব্বদাই দিব্যচক্ষু। কালাপাণ্ডারের শুভাগমন সঙ্গেও ভুবনেশ্বর এখনও মন্দির ও দেবতার পূর্ণ। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় কেবল মন্দির। কোনটা বস্ত্রে রক্ষিত, কোনটা পরিভ্রম্য, কোনটা শুদ্ধ। পাণ্ডারা কেহ বলে যে এখানে উনেকোটি দেবমন্দির, কেহ বলে সওয়া লক্ষ হইতে একটি কম। অকশ্যজের অতটা চর্চ্চা করিবার অবসর পাই নাই, তবে মোটা বুদ্ধিতে বুঝিয়াছি পাণ্ডা-দিগের লক্ষ বা কোটির জ্ঞান খুব গভীর না হইলেও শিবমন্দিরের আধিক্যে ভুবনেশ্বর বারাণসীর প্রতিদ্বন্দ্বী।

মর্থবাণীর খুব নিকটেই বিন্দুসরোবর, পাণ্ডা-দিগের মতে ইহা মহাদেবের জিশ্মাধাতের ফল। প্রব্রতত্ববিৎ বলেন ইহা ও ইহার তীরস্থ অনন্ত বাহুদেবের মন্দির বাঙ্গালী পণ্ডিত ভবদেব ভট্টের কীর্তি। সরোবরটি যে বহু প্রাচীন তাগ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। হইতে পারে আরও প্রাচীন বিন্দুসরোবর: ভাদেব ভট্টের চেষ্টায় বর্তমান বিন্দুসরোবরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ভবদেব ভট্টও অধুনিক লোক নহেন; তাঁহার আবির্ভাব খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে অনুমিত হইয়াছে। সরোবরের বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে দীপকৃতি অংশে দেবমন্দির। স্নানযাত্রার সময় নৌকাধারা দেবকার্য সাধিত হয়, অস্ত্র সময়ে নৌকা নিমজ্জিত থাকে—সুতরাং মন্দিরে বাইতে সম্ভরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সম্ভরণও ঠিক নিরাপদ বলিতে পারি না, কারণ সরোবরে কুস্তুরাদির অস্ত্রাব নাই। দেবতার মাহাত্ম্য সঙ্গ ও সাধারণ লোকের পক্ষে এই বিশ্বাসের আশ্রয় উপেক্ষণীয় নহে।

বিন্দুসরোবরে স্নান তর্পণাদির পর অনন্তবাহুদেবের ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যাওয়াই তীর্থযাত্রীর পক্ষে সনাতন প্রথা। বিন্দু সরোবরের তীরেই ভবানী শব্বরের মন্দির। ভবানী শরানাবহার; চরণদ্বয়ের নিকট শিবলিঙ্গ। আদর্শটি যেন বাঙ্গালী ক্রমে নিজস্ব করিয়া তুলিতেছে তাহা বলা বোধ হয় নিম্নারোহণ। কপিলেশ্বরের মন্দির কিছু দূরে—খুব প্রাচীন। কপিলেশ্বরও মহাদেব, তাঁহার প্রান্তরময় দেহে একটি রক্ষু আছে, পাণ্ডারা তদ্বারা নিখাস প্রেধাস চলে বলিয়া তক্ত বাজীর বিন্দুরোহণাদানের চেষ্টা করে। রক্ষুদ্বারে লেখকের ভায় অবিখ্যাসী হস্ত-চালন করতঃ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও পাণ্ডারা নিরস্ত হইবার নহে, বলিবে ভোগের সময় চলে অথবা কখন কখন চলে। বাহা হউক ঠাকুরকে যে সময় সময় নিখাস প্রেধাস কেলিতে হয় অস্ত্র সময় তাহার আরোহণ হয় না, ইহাও তাঁহার মাহাত্ম্যেরই পরিচায়ক। আমরা (ওড়িসার মতে) অগ্রহারণ সংক্রান্তির দিন কপিলেশ্বর দর্শনে গিয়াছিলাম। দিনটি পবিত্র, অনেক তক্ত “ধরা” দিয়া মন্দিরে শুইয়া পড়িয়া আছে দেখা গেল; ইহার অবশ্যই কোন না কোন অর্থাৎ লাভ না করিয়া উঠিবার পাত্র নহে। মন্দির প্রাঙ্গণে এখানেও অনেক দেবতা ছোট খাট মন্দির লইয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহার প্রত্যেক মন্দিরে দর্শনপ্রার্থীর প্রণামী সাধারণতঃ এক পরস।

বিন্দুসরোবরের তীরস্থ অনন্ত বাহুদেবের মন্দির কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা প্রধান দেবতা। ধানে ধারে অস্ত্র দেবতারও সেবারেতের অস্ত্রাব নাই। মন্দিরের প্রাচীর গায়েই বগেশ্বর হরিবর্ষদেবের সচিব বাঙ্গালী পণ্ডিত “বালগলভা ভূজঙ্গ” ভবদেবভট্টের প্রশস্তি। এই প্রশস্তি যে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা তাহা প্রশস্তি তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মাজাই জানেন। প্রান্তরে উৎকর্ষ প্রশস্তি প্রাচীর গায়ে বসাইয়া রাখা হইয়াছে।

নাগেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, বেবেশ্বর ইত্যাদি নামধারী আরও বহু শিবমূর্ত্তি এখন ভুবনেশ্বরে অনাদৃত অবস্থায় আছেন।

কেদার কুণ্ডের কুণ্ডায়ই ভুবনেশ্বর বাঙ্গালীর উপ-নিবেশে পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছে। এই কুণ্ডই প্রস্তবণের খেঁতাত জল ব্যাধিগ্রস্তের পক্ষে কল্যাণ-জনক বলিয়া অনেক চিকিৎসক মত প্রকাশ করেন। জলধারণের অভাব করেণী কুণ্ড নির্মিত হইয়াছে—এক কুণ্ড হইতে অল্প কুণ্ডে জল নির্গমনের ব্যবস্থা আছে। কেদার কুণ্ড ক্ষুদ্র, পানীর জলের ভ্রম বেশ যত্ন সহকারে রক্ষিত। গোবী কুণ্ড প্রভৃতি অপরা কুণ্ড গুলি বৃহৎ—তাহাতে অবগাহনাদি ক্রিয়া চলিতে পারে। কুণ্ডের পার্শ্বে কেদারনাথ মহাদেব ও কৃষ্ণ প্রস্তর খোদিত গোবী দেবীর মন্দির। এই প্রস্তবণের জল বতই খ্যাতিলাভ করিতেছে, ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণ-গ্রস্ত বাঙ্গালী ততই দলে বলে ভুবনেশ্বর আক্রমণ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।

জলের উপকারিতা সম্বন্ধে কিন্তু মতভেদ আছে। অনেকেরই ধারণা এই জল কোষ্ঠশুদ্ধির অমোঘ ঔষধ, কিন্তু কেহ কেহ বলেন উহাতে কোষ্ঠ শুদ্ধ না হইয়া আরও বদ্ধ হইয়া যায়। আমার অল্প কয়েক দিনের ব্যবহারে মনে হয় টহা পরিপাকের সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি বিষয়ে কোন উপকার পাওয়া গিয়াছে কিনা নন্দেহ। ইহার যে কোন-একটি বিশেষত্ব আছে তাহা নিশ্চিত তবে সেই বিশেষত্ব কোন ব্যাধিতে উপকারী তাহা বিশেষজ্ঞেরাই বলিতে পারেন।

ভুবনেশ্বরে বাঙ্গালীর অনেক নতুন নতুন বাড়ী নির্মিত হইতেছে। রক্তাক্ত মৃত্তিকা, মুক্ত বায়ু, প্রস্তবণের জল, চিকিৎসকের উপদেশ—কলিকাতাবাসী যে সহজেই আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে স্থানটি যদি কেহ নিঃসন্দেহ মনে করেন তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। বাঙ্গালীর চিরপরিচিত ম্যালেরিয়া এখানে বেশ প্রতিক্রিয়া বিস্তার করিয়াছে। ওড়িয়ার কোন ভ্রমণকারীই বা করে নাই?

যদি কেহ জল বা বায়ু ব্যাভীত অল্প কিছু পান বা ভোজনের অল্প বিশেষ উৎসুক থাকেন তবে তাহার অল্প স্থান হইতে জিনিষ-পত্রের ব্যবস্থা করিলেই ভাল

হয়। স্থানটি বাঙ্গালীর জার “স্বচ্ছতা স্বচ্ছতা” নহে, এখানকার চাউল ও ডাল খাইতে হইলে তাহার সহিত কিছুই স্থানীয় ককর ও গলাধঃকরণ করিতে হইবে। মৎস্ত এখানে একটা দুঃখাপ্য বস্তু, কল তরকারীও দুঃখাপ্য নহে। সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়। যে ডাব পুরীতে এত স্থূলত তাহা ভুবনেশ্বরের হাটের দিন সংগ্রহ না করিলে পাওয়া যাবে না। তরকারীও খুব কম প্রকারই দৃষ্টিপথে আসিবে। দুগ্ধ ও দ্রুত অবশ্য কলিকাতা অপেক্ষা স্থূলতঃ মিলিবে। গরু ও মহিষের মাখন বিনা বিচারে মিশ্রিত হইলেও স্থানীয় লোক তাহা গালাইয়া যে জিনিষী বিক্রয়ার্থ আনে সেটা দ্রুত,—চর্কি মিশ্রিত একটা দুর্গন্ধ দ্রব্য বিশেষ নহে।

ভুবনেশ্বরে এত দেব দেবীর স্থান কেন? দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন বোধ হয় আরম্ভ প্রাধানতঃ বৌদ্ধ-দিগের নিকট শিখিয়াছি। ভুবনেশ্বরের অনুরে—৩৪ মাইল দূরে—অন্তর্গরি ও উদয়গরি। এই দুইটা অল্পচল শৈল সরকারী রাস্তার উভয় দিকে পাশাপাশি ভাবে অতীতের যে কি এক মোহিনী স্মৃতি বক্ষে ধারণ করতঃ দণ্ডায়মান আছে তাহা কল্পনার নেত্রে তিন্ন বোধগম্য নহে। কত বৌদ্ধ ও জৈন সাধুপুরুষের পদরেণু এই শৈলশৃঙ্গল পবিত্র করিয়াছে তাহা কে বলিবে? আর পূর্বতগায়ে প্রাচীন ওড়িয়ার শিল্পকলা এইখানে আসিলেই বুদ্ধিতে পারা যায়। ওড়িয়া যে “মেড়া” বা মেঘ নহে, ২৫০০ বৎসর পূর্বেও সে স্তম্ভিগুণ কলাবিশ্ভার জগৎকে স্তম্ভিত করিতে পারিত, তাহা এইখানে আসিলেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পূর্বত কাটির কত যে গুহানামধারী আচ্ছন্নপ্রদ গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে—তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকেও বিস্ময়প্রদ। কত জীবজন্তু, দেবতা ও মানবের মূর্ত্তিতে যে এইসকল গুহা এবং তাহার প্রাঙ্গণ ও প্রাচীর অলঙ্কৃত তাহা দেখিবার বিষয়। ইহার এক সময় এই সকল গুহা অলঙ্কৃত করিতেন তাহাদের আহাির বিহারের চিন্তা ছিল না, চাকুরীর চিন্তা ছিল না, কল্যাণ বিবাহের চিন্তা ছিল না, ছিল ধর্ম-চিন্তা। যথেষ্ট

আনীত কলসুল বা অস্ত্র কোন আহারেই তাঁহার। সচেষ্ট থাকিতেন, সংসারকে তাঁহার। “চির বাসস্থান” বলিয়া মনে করিতেন না। জয়া বিজয়া শুভা, পশেণ-শুভা, সর্পশুভা, ব্যাঘ্র শুভা. ‘সর্প মর্ত পাতাল’ নামক ত্রিভল শুভা, ইত্যাদি কত শুভাই এখন পর্যন্ত কতনামে পরিচিত হইয়া মর্দকের চক্ষু আকর্ষণ করিতেছে। কোন কোন শুভার অবস্থান দেখিলে পূর্বে তাহা বৌদ্ধ বিহার ছিল বলিয়া মনে হয়, কোন শুভার এখনও শিলালিপি পরিস্ফুট। বিখ্যাত হস্তিগুফা এখনও জৈন নৃপতি খারবেলের কীর্তি কাহিনী দেখে বহন করিতেছে। শুভার আধিক্য উদয়গিরিতে। ইহার উপরিতাগে একটি কুস্ত এখনও ইন্দ্রদেবের রূপায় জলপূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু সে যতি সন্ন্যাসী এখন নাই, সে জলের সন্ধ্যা-হারও নাই। শুভাগুলি এখন পরিত্যক্ত, সাধুগণের অপরাহ্ন সদালাপ এখন অতীতের বস্ত। সাহ্য আরতির পরিবর্তে বস্ত্র খাপদের চীৎকারেই এখন শুভাগুলি সুখরিত। খণ্ডগিরিতেও কার্ণকার্য খচিত শুভার অভাব নাই; তন্মধ্যে অনন্ত-শুভা ও নবমুনির শুভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পাহাড়ের উপর এখন একটি জৈন মন্দির বিরাজমান। সেখানে নিরন্তরভাবে অর্চনাদি হইয়া থাকে—আদিনাথ, সন্তানাথ, পরেশনাথ প্রভৃতির মূর্তি।

আর একটি অতীত কীর্তির স্থান বৌলীপাহাড়। ইহা ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় ৫১৬ মাইল দূরবর্তী; এখানে রাজাবিরাজ অশোকের অশ্রুশাসন এখনও উৎকীর্ণ। কলিঙ্গজয়ের পর সীমন্তবর্তী রাজপুরুষদিগের উপর ব্যবহার ইহাতে নিয়মিত হইয়াছে।

অবশ্য ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচারক শাস্ত্রের অভাব নাই। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ মনে করেন ভুবনেশ্বরই মহাত্ম্যরত্নোক্ত স্বয়ম্ভূ বন। কিন্তু ভুবনেশ্বরই যে ঠিক খবি নিঃস্বিত প্রাচীন স্বয়ম্ভূ বন তাহা নিঃশঙ্কোচে বলা কঠিন। পরবর্তী সময়ে ইহাকে একাত্তকানন ও দ্বিতীয় বাণী বলা হইয়াছে, এমন কি মহাদেব বারানসীধার পরিত্যাগ করতঃ এই স্থানেই বাণ করিতেছেন একরূপ শাস্ত্রীয়

বচনেরও অভাব নাই। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শিব-পুরাণ, একাত্তপুরাণ, একাত্তচন্দ্রিকা, উৎকলখণ্ড প্রভৃতি বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ভুবনেশ্বরের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আর “ভুবনেশ্বর মাহাত্ম্য” ত আছেই। কোন তীর্থ বাজী উপস্থিত হইলে মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী পণ্ডিত তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু স্থানটি বতাই প্রাচীন হটক, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির নিকট অর্ধপ্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান ভুবনেশ্বরের মন্দির খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। শিলালিপির বর্ণনার পাওয়া যায় মন্দিরটি উৎকলরাজ অনিরক ভীমদেবের কীর্তি। তাহা হইলে ইহা খৃঃ দ্বয়োদশ শতাব্দীর মন্দির হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ মূল মন্দির ইহার পূর্বে হইতেই বর্তমান ছিল। অতঃপর লিঙ্গরাজ কতদিনের তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অস্ত-গিরি ও উদয়গিরিতে শুভার আধিক্য ও মর্দ্যনাথনার বিরাট আয়োজন দেখিয়া মনে হয় পুরাকালে এই অঞ্চল আর্ধ্য সভ্যতা’ একটি কেন্দ্র ছিল এবং ভুবনেশ্বর সম্ভবতঃ সেই কেন্দ্রেরই তদাধিপতি। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ইউয়ানচাং খণ্ডগিরি ওজ্জ্বলিত উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে নীরব। ইহাতে মনে হয় ভুবনেশ্বর তখনও পরিব্রাজকের মনোযোগ আকর্ষণের উপযুক্ত প্রমাণ লাভ করে নাই। রেলওয়ে লাইন খুলিবার পূর্বে এখানে তীর্থবাজীর সমাগম খুব বেশী ছিল বলিয়া বোধ হয় না—দগরাধ কেন্দ্রই বহু লোককে আকৃষ্ট করিত। বর্তমান সময়ে ইহার খেতাত প্রসারণই বাঙ্গালী বাজীর প্রধান আকর্ষণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মাহাত্ম্য এত প্রচারিত হইয়াছে যে ব্যাধিগ্রস্ত বাঙ্গালীর নিকট লিঙ্গরাজ অপেক্ষা প্রসারণই এখন অধিক প্রিয়। মন্দির বত বড়ই হটক, দেবতা প্রায় সকল তীর্থস্থানেই বায়ু ও আলোক হইতে হুয়ে এক প্রকার গহ্বরের মধ্যে থাকেন। তাঁহার এইরূপ অবস্থান মাহাত্ম্য-বৃদ্ধির জন্য কি পাণ্ডাদিগের সহায়তা আবশ্যক করিবার জন্য বলা কঠিন।

ত্রিবিংশতম তত্ত্বাচার্য।

আশাহত

(গল্প)

৪

অপরাজিত বাড়ী কিরীয়া চাউলের পুটুনিটা হোরাকের উপর নামাইয়া রাখিয়া পরম ডাকিল—“গরব।”

কোন উত্তর না পাইয়া, পরম ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সমস্ত নির্যাত্তি গোবরা অলস মননে শবার উপর পড়িয়া আছে। পরম জিজ্ঞাসা করিল, “মা কোথা রে, গোবরা?”

গোবরা জড়িত স্বরে কি একটা উত্তর দিল ভাল বুঝিতে পারা গেল না। পরম তাহাকে স্বাগ্রহে কোলে তুলিয়া লইতে গিয়া দেখিল, তাহার গায়ে আগুনের মত উত্তাপ; অরে সমস্ত শরীর পুড়িয়া বাইতেছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও, গরবী কিরিল না দেখিয়া, পরমের রাগ হইল। এই জ্বর ছেলেটাকে কেলিয়া সে পাড়া বেড়াইতে গিয়াছে? পরম জোর করিয়া ভাবনার বেগটাকে কিরাইতে চেষ্টা করিলেও তাহার কেবল মনে হইতেছিল, হাজার হউক সংহত! গোবরার প্রতি গরবীর যে মেহ দেখিয়া পরম একদিন আকুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহাই তাহার মনে বিরুদ্ধ ভাবের সঞ্চার করিতে লাগিল। কেন সে গোবরাকে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল? নিজের নির্বুদ্ধিতাকে সহস্র ধিকার দিয়া, সে গোবরাকে কোলে লইয়া শুইয়া পড়িল।

ছপ্তর হইতেই গোবরার অরবোধ হইতেছিল। অনেক দিনের চাপা জ্বর আবার ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া গরবী একটু চিন্তিত হইল। সে ভাবিয়াছিল রাত্রি বেদেনী এইরূপ রোগের ঔষধ জানে। রবিবারের দিন তাহার মাহুলীতে পুঁহিয়া, পলাজলে ধুইয়া, তাহা ছেলের গলার খুলাইয়া দিলে, যে কোন প্রকারের দূষিত জ্বর একদিনের মধ্যেই পলাইয়া যায়।

সেদিন রবিবার। স্নাতক গোবরা ঘুমাইয়া পড়িলেই গরবী কালবিলম্ব না করিয়া, পাঁচ পরশা দক্ষিণা দিয়া, বেদেনীর নিকট একটা মাহুলি সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল।

কিরীয়া আসিয়া হোরাকের উপর চাউলের পুটুনিটা দেখিয়া গরবী বুঝিতে পারিল, পরম কিরীয়া আসিয়াছে। সে ঘরের মধ্যেই আছে মনে করিয়া ডাকিল—“গোবরার বাপ!”

পরম সাড়া দিল না।

গরবীর সন্দেহ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, “গোবরা ভাল আছে ত?”

ঘর হইতে পরমের বিরক্ত স্বর শোনা গেল, “এত মায়ার আর কাব কি?”

গরবীর মাথার অকস্মাৎ একটা উষ্ণ রক্ত-প্রবাহ ফুটিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, স্বামীর মনের সন্দেহ ত এতটুকু কাটে নাই। সে এতদিন শুধু ব্রাহ্ম ধারণার বশবর্তী হইয়া পরের জিনিসকে আপনার করিবার যথা চেষ্টা করিয়া মরিয়াছে। তাহার মূল্য অতিমান আবার জাগিয়া উঠিল।

মাহুলিটি কপালে ঠেকাইয়া, গরবী প্রতিদিনের মত রান্ধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর এক পাথর তাত সূর্যকে ঘরের ভিতর রাখিয়া দিয়া পরমকে জানাইয়া দিল যে, তাহার আহাৰ্য্য প্রস্তুত।

পরম বলিল, “আমি কিছু খাব না।”

গরবী সে কথা কণ না দিয়া নিজে কতকগুলি তাত লইয়া তাহার দিকে পিছু কিরীয়া থাইতে বসিল। দুই এক গ্রাস যুখে দিয়াই, পাথরখানা হাতে করিয়া, গরবী উঠিয়া পড়িল।

অন্ধকার হইলে কেয়ারসনের ডিবেটা ঘরের কোণে আলিয়া দিয়া, এক বাটা দুধ ও জলের গেলাসটা গোবরার মাথার কাছে রাখিয়া, গরবী নিঃশব্দে পুথক গৃহে গিয়া শয়ন করিল।

গভীর রাত্রিতে আরও জলের আবশ্যক হওয়ার, পরম উঠিয়া সমস্ত ঘর খানি অহুস্কান করিল। কিন্তু জলের কলনীটা না পাওয়ার বাহিরে আসিয়া গরবীর ছায়ায় থাকি দিয়া ডাকিতে লাগিল, “গরবি, ও গরবি!”

পরমের অর কাণে বাইবামাত্র গরবী পাশ ফিরিয়া শুইয়া জোর করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

কোনরূপেই তাহার উত্তর না পাইয়া বিরক্ত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়া পড়িল “আচ্ছা।”

অগত্যা ঘটটা লইয়া পুকুর ঘাট হইতে জল আনিয়া পরম গোবরার সুখে দিল।

৫

সকাল না হইতেই গরবী ঘর হইতে বাহির হইয়া রোগীর ঘরের ছায়ায় নিকট দাঁড়াইল।

ঘরের ভিতর হইতে একটা অক্ষুট বয়লা-মূলক কাতর শব্দ এবং দুই চারিট অসব্দ প্রলাপ-বাক্য ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না।

আতঙ্কে গরবীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। ছুটিয়া তুলসী তলার গিরা, গলার আঁচল দিয়া বার বার প্রণাম করিয়া বোড়হাতে বলিতে লাগিল, “হে মা কালী, হে মা জগদ্ধাত্রী, এবার গরবীর সুখ রক্ষা কর।”

পরম বাহিরে আসিলে গরবী তাহার প্রতি চাহিতে পারিল না। অনাহারে, অনিদ্রায়, উৎকর্ষার তাহাকে অশানোখিত প্রেতের ভায় দেখাইতে হৈল।

যে সকল প্রতিবেশী গোবরার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনকে প্রেমের একমাত্র চিহ্নসক বিত্ত কবিরাজের নিকট পঠাইয়া দিয়া, পরম সুখে চোখে একটু জল দিতে লাগিল। লোকটা

অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, তাহার মাতার চিকিৎসার দরুন, ছয় বৎসরের বাকী পাঁচটাকা সাড়ে তিন আনা পরিশোধ করিয়া না দিলে, বিত্ত কবিরাজ কোন মতেই পরমের বাড়ীতে পদার্পণ করিবে না।

গরবী কি একটা কথা ভিজ্জাগা করিতে বাইতে-ছিল, কিন্তু পরমের অবস্থা দেখিয়া চূপ করিয়া গেল।

বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার শারীরিক বয়সা বাড়িয়া গেল। জোর করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে লাগিল। নিরুপায় পরম তাহার সুখের দিকে চাহিয়া তন্ত্রিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

যখন তাহার চৈতন্ত্য ফিরিয়া আসিল, দেখিল, মহকুমার সরকারি ডাক্তার তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া।

ডাক্তারের পা ছ’খানা জড়াইয়া ধরিয়া পরম চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল, “আমার গোবরাকে বাঁচিরে দাও, ডাক্তারবাবু!”

প্ৰথমকে আশ্বাস দিয়া ডাক্তার বলিল “রোগীর ঘরে আরও আলো বাতাস দরকার।”

সবে মাত্র পরমের এই একখানি ঘর সমল। গরবী যে ঘরে শুইয়া ছিল, তাহা মহুয়াবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। পরম অকুল পাথারে পড়িয়া গরবীর সুখের দিকে ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

ঘরে একটি ক্ষুদ্র গবাক ছিল। নিশ্চেষ্টরোগন বোধে নানারূপ তৈজস পত্র তাহা অনেক দিন হইতে রুদ্ধ ছিল। গরবী একে একে সে গুলাকে টানিয়া নামাইয়া কেলিল। গবাকের উইজীর্ণ কপাট ছইখানা টানিয়া খুলিতেই, রুদ্ধ বায়ু কতকটা বাহির হইয়া যাওয়ার, ঘরের গুমট অনেক কমিয়া গেল।

কতকগুলো উৎকট পথের ব্যবস্থা করিয়া প্রেসক্রিপশন খানি পরমের হাতে দিয়া, ডাক্তার বিদায় হইল।

ইতিমধ্যে পরমের মনটা অনেক লঘু হইয়া

আসিয়াছিল। ডাক্তারকে যে গরবীই ডাকিয়া আনিয়াছিল, সে বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ ছিল না।

গরবীর উপর অস্ত্রের বিরক্তির ভক্ত তাহার মনটা অগ্রসর হইয়া উঠিল। মনের তিক্ত ভাবটাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিয়া পরম বলিল, “গরব, রাগ করিস্নে। ছুৎ তাপের শরীর, সব সময় মন্টা ঠিক থাকে না।”

গরবী অভিমান ভরে প্রেসক্রিপশ্যন্ খানা হাতে লইয়া চলিয়া গেল।

কণপরে বিবিধবর্ণের ঔষধপূর্ণ ছই তিনটি শিশি লইয়া গরবী বধন পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল, পরম দেখিল একমাত্র লোহার কড়া ছাড়া গরবীর উত্তর হস্ত শূন্য। পরম বিবাহের সময় গরবীকে রূপায় বালা, খাঁক ও চার গাছি মল কিনিয়া দিয়াছিল। গরবী খাঁক ও মল তুলিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু বালা বোড়াটা একদিনের অস্ত্র হাত ছাড়া করে নাই।

পরম জিজ্ঞাসনরনে গরবীর মুখের দিকে চাহিল। গরবী সুখখানা নিচু করিয়া চলিয়া গেল।

একটা ছোট কাঠের বাসে গরবীর খাঁক, মল ও পিতৃদত্ত একটি সোনার নখ সবস্নে রক্ষিত হইত। গরবী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে, পরম সত্তর্পণে বাক্সটি খুলিয়া ফেলিয়া দেখিল, তাহার ভিতর কিছুই নাই। সে এক মুহূর্তে ব্য্থিয়া ফেলিল, সরকারি ডাক্তারের মোটা দর্শনীর সংস্থান কোথা হইতে হইয়াছে।

এতটা যে হইতে পারে, পরম তাহা ভাবিতে পারে নাই। গরবীর গহনা করখানির কথা অনেক বার তাহার মনে উঠিয়াছে। কিন্তু গোবরার প্রাণ রক্ষার জন্য, গরবী যে তাহার ব্যক্তিগত জীবন হইতে কোন প্রকারেই বঞ্চিত হইতে পারে না, তাহা সে একরূপ স্থির করিয়াই রাখিয়াছিল। গরবীর মুখে নতুন করিয়া অস্বীকৃতির বাক্য শুনিয়া নিজের মানিটাকে আর বাড়াইয়া তুলিতে তাহার ইচ্ছা হয় নাই।

পরমের ছই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিয়া রাখিল, উঠুক আগে গোবরা বিছানা ছেড়ে, তারপর দেখা বাবে কে কাকে জব্দ করে। রতন চাটুয্যের কাছে তমস্কর দিয়ে দশ গজা টাকা ধার ক’রে এনে, মহাজনের হাত থেকে গরবীর গহনাগুলো উদ্ধার ক’রে দেওয়া চাই-ই।

যোগীকে ঔষধ খাওয়াইয়া গরবী অর্দ্ধ কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, পরমের সুখখানা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি কাঁচ শেষ করিয়া কতকগুলো পাতা আনিয়া পরমের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

পরম হাসিয়া বলিল, “একটু মুন লক্ষা নিয়ে আয়।”

মুন লক্ষা আসিলে পরম ছইদিনের আহার একে-বারেই সম্পন্ন করিয়া ফেলিল।

হাত মুখ ধুইয়া পুকুরের ধারে উঠিবারাজ রতন চাটুয্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “গোবরা কেমন আছে রে, পরম?”

পরম গড় হইয়া চাটুয্যেকে প্রণাম করিয়া বলিল, “এখনো কিছু বিশেষ বুঝতে পারা যায়নি দা ঠাকুর।”

চাটুয্যে সুখখানা গভীর করিয়া বলিল, “কেন, বড় ডাক্তার এনেছিল, বিশেষ বুঝতে পারছিস্নে?”

“এই ত মোটে ওষুধ পড়েছে, এর মধ্যে আর কি এমন বুঝতে পারব?”

“ডাক্তার কত টাকা নিয়ে গেল?”

“আমি তা বলতে পারিনি দা ঠাকুর, গরবী জানে।”

“সতীন পোর অস্ত্রে গরবীর খুব মাথা ব্যথা দেখছি যে?”

“দা ঠাকুর, বললে বিশেষ ক’বে না, গরবের মত ঘেয়ে একালে দেখা যায় ন।”

চাটুয্যে একটু মুহ হাসিয়া উত্তর করিল, “দ্বিতীয় পক্ষ আবার কার কোন কালে মন হয় রে?”

চাটুয্যের তীক্ষ্ণবাণটা পরম অকাতরে সফল করিয়া গেল। কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চাঁচুয়ে পুনরায় বলিতে লাগিল, “ছেলেটার পুরোণো অরটা কি শুধু শুধুই জেগে উঠল? বাবু—এখন থেকে ওরূপজ্ঞাগুলো দেখে শুনে খাওয়াসু। সৎ মায়ের ওপর অভটা বিশেষ ভাল নয়।”

এই বলিয়া জ্যেষ্ঠাশ্রুগর রাজপরিবারের উদাহরণ তুলিয়া রতন চাঁচুয়ে পরমকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিল যে, স্বয়ং নরনাগরণ পর্যন্ত যখন বিমাতার হস্ত হইতে পরিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তখন এক কোঁটা বাগদীর ছেলের ত কথাই থাকিতে পারে না।

পরমের মস্তিষ্কের মধ্যে কি একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়া গেল। সে এক নিম্নাঙ্গে ছুটিয়া গিয়া রোগীর মাথার নিকট হইতে ঔষধের শিশি করটা তুলিয়া লইয়া, বাহিরে আনিয়া ঢালিয়া কেলিবার উপক্রম করিল।

গরবী ছুটিয়া আসিয়া পরমের হাত ছুঁখানা চাপিয়া ধরিয়া চৌকর করিয়া উঠিল, “হিন্বে কেনেছিস্ নাকি?”

উদ্ভ্রান্তের ভাৱ বিস্তারিত নয়নে চাহিয়া, পরম হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “সত্যি বল, তুই—

পরমের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। শিশি করটা পরবীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া, ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

পরবীর রমণী জ্বর অভিমানের প্রবল উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল। প্রবল পরাক্রমে অন্তরের তাবটাকে চাপিয়া রাখিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল “কথাটা খুলে বল্লেই হ’ত। আমি তোমার ছেলেকে বিষ দিয়েছি, না? আর যদি তোমার ছেলের নাম মুখে আনি, আমার নাম গরব বাগদীনী নয়—নয়—নয়।” এই বলিয়া নিজের কর্ণধর সঙ্গে-সঙ্গে মর্দন করিয়া সবচেয়ে দাঁটি কাঁপাইয়া প্রস্থান করিল।

৬

পরদিন গরবী অনেক বেলা পর্যন্ত উঠিল না। তাহার অন্তর অলিয়া বাইতেছিল। এতবড় নিম্নাঙ্গানির বোকা মাথার করিয়া পরমের সংসারে একতিল বাস

করিতে আর তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। সংসারের কাঁবে যোগ দিতে বাঙরা তাহার পক্ষে মরণের অধিক বলিয়া মনে হইতেছিল। কিসের জন্ত সে খাটিয়া মরিবে? পরমের সংসার তুলিয়া গেলেই বা তাহার ক্ষতি কি?

কিন্তু যখন তাহার মনে পড়িল যে, কণ্যকার ভিন্না জালখানা সমস্তরাজি মেলিয়া দেওয়া হয় নাই এবং নদীর মায়ের কাছে এখনই ছুপ আনিতে না গেলে, তাহার প্রাণ্ডি সবক্ষে সন্দেহ আছে, তখন সে একটু চকল হইয়া উঠিল।

সে আশা করিতেছিল, রুধ পুত্র লইয়া বিব্রত পরম তাহাকে আগে ডাকিবে। সে যে আগিয়া উঠিয়াছে তাহা জানাইবার জন্ত ঘরের মধ্যে এটা সেটা নাড়িয়া সাড়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভাতের রৌদ্রে যখননা সমুজ্জল হইয়া উঠিলেও কেহ তাহাকে ডাকিল না। পরম যে বাহিরে আসিয়াছে গরবী তাহারও কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিল না। অগত্যা মুখ খানি তারি করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোবরার ঘর খোলা ছিল। গরবী গোপনে মুখ বাড়াইয়া দেখিল ঘরে কেহই নাই।

পরমকে না দেখিয়া গরবী তত বিস্মিত হইল না, কিন্তু রোগা ছেলেটাকেও বিছানার না দেখিয়া—তাহার বুক খানি কাঁপিয়া উঠিল। রাজির নিশ্চকতার মধ্যে গোবরা কঁাকি দিয়া পলাইয়া যায় নাই ত? পরম কি এতই বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছে যে, গোবরার সঙ্গে শেষ দেখা করিবার জন্তও সে গরবীকে ডাকে নাই?

গরবী কাঁদিল না। অসম্ভব শক্তিতে জ্বরের রুদ্ধ বেদনা গুলাকে চাপিয়া রাখিয়া, সে পুঞ্জহীন পিতার সম্মুখীন হইবার জন্ত প্রস্তুত হইল।

পরম কিছু কিরিল না।

বড়ই বেলা হইতে লাগিল, গরবীর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ঐতিবেশীদের কাছে নিজের স্বামী পূজ্যের সংবাদ কি রূপে আনিতে বাইবে? বাস্তবিক

ছেলেটা যদি মরিয়াই গিয়া থাকে এবং পরম তাহার সংকারের জন্ত সন্ধান পৰ্য্যন্ত গিয়া থাকে, এক ঘরে বাস করিয়া গরবী তাহার সংবাদ জানে না, এ লজ্জা যে রাখিবার স্থান নাই। গরবী তরু তাবে পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নদীর মা গোবর কুড়াইয়া কিরিতেছিল। গরবীকে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, “তুই কি ম’রে ছিলা, গরবী? এতবড় রোগা ছেলেটা নিয়ে হুকোশের পথ চলে যেতে দিলি?”

গরবীর দেখে গ্রাণ আসিল। গোবরা তাহা হইলে বাঁচিয়া আছে। তাহার বাপ, তাহাকে কোন্ দুরম্বে লইয়া গিয়াছে। নিখাস কেলিয়া বলিল, “আমাকে কি ব’লে গেছে?”

“বলিস্ কি?”

“কেন বলবে? আমি তার কে?”

“ছেলেটাকে নিয়ে মেড়াবহের মনসা ঠাকুরের কাছে হত্যা দিতে গেল, আর তাকে ব’লে গেল না?”

গরবী কপালে হাত ঠেকাইয়া মনে মনে বলিল, “ঠাকুর, গোবরার পানে মুখ তুলে চেও।”

নদীর মা থাকিতে না পারিয়া পুনরায় বলিল, “ঘরের সাহসকে কোন কথা না জানিয়ে, চুপ চুপি বাড়ী থেকে চলে গেল? ও মা, কোথা বাব গো।”

“তার ইচ্ছে হ’ল, চলে গেল, আমি তার কি করব?”

নদীর মা এত সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। সে একটি একটি করিয়া সমস্ত জানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

গরবী কোন কথাই প্রকাশ করিল না। নদীর মা ভিরয়ের ব্যাপারটা সমস্ত জানিতে না পারিলেও ইহা স্পষ্ট অনুমান করিয়া লইল যে, দাবী জীর মধ্যে একটি কিছু বাটরাছে।

গরবী বলিল, “নদীর মা, আমার একটা কথা রাখবি?”

নদীর মা জিজ্ঞাসা করিল, “কি কথা গো?”

“আমাকে সাহা ধরা শিখিয়ে দিবি?”

বদলীর মেয়ে গরবী যে রাগির মত বসিয়া থাকে, আর সে নিজে গোবর কুড়াইয়া, সাহা ধরিয়া, খাটিয়া মরে, ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। আল জুযোগ পাইয়া হাসিয়া বলিল, “এ লখ আবার কেন হ’ল? মিন্বে কি আর তাত দিতে চায় না?”

“হাত পা থাকতে,—আমিই বা পরের তাত খেতে বাব কেন?”

“তাত খাওয়ার জন্তেই ত মিন্বে তাকে ঘরে এনেছে। মিছে কেন কাটা মাথতে বাবি?”

“তুই পারবি কিনা, বল।”

“পারবো না আবার কেন? তবে পরমা কিরে এসে আবার কিছু না বলে।”

“আমি কারো কথা কহার তোমাকা রাখিলে।”

নদীর মা আখাস দিয়া গেল, যে দিন সে সাহা ধরিতে বাইবে, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বাইবে।

নদীর মা চলিয়া গেলে, গরবী একটু ভাবিয়া লইল। ভাতারের চিকিৎসা পরিচাণ করিয়া গোবরাকে লইয়া দৈব অনুগ্রহের জন্ত পরম কেন যে এতদূর চলিয়া গেল, সে কোন মতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মনসা ঠাকুরের উপর যে পরমের অখণ্ড বিশ্বাস আছে, তাহারও কোন পরিচয় সে ইতিপূর্বে পায় নাই। তবে কি তাহার নিকট হইতে গোবরাকে দূরে রাখাই পরমের একমাত্র উদ্দেশ্য?

পরমের চরিত্র গরবী ভাল রূপেই জানিত। শিশুর প্রতিপালনের ভাণ্টা সময় সময় গরবীর উপর ছাড়িয়া দিলেও, সে যে কখনই সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর নির্ভর করিতে সাহস করে নাই সেটা তাহার ভালরূপেই জানা ছিল। তবুও আল সুসু ছেলেটাকে উদ্ধৃত রোজ বাতাসে সমস্ত দিনের পথ সাধার করিয়া বহিয়া লইয়া বাওয়ার জন্ত তাহার মনটা একরূপ জলিয়া জলিয়া উঠিতেছিল যে, সে এই নির্দোষ কুটিল পুরুষটিকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না।

৭

পাঁচ সাতদিন চলিয়া গেলেও, যখন গোবরা বা পরনের কোন সংবাদই গরবী পাইল না, তখন সে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ঘরের সজ্জিত চাউল ওলিও শেষ হইয়া আসিল। বাপের একটি ঘেয়ে বলিয়া গরবীকে কখনও বাপের উপার্জনে সাহায্য করিতে হয় নাই। পরনের ঘরে আসিয়াও, তাহার মর্ষবাণী অশ্রু ছিল। আশু নিভের উত্তরের জন্ত মাহ ধরিতে বাইতে বা পরের ঘরে দাসীস্বস্তি করিতে তাহার সঙ্কট বোধ হইতে লাগিল। ঘরে যে ছুই একখানি পিতল কাঁসা ছিল, তাহাই বীধা দিয়া ছুই চারিদিন চলিল। ক্রমে তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল।

পাড়ার লোকের অভাবে সময় অসময় মোক্ষদা ঠাকুরাণী ছুই চারি সের চাউল খার দিত। খুয়ের মাজাটা একটু বেশী হইলেও, ব্যাধ হইয়া অনেককে তাহাই গ্রহণ করিতে হইত। গরবীর অবস্থা দেখিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী নিতান্ত দয়া পরবশ হইয়া ছুই সের চাউল ও চারি আনা পরসা খার না দিলে, তাহাকে অনাহারেই বসিতে হইত।

ছুই সের চাউলে একটা মাহুষের কতদিন চলিতে পারে? গরবী আবার অভাবে পড়িল। অনেক তাবির কুণ কিনারা না পাইয়া, অগত্যা পরনের অহুসদ্ধানে বাইতে মনস্থ করিল।

কিন্তু মেড়াদহের পথ ত সে চেনে না। কে তাহাকে এই দীর্ঘপথ সজে করিয়া লইয়া বাইবে? বাইতে হইলেও ছুইচারি আনা পরসা পথ পরচের জন্ত আবশ্যক। গরবীর চোখ অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল।

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার বিবাহের সময় তাহার বাবা যে একখানা পুরাতন খালা দিয়াছিল, সে খালা সবদে ঘরের কুলুঙ্গিতে সাজান আছে। খালা খানি নামাইয়া লইয়া গরবী হাটে চলিল।

সেদিন হাটবার। বেশ বিশেষের অনেক লোক হাটে জমিয়াছে। দূর হইতে কোলাহল শুনিয়া

গরবীর পারে পারে লড়াইয়া বাইতে লাগিল। এত লোকের মধ্যে সে আপনার বিক্রয়ের বস্ত্র লইয়া কাহার নিকট উপস্থিত হইবে, তাবির পাইল না। একবার মনে করিল, কিরিয়া বাই। তখনই গৃহের অবস্থা স্মরণ হওয়ার, তাহার মনের গতি কিরিয়া গেল।

গরবী দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, তাহাদের গ্রামের কেহ আসিয়াছে কিনা। তাহার নিকট জানিতে হইবে, সে খালা বিক্রয়ের জন্ত কাহার নিকট উপস্থিত হইবে। কিন্তু বহু অহুসদ্ধানেও কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না।

একটা লোক ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। সে সহগা গরবীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি গা, তোমার কি চাই?”

গরবী আশ্চর্য হইয়া বলিল, “আমি এই খালা খানা বেচতে এসেছি।”

লোকটা খালা খানা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া গরবীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু মুহূর্ত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি দাম নেবে?”

গরবী বলিল, “বা উচিত দাম।”

লোকটা বলিল, “এ ত সেকেলে খালা। এখন আর এর কদর নেই। যদি আট গণ্ডা পরসা নিয়ে দিয়ে বাও, তা হ’লে আমি নিতে পারি।”

গরবী জানিত তাহার বাবা তিনটাকা দিয়া খালা কিনিয়াছিল। তিন টাকার মাল আট আনার দিতে গরবীর কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু কি করে? বেশী দাম বলিলে যদি সে না লইয়া চলিয়া যায় তখন উপায় কি হইবে? গরবী তাহাতেই সম্মত হইল।

সন্ধ্যার পূর্বে কয়েক সের চাউল এক অবশিষ্ট পরসা করাট হাতে করিয়া বাড়ী কিরিল। মোক্ষদা ঠাকুরাণী গরবীর অপেক্ষায় তাহার উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। গরবী আসিতেই তাহাকে চাল ও পরসার তাপাদা করিয়া বলিল।

বিনতির ঘরে গরবী বলিল, “আর ছ’টো দিন

খাক, মাসী, মিন্বে ফিরে এলেই তোমার পাই পরস
শোধ করে দেব ।”

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মোক্ষদা বলিল, “চার
চার কাঠা চাল ফেলে রাখতে পারি, এমন ক্ষমতা
আমার নেই ।”

পরবী বলিল, “কালই ডাকে আশতে বাচ্ছি,
মাসী, পরভবিন নিশ্চয় ফিরে আসবে ।”

পরবী বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া বাইতেছে তিনরা
মোক্ষদার চিন্তা হইল । বাগ্গী জাতি ত ! যদি আর
না-ই ফিরে ?

মোক্ষদা চাপিয়া ধরিল, আজ তাহার চা’ল পরস
শোধ না করিলে কোন মতেই চলিবে না । আবার ত
দিন আছে ।

পরবীর মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল । সে
কোথায় কি পাইবে ? মোক্ষদার ঋণ সে কেমন করিয়া
পরিশোধ করিবে ? পরবী পাবণ সূক্তির তার ঝাড়াইয়া
চিন্তা করিতে লাগিল ।

তাহার হাতের চাউনের দিকে অভুলি নির্দেশ
করিয়া মোক্ষদা বলিল, “হাতে চা’ল তবু ধার শোধ
ক’রতে চার না ! লোকের একি মতি প’তি হ’ল
না !”

পরবী তাড়াতাড়ি চাউল শুলি মোক্ষদার পারের
কাছে চালিয়া দিয়া বলিল, “আজকের মত এই নিরে
বাগ মাসী, তোমার পরস ক’টা বেমন করে পারি,
হ’চার দিনের মধ্যেই দরে দিচ্ছি ।”

মোক্ষদা চাউল শুলি সংগ্রহ করিতে করিতে বলিল,
“মনে থাকে যেন ।”

মোক্ষদা চলিয়া গেলে, পরবী হতাশ হইয়া বলিয়া
পড়িল । রাগের মাথায় সমস্ত চা’লগুলি মোক্ষদাকে
চালিয়া দিয়া সে যে কত বড় ভুল করিয়াছে, এখন
তা’হাই মনে হইতে লাগিল । কা’ল অর্দ্ধাহারে কোন
একরে চলিয়াছে । আজ সমস্ত দিন উপবাস । কাল
সকালে সে কিরূপেই বা পথে বাহির হইবে ?

চতুর্থীর কীর্ণ চক্রে আকাশে ভাসিয়া উঠিল । নীল

আকাশের গায়ে তারাগুলি হীরার মত বক্ বক্ করিতে
লাগিল । উঠানের আমড়া গাছের শুক পত্রগুলি দমকা
বাতাসে ঝন্ ঝন্ করিয়া করিয়া পড়িতে লাগিল ।

চাল ও তরকারির একটা বৃহৎ ধান্দা হাতে করিয়া
তলহরি আসিয়া ডাকিল, “পরব,—পরব আছিস্ ?”

তলহরির ডাকে পরবী কোন উত্তর দিল না ।
কাপড় খানা টানিয়া মাথায় দিল । তলহরি দেখিল,
চালের নীচে যেখানে খানিকটা অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া
আছে, সেই খানে সাদামত কি একটা নড়িতেছে ।
নিকটে আসিতেই পরবীকে চিনিতে পারিয়া সোৎসাহে
বলিয়া উঠিল, “এই যে পরব, শুনতে পাচ্ছিস্ সে নাকি ?”

পরবী একটু নড়িয়া উঠিয়া বলিল, “শুন কি হবে ?”
ধান্দা হইতে তরকারিগুলি নামাইতে নামাইতে
তলহরি বলিল, “আজ তোর কি হয়েছে ?”

“আমার মাথা !” বলিয়া পরবী উঠিবার চেষ্টা
করিল ।

তলহরি জিজ্ঞাসা করিল, “বাচ্ছিস কোথায় ?”

পরবী বকর দিয়া বলিয়া উঠিল, “মরতে ।”

“পরে মরবি, এখন আমার একটা কথা শোন
দেবি ।”

পরবী স্থির হইয়া দাঁড়াইল । চা’ল তরকারিগুলি
পরবীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া, তলহরি জিজ্ঞাসা করিল
“তোমার রান্না বুয়ে গিয়েছে ?”

“আমি আজ আর রাঁধব না ।”

“কি খাবি ?”

“তোমর তাতে কাব কি ?”

“একটু আছে বই কি ।”

পরবী তলহরির সুখের দিকে চাহিয়া রহিল ।
তলহরি বলিল, “হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে আজ আর
হাত নড়ুছেন না । পেট ত মানতে চার না ।”

পরবী বলিল, “তোর আদি কি করব ?”

“ইচ্ছে করলে সবই করতে পারিস ।”

“সোজা কথা বল্ছি ত বল্ । আদি অত ভাকানি
বুঝিনে ।”

ভজহরি বলিল, “রাগ না করিস্ ত বলি।”

গরবী বলিল, “আমার রাগে কার কি আসে যায়?”

ভজহরি বলিল, “আজ যদি দয়া ক’রে ছুটো রেঁখে দিস্ তবেই। নইলে বুঝিস্ ত?”

গরবী বিস্মিত হইয়া বলিল, “সে আবার কি?”

ভজহরি নরম স্বরে বলিল, “তোকেও ত রাখতে হবে, সেই সঙ্গে না হয় আমার অস্ত্রও ছুটো চা’ল নিলি।”

গরবী বুঝিল ইহার মধ্যে ভজহরির একটু গভীর উদ্দেশ্য আছে। মোক্ষবার ব্যাগারটা জানিতে পারিয়া, সে বোধ হয় এমনি করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছে।

ভজহরির উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতার তাহার কবর পূর্ণ হইয়া উঠিল। বারী পরিত্যক্তা, নিরাশ্রয়া নারীর প্রতি সম্পর্কশূন্য প্রতিবেশীর অবাচিত করুণা, গরবীর অশান্ত অন্তঃকরণকে সুস্থ করিয়া ফেলিল।

মিথ্য কটাক্ষে ভজহরির দিকে চাহিয়া গরবী বলিল, “আলোটা আল্।”

উৎফুল্ল হৃদয়ে ভজহরি আলো জালিয়া ফেলিল।

রাত্রা শেষ হইলে, ভজহরি খাইতে খাইতে বলিল, “পরমা শালার আকেলটা দেখ্ দেখি, গরব।”

গরবী হাঁড়ি হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

ভজহরি পুনরায় বলিল, “পরমা বতদিন না করে, আমি নিজে আর হাত পোড়ান্ধিনে, গরব।”

কথাটা গরবীর পক্ষে আশ্বাসজনক হইলেও, বিনা কারণে একজনের অশুভ্রমের পাত্ত হইয়া থাকিতে, তাহার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। অতিমানসী গরবীর অভিমানের প্রায়শ্চিত্ত যে এইরূপে হইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। ভজহরির কথায় কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল।

আহার শেষ হইলে ভজহরি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “এখন তুই যা, গরব, আমি আমি।”

অবশিষ্ট চাউলগুলি দেখাইয়া দিয়া গরবী বলিল, “চালগুলো নিয়ে যা।”

ভজহরি, “থাক না কেন।”

ক্রমশঃ

ব্রীজগদীশ রাজপেয়ী।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(পূর্বানুভূতি)

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইউরোপীয় শিক্ষার নবযুগের আরম্ভ। এই যুগে বহু বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক অন্বেষণ করিয়া নতুন প্রতিভাবলে অগতে স্রবণীয় হইয়াছেন। ইটালীতে ব্রুণো, ইংলণ্ডে বেকন্, ফ্রান্সে ডেকার্ট ইহারা সকলেই নবযুগের প্রবর্তক। এই যুগে Materialism বা জড়বাদের অভ্যাস হইতে একদিকে যেমন Science বা বিজ্ঞানশাস্ত্র সমূহের উন্নতি হয়, অপরদিকে Idealism বা মার্যাবাদের চর্চা হইতে

অধ্যাত্মশাস্ত্রেরও উজ্জ্বল উন্নতি হইয়াছিল। চিন্তার এই চইটি প্রবাহের একটি বহিস্রুবীণ, অপরটি অন্তঃস্রুবীণ। মানব জ্ঞানের সম্যক পৃষ্টিলাভন করে এই দুই শাখায়ই চর্চা অপরিহার্য। Materialismএর আলোচনা ইংলণ্ডে বহু অধিক হইয়াছে, অত্যন্ত বেশে তত হয় নাই। জন্ লক্, ডেভিড্ হিউম্, জন্ ট্যুরাট্, মিল্ প্রভৃতি সকলেই ইংরাজ এবং ইহাদের দ্বারা Materialismএর ভিত্তি স্থাপিত হয়। Charles

Darwin এবং Augustus Comte এর নাম এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। Darwin বিবর্তবাদের প্রচারক, করণী দার্শনিক Comte, positivism বা নাস্তিকতার আবিষ্কার। ইহারা উভয়েই জনসমাজে বিশ্বব্রহ্ম উৎসাহে পাইয়াছিলেন। Idealism এর বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, এই তত্ত্ব পাশ্চাত্য ধর্মের অঙ্গাঙ্গিতে বহু অধিক আলোচিত হইয়াছে, অতীত তত হয় নাই। Idealism যেন পূর্ব দেশেরই নিজস্ব, তাই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অপেক্ষা অঙ্গাঙ্গিতে ইহার আদর অধিক হইয়াছিল। Benedict Spinoza (১৬৩২—১৬৭৭ খ্রিঃ) এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলেও, তিনি বেনজিয়ানে এক গভূর্ণ ইহুদীবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার Substance theory বা সত্তা স্বাক্ষর গবেষণা এবং বিচার প্রণালী হইতে আধ্যাত্মিক নীমাংসার পথ সুপ্রস্তুত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ, অঙ্গাঙ্গ পণ্ডিত লাইবনিজ (Leibnitz) স্পিনোজার মতেরই পরিপোষক ছিলেন, এবং তাঁহার অসমাপ্ত মতাবলীর সংস্কার ও পুষ্টিসাধন করেন। পণ্ডিত শাস্ত্রে ইহার অসাধারণ ব্যাপ্তি ছিল এবং ইহার প্রচারিত Monad বা শক্তিকোষ তত্ত্ব দর্শন শাস্ত্রে ইহাকে চিরস্বরূপী করিয়াছে। এতদ্বির Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer ইহারা সকলেই স্বনামধন্য। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নুনাবিক ছই শত বৎসরের মধ্যে ইহাদের দ্বারা পাশ্চাত্য চিন্তা জগতে আধ্যাত্ম তত্ত্বের বৎসরোন্মাদি উৎকর্ষ সাধিত হয়। সূত্রবিচার এবং আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে ক্যান্ট অধিকার ছিলেন। তাঁহার দ্বারা সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী পণ্ডিত আধুনিক যুগে আর অগ্রসরছিলেন কি না সম্ভব। পরবর্তীকালের সমগ্র চিন্তা প্রণালী তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। উপরিউক্ত ছই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আরও অনেক খণ্ড সম্প্রদায়ের এবং মতের আবির্ভাব, এবং ইহাদের দ্বারা ভূবিজ্ঞান (Physics), তর্কশাস্ত্র (Logic), মনোবিজ্ঞান (Psychology), নীতি বিজ্ঞান (Ethics), সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান (Aesthetics), প্রাণবিজ্ঞান (Natural history), উদ্ভিদবিজ্ঞান (Botany),

ভূবিজ্ঞান (Geology), বায়ুবিজ্ঞান (Meteorology) প্রভৃতি বহু বিজ্ঞানশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সূত্রে Jeremy Bentham, Sir William Hamilton, Herbert Spencer, James Martineau প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল মহাত্মার চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের ফলে স্বাধীন চিন্তার প্রভূত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। সাহিত্য এবং রাজনীতিক্ষেত্রে আরও কত মহাপুরুষ সংগীত হইয়াছেন, তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব। স্বাধীন চিন্তার ইতিহাসে ইহাই toleration-এর যুগ। মধ্যযুগের ধর্ম-স্বাক্ষর দমন নীতির (religious persecution) বিরোধিতা হইতে মানব মাজেই স্ব স্ব অভিজ্ঞতানুসারে মতের প্রচার ও গোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে উপরে যে সামান্য বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ক্রিষ্টাব্দিক ছই শত বৎসর পূর্বে ইউরোপখণ্ডে ও জনসাধারণের ভিতর অজ্ঞান ভ্রমের ও কুসংস্কার বড় কম ছিল না। শিক্ষার অভাব ত ছিলই, তাহার উপর church authority পূর্ণদায়িত্ব বিস্তারিত থাকায় এবং ধর্মের সহিত রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায়, ব্যক্তিগত মতের স্বাধীনতাও লোপ পাইয়াছিল। ইহার সহিত যদি তারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার তুলনা করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে ইউরোপীয় সভ্যতা বিজ্ঞানের বহু পূর্বে ভারতের অবস্থাও তাহা হইতে কোন অংশে হীন ছিল না। বৈদিক সভ্যতার দিনে, ঋষিদিগের সময়ে স্বাধীন চিন্তার প্রভূত বিস্তার হইয়াছিল। চিন্তা প্রভাবে ধর্মের অঙ্গাঙ্গ, দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব সকল তত্ত্বই সন্ধান ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাঁহাদিগের মধ্যে ছইটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। "এক বিভাগের স্বর্গগণ সর্বদা ধন পুত্র, সংগ্রামজয়, স্বর্গস্থল, প্রভৃতি বাঞ্ছিত বস্তুর জন্য অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগের অনুষ্ঠান করিতেন; আর এক সম্প্রদায় অকৃতকার্য থাকিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়, বাসনাক্রমের উপায়

ও মোক্ষপথের অল্পসংখ্যক রত থাকিতেন। শেষোক্ত জ্ঞানিগণ অরণ্যে অবস্থান পূর্বক ব্রহ্মচর্য্য করিতেন বলিয়া তাঁহাদের ও তাঁহাদের চিত্তা গ্রন্থত গ্রন্থের আরণ্যক নাম হয়। আরণ্যক উপনিষদেরই নামান্তর। এখন শ্রেণী বেরণ কর্ণ. সাম্, যজুঃ, অথর্ব্ব এই চারি বেদ ও শিলা. তন্ত্র. ব্যাকরণ, নিক্কট, হন্দঃ, জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরাবিভাগ আবিষ্কার ও অল্পশীলন দ্বারা মানব সমাজের পার্শ্বিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞানিগণও তজ্জন উপনিষদ্ এবং দার্শনিক মতের সৃষ্টি দ্বারা পরা বিস্তার উৎকর্ষ সাধনে নিরত রহিলেন। উভয় সম্ভাগই দ্বারা ই দিন দিন পৃথিবীতে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল।” *

এই নূতন জ্ঞানালোকের কলম্বরূপ বহু দর্শনশাস্ত্র এবং উপনিষদাবলী আজিও বিস্তারিত রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানালোকের প্রভা স্বাভাবিক ঋষিদিগের প্রভাবে ক্রমঃ নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল; স্বাধীন চিন্তার দ্বার ক্রমঃ বন্ধ হইয়া আসিল। ইহারা ক্রমঃ ধন ও প্রকৃষের বশবর্তী হইয়া পড়িলেন। “রাক্ষা দেশের শাসনকর্ত্তা হইলেও ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণয়নের ভার ঋষি-জননের উপরই দ্রুত রহিল। শাস্ত্রাদেশ লক্ষ্যন করা রাজ্যেরও ক্রমতঃ নষ্ট, সুতরাং প্রকারান্তরে ঋষিগণই দেশের শাসন-ব্যয়ের পরিচালক হইলেন। তাঁহাদের আদেশ ও কার্য্যই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। ইহার কল ঋষিগণের অনেকের তপস্বী, সত্যপরায়ণতা নিম্পূহতা অনেকটা অতীত হইল। তাঁহারা ধন-লোভে ঐশ্বর্য্যশালী কলগণের দ্বারা প্রায়ই অধমেধ, রাজস্বের প্রভৃতি বড় বড় ব্যয়ের অহুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন।” *

পর্য্য বিত্তা কিছু দিবসের মত আত্মগোপন করিলে অপরাবিভা তৎক্ষণে দেখিতে দেখিতে সর্ব্বগ্রাসিনী সৃষ্টি

ধারণ করিল। বেদ অপৌরুষেয় ঐশ্বর্য্যবৃত্তি বিন্যস্ত জ্ঞান্য নিভা, এই বিশ্বাস সকলের মনকে বন্ধন হইয়া গেল। ভারতীয় আর্ষ্যসমাজের যখন এই অবস্থা, তখন বোধ হয় প্রাকৃতিক নিয়মে, একাদিক্রমে কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইহাদের এক জন বৃহস্পতি, দ্বিতীয় কশিলা, তৃতীয় পতঞ্জলি, চতুর্থ কশিলা, পঞ্চম গোতম, ষষ্ঠ ঋষিনি এবং সপ্তম বাদরায়ণ। ইহাদের চিত্তাগ্রন্থত মতাবলীই বর্ধ্যাক্রমে লোকায়ত মত, সাংখ্যমত, বোগমত, বৈশেষিক মত, জ্ঞান মত, পূর্ব্ব মীমাংসা এবং বেদান্ত মত বলিয়া উক্ত হইল। লোকায়ত মত নাস্তিক মতের নামান্তর; ইহা নৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া ইহা বর্ধ্য বৈদিক ধর্ম্মের কোন অন্তিও হয় নাই। অপর ছয় মত শীঘ্রই প্রতিষ্ঠালাভ করে। ইহাদের হ আপাততঃ বৈদিক ধর্ম্মের অন্তরায় হইলেও পরে তাংর প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল স্বাধীন। চিত্তার প্রসার বশতঃ লোকের মনে পুত্র্যর ঐশ্বর্য্যত্বা বলবতী হইয়া উঠে। তখন হইতে বর্ণপ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং বৈদিক বর্ণিক্যের স্রব্ধপাত হয়। বিদেশীয় পণ্যসম্ভারের আমদানি এবং ভারতীয় জব্যজাতের রপ্তানি উপলক্ষে সমুদ্রপথে গমনাগমন হেতু এবং বৈদেশিক-দিগের সংস্পর্শে কিছুদিনের নিমিত্ত প্রাচীন হিন্দু-দিগের মধ্যে একটা উদারতাবের সকার হইয়াছিল। এই সময়ে আর্ষ্য এবং অনার্য্যগণ পাশাপাশি বাস করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতেন। আর্ষ্য এবং অনার্য্যের অবাধ মেলামেশা হইতে অনেক আর্ষ্যের জাতিও আর্ষ্যদলভুক্ত এবং আর্ষ্যধর্ম্মাবলী হইয়াছিল, আর্ষ্যদিগেরও অনেকে অনার্য্যমত পোষণ করিতেন। এই উপলক্ষে উচ্চ এবং নিরশ্রেণীর মধ্যে অহুলোম ও বিলোম বিবাহ প্রচলিত হয়। কিন্তু ভারতের চূর্ত্তাগ্রবশতঃ এই সামাজিক উদারতা চিরস্থায়ী হইল না। ব্রাহ্মণগণ ইহাকে সামাজিক ব্যভিচার বলিয়া গণ্য করিলেন। এই সূত্রে মংগি মহ কৃত মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বা অহুশাসন উল্লেখযোগ্য। সমাজ বন্ধনের নিমিত্ত মহর পর অজি, হারীত, ব্যাকৎক

* ঐহুত পরম্পর শাস্ত্রী ঐহুত সামাজিক চরিত্রের অব-
তরণিকা হইতে উদ্ধৃত।

প্রভৃতি উনিশ জন ঋষি কর্তৃক সৃষ্টি সংহিতা রচিত হয়। "প্রচলিত (ভুক্ত) মহুসংহিতার বিধি অত্যন্ত কঠোর। উহা দ্বারা উপকার অপকার দুইই হইয়াছে। বোধ হয় উপকার অপেক্ষা অপকারও নিতান্ত অল্প হয় নাই। তিনি, সন্ধ্যা উপাসনা, বেদপাঠ, বধী সময়ে উপনয়ন সংস্কারের অভাব, বেদের নিন্দা এবং কোন কোন নিষিদ্ধ তৎকার গ্রহণ ও নিষিদ্ধ কর্ম করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য লোপ হইবে, এইরূপ কঠোর বিধির প্রবর্তন করিয়া যেমন সমাজে পবিত্রতা আনয়ন করিয়াছিলেন, তেমনই জ্যোতিষ, পুরাণ, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ ব্রাহ্মণের জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়া ঐসকল শাস্ত্রের উন্নতির পথে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। শূদ্রদের প্রতি মহুর বিধির কোন কোন অংশ অত্যন্ত অকৃত্রিম, ঐরূপ প্রত্যেক বিধি পালন করিয়া পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করা মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

মহুর অমুশাসনের ফলে সমাজের প্রকৃত উপকার বাহাই হইয়া থাকুক, ইহার অপকারিতা আজিও এই বিশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেশ উপলব্ধ হইতেছে। এই অমুশাসনের দ্বারা সুবৃহৎ আৰ্য্য এবং অনার্য্য সমাজ খণ্ডীকৃত এবং শতধা বিভক্ত হইয়াছিল। ধনী ও বহিষ্কৃত জাতির পক্ষে অপেক্ষাকৃত হ্রস্বজাতির নিঃশেষণ করে একরূপ অমোঘ অস্ত্র ভারতে আর বিতীর্ণ ছিল কিনা সন্দেহ। পদে পদে পাণের দোহাই দিয়া গুরুতর প্রারম্ভিকের বিধি এমন আর কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে নাই। কিন্তু মহুর ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে, তাহাতে তাঁহাদের অতীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায় বধেই রহিয়াছে। লোকে তখনও প্রাচীন আৰ্য্যদিগের পূর্বকথিত উদার শিক্ষা একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। তাহারা তখনও ঋষিদিগকে ঋষি বলিয়াই জানিত, দেবতা বলিতে তেজিশ দেবতাও হলে তেজিশকোটা দেবতা বুদ্ধিত না। পাছে সন্ত্যয়

আলোকে পুনরায় তাহারা মন্তক উত্তোলন করে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করিলেন। পুরাণ সৃষ্টির পর হইতে বহুসংখ্যক ঋষি দেবদেবী প্রাপ্তি হইলেন এবং তাঁহাদের আলৌকিক শক্তির পরিচয় দেওয়া হইল। ঋষিদিগের সহিত দেবতাদিগের কথোপকথন, ঋষি কিংবা দেবতার কোপানলে ব্রাহ্মণের জাতির পরাতন এবং ধ্বংস, ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে অপরাধের জাতির অমোঘ পাপ স্করণ এবং ব্রাহ্মণের প্রসাদে পাপ মোচন, দেবতার বরে অমুর বা অনার্য্য জাতির লোকের অমিত তেজ স্করণ এবং তন্নিসারণ ক্ষম দেবতাদিগের মন্ত্রণা, মানবের গৃহবিবাদে দেবতাদিগের পক্ষালম্বন ও সাহচর্য্য ইত্যাদি কতশত কাহিনী যে মহুর দেবতাবার সুললিত ছন্দে রচিত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বেদ, উপনিষদ্ এবং ধর্ম শাস্ত্র দ্বির শিক্ষার পরিবর্তে পৌরাণিক উপাখ্যান এবং সৃষ্টিকারিগণের ব্যবহা স্থান পাইল। দেখিতে দেখিতে নানা দেবদেবীর সৃষ্টির কল্পনা, পূজার ব্যবস্থা এবং উপাসক সম্মুখারের সৃষ্টি হইল। ভারতের চিন্তাপ্রবাহে মধ্যে মধ্যে যে ছবি একটি উজ্জল জ্যোতিষের আবির্ভাব না হইয়াছিল তাহা নয়। ইহাদের মধ্যে শাক্যসিংহ বা গৌতমবুদ্ধ অন্ততম। গৌতম অসাধারণ প্রতিভাশালী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং তৎকাল প্রচলিত সর্ববিধ ভাবা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রায় দেড় সহস্র বর্ষ বাঁচু তৎপ্রচারিত ধর্মমত এবং লোকশিক্ষা ভারতে প্রচলিত ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এই সময়ে সমগ্র ভারতে, এমন কি ভারতের বাহিরে, সুদূর ইউরোপ খণ্ডেও বৌদ্ধ প্রচারকগণ কর্তৃক ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচারিত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অমুশাসনই যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের বহুপূর্বে ভারতে আর একটি প্রাচীন ধর্মমতের উৎপত্তি হইয়াছিল; ইহা

* প্রকৃত পরচর শাস্ত্রী প্রণীত রাবাস্থাচার্য্য চরিত্রের অবতরণিকা হইতে উদ্ধৃত।

ঐশ্বর্যের প্রবর্তিত ঐশ্বর্য মত। বুকের সমসাময়িক চতুর্বিংশতিতম তীর্থকর মহাশয়ের কর্তৃক এই ধর্ম সংস্কৃত ও পরিমার্জিত হইয়া পুনঃ প্রচারিত হয়। ঐশ্বর্যত অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ হইলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্কূল বলিয়া উক্ত মত ভাঙতে দ্বারী হইয়া গেল, বৌদ্ধধর্ম হইতে পারিল না। বৌদ্ধধর্মের অবনতির দিনে উহাতে অনেক ব্যক্তির প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থান হয়। এই ক্ষেত্রেই আমরা শঙ্করাচার্যের পরিচয় পাই। শঙ্করের অষ্টম মত এবং বুকের নির্দোষ তত্ত্ব দুপের তেজ না থাকিলেও সামাজিক অবস্থানস্বারা তৎকালে তাহা হিন্দুধর্ম বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল। অষ্টম মতের পরেই দক্ষিণ ভারতের রামানুজাচার্য প্রচারিত বিশিষ্টাষ্টম মত উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্টাষ্টম মত বৈষ্ণব মতেরই নামান্তর। শঙ্কর ও রামানুজাচার্য হইতে হিন্দু ধর্ম পুনরায় জাগিল বটে, কিন্তু জাগিয়া দ্বিবিষয় প্রাপ্ত হইল। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থাপ্রাণলো অধীন চিন্তার পথ পূর্বেই কটকিত হইয়াছিল, এইজন্য পৌরাণিক কাহিনীর চমৎকারিত্বে সমস্ত কর্মনা-শক্তি ছুটিয়া গেল। স্মৃতি ও পুরাণ হিন্দুর সর্বত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রকৃত, অপ্রকৃত এবং অতিপ্রাকৃত সর্ববিধ ব্রহ্মতত্ত্ব মিলিয়া মিলিয়া সজীবতা লাভ করিয়া হিন্দুর হৃদয় ক্ষেত্রে এমন নিবিড়ভাবে বসিয়া গেল যে,—তাঁহার ভিতর কতটুকু প্রকৃত কতটুকু অপ্রকৃত এবং কতটুকু বা অতিপ্রাকৃত, তাহা বিচার করিবার শক্তি রহিল না। স্মৃতি ও পুরাণ হইতে যে হিন্দুজীবনের কোন উপকারই হয় নাই, তাহা বলা উদ্ভট নয়। উপকার বোধই হইয়াছে। এই সকল প্রভেদ প্রেমভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য, মেহ ভালবাসা, শৌর্যবীৰ্য্য প্রভৃতি সমাজ বন্ধনের এবং সমাজ রক্ষণের উপযোগী নানা উপকরণ বিভবান। তাহা সবেও ইহাদের দ্বারা ভারতের বহু অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ক্রিষ্টধর্মিক তিনশত

বৎসরের অধ্যবসায়ের ফলে অজান জাল ছিন্ন করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের উজ্জল আলোকে আপনাপন-কর্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর, ভারতে সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনার পরও মানবের শিক্ষা দীক্ষা ও চিন্তার পতি পরিবর্তিত হইল না। হিন্দুগণ সনাতন ধর্মের বোহাই দিয়া অল্পে ধর্মনামে পরিচিত শাস্ত্রের বিধি বলিয়া পরিগণিত ঘোষণার ও লোকাচারের গুরুমানন বহিয়া জীবনকে অকারণ ভারপ্রাপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের শিশু জন্মিয়া কৃত প্রেত ও জুজুর ভয় শিক্ষা করে, অধিক বয়সে পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়া মোহিত হয়, যৌবনে নানা সংস্কারের বশীভূত হয়। অজ্ঞ পিতামাতার ও পরিজনবর্গের সংস্কার বেটনীর মধ্য লাগিত পালিত এবং বর্দ্ধিত হওয়ার তাহাদের কর্মনার বিস্তৃতি লাগে পায়। তাহারা স্মৃতি ও পুরাণের অতিরিক্ত কোন বিষয়ের ধারণাই করিতে পারে না। পথে পথে জাতিপাতের ভয়, তেজিশকোটা দেবতার ভয়,—শুধু দেবতা নয়, অপদেবতার ভয়েও দিন দিন তাহারা জ্ঞান ও কাতর হইয়া পড়ে। মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়কুক, কুকতাক লইয়াই হিন্দু পরিবার ব্যস্ত। এই সকল বিধিব্যবহার চাপে হিন্দুর নির্দিষ্ট গভীর বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই। “শাস্ত্রবাক্য”—তাঁ সে যে বাক্যই হউক এবং বাহ্যিকই হউক,—অলঙ্ঘ্য, তাহা মানিতেই হইবে। যদি কেহ মনে করেন, এই সকল সংস্কার বা আচার বিচারের পরিমাণ পাশ্চাত্য সংস্পর্শে এবং শিক্ষার বিস্তারের সহিত ক্রমশঃ অভ্যাস করিতেছে, তাহা হইলে তাঁহারা বেন তুলিয়া না বান বে, বর্তমানে সমগ্র ব্রটিশভারতে জনসংখ্যার শতকরা আন লোকেরও কম লোক শিক্ষাহীন। ইহার মধ্যে পুরুষশিক্ষার্থী শতকরা ৫, ৫৫ এবং স্ত্রী শিক্ষার্থী শতকরা ১, ১৮ জন মাত্র। যে দেশে শিক্ষাবিস্তারের দায় এই, সেদেশে যুগ যুগান্ত প্রথিত সংস্কার-তন্ত্র মূল উৎপাটিত করিয়া, স্মৃতি পুরাণ, তন্ত্রমন্ত্র এবং ব্যবহার নিগড় ছিন্ন করিয়া জনসাধারণকে পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত ও পরিচালিত করিয়া তোলার আশা ছয়শা নয় কি?

প্রাচীন গ্রীসে একমাত্র সজ্ঞেয় ও খোটাগোঁসের চিত্তপ্রভাবে লোকের মন বিভক্ত জ্ঞানলাভের জন্য, বিজ্ঞানচর্চার জন্য এতদূর হইয়াছিল, ভারতে কতশত মুনিঋষির জন্ম ও তিরোভাব হইল, তথাপি সমগ্র হিন্দুভারত আজ সংস্কারের দাস, হিন্দুর মস্তিষ্কে উদারতা শক্তির অভাব, হিন্দুর প্রাণে বিশ্বমানবতার সাক্ষা নাই।

পাশ্চাত্যধর্মে জ্ঞান অজ্ঞানের স্বল্প বিরুদ্ধ চলিয়াছিল এবং তাহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এই স্বল্পের পরিণামে জ্ঞানের জয় এবং অজ্ঞানের ক্ষয় হয়। পাশ্চাত্যগণ বিচারবুদ্ধি (Reason)কে কার্যকর জানিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য, অর্থাৎ অজ্ঞানত্বের দূর করিবার জন্য প্রাণতঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে religious toleration এবং freedom of thought আসিয়াছিল। তখন তাঁহারা আর সংস্কার বা authorityর দোহাই মানিতেন না। সংস্কারকে স্বপ্নের ঢকে দেখিতেন। সত্যসন্ধান : মনীষিগণের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইল, চতুর্দিকে অনুধাবন ও পরীক্ষণ (observation and experiment)এর সাড়া পড়িয়া গেল, বিজ্ঞান সাহায্যে তখন তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিলেন। ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও, religious intolerance পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাবল্যে জনসাধারণের ভিতর freedom of thought কখনও স্থায়ী হওয়ার অবকাশ পায় নাই। Reason বা বিচারবুদ্ধি চিরদিনই কার্যকর রহিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা আসিল, তাহাও এক প্রকার খোঁজা

দেখা গিয়াছে। সমগ্র ভারত আজ মতমতভেদের ভারাক্রান্ত আন্দোলনে উদ্ভ্রান্ত, অথচ ভারতের সামাজিক জীবন এবং মানসিক জীবনের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। ভারতের মুণ্ডরসোঁকার না করিয়াই সকলে আজ পাশ্চাত্যবিভাঙনে বদ্ধপরিকর, পড়োয় আলোক ক্রম করিবার জন্য ব্যস্ত।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে East বা প্রাচ্যের সহিত West বা প্রাচীণের সন্ধান দেখান বিভ্রমবান্ধব। ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান ও কর্মের সহিত প্রাচীণের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, কর্মের সামঞ্জস্য সাধন অসম্ভাবিক। দৃষ্টিভঙ্গি বাঙ্গালী হিন্দু বা ব্রাহ্ম, মহারাষ্ট্রীয় অথবা কান্দীরী পণ্ডিত কিংবা মাজাজী বিলাত কেবল শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা ভারতের তাগাকাশ কখনই প্রসন্ন হইবে না। ইহাদের কর্মজীবনের পটভূমিতে সাধারণ হিন্দুগণের কর্মজীবনের সম্পর্ক নাই, থাকিতেও পারেনা, কারণ, এখানেও সেই শাস্ত্রের বাণী, জাতিপাণ্ডের ভয়। লোকশিক্ষা এবং ধর্মসম্বন্ধ ব্যতীত কোন জাতির কোনকালে উন্নতি হয় নাই। পৃথিবীতে যে সকল জাতি জাতীয়তার দাবী করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের সকলের মূলে এই দুইটি কারণ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। ভারতে বতদিন লোকশিক্ষার বিস্তার না হইবে, বতদিন বিভিন্ন ধর্মের লোক ধর্মবিষয়ে ভুলিয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বাবে আনিদান করিতে না পারিবে, ততদিন East এবং Westএর শিক্ষাগত মিলন (Cultural unity) অসম্ভব।

ঐতিহাসিক রায় চৌধুরী।

নগবালা

(উপভাস)

দশম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নের খবর।

ভারতীয় বড়লাটের দপ্তরে, উচ্চশ্রেণীর হিসাব-নবিশের কার্যে প্রবেশলাভ করিতে হইলে, প্রথমে দরখাস্তের সুত্রিত করণ, কিছু নগদ মূল্য দিয়া ক্রম করিতে হয়; দরখাস্ত ও দরখাস্তের ছাপার প্রমাণ-বলীর উত্তর লিখিতে হয়; দরখাস্তের সহিত দেহের স্বাস্থ্যতা, পটুতা ও বরংক্রম সম্বন্ধে, চিকিৎসা বিভাগের সর্বপ্রধান জেলা কর্মচারীর পরীক্ষা পত্র, ও এম্.এ. বা এম্.এস্.সি, পরীক্ষার কৃতকার্যতা সম্বন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিদর্শন পত্র রাখিল করিতে হয়। তৎপরে দরখাস্তকারিগণের মধ্যে কতক সংখ্যক প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার ভিত্তি মনোনীত হইলে, তাহাদিগকে আবার ঐ পরীক্ষার অন্ত বখেটে দর্শনী-দ্বারা, পরীক্ষা দিতে হয়। বাহ্যিক পরীক্ষার কৃতকার্য হয়, সেই সুবকসপের মধ্য হইতে, খালি পদের সংখ্যা অনুযায়ী, কয়েকটি মাত্র সুবক বাছিয়া লওয়া হয়।

এতগুলি বাধা অতিক্রম করিতে, প্রথমতঃ বিদ্যা, পরে স্বাস্থ্য, পরে কর্মতাপের লোকের সহায়তা আবশ্যক। ইহার উপর ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইতে, দরখাস্ত করিতে, পরীক্ষার কি দিতে কিছু খরচেরও আবশ্যক আছে।

দরিদ্র রামপ্রাণ সুখোপাধ্যায় তাঁহার আশার প্রদীপ শ্রীমান জ্যোতিঃপ্রকাশের অন্ত সহজেই অর্ধ সাহায্য এবং কর্মতাপের লোকের সহায়তা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, উহা না পাইলে, জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহার সমস্ত বিভাগ-গৌরব ও বুদ্ধিমত্তা লইয়াও কৃতকার্য হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

তিনি তাঁহার অফিসের বড় সাহেবকে ধরিয়া বলিলেন যে, অফিসের তহবিল হইতে, ধর্ম স্বরূপ তাঁহাকে কিছু অর্থ দেওয়া হউক; পরে তাঁহার বেতনের টাকা হইতে মাসে মাসে কিছু কিছু আবার লইয়া, ঐ ধর্মের টাকা পরিশোধ করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হউক।

বড় সাহেব অতি সদাশয় ব্যক্তি। তিনি তাঁহার দরিদ্র কিন্তু কর্মঠ ও বিশ্বস্ত কর্মচারীর অভাবের কথা অতি সহজেই হৃদয়গম্য করিতে পারিলেন। তিনি রামপ্রাণ বাবুকে কহিলেন যে, তাঁহার প্রার্থিত অর্থ, আপন পকেট হইতে দিবেন, এবং উহা পরিশোধ করিবার আবশ্যক হইবে না। এইরূপে, পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহ অন্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু বড় সাহেবের সদাশয়তা এই অর্থ সাহায্য করিরাই বিবৃথ হয় নাই। ইংরাজ জাতির একটা স্বভাব এই যে, যখন তাঁহারা কোনও কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা বেয়োগেই হউক, সেই কার্যে অসম্পন্ন না করিয়া নিবৃত্ত হ'ন না। ইহাকে তাঁহারা bull dog tenacity (ডাল কুত্তার গৌ) বলিয়া থাকেন। বড় সাহেবের, উচ্চ ইংরাজ কর্মচারী মহলে বখেটে প্রতিপত্তি ছিল। সেই প্রতিপত্তি লইয়া তিনি জ্যোতিঃপ্রকাশের মনোনয়ন সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ফলে, জ্যোতিঃপ্রকাশ কার্যে নিবৃত্ত হইবার অন্ত মনোনীত হইল। তৎসংবাদ পেজেটে প্রকাশিত হইবার বহুপূর্বেই অবগত হইয়া তিনি রামপ্রাণ বাবুকে জানাইলেন।

সেই শুভ সংবাদ শুনিয়া কৃতজ্ঞতা ভাবে রামপ্রাণ বাবু সাহেবের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। সাহেব তাঁহার আনন্দে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া,

ইংরাজি প্রথা অঙ্গবাসী, তাঁহার করস্বত্ব করিতে উত্তম হইলে, তিনি সাহেবের উত্তম হস্ত, হুই করতল মধ্যে গ্রহণ করিয়া, তক্তি পূর্বক উহাতে আপন ললাট স্পর্শ করিলেন; এবং চিত্তাবেগে সেই হস্তের উপর প্রচুর অশ্রু বর্ষণ করিলেন।

আপন পুরাতন বর্ষচাকরী কৃতজ্ঞতার এই নিদর্শন পাইয়া সাহেবের মনোমধ্যে কি হইতেছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারও লোচনময় আঁর্জি হইরাছিল। অশ্রুস্রাবাক্রান্ত চক্ষু তিনি কহিলেন, “রামপ্রাণবাবু, তুমি স্বদরোচ্ছ্বাসে, আর নিম্নে কবের অঙ্গপুষ্প করিয়া ফেলিয়াছ।”

রামপ্রাণবাবু চক্ষু মুছিয়া, আপন স্বদরোচ্ছ্বাস কতকটা প্রশমিত করিয়া কহিলেন, “না; এখন আমি আরও উৎসাহের সহিত কাৰ্য্য করিতে পারিব। তবে এই স্ত্রের খবরটা শীঘ্র শীঘ্র বাটীতে দিবার জন্য, আমি বণ্টা খানেক আগে বাইতে চাই। আপনি যদি অঙ্গগ্রহ করিয়া বণ্টা খানেক ছুটি দেন।”

সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে, সেদিন আর রামপ্রাণবাবুর দ্বারা অফিসের কার্য্য হইবে না। অতএব তিনি বলিলেন, “আমি তোমাকে বেলা তিনটা হইতে ছুটি দিলাম।”

রামপ্রাণবাবু সাহেবকে সেলাম করিয়া সাহেবের কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন; এবং আপন কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোন বতেই তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। কেবলই পুত্রের ও তাহার জননীর স্বর্গাংমুদ্র মুখ তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভূত হইতে লাগিল; কেবলই নব নব আশা তাঁহার স্বদরদরকে, নব নব বেশে নৃত্য করিতে লাগিল; কেবলই নূতন নূতন স্ত্রের উজ্জল চিত্র তাঁহার মানস আকাশে প্রতিকলিত হইতে লাগিল। তিনি কেবলই মর্মে করিতে লাগিলেন, পুত্র তাঁহাকে মাসে মাসে পাঁচশত টাকা আনিয়া দিলে, এই অর্থে তিনি কি কি সামগ্রী ক্রয় করিবেন।

প্রথম মাসের টাকা হইতে তাহার পর্জন্যনিষ্টকে নগদ কুড়ি টাকা দিতে হইবে; তাঁহার দেবতার কাছে তাহার কি মানত আছে, এই টাকার সেই সকল ব্যয় সে নির্বাহ করিতে পারিবে। বাকী চারিশত আশী টাকা, বোধ হয়, শ্রীমান বাবাজীর গোবাক পরিচ্ছদ ও আবশ্যক আসবাব গড়ে খরচ হইবে; একটু জুছাইয়া ব্যয় করিতে পারিলেই এই টাকার ভিতর হইতে শ্রীমতী বধূমহাশয় জন্য একখানা হাকি গোছের গহনাও হইতে পারিবে। তাহার পর, পরের মাসের পাঁচশত টাকা হইতে, মুন্সীর চলিশ টাকা, গেয়ালার কুড়ি টাকা, ধোবার ব্যয় টাকা, আর ব্রিহ হুই মাসের মাহিনা পরিমোদ্য করিতে হইবে। ক্রমে রামপ্রাণবাবুর কমাখরচ আর মনে মনে কুলাইল না। তিনি অফিসের কার্য্য না করিয়া, অফিসের কাগজ ও কালী ব্যয় করিয়া, আর ব্যয়ের দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু আয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাতয়ার তিনি বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন; গৃহিনীর সংস্কারমর্শ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। রামপ্রাণবাবু বাটী কিরিবার জন্য ছটকট করিতে লাগিলেন। ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল, বৃষ্টি তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে হইল, গগনপথে সূর্য্যের রথ অচল হইয়াছে। এইরূপে কোন রকমে তিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, আরব্যয়ের তালিকা বন্ধ পূর্বক পকেটে লইয়া এবং জীর্ণ ছাতিটি বাহনুলে গ্রহণ করিয়া, তিনি গৃহাতিস্থে বাবিত হইলেন। আজ তাঁহার বকে ভোর ছিল, তাই একাত্তরে ব্যয় করিয়া দ্রাম পাড়ীতে চড়িয়া, সন্ধ্যা বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন।

গৃহিনী তাঁহাকে সকালে বাটী প্রত্যাপ্ত দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত আগে এলে যে ? কোবও অঙ্গুণ করেনিস্ত ?”

রামপ্রাণ বাবু ছাতি গৃহিনীর উত্তম হস্তে সমর্পণ

করিয়া কহিলেন, “কতখান? আর কখনও আমার কতখান হবে না। আজ বড় সুখের খবর নিয়ে আমি বাড়ী এসেছি।”

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুড়ি টাকা মাইনে বাড়বার কথা ছিল; তাই বুঝি বেড়েছে?”

স্বামপ্রাণবাবু কহিলেন, “সে বাড়ুক আর নাই বাড়ুক। তার চেয়ে সুখের খবর আজ তোমাকে দেবো। জ্যোতিঃপ্রকাশ কোথায়?”

গৃহিণী বলিলেন, “কেন? এই কতকণ আমার কাছ থেকে ট্রাম গাড়ীর পরস। চেয়ে নিয়ে বেড়াতে গেছে।”

স্বামপ্রাণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ এত আগে বেড়াতে গেল কেন?”

গৃহিণী বলিলেন, “কি জানি। বোধ হয় কোন আয়গার মেনস্তার আছে। ভাল কাপড় চোপড় পরে গেছে। কিন্তু তাকে খুঁজছে কেন?”

স্বামপ্রাণবাবু কহিলেন, “সুখের খবরটা তারই সব আগে শোনা দরকার।”

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিন্তু এই সুখের খবরটা কি?”

স্বামপ্রাণবাবু হর্ষোচ্ছ্বসিত কর্তে কহিলেন, “বড় লাটের অফিসে তার পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী হয়েছে। আমাদের বড় সাহেব আমাদের চুপি চুপি খবর দিলেন। বুঝেছ, বড় সাহেবের চেঁচাতেই এ চাকরী হ’য়েছে।”

স্বামীর হঠাৎ সুখ দেখিয়া এবং সেই সুখে পুত্রের কৃতকার্যতার সংবাদ পাইয়া গৃহিণীর মুখটা বেন সাত হাত লাকাইরা উঠিল; তিনি মহানন্দ-উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন, “এখন তগবানের আশীর্বাদে সে বেন দীর্ঘায়ী হয়।”

স্বামপ্রাণবাবু কহিলেন, “এখন মাইনের টাকা ওলো মাসে মাসে কি করে খরচ করণো, তাই হুসনে পরামর্শ করিলে, চল।”

একাদশ পরিচ্ছেদ

বধূর আদর।

সেই দিন অকসি হইতে রমেশও মাতার মেহাকুল কর্ণে সুখসংবাদ আনিরাছিল। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় সে হাসিমুখে বাটী কিরিয়া, সম্মুখোপবিষ্ট মাতার পারের কাছে, পক্ষবিশ্রুতিটি চক্চকে রক্ত মুদ্রা রাখিয়া প্রণত হইল।

মাতা পুত্রের মস্তকে হাত বুলাইয়া, আশীর্বাদ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কিসের টাকা?”

রমেশ বলিল, “একটা হিসাবের গোলমাল, আমি ক’দিন পরিশ্রম করে যেটাতে পেরেছি। তাতে আমার মনিবের কিছু লাভ হয়েছে। তাই তিনি সন্তুষ্ট হ’য়ে আমাকে এই পঁচিশ টাকা বকসিস করেছেন। আর এই মাস থেকে দশটাকা হিসাবে মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন।”

মাতা, পুত্রের নমিত মস্তকের উপর পুনরায় তাঁহার মেহসিক্ত হস্ত স্থাপিত করিলেন। সেই মেহময় স্পর্শে রমেশ মনে করিল, কে বেন তাহার মস্তকে দেবতার মাধার মণির মুকুট পরাইয়া দিল। মাতা মেহাকর্ষে কহিলেন, “তুই ঐ আকিগেই লেগে থাকিস; তোর ঐখানেই ভাল হ’বে। তুই সংপথে থেকে, মনিবের বাডে ভাল হয় খুব পরিশ্রম করবি, তগবান তোর ভাল করবেন। আর মনে রাখিস, তগবান যখন ভাল করেন, তখন কোন মানুষ তাতে বাধা দিতে পারে না।”

মাতার উপদেশ বাক্য শুনিয়া রমেশ গদগদ কর্তে কি কথা বলিল, মাতা তাহা কর্ণে ওনিত পাইলেন না; কিন্তু তাহাতে তাঁহার হৃদয়মধ্যস্থিত মেহ-সাগর আলোড়িত হইয়া উঠিল। রমেশ তাঁহার পদপ্রান্ত ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলে, তিনি কিয়ৎকাল ভাবাবেগে কোন কথা কহিতে পারিলেন না। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, “ঠিক সময়, তগবান তোর আর বাড়িয়ে দিয়েছেন। তোর ছেলে হ’বে কিনা, তাই তগবানের

কৃপায়, সে আপনার হৃদয়ের বোগাক্ত করে নিয়ে আসছে।”

রমেশ এ সংবাদটি জানিত না। এক্ষণে মাতার নিকট গিয়া, সে প্রেমপূর্ণ নয়নে অহরোণবিত্তা, লজ্জাবনতমুখী, অবগুষ্ঠনবতী মালতীর দিকে তাকাইল।

কীণ অবগুষ্ঠন ভেদ করিয়া সেই দৃষ্টি মালতীর প্রোম্বুল নয়নের সহিত মিলিত হইল; মালতীর শিরায় শিরায় প্রেমপ্রবাহ প্রবাহিত হইল; সে শ্রিতবতের প্রেমপূর্ণ প্রেমদৃষ্টি শিরায় শিরায় অহুতব করিল। করিয়া, তাহার ত্রীভাঙ্গাগরজিত নবিত মুখখানি আরও অবনত হইল।

কণকাল মধ্যে প্রেমিক প্রেমিকার নয়নে নয়নে এই প্রেমলীলা হইয়া গেল। মাতা কি চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন; তিনি ইহার কোন সন্ধানই পাইলেন না। তিনি বলিলেন, “বোমা, এ দিকে এস ত, মা?” লজ্জা-সঙ্কুচিতা মালতী আদেশ মত তাঁহার নিকটবর্তিনী হইলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, “এই টাকা ক’টা ছেলে আমাকে দিচ্ছে। এতে তোমাদের কোন অধিকার নেই। এ টাকা আমি ইচ্ছামত খরচ করবো; তোমরা কোনও আপত্তি করতে পারবে না।”

খশ্ঠঠাকুরাণীর নিজ ইচ্ছামত ব্যয় করিবার অর্থ, বুদ্ধিমতী মালতী বুঝিল; বুঝিল যে, তাহাদিগকে কোনও ভাল খাদ্য খাওয়াইবার জুই উহা ইচ্ছামত ব্যয় করিতে চাহেন। কিন্তু সে মনের কথা প্রকাশ করিল না; কেবল মাড় নাড়িয়া স্বস্তীর কথাই সম্ভবিত জানাইল।

মাতা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “এই টাকার মধ্যে দশ টাকা বাজে তুলে রাখ। আর পাঁচ টাকার রমেশ নিজের জন্তে ছোটো ভাণ্ডা কিনে আনুক। আর বাকী দশ টাকা খরচ করে, রমেশ কিছু বি ময়দা নিয়ে আনুক। আমি আমার গোয়াতি বোকে রাখে রাখে দুটি ভেদে খাওয়াতে চাই। ও ত এক গরাসও তাত খেতে পারে না।”

মালতীকে দুটি খাওয়াইতে রমেশের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। সে মাতার প্রত্যাব গনিয়া, হাসি মুখে ভাণ্ডা কাপড় ছাড়িতে উপরে চলিয়া গেল।

মালতী স্বাতন্ত্র্যের বাক্যের কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহার গায়ের নিকট হইতে টাকাগুলি উঠাইয়া লইল।

খশ্ঠঠাকুরাণী আশ্বাস কহিলেন, “দেখ, যেন বি ময়দা আনতে ভুল হয় না।”

মালতী বলিল, “কিন্তু, মা, আমি ত দুটি খেতে জ্বল বাসিনে। কলা, মিচু, আন এই সব খেতে ভালবাসি।”

খশ্ঠঠাকুরাণী কৃজিম কোণ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “আমার সঙ্গে জুয়াচুরি কোরনা, বোমা। আমার টাকা দিয়ে, তুমি মিচু আন কিনে, আমাকেই রাখে খেতে দেবে, মনে করেছ? কেন রমেশ কি আমাকে ক’মূল এনে দেয় না? আমার টাকার একটি গরাসও আমি তোমাদের সংসারের জিনিষ কেনবার জন্তে খরচ করবো না। টাকা আমার ইচ্ছামত খরচ করবো। রমেশকে বল, আজই বি ময়দা কিনে আনা চাই।”

মালতী আর কোন কথা কহিল না, আপন অকলে অর্থ গ্রহণ করিয়া, বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপরে গেল।

রমেশ উপরে উঠিয়া, শ্রিতবতা পত্নীর প্রতীকার হই বাহ প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিল; এক্ষণে তাহাকে নিকটে পাইয়া, দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া কেলিল। হুইটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় মিলিত হইল, প্রেমপূজার রক্তপুঞ্জের মত হুই বোকা ঠোঁট আপন আপন পূজা গ্রহণ করিল; রমেশ প্রণয়িনীর কর্ণমূলে মুখ রাখিয়া মুহূর্ত্তে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি নাকি মা হবে?”

মালতী বামীর আদরে আত্মহারা হইয়াছিল; তাই কিছুকণ তাহার প্রেমের কোনও উত্তর দিতে পারিল না। পরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, “মা,—মাই ত মেয়েদারদের সব চেয়ে বড় খেতাব।”

রমেশ শ্রিতবতাকে আদর করিয়া কহিল, “কিন্তু

খেতাব টেতাব বড় লোকেরই পোষার। আমাদের মত গরীব লোকের পক্ষে খেতাবের হুখ বোগান' বড় শক্ত কার।"

মালতী স্বামীর ব্যঙ্গ ব্যংগ্য হাসিয়া বলিল, "কেন, না ত বলেছেন, আমার ছেলে আপনার হুখের বোগাও করে নিরে আসছে।"

রমেশ আর হই এক কথার পর বলিল, "হঁ, মা যে তোমাকে লুচি খাওয়ার জন্যে, বি মরদা কিন্তে বলেছেন, তার টাকাটা আমার দাও।"

মালতী বলিল, "ছি! তুমি কেনেছ? আমি দশ টাকার বি মরদা খাব? দশ টাকাত্তে বি মরদা কিনলে, এদিকে অল্প দরকারী খরচ কিছুই করতে পারব না। আর চার খানি কাপড়ই পুরান হ'রে গেছে; তাঁর জন্যে একখোড়া নতুন কাপড় কেনা চাই। আর তোমারও এক খোড়া কাপড় চাই।"

রমেশ বলিল, "না, না, আমার কাপড় এখন চাইনে, এই কাপড়েই এখন তিন চার মাস চালিয়ে দিতে পারব। আর কথা না শুনলে, মা রাগ করবেন; মনে মনে হুখ

করবেন। তুমি আমাকে ঐ দশ টাকাই দাও। ঐ থেকেই আমি ম'র কাপড়, আর বি মরদা, হুই কিনে আনব এখন।"

মালতী কি তাবির স্বামীর ব্যংগ্য আর প্রতিবাদ করিল না। অকস হইতে আমার জন্ত পাঁচটাকা, এবং স্বামীর কাপড় ও বি মরদার জন্ত দশ টাকা বাহির করিয়া দিল। বাকী দশটাকা আপন বাসে তুলিয়া রাখিল।

রমেশ সন্ধ্যায় কিছু পুর্বেই জামা কাপড় বি মরদা কিনিতে বাহির হইল। কিন্তু পথে এমন ঘটনা সংঘটিত হইল যে, মাতার কাপড় ব্যতীত সে আর কিছুই কিনিতে পারিল না। এই ঘটনাটা আমরা পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব। এখন আমাদের একবার কলিকাতা ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে বাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

ক্রমশঃ

ক্রিমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা

দিগন্তের হিরণ্ময় প্রাঙ্গণ-প্রাঙ্গণে

কে তুমি অজনে,

ক্রীড়াময়ী, চঞ্চল-চরণা ?

পবনে লুটিছে রাঙা বসন অঞ্চল

ফুল তব আনন কমল,

নীরব গগন-তলে অদ্বিগ-বরণা।

হাসির কুহুমদগ উঠিছে বিকশি',

হে চাক্র রূপসী,

উজলিয়া আকাশ ভুবন।

লাজ ভরা মনোরম আঁধি হুটি তব

চলে পড়ে অল্পরাগে নব;

আবেশে শিথিল কালো কবচী-বন্ধন।

একি তব অপরূপ ক্রীড়া মনোহারী,

তরঙ্গ কুবাণী।

বহু-সম আকুল উজল।

শ্রোম উদ্ভাটনা সম সিদ্ধ প্রাতিহীন,

তপস্বিনী সম অমলিন

মৃদু-হারার মাঝে মিলন-চঞ্চল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস

(পূর্বানুস্মৃতি)

একাদশ শতাব্দের শেষভাগে ব্রাহ্মণ সভ্যতার জন্মভূমি আৰ্য্যাবর্তের মধ্যদেশে হুইটি রাজবংশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই হুইয়ের একতম শাক্তরীর চাহমান বা চৌহান বংশ; অপর কান্তকুজের গাহড়বাল বংশ। বিনি তারাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে একবার (১১২১) সুইজুদীন খোরীকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয়বার (১১২২ খৃঃ অব্দ) স্বয়ং পরাজিত ও নিহত হইলেন সেই চৌহান-রাজ দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজের প্রপিতামহ অজয়রাজ সম্বন্ধে “পৃথ্বীরাজ বিজয়” নামক মহাকাব্যে (পঞ্চম সর্গে) কথিত হইয়াছে যে তিনি—“মাতঙ্গান্ অজয়ং রণে”। টীকাকার জোনরাজ লিখিয়াছেন, “মাতঙ্গান্ স্নেহাংশে যুদ্ধেহজয়ং”, স্নেহগণকে যুদ্ধ পরাজিত করিয়াছিলেন। অজয়রাজ সম্ভবতঃ বাঙ্গাল শতাব্দের প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন। ‘পৃথ্বীরাজ বিজয়ের’ ষষ্ঠ সর্গের প্রথমাংশে দেখা যায় অজয়রাজের পুত্র অর্ণোরাজের সময়ে তুঙ্গকরা চৌহানরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। (১) অর্ণোরাজ এই আক্রমণ রোধ করিতে বাইরা বহু তুঙ্গক নিহত করিয়াছিলেন। অর্ণোরাজ তুঙ্গকহত হইতে আত্মরক্ষা করিরাই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র বিগ্রহরাজ বীসলদেব বোধ হয় তুঙ্গক-দিগকে আৰ্য্যাবর্ত হইতে বিদূরিত করিবার জন্য বখেটে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজমীরে “আড়াই-দিন কা কোঁপরা” নামক মসৃজিদে চারিখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার হুইখানিতে বিগ্রহরাজ বিরচিত

“হরকলি” নাটকের কিংবদন্ত খোদিত আছে। “হরকলি” নাটকের উপসংহারে ১২১০ সংবৎ এই মাঘ (২২শে নভেম্বর, ১১৫৩ খৃঃ অব্দ) এই তারিখ দেওয়া আছে। অপর হুইখানি লিপিতে সোমদেব নামক কবি বিরচিত “ললিত বিগ্রহরাজ” নাটকের প্রথম অঙ্কের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের কিংবদন্ত পাওয়া যায়। “ললিত বিগ্রহরাজ” নাটকের তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের ষতটি পাওয়া গিয়াছে ডাক্তার কিলহর্ন তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। এই ‘ললিত বিগ্রহরাজ’ নাটক, সমন্বয়ে রচিত ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকের নায়ক স্বয়ং চৌহান-রাজ বিগ্রহরাজ বীসলদেব এবং নায়িকা বসন্তপাল নামক রাজার কন্যা দেশলদেবী। তৃতীয় অঙ্কের শেষ ভাগে নায়ক নায়িকাকে বলিয়া পাঠাইতেছেন,— “রাজপুত্রীকে জানাইবে, তুঙ্গক রাজের সহিত যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই আমি আসিরা দেবীর সজ্জা বিধান করিব; শুনিতে পাইতেছি তুঙ্গকরাজও আমাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।” চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য বিগ্রহরাজের শিবির। শিবিরের নিকটে হুইংন তুঙ্গক বন্দীর প্রবেশ। এইখানে বন্দীদের সহিত একজন তুঙ্গক গুপ্তচরের সাক্ষাৎ হইল। গুপ্তচর বলিল, “বিগ্রহরাজের সেনাবলের মধ্যে সহস্র হতী, লক্ষ অশ্ব এবং দশ লক্ষ লোক আছে।” “তদর্শনং ভয়ং পাশা-ভিদে শাশলে বিত্তকে ভোদি”, “এই কটকের পার্শ্বে সাগরও শুক মনে হয়।” তারপর গুপ্তচর চলিয়া গেলে বন্দীর রাজ-শিবিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বিগ্রহরাজ তাহাদিগকে স্বর্ণ মুদ্রা ও বস্ত্র পুরস্কার দিয়া বিদূর করিলেন। এমন সময় বিগ্রহরাজ হান্সীরের বা আমীরের অর্থাৎ লাহোরের গজনবী

১। “পৃথ্বীরাজবিজয়” চৌহানরাজ দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজের সময়ে রচিত একখানি সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্য। এই কাব্যের একখানি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি যুবলার সাহেব কান্দীরে পাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় এগিরাস্টিক সোসাইটি কর্তৃক তাহা বণ্ডন প্রকাশিত হইতেছে।

বংশীয় জলতানের কটকবলের স্বরূপ জানিবার জন্ত যে চর পাঠাইয়াছিলেন সে আসিয়া জানাইল যে হান্দীরের গজ, রথ, অর্থ এবং লোক বল অসংখ্য; হান্দীর সৈন্যে বিগ্রহরাজের অতি নিকটবর্তী হইয়াছেন এবং শীঘ্রই একজন দূত প্রেরণ করিবেন। এই সংবাদ শুনিয়া বুদ্ধ কহা কর্তব্য কিনা স্থির করিবার জন্ত বিগ্রহরাজ খীর মাতুল সিংহবলের এবং মন্ত্রী ঐধরের অভিমত নিজাসা করিলেন। মন্ত্রী ঐধর বুদ্ধ না কহাই কর্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন; সিংহবল বুদ্ধের অঙ্গুলে মত দিলেন। বিগ্রহরাজ সিংহবলের সমর্থন করিলেন। এমন সময় তুরুকরাজের দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। দূত বিগ্রহরাজের আশীর্বাদ পরিচয় পাইয়া একেবারে চমৎকৃত হইল। “ললিতবিগ্রহরাজ” নাটকের বতখানি পাওয়া গিয়াছে হৃৎশ্যাকনে এই খানেই তাহার শেষ। (২) নাটকের নায়ক বিগ্রহরাজ সম্ভবতঃ তুরুকরাজ হান্দীরের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং নায়িকার সহিতও তাঁহার মিলন হইয়াছিল। পুণ্ডন দ্বিতীয় অন্তর্গত কিংজসাহ কোটিলার ভিতরে যে অশোকস্তম্ভ আছে তাহার পায়ে প্রাচীন লিপ্যাকরে খোদিত বিগ্রহরাজ বীসলদেবের একটি প্রশস্তি পাওয়া যায়। এই প্রশস্তির তারিখ ১২২০ বিক্রম সম্বৎ, ১লা চৈত্রাখ, অর্থাৎ ১১৬৪ খৃঃ অব্দ, ১ই এপ্রিল। এই প্রশস্তিতে এই লোকটি আছে—

আবিদ্ধা দাহিবায়ের্কিরচিতিবিজয়তীর্থবাজা প্রমজাদ্
উদ্বোধনেনু প্রহর্তা নৃপতিনু বিনমৎকরেনু প্রসন্নঃ ।
আর্য্যাবর্তঃ বর্ধাৎ পুনরপি কৃতবানু স্নেহচিত্তেহনাত্তি-
দেবঃ শাক্তরীপ্তো অগতি বিজয়তে বীসলকৌশলিগঃ ॥ (৩)

“তীর্থবাজা উপলক্ষে তিনি বিদ্যা হইতে হিমালয় পর্বত পর্যন্ত ভ্রম করিয়াছেন; তিনি উদ্ধৃত রাজা-
দিগের শাসক এবং নতশির নৃপতিগণের উপর প্রসন্ন;

পুনঃ পুনঃ স্নেহ লাভ করিয়া তিনি আর্য্যাবর্ত নামের
সার্বভৌমত্ব সম্পাদন করিয়াছেন; সেই শাক্তরীপতি
পৃথ্বীপতি বীসলদেব অগতে বিজয়ী।”

মহা-ভাস্কর্য্যকার মেঘাতিথি (২:১২) আর্য্যাবর্ত
শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, “আর্য্য বর্ত্তে বজ্র পুনঃ
পুনঃ কৃতবন্ত্যাক্রম্যাক্রম্যাপি ন চিরং বজ্র স্নেহা হাতারো
ভবতি”; “আর্য্যগণ যেখানে বাস করেন এবং পুনঃ
পুনঃ অভ্যাসিত হন এবং পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও
স্নেহগণ যেখানে হারী হইতে পারে না।” এই ‘আর্য্য’,
জাতিতত্ত্বের ‘আর্য্য’ বা Aryan race নহে। এই
আর্য্য শব্দের অর্থ হিন্দু। বিগ্রহরাজ “আর্য্যাবর্ত্তকে
বর্ধাৎনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন” একথা প্রশস্তি-
কারের অভিপ্রায়োক্তি মাত্র। কেন না পাত্রাবতখন
তুরুকগণের করতলগত ছিল। বিগ্রহরাজের দৃত্যার
পর তাঁহার ব্রাহ্মপুত্র প্রথম পৃথ্বীরাজ আলখীরের
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হান্দীর একখানি
লিলালিপি হইতে জানা যায়, নিখিল বহুমতীর শল্য-
স্বরূপ হান্দীরের অর্থাৎ তুরুক জলতানের গতিরোধ
করিবার জন্ত প্রথম পৃথ্বীরাজ খীর মাতুল কিল্লানের
হস্তে হান্দী হৃৎ রক্ষার তার জন্ত করিয়াছিলেন।
অগ্রসিদ্ধ দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ এই প্রথম পৃথ্বীরাজের অপর
পুত্রতাত সোমনব্বরের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী।

তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের আর এক প্রবল শক্তি
ছিল কান্যকুবের গাহড়বালরাজ। গাহড়বাল বংশের
রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব। দ্বিতীয় একাদশ শতাব্দের
শেষ ভাগে এই কান্যকুবের সিংহাসনে অবিরত
ছিলেন। চন্দ্রদেবাবি গাহড়বালরাজগণের তাত্র-
শাসনে ‘তুরুকবত্ত’ নামক একটি কব উল্লিখিত
হইয়াছে। ‘তুরুকবত্ত’ হইতে তুরুক ঔপনিবেশিক-
গণের দেয় ভিজিরায় পাঠা কোন বিশেষ কর;
আর না হইতে তুরুক আক্রমণকারিগণকে দমন
করিবার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহার্থ স্থাপিত বিশেষ
কর। চন্দ্রদেবের পৌত্র গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে মহারানী
কুবেরদেবীর সারনাথে প্রাপ্ত প্রশস্তিতে লিখিত আছে—

২। Indian Antiquary, Vol. XX, pp. ২০৫-
210.

৩। Indian Antiquary, Vol. XIX, p- 218.

বারাণসীতে ভুবনরক্ষসদল একে।
 হুঁতাত্ত্বককনুতটানবিত্ত হরণে।
 উক্তো হরিসঙ্গ পুনরজ বভুব তদ্বাদ্
 গোবিন্দচন্দ্রে ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥ (৪)

“হর কর্তৃক হুঁত তুৎকনুসেনার হত হইতে বারাণসী রক্ষার অগ্রকৃত ভুবন রক্ষণে একমাত্র দক্ষ হরিগোবিন্দচন্দ্রে এই নাম ধারণ করিয়া স্বয়ং তাঁহার (মহনচন্দ্রের) পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইরাছিলেন।” “তাবাকাং-ই নাসিরি” প্রোক্ত দেখা যায় যে, গোবিন্দচন্দ্রের সমসময়ের গজনবী বংশীয় পাণ্ডাবংশি বাহরাম সাহ বারাণসী পর্য্যন্ত অগ্রণর হইরাছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার ষৎ তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের তাম্রশাসনে কথিত হইরাছে—

“ভুবন-দলন-হেলাহর্য্য হযীর নারী
 নয়ন-জলদ-ধারা-ধৌত-ভূগৌক তাপঃ”

“তিনি ভূম দলনকর্ম হযীরের নারীগণের নয়ন জলের ধারার ধারা পৃথিবীর তাপ দূর করিয়াছিলেন।” এই বিজয়চন্দ্রের পুত্র ও উত্তরাধিকারী জয়চন্দ্র বৃহৎকদীন মহম্মদ বোরী কর্তৃক ১১৯৩ খ্রীঃাব্দে পরাজিত হইরা ছিলেন।

সমসময়ের লিপি হইতে এই যে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম ইহা পাঠ করিলে বুঝিতে পাওয়া যায় যে, তুৎকনুগ কর্তৃক অর্থাৎ উক্তবিজয়ের কাহিনী রণনৈপুণ্যের অভাবের পরিচায়ক নহে। এই সকল লিপিতে মধ্যদেশের হুই প্রহরী চৌহান এবং গাহড়বাল রাঃগণের শৌর্য্য বর্ধ্য বৈধেয়র বখেট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া যায় না একটি কথা,—আর্য্যাবর্ত্তকে পুনরায় সার্বভৌম্য করিবার জন্য উত্তর শক্তির মিলনের কথা। চৌহানসেনা এবং গাহড়বালসেনা একত্র মিলিয়া একটবার তুৎকনু সেনার সম্মুখীন হইরাছে এমন কথা কোথাও খুঁজিলেও উল্লিখিত হয় নাই। যেন কোনও অপদেবতার

অভিসম্পাতের কলে আর্য্যবর্ত্তগণ প্রয়োজনমত সন্ধিলিত হইয়া কার্ণোড়ারের চোটা করিবার সামর্থ্য হারায়াছিলেন। খ্রীঃ দশম শতাব্দের অবসানে হিন্দুজাতির অধঃপতনের আরম্ভ। তদবধি অসহযোগ অধঃপতনোদ্ভূত এবং অধঃপতিত ভারতবাসীর স্বভাবসিদ্ধ হইরাছিল।

(৩) বাঙ্গালার কলঙ্ক।

বঙ্কিমচন্দ্রে “বঙ্গদর্শনের” মঙ্গলাচরণে ‘ভারত কলঙ্ক’ প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালীর ভীকৃত্যার কলঙ্ক অপনোদিত করিবার জন্য ধারাবাহিক রূপে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল প্রবন্ধের উপসংহার ১২৯১ সালের ১৫ই শ্রাবণ প্রকাশিত “প্রচার” পত্রের প্রথম সংখ্যার “বাঙ্গালার কলঙ্ক” শীর্ষক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের আরম্ভে তিনি লিখিয়াছিলেন, “বখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইরাছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উত্তম। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার স্বপতান যাজেই আমাদের সহায় হউন।”

“বাংলা ভারতের কলঙ্ক বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও হুঁতাত্ত্ব অন্ধকার। কদাচিত্ অজ্ঞাত ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীক, চিরকাল জীবাঁতাব, চিরকাল ঘৃসি দেখাইলেই পলাইয়া যায়।”

‘বাঙ্গালার কলঙ্ক’ শীর্ষক প্রবন্ধ প্রচারিত হওয়ার পর ৪০ বৎসর কাল অতীত হইরাছে। এই অবকাশে ঐতিহাসিক প্রমাণ আহরণ এবং ব্যাখ্যান উদ্ধৃতিসে চলিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে এই ব্যাপারে জগদীশ্বরের হাত দেখিতে পাইতেন সন্দেহ নাই। এই সকল অভিনব প্রমাণ অবলম্বনে বাঙ্গালার কলঙ্কের কথার পুনরালোচনা করিয়া এই প্রত্যাবের উপসংহার করিব।

যে সকল স্বতন্ত্র খণ্ডরাজ্যের অত্যধার আধীযবর্ডের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিরাছিল তদ্বধ্যে বাঙ্গালা বিহার লইরা গঠিত গৌড়রাজ্য অল্পতম প্রধান রাজ্য ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে কাঙ্ককুজের বশোবন্দীর অধঃপতনের পর আধীযবর্ডে, বিশেষতঃ বাঙ্গালার, যোর অরাজকতা উপস্থিত হইরাছিল। এই অরাজকতার সময় বাঙ্গালার জননারকগণ অসাধারণ আত্মসংবন্দের পরিচয় দিরাছিলেন। গৌড়াধিপ ধর্মপালের (আত্মমানিক রাজ্যকাল খৃঃ অঃ ৮০০-৮৪০) খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রখাশনে বাঙ্গালার এই অরাজকতা মাৎস্ততার বলিরা বর্ণিত হইরাছে, এবং ধর্মপালের পিতা গোপালদেবের রাজ্য লাভ সম্বন্ধে কথিত হইরাছে :—

“মাৎস্ততারবপোহিভুত্ প্রকৃতিভিলম্বাঃ কয়ং প্রোহিতঃ

ঐগোপাল ইতি কিশীপ শিরসাং চূড়ামনি তৎসুতঃ।”

“অরাজকতা দূর করিবার জন্য অসসাধারণ রাজ-কুলচূড়া (বগাটভনর) গোপালকে রাজলক্ষ্মীর পানি-প্রাধন করা হইরাছিল।” প্রাচীনকালে বাঙ্গালা দেশ ভৌমিকগণের এবং মাণ্ডলিকগণের শাসনাধীনে ছিল। সুতরাং এখানে “প্রকৃতিভিঃ” পদে ভৌমিক এবং মাণ্ডলিকগণ বুঝিতে হইবে। গোপাল এবং ধর্মপালের বংশধরগণ বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত বহুত্রে ভূমিকে “জনকভূ” বা অমৃতভূমি বলিরা পরিচয় দিরা গিরাছেন। সুতরাং এই নির্কাচন বাঙ্গালা দেশেই হইরাছিল একরূপ মনে করা বাইতে পারে। তিব্বতীর লেখক তারানাথের মতেও গোপাল বাঙ্গালার নির্কাচিত হইরা পরে মগধ জয় করিরাছিলেন। তদীয় পুত্র ধর্মপাল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইন্দ্রাবুধ প্রভৃতি নরপতিগণকে পরাজিত এবং অল্পতম চক্রাবুধকে কাঙ্ককুজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিরা আধীযবর্ডে স্বীয় প্রাধাত্য স্থাপন করিরাছিলেন। কিন্তু আধীযবর্ডে গৌড়াবিনাশের প্রাধাত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইরাছিল বলিরা মনে হয় না। কেননা ইহার পরেই আধীযবর্ডের প্রাধাত্য লইরা গৌড়ের পাল নরপতি, রাজপুতনার এবং পরে কাঙ্ককুজের শুজর-প্রতীহার নরপতি, এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট নরপতি এই তিন

পক্ষের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধ দেখা যায়, এবং বতদিন ত্রা তিন পক্ষই চুর্জল হইরা পড়িরাছিলেন ততদিন এই বিরোধের নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু এই বিরোধ সম্বন্ধে পাল নরপালগণ নবম এবং দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে খুব প্রতাপশালী ছিলেন। কিছুদিন হয় নালন্দার তদ্বত্বপূর্ণের তিতরে ধর্মপালের পুত্র দেবপালের একখানি তাম্রখাশন পাওয়া গিরাছে। এই তাম্রখাশনের উপসংহারে সুবর্ণবীণের অধীধর ঐবলপুত্রদেবের দূত বলবন্দীর প্রশংসা আছে। এই বলপুত্রদেবকে ববত্বনির অধিপতির গৌত্র বলিরা পরিচিত করা হইরাছে। সুতরাং সুবর্ণবীণ ববত্ববীণের পার্শ্ববর্তী কোন বীণ একরূপ অল্পমান করা বাইতে পারে এবং এই সকল বীণের সহিত গৌড়পতির এবং গৌড়জনের সম্বন্ধ ছিল ইহাও প্রমাণীকৃত হয়। (৫)

গৌড়রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয় দশম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে যখন কাঙ্ককুজগণ পাল নরপালের হাত হইতে বয়েস্ত্রের খানিকটা কাড়িরা লইরাছিলেন। কিন্তু বয়েস্ত্রে কাঙ্ককুজ আধিপত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার অবকাশ পায় নাই। যোধ হয় এই দশম শতাব্দেই শেষভাগে প্রথম মহীপাল অনধিকারীর অধিকৃত বয়েস্ত্রে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। এক সময় মহীপালের প্রতাব বজ হইতে বারাপনী পর্যন্ত বিস্তৃত হইরাছিল। কিন্তু মহীপালকে দুইটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বুঝিতে হইরাছিল। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর একজন চেদির (বর্তমান জবলপুর প্রদেশের) রাজা গাজেন্দ্রদেব এবং আর একজন আবিড়দেশের রাজা রাজেন্দ্রচোল।

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়রাজ্যের কেন্দ্র ভাগে (বয়েস্ত্রে) এক নূতন বিপদ উপস্থিত হয়। প্রথম মহীপালের প্রপৌত্র দ্বিতীয় মহীপাল প্রকাপীড়ন করার কৈবর্ত নারকগণের অধীনে বয়েস্ত্রে দেশে বিদ্রোহা-নল জলিরা উঠে। কিয়ৎকাল পরে দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহিগণকর্তৃক নিহত হইরাছিলেন। কিন্তু পরে তদ্বহার ভ্রাতা রামপাল কৈবর্ত নারককে পরাজিত করিরা

বরেন্দ্র দেশের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হইরাছিলেন। সদ্ধা-
কর নন্দী কর্তৃক সমসময়ে রচিত "রামচরিত" নামক এক-
খানি সংস্কৃত কাব্যে এই বিজ্রোহের এবং তাঁহার দমনের
কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। রামপাল, কৈবর্ত বিজ্রোহ
দমন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন নাই; তিনি কামরূপে, বঙ্গে
এবং কলিঙ্গে গৌড়াধিপের আধাভ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া-
ছিলেন। রামপালের পুত্র কুমার পাল দ্বাদশ শতাব্দের
প্রথম ভাগে এই আধাভ কতক পরিমাণে বঙ্গার রাধিরা-
ছিলেন। কিন্তু কুমার পালের মৃত্যুর পর আবার
"নাৎসত্য" উপস্থিত হয়। মিথিলার কর্ণাটবংশীয়
লাটদেব স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্ব বঙ্গে
বর্ধমান স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। কর্ণাট হইতে
আগত সেন বংশীয় বিজয়সেন রাঢ়দেশকে কেন্দ্র করিয়া
গৌড়মণ্ডলে স্বীয় আধাভ স্থাপন করিতে সচেষ্ট করেন।
বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশান্তিতে কথিত হইয়াছে, তিনি
"গৌরেন্দ্রমন্ত্রণ" গৌড়াধিপতিকে সবলে আক্রমণ
করিয়াছিলেন। তাঁহার বারাকপুরে আশ্রয় গ্রহণ
বিক্রমপুরে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হই-
য়াছে। পশ্চিম দিক হইতে গাহড়বাল রাজা আসিরা
ক্রমশঃ মগধে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। কাশ্মি-
রাজ্যের দক্ষিণ দিক হইতে অনন্তবর্ষা চোড়গঙ্গ আসিরা
দক্ষিণ রাঢ় আস করিয়াছিলেন। কলে দ্বাদশ শতাব্দ
তরিত গৌড়রাজ্য হইয়া পাল, বর্ধা, সেন, কলিঙ্গের গঙ্গ-
বংশীয় এবং গাহড়বাল রাজগণের মধ্যে অবিরত বিরোধ
চলিতেছিল। কৈবর্ত বিজ্রোহ গৌড়রাজ্যের কেন্দ্র
বরেন্দ্রের যে ক্ষতি করিয়াছিল এই গোলবোগের মধ্যে
তাঁহা পূরণের অবকাশ বোধ কাহারও ঘটে নাই। তাই
দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে বক্তিরারের পুত্র মহম্মদ
খিলজি বখন বাজলা আক্রমণ করিলেন তখন পরিত্যক্ত
রাজপুত্রী নোদিয়া এবং প্রহরীশূন্য বরেন্দ্র ভূমি অবাধে
তাঁহার পদানত হইল। স্তত্রায় মহম্মদ বক্তিরারের
বরেন্দ্র বিজয় কাহিনীকে কলকের কাহিনী মনে না করাই
কর্তব্য।

কিন্তু মহম্মদ-ই-বক্তিরার কর্তৃক বরেন্দ্র অধিকারের

পরের অর্দ্ধ শতাব্দের ইতিহাস শুধু বাঙ্গালীর নয়, বাঙ্গা-
লীর প্রতিবেশী কামরূপী এবং উড়িষ্যাগণের বিশেষ
কলঙ্কজনক। ভীকতা এ কলঙ্কের কারণ নহে;
চৌহান ও গাহড়বালের কলঙ্কের মত এ কলঙ্কেরও
কারণ সহযোগিতায় অসামর্থ্য। বরেন্দ্র পরিত্যাপ
করিয়া লক্ষণসেনের উত্তরাধিকারীরা প্রাপ্ত নবদ্বী-
পস্থিত পূর্ববঙ্গে আশ্রয় লইয়া এক প্রকার নিরাপদেই
ছিলেন। নোদিয়া অধিকারের কয়েক বৎসর পরে
মহম্মদ বক্তিরার তিব্বত জয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন।
তিব্বতের পথে তাঁহাকে সঠৈগ্তে করতোয়ার পাবান
নির্ধিত সেতু পার হইয়া বাইতে হইয়াছিল। এই সেতুর
অপর পারে কামরূপ রাজ্য। মহম্মদ বখন সেতুর
পাশ্বরে উপস্থিত হইলেন, তখন কামরূপ রাজ্যের দূত
তাঁহার কাছে নিবেদন করিল যে, কামরূপ রাজ্যের
অভিমত এই, মহম্মদ বক্তিরার এ যাত্রা কিরিয়া বাউল,
এবং আগামী বৎসর অধিকতর সেনা লইয়া তিব্বত
আক্রমণ করুন; তখন কামরূপরাজ সঠৈগ্ত তাঁহার
সহিত যোগদান করিবেন। কামরূপ রাজ্যের পরামর্শ
তুচ্ছ করিয়া মহম্মদ তিব্বত আক্রমণ করিলেন এবং
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।
কিরিয়া সেতুর কাছে আসিয়া দেখেন সেতু তাদিরা
কোলা হইয়াছে। তখন তিনি একটি মন্দিরে আশ্রয়
লইলেন। এই অবসরে কামরূপ রাজ্যের সেনা আসিরা
তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। নিরুপায় হইয়া মহম্মদ সেই
বাহু ভেদ করিয়া সাগরের নদীতে নামিলেন। কিন্তু
বিচুত্ব অগ্রসর হইয়া তুরস্কসেনা অথই জলে উপস্থিত
হইল। তখন কামরূপীরা আসিরা তাঁহাদিগকে
আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের কয়েক অধিকাংশ
তুচ্ছ হয় অত্রাঘাতে নিহত হইল না হয় জলমগ্ন হইল।
শতক অল্পের লইয়া কেবলমাত্র মহম্মদ পরপারে পৌ-
হিতে সমর্থ হইলেন এবং ক্রমে দেবকোটে উপস্থিত
হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। (৬)

৩। যেডাট কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত "ভাবাকৎ
ই-নালিদি" ১৩১—১৩২ পৃষ্ঠা।

মহম্মদ বক্তাবাদের মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দী পরে লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা মালিক ইক্তিয়াকদীন যুজবক কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। যুজবক করতোয়া (বেগমতী) পার হইয়া কামরূপে উপস্থিত হইলে, কামরূপরাজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া গেলেন। কামরূপের রাজধানী যুজবকের হস্তগত হইল। তারপর রাজধানীর আশে-পাশের গ্রামে বসে থাকাদি ছিল কামরূপরাজ তাহা উচ্চমূল্যে খরিদ করিয়া লইয়া গেলেন। দেশে ভাল কদল জন্মিয়াছে দেখিয়া যুজবক থাকাদি সংগ্রহ করিয়া গোলাজাত করা কর্তব্য বোধ করিলেন না। তারপর বখন চৈতালি কদল কাটিবার সময় উপস্থিত হইল তখন কামরূপ রাজ নদীর (করতোয়ার বা তিস্তার বা উত্তর নদীর) বাধ কাটিয়া দিলেন। দেশ জলে ভাসিয়া গেল; চৈতালি কদল ডুবিয়া গেল, নিরুপার যুজবক লক্ষণাবতীর দিকে যাত্রা করিলেন। তলমর দেশের অজানা অগ্রশত পথে তুরকসানাগণকে একত্র পাইয়া কামরূপীরা তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল, উত্তর পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুজবক হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। শত্রুর নিকট একটি তীর তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। তিনি আহত হইয়া ভূপতিত এবং মৃত হইলেন। যুজবকের পুত্রকন্যা এবং অন্তান্ত পরিবারবর্গও মৃত হইলেন। বখন বন্দীবশে যুজবককে কামরূপ রাজের নিকট উপস্থিত করা হইল তখন তিনি তাঁহার পুত্রকে কাছে লইয়া আসিতে অসুদৌষ করিলেন। বখন পুত্রটিকে কাছে আনা হইল তখন যুজবক পুত্রের মুখের উপর মুকুশানি রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে কামরূপ রাজ্য তুরকের কবলমুক্ত হইল (৭)

কামরূপী রাজের তুরক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার শক্তি ছিল, করতোয়া পার হইয়া তুরক রাজ্য আক্রমণ করিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু প্রাচীন গৌড় রাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট উৎকল রাজের সে সামর্থ্য ছিল। গঙ্গা-

বংশীয় প্রথম নুসিংহদেবের সেনা-তি তুরকান্বিত লক্ষণাবতী দেশে আক্রমণ করিয়া ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী লক্ষণাবতী নগরী পর্যন্ত পহুছিয়াছিলেন।

উৎকল রাজের সহিত লক্ষণাবতীর শাসনকর্তাগণের যে দীর্ঘকাল ব্যাণী যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল মিন্‌হাজ তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাবংশীয় রাজগণের ভাষ্যশাসনেও তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু একটি খবর কোথাও পাওয়া যায় না; তুরকগণের বয়েসে ও রাত অধিকারের পর কামরূপ, বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) এবং উৎকলের হিন্দু নৃপতিবর্গ একত্র মিলিত হইয়া তুরক আগন্তুকগণকে পাল্টা আক্রমণ করিবার কল্পনা কখনও মনে স্থান দিয়াছেন একবার আভাস কোথাও পাওয়া যায় না। বস্তুত নবম শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু নৃপতিগণকে অনেক সময় আবৃত্তক মত একযোগে কাজ করিতে দেখা যায়; কিন্তু তারপরে আর দেখা যায় না। তারপর যেন হিন্দুদিগের একত্র মিলিয়া কাজ করিবার সামর্থ্য সহসা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই প্রকার সামর্থ্য বিলোপের কারণ চরিত্র-বিশোধ, নৈতিক অবনতি। সমষ্টির হিতের তত্ত্ব ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসংঘাত করিতে হইলে যে বিচারশীলতা এবং যে চরিত্রবলের প্রয়োজন, সে চরিত্রবল প্রধান প্রধান হিন্দুদের তখন ছিল না। পক্ষাঘরে তুরকদিগের সেই বল অধিকতর পরিমাণে ছিল বলিয়াই আর একই সময়ে তাঁহারা একদিকে হিন্দুদিগকে আর একদিকে আদিম ইসলামীর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আরবদিগকে পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। (৮)

শ্রীমাপ্রসাদ চন্দ্র।

৭। রেভাট্টের "ভাবাবৃত্তি-ই-নাসিরি ১৬৪—১৬৬ পৃষ্ঠা। ১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যুজবকের মৃত্যু হয়।

৮। এই প্রভাবে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইল তাহার অবিকারের প্রমাণ লেখকের "গৌড়রাজবংশ" নামক পুস্তকে এবং সপ্তম বর্ষের "মানসী" পত্রে প্রকাশিত "বঙ্গালীর ইতিহাস (সমালোচনা)" শীর্ষক প্রবন্ধে (৫১১—৫১৩ ও ৫১১—৫১৩ মুদ্রিত হইয়াছে।

নারীর মন

(গল্প)

সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল জামাতার প্রত্যাবর্তনের আশায় থাকিয়া প্রৌঢ় কুমারনাথ বৎসন হতাশ হইলে, তখন তাহার মন একেবারেই তাবির পড়িল। অসুঠের পরিহাস! একদা বাটার হস্তে কত সন্তানান করিয়া কতায় সুখ সৌভাগ্যের কথা তাবির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, আজ তাহারই নির্দয় হঠকান্ধিতার জীবনের এই শেষ ক’টা দিন অশ্রুশোচনারপূর্ণ হইয়া উঠিল। মানসিক অশান্তিতে অকালেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল; সময়ও আর নাই। পরপারের ডাক বুঝি বা কাণে আসিবার বাজে। তাই অনিমার তবিত্ত্য তাবনা তাঁহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল। অবশেষে যেদিন সকল তাবনা চিন্তা হইতে ছুটি মিলিল, পুত্র কুমারনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—“আজ হতে অগ্নির তার তোমার, হৃদয়ের শরীরে একই রক্ত! ওর অসম্মানে তোমারও অসম্মান যেনো।”

তারপর আরও ছুটি বছর কাটিয়াছে। কুমারনাথ ব্যবসারে বেশ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পরে তাহার বালিগঞ্জের বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে। ইতিমধ্যে অনিমা নিজে পছন্দ করিয়া দাদার বিবাহ দিয়াছিল। তাহাদের ছোট সংসারটিতে আবার সুখের হিলোল বহিয়াছে। অকপের মত চিন্তা করিতে এখন আর কেহ নাই; তাহার নাম এ বাড়ী হইতে লোপ পাইয়াছে। কেবল অনিমা একেবারে তুলিতে পারে নাই; তাহার মনের এক কোণে আশায় কীপ আলো এখনো বুঝি বা মিট মিট করিয়া জ্বলে।

সন্ধ্যা সমাগত, অন্তিমিত সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু হরণ করিয়া পৃথিবী তখন রক্তরাগে রাঙিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় মিনি ও অনিমা বাহিরের বাগানটিতে

ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বাগান হইতে সিঁড়ির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নানাবিধ দেশী বিদেশী ফুলের টবে সজ্জিত। বড় বেরঙের অজস্র ফুল ফুটিয়াছে; বধু মিনি একটা বড় রক্তবর্ণ গোলাপ ছিঁড়িয়া অনিমার হাতে দিয়া বলিল,—“দেখ তাই। ছদ্ম এদিকে আসিনি, কত ফুলই ফুটে রয়েছে। বেরাটা কি করে! তোড়া বেঁধে বাইরের ঘরটার সাজিরে রাখলেও ত পারে।”

অনিমা একটা ছোট নিখাস কেঁদিয়া বলিল,—“ফুলগুলি ঠিক আমার মত, নয় তাই? কোটাই সার, কেউ আর ফুলে দেখছে না।”

মিনি বলিল,—“কেন, যখন কোটে ওখনি ত দেখে মাহুকের মন ভালে।”

“তা বটে”—বলিয়া অনিমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি তাবির তারপর বলিল,—“কাল ভাগবত শুনতে বাবিত ত?”

মিনি মাথা নাড়িয়া বলিল,—“না তাই,—ও আমার ভাল লাগে না। কি যে ছাই বুঝতেই পারি না। সত্যি তোর কি করে ভেতে মন বার?”

“কি আর করি! মনটা বার ভেতে সেই যখন দুয়ে রইল, তখন এটাকে একদিকে দেওয়া চাই ত,” বলিয়া অনিমা নীরব হইল।

বারবার এই কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া মিনি সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিল। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকা তার স্বভাব নয়। গভীর হওয়া সে ভালবাসে না। তাই আবার হাসিয়া বলিল, “তুই কি করে এতগভীর হোস তাই? দেখে দেখি এমন সুন্দর সন্ধ্যা, এমন ফুলের মেলা, আর তার দাব-বানে তুই ঠিক যেন বেঁধে ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদ!”

অনিমা এবার হাসিল। “ঈশ, কবিত্ব যে আর ধরছে না।” বলিয়া মিনির গাল দুটা টিপিয়া দিল। তাবিল সরলা মিনি, সংসার এখনো তার কাছে নুতনবে ও আনন্দে পরিপূর্ণ, হৃৎকের বার্তা সে কি জানে?

সেদিন বিপ্রহরে মিনি অপিসার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “ঠাকুর্নি, একটা সুখবর আছে তাই।” অনিমা একটা বই পড়িতেছিল; সে সুখ না তুলিয়া দিচ্ছিল। “কি?”

মিনি বলিল—“এরি বলছি না ত! আগে একটু প্যারে ধরে দেখে নে। তার পর।”

অনিমা এবার বইখানা বন্ধ করিয়া হাসিয়া বলিল, “একজন ত হাসখণ্ড লিখে দিবেছেন, তাতেও কি সাধ মেটে না?”

পরাজিত হইয়া মিনি বলিল, “তোমার সঙ্গে কথাবার্তা দার না তাই। শোন—তোমার দাদা আগ বসছিলেন, তাঁর বিলাতের কোন বন্ধু লিখেছেন, অল্প-বাবু এবার দেশে ফিরছেন; পড়া ত তাঁর কবেই শেষ হয়েছে, এতদিন নাকি চাকরী করছিলেন।”

হঠাৎ প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে অপিসার সুখখানি রক্তিম হইয়া উঠিল। পাছে মিনি তাহা ধরিয়া ফেলে এই ভরে সে সুখ নৌচু করিয়া রহিল।

মিনি তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিল,—“আমি তাই বলছিলাম তাঁর কাছে, এবার ঠাকুর্নি পালাবে।”

অনিমা উৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা কি বলেন?”

মিনি কহিল,—“তিনি বলেন, আমি কক্ষণে এত ফাংলা নয়। সে তার নিজের সূচ্য বোকে। যে তাকে এতদিন অবহেলা করেছে, তার কাছে সে বাবে? কক্ষণে নয়।”

অনিমা কিছু বলিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া মিনি বলিল,—“দাদার যদি একথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে কি বলব তাই?”

“তোমার যা খুসী! বলিস্, দাদী কোন অবস্থাতেই জীর পরিত্যক্ত নয়।”

মিনি এবার কৃত্রিম কোণ প্রকাশ করিয়া বলিল, “তুই কেন তাই একালে জমালি? মনে হয় তুই যেন সেই সত্যিকালের মাহুদ; একালে তাকে মানার না মোটে।”

অনিমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন?” মিনি বলিল,—“দেখনা সে দিন তোমার দাদা আমার সঙ্গে মিছামিছি ঝগড়া করেছিলেন বলে আমি তিন দিন তাঁর কাছে বেসিনি। আর তোমার কিনা এক-বিপ্লব অভিমান নেই। আমার কি ইচ্ছে করে জানিস? তিনি যেমন তাকে কাদিয়েছিলেন, আমরাও তাঁকে কাদিয়ে ছাড়ব।”

অনিমা একটু স্নান হাসিয়া নীরবে রহিল। কিছুক্ষণ পরে বাহিবে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। অনিমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “বা তাই, দাদা এলেন বুঝি! চাটা তুই করে দিস। যদি আমাকে ধোঁয়েন, তাহলে বলিস্ যে আমার মাথা ধরেছে।”

মিনি চলিয়া গেল। অনিমা তাহাতে লাগিল, এতকাল পরে দেশের কথা মনে পড়িয়াছে তবে। কিরিয়া আসিতেছেন, যদি অনিমাকে মনে পড়ে। কাছে আসিয়া যদি অপরাধীর তার দাঁড়াইয়া আগেকার মত মধুর কণ্ঠে বলেন, “কমা কর অণি, আমার অপরাধবোধ্য শান্তি নেই, তবু তোমার কাছে ক্ষমার প্রার্থী আমি আছি।” তখন কি অনিমা, কাদালের মত এত দিনের হৃৎ এক নিমেষে না তুলিয়া যনের তেজটুকু বজার রাখিয়া বলিতে পারিবে, “বাও, এখন কিসের দরকার?” কিন্তু অন্তর বাহাকে দেখার জন্য অংশিনা কামনা করিতেছে, তাহাকে অশ্রু কণা বলা কি সম্ভব হইবে?

অপিসার সারা মনে যেন অনিন্দের তড়িৎ-প্রবাহ এক নিমেষে বহিয়া গেল। সে বীরে বীরে পিতার শেষ জীবনের হৃৎ, প্রাতার বিরূপবাপী সবই তুলিয়া গেল। আশার মোহন ছুরে বহুদিন পূর্বককার শোনা একটি গান কেবলি তাহার কাণে বাজিতে লাগিল :—

বাঁজিবে সখি বাঁশি বাঁজিবে !

কখন রান্না জ্ববে বাঁজিবে !

বচন রাশি রাশি, কোথা যে বাবে ভাসি,

অধরে লাজ হাসি বাঁজিবে !

কিন্তু তারপর ? দশবৎসর পূর্বে জ্বরের মাঝখানে অমল শতদল প্রেমে যে সিংহাসন রচিতা দিগাহিল এখনো তাহা অটুট আছে কি ? না, তাহা যে তিনি বেজার মঠ করিয়া ফেলিয়াছেন ! আর বুদ্ধি সেরূপ দেয়া হইবে না । মাঝখানে এই দশবৎসরকার ব্যবধান ! সহজ শ্রদ্ধার ঠাইঃবুদ্ধি এর মধ্যে নাই ।

* * *

মাগুবে গড়ে আর বিধাতা ভাজেন ! অনিমা আশার আশার দিন গণিতে লাগিল । কিন্তু অরুণ-কুমার ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিতে আসিল না । খালি চিঠি লিখিয়া কুমুদনাথকে আপনার আগমন বার্তা জানাইল । কুমুদ রাগ করিয়া চিঠি ছিড়িয়া ফেলিল । যিনি শক্তির চিহ্নে জিজ্ঞাসা করিল, “কি লিখেছে ?” কুমুদ জোখতরে কহিল, “কিছু না, রাফেল-টার কোন পরিবর্তন হয়নি, আনিও ওকে সাধছি না ! অনি আনাদের জলে পড়ে’নি ।” অনিমা সমস্ত তুমিরা নীরবে রহিল ।

কয়েক দিন কাটিল । সেদিন অনিমার বড় ননদের বাড়ীতে তাহার নিমন্ত্রণ ছিল । বগুয়ালয়ের মধ্যে একমাত্র তিনিই অনিমার খোঁজ খবর নিয়া সম্পর্ক বজায় রাখিতেন । অনিমাও মধ্যে মধ্যে গিয়া সেখানে থাকিত ।

অনেকটা দূর বলিয়া সকাল বেলাই নান সারিয়া সভাভাটা, সম্মতিতা অনিমা যখন গাড়ীতে উঠিতে গেল তখন যিনি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল । এবং এক মুহূর্ত তাহাকে দেখিয়া বলিল, “তোকে দেখতে ঠিক ইরানী বলে জ্বব হয় তাই । তোকে যে তুচ্ছ করে সে কি রকম, আমার বড় দেখতে সাধ হয় ।”

অনিমা কিছু বলিল না, খালি একটু হাসিয়া গাড়ীতে উঠিল । মনে বলিল, “দেখিসনি, তাই ”

সে বাড়ী পৌছিয়া বড় ননদকে প্রণাম করিতেই তিনি সঙ্গেহে মুচ্ছন করিলেন । তার পর, মুহূর্তেই অনিমার সুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অভ্যন্ত নিমন্ত্রিতাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “দেখ দেখি কেমন বট ! আমার ভাইয়ের যোগা কি না । তাইত আজ ওকে আনা । হুইজনকে এক আরগার দেখব—এত আমার ভাগ্যে কখনো হয়নি ।”

অনিমা এবার প্রমাদ গণিল । সে তো ইহার ভক্ত প্রভুত হইয়া আসে নাই । অথচ এরূপ সম্ভাবনা তাহার মনে আসা উচিত ছিল । এখন এ সম্ভা হইতে মুক্তি পাইবে কিরূপে ? এত লোকের তিতর নিজের অবস্থা প্রকাশ করিয়া সকলের কৌতুহলে আগানো, তাহা ত লোভনীয় নয় । কিন্তু অব্যাহতি ভাবে তাঁহার নিকট যাওয়া, এ বেন তার করনারও অতীত । কি করিবে অনিমা ভাবিতে লাগিল ।

এমন সময় তার বড় ভাণ্ডী ‘বেবী’ আর ভাবিতে অবকাশ না দিয়া, “ওল ছোট মারী, মাঝাবাবুর সঙ্গে দেখা করবে চল” বলিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল । অনিমা বাধ দিল না, কম্পিত গদে তাহার সঙ্গে চলিল । এ বেন তাহার অধিগমীক্ষা । তিতরে বাহিরে আগুনে বেড়িয়া উঠিয়াছে । মুক্তি পাইবে কিনা কে জানে !

মনের এমনি সঙ্কট অবস্থায় অনিমা যখন অরুণের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তখন অরুণ আনন্দের কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল । বেবীর আস্থানে কিরিয়া হঠাৎ সে বেন তন্তিত হইয়া গেল । এই অনিমা, দশবৎসর পূর্বেকার কিশোরী, আজ যৌবনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্যের বোল কলার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে । মুহূর্তের মধ্যে অরুণ সব তুলিয়া নির্মিমেব নরনে চাহিয়া রহিল । আর লজ্জিত অনিমা এই অগলক দৃষ্টির ভলে আপনাকে নিরা বিব্রত হইয়া উঠিল । বেবীও চলিয়া গিয়াছে । দশ বছর পরে আবার এই একান্ত আপনাতর ছটা মাহুব এক আরগার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; অথচ তাহাদের মধ্যে কত বড় ব্যবধান ! কথা বলিবার শক্তিও বুদ্ধি নাই ! অনিমার বকের তিতর বেন

চিপ 'চপ' করিতে লাগিল। অবশেষে সে আপনাকে সামলাইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাল হিলে?"

অন্ধ্রণ বিস্মিত হইল। তাহার স্তরে সফোচ নাই, বিধা নাই, এ যেন নিত্যন্ত পরিচিতের মত প্রশ্ন "তালো হিলে?"

এর পরে চূপ করিয়া থাকা তাহার পক্ষে অশোভন, তাই সে মুহূর্ত্তে উত্তর দিল, "ইয়া—তুমি?"

অনিমা বলিল—"তাল। তারপর, এদেশেই থাকবে ত এখন? না, আবার দেখানে যাক?"

অন্ধ্রণ একথা কোন জবাব দিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া অনিমা আবার বলিল, "তাহলে আমি বাই—"

অন্ধ্রণ এবার যেন সফোচ কাটাঁইয়া চকিতে বলিয়া কেলিল, "দাঁড়াও, আবার কবে দেখা পাব? হোমার কাছে একটা কথা বলবার আছে।"

হঠাৎ অন্ধ্রণের এই প্রশ্নের এবং কথার স্তরে অনিমা যেন কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু ধরা দিল না। হাসিমুখে বলিল, "এই ত দেখা হ'ল, আবার কেন?"

অন্ধ্রণ ভাবিল যে সে বলে 'তোমাতে আমাতে কি খালি এইটুকু দেখা হওয়ার কথা অনিমা?' কিন্তু আবার সফোচ আসিয়া বর্ধরোধ করিয়া দিরাছে, তাই আর বলা হইল না। একথা বলিবার অধিকার বুঝি তাহার আর নাই।

কোন উত্তর না পাইয়া অনিমা একবার জিজ্ঞাস্যমুখে অন্ধ্রণের দিকে চাহিল। তারপর বীরে ধীরে বলিল, "আর, অপরিচিতের সঙ্গে কিই বা কথা থাকতে পারে? আচ্ছা, চলান আন।"—বলিয়া তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অপদ্রুপ লীলাভরে ঘুরিয়া চলিয়া গেল।

অনিমা বর্ধন তাহার মননের নিকট গিয়া, বৌদিবির অগ্রহৃতার দোহাই দিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় চাহিল, তখন তিনি বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তাহার যত্নোচ্ছাসহীন ক্যাকাশে মুখের দিকে চাহিয়া তিনি আর বোর করিতে পারিলেন না। হঠাৎ এক পরিবর্তন? কিছুকণ আগের দেখা হৃদয় প্রত্যন্ত-পদ্মটী যেন এক নিমেষে ম্লান হইয়া উঠিয়াছে।

অনিমাকে এত শীঘ্র করিতে দেখিয়া তিনিও আশ্চর্য হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "এত তাড়াতাড়ি করিলি যে?" কৃত্রিম ভয়ের অভিনয় দেখাইয়া অনিমা কহিল, "বড্ড ভয় পেয়েছি, তাই গালিয়ে এলাম।"

মিনি তাহার রকম দেখিয়া হাসিল। বলিল, "কিসের ভয়? বাব দেখেছিস্ নাকি?"

অনিমা বলিল, "বাব নয়, সাপ।"

মিনি বলিল, "বাঃ—বাবের চেয়ে বুঝি সাপের ভয় বেশী?"

"নয়? বাবকে তবু চোখে দেখে কিছুকণ লড়াই করা চলে। আর ও যে শুণ্ড শত্রু, কখন ফোঁস করে প্রাণটী নেবে জান্‌বার ঘো নেই।" বলিয়া অনিমা মিনিকে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়া কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার সে খালি মিনির সঙ্গে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। রাজ্যেও শরীর তাল নয় বলিয়া তাড়াতাড়ি আপনায় কক্ষে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। কিন্তু ঘুমাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অশান্ত মনে সে কেবল সারাদিনের ব্যাপারটা ভাবিতে লাগিল।

আজ সে জরী হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ঠেক মনটা ত ভয়ের আনন্দে পূর্ব্ব হয় নাই। এ কি হইল? তাহার গর্ভ তো পরিপূর্ণ রাখিয়া কিরিরাজে, তবে কেন এ আপণোষ? বাহা হয় নাই তাহা।—অহির চিত্তে সে বার কয়েক গৃহমধ্যে ঘুরিয়া অবশেষে জানালার গিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার রাজি। তারায় তারা আকাশ। জনকোলাহল নিবৃত্ত। যেন তাহারই মনের মত একটা বিরাট শ্রুতা পৃথিবীকে ছাইয়া কেলিয়াছে। সুমন্ত পুরীর মত খালি সারি সারি অট্টালিকা, মাঝে মাঝে ছ একটা বুক উন্নত শিরে শুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তারি মাঝে যেন সুজ্জিতা প্রকৃতি। অনিমা ভাবিতে লাগিল, 'সাহসের জীবনও এইরূপ রহস্যময়। সবই আছে, তবু যেন কাঁকা। এত অতৃপ্তি কোথা হইতে আসে? এই যে জীবন, কিসের কোঁত তার? দেহের স্রোতা, সরল দ্বারা



সিদ্ধপ্রদেশের আমীর-রাজতবনে নৃত্যসভা

১৮০৮ খ্রিঃ কাশ্মীরে নেপালি সৈন্যেরা কর্তৃক চিত্রিত—১৮০৮ খ্রিঃ কাশ্মীরে নেপালি সৈন্যেরা কর্তৃক চিত্রিত

বৌদিদি, তবু মনে হয় সে বুঝি ভাসিয়া বেড়াইতেছে।
চারিধারে কুল নাই, সীমা নাই।

সে রাখে অরুণ এইরূপ বিনিময়নয়নে বিছানার
এপাশ ওপাশ করিয়া কাটাইতেছিল। এই অগ্নিমা ত
তাহারই। কিন্তু, কতদূরে! তাহার উপর বুঝি
আর কোন অধিকার নাই।—কেনই বা থাকিবে।
সত্যই অগ্নিমা কে এতদিন তুলিয়া থাকার কারণ শুধু
বিভার্জনের প্রণোতন নয়, আরও কিছুই মোহ সেখানে
ছিল। দশবছরের কৃত কার্য তাহাকে যেন আজ
কাটার মত বিধিতে লাগিল। কেন সে অগ্নিমা কে
তুলিয়া মরীচিকার লিহনে ছুটিয়াছিল? কলে তৃপ্তি তো
পায়ই নাই, সুদীপ্ত পানীর অধিকারও সেই সঙ্গে
হারাইয়া ফেলিয়াছে।

মনে পড়িল, কুসুমকে চিঠি লিখিয়া সে উত্তর পায়
নাই। তাহার তার অপরাধ তুলিতে পারে নাই—
সে ত অগ্নিমার ব্যবহারেই বোঝা গেল। তাই স্বামী
হইয়াও আজ সে অপরিচিত।

কিন্তু সে কেন চিঠিতে অগ্নিমা কে দেখিবার জন্য
ব্যাকুলতা জানায় নাই? এখন যে আর কোন পথ
নাই। যদি সে প্রথমেই দেখা করিতে চাহিত, তাহা
হইলে আজ এত উপার খুঁজিতে হইত না। অরুণ
তুলিয়া গেল তখনও সে অগ্নিমা কে দেখে নাই। আজ
তাহাকে দেখিয়াছে, তাই এত ব্যাকুলতা। এক
মুহুর্তের দেখা অগ্নিমা যেন মনের মধ্যে আসন ঘেলিয়া
বসিয়াছে, কোথাও আর ফাঁক নাই। অরুণের মনে
হইল, অগ্নিমা ঠিক যেন সুস্মিত অগ্নিশিখা। মন
আকৃষ্ট করে, কিন্তু ছুঁইবার বো নাই। তার মনে
একটা অজ্ঞাতপ আগিতে লাগিল—আজিকার এই
মুহুর্তটাকে যদি আর একটু বেশী বাড়াইতে পারিত!
তখন কেন সে অগ্নিমার কাছে কমা চাহিয়া লইল না?
সুখ অরুণ, আজিকার এত বড় সুযোগটাকেও সে
হেলায় হারাইয়া ফেলিয়াছে!!

অগ্নিমারও দিন কাটিতেছিল, কিন্তু সমস্ত জীবন তুলিয়া
যে কোতের হাংকার বহিতেছে তাহাকে চাপিয়া রাখা

বুঝি তার সাধ্য নাই। তাহার হৃদয়—সে যেন
কারোই রূপান্তর। কুসুম তাহা লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে
বলিল, “অরুণের চিঠির জবাব না দিয়ে ভাল করিনি,
নয়?”

মিনি বলিল, “নিশ্চয়। তোমরা না বললে সে কি
সেধে আসবে?”

কুসুম বলিল, “তাই তাবছি, তাকে আসতে লিখব।
কিন্তু অরুণের তার তোমার উপর। তার ব্যবহার
মনে কঃলে আর তার মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না। আমি
যদি না থাকি, তুমি একলা পারবে ত?”

মিনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, পারিবে।

পরদিন বিকালে অরুণ যখন আসিল, কুসুম তার
আগেই বাহির হইয়া গিয়াছে। মিনি গদগদে তাহাকে
বসাইয়া বলিল, “তিনি এইমাত্র একটা কাবে বেরিয়ে
গেলেন।”

কুসুম নাই শুনিয়া অরুণ চকুলজ্বার হাত এড়াইয়া
বুজির নিখাস ফেলিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই অবসি
বোধ করিতে লাগিল। ফিরিয়া বাইবে কি নাই ততক্ষণে
করিতেছিল, মিনি বুঝিতে পারিয়া বলিল, “উনি
নেই, তাতে কি? আমরা ত আছি। বসুন, ঠাকুরিকে
খবর দিয়ে আসি।”

অগ্নিমা একাকী আপনায় কঁকে বসিয়া ছিল। মিনি
আসিয়া বলিল, “তাই, অরুণ বাব এসেছেন। তোর
কাছে নিয়ে আসব?”

অগ্নিমা সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল, “সে কি?
দাদা জানেন?”

মিনি বলিল, “জানেন বৈ কি। তিনিই ত আসতে
লিখেছেন।”

অগ্নিমা কহিল, “দাদা কেন লিখলেন? যদি
অজ্ঞরোধে পড়ে এসে থাকেন? তাঁর নিজের ইচ্ছার
এসেছেন কি?”

মিনি এত সব প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই
একটু মুড়িলে পড়িয়া কহিল, “বারে, আমি কি জানি?
সে ত তোমার জানবার কথা। ইচ্ছে না থাকলে কি

কেউ অহরোহে পড়ে কাঁচ করে ?" বলিয়া বিনি বাহির হইয়া গেল।

টিক কথা। কিন্তু দানী কেন লিখিলেন ? অনিয়ার মনের তাৎকালিক তাঁহার নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে ? ছিছি, কি লজ্জা ! আর তিনি, এত দিন পরে কি বলিয়া দিয়া হইল ? অনিয়ার তাবির কিছই টিক করিতে পারিল না। ঠাঁই তাঁহার মনে হইল, এ বুঝি সেদিনকার সাক্ষাতের কল। আসিয়া বাহাকে খবর দেওয়াও দরকার মনে করেন নাই, আল তাহার জন্ত বিনা কারণে আসিবেন এ বেন বড়ই অবিদ্বান। কিন্তু সত্যই যদি সেদিনের দেখার মন চলিয়া থাকে ?—অনিয়া আর তাবিতে পারিল না। তাহার অঙ্গর কাঁপিয়া উঠিল। যে পূজা তাহাকে নয় সে পূজা অনিয়ার চায় না। তাহার সৌন্দর্য্য তাহার রূপ আজ বেন তাহাকে বিচার দিয়া কেবলি বলিতে লাগিল, "কামরা ছাড়া তোমার কোন মূল্য নাই—কোন মূল্য নাই।"

বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। ধীরে ধীরে অরুণকে নিয়া মিনি প্রবেশ করিল। বলিল, "ঠাকুরি, অপরাধী হাজির, জব্ব্ব কর কাণ দুটো মলে দি। নইলে

ধাক্কা, তুমিই মনের মত শাস্তি দিও। আমি বাই, খাওয়ার আয়োজন করিগে।"

অনিয়া তখন তাবিতেছিল, সেদিন তাহার পরীক্ষা হয় নাই, অগ্নি পরীক্ষা তাহার আজ। সেদিন বুঝি আজিকার মত অপমানের জ্বর এমন স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। অধীর চিত্তে সে মনে মনে বলিল, ভগবান তোমার স্পষ্ট নারীর মনের জন্ত কেবল কি কোমলতাই নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছ ? একবিন্দু শক্তি দিতে পার নাই ? এক মুহূর্তের জন্ত আজ এতটুকু শক্তি দাও। বার জোরে এই অনাহত অশ্রুমাণিতে ফিরাইয়া দিয়া সতেজে বলিতে পারি, "তোমার খেয়ালমত ভালবাসা, সে আমি চাইনা।"

মিনি চলিয়া গিয়াছিল। আবার হ্রসবে কাছাকাছ। নিস্তব্ধ কক্ষ—অরুণ ধীরে ধীরে আরো নিকটে গিয়া অনিয়ার একখানি হাত ধরিয়া মুহূর্তে ডাকিল—
"অনিয়া।"

হার, কৈ শক্তি ?—শক্তি ত মিলিল না ! অনিয়ার মত হইয়া আমিহকে প্রণাম করিল।

শ্রীপ্রসাদ সেন।

কৈলাসপর্বত ও মানসরোবর দর্শন (পুরানুস্মৃতি)

২। দিওরি

১৯শ জ্যৈষ্ঠ ইং ২রা জুন সকালে উঠিয়াই নিকটবর্তী করণার বাইরা দানাদি করিয়া কিছু খাওয়ার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ডাক বাজার নীচেই সরকারী জুহুবে একটি সরকারী বেবের দোকান আছে, দোকানদার ব্রাহ্মণ। পাঁচোড়ের বেশীর তাগ গোঁকই ব্রাহ্মণ, কড়িয় ও অন্যান্য জাতি সংঘাত পরিমাণে আছে, কিন্তু

সব কাষেই প্রায় ব্রাহ্মণই বেশী পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-টিকে আহার সম্বন্ধে বলার সে আমাকে গরম গরম রুটি ও আলুর তরকারী খাওয়াইতে পারে বলিল। আমি "তথাস্তু" বলিয়া তাহাকে তৈয়ারী করিতে বলিলাম। আমার নেপালী বন্ধুরা রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বলিলেও হইতে পারিত, কিন্তু বিশেষ দরকার না পড়িলে তাঁহাদিগকে বড় দেওয়া উচিত বিবেচনা করিলাম না। ৮টার মধ্যেই খাইয়া সকলেই আবার চলিবর জন্ত প্রস্তুত হইলাম।

এই বার পথটি অনেকটা সমতল, তাই বলিয়া কলিকাতার মরদানের মত নহে—অনেক উচু নিচু আছে। বেলা বিপ্রহর পর্য্যন্ত পথ এই রকমই ছিল, আবার চড়াই আরম্ভ হইল। বিপ্রহর বলিয়া চড়াইয়ের বড় কষ্ট পাইতে লাগিলাম। সকলেই বঁটা ধানেক বিশ্রাম করিয়া আবার চড়িতে লাগিলাম। যদিও আজকের চড়াই বিগত কল্যের মত, কিন্তু পূর্ব্বদিনে বড় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ছিলাম বলিয়া আজ বেন সকলেই হাঁটিতে কষ্ট পাইতে লাগিলাম। আজ আর বোড়াটি আগে বাইতে দেওয়া হয় নাই, কেহ কেহ উহা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বেলা ৩টার সময় এক পশলা বুটি হইয়া গেল, বেশ ঠাণ্ডা হইল। ঠাণ্ডা হইবার জন্য আরও কিছুকণ চলিতে পারিলাম। কিন্তু এইবার আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। আর চলিবার ক্ষমতা রহিল না, আমি বলিয়া পড়িলাম, ও আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম, “আপনারা অগ্রসর হউন, আমি যদি পারি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনাদের সঙ্গে চম্পাওতে আসিয়া মিলিত হইব, না পারিলে রাজ্যে পাহাড়ে থাকিয়া সকালে নগরে পৌছিব।”

আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের চম্পাওতে পৌছিবার কথা। এখান হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূর। বন্ধুরা বলিলেন, “সে কথা কোন মতে হইতে পারে না। এক সঙ্গে আসিরাছি, আমরা আপনাকে একলা ছাড়িয়া বাইতে পারি না।” তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ নেপালী হিন্দু, তাঁহারা কোন মতেই সঙ্গীকে ছাড়িয়া বাইতে সম্মত হইলেন না। বিব্রত সমস্তার পড়িলাম। এ দিকে শারীরিক অবস্থা, ওদিকে সঙ্গীদের অবস্থা—কি হইবে, অগত্যা সাহসে ত্বর করিয়া কিছুকণ বিশ্রাম লাভের পর সকলের সঙ্গে আবার চলিতে লাগিলাম। আর বেশী দূর বাইতে হইল না, চড়াই শেষ হইয়া আসিল, পরেই উৎরাই ও গ্রাম সমতল রাস্তার চম্পাওতে পৌছিতে হইবে। চড়াইয়ের পর একটু উৎরাই মানিয়াই একটি নদী আছে, সেইখানে সকলে বাইরা

মুখ হাত ধুইয়া ও জল পান/করিয়া পিপাসা নিবারণ করিলাম এবং কিছুকণ বিশ্রাম করিলাম। এবার আমাদের নেপালী ভাষাই বাবু বলিলেন, তাঁর ভদ্রানক মাথা ধরিরাছে ও পেট ব্যথা করিতেছে। তিনি বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছু সুস্থ হইলে আমি সকলকে বলিলাম, “আর চম্পাওত ৩ মাইল, আপনারা অগ্রসর হউন, ভাষাই বাবু ও আমি আশ্তে আশ্তে আসিতেছি আপনারা বাইরা বাসা ঠিক করিয়া রাখিবেন।” চাকরটি যে এখনও পিছনে কোথায় পড়িয়া আছে তার কিছুই খবর নাই। অপর সকলে অগ্রসর হইলে আমরা দুই জনে চাকরটির জন্য অনেককণ অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু যখন তাহার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল আমরাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম।

এইবার আমরা নদীর ধারে ধারে জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিরাছি। সন্ধ্যা আগত গ্রাম, রৌদ্রের উত্তাপ একেবারেই নাই, জল হইয়া বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য আর কোন বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে না। পাহাড়ের সাতার বিপ্রহরের রৌদ্রের উত্তাপ মাহুকে শীতলীকৃত করিয়া ফেলে। জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা, আশে পাশে অনেক জংলি গোলাপ গাছ ও জায়গার জায়গার নদীর ধারে চাষাবাস। কোথাও রাখালেরা গরু চরাইয়া বাড়ী করিয়া বাইতেছে। অদূরে চম্পাওত নগর দেখা বাইতেছে, একটা মরদানের উপর ছোট গ্রাম। গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে অনেক চাষ বাস, ও অদূরে আবার পর্ব্বতশ্রেণী। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গ্রামের বাহিরে (যেখানে আমাদের বাকি সঙ্গীরা বাসা স্থির করিয়াছিলেন) পৌছিলাম। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। গ্রামটি এখনও অর্দ্ধ মাইল দূরে, কিন্তু থাকিবার স্থান আছে বলিয়া এবং কাছেই একটি নদীতে জল পাওয়া বাইবে তাবিয়া এবং চাকরটি এখনও আসিয়া পৌছে নাই সেই কারণেও বটে, এই স্থানে থাকাই স্থির হইল। বন্ধুরা রাখিবার উত্তোপ করিতে লাগিলেন,

কিন্তু আমাকে সজ্ঞিতে কিছুই খাইতে হইবে না বলিয়া বিহানা বিহাইয়া গুইয়া পড়িলাম। আজ বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে, কারণ বৈকাল বেলায় একটু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন, এখনও বৃষ্টি হইবার খুব সম্ভাবনা। কিছুক্ষণ পরে সকলের খাওয়া হইল। চাকরটিও ইতিমধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আমরা সকলেই আজ এক স্থানে থাকিলাম, কারণ আরগাটি জঙ্গলের ধারে ও শোনা গেল সময় সময় এখানে বাঘ ভালুকের উপদ্রব হইয়া থাকে।

৩। চম্পাওত।

২০শে জ্যৈষ্ঠ ইং ওরা ছুন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা চম্পাওত নগরের ভিতর দিয়া লোহা বাটের দিকে রওয়ানা হইলাম। চম্পাওত বেশ একটি নগরী। এখানে একটি ফুল, হাঁসপাতাল, পোষ্ট অফিস আছে। একজন সনুডপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন, তাঁহার আদালত আছে। পুরাকালে কুমায়ুন বা কুর্মাঞ্চলের হিন্দু রাজাবংশের ইহা রাজধানী ছিল। পরে গুরুখা দিগের হাতে পড়িলে তখনও একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। গুরুখা যুদ্ধে তাহাদের পরাজয়ের পর বধন ইহা ইংরাজ-দিগের হস্তগত হইল, তখনও অনেক দিন ইহা একটি সৈন্ত নিবাস ছাউনি ও সর্বভুক্তিজনাল টাউন ছিল। এখন এখানে সৈন্ত সামন্ত রাখা হয় না; এবং লোহা বাটে সর্বভুক্তিজনাল আফিসের হেডকোয়ার্টার উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার আর পুরুত্ব নাই। তাহা হইলেও ইহা প্রসিদ্ধ জনপদ ও হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। সহরের সন্নিকটে একটি পাথরের পুরাতন মন্দির আছে। ইহা যে স্তুনিপুণ শিলা তৈয়ারি করিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাই ষট্‌ক দেবের মন্দির, ভগবান এখানে কুর্খ অবতারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই কারণে এই স্থানটি এবং বিশেষ রূপে ও সমস্ত প্রদেশটি কুর্মাঞ্চল নামে খ্যাত হইয়াছে। চম্পাওত

সমুদ্রগর্ভ হইতে ৫৬৪২ ফুট উচ্চে অবস্থিত ও টনক-পুর হইতে ৩০ মাইল দূর।

আমরা নগরের বাহির হইয়া ময়দানে পড়িয়া বেশ সমতল ভূমি দিয়া বাইতে লাগিলাম। কাছে কোনও জঙ্গল নাই সমস্তই শস্তক্ষেত্র। অদূরে যে পাহাড় দেখা বাইতেছে উহার উপর দিগা লোহা বাটের পথ। রাত্তার হুঁধারে ছোট ছোট দেবদারু গাছের জঙ্গল আছে, দেখিলেই বোধ হয় যেন বালুয়ার সন্নিকটস্থ কোন বাগান-জঙ্গল নয়। গাছগুলি দেবদারু, কিন্তু ইহা অল্প রকমের দেবদারু। এক রকম দেবদারু আছে বাহা ম্লিহানীর জঙ্গলে পাওয়া যায়, তাহাকে ইংরাজিতে পাইনাস লঙ্গিফলিও (Pinus Longifolio) এবং সচরাচর চিড় গাছ বলা হয়। কিন্তু এই দেবদারু গাছগুলি পাইনাস এক্সেলসিয়র (Pinus Excelsior)—কলিকাতার বড় লোকদের বাগানে Cypress গাছের মত দেখিতে, গোড়া হইতে ডগা পর্যন্ত যেন কাঁচি দিয়া কাটিয়া দাঁড় করান হইয়াছে, গোড়াটি খুবই মোটা, আর ডগাটি খুবই সরু।

সীতাই পথ অতিক্রম করিয়া সম্মুখের পাহাড়টি পার হওয়া গেল। পাহাড়টির উপরে গাছপালা একটিও নাই। রাত্তার ধারে মাত্র একটি গাছ, গাছের ছায়ার বসিয়া দৃশ্যগুলি বাহা দেখিয়া আসিয়াছি, পেহন কিরিয়া আবার একবার দেখিতে লাগিলাম। সম্মুখে উত্তর দিকেই লোহাবাট দূরে জঙ্গলের মধ্যে আভাস মাত্র বোঝা বাইতেছে। আবার লোহা বাটের দিকে দেবদারু গাছের ঘন জঙ্গল আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চলিতে লাগিলাম।

এবার লোহাবাট পর্যন্ত আর বেশী ভাগ উৎরাই। রাত্তার হুঁধারেই বড় বড় দেবদারু গাছ, ও অনেক জংলি গোলাপ গাছ আছে। আরও নানারকম গাছ লতা পাতা আছে। আবার নেপালী বহুলা একরকম মরিচের মত ছোট ছোট কল আনিয়া কহিলেন, “ইহার নাম টিঘুর, খাইলে জল পিপাসা নিবারণ হইবে।” সুখে ছই একটি দিগাই বুঝিতে পারিলাম ইহা কাঁচা

কাবাব চিনির ফল (cubeb)। জঙ্গলে খুব কাবাব চিনি কলিয়াছে, কিন্তু বোধ হয় এ দেশের লোক ইহার ব্যবসা বাণিজ্য করে না। বাইতে বাইতে পথে একটি বড় গ্রাম পাইলাম। এইখানে অনেক মুসলমানের বাস। এখান হইতে লোহাঘাট দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে লোহবর্গি নদীর তীরে পৌছিয়া নদীর ধারে ধারে রাস্তা দিয়া বাইতে লাগিলাম। আমরা ছইজন পিছনে পড়িয়াছি, বাকি সকলে অগ্রসর হইয়াছেন। নদীর ধারে ধারে বাইরা লোহাঘাটে ঢুকিতেই নদীর উপর একটি সেতু আছে। সেতুর পারেই নদীর ধারে ঋষীশ্বর মহাদেবের মন্দির। আমাদের সঙ্গীরা ইহার আগে আসিয়াছিলেন তাঁহার। এই স্থানটি থাকিবার জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন। আমরাও বাইরা তাঁহাদের কাছে পৌছিলাম। দেখলাম তাঁহাদের নির্বাচনটি অতি সুন্দরই হইয়াছে।

ঋষীশ্বর মহাদেবের মন্দিরটির ছই দিকেই নদী। এক দিকে লোহবর্গি, অপর দিকে অস্ত্র একটি ছোট নদী, লোহবর্গিতে আসিয়া মিশিয়াছে। ছইটি নদীর ধারেই বেশ উচ্চ পাহাড়, জঙ্গলে পরিপূর্ণ, বড়ই মনোহর ও শান্তিদায়ক দৃশ্য। মন্দিরের অদূরে অস্ত্র ছই দিকে লোহাঘাটের সহর বাজার। কিছুকণ বিদ্রাম করিয়া লোহবর্গিতে স্নান করিলাম। ইহা আমাদের শাস্ত্র কথিত স্বপ্ন পুরাণের তীর্থস্থান, পুরাতন নাম এখনও চলিয়া আসিতেছে। স্নান করিয়া নিজেই পাক করিয়া আহাৰ করিলাম। ঘণ্টা দুয়েক বিদ্রাম করিয়া লোহাঘাটের বাজার দেখিতে বাহির হইলাম।

৪। লোহাঘাট।

লোহা ঘাটে একটি সব্‌ডিভিজনা ল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী আছে। তিনটি উকিলও থাকেন। উকিল গজানন পুনেঠা। একজন উৎসাহী যুবক, বাজারের মধ্যে তাঁহাদের একটি কাপড়ের দোকান আছে, হরিনন্দন পুনেঠা তাঁহার জেষ্ঠ্যভাত এই দোকানের

কার্য্যাব্যাক। আমি সোজা হুজি তাঁহাদের দোকানেই উঠিলাম। প্রথমেই হরিনন্দন পুনেঠার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম, পরে উকিল মহাশয় আসিলে তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। অনেককণ কথাবার্তা কহিবার পর তিনি বলিলেন, আপনার সমস্ত ব্যবস্থা এইখান হইতেই হইরা বাইবে। তাঁহার নিকট শু'নলাম মিষ্টার টমাস এখনকার সব্‌ডিভিজনা ল ম্যাজিষ্ট্রেট। টমাস সাহেব পূর্বে গোরখপুরে ছিলেন, তথায় তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। মিসেস্ টমাস বাঙ্গালী শরের কন্যা। বাজার পরিভ্রমণ করিয়া আমরা মিষ্টার টমাসের বাঙ্গলার গেলাম। টমাস সাহেব আমাদের দেখিয়া বড় খুশী হইলেন ও গোরখপুরের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মিসেস্ টমাসও আসিয়া আমাদের চিনিতে পারিলেন। চা পানের পর অনেক রকম গল্প আরম্ভ হইল। কত রংয়ের কত ধরনের কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা অনেকটা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। মিসেস টমাস বড়ই ধার্মিক খুটান রমণী। তিনি আমার কোন মতে বাগার করিতে দিলেন না। বলিলেন, লোহাঘাটে বত দিন আছেন আমাদের আতিথ্য স্বীকার করিতেই হইবে। আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। যে ছই দিন লোহাঘাটে ছিলাম, বড়ই আনন্দে ও সুখে কাটাইলাম।

বিবি টমাস বলিলেন—“সকল ধর্ম্মই এক, প্রভেদ মাত্র পছা অবলম্বনে। কেহ কোনটি ভাল পথ বলিয়াছেন, অপর কেহ আবার নুতন পথ দেখাইয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ বুঝাইয়াছেন।” সাধারণত আমরা যেমন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-বাজক বা পাদরীদিগকে হিন্দু ধর্ম্মের বিদ্বেষী দেখিতে পাই ও কথার কথায় অস্ত্র ধর্ম্মের প্রতি কটুক্তি করিতে শুনিতে পাই, তাঁহার কাছে তাহার কোন রূপ গুরুপর্যন্ত ছিলনা। অনেককণ কথা কহিবার পর, ভোজননের ডাক পড়িল। সাধারণ নিয়ম অনুসারে আমিও তাঁহাদের সহিত টেবিলে বাইরা বসিলাম। আমি রাজ্যে কিছু খাই না, বসিরা বসিরা মিসেস টমাসের মিষ্ট কথার আশ্বাস পাইতে লাগিলাম। “ভগবানের পুত্র

বীণা খ্রীষ্ট মন্থবাণীগের অস্ত্র জন্ম লইয়া কত কষ্টই সহ্য করিয়াছেন, ও পরের দুঃখে কাতর হইয়া মন্থবাণীকে তাহাদের কষ্ট হইতে নিবৃত্ত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐতস্তদেবও ইহাই করিয়াছিলেন। বীণাই ভজ, আর ঐতস্তই ভজ, ভজনানন্দে অবশ্যই আনন্দ পাইবে এবং তাহাই তগবৎপ্রাপ্তির প্রথম পথ।”

আহাঃের পর অনেক কণ পর্বত আমাদের কথা বার্তা চলিল। রাজি অধিক হইলে আমরা সকলেই মিলিত হইয়া তগবৎ প্রার্থনা করিলাম। খুষ্টান ও সুসলমানদের মধ্যে এখনও শরনের পূর্বে তগবৎ আরাধনা প্রচলিত আছে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া একবার লৌহবর্গিতে স্নান করিয়া আসিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, স্নান করি। সকালে যদিও একটু ঠাণ্ডা বোধ হইল, কিন্তু স্নান করিবার পর যেন শরীরে বেশ ক্ষুধা হইল। বাজার কিরিয়া আসিয়া টমাস সাহেবদিগের সহিত ৮টার সময় চা খাওয়া হইল, ও ১০টার সময় প্রাতরাশ শেষ হইল।

একবার বাজারের দিকে বাহির হইলাম। বাজারে আসিয়া পণ্ডিত হরিনন্দন পুনেঠার দোকানে বাইরা বসিলাম। সেখানে অনেককণ থাকিয়া নানা রকম রাস্তার বিষয়ে খবরাখবর পাইলাম। তাঁহার এক ব্যাপারী বন্ধু নন্দরাম কল্যাণ সিং, পারবিরাংয়ে থাকেন, তিব্বতে তাকলা কোটের বাজারে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যান। পুনেঠা মহাশয় তাঁহার নামে এক পত্র লিখিয়া আমাকে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার নেপালী বন্ধুদের কাছে গেলাম।

কল্যাণ প্রত্যুষেই আমরা রওনা হইব স্থির হইল। আমরা মাত্র লোহাখাটি পর্যন্ত বোড়া ভাড়া করিয়া-ছিলাম, অতএব এখান হইতে আবার দুইটি বোড়া ৮ হিসাবে পিথোরগড় পর্যন্ত ভাড়া করা হইল। প্রত্যুষে আহাঃাদি করিয়া এখান হইতে বাওয়াই জুবিধা বিবেচনা করা গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত শিবস্থানে

থাকিয়া সন্ধ্যাশিবে ধর্ম্মের সন্ধ্যা আচিতি দেখিয়া, আবার টমাস সাহেবের বাজার কিরি আসিলাম। আজ রাজ্যেও তাঁহাদের অতিথি থাকিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। তাঁহারা আরও দিন কয়েক থাকিয়া বাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি আমার নেপালী বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা করিলাম না, সকালে উঠিয়াই বাওয়া স্থির রহিল।

২০শে জ্যৈষ্ঠ ইং এই জুন প্রত্যুষে লৌহবর্গিতে স্নান করিয়া আমার নেপালী বন্ধুদিগকে বলিলাম, “অপনারা বত শীঘ্র গারেন বাজার দিকে আসুন, আমাকে প্রস্তুত পাইবেন।” পিথোরগড়ের রাস্তা বাজার ধার দিয়াই গিয়াছে। মিসেস্ টমাস আমার নেপালী বন্ধু ও তাঁহাদের মহিলাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার নেপালী বন্ধুগণ, ইহা শুনিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

পূর্ব রাজ্যেই বিবি টমাস তাঁহার ভৃত্যদ্বিগকে আমাকে ৮টার সময় খাওয়াইয়া দিবার হুকুম দিয়াছিলেন। পার্শ্বতীর দেশে বেন্দীর ভাগ চাকরই ব্রাহ্মণ। ৮টার মধ্যেই আমার আহাঃ হইয়া গেল। ভাত ও আলু মটরগুটি দিয়া ডালনা। আজ তরকারী খাইলাম, কিন্তু জানিতাম না ইহার পর দুইমাস আর কোন তরকারির সুখ দেখিতে পাইব না।

আমার নেপালী বন্ধুরা আসিলে তাঁহাদের মহিলাদিগকে দেখিয়া মিসেস্ টমাস বড়ই খুসি হইলেন। সকলেই মিষ্টার ও মিসেস্ টমাসের অভ্যর্থনা পাইলেন। আমার নেপালী বন্ধুরা জাতিতে নেওয়ার (Newar) পূর্বেই বলিয়াছি। সমস্ত নেপালের ব্যবসা বাণিজ্য নেওয়ারদের হাতে। নেওয়ার জীলোকদিগের পরিধান, অন্য নেপালী মহিলাদের পরিধান হইতে অনেকটা বিভিন্ন। ইহারা মৌখীন রকমের কাপড় পড়েন ও কেশ-বিন্যাসও অন্য রকমে করিয়া থাকেন। মাথার ফুল বসাইতে বড় ভালবাসেন। মিসেস্ টমাস যদিও পূর্বেই নেওয়ার মহিলাদের ছবি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু

ইহাদিগকে দেখিয়া বেন জীবিত ছবি পাইলেন। সকলকেই ফুগ ও কল উপহার দিলেন। আজ দুই দিন বেশ আনন্দে কাটাওয়া, সন্ধানন্দ খ্রীষ্টকালের দিকে আবার আগ্রসর হইতে লাগিল।

বাগলার কাছ হইতেই বেশ সমতল রাস্তা চলিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি সমতল বলিলে কলিকাতার মত বুঝিলে চণ্ডিবে না, মধুপুর কিংবা গিরিডিতে বাহাকে "পাহাড়ের উচু নিচু" বলা হয় সেই রকম উচু নিচুকেই, কিংবা তারার চাইতে আরও বেশী উচু নিচুকেই হিমালয় পর্বতের সমতল বুঝিতে হইবে। রাস্তার দুইধারেই অনেক চাষবাগ হইয়াছে। একটু দূরেই রায়েকোট (Raikot) গ্রাম, তার পরেই একটি উচ্চ পর্বত আরম্ভ হইয়াছে। উহার উপরে খুটান দিগের মাউন্ট এবট (Mount Abbot) গ্রাম খুটান ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্ম প্রচারের জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই সূদূর পাহাড়ে তাঁহারা নিজেদের ধর্ম প্রচার করিয়া নিজেদের বসতি কার্যে করিয়াছেন, এই হিমালয় পর্বতের অনেক দুর্গম স্থানে তাঁহারা বাইরা নিজেদের ধর্ম প্রচার করিবার প্রবৃত্তি পাইয়াছেন। সূদূর ভোট দেশে গুটি চৌদালি সিন্ধা বসিয়া একটি স্থানে দুইটি খুটান মহিলা কিছুদিন নিজেদের ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন এবং একটি স্কুল ও খুদিয়া-ছিলেন।

মাউন্ট এবট পর্বতের উত্তরে পশ্চিমে কমা-ধুরী দেবীর মন্দির। তাহার আরও পশ্চিমে অস্তিত্ব হিন্দু তীর্থ স্থান আছে। কিন্তু হিন্দুদিগের স্থান গুলি আজ নির্জীব, কারণ হিন্দু ধর্মের প্রচার নাই। যদি ধর্মের প্রচার না থাকে ও জলের প্রবাহ না থাকে, তাহা হইলে কালে উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। হিন্দু! তোমাদের কি নিজা আর ভাদে না? তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া জাভা দ্বীপ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের জয় পতাকা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু

তোমরা আজ এমন দুর্বল যে, তোমার হিমালয় দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই, সমুদ্র পার হইবারও সাহস নাই। কারণ, কোনও অন্ধকূপের পতিত বলিয়া দিয়াছেন, সমুদ্র পার হইলে জাভ হারাইবে।

কথা কহিতে কহিতে বেশ আনন্দে চলিয়াছি। দুই দিনের বিগ্রামের পর আজ পথ হাঁটিতে ততটা কষ্ট হইতেছে না। ডান ধারে খুব উচু পাহাড়, বামে খুব দূর পর্যন্ত পার্শ্বীয় গঙ্গার ও পরেই নদী আছে। 'এই স্থানে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম ও পাহাড়ের ধারে বেশ চাষবাগ হইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলিয়া "ছিরা" স্থানে পৌছিলাম। এখানে একটি ছোট ডাকবাগলা আছে। মনে করিলাম, এখানে একটু জল খাওয়া বাইবে ও বিশ্রাম করা বাইবে। সকলেরই জল পিপাসা লাগিয়াছিল, কিন্তু জল পাওয়া গেল না বলিয়া আর মাইল খানেক বাইরা "বমুন পানি"তে আমরা বিশ্রাম করিলাম। বমুন পানিতে পানিই পানি (জলই জল) কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় হইতে ঝরণা বাহির হইয়াছে। এই স্থানে একটি ছোট কলা বাগান আছে, কিছু কলা কিনিয়া আবার বাস দূরেকের জন্ত কল খাইয়া লইলাম। লোহাঘাট হইতে সমস্ত হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বৎ হইয়া আবার বতদিন বদরি-নারায়ণের কাছে বোশি নঠে না পৌঁছিব ততদিন আর তরকারি বা ফলের সুখ দেখিব না। হিমালয়ের অস্তিত্ব স্থানে সময়ে অনেক তরকারি ও নানারূপ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু আমি যে সময়ে গিয়াছিলাম সে সময়ে কিছুই ছিল না।

৫। রামেশ্বর ঘাট

দূরে রামেশ্বরের পর্বত দেখা বাইতেছে। যদিও মন্দির এখান হইতে দেখা যায় না, কিন্তু কোন্ স্থানে মন্দিরটি অবস্থিত তাহার ধারণা করা বাইতে পারে। অদূরে রামেশ্বরের পুল ও রামেশ্বরঘাট পর্বত পার হইতে হইবে। এক পাহাড়ের উচ্চ স্থান হইতে অপর অর্ধ একটি পাহাড়

বাইবার ভক্ত যে নৈকীর্ণ পথ তাহাকেই বাট বা বাটি বলা হয়। খেয়াবাট তুলিতে যেমন নদীর উচ্চতীর হইতে নীচে নামিয়া নৌকাযোগে চল পার হইয়া আবার পরবর্তী উচ্চতীরে উঠিতে হয়, পাহাড়ের বাট অবতীর্ণ হওয়াও প্রায় সেই রকম। এক উচ্চ শৃংগ হইতে আরও উচ্চতর শৃংগে বাইতে হইলে অনেক উঠা-নামা করিতে হয়। এবার আশ্বিনগকে রামেশ্বর বাটে তাহাই কহিতে হইবে। প্রায় ৩ মাইল পথ নীচে নামিয়া, রামগঙ্গা পার হইয়া আবার তিন মাইল পর্বতে উঠিয়া গুরগা পর্যন্ত বাইরা রামেশ্বর বাট পার হইয়া তবে শিখোরা গড়ের সমতল ভূমি পাওয়া যাইবে।

বহুলা পানি হইতে উৎরাই আরম্ভ হইল। আজ আমরা বেশি উঠা-নামা করি নাই, তাহা ছাড়া দুইদিন বিশ্রামের পর একটু জুইই ছিলাম, রাত্তার বিশেষ কষ্ট হয় নাই। এবার আবার উৎরাই আরম্ভ হইল যেখান আমরা একটু থলী হইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই নৈরাশ্রের সঞ্চার হইল। রামেশ্বর বাটের উৎরাই তরানুক কঠিন, কারণ মাত্র একটি পর্বত খাড়া একবারে নদী বক্ষ পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। নদীবক্ষ বহিঃ দেখিতে খুব কাছে বোধ হয়—যেন সাজোরে ঢেলা ফেলিলে নদীর জলে ঢেগাটি পড়িবে—কিন্তু পাহাড় দিয়া বাইতে অনেকখানি রাস্তা। রাস্তাটি পাহাড়ের পার্শ্ব আঁকা বাঁকা করিয়া কাটিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। রাস্তাটিও তাল নয়, পথ সংকীর্ণ, ও পাথরে পরিপূর্ণ। বাই হটক, আমরা কোন মতে আস্তে আস্তে নামিলাম। বোড়াটির কোনও রকম ব্যবহার করা বাইতে পারা গেল না, কারণ উৎরাইয়ে বোড়ার উপর চড়া একেবারেই চলে না। বোড়ার গর্দানের উপর জিনটি না কসিলে বোধ হয় কিছুই হইতে পারে না। হাসিবার কথা নয়, বাঁধারা পার্শ্বতীর বোড়ার তির্যক্বে দেশে পাহাড় অতিক্রম করিবার ছবি দেখিয়াছেন, তাহার দেখিবেন, বোড়ার জিনটি পিঠের মাঝখানে নয়, একেবারে গর্দানের দিকে।

গোমটী, সরষু ও রামগঙ্গা। এই স্থানের কিছু উপরে তিনটি মিলিত হইয়াছেন, সেই জন্ত এই স্থানটি ও শ্রীশ্রীরামেশ্বর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। রাম গঙ্গা এই-স্থানে দুইটি উচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। দুইটি বড়ই জলধর, এখন পর্যন্ত বাঁধ। কিছু দেখিরাছি তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বরাবর নদীর ধারে ধারে বাইরা পুল পার হইতে হইবে। কিন্তু কাছেই একটি ছোট পুল ছিল, সেটি ভালিয়া যাওয়ার কারণে একবার খুব উচু নিচু করিতে হইল। বড় বড় পাথর, রাস্তা নাই, সেই কারণে ঘোড়াগুলি পার করা জরুর হইয়া উঠিল; অতএব ঘোড়ার মাল-পত্র নামাইয়া খালি ঘোড়া পার করা গেল। সন্ধ্যা হইতে না হইতে আমরা রামগঙ্গার পুল পার হইলাম। পুলটি বেশ বড় ও জলধর। এটা বোলা পুল বা হংগাভিতে বাহাকে সাসপেনসন ব্রিজ (suspension bridge) বলা হয়। পার্শ্বতীর দেশে পুরাকালে নদীর উপরে পার্শ্বতীরের দড়ির বোলা পুল তৈয়ার করিত। তাহারই উপর দিয়া পারাপার হইবার উপায় ছিল। পার হইবার সময় পুলটি বড়ই জ্বলিত, সেই কারণে অনেকেই সাহস করিয়া পুল পার হইতে পারিত না। হরিহারের কাছে লছমন বোলা বেশ প্রসিদ্ধ স্থান। লছমন বোলায় পূর্বে দড়ির বোলা পুল ছিল, বাজীরা বড় কষ্ট পাইত। এখন কোন ধার্মিক বড় লোকের দানে লছমনবোলায় একটা জলধর সাসপেনসন ব্রিজ নির্মিত হইয়া বাজীদিগের কষ্ট নিবারিত হইয়াছে।

সাসপেনসন ব্রিজগুলিও পুরাকালের দড়ির জ্বলির অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছে। নদীর দুই পাশে পাহাড়ের উপর দুইটি পারার মতন উচ্চ বেওয়ার তৈয়ার করিয়া, তাহার উপর দিয়া দুইগাছি লোহার তারের দড়ি টানিয়া বেঁধা হইয়াছে, সেই লোহার দড়িতেই লোহার গরাদে দিয়া লৌহ বীম জ্বলাইয়া তাহার উপর পাটা বিছাইয়া পুল নির্মিত হইয়াছে। পুলটি সম্পূর্ণই লৌহ-নির্মিত, তাই বেশী দোলে না, তবে পাঁচ সাতজন এক সঙ্গে চলিলে যেন একটু বোলায় মতন সামান্য দোল

বোধ হয়। পার্ৱতীৰ নদীৰ মথো পাৰা কৰিয়া পুল বানস বাইতে পাৰে না, কাৰণ ধৰ্ম্মকালৈ খৰস্ৰোতে নদীৰকে পাৰা বত মজবুতই হক না কেন তালিয়া বাইবাৰ তৰ আছে।

পুল পাৰ হইয়া নদীৰ উত্তৰ তীৰে পৌছিলাম। এই স্থলে দুটি ছোট ছোট বৰ ধৰ্ম্মশালা নামে অতিহিত। কোন ধাৰ্ম্মিক ব্যক্তি প্রস্তুত কৰাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন ক্ষয় গুলিৰ বড়ই বে-মেরামত হইল পড়িয়াছে আৰ ধাকিবাৰ উপযুক্ত নহে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, অতএব আজ আমাদিগকে এইখানেই বাসা কৰিতে হইল। জিনিসপত্রগুলি ঠাখিবাৰ পৰ অংঘাৰ নেপালী বন্ধুৱা বন্ধুৱেৰ বন্ধোবস্ত কৰিতে লাগিলেন। খাওৱাৰ পৰ সকলে তইবাৰ পূৰ্বে একটা খুব বড় বকম আগুৱেৰ ধুনি জালিয়া রাখা হইল। এই স্থলে ব্যাজ ও বিশেষ কৰিয়া তলুকেৰ বড়ই তৰ আছে, কাৰণ সমস্ত স্থানটি জললে পৰিপূৰ্ণ। সেইজন্য ৱাজিকালে আগুৱ জালাইয়া রাখা উচিত। কাঠ সংগ্ৰহ কৰিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। ধুনি জালাইলে সুবিধাই হয়, ৱাজে একটু শীতও হইয়াছিল।

২৩ মে জৈষ্ঠ ইং ৬ই জুন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমৱা শীজ বাহিৰ হইয়া পড়িলাম। সম্মুখেই কঠিন চড়াই, ৱোজ হইবাৰ পূৰ্বে চড়াইটি শেব কৰিতে পাৱিলে বিশেষ কষ্ট হইতে বাঁচা বাইবে। কি তন্নানক চড়াই। পূৰ্বে দিউৱ চড়াই মনে কৰিয়াছিলাম, এখন বুকিতে পাৱিলাম ৱামেখৰ বাটেৰ চড়াই আৰও কঠিন। এখন কঠিন বলিতেছি, কিন্তু পৰে পৰে বখন আৰও কঠিন আসিবে তখন বলিব ৱামেখৰেৰ চড়াই কিছুই নয়। ধীৰে ধীৰে পথ অতিক্ৰম কৰিয়া ২টা বাজিতে বাজিতে ৱামেখৰেৰ চড়াইয়ে চড়িয়া গুৱণা পৌছিলাম।

গুৱণা হইতে পিখোৱা গড় পৰ্য্যন্ত ভূমিকে একটা খুব বড় পার্ৱতীৰ মাঠ বলা বাইতে পাৰে। স্থানে স্থানে খুব উচু নিচু আছে, ছোট বড় পাহাড়ও আছে, কিন্তু সমস্তই প্রায় সমতল ভূমি। দূৰে দূৰে পৰ্ব্বতের উপৰ অনেক পার্ৱতীৰ গ্রাম দেখিতে পাওৱা বাইতেছে।

বেশ চাববাসও হইতেছে। গুৱণাৰ একটি বেমেৰ মোকান ও সৱকাৰি ডাক বাকলা আছে। কিন্তু জল অনেক দূৰে, তাই গুৱণা হইতে এক মাইলে একটা গ্রাম আছে সেইখানে বাওৱাই হিৱ হইল। গুৱণা হইতে কিছু চাউল খৰিদ কৰিয়া লইলাম। বেশ ভাল চাল, টাকায় ২ সেৱ কৰিয়া পাওৱা গেল। তৱকাৰি কিছুই পাওৱা গেল না অতএব কিছু ডাল কিনিয়া লইলাম।

প্রায় এক মাইল বাইয়া একটা গ্রাম অতিক্ৰম কৰিয়া তালি পেউনি গ্রামেৰ নিকট পৌছিলাম। এই স্থানে একটা ছোট নদী আছে, বন্ধনাধি কৰিয়া খাওৱা হইবে ইহাই হিৱ হইল। জিনিস পত্র ৱাখিয়া বন্ধনাধিৰ উভোগ কৰা গেল। কিন্তু আজ একটা বিশেষ অতাব হইল। বাহা আমৱা কখনও তাবি নাট, আজ জালাইবাৰ জন্ত কাঠ সংগ্ৰহ কৰা বড়ই দুৱহ ব্যাপাৰ হইয়া উঠিল। ৱামেখৰেৰ বাট উঠিয়া গুৱণা হইতে বে পার্ৱতীৰ মাঠ আৱন্ত হইয়াছে ইহাৰ কোথাও আৰ জল নাই। ছোট ছোট বে পাহাড় গুলি আছে তাহাতেও গাছ পালা নাই। কোন পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে কিংবা নিম্নদেশে বেথান হইতে কোন পার্ৱতীৰ নদী বাহিৰ হইয়াছে সেই স্থানেই বৎসামাত্ৰ গাছপালা আছে। গ্রামবাসীদিগকেও দূৰ হইতে কাঠ আনিয়া ইন্ধন সংগ্ৰহ কৰিতে হয়। আমৱা কোনও বকমে ছোট বন জল গাৰ্হেৰ কাটা সংগ্ৰহ কৰিয়া তাহাতেই কাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ কৰিলাম। আজ আবাৰ বহুতই পাক কৰিয়া ভোজন কৰিলাম। বিশ্রাম কৰিবাৰ পৰ আবাৰ ৱওৱা হইবাৰ জন্ত সকলে উঠিলাম।

আমৱা নদীতটে ৱান্তা হইতে বেথান দিয়া নামিয়া হিলাম, সমতলৰ সেথান দিয়া কেহ নামে না। সেই কাৰণ কোন নামিবাৰ বা উঠিবাৰ পথ নাই। সদৰ ৱান্তা হইতে নদীগৰ্ভে প্রায় ১০০ ফুট নীচে। আমি বাসনগুলি ধুইয়া ছই হাতে লইয়া উপরে উঠিতেছি, এমন সময় তুল ক্ৰমে আমাৰ পা একটা অপলকা বাৱগাৰ পড়িয়া পিছলাইয়া পড়িয়া গেলাম। পড়িয়াই নদীৰ দিকে পড়াইয়া

বাইতে লাগিলাম। প্রায় পাঁচগাত হাত নীচে বাইরা কতক গুলি কাঁটা গাছ ছিল তাহাতেই কাপড়গুলি লাগিল। এইরূপে আটকাইয়া গেলাম ও কাঁটাগাছগুলি হাত দিয়া ধরিয়া ফুলিতে লাগিলাম। নীচেই ২৫-২৬ ফুট খাড়া গভীর নদীর গর্ভ। আমার নেপালী বন্ধুরা বোকাইয়া আসিয়া ছই জন নীচে হইতে আমার পায়ের তলায় হাত দিয়া আমার বোলা অবস্থা হইতে উপরে ফুলিলেন। বৃদ্ধ অজস্বর আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে ফুলিয়া লইলেন। কাঁটার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, বিশেষ হাতের তালুগুলি একবারে রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। উপরে রাত্তার আসিয়া খানিকটা হাসা গেল, কিন্তু খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার আমার চণ্ডিতে লাগিলাম। এবার আমি বোকার সওয়ারি করিলাম। প্রায় সবতল ভূমি দিয়াই চণ্ডিতে লাগিলাম। কিছুদূর বাইরা বোকা হইতে নাহিয়া পড়িলাম। আভিকার দৃষ্ট তত স্তম্ভ নর, পাহাড় পর্বতে গাছ পাল্লা না থাকার কারণ সকলই যেন একটা রুদ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আসোশাশে শতক্ষেত্রের অন্ত যেন এক একবার একটু সাধনা হইতে লাগিল। পট্টিসৌর বা শিখোরা গড় এ সকলের শতক্ষেত্র এবং এইখান হইতেই লোহাঘাট পর্যন্ত শত সরবরাহ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়।

আষাঢ়ে

ও কার	পাগল হানি ঠিকরে পড়ে যন মেঘের কিনারার,	আর	পাগল তা'রে করতে পারে আলো-ছায়ার মরিয়ার।
ও কে	মজারিতে উদাস করে ডাকছে শত ইসারার ? খান্ধ টাঘের তরী বাওয়া, মেঘের ছায়ার আকাশ ছাওয়া,	ও সে	বান-হারার মররেতে, চলবে অচিন্ বন্দরেতে, বল্ছ তরল অহরেতে চলবে তাসি' মরিয়ার।
আজ	বিবাহ তরে সজল হাওয়া স্বর ধরেছে উদারার। 'কান্না-হাসির গভী ছিঁড়ে, অসীমে প্রাণ বিশতে করে,	তার	সুখার বানে কানার কানার, তরলো তাহার শুক হিয়ার, উছলে-ওঠা হাজার ধারার কেলছে ছেয়ে বজ্রধার।
এই	কোলাহলের সাগর তীরে ধাক্কে চাহে নিরাণার। ইন্দ্রধনুর সেতুর পারে, দৃষ্টি তাহার খুলছে কা'রে,	সে যে	বা' কিছু তা'র আগন আছে, বিলিয়ে যেবে অগৎ মাঝে, গৈরিকেতে বাউল সাঝে ছাক্বে এবার মধুরার। শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

ঋগ্বেদের মর্মবাণী

[৪]

আমরা পূর্ব-সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে, বেদান্তের ভাষ্যকার হই প্রকার দৃষ্টির কথা বলিয়াছেন; এক, অজ সাধারণ লোক যে ভাবে জগতের বস্তুগুলিকে দেখিয়া থাকে; অপর তত্ত্বদর্শিগণ যে ভাবে জগৎকে অহুত্ব করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকের স্বাভাবিক দৃষ্টি, জগতে অতিব্যক্ত নাম-রূপাদিতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। আমরা জগতে নানাপ্রণী বস্তু দেখিতে পাই,—বৃক্ষজাতীর বস্তু, পশুজাতীর বস্তু, মনুষ্যজাতীর বস্তু—কত জাতীর বস্তু আমরা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রত্যেক জাতিতে আবার অসংখ্য নাম-রূপধারী ‘ব্যক্তি’ (individuals) দেখিতে পাই। ইহাদের প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র, ভিন্ন। আবার সকল বস্তুই অহরহঃ পরিণত হইতেছে, ইহাও সর্বদা দৃষ্ট হয়। এমন বস্তু কদাপি পাওয়া যাইবে না, বাহা এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থা না পাইতেছে। ইহাই বস্তুগুলির প্রকৃতি। দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। একটা বৃক্ষের কথা ভাবিয়া দেখুন। উহার বীজাবস্থা বিনষ্ট হইবার পর, উহা অঙ্কুরাবস্থায় পরিণত হয়। আবার, অঙ্কুরাবস্থার পর, উহা ফলপুষ্পাদিসম্বিভ বৃক্ষাবস্থায় পরিণত হয়। সর্বত্রই এইরূপ। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমার বাণ্যাবস্থার পরে যৌবনাবস্থা; যৌবনাবস্থা চলিয়া গিয়া, এখন প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এইরূপ যুজুর্পাবস্থা চলিয়া বাইবার পর, পিতৃাবস্থা; পিতৃাবস্থার পর, বটাবস্থা দৃষ্ট হয়। পূর্জাবস্থা, বর্তমানাবস্থার ‘কারণ’। এবং বর্তমানাবস্থা, উহার পূর্জাবস্থার ‘কার্য’। এই প্রকারে, কার্য-কারণ-দ্বয়ে আবদ্ধ থাকিয়া, প্রত্যেক বস্তু এক অবস্থা নাশের পর, অপর অবস্থায় পরিণত হইতেছে,—ইহাও আমরা সর্বত্র সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বস্তুর এই সমস্ত

অবস্থা হাড়া যে আবার কোন ‘বস্তু’ পরমাখা বা অপর কোন বস্তু আছে, তাহা আর আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না। ইহারই নাম—‘স্বাভাবিক দৃষ্টি’।

কিন্তু বাঁহারা ‘তত্ত্বদর্শী’ লোক, তাঁহারা বলেন যে—‘দাচ্ছা, তোমার কথা মানিলাম। আমরা নানা প্রণী, নানা জাতীর, বস্তু দেখিতেছি। ঐ সকল বস্তু এক অবস্থা হইতে অপর এক ভিন্ন অবস্থায় নিরন্তর পরিণত হইতেছে,—এ কথাটাও মানিয়া লইতেছি। উদ্ভিদ ভিন্ন এ কথাটা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বাহা, তাহা অস্বীকার করিলে, আমার ঐক্য্য প্রকাশ পাইতে পারে, আমার গায়ের জোর প্রকাশ পাইতে পারে;—কিন্তু আমার বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইবে না। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে—‘প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এই জাঃ প্রপঞ্চ ‘বিভিন্নান’ রহিয়াছে, ইহার অপলাপ বা অস্বীকার করা ত কখনই সম্ভব হইতে পারে না।’ *

‘প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—যুজুর্পাবস্থা চলিয়া গিয়া বটাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে;—ইহা অস্বীকার করা ত আর চলে না। মাটির পরিণতি বট,—ইহা নদী হইতে জল লইয়া আসিয়া আমার ক্ষুদ্রবৃত্তির আমার পিপাসার উপশমের সাহায্য করিতেছে; উহাও সর্বদা আমার সাংসারিক প্রয়োজন ব্যবহার নিম্পন্ন করিতেছে। সুতরাং বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির কথাটাও কখন অস্বীকার করা চলে না।

ও যদি ভাব্য বিদ্যানোয় বাহ্যঃ পৃথিব্যাং লক্ষণঃ, আত্মাত্মিকত্ব দেখেজিয়াংলক্ষণঃ—একঃ এবিলাপরিচুৎ উচ্যেৎ...স পুরুষ নামেণ অশক্যঃ এবিলাপরিচুৎ। ইত্যাদি (শঙ্করভাষ্য, বেদান্ত দর্শন)

“কিন্তু তুমি যে বলিলে যে, ইহা ছাড়া ‘বতঙ্গ’ কোন পরমাণু নাই,—তোমার এ কথাটা আমরা মানিতে প্রস্তুত নহিঁ। আমরা বলি, নাম-রূপাদি সকল অবস্থান্তরের মধ্যে একটা জিনিষ অমুহ্যত হইয়া আসিতেছে। উহা আপন স্বরূপে ঠিক থাকিয়াই আপন ‘বাতঙ্গ’ বজার রাখিয়াই, অবস্থান্তরগুলির মধ্যে অঙ্গুগত হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থান্তরগুলি, সেই বাতঙ্গের কোন হানি করিতে পারিতেছে না। দৃষ্টান্তের অভাব নাই! রজ্জু-সর্প, তক্তির-রক্ত, নক-বস্ত্রোচ্চিকা—প্রভৃতির দৃষ্টান্ত লও। সর্পাবস্থার প্রভীতি হইতেছে; কিন্তু রজ্জু ত প্রকৃতই অবস্থান্তরিত হইয়া পড়ে নাই। উহা বতঙ্গ রহিয়াই, সর্পাবস্থা পাইয়াছে; রজ্জু ত প্রকৃতই সর্প হইয়া উঠে নাই। তুমি যে আমার অবস্থান্তর গুলির মধ্যেই কার্য কারণের কল্পনা করিতেছিলে, সেটাও ঠিক কথা নহে। যে জিনিষটা সবল অবস্থার মধ্য দিয়াই অমুহ্যত হইয়া আসিতেছে, সেই জিনিষটাই প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল অবস্থান্তরের ‘কারণ’। উহা হইতেই অবস্থান্তর গুলি উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উহাই সকল অবস্থান্তরের মধ্যে আপনার বাতঙ্গ্য হারার নাই, আপন স্বরূপকে হারার নাই।”

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! তৎস্ববর্ণী লোকেরা এই প্রকার কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদিগকে একটা এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় যে—“মহাশয়! আপনারা ত অবস্থান্তর গুলিকে স্বীকার করিতেছেন। এবং আপনারা ঐ অবস্থান্তর গুলির মধ্যে অমুহ্যত একটা জিনিষ স্বীকার করিতেছেন; এবং আপনারা বলিতেছেন যে, ঐ জিনিষটা বতঙ্গ থাকিয়াই—আপন স্বরূপে ঠিক থাকিয়াই—বিকৃত না হইয়াই—প্রত্যেক অবস্থান্তরের মধ্যে অঙ্গুগত হইয়া রহিয়াছে। আচ্ছা মহাশয়! যদি তাহাই হয়, তবে আমরা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে,—ঐ উত্তরের মধ্যে সন্দেহ তবে কি প্রকার হইবে? এই অবস্থান্তর গুলির সঙ্গে, সেই অমুহ্যত জিনিষটার সন্দেহ কি প্রকার?”

এই প্রশ্নের উত্তর, ভাব্যকার নিজে এইরূপে দিয়াছেন—

“পরমাণু এই নাম-রূপাদি বিকার গুলির মধ্যে অমুহ্যত রহিয়াছেন। এই বিকারগুলি, এই অবস্থান্তর গুলি,—প্রকৃতপক্ষে তাঁহা হইতে ‘বতঙ্গ’ কোন বস্তু নহে। ইহারা উৎপন্ন হইবার পূর্বে, যথুতে রসের ভ্রম, কাঠে অগ্নির ভ্রম, ঘূতে মাধুর্যের ভ্রম, তাঁহারই মধ্যে অবিস্তৃত ভাবে ছিল। বর্তমানেও তাঁহাতেই অবিস্তৃত রহিয়া—ইহারা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। আবার, ইহারা তাঁহারই মধ্যে পুনরায় বিগীন হইয়া বাইবে। সুতরাং ইহাদের বতঙ্গতা কৈ? তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহা হইতে বতঙ্গ হইয়া,—ইহারা থাকিতে পারে কৈ? প্রকৃত কারণের সহিত, উহার কার্য বা অবস্থান্তর গুলির এই প্রকারই সম্বন্ধ। বাহা হইতে বাহার অতিব্যক্তি হয়, তাহাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না; তাহা হইতে বিতক্ত হইয়া—পৃথক্ হইয়া সে থাকিতে পারে না।* মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটাদি যে কোন অবস্থাই ধারণ করুক না কেন;—মৃত্তিকা হইতে বিতক্ত হইয়া, মৃত্তিকার স্বরূপকে ত্যাগ করিয়া, মৃত্তিকার স্বরূপ ছাড়া অন্য কোন ‘বতঙ্গ’ স্বরূপ লইয়া, ঘট কখনই উৎপন্ন হইতে পারিবে না, থাকিতেও পারিবে না। অতএব, নাম-রূপাদি বিবিধ বিকারময় জগৎটাও—ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে কোন বতঙ্গ বা ভিন্ন বস্তু হইতে পারে না। অবস্থান্তরগুলি, সেই অমুহ্যত কারণটার আপন স্বরূপেরই পরিচায়ক; কোন ‘অন্ত’ বস্তু নহে।

তাহা হইলেই, পাঠক পাঠিকা দেখিতেছেন যে, অবস্থান্তর গুলিকে, নাম-রূপাদি বিকারগুলিকে উড়াইয়া দিবার কোনই প্রয়োজন হইতেছে না। জগৎকে অপলাপ বা অস্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন উপস্থিত হইতেছে না। ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে কোন

* বস্তু ত বস্তুদ্বারা সত্য; আরও, স ভেদ অপ্রবিত্ততা দৃষ্টঃ, বস্তু ঘটাদীনামৃ বৃথা।

বিরোধও থাকিতেছে না। বাহ্য প্রকৃতগত্রে ‘অন্ত’ একটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে; বাহ্য ব্রহ্মেরই স্বরূপের বিকাশ বা অভিব্যক্তি;—তাহার সঙ্গে ব্রহ্মের বিরোধ হইবে কি করিয়া? এই প্রকারে ভাব্যকার, অগত্বে রাধিয়াই বিরোধ তত্ত্বন করিতে পারিয়াছেন। অগত্বে উড়াইয়া দিয়া, অপলাপ করিয়া, তাঁহাকে বিরোধ তত্ত্বন করিতে হয় নাই।* ভাব্যকার ভারতের ব্রাহ্মণ। কাহাকেও হিংসা করা, কাহারও প্রাণনাশ করা, ব্রাহ্মণের ধর্ম নহে। শকর, অজ্ঞোত্তরহস্ত বোদ্ধ-গুরুবের ভার, এ অগত্বে প্রাণনাশ করিতে উদ্ভত হন নাই। তিনি যে অর্থে অগত্বে ‘অসত্য’ বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অন্ত প্রকার।

সাংখ্যাচার্য্যগণ, ‘প্রকৃতি’ নামক একটা বস্তুকে এই অগত্বে উপাধান (material cause) বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা এই প্রকৃতিকে, একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র অসংসিদ্ধ শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, এই প্রকৃতি, কাহারও বিনা প্রেরণার, আপনা আপনি, অবনিহিত শক্তি-বলে এই অগত্বে পরিণত হইয়াছে। ভাষ্যচার্য্যগণও, পরমাণুগুকে অগত্বে মূলে স্থাপন করিয়াছেন। এই পরমাণুগু, তাঁহাদের মতে, স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ, নিত্যবস্তু। পরমেশ্বর, এই সকল নিত্য পরমাণুকে গড়িয়া পিটিয়া অগত্বে আকারে পরিণত করিয়াছেন। তবেই, সাংখ্য এবং ভাষ্য—উভয় মতেই, অগত্বে স্বাধীন, স্বতন্ত্র, ‘অন্ত’ একটা বস্তু হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু বেদান্ত দর্শন এ প্রকার সিদ্ধান্ত করেন নাই। বেদান্তের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। বেদান্তের ভাব্যকার, প্রকৃতির স্বাধীনতা স্বীকার করিতে পারেন নাই। এই অন্তই তিনি আপন দর্শনে, সাংখ্যের ‘প্রকৃতি’ শব্দটিকে গ্রহণ করিতেই আপত্তি

উত্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তের “মায়াক্রি” কোন স্বাধীন, স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ইহা ব্রহ্মের নিত্য স্বাধীন, নিত্য অঙ্গগত। ব্রহ্মগততা বাঁচীত হইয়া কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। উহা ব্রহ্মস্বরূপেরই বিকাশোন্মুখ অবস্থা মাত্র * উহা ব্রহ্ম হইতে ‘অন্ত’ কিছু নহে। এই অগত্বে-রূপে অভিব্যক্ত হইবার অন্ত, যখন ব্রহ্মের “ঈশ্বরশক্তি” বা চেষ্টা উপস্থিত হইল, উহা তাহাই।—

“ঈশ্বরশক্তিতে প্রবৃত্তি তৎসং সমতৎ।”

আনন্দগিরি এই মায়াক্রি শব্দে বলিয়াছেন যে,— “ইহা যখন পরমাঙ্গারই শক্তি, তখন ইহা পরমাঙ্গারই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পরমাঙ্গার স্বরূপ ব্যতীত ইহার স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। অতএব ইহা সৎসং, ব্রহ্মের একত্বের কোন হানি হইতেছে না।”

“ইহা পরমাঙ্গা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই ক্রিয়া করিয়া থাকে; নিজে স্বতন্ত্রভাবে কোন ক্রিয়া করিতে সমর্থ নহে।”

ভাব্যকার অনেক স্থলে, এই মায়াক্রিকে, ব্রহ্মের “কর্মহানীর” বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মকে ইহার ‘কর্তা’ বলিতে হয়। কর্তা, আপন ক্রিয়ার ব্যাপক। ব্যাপককে, তাহার ব্যাপ্য হইতে স্বতন্ত্র হইতেই হয়। ব্যাপ্য এবং ব্যাপক—এক বস্তু হইতে পারে না। কিন্তু, কর্ম কখনই কর্তাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। অতএব, মায়াক্রি আর কিছুই নহে; উহা ব্রহ্মেরই ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা। সুতরাং, ব্রহ্ম হইতে উহা কোন “স্বতন্ত্র” বস্তু হইতে পারিতেছে না। সুতরাং, এই অগত্বে, এই নাম-রূপাদি বিকারবর্গ,—ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, ব্রহ্মেরই বিকাশ, ব্রহ্মেরই ক্রিয়া বা কর্মমাত্র। ‘অন্ত’ কোন বস্তু নহে।

উহা যে ব্রহ্ম হইতে বাস্তবিক স্বতন্ত্র কোন বস্তু

* “পরমার্থভিপ্রায়েণ তদনন্তরনিভায়া। ... পরিণাম-প্রক্রিয়াক আভ্যন্তরিত সৎসংখ্যায় কার্য্যপ্রকং।”—স্বত্রকারঃ (বেদান্ত-ভাষ্য)।

* বেদান্তের মায়াক্রি ইহাকে ‘আয়মানাবস্থা’, ‘চিকিৎসিতাবস্থা’, ‘উন্মূগীভূতাবস্থা’ বলা হইয়াছে।

স্বহ, উহা ব্রহ্মকেই অতিব্যক্তি মাত্র—ইহা বুঝাইবার
অল্প ভাষ্যকার, সাংখ্য বা ভাষ্যের মত, অল্প কোন
বস্তুকে জগতের উপাদান না বলিয়া, ব্রহ্মকেই জগতের
উপাদান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাঠক-
পাঠিকা! আপনারা অবশ্যই তুলিয়া থাকিবেন যে,
বেদান্ত এক ব্রহ্মকেই, একাধারে, নিমিত্ত কারণ
(Efficient Cause) এবং উপাদান কারণ
(Material Cause) বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম,
এই জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াই, আপনাকেই জগৎ-
রূপে পরিণত—বিকাশিত—করিতেছেন।—

“পূর্বসিদ্ধোপি হি সন্, জগদাকাশে

পরিণময়ামাস আত্মানং।” (বেদান্ত ভাষ্য)

তিনি অল্প কোন স্বাধীন উপাদানকে গড়িয়া
পিটিয়া জগৎরূপে পরিণত করেন নাই। তিনি
নিজেই নিজকে, বিবিধরূপে ও বিবিধ নামে
অতিব্যক্ত করিতেছেন। সুতরাং জগৎকে ব্রহ্মেরই

বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ‘অল্প’
কোন বস্তু নহে।

কিন্তু এই মহান্ সিদ্ধান্তটা বেদান্ত কোথায়
পাইলেন? প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনারা তুলিলে
হয়ত বিস্মিত হইবেন যে, বেদান্ত এই তত্ত্বটা অবিকল
ঋগ্বেদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা মূলে
ঋগ্বেদেরই সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম বস্তু যে জগতের নিমিত্ত
কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই—একথা অত্যন্ত
স্পষ্ট করিয়া, ঋগ্বেদই সর্ব প্রথমে বলিয়া দিয়াছিলেন।
বেদান্ত তাহাই আগুন দর্শনে, সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ
করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা ঋগ্বেদের সে কথা আর একদিন
বলিব।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

কবির কল্পনা

ছুটে বাই, আমি ছুটে বাই ওগো

চাঁদের জ্বর নুটিতে,

ছুটে বাই আমি অসীম গগনে

ভারকার সাথে ছুটিতে।

বপুসুরীর জ্যোতী-মাধুরী নিঃশেষে আমি বহিরা,

জল'ত সুখা-বর্ণের আমি কীর-সমুদ্র মধিরা।

ছুটে বাই আমি উড়ার বত

উগা অশনী ধরিতে,

ছুটে বাই আমি মেঘের কোণেতে

বাহুল ধারার করিতে।

ছুটি দেশে দেশে উদাসীন বেশে পাণ্ডুল পবনে তাসিরা,

সবি চেনা ঠাই, এখরা যে তাই ডাকে মোরে ভালবাসিরা।

নন্দন বনে ছুটি উল্লাসে—

সৌরভ রাখে আবারি,

গোলোকবিহারী আমি শ্রীহরির

চরণানুত আহারি।

বহি আনন্দ সহি আনন্দ ছুটি আনন্দ চালিরা,

কংসের কারাগৃহ আলো করি মণির প্রদীপ আলিরা।

ছুটে বাই আমি সলাজ মেহুর

বৃথিকার বুকে সুঘাতে,

ছুটে বাই আমি বিলাতে আপনা

বৌবন-সুখ-চুম্বতে।

বন-মর্দরে নদী-নির্ঝরে মর্দরে গান ঢালি গো,

বিষে স্রবের মৌচাক রচি মনমুগ্ন করি থালি গো।

ছুটে বাই আমি চকল শিত—

গোপালের সাথে নাচিতে,

ছুটে বাই আমি জনকোণাহলে

সকলের সাথে বাঁচিতে।

রূপরস বেধা পড়িছে গলিয়া গোপনেন্তে সেধা বিহাতি,

দরদী বেধার অলে বেধনার সেধা দেহছারা বিধারি।

ছুটি অনন্ত বহন টুটি

উদ্যম স্রোতে মাতিয়া,

কোথা হৃদয় চির-মনোহর

অন্তর আছি পাতিয়া।

আপন ছন্দে ছুটি আনন্দে সত্যের করি আরতি,

হৃদয় আমি, উদ্যম আমি—মুক্তির আমি সারথি।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

কান্দীর-ভ্রমণ

(পূর্বানুস্মৃতি)

এই অন্তঃস্মরণ—প্রত্যহ সকল বেলা উঠিয়া অনেকটা না ইঁটলে কিছুতেই স্থায় উজ্জেক হয় না, তাই আশে গুপকরের দিকে গেলাম। এই কয়দিনে দৃষ্টাবলীর আরও পরিবর্তন হইয়াছে। প্রায় ১৫১২০ দিন প্রায় যৌত্র গুপকর পাহাড়ের বরফ অতর্হিত হইয়াছে—মহাদেবের তুং শৃঙ্গও প্রায় বরফশূন্য। শীত ক্রমেই বাড়িতেছে। প্রত্যহ বেলা ৯টা পর্যন্ত frost থাকে। সকলদেশেই সে হরিৎ সৌন্দর্য্য নাই, প্রায় সকলগুলিই পত্রশূন্য হইয়া যেন আগুনে পুড়িয়া কালো হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চেনারও তাহার পদাক অঙ্গসরণ করিতেছে। বাড়ি কিরিতে একটু হাওয়ার তেজ হইতেই অজস্র ধারার সঞ্চেদ ও চেনারের পাতা পুষ্প বৃষ্টির মত আমাকে ঢাকিয়া কেলিল। কান্দীরে এই পাতা পড়ার দৃষ্ট বড়ই মধুর। হৃদয় সরল রাস্তাগুলির হুই পাশে অগণিত বৃক্ষশ্রেণী, তাহার নীচে ফুলারবিন্দুখী বালিকারা ছুটাছুটি করিয়া পাতা ফুড়াইতেছে, আর উপর হইতে পুষ্পবৃষ্টির মত পাতার রাশি তাহাদের চোখে মুখে বর্ষিত হইতেছে। কবি না হইয়াও এ দৃষ্ট বেশ উপভোগ করা যায়।

৮ই অন্তঃস্মরণ—আজ তা পানান্তে সন্ধ্যার

পর Mr J & H এর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। জীনগরে রাজিতে ভ্রমণ বড়ই আনন্দদায়ক। রাস্তার জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। দারুণ শীতে হাটিতে কোন কষ্ট হয় না।

এখানে “শালী” অর্থাৎ শালের কি একটা control লইয়া বড় গোলযোগ চলিতেছে। চাউল যে শুধু হুন্দুলা তাহা নহে। একেবারে হুন্দুলা হইয়া উঠিয়াছে। গরীবেরা কেহ কেহ ২৩ মাস শুধু কটী খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। দেশের সংকে সমস্ত হরিজ অধিবাসীরাও তাত খাইতে না পাইয়া একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

৯ই অন্তঃস্মরণ—আজ একটু হাওয়া হওয়ার শীত আরও বেশী হইয়াছে। এইবারে এ স্থান ত্যাগ করাই কর্তব্য। একবার মার্তণ্ড (মার্টন) মন্দির দেখিবার উদ্দেশ্য করিতে হইতেছে। তার পর যদি পারি “পীর প’খাল” পর্বতরাজির নতুকে বানিহাল পাস (Bani-hal pass) দিয়া জম্মু বাইব এবং তথা হইতে দেশে ফিরিব।

১০ই অন্তঃস্মরণ—সকাল বেলা উঠিয়া দেখি যে বেহার frost হইয়া সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে

ছোট ছোট নথরকান্দি গাছগুলি শুকাইয়া বাইতেছে। রৌদ্রের তাপেই গাছ শুকাইয়া যায় জানা ছিল, নীতে ও হিসে যে গাছ শুকাইয়া মরিয়া বাইতে পারে তাহা এই খানেই দেখিলাম। বিগ্রহের আহারান্তে বসিয়া আছি এমন সময় ধবর আগিল Mr O সেল্ফন মিয়াছেন। তাঁহাদের কারখানার প্রস্তুত একখানা “কিলান” (কার্পেট) আমাকে দেখাইলেন। বাস্তবিক এই আসব-গুলি অতীব সুন্দর।

১১ই নভেম্বর—রাতে একটু দেবীতে শুইয়াছিলাম, স্নতরাং শেবরাতে বেশ একটু নিজার ঘোর হইয়াছিল। হঠাৎ নিজাতদে মেঘি বর বেজার কাপি-তেছে। ভূমিকম্প আশঙ্ক হইয়াছে। ঘরে ২নং ‘প’ বাবু ছিলেন, তিনি লাক্কাইয়া উঠিলেন। মনে হইল বর ডাঙ্গিয়া পড়িবে। তাবিলাম নীচে বাই, কিন্তু বর যেরূপ কানিতেছিল তাহাতে সে সাহসও হইল না। অপর্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়াই রহিলাম। আর দেড় মিনিট পরে কম্পন ধামিয়া গেল। কান্দীয়ে নাকি ভূকম্পন আরই হইয়া থাকে। বরগুলি আরই কাঠের, তাই এ ধাক্কা সহজেই সামলাইয়া লয়।

১২ই নভেম্বর—নীতের প্রেক্ষাপে বাধ্য হইয়া পটুর সূতের অর্ডার দিতে হইল। এখানে কারিকরণ হুন্দ শাল তাক্তা বরন কনাইয়া দিয়া এখন ‘পটু’ (Kashmir tweed) প্রস্তুত করিতেছে। এই কাপড় ক্রমেই সকলের, বিশেষতঃ সার্ভেবরের নিকট আদৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত লুই এখনকার এক প্রধান পণ্য।

আহারাদির পর Mr. Rএর সহিত এখানকার প্রসিদ্ধ রেশম কারখানা দেখিতে গেলাম। আমরা তাঁহারই বাসার থাকি। তিনি এই কারখানার একজন পঞ্চ কর্মচারী—আগান হইতে কাষ নিখিয়া আসিয়াছেন—অতি অমারিক ভ্রমলোক। বিত্তীয় কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিয়া বহু আমাকে প্রথম হইতে দেখাইতে সার্মগলেন। এখানে চারিবিধের কুবকদিগকে বীজ দেওয়া হয়, তাহার

সেগুলি হইতে কীট প্রস্তুত করে এবং কারখানা হইতে প্রস্তুত “মালবেরী” (ফুঁত) পাভা খাওয়াইয়া সেগুলিকে পুষ্ট করে। পরে তাহার বখন cocoon (গুটি) প্রস্তুত করে তখন সেগুলিকে রৌদ্রে শুকাইয়া ভিতরের কীটকে মারিয়া ফেলা হয় এবং সেইগুলি এই কারখানা কিনিয়া লয়। আর নিকটবর্তী গ্রামসমূহের কুবকধন কাঁচা গুটি আনিয়া দেয়। সেগুলি প্রথম একটা উত্তপ্ত গ্যাস দিয়া গরম ঘরের মধ্যে রাখিয়া ভিতরকার পোকগুলি মারিয়া ফেলা হয়। তাহার পর সমস্ত গুটি এক বিদ্যুত ঘরে লইয়া গিয়া অসংখ্য কুলী প্রথমে তাহার উপরকার পর্দা তুলিয়া কেলে। পরে শুণাঙ্গুসারে সেগুলিকে শ্রৌ বিতক্ত করা হয়। অপর একটা ঘরে বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন রংএর গুটি পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। এগুলি নমুনাস্বরূপ বিদেশে পাঠান হয়। এখানকার একটা কর্মচারী আমাকে কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের গুটি উপহার দিলেন।

তথা হইতে আমরা যে গৃহে সূতা বাহির হয় তথায় গেলাম। সারি সারি বহুসংখ্যক পায়ে দীর্ঘ দিয়া জল গরম রাখিয়া গুটিগুলি সিদ্ধ হইতেছে। সেখান হইতে পৃথক পায়ে সেগুলি ফেলিয়া দিয়া এক একটা লোক নিপুণ ভাবে নয়টি হইতে নয়টি সূতা বাহির করিয়া এক সঙ্গে একটা হুন্দ ছিঁড় মধ্যে দিতেছে। সেখান হইতে বিদ্যুতের বগে সেই সূতা লাটাইএ জড়ান হইতেছে। সে লাটাইটির সূতা পাড় হরিজাবর্ণ। আশ্চর্যের বিষয় যে এই অতি হুন্দ মাকড়সার জালের মত সূতা অত্যন্ত শক্ত। বাহারা এই নয়টি তার একজ করিতেছে তাহাদের কোশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। লাটাই হইতে সূতার গোছা খুলিয়া ওজন করিয়া পৃথক ভাবে রাখা হয়, তাহাই আবার প্যাক করিয়া বাধিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়।

এখানে সূতাই প্রস্তুত হয়, তাহা হইতে কোন কাপড় প্রস্তুত হয় না। তবে সম্প্রতি বরন শিল্পের ব্যবহারও চেষ্টা হইতেছে।

এই কারখানার আশ্রয় নিবাইবার ব্যবস্থা অতি



কান্দীর সাধারণ মুসলমান রানী

জন্ম। সমস্ত বৈজ্ঞানিক শক্তিতে সম্পন্ন হয়। প্রথমত একটা বাগানী ভূতলোক এই কারখানা পরিকল্পিত করেন এবং মুরশিদাবাদের আদর্শেই কার্যারম্ভ হয়। এখন অনেক উন্নতি সাধিত হইয়া ইহা পৃথিবীর মধ্যে রেশম প্রস্তুতের একটা প্রধান কারখানার পরিণত হইয়াছে।

অপরূহ খানিক টাকার ও খানিকটা হাটের বেড়াইয়া Mr J'র ঘরে গিয়া বসিলাম। বাতায়ন মুক্ত। একটা কাংড়ী লইয়া আমি বসিয়া অন্তমনে কি ভাবি-তেছি, হঠাৎ বন্ধু আমার একটা ক্ষুদ্র ঠেলা দিয়া বলিলেন, “বিবাদ মীমাংসা করুন।” তাঁহার নির্দেশমত চাহিয়া দেখিয়া আর চক্ষু ক্রিয়াহীতে পারিলাম না। এখানকার মুসলমানীরা বলে, তাহারাই বেনী জুজুরী; পণ্ডিতানীরা

বলে তাহারাই বেনী—এই বিবাদ। পার্শ্ববর্তী বাতায়নে একটা মুসলমানী তরুনী দাঁড়াইয়া আছেন—একটা সুগঠিত মর্ম্মরমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। কোথাও এতটুকু খুঁৎ নাই। তাহার উপর সেই চম্পক বর্ণ, আর কি বেন এক কমলীয়তা মুখের উপর ডালিয়া বেড়াইতেছে। কবির তাহার বলিতে হয় “চাহিলে করুণ ধরা চরণে বিকীতে চায়।” হাঁ, আজ কান্দীর-জুজুরীর প্রকৃত রূপ দেখিলাম। তন্ময় হইয়া আছি, এমন সময় বন্ধু বলিলেন, “উত্তি দেখিয়ে।” তাকাইয়া দেখি—আর এক তরুনী পণ্ডিতানী নিয়ে রাত্তার দাঁড়াইয়া কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। আমার আর “রায়” দেওয়া হইল না। এ বিবাদ মীমাংসা করিবার শক্তি আমার



কাম্বোজী পণ্ডিত পরিবার

(মহিলাদের ছবি সহজে পাওয়া যায় না)

নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, মুসলমানীরা স্বভাবতঃ যেন একটু তীক্ষ্ণ এবং পণ্ডিতানীপ যেন অপেক্ষাকৃত কোমল। তবে তাহার ব্যতিক্রমও যথেষ্ট দেখা যায়।

১২ হইতে ২০শে নভেম্বর। 'মার্টিন' বাওয়া আর হইয়া উঠিতেছে না। ঐ পরিবারের সহিত অত্যন্ত খাতির হইয়া গিয়াছে, প্রত্যহই তাঁহাদের হাউস বাটে হয় চারের পার্টি না হয় গল্প-গুজব আর তাঁহাদের মোটরে নগর ভ্রমণ চলিতেছে। একদিন বৃষ্টি হইয়াছিল, বেজার শীত আর সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিংকারে পাহাড়ে বরফপাত। পরদিন সৌভাগ্যক্রমে রোজ হওয়ার বরফ অদৃশ হইয়া গেল। আর একদিন প্রাত্যহিক ভাংগার সৌন্দর্য দেখিবার জন্য ঐ পরিবারের সহিত তাঁহাদের মোটরে পানলুরের দিকে গিয়াছিলাম। রাজির বাতাস তীক্ষ্ণ সূতিবেধের মত পশমী বাগান্ধাতা টুপী তৈর করিয়াও মাথার ও কাণে বিঁধিতে লাগিল। কিন্তু চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে স্পন্দ রাতের সৌন্দর্য দেখা গেল, তাহাতে বোধ হয় বাস্তব সূতিবেধও গ্রাস করিতাম না। পূর্ণিমার রাতে "তাজ-মহলের" সৌন্দর্য ও ইহার নিকট পরাভূত।

শীত ক্রমেই বাড়িতেছে। এখন দিনের বেলাতেও যদি সোজের তেল কমিয়া যায় তাহা হইলে স্নানেল ইত্যাদির ভিতর দিয়াও শীত বোধ হয়। রাজার লাদাকীরা নামদা ও অস্ত্রাশ শীত বস্ত্র বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে এবং ছেলে মেয়েগুলি যেন আরও অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিমধ্যে একদিন জটনক বজুর নিমন্ত্রণে এক নর্তকী ও গায়িকা "আ—" বিবির বাটাতে বজুর সহিত উপস্থিত হইলাম। কাম্বোজী সঙ্গীত ও নৃত্যের বিষয় জানিবার কৌতূহল এতই অধিক হইয়াছিল যে, নর্তকীর বাড়ী বাইবার একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাকেও দমন করিয়া ফেলিলাম। আমরা প্রায় অর্ধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর গায়িকা মহাশয়ার স্তম্ভাগমন হইল। তিনি মাথার সোপা ও জড়োয়া মুকুট পরিয়াছেন। মাথার সহিত বাঁধা অথচ কাণের পাশ দিয়া খুলাইয়া দেওয়া এক বোঁপা মাঝড়ী, গলার বেজার মোটা জড়োরা টিক, আরও নানারূপ অলঙ্কার ও অঙ্গুষ্ঠীর আছে। তাঁহার পিছান সূচর কাঁধ করা 'ফেনে'। বয়স বোধ হয় ২০ বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি সেখানে



শ্রীনগর বারী। উল্লো নির্মিত দাঁড়িপাশা

করিয়া উপবেশন করিলেন এবং তখনও উক্ত উপস্থিতি
হল নাই বলিয়া রহস্তালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। উদ্ভূত
অনেকটা আশঙ্কায় মত পণ্ডিতা, তবে কথা চালাইতে
পারেন। বহু তাঁহার নিকটে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন,
আমি একটু দূরে একখানা চেয়ারে বসিয়া গঙ্গা শুনিবার
প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

২৪টা কথাতাই বুলিলাম বিবি বেশ দুঃখিনী। অবশ্য
তিনি যে রূপবতী এ কথা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ বহু
আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আপনি ইহার হাত
খানা একটু দেখিয়া ভবিষ্যত বলিয়া দিন।” তাঁহার
কথা শেব হইতেই বিবি উঠিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে
হাতখানা প্রসারিত করিয়া দিলেন। আমি এক্স

ব্যাপারের ভিত্তি একেবারেই প্রকৃত ছিলাম না। বিশেষতঃ এই করকোত্তর ব্যাপারটা আমার নিকট বন্ধ বান্ধব অথবা অন্তর চরিত্রতার উপর একটি রহস্য করিবার ভিত্তি মাত্র ছিল এবং সেই ভাবেই তাহার ব্যবহার করিতাম। বাহ্যিক বখালাধ্য গভীরের সহিত আমি বিবির করত্যাগ বিচার করিয়া প্রথমে একটি অতীত ঘটনার উল্লেখ করিলাম। ব্রহ্মের মধ্যে সুবতীর হাতে অঙ্গুল মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রকৃততা দেখাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। কি বেন এক ঐক্সকালিকের বাহু মস্ত্র সমস্ত ছবিটা বদলিয়া গেল। সেই হস্তাঙ্গনা, প্রকৃততা সুবতী এখন রোরঙ-মানা বালিকা। ওস্তাদকী আলিরা সেলাম করিয়া বাজনা শুরু করিলেন, কিন্তু গান গাহিবার বা ওস্তাদের মত প্রকৃতি কাহারও আর রহিল না। আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া বিষয়টা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোন ফল হইল না। বিবি বলিলেন, “আপনাকে সহস্র সেলাম, আমি পথ দ্বিষ্টে পাইরাছি।”

আমি সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিরিয়া আসিতে এই বখাই মনে হইতেছিল যে, যদিও কালই এ রমণী মরতো এ কথা তুলিয়া বাইবে, তথাপি সে রমণী হৃদয় একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই।

২১শে নভেম্বর সকাল বেলা উঠিয়াই দেখি বেলায় শীত। এত সকালে অর্থাৎ ৭ ১০ মিনিটে কখনও উঠি নাই। এখনে ২০টর পূর্বে অল্প লোকেই বাহির হয়। Mr. Q এর সহিত কিছু কাব ছিল তাই চা পান করিয়া ৮টার সময় গুপকরের দিকে রওনা হইলাম। সমস্ত মঠ তুষার পাতে (frost) সাবা হইয়া গিয়াছে। গুপকরের নিম্নে ৮—৪৫ মিনিটেও ব্রাদি বর্ণনা বোধ লাগিল। কুজাটকাবৃত “ডাল” হৃদে কিছুই দেখা বাইতেছে না। Mr Q এর হাউন্স বোট উঠিতে দেখি প্রায় অর্ধ ইঞ্চি পুরু frost জমিয়া জাতি চিনির মত হইয়া রহিয়াছে। পুনরায় চা পানান্ত Mr. Q এর সহিত বাহিরে আসিয়া গুপকরের রাজা



শ্রীমতী মাকিয়ার। বসন্তের সময় ফল বিক্রয়



বিবাহ সন্ধ্যায় কান্দীরী বর

সাহেবের বাংলোর দিকে চলিলাম। পাশে একটা ক্ষুদ্র নালার অগের উপর কৈমন বেন একটা পর্দার মত দেখিয়া কৌতূহল বশতঃ হাতের ছড়ি তাহার উপর রাখিতেই দেখি তাহা কাঁচের মত কঠিন। বুঝিলাম যেখানে নালার তলে শ্রোত নাই সেখানে তাহার উপরের তর অমিরা প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু বরকের চাবনী হইয়া গিয়াছে। একটু ঘোরে বৌচা দিতেই তাহা তালিয়া ঠিক বেন একখানা মোটর গাড়ীর wind screen সরিয়া গেল। Mr J বলিলেন আর ১৫১৬ দিন মধ্যেই বরক পতন আদ্য হইবে।



জুন্নার ঘরে কান্দীরী মুসলমান উপাসক

আজ রাত্রে সাহেব বাইবার পর "বানিহা" পান। সময় আমাকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া শতবার বন্ধ হইবে। সুতরাং সে পথে যখন মস্তু বাওয়ার উপার বাইতে অহরোধ করিয়া গিয়াছেন।
মাই—তখন পলায়নই প্রাপ্ত।

২২শে—৩০শে অক্টোবর—আজ ১লা পাতা মাই। ঈদগর জনপুত। চারিদিকে যেন জিনেঘর। এ ক'দিনের জারেরী আগ বসিয়া লিখিতেছি। এক গভীর নিস্তরতা। এক এক দিন বেলায় গতকাল্য বন্ধুর Mr J আশু চলিয়া গিয়াছেন। বাইবার frost, আর প্রায়ই কুসালার সময় আবৃত। গভীর

আমি পরিষদে রাষ্ট্রে পথ চালাই কর। সাধারণ লোক মনেই 'কাংগী' লইয়া পথ চলিতেছে। 'মাটনে' বাওয়া হইয়া উঠিতেছে না।

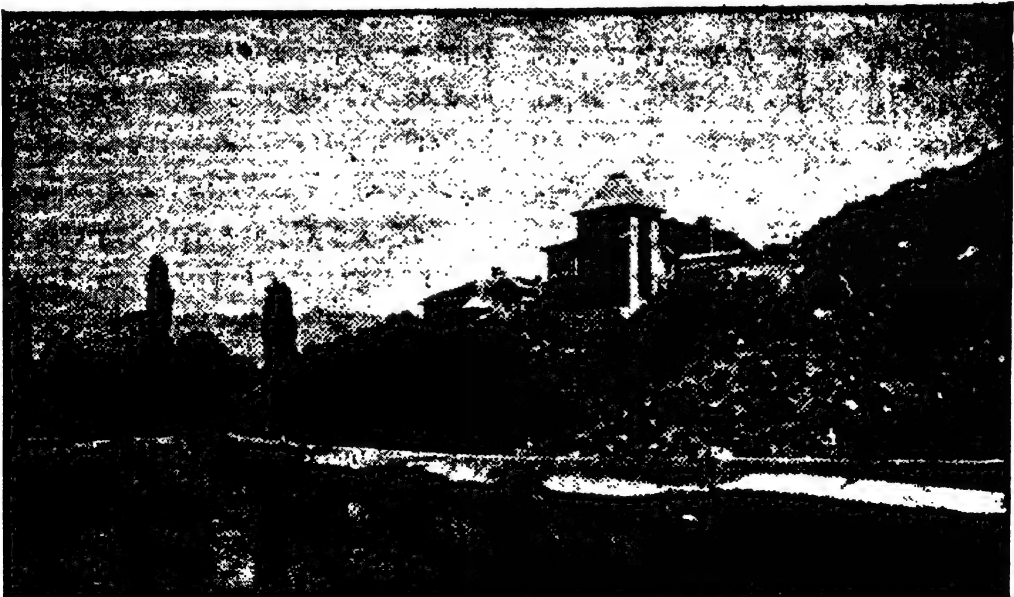
ইতিমধ্যে একদিন, পূর্বোক্ত Mr R এর সহিত বৈকাল বেলা তাঁহার আফিসে বেড়াইতে গেলাম। তিনি ইতিপূর্বে আমাকে বেশের 'কাংখানা' দেখাইয়াছিলেন, এইবার তাঁহার department অর্থাৎ বেখানে বীজ হইতে পোকের উৎপত্তি হইয়া সেগুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় বীজ উৎপন্ন হয় তাহাই দেখিতে লইয়া গেলেন।

একটা জীর্ণ বাটীতে প্রবেশ করিয়া আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম। বহু কি করিয়া বীজ হইতে পোকা বাহির হয় এবং তাহারা প্রজাপতিতে পরিণত হইয়া পুনরায় ডিম পাড়ে, এবং কি করিয়া সেই ডিমগুলি পরীক্ষা করিয়া কৃষকদিগকে বিতরণ করা হয় ইত্যাদি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

যের আশ্রয় ছিল না। শীতে হাত পা জমিয়া

বাইতেছিল। তখন তিনি তাঁহার এক পণ্ডিত কর্ম-চারীকে চায়ের ছকুম দিলেন। পণ্ডিত আমাকে বিজ্ঞাপন করিল যে আমি "নামকী" অথবা "মিঠি" কি প্রকার চা পান করিব। কাশ্মীরীরা Green tea হইতে লবণ সংযোগে যে চা প্রস্তুত করে তাহা "নামকী" ও চিনি দিয়া বাহা প্রস্তুত করে তাহাই "মিঠি"। আমি বলিলাম "নামকী"—কাশ্মীরীরা "নামকীই" পদম্ব করে। প্রায় আধঘণ্টা পরে পরিচারক ধাতু পটলে চ আসিল। একখানা পরিচারক কনাল দিয়া তাহা ধরিয়া আমরা পান করিতে লাগিলাম। গ্রাম এত গরম যে শুধু হাতে তাহা ধরা যায় না।

সকল কাশ্মীরী "কুলচা" সেও কতক 'নামকী' কতক 'মিঠি'। একটা স্ত্রীরাহ 'চা' আর জীবনে পান করি নাই। ম'লাই, চিনি ও লবণ সংযোগে এই চা প্রস্তুত, তাহার মধ্যে এলাচি প্রভৃতি মশলা। 'কুলচা' শুদিও উৎকৃষ্ট। ধর্মবাদ দিয়া বিদ্যার হইলাম। গতকল্য (৩০শে নভেম্বর) বহু Mr H আমাকে পান শুনিবার



নিময়ণ করিয়া গেলেন। সে দিন গান শুনিতে পাই নাই—সুতরাং উৎসাহের সহিত যুক্ত হইলাম। এবার গান শুনার বটতে।

রাতি ৮টার সময় আমি গানের আসরে উপস্থিত হইতেই বন্ধু উঠিয়া আনিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া বসাইলেন। আসর বেশ সরগরম। আমি বসিতেই গান বন্ধ হইয়া গেল। তাকাইয়া দেখি গায়িকা বিকট্রুখে মাটির দিকে চাহিয়া আছেন—ইনি সেই পুরোক্ত বিবি! হঠাৎ এইরূপ রসতল হওয়ার একটু লজ্জিত হইলাম। বন্ধু বলিলেন আমি ফরমাইস করিলে সেইরূপ গান হইবে। তখন আমি বিবিকে গান করিতে অগ্রগোধ করিলাম। তিনি কি গান গাহিবেন জানিতে চাহিলেন। উর্দু গান চলিতেছিল কারণ শ্রোতা অধিকাংশই পাঞ্জাবী। আমার পক্ষে সবই সমান। আমি কান্দ্রী গান শুনিতে চাহিলাম। গায়িকা তখন মূলনিত করণকণ্ঠে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিক সেই অশ্রুতপূর্ব কান্দ্রী সঙ্গীত সেই সুবতীর করণ বর্ধ বড়ই মধুর শুনিয়াছিলাম। তাহারপর অনেক উর্দু গান হইল কিন্তু অমন মিষ্ট আর একটাও লাগিল না। সকলে চলিয়া গেলে আমি ও বন্ধু বসিয়া রহিলাম। গায়িকা আনিয়া আমাকে সেলাম করিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার কান্দ্রী গানটী নোট করিয়া লইলাম এবং তাহার একটি সংক্ষিপ্ত টীকাও লিখিয়া লইলাম। কতক তিনি বুঝাইতে পারিলেন না, কতক নিজে বুঝিলাম না তবুও লিখিয়া লইলাম। একটু নমুনা দিতেছি:—

বেদন্বদী দাদি চাইনি

নিরুহো সকে দান

শৈলাই মঠিহো মাইনে

ইয়ারো লো—লো—লো—

এই “ইয়ারো—লো—লো—লো” সমস্ত কান্দ্রী সঙ্গীতের একটা বিশেষত্ব। টীকাটা হারাইয়া কেলিয়াছি।

এইরূপ ৪টা গদ্যে সঙ্গীত সমাপ্ত—এই ‘গরলা’ ও মলম’র প্রেম বাটত।

ইতোমধ্যে বন্ধুর এক ভৃত্য কয়েক পেয়লা চা লইয়া আসিলেন। বিবি বলিলেন যে তিনি ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া কেবল খোদার নাম করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। আমরা অবাক হইয়া শুনিতেছি, এমন সময় সেই মুসলমানী এক পাঞ্জ চা আনার হাতে উঠাইয়া দিলেন এবং পরক্ষণেই আর এক পাঞ্জ বন্ধুর হাতে দিলেন। আমরা উভয়ে উভয়ের মুখে দিকে চাহিলাম, কিন্তু চাএর পাঞ্জ নামাইয়া রাখিতে পারিলাম না। কান্দ্রীরে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী যে এদেশের মত এতটা ভাতিতেদের ভাব দেখানে নাই। চা পানের পর সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসার ফিরিলাম।

১৯শা হইতে ৩ই ডিসেম্বর—স্বর্গদেবকে আর বড় একটা দেখা যায় না। শীতও বেলায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে টিপ্-টিপ করিয়া বৃষ্টি হয়। তাঁতার লোক চলাচল খুবই কমিয়া গিয়াছে। রেলয়ের বন্ধ প্রণালী। একটা কুঠাংগা চারিদিকের পাহাড় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সাধারণের হাতে কান্দ্রী আর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের ঘরে দিন রাত বুঝারি অথবা electric heater জলিতেছে। জলে হাত দেওয়া একরূপ অসম্ভব। এই তাৎবেই নাকি এখন চলিবে এবং এরূপ চলিলে শীতই বরফ পড়া আরম্ভ হইবে।

৪ঠা ডিসেম্বর ৪টার সময় আমি Mr. H এর সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদেরকে সেলাম করিল। সে পুরোক্ত মর্দকীর ভৃত্য, সে বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “বন্ধুর আপনার বাগা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিবি সাহেবের কি এক বেমার হইয়াছে যে তিনি-আর মজুরা করিতে যান না, মর্দবাই ঘরের ভিতর বসিয়া থাকেন।” বন্ধু আমাকে বলিলেন “চলুন দেখিয়া আসা বাক ত—তাহারকি বাত বোধ হইতেছে।” আমি বাইতে যীকৃত হইলাম না। বন্ধু তখন ভৃত্যের সহিত চলিয়া গেলেন এবং পরদিন

আসিয়াই বলিগেন—লোকটা বাহা বলিগাছে তাহা সত্য।

৬ই ডিসেম্বৰ—সকাল বেলা খুব তাড়িয়া গেল কিন্তু উঠিতে ইচ্ছা হইল না। কখন হুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিল। ২নং 'প' বাবু উঠিয়া ঘরের বাহির হইলেন এবং পরক্ষণেই 'দেখ দেখ' বলিয়া চীৎকার করিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি ডাড়াডাড়া উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখি সমস্ত সাদা। বিকাল বেলা বর্ষাতি চাণাইয়া যখন বাসায় কিরি তখনই কথা হইতেছিল যে হয়তো আজ রাত্রে বরফ পড়িবে। কলকাতা তাহাই হইয়াছে। শেষ রাত্রে বরফ পড়িয়া সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বরফ কোথাও অল্প ইকি কোথাও বা এক ইকি মাত্র। চারিদিক কুজ্জটিকাছর; কদাচিৎ পাখাড় দেখা যাইতেছে তাহাও সাদা। আমরা নামিয়া আসিয়া সেই বরফের উপর দিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, পায়ে নীচে "মচ্, মচ্" শব্দ হইতে লাগিল, আর পায়ে দাগ বসিয়া গর্ত হইয়া বাইতে লাগিল। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নাই কদাচিৎ ২১টা কাক বা শালিক বরফের উপর দিয়া বেড়াইয়া ঠোকাইয়া খাওয়ায় সংগ্রহের চেষ্টার আছে। একটা কুকুর বিষয় তাবে বরফের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে বেখানে একটু বেশী বরফ পাত হইয়াছে সেইখানে শুইয়া পড়িল। এটা বিবাদ কি আনন্দের চিহ্ন বুঝা কঠিন। হঠাৎ সে উঠিয়া গা বাকি দিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। বোধ হয় তাহার বরফ পাতের সহিত পূর্বে পরিচয় ছিলনা—এবং এই প্রথম পরিচয়টা বড় সুবিধাজনক মনে হয় নাই।

শীত অবস্থা খুবই হইয়াছে, তবে অসহ্য নয়। বরফ পড়িবার পূর্বে গঠকল্যা শীত ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল। তবে এখনও লিখিতেছি আর হাত যেন অবশ হইয়া উঠিতেছে। বেলা ১১টার খুঁচা দেখা গেল। বারান্দার আঁঠিয়া দেখি হুহু করিয়া জল পড়িতেছে, অথচ বৃষ্টির লেশ মাত্র নাই। বতকণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল ততকণ হুহু কোঁটাও জল

ছিল না। রৌদ্রে বরফ গলিয়া এ ব্যাপার হইতেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বরফ অদৃশ্য হইয়া গেল এবং সত্যি ভিত্তিয়া জল চলিতে লাগিল। ক্রীমগরের রাস্তার একবার কাণা হইলে আর সহজে শুকাই না। একে তো রৌদ্রের তেজ নাই, তার উপর সংকীর্ণ রাস্তার উত্তর পাশে উঁচু বাড়ী। রাত্রে বাসায় কিরিবার সময় আবার টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হুহু হইয়া গেল।

৭ই—১০ই ডিসেম্বৰ—এ কয়দিন বেশ রৌদ্র হইয়াছে। কান্দীর শাল, তাকতা, তোবা, গট্টু, প্রভৃতির বরন সবকিছু একটু অসহ্য করিয়াছি। তিব্বত অঞ্চলে 'তোব' নামক এক কুজ আনোয়ার আছে তাহাদের পশমে প্রস্তুত হুতার যে হুদ্র আলোয়ান প্রস্তুত হয় তাহারই নাম 'তোবা' বা 'সাতোবা'।

ইয়ারকন্ড নামক প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত পশম আসে তাহার মধ্য হইতে বাছাই করিয়া পশম হইয়া যেদেরা অতি প্রত্যবে নির্ভনে চরকা দিয়া যে হুতা প্রস্তুত করে তাহা হইতে 'তাকতা' প্রস্তুত হয়। এই তাকতার উপর হুচী কার্য করিয়া 'শাল' ও আনিয়ার প্রস্তুত হয়। শাল ও আনিয়ার উপর কান্দীরীয়া যে অদ্ভুত হুদ্র হুচী কার্য করে তাহা দেখিয়া বিশ্বাসে অবাক হইতে হয়।

শাল ব্যতীত কমাগ, বিজানার চাদর, নামদার শাড়ী প্রভৃতি বহু জিনিষের উপরই ইহারা রেশম বা পশম দিয়া অদ্ভুত হুচী কার্য করিয়া থাকে। কলকাতা হুদ্র শিল্পে কান্দীরীদের তুলনা হয় না। অথচ এই হুতগাণ্য জাতির নৈতিক ও শারীরিক শক্তির সম্পূর্ণ অভাব। ইহারা পরাধীন থাকতে থাকিতে আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছে। 'মহিষ' ও গুত্তর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে মহিষের লজ্জা আছে গুত্তরের তাহা নাই। এই বিচারে দিয়া দেখিতে হইলে কান্দীরী বিশেষতঃ কান্দীরী মুসলমানদের শতকরা ৯০৯৫ জন মহুদ্র-পদবাচ্য হইতে পারে না। এমন নির্লজ্জ জাতি কানি আর সমস্ত ভারত-বর্ষে কোথাও দেখি নাই। গালি দেও, মার, অপমান কর কিছুতেই

গ্রাহ্য নাই। অবশ্য আমার এই মতবা শ্রীনগরের পক্ষেই প্রযোজ্য—যেহেতু আমি এ পর্যন্ত ঘরের প্রাঙ্গণে তাল ফরিয়া লোক চরিত্র দেখিবার সুবিধা পাই নাই। সহরের লোক দেখিয়া বিশেষতঃ যে সহরে পৃথিবীর সর্বত্র হইতে লোক আনোনের ভিত্তি আসিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া একটা পুরাতন জাতি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় আমি; কিন্তু যতটা দেখিয়াছি তাহাতে আমার এ ধারণা বাইবার নহে।

বাহা হউক কান্দীরের পশমীনার শিল্প বহু পুরাতন কিন্তু স্থল শিল্প এখন আর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে প্রধান ব্যবসা লুই এবং পটু। শাল, তাকতা প্রভৃতি করিয়া যে পশম অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে আলোরান; এইরূপে ক্রমে লুই এবং সর্বশেষে পটু প্রস্তুত হয়। তাই পটু এত সস্তা। এই পটুর প্রচলন ক্রমেই বাড়িয়া বাইতেছে।

লাম্বাক (কুয় ভিবত) ও ইয়ারকন হইতে এখানে নাম্বা আমদানী হয়। কান্দীরীরা তাহার উপর পশম দিয়া নানারূপ কারুকার্য করে। এতদ্ভ্যতীত আঙ্গ-কাল এখানে অতি উৎকৃষ্ট কার্পেট প্রস্তুত হইতেছে। আর অনন্ত লালের “গাংবা” নামক একরূপ নানারূপের পশমের কারুকার্য-খচিত চাদর অতিশয় প্রসিদ্ধ।

পশমীনার শিল্প ব্যতীত কাঠের উপর খোদাই (wood carving) এখানকার প্রসিদ্ধ। Papier machie অর্থাৎ কাগজের Pulp দিয়া প্রস্তুত জব্যের উপরের কারুকার্য ও গোণা রূপার ভিনিষের উপর অতি স্থল কারুকার্য এখানে অতি চমৎকার। এই সমস্ত জব্য প্রতি বৎসর রাশি রাশি বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি দূর দেশে গিয়া থাকে।

১১ই—১৩ই ডিসেম্বর—আমি ১০ই তারিখে সমস্ত দিন খুঁজি দেখা বার নাই। দারুণ কুষ্টিকাতে চারিদিক আচ্ছন্ন। গতকলা হইতে শরীরটা ভাল বাইতেছে না সুতরাং আজ আর বাহির হইলাম ন। শীত ক্রমেই অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। এক খানা চোরারের উপর বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলাম। গায়ে পশমীনার মোটা ও পট্টা বাধা ছিল। খানিক লিখিয়া পাঠা অংগা করিতে লাগিল। উত্তীয়ার সময় দেখি পা অসাধ্য হইয়া গিয়াছে। কাংরীতে সৌঁকরা তরে রক্ষা। বেলা বতাই বাইতে লাগিল শীতও ততই বাড়িতে লাগিল। অপরদ্ধে টিপ্-টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পতন আরম্ভ হইল। সকলেই বলিতে লাগিলেন শেব রাতে তুষার-পাত হইবে। কাল রাতে বাসার আহারাদির একটু বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। কান্দীরী পোলাও ও ২৩ রকমের কান্দীরী মংস রান্না হইয়াছিল। এক প্রকারের নংম—লকেঙ্গুস—এক প্রকার রোট, খাইতে বেশ। আজ আর আহারের আকাঙ্ক্ষা ছিল না তাই “কান্দীরকা কংম শাক আর নসৌকা তাতা” বান্ধ দিলাম। কয়েক খানা গরম লুচিতে কৰ্ম্ম শেষ করা গেল।

সন্ধ্যার পর শীতের একোপে বাধ্য হইয়া বুখারী জালিতে হইল। এখানে সমস্ত ঘরেই চিম্নী আছে। বিলাতের fire placeএর স্থল কি তাহা আজ বেশ বুঝিতে পারিলাম। আগুনের নিকট সকলে বসিয়া গল্প করার আরামটা অমূল্য না করিলে বুঝান বার না। কাঠগুলিও দশালের মত—ধোঁয়া হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

ବଞ୍ଚନାବ୍ରୀ

ବିଷୟା ତୋର ବୁକେ ସେ ବାଜୁଛି ଯାଗୋ ଦିବସ ବାଣୀ,
କେମନ କରେ ବୁଝିବେ ତାର, କେମନ କରେ ବଳବ ଆସି ?
ଦୀର୍ଘ ବୁକେର ତପ୍ତଧାସ, ଆର ଶିଉଣୀ-ବରା ଅଞ୍ଜନାସି,
ତାହାରେ ତଳେ ଓଠିରେ ତେଜେ, ତୋହର ବୁଦ୍ଧେର ସମ୍ପର୍କ-ହାସି !
କି ବାଧା ଓହି ହାସିର ଆଡ଼େ ଡାକିରେ ଓଠା କୁହୁର ସବ,
ଆସାର ରାତେ ବାଜୁର ଆଗୋ ବିବିରେ ତୋଳେ ମରାମ ମମ ।
ଆମନ ଶିଖା ଆଗିରେ ତୁଳି' ମୋମନ ସମ୍ପର୍କ ନିଃସ କରି
ନିବିଡ଼ କାଳୋ ଆସାର ନାଶି ଆଗୋର ସାଧ ବିଷ-ତରି —
ସୁତ ଶ୍ରାବେର ମନ୍ତ୍ରୀବନୀ, ତପ୍ତ ହିରାସ ଶାନ୍ତିବାରୀ ;
ସଞ୍ଜା, ହୁସାଦାବ୍ରୀ ଖମ୍ବୋ, ଜାଗ୍ ମା ଆଜି ବଞ୍ଚନାବ୍ରୀ !

ଆଜୁଳ କରା ସେହର ମରମ ହାଡ଼ିରେ ଗେହେ ନକଲ ଦେହେ,
ଅସର, ମନ୍ତ୍ରୀବ ଶ୍ରୋତେର ବିତାନ ଓଠିରେ ସେତେ ସୁହେର ଗେହେ,
ମରମ ହେଲେ କିଭେର ବଳେ ଆମନ କର ଆମନହାରୀ,
ବିକିରେ ଦିତେ, ବୁକେର ହାକେ ଲୁକିରେ ସାଧ ସାତୁଧାରୀ ;
ମା, ମା ବଳେ ଡାକଲେ ମରମ କେନ ଅସରଗେର ଚେତନ-ବାସେ
ଆଗିରେ ତୋଳେ, ସାଧ୍ୟ କି ତୋର ବଳେ ଧାକିରୁ ଅମନ-ହାସେ ?
ମାଗର ମମ ଅତଳ ହିରା ଓଠିରେ ଓଠି ଓଠାଲି ହରେ,
ସାଧୁତେ ତୁମି ବିଷ-ଭୁବନ ବାଡ଼ିରେ ହାଟି ହତ ଦିରେ ।
ବିଷୟାତା ଶକ୍ତିବରୀ ତୁହି ସେ ମା ମୋ ହୁଡ଼ି ତାରି,
ସଞ୍ଜା, ହୁସାସମନ୍ତ୍ରୀବନୀ ଜାଗ୍ ମା ଆଜି ବଞ୍ଚନାବ୍ରୀ ।

ସମ୍ପର୍କ-ସକର ମାହାମାନ ଡାକାତୁରର ହରତେ ଆଳା,
ଆମନା ଶୁଦ୍ଧ ବିକିରେ ଦିରେ ଅନ୍ଧ ଜଗତ କରୁ ଆଳା ।
ତୁମ୍ଭି ତୋହାର ଶିଖିରେ ଦିହ ସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମଳ ମନ୍ତ୍ରୀମରେ
ହୁର ହାସି ହାଡ଼ିରେ ଗେହେ ବରବ ବିଷୟ କାନ୍ତି ତରେ ;
କର୍ତ୍ତେ ତୋହାର ବିଷୟାଣୀ, ନିବିଳ ଭୁବନ-ସନ୍ନିଗଲେ
ଶାନ୍ତି ହରେ ନାମ୍ୟ ନୀ ତ, ସାତୁଧାରୀ ଉଦୋଧନେ,
ତକି ତୋରେ ଆହେନ ବାଧା ମନ୍ତ୍ରୀକାରୀର ବିଷୟାଣି
ହାଡ଼ିରେ ଗେହେ କର୍ମ ହାକେ ଶକ୍ତି ତୋହାର ଆବ୍ରୀତୀ !
ଆନୀବ ତୋହାର ଶିରୀର ଶିରୀର, ଚରମ-ବେଶ୍ ବିଷୟାଣୀ,
ସଞ୍ଜା, ହୁସାସମନ୍ତ୍ରୀବନୀ ଜାଗ୍ ମା ଆଜି ବଞ୍ଚନାବ୍ରୀ !

ସତ୍ତ ଓଠାଲି ସମ୍ପର୍କ-ସାମର ତରୁ ତୋହାର ଚରମ-ତଳେ,
ଶିଖିର ମି'ନ୍ତୁର ଓଠିରେ ତାତି' ବିଷ-କୋଡ଼ା କୁହାଲେ !
ଧୁମ୍ବର ମମ ନିଃସ ହରେ ବିଗାଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମି,
ତାତେହି ଆଗୋ ସମ୍ପର୍କ-ଧାସ ଏ ଅସର-କଥାର-ମୁଖାତୁମି !
ହୁସେ ହୁସେ ମତିର ମାଗି' ଅମନ କରେ ଆମନ-ତୋଳା,
ଐତରୁଣେ ବରତେ ମାରେ — ହୁସେ ମୋହଲ ସମ୍ପର୍କ-ହୋଳା !
ରୋଗେ, ମୋକେ ମାହନା ଦାନ, ତାମେ ଶ୍ରାମେ ଅତର ବାଣି,
ଆମନ ତୋଳା, ଜୀବନ ତରି' ମରମ ମାଗି-ହୁଲେର ସାଣି !
ମି'ନ୍ତୁର ହାକେ, ନୋରା ହାତେ ତୋହାର ସେନ ଦେଖତେ ମାରି
ସଞ୍ଜା ହୁସାସମନ୍ତ୍ରୀବନୀ — ନାଡ଼ାଓ ଆଜି ବଞ୍ଚନାବ୍ରୀ !

ନାଡ଼ାଓ ଆଜି ବଞ୍ଚନାବ୍ରୀ, ନାଡ଼ାଓ ଆଜି ସୁଧୀ ତୁଳେ,
ବିଷୟାତା ଡାକୁଛି ତୋହାର ଦିଗନ — ସହା ମାରର କୁଳେ !
ସାତୁଧାରୀ ସୁକ୍ତି ଆଗୋ ମାଗୁକ ମରମ ବଳେ, ବଳେ
ତନ୍ତ୍ରୀକ୍ରମେ ଶକ୍ତିବରୀ — ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୋତେର ଉଦୋଧନେ ।
କର୍ତ୍ତେ ବରବ ଅସର ମିତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧାଓ ଜୀବନ-ରୋଗେ,
ମନ୍ତ୍ରୀ, ତରେର କୋଧାର ମରମ ଅସର ସମ୍ପର୍କ-ଚମଳ ହୋଳେ ।
ହୁସେନି ନାଡ଼ାଓ ଆଜି, ଆସାର ବରେ ଆଲୋକ ଆଗୋ,
ନୀଳ ଆକାଶେର କାମାର କାମାର ହାଡ଼ିରେ ଦିତେ ତୋହାର ଆଗୋ !
ଅମ୍ବର ତୋହାର, ଯାଗୋ ଆସାର ! ମନ୍ତ୍ରୀବରୀ ଶାନ୍ତିବାରୀ,
ସତ୍ତ ଓଠାଲି ମିତ୍ର ମମ ଜାଗ୍ ମା ଆଜି ବଞ୍ଚନାବ୍ରୀ !

৩/আন্তোব মুখোপাধ্যায় *

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন যে রঘুবংশীরদের গুণের কথা প্রবণাত্তর চপলতা প্রণোদিত হইয়া তিনি রঘুবংশ লিখিতে আকৃত্ত করিয়াছিলেন। ঠিক সেইরূপ আমিও বলিতে পারি যে দেশ-বিদেশবিশ্রুত যে মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শনার্থ ও তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রচলিত প্রদানার্থ আমরা সকলে অন্য এই স্থানে সমবেত,—বাতুলতা প্রণোদিত হইয়াই তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। বাস্তবিক, আন্তোব মুখোপাধ্যায়ের সহিত তুলনাতে আমরা এতই ক্ষুদ্র যে তাঁহার চরিত্রের ও কার্যের বর্ষা সমালোচনা আমাদের মধ্যে কেহ করিতে পারেন কি না, তাহাকে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কুশাগ্রবৃদ্ধি আন্তোব যে সমস্ত কার্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে যে কি উদ্ভেদ নিহিত ছিল, তাহা সম্যক-রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে, আমাদেরও সেইরূপ বা অন্ততঃ প্রায় তুল্যরূপ ধীশক্তি থাকা প্রয়োজন; কিন্তু এই কথা বলিলে অতুক্তি হইবে না যে তাঁহার মনীষার সহিত তুলনাতে আমাদের মস্তিষ্ক এতই চূর্ণল যে আমাদের পক্ষে সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাঁহার মনোগত ভাবের সহিত স্পর্শিত হইবার আকাঙ্ক্ষা বারনের চন্দ্র-স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষার মত ছুরিকাঙ্গানাদ।

আন্তোবের শব্দে যে দিন পাটনা হইতে হাওড়া ঠেশনে আনীত ও কালীঘাটের স্থানে তৎক্ষণে পরিণত হইয়াছিল, সেদিন প্রত্যেক বাঙ্গালীর নেত্রে ও বদনে যে এক বিবাদ-কালিদাস দ্বারা পড়িয়াছিল, সেইরূপ বিবাদ-কালিদাস দ্বারা বহুদিন বাঙ্গালীর নেত্রে ও বদনে দেখা যায় নাই। দেশ হইতে মাঝে মাঝে খ্যাতনামা ব্যক্তির ভিরোভাব ঘটতেছে, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যালাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর আর কাঁহারও মৃত্যুতে বোধ হয় প্রত্যেক বাঙ্গালী এমন করিয়া বৃত্তিতে পড়েন নাই যে আল

তাহারই একজন নিতান্ত অন্তঃকর বন্ধু পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। এইরূপ অবস্থার কারণ কি তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আন্তোব খাঁচী বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কোন্ কোন্ স্থান ব্যাধিগ্রস্ত তাহা তিনি যেমন করিয়া বুঝিয়াছিলেন, তেমন করিয়া বোধ হয় আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই। রোগের স্থান নির্ণয় করিয়াই তিনি নিবৃত্ত হন নাই, রোগের স্বরূপ ও নিদানের অন্বেষণও তিনি করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে সেই রোগের প্রতিকার হইবে তাহাও তিনি যেমন করিয়া বুঝিয়াছিলেন তৎপূর্ব্ববর্তী আর কেহই তেমন করিয়া বুঝিতে পারেন নাই বা বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। কি ঔষধে রোগের উপশম হইবে কেবল তাহাই নির্ধারণ করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই; তিনি নিজের নানান স্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। এমন সময়ে কালের কঠোর হস্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিল, আরও কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তাঁহাকে চিরদিনের জন্য সমগ্র দেশ ও জাতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

আন্তোবের মৃত্যুর পর সাময়িক পঞ্জাবিতে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি একজী-ভূত হইয়া পুস্তকাকারে তাঁহার প্রাক্কালে বিতরিত হইয়াছিল। এই সমস্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে বাঙ্গালী প্রদেশে ও বাঙ্গালী প্রদেশের বাহিরে যুরোপীয় ও ভারত-বাসী-সম্পাদিত পুস্ত্রে একবাক্যে স্বীকার করা হইয়াছে যে আন্তোবের মত কর্মী পুরুষ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই এবং পৃথিবীতেও যে বেশী আছে তাহাও মনে হয় না। নারক পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছেন যে “বাঙ্গালীর মনীষার ইতিহাসে, বাঙ্গালীর প্রতিভার ইতিহাসে, বাঙ্গালীর

কৰ্মশক্তি ইতিহাসে, বাঙ্গালীর গৌরবের ও স্পর্ধার ইতিহাসে তিনি অবিনশ্বর অমর হইয়া রহিবেন।” বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় শুভে উল্লিখিত হইরাছে যে “আশুতোষের সবটাই বিরাট ছিল, তাঁহার বপু বিরাট, তাঁহার জ্বর বিরাট, তাঁহার বিভাবুদ্ধি বিরাট, তাঁহার পরিকল্পনা বিরাট, তাঁহার কৰ্মশক্তি বিরাট, তাঁহার অধ্যবসায় বিরাট।” যদি বলা যায় যে, ইংরেজ শাসনের প্রথম অবস্থাতে রাজা রামমোহন রায় জাতীয়তার সম্যক উপলব্ধিকরে যে বঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিলেন বর্তমান সময়ে আশুতোষ সেই বক্তার সর্বপ্রধান প্রতীক ছিলেন, তাহাতে বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবেন না। বহুমতীর সম্পাদক মহাশয়ের ভাষাতে বলিতে গেলে “মধ্যাহ্ন মার্ভণ্ডসম প্রদীপ্ত প্রতিভার অধিকারী” আশুতোষ তাঁহার সুখ্য পর্য্যন্ত যত কাল করিয়া গিয়াছেন, সমস্ত কার্যেই সুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তার উদ্বোধন, এবং সেই হেতু নায়ক-সম্পাদক লিখিয়াছেন যে “আশুতোষের তুলনা আশুতোষ। বাঙ্গালীর তাঁহার তুলনা নাই—প্রতিদম্বী নাই—ভারতেও নাই। তিনি বাঙ্গালীর, ভারতের গৌরবজন্ত ছিলেন। সমগ্র ভারতে এই একটা মানুষ ছিলেন বাঁহাকে দেখাইয়া ভারতবাসী শ্রাব্য ও স্পর্ধার সহিত বলিত, দেখ দেখ এই আমাদের ভারতীয় মানবতার শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ—ইহার তিতর বাহির নব ভারতের নব আদর্শে অল্পপ্রাণিত—স্বাভিপ্রের পূর্ণতার টলমল, মুক্তি-কোষ্ঠ-চাদরে-পরিবৃত—জাতীয়তার গৌরবে নিত্য উন্নতশির—এই বিরাট পুরুষকে একবার প্রাণ তরিতা দেখ।”

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুন মাণিকালী লেনে আশুতোষের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গঙ্গাগঙ্গা মুখোপাধ্যায় একজন তৎকালীন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। পিতা ও মাতার তত্ত্বাবধানে তাঁহার শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাতে বিশেষ সম্মানের সহিত কৃতকার্য্য হইয়া তিনি নিজের কৰ্মজীবন আরম্ভ করেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে যোগদান করেন। ১৯০৪

খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন-চালেনার নিযুক্ত হন। কলিকাতা হাইকোর্ট এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই দুই স্থানই বিশেষরূপে তাঁহার কৰ্মক্ষেত্র ছিল। এই হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তিরেকে বেশস্থ আরও অনেক অস্থানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কিন্তু জাতীয়তার যে উচ্চ আদর্শ লইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেছিলেন, অত্যন্ত অস্থানেও তিনি প্রত্যেকে বা পরোক্ষে সেই এক উদ্দেশ্য সাধনেই নিযুক্ত ছিলেন। তপস্বী বেক্সণ আহারনিজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্বক শীতগ্রীষ্মের প্রতি ক্রক্ষেপ না করিয়া সমস্ত সময়েই এবং সমস্ত অবস্থাতেই তাঁহার নিজের আরাধ্য দেবতার দর্শন লাভের জন্ত একাগ্রচিত্তে থাকিয়া নিযুক্ত থাকেন, সেইরূপ আশুতোষও সেই দিন দর্শনের চেষ্টাতে দিবানিশি ব্যাপৃত ছিলেন, যেদিন জগতের বিশ্বমণ্ডলীর সভাতে ভারতবাসী গৌরবের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবাসী আবার স্বীয় মূল মর্যাদার স্থান ফিরা পাইবে, শিক্ষিত জগতের সম্মুখে ভারতবাসী আবার উজ্জ্বলিত হইতে সক্ষম হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যে সমস্ত গুণ থাকিলে মানুষ হইতে পারা যায়, ভারতীয় যুবকের মধ্যে সে সমস্ত গুণের অভাব নাই, কিন্তু যথোপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনার অভাবে সেই সমস্ত গুণ পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না। সেই হেতু যখন জাঙ্গালীর ভূতপূর্ব যুবরাজকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি দেওয়া হয় সেই উপাধিপত্র বিতরণ প্রসঙ্গে আশুতোষ বলিয়াছিলেন যে:—

“It is their (the Indian people's) ambition not only to advance on material prosperity, but also to qualify themselves to take an important part, not all unworthy of their ancient traditions, in that great intellectual and spiritual competition through which mankind may hope gradually to accomplish its high ideal purposes, a competition in which all people of earth may peacefully join, rivals and brothers at the same time.”

হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রধান কৰ্মক্ষেত্র

হইলেও, ইহা সর্বসাধারণের যে হাইকোর্টে তিনি বাহা করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বাহা করিয়াছেন তাহার মূল্য অনেক বেশী। বতরিন ভারতবর্ষে শিক্ষার আদর থাকিবে, দেশে উচ্চশিক্ষার বিচারকসে আন্তর্জাতিকের কার্যের ইতিহাস ততদিন স্বর্ণাকরে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর দ্বারা আকর্ষিত থাকিবে। কিন্তু বিচারপতি হিসাবেও তিনি বাহা করিয়াছেন তাহার মূল্যও অসামান্য ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পাটনা হাইকোর্টে বিচারপতি-পদ ও অন্যান্য সকলে একত্রিত হইয়া যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার ডব্লিউ মিলারের মতে "the name of Sir Ashutosh Mookerjee is a household word throughout the High Courts of India." দেশের আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞ প্রজ্ঞা ও সম্মানের চক্রে দেবিভেন তাহা এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে।

কিছুদিন পূর্বে প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র গাল মহাশয় আন্তর্জাতিকের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তিকাতে তিনি আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে

"He has been a brilliant student, a successful lawyer and judge and an eminent educationist, but in all these walks of life he has been only one among many. In all these he has had many equals and even some superiors. It is only as Vice-Chancellor of the Calcutta University that Sir Ashutosh has attained his unique position in our public life."

অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় যে শ্রীযুক্ত গাল মহাশয়ের এই উক্তির সহিত একমত হইতে পারিলাম না। হাজি, আইনজ্ঞ, এবং বিচারপতি হিসাবে আন্তর্জাতিকের সমকক্ষ অথবা তদপেক্ষা প্রতিভাশালী কেহ থাকিতে পারেন কিন্তু বর্তমান যুগে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিকতর আর কেহ ভারতবর্ষে অগ্রগণ্য করিয়াছেন কিনা তাহাতে

সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ডাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে স্যার আন্তর্জাতিক বাহা করিয়াছেন তাহা যে খুব বড় যে কথা ঠিক এবং তাহাতেই যে তাঁহার নাম দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহাও ঠিক; কিন্তু ইহাও ঠিক যে যদি দেশে কি তাহা শিক্ষা প্রচলিত হইলে এই আভি অত্যন্ত সত্য আভির সমকক্ষ হইতে পারিবে সে সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা না থাকিত, কি নীতি অবলম্বন করিলে দেশে উচ্চ শিক্ষার প্রচার অগ্রগতিতে ও সহজসাধ্য হইবে তাহা তিনি সম্পূর্ণ ভাবে না বুঝিতেন, কি প্রণালীতে শিক্ষার সংস্কার সাধন করিলে ভারতের বিভিন্ন খণ্ডজাতি এক পূর্ণ জাতিতে পরিণত হইবে, তাহা যদি তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে কেবল মাত্র ডাইস-চ্যান্সেলাররূপে সেনেট ও সিন্ডিকেটের সভ্য-পতিত্ব করিয়া তিনি দেশের ও জাতির নিকট এত প্রজ্ঞার ও আদরের পাত্র হইতেন না। লর্ড কার্জন যখন ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আন্তর্জাতিক অবস্থা অনুসন্ধানের জন্ত এক কমিশন নিযুক্ত করেন, তখন দেশে সেই কমিশনের গঠন বিস্তৃত অত্যন্ত আগ্রহ হইলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে আইন ভারতের রাজ-সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছিল সেই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পূর্ব অবস্থা সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে তাহা পরিচালিত হইতেছিল তাহাতে দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা মোটেই হইতেছিল না এবং তাহা শিক্ষক ও ছাত্রসংখ্যার মধ্যে মৌলিক অনুসন্ধিৎসার দীপ জ্বালাইতে সক্ষম হয় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপদ্ধতি প্রভৃতির অনুসন্ধানের জন্ত কমিশন গঠন করেন। এই কমিশ্যন অর্জনশীল সাহিত্য, মর্শ্বন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, আইন, ঔষধবিদ্যা ও স্থপতিবিদ্যাতে উচ্চতাপাধিকারী অনেক যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

বাহিৰ হইয়াছেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কয়জন বীর অজস্কান ও গবেষণার বাণী পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ উপহার দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? আর ৫০ বৎসর পরে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হ'ল, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আবশ্যক নহে এই মত বাহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা যে অত্যন্ত সীমাবিশিষ্ট ছিল তাহা আমাদিগকে সীকার করিতেই হইবে, এবং দুঃখের আশুতোষই কেবল মাত্র ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তৎকালে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার আবশ্যক, এবং ইহা সংস্কৃত হইলে আমরা আমাদের সুখ পৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইব। এই হেতু ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বলিয়াছিলেন যে :—

"India, we cannot conceal the fact from ourselves, contributes hardly anything at the present moment towards the progress and extension of knowledge : in this respect, it does not rank even with the smallest of the civilized countries of the West. Our Colleges and Universities doubtless help to preserve and impart knowledge and learning, but they do exceedingly little to augment and extend it...I prefer to take my stand on the conviction, deep-rooted in my mind, that India with her great intellectual traditions, India which in old times was one of the chosen seats of wisdom and learning, is expected, nay, is bound to come to the front rank again and take her due place among those nations which are justly regarded as the leaders in the evolution of humanity in modern times."

Sadler Commissionও এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"According to the accepted view of almost all progressive societies, a university ought to be a place of learning, where a corporation of scholars labour in comradeship for the training of men and the advancement and diffusion of knowledge. On this definition the Indian universities, in their first form, are no true universities."

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্গতিক্রমে আশুতোষ যে সমস্ত

কার্য্য করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রত্যেক ভাবে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করণ।

(২) বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিষয়ভূক্ত করণ।

(৩) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য সমূহের ব্যুৎপত্তিতে উৎসাহ প্রদানার্থ Indian vernaculars নামক একটি বিষয় এম, এ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করণ।

(৪) ভারতীয় ইতিহাসের চর্চায় জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করণ।

(৫) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আলোচনার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান আলোচনার সুত্রপাত করণ।

(৬) জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি অবশ্য জাতব্য বিষয়গুলির পাঠ্যের ব্যবস্থা করণ।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহার সম্যক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাহাতে আমাদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং বাহাতে শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়ই আমরা দেশে বসিয়া শিখিতে পারি সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বিপুল কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বাহাতে অধ্যাপকগণ নিজের নিয়মিত কার্য্য সম্পাদনান্তর নিজ নিজ প্রিয় বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্ত সুবোগ ও অবকাশ পাইতে পারেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এবং বাহাতে এই সমস্ত অধ্যাপকের গবেষণার ফল বিৎসমাজে প্রচারিত হইতে পারে তজ্জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে University Journal of Letters এবং University Journal of Science নামক দুইখানি পত্রিকা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বন্দোবস্তের ফলে দেশে ও বিদেশে একাধিক বিৎসমাজ প্রচারিত পত্রিকাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের লিখিত অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক

প্রকাশিত পত্রিকাগুলিরও অনেক সংখ্যা প্রচারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত আছে, সেই সমস্ত স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সাময়িক পত্রিকা বা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবং সেই সমস্ত গ্রন্থ তৎ তৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কার্য্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আন্তোভের বুদ্ধিরাহিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের কার্য্য ছই প্রকার। কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিন্নত সাধারণে প্রচারিত হইয়াছে সেই সমস্ত অভিন্নত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছাত্রদিগকে জানান অধ্যাপকদিগের প্রথম কার্য্য। কিন্তু তাঁহারা যে কর্মে ত্রুটি হইয়াছেন, তাহা সম্যক্ ভাবে পালন করিতে হইলে তাঁহাদিগকে মৌলিক গবেষণা দ্বারা নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে হইবে, নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বাধীনভাবে জ্ঞানের অন্বেষণ করিবার ক্ষমতা শিষ্যদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং নিজেদের ও শিষ্যদের আবিষ্কারের ফল সুধী-সমাজে প্রচার করিতে হইবে। ভারতবর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও আজকাল অধ্যাপকগণ গবেষণাতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান যে অধ্যাপকদের দৈনন্দিন কার্য্যাত্তর্গত হওয়া বিষয়ে সে ধারণা বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষ মধ্যে বাকী। দেশেই সর্বপ্রথমে আন্তোভের কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল, এবং এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরেকে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ নিজ অধ্যাপক লিখিত সম্বর্তাবলী প্রকাশিত করিবার ক্ষমতা বিশ্বব্যবস্থা নাই। দৈনন্দিন কার্য্য পরিসমাপ্তির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দিগকে নিজ নিজ কার্য্য করিবার ক্ষমতা যে বঞ্চেই সুবিধা ও অবকাশ দেওয়া হইত, তাহার বিরুদ্ধে এক সময়ে দেশে কিছু কিছু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কিছুদিন হইল অধ্যাপক রাখণ যে ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান বিজ্ঞান সভার সমস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহার সূলে আন্তোভ। স্বাধীনভাবে জ্ঞানানুসন্ধান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে

ভারতের অন্যত্র বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা অগ্রগামী তাহা কেহ স্বীকার করিতে পারিবেন না, এবং ইহা যে আন্তোভের অতুলনীয় করণ ও কর্মশক্তির ফল তাহাও সর্ববাদীসম্মত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ Englishman ও Times of India পত্রের সম্পাদকীয় উক্তির উল্লেখ করা বাইতে পারে।

Englishman পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন যে :—

"...It is chiefly due to him and his passion for pure learning, not as a means to an end, but as an end in itself, that the Calcutta University has a world wide reputation in certain branches of knowledge."

Times of India নামক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে—

"The result has been that Calcutta now leads in the university world. Much of the research done at Calcutta has been of real value and added to the inter-national reputation of India for culture, and the staff of the Calcutta University is the envy of universities in other parts of India."

আন্তোভের জীবদ্দশাতে যে প্রকাশ্য ব্যক্তি অনেক বার তাঁহার কার্য্য ও কার্য্যশক্তির অতি তীব্র সমালোচনা করিতেন, তিনিও বর্তমান জুন মাসের Modern Reviewতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

"For the facts that the Calcutta University is the first and foremost teaching university in India, that it teaches more students in more subjects than any other Indian university, that in many sciences and arts it has turned out a laudable amount of genuine research, the chief credit is due to the man who has served it longer and with greater devotion as a senator a syndic and a vice-chancellor than any other person."

তাঁহারা এই পৃথিবীতে যীর প্রতীতি ও কর্মশক্তি দ্বারা নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকের ও জগতের হিতকর কার্য্যের অন্বেষণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা প্রথম হইতেই নিজ সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপন করেন, এবং সমস্ত জীবন সেই আদর্শকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন।

আশুতোষের জীবনী আলোচনা করিলে এই উক্তির বাধার্থ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে তিনি সর্ব প্রথমে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন বনোবোণ সহকারে তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভবিষ্যৎ জীবনে উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি কি নীতি অবলম্বন করিবেন সে বিষয়ে তাঁহার আদর্শ সুস্পষ্ট ছিল, এবং বৃত্তাকাল পর্যন্ত তিনি সেই আদর্শই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। বেশবিত্তাস প্রভৃতি বাহ্যিকচিন্তা মুক্ত না হইয়া প্রাচীন কালের হিন্দুদিগের দ্বারা ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন পূর্বক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই কর্তব্য, এই আদর্শও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার-রূপে উপাধি বিতরণ উপলক্ষে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা কালে আমাদের দেশের ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। মাতৃভাষার যথেষ্ট অনুশীলন যে আমাদের দেশে হইতেছে না, আমাদের দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারকরণ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকের একটি অবশ্য কর্তব্য কর্ম, তাহাও তিনি এই সময়ে বীর অলম্বগম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন :-

"There is only one other point in connection with the new Regulations to which it is my duty to invite your attention. I mean the Regulations which deal with the appointment of University Professors, Readers and Lecturers...Those Regulations indicate that the University is no longer to be a merely examining body with power to grant degrees ; it is not even to be merely a federation of Colleges ; it is to be there and a great deal more. It is ultimately to be a centre for the cultivation and advancement of knowledge. This is unquestionably a true ideal of a university, and the realisation of this stimulating ideal, though it may be attended with difficulties, is imperative and is by no means impracticable. Among the brightest signs of a vigorous university, is zeal for the advancement of learning and the true function of a university is not merely the distribution of knowledge but also its acquisition and conservation. Every Professor must be a student, and every advanced student must be animated by a higher ideal than mere absorption of knowledge.

"Graduates of today...Do not hesitate to own at all times that you are genuine Indians, and do not fail to rise above the petty vanities of dress and taste. Above all sedulously cultivate your vernaculars, for it is through the medium of the vernaculars alone that you can hope to reach the masses of your countrymen and communicate to them the treasures that you gather from the field of European learning...you ought to be the trusted interpreters of the West to the East and of the East to the West."

সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান, ও ইতিহাসের প্রভূত উপাধি পরীক্ষার পরবর্তী অল্প সময় উপাধিপ্রার্থী ছাত্রগণের অধ্যাপনার ভার বিশ্ববিদ্যালয় নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজসরকার যে বিধিবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে এই সমস্ত বিষয়ের উচ্চতর শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে স্তম্ভ করিয়াছেন, যে বিধির ফলে কলিকাতাতে কোন কলেজ পূর্বোক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন না, এবং তারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও যে পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছেন সেই বিষয়ের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে থাকেন, এবং আশুতোষের বক্তৃতা পাঠে মনে হয় যে ভবিষ্যতে উচ্চতর শিক্ষা যে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রদত্ত হইবে, সর্বপ্রথমে তাঁহার সেইরূপ অভিশ্রুতি ছিলনা, এবং সেই হেতু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে উপাধি বিতরণ সভাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে :-

"We do not dream of establishing for ourselves a monopoly of M. A. or research teaching. We shall welcome all sound competition : we feel ourselves free from the spirit of jealousy."

কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার প্রণালীর পরিবর্তন যে বিশেষ আবশ্যক তাহা তিনি উক্ত সভাতেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে প্রথম উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তকাদি নির্ধারণের ভার সেনেটের উপর থাকিলেই চলিতে পারে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি পরীক্ষা গুলিতে অর্থাৎ যে সমস্ত পরীক্ষাতে পাঠ্য-বিষয়াদি নির্ধারণ ও ছাত্রদের কৃতকার্যতার পরীক্ষা প্রভৃতি কেবল মাত্র বিশেষজ্ঞ

যাঁরাই সম্ভবপর সেই সমস্ত পরীক্ষার ব্যবস্থার ভার শিক্ষক সম্বলীর উপর ভরত থাকাই কর্তব্য। তাঁহার মতে—

"We may admit, I think, that the senate...may remain entrusted as hitherto with the function of determining the general courses of study to be followed in our colleges up to a certain standard, possibly the B. A. standard....On the other hand it is evident...that all the arrangements as to the higher specialised courses of studies....should be left entirely and solely to those special experts, whom the University entrusts with the task of instruction in those subjects. The University Professor of Mathematics, to take one illustration only, and his helpers i. e. all the M. A. Lecturers in Mathematics will, under this system, ex-officio determine the higher courses, text books, and methods of examination in Mathematics."

এই সময়ে প্রধানতঃ বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে এই উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই উচ্চতর শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং Sadler Commission এর মতে—

"The position grew acute when both the University and the Presidency College repeatedly made insistent demands, the one upon the Government of India, the other upon the Government of Bengal, for funds for the promotion of higher training."

ইহার কলে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ভারত রাজসরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্ত নরসিং সঙ্গীত লইয়া এক সমিতি গঠন করেন, এবং সভাপতি আগন্তোষ ব্যতিরেকে, মিঃ হেনরী, স্যুডার হেনরি হেডেন, ডাক্তার ব্রজেননাথ গীল, ডাক্তার Howells, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক Hamilton মিঃ Wordsworth এবং মিঃ Anderson এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাহাতে কলিকাতা শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষকদের সাহায্যে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে কলিকাতাতে Post-Graduate শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা বাইতে পারে সেই সম্বন্ধে রাজসরকারকে উপদেশ দিবার জন্ত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর এই সমিতি গঠিত হইয়াছিল, এবং সেই বৎসরের ১২২ ডিসেম্বর তারিখে এই সমিতি বীর মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভাতে এই সমিতির মন্তব্য সম্বন্ধে

অনেক বাধাহুবাধ হইয়াছিল, এবং পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট কর্তৃক এই সমিতির মন্তব্য গুলি আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে রাজসরকার সেনেট কর্তৃক গৃহীত মন্তব্য গুলি বিধিবদ্ধ করেন, এবং বর্তমান সময়ে যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে তাহার সূত্রপাত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ সুগাভকারী পরিবর্তন দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিতেছে কিনা তাহাতে সর্বপ্রথমে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কিন্তু আগন্তোষের মৃত্যুর পর তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকাদিতে ও সভা সমিতিতে যে সমস্ত উক্তি করা হইতেছে তাহাতে মনে হয় বেন দেশবাসী তাঁহার কার্যের স্বার্থ সূচ্য ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছে। যে সমস্ত কলেজ উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের অধিকার হইইতে বঞ্চিত হইয়াছে সাধারণের চক্ষে সে সমস্ত বিদ্যালয়ের সম্মানের কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশের শিক্ষার প্রচার কিরূপ হইয়াছে তাহার মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে এই নব প্রথাতে যে দেশ ও সমাজ সমর্থিত লাভবান হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এমন কি ভারতবর্ষের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর আগন্তোষের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী B.A. ও B. Sc. Honours পরীক্ষাতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই নব প্রবর্তিত শিক্ষা প্রণালীর দুইটি বিশেষত্ব। এই প্রণালীতে শিক্ষার্থীগণ নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের নিকট হইতে শিক্ষা পাইতে পারেন এবং কোন বিশেষ বিষয়ে অনেক শিক্ষক থাকিতে শিক্ষকগণের প্রত্যেকেই সেই বিষয়ের কোন এক বিভাগে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে, নিজের সেই বিভাগ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিতে এবং শিষ্যদিগকে সভ্যজ্ঞানসন্ধান উৎসাহিত করিতে পারেন। ইহা ছাড়া এই শিক্ষা প্রণালীর আর একটা বিশেষত্ব আছে। বাহার শিক্ষক, এই প্রণালীর প্রবর্তনের পূর্বে শিক্ষার পদ্ধতি বিধানের উপর তাহাদের কোনও হাত ছিল না, এবং Sadler Commission এর মতে—

"The Post-Graduate system, for the first time in the history of the University, recognised and gave

effect to the principle that these teachers were entitled, as of right, to be associated in the management of the teaching arrangements."

এই প্রসঙ্গে কমিশন আরও বলিয়াছেন যে—

"It is clear that the Post-Graduate scheme gives us valuable recognition to what...must be deemed, the

fundamental principle namely, that each student no matter to what College he is attached, is entitled to have the advantage, of the most helpful teaching given in the best educational institutions of this city."

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ।

দারার দুর্দৃষ্ট

(পূর্বানুসৃতি)

যে মুহূর্তে দারা খুঁজ হইয়াছেন তখনই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার জীবনীলা কল্পে শেষ হইবে। তথাপি তাঁহার অন্তরের নিভৃত এদেশে নির্দোষিতপ্রায় আশা-প্রদীপের ক্ষণিকোৎসব মুহূর্ত তাহে জ্বলিতেছিল,—বুঝি ঔরঙ্গজীব জ্যোতের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেও, শাজাহান বাদশাহের অল্পবয়সী প্রাচীন ওমরাহগণ সে নৃশংস হত্যার আদেশের প্রতিবাদ করিবেন, অন্ততঃ অন্তঃপুরের রমণীবৃন্দ তাঁহাদের স্বভাব-স্বলভ করুণার বশবর্তিনী হইয়া অমানুষিক প্রাত্যহৃত্যা সংঘটিত হইতে দিবেন না। বাহা হইবার নহে তাহাই হইবে, দীন দরিদ্র রাজরাজেশ্বর হইবে, যে চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে তাহাকে পুনরায় পাইব, এইরূপ প্রলোভনে আশা যদি আমাদিগকে প্রলুব্ধ না করিত তাহা হইলে ক্ষয় ক্ষতি, ব্যথা বেদনাময় সংসারে মাহুত করদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিত ? দারা জানিতেন, ঘোবনের প্রারম্ভ হইতেই ঔরঙ্গজীবের সহিত তাঁহার শত্রুতা চলিয়া আসিতেছে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমে বর্ধিত হইয়াই চলিরাছে, সেই ঔরঙ্গজীব আজ তাঁহাকে একান্ত কবলগত করিয়াছে ; সুযোগ পাইলে রণক্ষেত্রেই তাঁহাকে বধ করিত, তাহা হয় নাই, আজ তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়াও হয়ত বা হত্যা করিবে না। দারার এ আশা নিতান্তই

ছরাশা। তথাপি আশা না করিয়া ম'হুত কি পারে ?

যে দিবস দারাকে কারাবদ্ধ করা হইল, সেই দিন সন্ধ্যাকালে দেওয়ান খাসে ঔরঙ্গজীব বাদশাহের দরবার বসিল। আমীর ওমরাহ, মন্ত্রী সেনাপতি, কাজি হাকিমের বৃৎ দরবার গৃহ পরিপূর্ণ। দিল্লীখবর, জগদীশ্বরের জ্ঞান, দারার অদৃষ্ট নিয়মিত করিবার জন্ত ময়ূর সিংহাসনে সমুপবিষ্ট। দেওয়ান খাসের জাকজীরা অন্তরালে অবরোধ-বাসিনী নারীবৃন্দ বিচারের ব্যক্তিভিন্নর দেখিবার জন্ত সমাগত। সিংহাসনের ভাষা অধিকারের জন্ত মুক্ত করিয়াছেন, তাহার বিচার নহে, বক-বার্ষিক ঔরঙ্গজীবের মতে, দারা মুসলমান ধর্মের বিরোধী, সেক্ষণ লোক জীবিত থাকিলে ভারতে মুসলমান ধর্ম লুপ্ত হইয়া যাইবে, সুতরাং ধর্ম-প্রবর্তা কাজীগণের দারার সম্বন্ধে অভিপ্রায় জানিবার জন্ত এই বিচার-সভা বসিয়াছে। দারা সকল ধর্মাবলম্বীদিগকে সমুদ্বিষ্টে দেখিতেন, হিন্দুর প্রতি অত্যাচার না করিয়া হিন্দুর অসুখা উপনিবদের অহুবাধ করাইয়া, মুসলমান শাস্ত্র গৃহীত করাইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ এবং সেইজন্য তিনি, ধর্মধ্বজী ঔরঙ্গজীব এবং তাঁহার অদৃষ্ট কাজী ও অপরাধের অল্পগত জনের চক্ষে মুসলমান ধর্মের শত্রু। এতাদৃশ গর্হিত অপরাধের বিচার

না করিয়া ধর্মরক্ষক ঔরঙ্গজীব কি ছিন্ন থাকিতে পারেন ?

বস্তুতঃ রূপপ্রত্যাগত বিজয়ী দারা, সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া রাজদ্রোহী, গিফুদ্রোহী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদের হত্যাকাশী ঔরঙ্গজীবের যদি বিচার করিতে পারিতেন তাহা হইলেই ভার ও ধর্ম বজায় থাকিত। কিন্তু অধিল ধরিজী, বামনরূপী ভগবানকে দান করিয়া বলিরাজার রসাতল বাস ব্যবস্থা হইয়াছিল, আর অঞ্জলি পরিমিত শতদুর্দান করিয়া ব্রাহ্মণ অব্যয় বর্গ লাভ করিয়াছিল; আবাল্য অসতী কুন্তী অমরপুত্র-বাসিনী; অশ্ব পতিদেবতা জানকীর শেব ব্যবস্থা পাতাল প্রবেশ। সেইজন্যই কবি বলিয়াছেন “ধর্মস্ত মুদ্রা গতিঃ” সত্য সত্যই ধর্মের গতি যদি বিচিন্ন না হইত তাহা হইলে পুত্র-পুত্র পাগাচরণ করিয়া গাংগা ঔরঙ্গজীব নিক্রমে ভারত সম্রাজ্যের অধীশ্বর-রূপে ময়ূর সিংহাসনে বিরাজ করিতে পারিত কি? হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী এবং সোমনাথ হইতে চন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিশাল ভারতের হিন্দু মুসলমান প্রজা-পুত্র এবং সর্বাধি সামন্ত নরপালবর্গ, আরকী নরপতি আলখলীর পাগাচরণ অবিচলিত চিত্তে অবলোকন করিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সকলেই যেন প্রাণহীন কার্ঠপুতলিকা, রাক্ষসের রাক্ষসী গীলার প্রতিরোধ করে কেহই কিছু কহিতে-বা করিতে পারিল না, ইহাও এক বিচিন্ন ব্যাপার।

বিচার সভায় কেবল মাত্র বুদ্ধ দানেশমন্ড খাঁ দারার প্রাণদণ্ডের প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন এবং বাহাতে সেই ঔরঙ্গ দণ্ডের ব্যবস্থা না হয়, সেজন্য ঔরঙ্গজীবের সিংহাসনের পাদপীঠতলে নতজাঙ্ঘ হইয়া বারবার আবেদন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু অপরূপ সেনাপতি ও মন্ত্রিপণ, বিচার বিভাগের ন্যায়বোধ কাকীবর্গ সকলেই দারার প্রাণদণ্ডের ব্যবহার পক্ষপাতী, তন্মধ্যে মাতুল শায়েস্তা খাঁ, যিনি “আমীর-উল্-ওমরাহ” উপাধিতে ভূষিত, তিনিই সর্বাঙ্গেকা সমধিক উত্তেজিত। দারা জীবিত থাকিলে

সিংহাসন নিশ্চল হইবে না, ধর্ম বিলুপ্ত হইবে, এবং যে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ঔরঙ্গজীব ককিরি গ্রহণ এবং পুণ্যধাম মক্কার বাইবার সঙ্কল্প তাগ করিয়াছেন সেই ধর্মরাজ্য স্থাপনেও ব্যাঘাত হইবে, ইহাই ছিল শায়েস্তার প্রবল যুক্তি।

গীরাঙ্গ বেগের পৌত্র, আসকের পুত্র, মমতাজমহলের ভ্রাতা শায়েস্তা—দারা, ঔরঙ্গজীব প্রভৃতি সকলেরই মাতুল; সমরক্ষেত্রে মাতুল এবং ভাগিনেয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে হইয়াছেও, এমন কি সমর সমরের উত্তপ্ত শোণিত বেগে একজন অপরকে বধ করাও সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু রূপ-কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, সমরোত্তমতা বিদূষিত হইয়া গেলে, সত্যতলে বসিয়া যুক্তি পূর্বক ভাগিনেয়ের যুক্ত্য ব্যবহার অল্প ব্যতীত হওয়া নিতান্তই নৃণংস ব্যাপার এবং ঐশাচিক প্রভৃতির পরিচায়ক। “নরনাং মাতুলক্রমঃ” কথাটা মিথ্যা নহে, যুক্তি এই শায়েস্তা খাঁর প্রকৃতি বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়ার ঔরঙ্গজীব এত বড় নিষ্ঠুর এবং পাগাচারী হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষাও বিচিন্ন ব্যাপার দারার বধ ব্যবস্থার অল্প ভাগিনী রোসেনারার বিপুল ব্যগ্রতা! চিত্রাচরিত মুসলমান অবরোধ প্রথার অবমাননা করিয়া রোসেনারা অন্তঃ-পুত্র হইতে দেওয়ান খাসের দরবার উপস্থিত হইল এবং দারার বধ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের অল্প ঔরঙ্গজীবকে বারবার উত্তেজিত করিতে লাগিল। দানেশমন্ড এবং শায়েস্তাখাঁর বাদ প্রতিবাদে যখন অনেকের চিত্তই দোলায়মান, সেই পরম মুহূর্তে রোসেনারার নির্দ্বন্দ্বাতি-শয্যে, বাহার্য বধ দণ্ডের বিরোধী ছিল তাহাদেরও মত পরিবর্তিত হইয়া গেল—হইবারই কথা, কেননা ভারতেশ্বর সম্রাটের শ্রীতির জন্য তাঁহার অন্তরের অতি প্রায় অহুমান করিয়া তদনুরূপ কর্মের অহুতান বা মত প্রকাশ না করে এমন আত্মীয় ওমরাহ, মন্ত্রী মনসবদার, কাকী দোলা কেহই ছিল না। সম্রাজ্যের সকলেই জানিত ঔরঙ্গজীবের অভিপ্রায় কি—দারার কিরূপ দণ্ড তাঁহার অভিলষিত; কপটী

ঔরঙ্গজীব যে স্বয়ং নিরব থাকিয়া অপর সকলের দ্বারা দারার বধের ব্যবস্থা করাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন ইহা কাহারই অবদিত ছিল না। সুতরাং সেক্ষণ ক্ষেত্রে ইচ্ছানুযায়ী ধর্মশাস্ত্রের ব্যবহাঙ্গ, তাঁহার অন্নদাস মোলাগণের নিকট হইতে পাওয়া, আলমগীর বাদশাহের পক্ষে অতি সহজসাধ্য ব্যাপার।

রোসেনারা নারী হইরা, তগিনী হইরা, ভ্রাতার প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞার অস্ত্র বেক্ষণ আগ্রহাতিশয়া দেখাইরাছিলেন এবং যে সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন সে সমুদয়ও হয়ত ঔরঙ্গজীবেরই শিক্ষা; কিংবা স্বার্থ প্রণোদিত হইরা ঔরঙ্গজীবের অভিলাম্বানুযায়ী মত দেওয়াও রোসেনারার পক্ষে অসম্ভব নহে। দিল্লীর বাদশাহের অন্তঃপুরে নারীগণের মধ্যে একজন “বাদশাবেগম” উপাধি পাইরা রঙ্গমহলের সর্বময়ী কর্ত্রী হইরা থাকিতেন। শাহজাহানের সময়ে মমতাজের মৃত্যুর পরে জাহানারা সেই পদ গ্রাপ্ত হইরাছিলেন, ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে তাঁহার অতিপ্রাণের অনুগামিনী হইলে সেই গৌরবময় পদবী লাভ করা ঘাইতে পারিবে, সেই অস্ত্র রোসেনারা ঔরঙ্গজীব কর্তৃক আগ্রা ছুঁই অবরোধের সময় হইতেই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, এমন কি পিতা শাহজাহানের বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে দ্বিধা করেন নাই। আজও সেই স্বার্থের প্রেলোভনে ঔরঙ্গজীবের প্রীতির অস্ত্র দারার মৃত্যু কামনা করা এই ছুটী নারীর পক্ষে অসম্ভব নহে।

কলতঃ ঔরঙ্গজীবের বাহা অভিপ্রের্ত তাহাই হইল। দরবারের আমীর ওমরাহ, কাজী মোল্লা সকলে একবাক্যে দারার বধদণ্ডের ব্যবস্থাই সঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। রোসেনারার মনস্কামনা পূর্ণ হইল, ক্ষুরকর্ষা ঔরঙ্গজীব কৃতকৃতার্ব হইলেন; দারার জীবন রক্ষার বৃদ্ধ দানেশমন্দের সকাতির প্রার্থনা পালায়নার অন্তরকে স্পর্শও করিতে পারিল না। জ্ঞানতঃ ধর্মতঃ বিনি অথও ভারত সাম্রাজ্যের স্বার্থ অধিকারী, ছই দণ্ডের দরবারে তাঁহার বধের ব্যবস্থা স্থির হইরা গেল।

অপরূপ এই যে তিনি গাবও তও ঔরঙ্গজীব এবং তাঁহার অন্নপুট শায়েস্তা খাঁ ও কাতীগণের বিবেচনার গোঁড়া মুসলমান নহেন,—কেন না তিনি সর্ব ধর্মাবলম্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন, অপরের সাহিত্যে, দর্শনে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও ধর্মশাস্ত্রে বাহা উপাদেয় পাইয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিয়া মুসলমান শাস্ত্র পুট করিয়াছেন, অপর ধর্মাবলম্বীর উপর কোন প্রকার অত্যাচার কখনও করেন নাই।

এই দারার জন্মের পরে ক্ষুটকুস্থলকান্তি শিশুসহ সজীক শাহজাহান সাধু মুসলমান কবিরের আশীর্বাদ লাভার্থ বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হইরাছিলেন; সাধু ময়ূরগুচ্ছ দ্বারা শিশুর সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহার সর্ব অমঙ্গল বিদূরিত করিয়া দিরা-ছিলেন। তৎপরে পদারবিষে সমাহিত চিত্ত সন্ন্যাসীর শুভাশীর্বাদ লাভ বাহার জন্মের অনতিকাল পরেই ঘটরা-ছিল, বাহার বাল্য কৈশোর ও যৌবনের অবিকাংশ পিতৃ-মেহের নিবিড় বেষ্টনের মধ্যে পরমানন্দে কাটিরা গিয়াছে, সিংহাসনাধিরোহণের সময় বাহার সমাগতপ্রায়, তক্তে তাউস বাহার স্পর্শ লাভার্থ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছে, জীবনের সেই পরম মুহূর্তে স্বার্থপর শোণিত পিপাসু ভ্রাতার আজ্ঞার দাতকের গুল্মাঘাতে দারার জীবনান্তের ব্যবস্থা বিধিকৃত কি নির্ধন ললাটলিপি! রাজ্যলোভে এবং ধর্ম ও প্রেমের নামে সংসারে বহু হত্যা-কাণ্ড ঘটরা গিয়াছে কিন্তু দারা এবং তদীয় পুত্রদ্বয়ের গোচনীর মৃত্যুর জ্ঞার জ্বর-বিদারী ব্যাপার ইতিহাস খুঁজিলে দোসর মিলিবে কি না আমি জানি না।

বিচারের অব্যবহিত পরেই ঔরঙ্গজীব দারার বধের আজ্ঞা প্রচার করেন নাই; বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল কাজী ও মোলাগণের অভিমত দিল্লীতে প্রচারিত হইলে দিল্লীবাসী প্রজাপুঞ্জ তাহা কি ভাবে গ্রহণ করে এবং তাহার। সেই নিদারুণ বার্তা শুনিরা কিরূপ আচরণ করে তাহাই দেখিরা তিনি ইতি কর্তব্যতা স্থির করিবেন। ইহার মধ্যে একটা ঘটনা ঘটরা গেল এবং সেই ঘটনার অন্ত, যদি বা দারার বধ-ব্যাপার ছই চারি দিবস পরে

ঘটিত, তাহা হইল না, সেই ঘটনা হতভাগ্য রাজকুমারের
মৃত্যুকে অগ্রসর করিয়া আনিল। সে ঘটনাটি এই—
কৃত্তর আকর্গান মালিক জিউরান, দারাকে বাহাদুর-খাঁর
হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং বাদশাহের প্রসাদ লাভের
জন্ত শাহী সৈন্তের সঙ্গেই রাজধানী দিল্লী নগরীতে
আসিয়াছিল। কৃত্তর নরশিখারের সংকল্পের পুরস্কার
স্বরূপ বাদশাহ তাঁহাকে নানা ধনরত্ন উপহার দিয়া
মনসবদারের গৌরবময় পদবীতে উন্নীত করিয়াছিলেন।
অকৃতজ্ঞ নরোধম জিউরান এই সমুদ্রাশ্রয় সম্মানের আনন্দে
উন্মাদিত হইয়া, তাহার আকর্গান অহুচরবর্গ সহ যখন
দরবার হইতে স্বীয় বাসভবনে ফিরিতেছিল, তখন
দিল্লীর জুহু জনসাধারণ পাবণ্ডের মূর্ত্তি দেখিয়া আর
ঐর্ষ্য ধারণ করিতে পারে নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া
প্রথমে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিল এবং
নগরীর গৃহশীর্ষ হইতে নারীগণ আবর্জনাপূর্ণ মূদ্‌ভাণ্ড
পাণ্ডিতের মন্তকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গন্তব্যপথে
জিউরান বতই অগ্রসর হইতেছিল, জুহু নাগরিকের
সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; প্রথমে প্রস্তর খণ্ড
তৎপর বংশদণ্ড, অবশেষে তেগা, তলোয়ার, বর্ষা, পাটা
ছোরা ছুরি বাহার বাহা ছিল, তাহাই লইয়া সকলে
জিউরান ও তাহার অহুচরবর্গকে আক্রমণ করিল;
জিউরানের সমভিব্যাহারী আকর্গান সৈন্তগণ যথাসক্তি
প্রহুর রক্ষার্থ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সেই হানাদার
অসি ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাতে আহত হইয়া বহু
আকর্গান মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং জিউরানের প্রস্তর ও
অস্ত্রাঘাতে আর প্রাণান্ত হইবার উপক্রম। সহর
কোতোয়ালি সংবাদ পাইয়া, নগর রক্ষার্থ যে সকল সৈন্ত
অষ্টগ্রহর প্রস্তর থাকে, তাহা লইয়া জিউরানের সাহা-
য্যার্থ অগ্রসর হইলেন এবং বহু চেষ্টার বহুকণ পরে
জুহু নাগরিকগণের হস্ত হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া
তাহার নির্দিষ্ট বাসগৃহে লইয়া বাইতে পারিয়াছিলেন।
নারীহস্ত নিক্ষিপ্ত আবর্জনার মূদ্র তাহাদের আঘাত
হইতে জিউরানের মন্তক দেহ বাটাইবার জন্ত কোতো-
য়াল সাহেবকে অনেকগুলি ঢাল একত্র করতঃ একটি

আচ্ছাদন প্রস্তুত করাইয়া তাহার নিম্নে তাহাকে লুকা-
ইয়া লইয়া বাইতে হইয়াছিল। উপযুক্ত সময়ে কোজসহ
কোতোয়াল সাহেব উপস্থিত না হইলে সেই দিনই
দিল্লীবাসীর হস্তে লণ্ডভাষাতে মালিক জিউরানকে
কিঞ্চিৎ কুহুরের ভার প্রাণ বিসর্জন দিয়া তাহার পাণের
সমুচিত প্রতিফল গ্রহণ করিতে হইত এবং সেইদিনই
যমদূত তাহার দেহ-বিযুক্ত পাগমলিন আত্মাকে অনন্ত
কালের জন্ত নরকের আলমর অধিকৃষ্টে নিক্ষেপ
করিত।

জুহু নগরবাসী-জনের এই আচরণের কথা বখা-
সময়ে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের নিকট বিজ্ঞাপিত হইলে
তিনি জিউরানকে অবিলম্বে দিল্লী ত্যাগ করিয়া তাহার
ভারত সীমান্ত সন্নিক্ত পার্শ্বভা তবনে প্রত্যাবর্তনের
জন্ত আদেশ দিলেন। জিউরানও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না
করিয়া রাজ্যের অধিকাংশের আয়রণে বাদশাহের সৈন্ত
পরিবৃত্ত হইয়া দিল্লী নগরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।
জনপ্রিয় দারার প্রতি ঘৃণাশীল নগরবাসী কখন কোন
বিপদ ঘটাইয়া কেলে, কোন মূহুর্ত্ত কাগাগার ভগ্ন
করিয়া দারাকে মুক্ত করিয়া দেয় এই আশঙ্কার ঔরঙ্গজীব
দারার হত্যা কার্য আর স্থগিত রাখা কর্তব্য নহে বলিয়া
স্থির করিলেন।

খাওয়ারসপুরার প্রহরী পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত প্রাসাদে
দারা এবং সিপাহকে ঔরঙ্গজীব অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া-
ছিলেন। দারা সুরাদেহের ভার পলায়নের উদ্ভব পর্ষন্ত
না করিতে পারেন এই জন্ত বহু প্রকার সাবধানতা
অবলম্বন করা বাইতে পারে, পূর্ব হইতেই
ঔরঙ্গজীব তাহা করিয়াছিলেন। বৎসরাধিক কালের
নানাবিধ ক্লেমে ক্রিষ্টকার, সময়ে অজ্ঞাহত এবং প্রিয়-
বিরোগবিহীন দারার অন্তরে পলায়নের ইচ্ছা কোন
দিনই উদয় হয় নাই; ধরমতের ক্ষেত্র হইতে আরম্ভ
করিয়া পুনঃ পুনঃ রণ পরাভব, জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমানের
নিক্রদেশ, প্রিয়তমা পত্নীর পথপ্রান্তে শোচনীয় মৃত্যু
এবং জীবিত-দান-প্রাপ্ত জিউরানের কৃত্রিমতা, এই সকল
গুলি একত্র হইয়া দারার অন্তরে একান্ত ঔদাসীন্তের

সকার করিয়াছিল। সেরূপ অবস্থার নিবারণ-শর-সম্মানিত কুরানের ভায় ঔরঙ্গজীবের অন্তঃসংগর্ভ কর্তৃক পশ্চাৎসংঘটিত হইতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়নের ক্রেশ ও লাঞ্ছনা পুনরায় স্বীকার করিবার ইচ্ছা কি তাঁহার হইতে পারে? ইহজীবনের সুখ দুঃখ সমস্তই তিনি দেখিলেন, জীবন তা। সুখ এবং এই এক বৎসরের দুঃখ রানি তুলানিতে পরিমাপ করিলে দুঃখের দিকটাই গুরু হইয়া ভূমিস্পর্শ করিবে সন্দেহ নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজীবের হস্ত হইতে পলায়ন দ্বারা পরিমাপ লাভের কামনা তাঁহার হইতেই পারে না। তবে লোকলজ্জা এবং সাম্রাজ্যের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিরাগের ভয়ে অগ্রদেয় হত্যাব্যাপার হইতে ঔরঙ্গজীব বিরত হইতেও পারে, এই ক্ষীণ আশাটুকু হয়ত তাঁহার অন্তরে কখন কখন উদ্ভিত হইয়া থাকিবে। তাঁহার নিম্নের জ্ঞান নহে, চতুর্দশবর্ষীয় মাতৃহীন শিশুর সিপারের চিন্তা। তাঁহাকে নিরত কাতর করিয়াছে সন্দেহ নাই; এবং সেই সিপারের সুখ চাহিয়াই 'তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছা' হইয়াছিল এবং হইয়াও নিতান্তই স্বাভাবিক।

প্রাসাদ দারার পিতা পুত্রকে ঔরঙ্গজীব একত্রে রাখিয়াছিলেন। দারা এবং সিপারের সংকীর্ণ বন্ধী জীবনের সেটাইটুকুই একমাত্র সুখ আনন্দ আশ্রয় বাহ্য। কিছু সমস্তই। বাদশাহ ইচ্ছা করিলে, ইহজনকে পৃথক স্থানে রাখিতে পারিতেন, তাহা করিলে পিতাপুত্র, কাহার অদৃষ্টে কি ঘটিল না জানিতে পারিয়া, জীবনমৃত্ত অবস্থার দিন কাটাইতেন। ঔরঙ্গজীবের দ্বার পর-পীড়ক, নৃশংস, নররাক্ষস এই অজুগ্ৰহটুকু কেন করিয়াছিল তাহা অজ্ঞান করা কঠিন। যে ব্যক্তি মুহু বিব প্রয়োগে বাগক জ্ঞাতস্পৃহগণের ধীরে ধীরে জীবন নাশ করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, প্রদেশাধিপতি নরপতির জীবিতাবস্থায় জিহ্বা কর্তন করিয়া উন্মাদিত হইয়া উঠে, সে বাহ্যকে চির শত্রু মনে করিয়াছে, সেই দারাকে পুত্রের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার পৈশাচিক আনন্দ ভোগ হইতে নিজকে বঞ্চিত কেন করিল

বুঝিতে পরা কঠিন; সম্ভবতঃ কোন নিষ্ঠুরতার অভিপ্রায় ছিল, বাহ্য থাকিবে। প্রমুখ তীব্র রাজ-ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিতে শক্তি হইরাছে, সেই জন্য আমরা আর তাহা জানিতে পারিতেছি না।

দিল্লীর পুৰ্ববাসিগণ কর্তৃক যে দিন মালেক জিউরানের নির্বাসন শেষ হইল, সেইদিনই রাক্ষস প্রকৃতি নররক্ত-লোলুপ নজরবেগের উপর অবিলম্বে দারাকে হত্যা করিবার আদেশ ঔরঙ্গজীব প্রচার করিলেন। আদেশ পাইবামাত্র পৈশাচিক হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া নৃশংস ঘাতক নজরবেগ, তাহার হত্যাকাণ্ডের সহকারী, সমগ্রকৃতির অপরাপর জ্ঞানদগণ সহ বধাসক্ত বস্ত্রতার সহিত প্রস্তুত হইতে লাগিল, যেন রাজকুমার দারার সহিত পাবণের কতকালের জাতমূল শত্রুতা, আজ সেই শত্রুতা নির্বাসনের মাংসপ্রহৃত সমুপস্থিত। “যত দেবত বজ্রং তথা ভূষণবান্ধবঃ” ঔরঙ্গজীবের অমৃতর সহচর তাহারই অমুরূপ না হইবে কেন? রেসেনাগা, শারেক্তা বা প্রভৃতি সকলে স্বার্থের জ্ঞান দারার প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতী ছিল একথা বুঝা যায়, কিন্তু দারার রক্তদর্শনের জ্ঞান নজরবেগের এই অমাহুতিক উৎসুক্য বধার্থই আবোধ্য।

পাবণের প্রস্তুত হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। আদেশ প্রাপ্তির ক্ষণপরেই সহচর নজর সশস্ত্র হইয়া দারার কারাগারের দ্বারোদ্বাটন করতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহাদের সূক্তি দেখিয়াই দারার বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহার কি উদ্দেশ্যে তথায় গিয়াছে। নরশোণিত-তৃষ্ণা ইহাদের নয়নে বদনে অঙ্কিত, হস্তে তীক্ষ্ণদার উদগ্ন কপাণ; সাক্ষাৎ বমদুতের ন্যায় ইহারা হতভাগ্য পিতাপুত্রের সমুখে সমুপস্থিত। স্পৃগোপিত সিপার জ্ঞানদগণের ভীম সূক্তি দেখিয়া ভীতিবিহ্বল চিত্তে চীৎকার করিতে করিতে, বাগকের চিরনির্ভর পিতার মেহবন্ধের উপরে সূচ্ছিত হইয়া পড়িল। হতভাগ্য পিতা প্রাণপণে পুত্রকে নিবিড় বাহুবর্ডনের মধ্যে ‘চাপিয়া ধরিয়া, হস্ত দ্বারা তাহার নয়নদ্বয় আচ্ছাদিত করিলেন এবং কম্পান সস্ত

শিশুকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তখন কঠে “তর নাই তর নাই” বলিতে লাগিলেন।

সুখের আশাস বাণী শুনিয়া সিগার আশ্বস্ত হইবে কেন? কারাগারের দারোয়াতন করিয়া কোষদ্রুত কৃপাণ হস্তে বাতকগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই নরবাতি, গুপ্তপ্রকৃতি জন্মদগণের হস্ত হইতে তাহাকে এবং তাহার পিতাকে রক্ষা করিবার সামান্য চেষ্টাইকু পর্য্যন্ত করিতে পারে, এমন একটি প্রাণীও বিশাল বিধে আজ নাই। পিতা পুত্র উভয়েই নিরজ। এমন নিঃসহায় অবস্থায় পিতা যে “তর নাই” “তর নাই” বলিতেছেন, সে যবও যে তরবিহীন বিপন্ন ব্যক্তির কঠনিঃসৃত চেষ্টাবিহীন ব্যাকুল শব্দ মাত্র, উভার যে সার্থকতা কিছুই নাই তাহা বুঝিতে সিগারের বাকী ছিল না, তাই সে আশ্বস্ত হইতে পারিল না। বাত-সঞ্চালিত বংশপত্রের ন্যায় তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল; পুত্রকে বন্ধে চাপিয়া ধরিয়া সহায়হীন নিরুপায় দ্বারাও ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছিলেন এবং অশ্রুনিরুদ্ধ কঠের বিকৃত স্বরে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—“তোমরা কি চাও, কেন তোমরা এখানে আসিয়াছ?”

ভারতের একাতপত্র প্রভৃৎ বাঁহার উত্তরাধিকার, অতি অল্পকাল পূর্বেও বাঁহার আদেশ, দেবাদেশের দ্বার ভারতের সর্বত্র প্রতিপাণিত হইত, বাঁহার ইচ্ছা পরিপূর্ণের জন্য ছুঁদিবস পূর্বেও ভারতের কোটি কোটি নরনারী প্রাণপাত করিত, আজ সেই দ্বার, শাহানুশাহ বাদশাহ শাহাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারা কি হুর্নতি!—নীচ বাতকের তরে তিনি কম্পিত কলেবর।

নজরবেগের দ্বার পাঁচাশ হুদর পাণ্ডিত্য দ্বারাকে বলিতে পারিল না যে, কি উদ্দেশ্যে সে কারাগারে আসিয়াছে। বাদশাহের আদেশে সিগারকে পৃথক প্রকোষ্ঠে লইয়া বাইতে হইবে, ঔরঙ্গজীব বাদশাহ ছইজনকে একস্থানে রাখিবেন না, এই মিথ্যা কথা তাহাকেও রচনা করিতে হইল। বাতকের জিহ্বা যে বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না, সেই কার্য

করিবার আদেশ-বাণী ঔরঙ্গজীবের কঠ হইতে কেমন করিয়া বাহির হইয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। পাপ-চিন্তা এবং নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে করিতে দ্বারা ঔরঙ্গজীবের হৃদয় হইতে কোমলতা একেবারে তিরো-হইয়া গিয়াছিল, এবং তুলনার দেখা বাইতেছে, রাজাদেশে হত্যার নিয়োজিত বাতক অপেক্ষাও সে অধর, অংগাচারী ত্রাজ তদ্রূপ গণ্ডার অপেক্ষাও হিংস্র, বিবর-বাসী সর্প অপেক্ষাও ক্রুর।

পিতা এবং পুত্রকে চিরবিচ্ছিন্ন করা হইবে, ইহার অর্থ কি তাহা দ্বারার বুঝিতে বাকি রহিল না। নজরের পদমূলে দ্বারা ছিন্নমূল তরুর দ্বার নিপতিত হইয়া গলদশ্র নেজে। তাহাঙ্গিকে একজ্ঞ রাখিবার জন্য কাতর-প্রার্থনা, বরম্বার জানাইতে লাগিলেন এবং আসন্ন পিতৃবিচ্ছেদ ভয়ে কাতর বালক সিগার তুলুস্তিত মস্তকে, নজরের পদমূলে ধারণ করিয়া কেবল অশ্রু-জলে বুক ভাসাইতে লাগিল, বালকের রুদ্ধকণ্ঠে প্রার্থনার একটি বাণীও বাহির হইতে পারিল না। কুশি-কঠোর নজর বেগ, কণিক হুর্নলতার দ্বারা নিকট রাজাদেশ স্পষ্ট ভাবায় বলিতে পারে নাই, কিন্তু স্বভাব-নিষ্ঠুর পাপাত্মার সে মোহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। বজ্র গভীর স্বরে সিগারকে উঠিতে আদেশ দিয়া সকোরে তাহার প্রকোষ্ঠ ধাণে করিল এবং তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া বাইবার জন্য আশ্রয়িক বল প্রয়োগ করিতে লাগিল। কি হৃদয় বিদারী এই দৃশ্য! দ্বারার ধন জন, সম্পদ সজ্জন, সমস্তই গিয়াছে, বসন্ততমা পত্নী পরলোকে, তাহার বিহববেদনার বৃষ্টিক দংশনে অহুদিন মরণের অধিক বাতনা ভোগ করিতে চাইতেছে। তাহার অভাবে অপ্রাপ্তবয়ঃ পুত্রের কি অবস্থা ঘটবে সে চিন্তা মনে আনিতেও হৃৎকম্প হয়। তাহার উপরে স্তূর্ত্তিবান বসন্ততরুণী বাতক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। বক্ষলগ্ন, তরবিহীন, বালক পুত্রকে বল পূর্বক স্থানান্তরিত করিবার পর সুহৃৎই ৭৬লা বাতে তাহার মস্তক রুদ্ধবিচূত হইবে, এবং পরে সে পুত্রের দশাই বা কি হইবে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।

রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দারার জ্ঞান দুর্গতি আর কাণ্ডারও হইয়াছে কি না বলা কঠিন। অমুনয় বিনয়, অশ্রু, কাকুতি, পদপ্রান্তে পড়িয়া ধূলি-অবলুপ্তি মন্তকে সকাতির প্রাণতিকার প্রার্থনা, কিছুতেই কিছু হইল না। পাশব নজর বেগ পাশব বল প্রয়োগ করিয়া দারার আলিঙ্গনবদ্ধ পুত্র সিপারকে কক্ষান্তরে লইয়া গেল। তথা হইতে বালকের আর্ন্তরোদন-ধ্বনি মুকু-পথ-বাজী পিহার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। হায়!

মামুষ মামুষের প্রতি এতদূর নিকরুণ হইতে পারে ইহা দেখিলেও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অনিরাতি মানবের কৃৎস্নিনের নারায়ণ বাস করেন। যে জন্মে দেবতা অধিষ্ঠিত, তাহা একরূপ নিদাক্ষণ ভাবে অকরুণ কেমন করিয়া হইতে পারে তাহা মানবের সঙ্গীত বুঝর অতীত।

ক্রমশঃ

ঐজগদিশ্রনাথ রায়।



শিশু দারা সহ সাধুসঙ্গীণে সঙ্গীত শালাহান

শুশ্রূষা ও তৎপরবর্তীকালের মথুরা (পূর্বামুসৃতি)

শুশ্রূষা সম্রাটগণের শিল্প-লেখা ও তাম্রশাসনাদি হইতে, ইহাদিগকে 'পরম ভাগবত' অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া জানা যায়। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সোডাস ও রথুনের পুত্র যুব সেন প্রভৃতি ছই একজন শক সম্রাট এইরূপ "পরম ভাগবত" ছিলেন। ইহাদের কথা পরে বলিব।

ভাগবতগণের মধ্যে অনেকের মূর্ত্যায়, "পদ্মহস্তা পদ্মহস্তা চ পটোৎকিষ্ঠ বটপ্লুতা"—ছই দিকে ছইটি হস্তী তত্তে কলসী ধরিয়া, কলসোপরি উপবিষ্ট। কমলহস্তা ত্রী বা লক্ষ্মীদেবীকে অতিবেক করিতেছে, এইরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে। শুশ্রূষা সম্রাটেরা অনেকেই উত্তর ভারতের নানা স্থানে বিষ্ণু মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এবার আমরা মথুরার শুশ্রূষা সম্রাটগণের কি কি নিদর্শন (Relic) পাওয়া গিয়াছে তাহাই বলিব। আগরজঙ্ঘের (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) মথুরার একটি উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত তথাকার প্রধান দেবতা কেশবদেবের জুশোভন মন্দিরটা তাহার, তাহাই ভিত্তির উপর এতী মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই টিলার উপর স্থাপন যুগে কংসের কারাগার ছিল। তথার দেবকীর গর্ভে ঐক্কক চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে ঐক্ককের প্রপৌত্র বজ্রনাভ এই টিলার উপর জয়কালীন আকারের অমুরূপ কেশব নামে একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করেন। প্রায়তত্ত্ববিৎ জেনারেল কানিংহাম সাহেব ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সেই মসজিদের প্রাঙ্গণে কটকের নিকট বসান শুশ্রূষা লিপি খোদিত একখানা পাথর কলক আবিষ্কার করেন। * সেই পাথর কলকখানা মাপে ১১" x ১১"

* অণোক, হুণান, শুশ্রূষা ও পালরাজগণের খোদিত শিলালেখ এবং কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি অস্থলীভূত ও আলোচনা



মথুরার প্রাচীন হরগৌরী মূর্তি

ইহা। ইহার গায়ে ত্রীশূল, বটোৎক চণ্ড, চন্দ্রশূল

করিয়া লিপিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন যে, 'প্রায়' ৩৪ শত বৎসর অন্তর ভারতীয় লিপি বা অক্ষরের হ্রাস ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া দেবনাগর ও ব্রাহ্মী বর্ণমালা বর্তমান আকারে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অক্ষরের হ্রাস দেখিলেই মূর্তিতে পারেন যে, সে লিপিগুলি কোন্ যুগের লিপি, বা খোদিত। এখন মূর্ত্যবস্তুর কানে পড়িয়া বোঝায় তাহাদের আর রূপান্তর ঘটিবে না।



মথুরার দক্ষিণে নিম্নবনে প্রান্ত পাথার শিল্পের তিনটি মূর্তি। মধ্যে তপস্ক্রিষ্ট বৃদ্ধদেব,
দক্ষিণে বিভক্‌নুভার বৃদ্ধদেব, বামে দ্যাবী বৃদ্ধদেব

(১ম) ও সমুদ্রগুপ্ত পর্বাত চারিজন গুপ্ত সম্রাটের নাম লেখা আছে। যথা—“মহারাজ ঐশ্বৰ্য্য প্রাপ্তোজ্ঞ মহারাজ ঐশ্বৰ্য্যোৎকট পৌত্র মহারাজাধিরাজ ঐশ্বৰ্য্য-গুপ্তপুত্র মহারাজাধিরাজ ঐশ্বৰ্য্যগুপ্ত পুত্রোদত্ত দেব্যাসমুৎপন্নেন পরমভাগবতেন মহারাজাধিরাজেন” (সেই পুর চন্দ্রগুপ্ত ২য়)। পাথরখানা আরও বড় ছিল, তাহাতে অপর যে সংলগ্ন কথা লিখিত ছিল, তাহা মসজিদ নির্মাণকালে ভাঙরেরা হানানসই করিবার নিমিত্ত, সেই পাথরখানকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। মসজিদের প্রাঙ্গণে বসান এই গুপ্ত নামাক্তিত পাবাণখানি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের অসুমান হয় যে, এখান হইতে কেশব মন্দিরের গাছে বা দ্বারপার্শ্বে সংলগ্ন ছিল। সম্ভবতঃ গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে কেহ কেশবদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়া নিজ পূর্বপুরুষগণের নামাক্তিত করিয়া থাকিবেন। আবার ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ফুহার সাহেব মসজিদের অনতিদূরে উত্তর পশ্চিমদিকে ভূগর্ভ খনন করিয়া বৌদ্ধ মঠের কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ ও একটি বৌদ্ধ স্তম্ভারামের পরিক্রমাপথ আবিষ্কার করিয়া-

ছেন। সে পথটা মসজিদের নিম্ন দিগা চলিয়া গিয়াছে বলিয়া খনন কার্য্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, একটা বৌদ্ধ স্তূপের উপর গুপ্ত রাজাদিগের কেহ না কেহ কেশবদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। পরে আওরঙ্গজেব মন্দিরটিকে মসজিদে পরিণত করেন। সেই গুপ্ত নামাক্তিত পাবাণখানি আজিও মথুরার বাহুবরে রহিয়াছে। বাহুবরে ইহার নথর কিউ ৫ (Q 5) প্রস্তরস্থবিং ভোগেল সাহেব বলেন, এই পাবাণখানি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আদেশে খোদিত, তিনি “পরম ভাগবত” অর্থাৎ বিকৃতকৃত। খনিত স্থানটা আর বন্ধ করা হয় নাই। যে কেহ ইচ্ছা করেন দেখিতে পারেন। এই খনিত স্থান হইতে অল্পদূরে একটি বহু পুরাতন কুপের মধ্য হইতে কানিংহাম সাহেব অপর কতকগুলি ধ্বংসাবশেষের সহিত একটি ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ দণ্ডারমান বুদ্ধমূর্তি ও অপর একটি ছোট উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি উত্তোলন করেন। দণ্ডারমান মূর্তিটির পাদপীঠে গুপ্তাকরে লিখিত আছে যে অরুণী

নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সেই মূর্তিটিকে ২৩০
শতাব্দীতে (৫৫০ খৃঃ) বশোবিহারে দান করিয়াছিলেন । *
উপবিষ্ট মূর্তিটার ওলে গুপ্ত লিপি আছে, কিন্তু লেখাটা
অস্পষ্ট ও সমাপ্ত হয় নাই। [২খুরার ১৯ মাইল



বথুরার প্রাপ্ত গণেশমূর্তি

দক্ষিণ দিকে কালেক্টরের কাছারীর নিকট আমালপুর
নামক স্থানে হবিকের নির্মিত একটা ভগ্নবিহারে

এই বশোবিহার শব্দ হইতে আসিয়া বুঝিতে পারিভেছি
যে, এই ভেশব দেবের ভূগতীতে হউক, অথবা ইহার
সম্বন্ধিত কোন স্থানে বৌদ্ধ মঠবিহার বশের নামে একটা
বিহার ছিল। সম্রাট অশোকের গুরুর নাম উপগুপ্ত, তাহার
গুরুর নাম বশঃ। ইহার নাম আত্মরূপে দুই একবার
উল্লেখ করিয়াছি। ইনি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বথুরার
বাস করিতেন।

মুক্তিকা মধ্য হইতে ৭ ফুট ৩ ই: উচ্চ স্থানর অপর
একটি দণ্ডারমান বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দক্ষিণ
হস্তটি তাম্রিঙ্গা গিয়াছে বামহস্তে বসনগ্রাণ্ড ধরিত্বছেন।
তাহার পাদপীঠে সংস্কৃত ভাষার গুপ্তাক্ষর চইছয়ে
লিখিত আছে—বশোদিত্য নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু
কর্তৃক সেইটা পিতামাতা, আচার্য্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি
ও সর্বগ্রামীর হিতাকাঙ্ক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। অপর একটি
দণ্ডারমান বুদ্ধমূর্তির পাদপীঠে সংস্কৃত ভাষার গুপ্তাক্ষরে
লিখিত আছে, দেবতা নান্নো একজন বিহার স্বামিনী
১৩৫ শতাব্দীতে (৪৫৫ খৃঃ) “যদজ্ঞ পুণ্য” ভবতু
মাতাপিতোঃ সর্ব সন্তানং হিতার” দান করিয়াছেন।
গুপ্ত সম্রাটগণের সময়েও যে বথুরার বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত
হইত, এগুলি তাহার অঙ্গাঙ্গ প্রমাণ।]



ভগ্নমূর্তির মণ্ডলা মূর্তি চক্ৰহতা বৈকবী শক্তি,
উত্তর পার্বে সহচরী, পদতলে গরুড়, বথুরা
কংস টিলার প্রাপ্ত।



মধুরার আশ্রিত শুশ্রূষার বিকৃষ্ট উত্তর
পার্শ্বের লক্ষী সঙ্কল্প



মধুরার আশ্রিত শুশ্রূষার আত্মাত্মিক মজার উপবিষ্ট হর্গাধর্গি
উত্তর পার্শ্বের কার্তিক ও পূর্ণ, শীর্ষে লৈলী ভীষ্ম

শুশ্রূষার নামাঙ্কিত আশ্রিত শুশ্রূষার নামাঙ্কিত
শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় শুশ্রূষা-সম্রাট শুশ্রূষা-দ্বিতীয়ের কথা বলব।
ইনি (৩৭৫—৪০০) খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া
ছিলেন। ইহার উপাধি বিজয়াদিত্য। ইনি মাদ্র
ও সোরাষ্ট্র হইতে শক-সম্রাট দিল্লীকে বিতাড়িত করিয়া
শিহুসাম্রাজ্যের পরিধি পশ্চিমে আরব সাগর পর্য্যন্ত
বিস্তৃত করেন। সেই ক্ষুদ্র ইহার সময় হইতে
আরব সাগর দিয়া জলপথে দিল্লী ও ইউরোপের সহিত
বাণিজ্য করিবার সুবিধা হয় বঙ্গদেশও বোধ হয়
ইহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইহার সময়ে শুশ্রূষা
সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা
অবধারণ করিয়াছেন যে, কালিদাস গ্রন্থ নবরত্নের
পণ্ডিতেরা ইহারই সভা সমন্বিত করিয়াছিলেন।

ইতিহাস দেখিতে পাই যে সম্রাট শুশ্রূষা এই চন্দ্রগুপ্ত
বিজয়াদিত্য ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় নগরীর সংস্কার
করিয়া রাজধানী তথায় লইয়া যান। কালিদাস গ্রন্থ-
বর্ণনের বোড়শ সর্গে, নিম্নোক্তকালে “বিশেষতঃ কলত্র
বেশা” ধ্বংসপ্রাপ্তর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সুখে নিজ
পুত্রের পরিতাপ ও তদ্রূপ দশরূপ বর্ণনা দিয়া চন্দ্র-
গুপ্ত কর্তৃক অবস্থায় সংস্কার হইল তাহা মহাকবি
হরিশ্চন্দ্রকে দেখিয়া থাকিবেন। এ কাণ্ডেই ইন্দুমতী
স্বয়ং প্রদর্শন তিনি মধুরার নীপবংশীয় গ্রন্থে নামক
একজন রাজার নাম করিয়াছেন। তাহা কালিদাস
বা ইতিহাসিক কোন লোকের নাম কিনা বলিতে
পারিলাম না। কবি, ইন্দুমতীর স্বয়ংস্বয়কালে সুনন্দা সুখে
মধুরা ও যমুনার তৎকালীন শোভা সম্পদের এক-
খানি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন, এবং বৃন্দাবনকে
কুবেরের চিত্রবর্ধী উজ্জ্বলতার সহিত তুলনা করিয়াছেন।
গোবর্ধন জাহাজ বর্ষাকালে যমুনেরা অবধি নৃত্য

করিত বাহা বলিয়াছেন তাহা
আলিও দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ
কেহ কালিদাসকে মালব-পতি
বশোদধর্মদেবের সত্যাসন বলিয়া
থাকেন। এই বিষয়ে মতভেদ আছে।
চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়ের) রাজত্ব কালেই
কাহিরান ভারতবর্ষে প্রথমে আসিয়া-
ছিলেন। তিনি পাটলিপুত্র নগরে
তিন বৎসর থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা
শিখা করেন। রাজধানী তখন
পাটলিপুত্র হইতে অযোধ্যায় স্থানান্তরিত
হইয়া ছিল, কাহ্নেই পাটলিপুত্রের
পূর্ব গৌরব ও শোভা সম্পদ বহুল
পরিমাণে কথিত গিয়াছিল। কাহিরান প্রায় ছয় সাত
শত বৎসর পূর্বে অশোক কর্তৃক নির্মিত স্তম্ভ
পাথর রচিত প্রাসাদখানি দেখিয়া বলিতেছেন যে, সে
স্থানক শিল্পকলা-বিভূষিত প্রাসাদটি যেন মাহুকের হাতের
কাঁচ নহে, কোন দেব-শিল্পীর রচনা। তখন এই
পাটলিপুত্রে একটি মাত্র বৃহৎ স্তম্ভের সন্নিকটে, মণি-
বান ও হীনবান উভয় সম্ভ্রদ্যে মোটে ছয় সাত
শত বৌদ্ধ বতির বাস ছিল। তাঁহারা বৎসরের দ্বিতীয়
মাসে আপনাদের বৌদ্ধ দেবমূর্তিগুলিকে কুড়িখানি
রথে বসাইয়া গীত বাজ নৃত্যাদি সহকারে মহানন্দে
নগর ভ্রমণ করাইতেন। কাহ্নেই বলিতেছেন যে তিনি
যখন কপিলাবস্ত, কুশীনগর, গয়া, বৃথগয়া প্রভৃতি বুদ্ধ-
দেবের জীলা স্থানগুলি দেখিতে যান, তখন সর্বত্রই
ঐহীন, জনবিরল ও কোথাও বা বন জঙ্গল সমাকীর্ণ;
অথচ আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, সেই সময়ে
মথুরার কুড়িটি সম্ভ্রদ্য, তিন সহস্র বৌদ্ধ বতির
বাস ছিল। এবং তাঁহারা পূর্ণ প্রত্যয়ে বৌদ্ধধর্মের
অন্তর্ধান ও শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। ইহা হইতে
আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, গুপ্ত সম্রাটেরা ব্রাহ্মণ্য
ধর্ম অঙ্গলবন করাতে অযোধ্যা, পাটলিপুত্র, বিহার
প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আস্থা কমিয়া



মথুরার প্রাপ্ত ঐকমূর্তির
সংখ্যকী (Minerva) মূর্তি

গরিয়াছিল। কিন্তু মথুরার তাহা অল্প
ছিল।

এখানে আরও একটি কথা
বলিতেছি। পুণ্ড্রভন দিল্লীতে কুহ
মিনারের সন্নিকটে যে প্রসিদ্ধ লৌহ
স্তম্ভটি স্থাপিত আছে, এতদিন
সেইটিকে অনভিজ্ঞ লোকেরা কেহ
দিল্লীজা কর্তৃক রাজকীর মস্তকে
স্থাপিত যজ্ঞীয় যুগ, কেহ ভীমের
গদা, কেহ হুমানকীকা লাঠী প্রভৃতি
কত কি বলিত। এখন উহার
পাশেই লিপি পাঠে নিঃসংশয়ে জানা
গিয়াছে যে, সেই লৌহ স্তম্ভটি চন্দ্র
নামক কোন রাজার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুধ্বজ।

এই চন্দ্র নামক রাজাকে চন্দ্র গুপ্ত, কেহ বা
চন্দ্র বর্ষদ বলিয়া অনুমান করেন। আমরা
এই লৌহ স্তম্ভটিকে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের স্থাপিত
বলিয়া মনে করি। ভিন্সেন্ট স্মিথ সাহেব তাঁহার
ইতিহাসে ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে, একাদশ
শতাব্দীতে হোমর বংশীয় রাজারা এই বিষ্ণুধ্বজটিকে
বৈষ্ণব-প্রধান মথুরা হইতে লইয়া আসিয়া দিল্লীতে
স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা সাহেবের এই উক্তি
সঙ্গত বলিয়া মনে করি। পার্শ্বান সম্রাটেরাও এই-
রূপে দুইটি অশোকস্তম্ভ অনুমান হইতে আনিয়া
রাজধানী দিল্লীর শোভা বর্ধন করিয়াছিলেন। লৌহস্তম্ভটি
প্রায় দেড়শালায় বৎসর ধব্য উন্মুক্ত স্থানে অব্যবে
রোজ্য বৃষ্টির উপদ্রব সহ করিয়া আসিতেছে, তথাপি
কোথাও বিস্ময়জনক সন্নিহা ধরে নাই, পাশিষ্টা বেন
টটিকা রহিয়াছে। মুসলমানেরা কামানের গোলা
বারিয়াছিলেন তাহার দাগ রহিয়াছে, কিন্তু তাঙ্গরা
যায় নাই। ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এইটিকে
গুপ্ত রাজগণের সময়ে লৌহ শিল্পের শ্রেষ্ঠ আদর্শ
বলিয়া মনে করেন। গুপ্ত রাজারা যে বিষ্ণুধ্বজ বা
বিষ্ণুধ্বজ স্থাপন করিতেন তাহার প্রমাণ কলচুরের

এবন্ধে আরও বলিব। পূর্বেক কিকিউ পঁচ চিহ্নিত পাবাপথানি ও সেই লৌহস্তম্ভটী মথুরায় ছিল ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়, যেমন অযোধ্যা সংস্কার করিয়া তথাকার বৌদ্ধ স্তূপগুলিকে রামকোট, স্মরণীয় পর্বত, মণি পর্বত প্রভৃতি হিন্দুনামে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন, মথুরাতেও তিনি একটি বৌদ্ধস্তূপকে কেশব দেবের মন্দিরে পরিবর্তিত করিয়া থাকিবেন। শৌহনয় বিষ্ণুধ্বজটী ঐ কেশব মন্দির গ্রানিটের সমুদ্বতাবে প্রোথিত ছিল এবং গুপ্ত নামাঙ্কিত পাবাপথানিও মন্দির গায়ে সংলগ্ন ছিল, আমরা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইরাছি। ইহাই যে ক্রম সত্য তাহা বলিতেছি না, এ বিষয় ইংরাজ আমলের মথুরা প্রবন্ধে আরও বিশদ করিয়া আলোচনা করিব।

চতুর্থ সত্রাট কুমার গুপ্ত (১ম) (৪১৩-৪৫৫ খৃঃ)। ইনি পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের ভার মহাসমারোহে বিষ্ণুপ্রধান অৰ্থমেধ যজ্ঞ সমাধান করেন। ইহার রাজত্বের শেষ দিনে ভারতের উত্তর পার্শ্বতা প্রদেশ হইতে খেতহুণ নামে খাঁনানাক, কোটিরগত চক্ষু দাড়িগোক বিহীন, কাঁধ বাহির করা এক কদাকার বর্কর দল্লাদল ভারতের উত্তর প্রদেশে আসিয়া আর্ঘ্যাবর্তের নানা স্থানে প্রজাগণের ধন লুণ্ঠন ও নিৰ্যাতন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাহার এতই প্রবল হইয়া পড়ে যে ভারতের নানাস্থান তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। কুমার গুপ্তের পর পঞ্চম সত্রাট স্বকগুপ্ত (৪৫৫-৪৮০ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। খেতহুণদিগকে পরাস্তব করিয়া ক্রিয়াকালের জন্ত দেশমধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। ইহারও বিক্রমাদিত্য উপাধি ছিল। এই হুণদিগের পরাজয় ঘটনা তিনি একটি বিষ্ণুধ্বজে খোদিত করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, “ঐক্লব যেমন শত্রু কংসকে বিনষ্ট করিয়া আপন মাতা দৈবকীর নিকট গিয়াছিলেন, স্বকগুপ্তও তেমনি হুণদিগকে পরাজিত

করিয়া আনন্দাশ্রম বর্ষণ করিতে করিতে নিজমাতার নিকট উপস্থিত হইলেন।” এই বিষ্ণুধ্বজটী গান্ধিপুয়ের অধর্গত ভিত্তিারি গ্রামে আনিও নগরস্থান আছে।



গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তি

ইহার উপর শালী নামে যে বিষ্ণু মূর্তিটী স্থাপিত ছিল, সুসলম'নগণের উপদ্রবে তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। এই বিষ্ণুধ্বজের লেখা হইতে দুইটী বিষয় জানিতে পারা যায়। (১) গুপ্ত সত্রাটেরা যে বিষ্ণুপূজা করিতেন ব বিষ্ণুভক্ত ছিলেন তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। এবং (২) সে সময়ে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার ঈক্লবের আখ্যানও সে দেশমধ্যে প্রচলিত হইরাছিল তাহাও জানা গেল। এই বিষ্ণুধ্বজটী অপর কোন স্থান হইতে ভিত্তিারি গ্রামে আনীত হইয়াছে কিনা জানিতে পারি নাই। স্বক গুপ্তের পুর পুরগুপ্ত প্রতাপাদিত্য গির্গার পর্বতের নিকট বৃহৎ ব্রহ্মপার্শ্ব একটি মনোহর বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেটিতে আনিও তাঁহারই নামাঙ্কিত শিলালেখ রক্ষিত আছে। ইহার পর আদিত্য সেন অগ্গ'র গ্রামে ও ললিতাদিত্য পরিহাসপুরে (বর্তমান নাম পরম পোয়) এক একটি করিয়া বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল হইতে অনুমান করা যায় যে, গুপ্ত রাজারাই বিশেষরূপে বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বধন অস্ত্র ও অন্যান্য

বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করা হইলেন তখন শ্রীচকের অনাত্মি মথুরাতেও বিষ্ণু মূর্তি স্থাপন অনুমান করলে অসম্ভব হয় না। ইহার পর ভোক্তাশ্রম নামে অপর একজন খেতহুণের দলপতি ভারতে আসিয়া পুনরায় উদ্ভব করিতে আরম্ভ করে। তাহার পুত্র 'মহির' ওল বা 'মহির' কুল এতট বৌদ্ধ বিবেচী 'হুল' বে, হিরহুসাও, বলিয়াছেন হিরি কুল বৌদ্ধদিগের বোল হাজার সম্ভারাম, বিহার, সৈধ্য প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। বৌদ্ধ প্রধান মথুরা ইহার হস্তে কে নরূপে লাহিত হইয়াছিল কিনা তাহ ইতিহাসে পাই নাই, তবে ভোগল সাহেব প্রভৃতি হই এক জন ঐতিহাসিকের মত এই যে, মথুরা ধ্বংসের ৩৩ কেবল মুসলমানেরা দায়ী নহে, এই নগরকে হুণদিগেরও অত্যাচার সম্বন্ধে করিতে হইয়াছিল। ইহার

কর নগরের যুদ্ধে 'মহির' কুল ও হুণ দিগকে বেশ খেঁচে চিরতরে বিভাঙিত করিয়া দর্পচূর্ণ করিয়া দেন। কালিদাস রচুৎ 'মথুরা' কালে হুণ দিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মল্লনাথ টাকার হুণদিগকে 'উত্তর জনপদ বাসী কজির' বলিয়াছেন। রাজপুতদিগের মধ্যে আজিও হুণ নামে একটি শাখা আছে। মালবাধিপতি বশোধর্মদেব এই সময়ে হুণ দিগকে পরাস্ত করিয়া শকারি বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের অপর একটা গুপ্তের কথা এখানে বলিব। হিরহুসাং বলেন বালাদিত্য নালন্দার * বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুবর্ণ ও মণির মণ্ডিত একটি ৩ শত ফুট উচ্চ ইষ্টক নির্মিত সুবিশাল মঠ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি বৌদ্ধদিগেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিরহুসাং করেক বৎসর নালন্দার থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন।

ইতিহাসে মালবারাজ বশোধর্মদেবের বৈরূপ প্রবল প্রতাপের পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয় যেন বালাদিত্যের সময়ে মথুরা নগরী বশোধর্মদেবেরই অধিকারভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাই নাই।

সে বাহা হউক, ৯ম শতাব্দীর চতুর্গুপ্তের উপাধি ছিল দ্বাদশাদিত্য। বুঝাবেন এখন যে উচ্চ টিলার উপর সনাতন গোম্বারীর প্রতিষ্ঠিত মননযোগ্য জীর মন্দিরটা দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেইটিকে লোকে আজিও দ্বাদশাদিত্যের লিা বলিয়া থাকে। বরাহ পুত্রাণ দে'খতে পাই প্রাচীন সেই দ্বাদশাদিত্যের টিলার উপর একটি সূর্য্য দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বাদশাদিত্য শব্দের অর্থ—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পুত্রা, ব্রহ্মা, স'বতা, তপ, বাহা, বিবাতা বরুণ, মজ্জ, শক্র, উপক্রম এই দ্বাদশ নামধারী দ্বাদশ দাসের



দর্পণ হস্তে কোণ্ড বৌদ্ধ দেবী। কেহ কেহ এটিকে

নিরুভী বা ভাগ্যদেবী মনে করেন। স্থানীয় মুগ

পর সম্ভব শতাব্দী নরসিংহ গুপ্ত (উপাধি বালাদিত্য) ও মালবাধিপতি বশোধর্মদেব উভয়ে মিলিয়া ৫২৮ খঃ

* প্রাচীন কালে ভারতের ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ বিববিদ্যালয় বা বিদ্যাপীঠের নাম পাওয়া যায়। গণেশোত্তরের নিকট তক্ষশিলা, বিহার ও রাজগৃহের নিকট নলন্দা (বর্তমান নাম বড়নাঁও) মেঘটী পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমশিলা, গঙ্গাভীরে কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা আজিও সন্ধান হয় নাই।

১২টি স্বর্গ। সুতরাং ১২ সত্ৰাট চন্দ্রভণ্ডের দ্বাদশাদিত্য উপাধি হইতে কিংবা দ্বাদশ স্বর্গের নাম হইতে—এই টিলাটির নাম কি ভক্ত দ্বাদশাদিত্য হইরাছে, সে সন্দান কেহ দিতে পারিলেন না। কিন্তু বেশ নাম-সাদৃশ্য রহিয়াছে। আর একটি কথা এখানে বলিতে হইতেছে; শুণ্ড সত্ৰাটগণের মধ্যে ১ম, ৩য়, ৫ ও ৯ম সত্ৰেটের নাম চন্দ্রভণ্ড ছিল। দ্বিতীয় সেই যে জৌৎ ভক্তের নাম পূর্বে

উল্লেখ করিয়াছি সেইটা কোন্ চন্দ্রভণ্ডের স্থাপিত? অনেকেরই মত, রাজচক্রবর্তী ২য় চন্দ্রভণ্ড বিক্রমাদিত্যেরই কীর্তি। আমরাও তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে করি। ইহাদের পর হইতে শুণ্ড সত্ৰাটেরা ক্রমে রাজসম্পদ শূন্য ও হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্বানুস্মৃতি)

জি, আই, পি রেল পথে অনেক দূর গিয়া নিজ'ম সরকারের রেল হারজাবাদ বাইতে হয়। যতদূর স্মরণ হয় পুণা হইতে শেষ রাজ্যে যেন বাজা করিয়াছিলাম, এবং হোট্টিং জংশনে মধ্যাহ্নের আহার শেষ করি। সেক্রেটারী বাবু, ডাক্তার বাবু, আমার পাঠক পাঠিকাগণের পূর্ব পরিচিত রক্তপ্রের শশিশেখর এবং আমি এই চারিজন, "চেতুর্ভিঃ শোভনা রাজ্য" করিলাম। দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে (সে দিনে সমস্ত রেল গাড়ীই মন্থরগতি ছিল) হোট্টিংতে পহুঁছিয়া টেনে প্রাণ্ডব্য ভোজ্যের সন্ধানে বাহির হইলাম; সকলের এক প্রকার ভোজ্যে তৃপ্তি হয় না, কারণ "তিন্ন ক'চিহ্নলোভঃ" সেই ভক্ত নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী আহার্য সংগ্রহ করিয়া অঠরআলা নিবারণ করতঃ যখন রেলগাড়ীর দিকে আসিলাম, তখন দেখি আমাদের কামরার একটি সৌরবর্ণ, দীর্ঘকার, সুন্দর ও সুবেশধারী মুসলমান যুবক বসিয়া আছেন। মনটা অপ্রসন্ন হইল, কারণ আমরা চারিজনই কামরাটি অধিকার করিয়া জুথেছিলাম, অপরিসীত লোকের সমক্ষে সমস্ত কার্য্যেই বাধ বাধ লাগিবে বলিয়া লোকটির উপরে কিছু বিরক্তই হইলাম। মনে মনে কহিলাম, কেন বাপু,—আর কি কামরা ছিল না? তবে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার

উপায় নাই। কারণ দিকভাগে প্রথম শ্রেণীর কামরার ছয় জন করিয়া বসিবার নিয়ম, আমরা চারিজন মাত্র হিলাম, আরও দুই জনকে স্থান দিতে আমরা রেলের আইন মত বাধ্য, কেন না সে কামরাটি আমরা রিজার্ভ করি নাই। বিরক্ত হইবার আরও একটি কারণ ছিল—সেই ভক্তলোকটির সঙ্গে তাঁহার বিছানা, ট্রাক ব্যতীত একটি প্রকাণ্ড বাঁশের ঝুড়ি ছিল যাহা আমাদের কামরার মেঝের প্রায় এক চতুর্থাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের চারি জনের অষ্টসংখ্যক শ্রীচরণ রাখিবার স্থান পাওয়াই দুষ্কর হইরাছে। ভক্তলোকটি দেখিলাম অতিশয় বিনয়ী। আমরা কামরার প্রবেশ করিবা মাত্র সমস্তই দাঁড়াইয়া সেলাম করিলেন এবং পরিষ্কার উর্দ্ধ ভাবায়, আমাদের অনুপস্থিতিতে ককে এবেশ করা এবং প্রকাণ্ড ঝুড়ি দ্বারা কক্ষতল জুড়িয়া দেওয়ার অপরাধের ভক্ত বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গী তিনজন উর্দ্ধ উপস্থিত হইলেই মুক হইয়া বান। আমি যে উর্দ্ধতে মৌলবী তাহা বলিতেছি না, তবে কারাক্ষেপে কাব চালাইয়া দিতে পারি বটে। সকলের হইয়া আমিই আলাপ আরম্ভ করিলাম। স্রালাপে জানিলাম তিনি হারজাবাদ নিবাসী এক "মওলানা," হারজাবাদেই বাইতেছেন, হোট্টিংতে

কার্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিত্ত উর্দ্ধ জ্বলনে আমাদের চিত্তের অগ্রসরতা অনেক পরিমাণে বিঘ্নিত হইল; কিন্তু আশাপ্রাপ্তি বুলিলাম লোকটি নিরতিশয় হস্তরসিক, প্রতি কথার লোককে হাসাইতে পারেন; এই হস্ত পরিহাসের মধ্যে আমাদের পূর্ক বিরক্তির তাব কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার সন্ধান পাওয়াই হুসর।

আমরা সেদিনে আজিকার মত পলিতকেশ, গোলচর্খ বৃদ্ধ ছিলাম না। অল্প বয়সে কোতুল পূর্ণ মাঝাতেই থাকে; প্রকাণ্ড বঁশের বুড়িতে কি আছে জানিবার কোতুল বখন হুর্দ্বনীর হইল, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলিলাম। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুলিলাম তিনি আমার কোতুলে বিরক্ত মোটেই হন নাই, বরং একটু খুসীই হইরাছেন। প্রসন্ন করিবামাত্র সহস্র বদনে তিনি বুড়ির নিকটে গিয়া তাহার বন্ধনজু খুলিয়া ফেলিলেন এবং উপরের ঢাকনা খুলিবামাত্র দেখিলাম এক প্রকাণ্ডকার মোরগ তাহার মধ্যে কোন প্রকারে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। মঙলানা সাহেব হুইহতে তাহাকে কাঁট তুলিয়া বখন রেলগাড়ীর মধ্যে দাঁড় করাইলেন, দেখিলাম সেই অতিকার কুকুটটির তাজ্রুচা আমার দাঁড়িয়া থাকিলে আমাদের বক ল্পর্শ করিতে পারে। তাবিলাম এই শকুন্ত বুলি পক্ষের প্রাপ্তোজ কিংবা তদ্বংশীয় সম্প্রতি বা জটায়ুর দশ রাজির জাতি। তত বড় মোরগ আমি তৎপূর্বে ত দেখিই নাই, আজও পর্যন্ত তাবুশ “কুকুপাখী” আমার চক্ষু গোচর হয় নাই।

মঙলানা সাহেব আমাদের প্রশংসমান চক্ষু দেখিয়াই বুলিলেন, আঁরা তাঁহার সব্ব রকিত এই শকুন্ত শাবকটি দেখিয়া বিম্বিত হইরাছি এবং এই ধারণা তাঁহার মনে হইবামাত্র তিনি সগর্বে মোরগের বংশাবলী এবং গণাবলীর কথা বলিতে লাগিলেন। অসম্ভবতঃ ত্রায় তাঁহার উর্দ্ধ জ্বলন চলিতে লাগিল, সে তাবা বখাবধরূপ লিখিয়া পাঠক পাঠিকাগণের কোতুল নিবারণ করা আমার সাধ্যাতীত, কারণ কোন মতে

মনের তাব ব্যক্ত করিবার কমতা আমার থাকিলেও, তাবুশ উক্ত অক্ষের উর্দ্ধ তাবার আমার মখল নাই। যেটুকু উর্দ্ধ আমি বলিতে পারি তাহা কাণ দিয়া শিখিরাছি, অর্থাৎ শুনিয়া; — উর্দ্ধ বা কাণীয় এক বর্ণও আমি পড়িতে বা লিখিতে জানি না। একবার নাটোরের “সহর ওস্তাদ” মৌলবী সাহেবের নিকট “স্ববুক” পাঠাইতে আশ্রয় করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার মেধা, স্মৃতি, বুদ্ধি ও মনোযোগ দেখিয়া মৌলবী সাহেব আমার সব্ব হতাশ হইয়া অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া ছিলেন। মঙলানা সাহেব বলিলেন, তাঁহার মোরগ, লড়াইয়ের মোরগ অর্থাৎ উহার সমকক্ষ একই জাতীয় অস্ত্র মোরগের সহিত লড়াই করিবার জন্য এই সকল মোরগের বংশ বৃদ্ধ ও সাময়িক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহার শকুন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কজির জাতীয়।

লড়াই করিবার মোরগের কথা আমি পূর্বে শুনিয়াছিলাম; মুরশিদাবাদের নবাবী আমলে মোরগের লড়াই সেখানে প্রচলিত ছিল তাহাও শুনিয়াছি; নাটোরের পূর্ক পূর্ক মহারাজগণের সময়ে নাসি বহু পরিশ্রমে দেশ দেশান্তর হইতে এই জাতীয় মোরগ সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু আমার শৈশবাবধি সেদিন পর্যন্ত বচকে আমি ক্রান্তধর্মী মোরগের স্মৃতি দেখি নাই। মঙলানা সাহেব বলিলেন উহাদের সূত্র নাকি অত্যন্ত অধিক, এমন কি শুনিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। সময়ে সময়ে সংস্র সূত্রাং অধিক দিয়া কিনিতে হয়, কারণ উহাদের সংখ্যা নাকি বড়ই কম। তাঁহার কথা শুনিয়া তাবিলাম ‘মানব’ প্রভৃতি অতিকার জন্ত যেমন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বুলি বা এই অতিকার বিহবংশও এককালে লুপ্ত হইয়া বাইতে পারে। তাঁহার নিকট শুনিলাম নিজাম সরকারে এইজাতীয় কচেকটি “সমর শকুন্ত” রহিয়াছে, বিশেষ িণেব দিনে নিজাম বাহাদুরের ইচ্ছা হইলে ইহাদের লড়াই হইয়া থাকে। বুদ্ধকালে উহাদের পায়ে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাধিয়া দেওয়া হয় এবং সেই

ছুরিকার আঘাতে প্রতিপক্ষ বিক্রম হইয়া রক্তস্রাবে মরিয়া যায়। আমাদের বালাবন্ধুর আমাদের বাড়ীতে যেন এবং যুগযুগের লড়াই হইতে দেখিচ্ছি, তাহাতে যুদ্ধামনি প্রাণীদিগের মৃত্যু ঘটতে দেখি নাই। যে জীৱী ছুরিকাঘাতে বিনীর্ণবন্ধ হইয়া বিহ্বলের প্রাণান্ত হয় উহা বড়ই নৃশংস বলিয়া মনে হইল, কিন্তু মংলানা সাহেবের উৎসাহের মুখে সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে আমার সাহস হইল না।

কথা বার্তার কতদূর আসিয়াছি, করটা ঠেশন পার হওয়া গিয়াছে সে সকল দিকে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখিলাম মাঠের মাঝখানে ট্রেন দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং যন যন এঞ্জিনের বাষ্পী বাজিতেছে। মংলানা সাহেব বলিলেন “এখন আমরা নিজাম সরকারের রেলপথে চলিয়াছি, সেইজন্য গাড়ী চলিতেছে না।” আমি কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি দেখিরা তিনি কহিলেন “Ruling chief দেৱ রেলের বন্দোবস্ত এইরূপই হইয়া থাকে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। আগনি বিদেশী লোক এ সকল খবর কেমন করিয়া জানিবেন? আমরা এই দেশবাসী, সুতরাং সমস্তই আমরা অবগত হইবার সুযোগ পাই।” বহুকণ ট্রেন-খানি সেই তেপান্তর মাঠে দাঁড়াইয়া যন যন বাষ্পী বাজাইতে লাগিল, কিন্তু সে স্থান হইতে একপদও অগ্রসর হইল না। কিছুকাল পরে দেখি মাঠের মধ্যদিয়া বহুলোক একত্রে আসিতেছে এবং সেই জনতার মধ্যে দেখা গেল, আশাসোটা, ছাতা, পাখাধারী অনেক লোক আগে আগে চলিয়াছে, মধ্যে মূল্যবান পরিচ্ছদধারী একব্যক্তি অস্বাভাবিক আসিতেছেন। মংলানা সাহেব আমার “সমাচার দর্পণ”, সুতরাং তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি? তিনি দীর্ঘ হাত করিয়া কহিলেন, এই ব্যক্তি নিজাম সরকারের এক বৃহৎ তহনীলের প্রধান কর্মচারী, কার্যান্তরে কোথায় গিয়াছিলেন, বীর কর্মস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন এবং তাঁহারই লজ গাড়ী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া

বাষ্পী বাজাইতেছিল। অস্বাভাবিক যে ব্যক্তি চলিয়াছে—সে অখণ্ড আবার আরব দেশীয়—তাঁহার মস্তকো-পরি সর্পহস্ত—এ দৃশ্য আমি নুতন দেখিলাম। পাল্কি, নাল্কি, ডাম্বান্, মহাপারা ওড়তি যানে বিবাহ করিতে বাইবার সময়ে শোভাযাত্রা হয় এবং আশাসোটা আড়ানী ছাতা সঙ্গে থাকে; রাজকীয় সওয়ারীর সঙ্গে নকীব উচ্চৈঃস্বরে অবাধ্য ভাষার প্রোকাবলী অগু-ভাবে উচ্চারণ করিতে করিতে সর্পাক্ত কলেবরে সঙ্গে সঙ্গে বার ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু যোক্ত সওয়ারের মাথায় ছাতা এই ২য়ম দেখিলাম এবং দেখিরা অবাক হইয়া গেলাম। রেলের সমগ্রাঙ্গসারে নিজাম সরকারের কর্মচারী নিজের গতিবিধির সময় নিয়মিত করিবেন না, তাঁহার সমগ্রাঙ্গসারে রেলকে চলিতে হইবে, সেই জন্যই পথের মধ্যে এতগুলি যাত্রী গাড়ীতে বলিয়া ছট্‌কট্‌ করিল। ইহা সময়ের মূল্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিবার কল, এবং ইহা কেবল ধর্মজীবী প্রাচীন-বিতাগেই সম্ভব হইতে পারে। যখন কর্মচারীপ্রবর সদলবলে গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ী চলিবার সময় হইল, তখন আবার বাষ্পী বাজিতে লাগিল। কিন্তু গাড়ী চলে না। এক একবার চাকা অর্ধেক ঘুরিয়াই থামিয়া যায় এবং সমগ্র ট্রেনখানি বিধম ঝাঁকানি ধায়। আমার দিকে চাহিয়া মংলানা সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, “ইহাকেই বাদশাহী চাল বলে। শাহী লাইনের গাড়ী শাহী চালে চলিবে না ত কি সাধারণ চালে বাইবে?” মংলানা সাহেবের কথাবার্তার প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলাম তিনি শিক্ষিত এবং পরিহাসময়িক লোক; তিনি ইংরাজী ভাষা-তেনন ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই বাটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শিক্ষা কিছুমাত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় নাই।

হায়তাবাদের এক ঠেশন আগে হইজন ভ্রমলোক আমাদের গাড়ীতেই উঠিলেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ বিশেষ জাঁকাল না হইলেও দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে পরিচ্ছদের মূল্য অধিক, এবং তাঁহাদের মাথায় হায়তাবাদী টুপী দেখিরা অজ্ঞান করিলাম সরকারের সহিত

সংস্কেট বিশিষ্ট লোক হইবেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মণ্ডলনা সাহেব সসজ্জনে, গাঞ্জোখান পূর্বক সেলাম করিয়া কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথার বুঝিতে পারিলাম তত্ত্বলোকবর তদানীন্তন পেশকার (পরে প্রধান মন্ত্রী হইরাছিলেন) রাজা কিশন্ প্রসাদের সঙ্গী—রাজা সাহেব ভিন্ন গাড়ীতে আছেন। মণ্ডলানা সাহেব “কলকাতা কা রহিস্” বলিয়া আমাকে তত্ত্বলোক দিগের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। কলকাতা কা রহিস্ তুমিরা আমার কি পরিচয় তাঁহারা পাইলেন তাহা তাঁহারা বুলিতে পারেন—অন্ততঃ বিদেশীলোক হারজাবাদে বেড়াইতে আসিরাছে এটুকু বুঝিরা থাকিবেন।

হারজাবাদ ঠেশনে পহঁছিবার পূর্বে পাড়ী “হোসেন সাগর” নামক প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদের নিকট দিয়া অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে চলে; এই দীর্ঘিকার বৈধি প্রায় তিন ক্রোশেরও অধিক এবং ইহার পরিসর বোধ করি দুই মাইল হইবে; বস্তুতঃ সেকেন্দ্রাবাদ হইতে হারজাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত এই সুবৃহৎ জলাশয় হারজাবাদের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য সামগ্রী। সন্ধ্যাসমাগমে ইহার সুদীর্ঘ তটভূমি অসংখ্য আলোক স্তম্ভের উপরে বথন প্রদীপ আলিরা দেওয়া হয়, রেলগাড়ী হইতে সে দৃশ্য দর্শকের নয়ন মন মুগ্ধ করিরা দেয়। আবার সেকেন্দ্রাবাদ হইতে হারজাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ রাজবন্দী হোসেন সাগরের কূল ধরিয়া চলিরা গিরাছে, এই দীপালোকিত প্রশস্ত রাজপথ নগরবাসিগণের সাক্ষ্যবাসু সেবনের বড় মনোঃসম স্থান। তুমিরাছি হোসেন সাহ নামক নিজামের সময়ে, রাজ্যে দ্রুতগতি হস্তি উপস্থিত হয়। অংচুর আহাৰ্যের মহার্ঘতার বহু প্রজা বথন সুকায়ুখে পড়িতে লাগিল, তখন এই পরভূঃধিকার ধর্মশীল রাজ্যেশ্বর যোজন বিস্তৃত এই কৃত্রিম জলাশয় খনন করিবার ব্যবস্থা করাইরা প্রমলক দৈনিক উপার্জনে প্রজার অন্নকষ্ট দূর করিরাছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্য হারজাবাদের পুরবাসীজনের জলকষ্ট দূর হইরা গিরাছে। যেমন ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা ও ভল্লমপ।

ইহার মধ্যে হার্নে হানে কৃত্রিম দীপ নির্মাণ করা হইরাছে, কলতঃ সার্বক ইহার নাম রাখা হইরাছে “হোসেন সাগর”; ইহার তটভূমিতে দাঁড়াইরা যে দিকে চক্ষু ফিরাইয়া যায়, বিস্তীর্ণ জলরাশি এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি কৃত্রিম দীপ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। সামান্য বায়ুবেগেই এই দিগন্তরেখাচূরী দীর্ঘিকা বক্ষে তরঙ্গমালা উচ্ছ্বসিত হইরা উঠিরা সাগরেরই অলঙ্করণ করে। আজমীর, ভোপাল, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে অনেক স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাপী, সরোবর, হ্রদ, দীর্ঘিকা আমি দেখিরাছি, আমার মনে হয় হারজাবাদের “হোসেন সাগর” কাহারও অপেক্ষা হীন হইবে না, বিশেষতঃ ইহার দীপালোকিত তটবন্দী ইহাকে অতুল শোভা-সম্পদে সম্পন্ন করিরা তুলিরাছে। এই হোসেন সাগরের প্রশস্ত বক্ষে নৌকা বিহারের জন্য নিজাম সরকার হইতে অনেকগুলি দীর্ঘ লঞ্চ রক্ষিত আছে। রাজ্যেশ্বর এবং তৎপরিবারস্থ সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ হইরাই থাকে, কোন বিদেশী ভ্রমণকারী হারজাবাদ দেখিতে গিরা যদি এই বাপীবন্ধ বিহারের জন্য ভ্রমকলের নৌকা চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার সে প্রার্থনা পূরণ হইতে কোন বাধা হয় না।

আমরা পথেই স্থির করিরাছিলাম যে সম্ভবতঃ হারজাবাদে ভাল হোটেল আদি পাওয়া বাইবে না, সেকেন্দ্রাবাদ ইংরাজের অধিকারে সেখানে হোটেলের বন্দোবস্ত ভাল হইবার সম্ভাবনা, আমরা সেইখানেই নামিব এবং সেখানে হইতেই হারজাবাদ দেখিবার ব্যবস্থা করা বাইবে। তদনুসারে হারজাবাদে না নামিরা আমরা সেকেন্দ্রাবাদে নামিলাম। সচরাচর রেল ঠেশনে যেমন কুলি, মজুর সুটের ছড় হাণ্ডা থাকে, এখানেও তাহাই দেখিলাম। গাড়ী দাঁড়াইবার পূর্বেই কুলি কামরার প্রবেশ করিরা মাল পত্র ধরিরা টানাটানি আশ্রয় করিরা দিল; ভিনিষপত্র নামাইরা আমার ভৃত্যকে সেইখানে রাখিরা আমি ঠেশনের বাহিরে গাড়ীর খোঁজে গিরাছি, আসিরা দেখি

অল্পসময়ে জানিলাম, কুলি ভিনিব। মাথার তুলিয়া জনতার মধ্যে সুক্কাইত হইবার চেষ্টায় ছিল, সেই ভক্তই চাকরের সহিত গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞাপন করিলে অসম্বন্ধ প্রমাণের মত কি বলিতে লাগিল, তাহার অর্থ আবিষ্কার করা আমার সাধ্যাতীত দেখিলাম। আরও দেখিলাম তাহার বদন-নিঃসৃত স্রবাস সঙ্গক্ষে চক্ষুর্দিক আঘাতিত, বারুণী বিদূর্ণিত লোচনবহির বর্ণ, বসন্ত-বৈতালিকের নেত্রবর্ণকেও প্রায় করিয়াছে।

বাহা হউক সেখানে আর বিশেষ গোলযোগ না করিয়া ক্যোচমানের সাহায্যে মালপত্র গাড়ীতে তুলিয়া হোটেলের দিকে চলিলাম। বতনুর মনে হয় ভিটক হোটেল পেলাম, কারণ শুনিয়াছিলাম ঐ হোটেলটি নাকি সেকেন্দ্রাবাদের মধ্যে সেকালে সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেল ছিল। গিয়া দেখিলাম হোটেলের সাক্ষাৎজন হইয়া গিয়াছে কারণ আমরা বখন হোটেল পৌঁছিয়াছিলাম তখন রাজি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, এগারটা বাজিবার অল্প বিলম্ব। হোটেল লোক অধিক হওয়ার, হোটেল ওরাল তেতাগার ছাদে চাটাই এবং সামিয়ানার সাহায্যে কতকগুলি কণ্ডুর কামরা প্রস্তুত করাইয়াছে, বাহার মধ্যে চত্রে স্বর্ঘ্যের রশ্মি এবং তরুর অনারাসে প্রবেশ করিতে পারে। উপার নাই, সে রাজ্যে আর বাই কোথায়, ঐ চাটাই ঢাকা কামরাতেই আশ্রয় লইলাম। আহাৰ্যের মধ্যে পাওয়া গেল, তৃতীয় শ্রেণীর দেহসংস্পর্গ শূন্য পাউরুটি এবং সুবিকপূৰ্বগন্ধী 'চা'—বলা বাহুল্য উহা গলাধঃকরণ করা গেল না। এখানেও দেখিলাম হোটেলের ভূতপূৰ্ণ সকলেই খলিত-বাক্ এবং বারুণী-বিদূর্ণিত লোচন। পরদিন শুনিয়াছিলাম কি এক পক্ষ উপলক্ষে সে রাজ্যে সেকেন্দ্রাবাদের স্থলমানগণ (ইতর শ্রেণীর অবস্থা) মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

হোটেলের ভিত্তি, মেখর, শিখরগার গুলির চেহারা দেখিয়া আমার বিরূপ সন্দেহ হইতে লাগিল, কুলি

হইল ইহারা স্রবিকা পাইলে চুরি করিবে। আরও দেখিলাম, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া চাটাইয়ের দ্বিজপথে আমাদেরকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং হুই তিন জনে নিরবরে কথা কহিতেছে। সে কামরার আমি এবং আমার ভৃত্য ছিলাম; ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার ভৃত্যকে ডাকিয়া আমার রিতলতার বাহির করিয়া দিতে বলিলাম এবং প্রদীপ জ্বলিয়া কতকগুলি টোটা রিতলতারের মধ্যে বাতাসের ভরিতে ও বাহির করিতে আরম্ভ করিলাম, ইচ্ছা উহারা দেখে যে আমার নিকট আগ্নেয়াস্ত্র রহিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে উহা ব্যবহৃত হইতেও পারিবে। আগ্নেয়াস্ত্রের মহিমা অপার। স্বর্ঘ্যের কুস্মাটকান্তায় বনাক্ষরীয়ে নিঃশব্দ-পাদারী কৃষ্ণকার প্রেতবৎ মানব মূর্তিগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইল তাহার সন্ধান পাইলাম না; হুই একবার বাহিরে আসিয়াও দেখিলাম, কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তথাপি মনের সন্দেহ দূর হইল না—যে ছোট বাস্তবের মধ্যে নোট এবং টাকা ছিল, সেটি আমার উপাধান নিয়ে রাখিলাম, কিন্তু ঘুমাইলাম না। রিতলতার হাতে লইয়া বসিয়াই রহিলাম। ভৃত্যকে ঘুমাইতে বলিলাম, ইচ্ছা রহিল শেষ রাজিতে তাহাকে জাগাইয়া দিয়া আমি নিদ্রা বাইব। ভৃত্য অকাতরে নিদ্রা ঘাইতে লাগিল। রাজি শেষে তাহাকে জাগাইবার কথা, কিন্তু বেচারার গভীর নিদ্রা দেখিয়া তাহাকে জাগাইতে ইচ্ছা হইল না, কারণ জাগিল, পথে বাহির হইলে বেচারাদের শরন ভোজনের কোন নিয়ম বা পারিপাট্য থাকে না, পরিশ্রান্ত দেহে আর অনাহারে ঘোর নিদ্রার অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। রাজিও আর অধিক নাই, অবশিষ্ট রাজিটুকু আমিই জাগিয়া রহিলাম। প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, তাহাকে লব্ধ জাগাইবার জন্য সে বড়ই অসুযোগ করিতে লাগিল। আমি চা আনিবার জন্য তাহাকে হোটেলের ভৃত্যের নিকট পাঠাইয়া, হাত দুখ ঘুইয়া প্রস্তুত হইলাম।

প্রাতে দিবালোকে আমার চাটাই বেষ্টিত কামরার

শোভা সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠ দেখিরা হোটেলগুলোকে মনে মনে প্রচুর অধীক্ষা করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিলাম, সেখান হইতে স্থানান্তরে বাইতে হইবে। স্থান পরিবর্তন করিবার অল্প কারণও ছিল—সেকেন্সাবাদ হইতে হারজাবাদ সহরের দূরত্ব প্রায় ছয় সাত মাইল, নিত্য ছই বেলা এত দূর পথ গমনাগমন অস্বস্থিজনক, বোড়ার গাড়ীতে গেল এক ঘণ্টারও অধিক সময় লাগে, রেলের যাত্রারত করিতে হালে নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীকার থাকিতে হয়, কোন কারণে একখানি ট্রেন ধরিতে না পারিলে হয়ত সে বেলা আর যাওয়াই ঘটে না। অস্বস্থান করিয়া জানিশান, হারজাবাদে অতি উত্তম হোটেল রহিয়াছে এবং অনেক ভ্রমালোক সেই হোটেলেই থাকে; হোটেলটি নতুন খুলিয়াছে বলিয়া মারের গাইডে তাহার কোন সংবাদ নাই। বেলা দশটা আশ্চর্য সময়ে মধ্যাহ্নের আহ্বার শেষ করিয়া আমি এবং সেকেন্সাবাদি বাবু বোড়ার গাড়ীতে হারজাবাদ যাওয়া করিলাম, ডাক্তারবাবু শিশিগেহর এবং ভৃত্যকে হেটেগে জিনিব পত্রের পাহারার রাখিয়া গেলাম।

সেকেন্সাবাদ সহর ছাড়াইয়া হোসেন সাগরের তীর বাহিয়া যে পথ গিয়াছে, সেই পথে গাড়ী চলিল। বিস্তীর্ণ জলাশয়ের শোভা দেখিতে দেখিতে দীর্ঘপথ কেমন করিয়া অতিবাহন করিলাম বুঝিতেও পারিলাম না, একেবারে হারজাবাদের হোটেলের দ্বারে গাড়ী উপস্থিত হইল।

চান্দরবাট নামক সহরের একটি উৎকৃষ্টতম অংশে পূর্বকালে নির্মিত সরকারের কোন পদস্থ লোকের একটি মনোরম গৃহ ছিল, সিঃ বুরি নামক ইটালিয়ান হোটেলগুলা সেই গৃহ ক্রয় করিয়া বা তাড়া লইয়া এই হোটেল খুলিয়াছে। এই হোটেল গৃহের কক্ষগুলি প্রশস্ত, অলিন্দ গৃহকুটির সমস্তই খেত কক্ষ মর্দরে বিনির্মিত, ভোজন গৃহ, স্নানাগার সমস্তই মর্দরাতীর্ণ—এক কথায় এই হোটেলের ভুলনার সেকেন্সাবাদের তদানীন্তন ডিউক হোটেলকে নরক

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গাড়ী বাধ্যতায় গাড়ী বাইবা মাত্র সত্রীক বুরি সাহেব সহাত বদনে গাড়ীর নিকটে ‘কন্টিনেন্টাল’ প্রকার অভিবাদন করতঃ নামিতে বলিলেন। আমরা নামিয়া আমাদের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিলামাত্র বুরি সত্রী হোটেলের কক্ষ কক্ষ আমাদিগকে লইয়া গিয়া সমস্তই দেখাইলেন। সেই দিবস সন্ধ্যার পূর্বেই আসিব বলিলে, আমাদের কিরিয়া বাইবার এবং আসিবার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট কেটন গাড়ী এবং খেত বর্ণের আরব জুড়ী দিলেন এবং মালপত্র বহিবার জন্য একখানি বন্ধ লরি গোছের গাড়ীও দিলেন, সঙ্গে হোটেলের একজন ভৃত্য সেল যে মাল পত্রের হেফাজত করিবে।

সেকেন্সাবাদে অপরাহ্নে কিরিয়া গিয়া পূর্ব রাত্রি এবং সে দিনের বিল দিতে বলিলে, ম্যানেজার সাহেব আসিয়া ভাল কক্ষ দিবেন এবং আমাদের আরামের জন্য বাহ্য কিছু আবশ্যক সমস্ত ব্যবস্থাই হইতে পারিবে বলিয়া অনেক প্রলোভন দেখাইলেন। কিন্তু এক রাত্রির অভিজ্ঞতাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, আর কথায় “ভবি ভুলিবার নহে।”

আমরা সৌজন্যের সহিত বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমাদিগকে রাখিবার জন্য তাহুণ চেষ্টা করিবার কারণ এই যে, হারজাবাদের বুরি সাহেবের হোটেলে বাহারা থাকিতে পারে তাহারা নিশ্চয়ই অবস্থাপন্ন শোক ইহাই তাঁহার ধারণা। বস্ততঃ বুরির হোটেলে অবস্থান ব্যয়সাধ্য বটে, কারণ বোম্বাইয়ের তাজ হোটেল থাকিতে বর্তমান ব্যয় বাহুল্যের দিনে যে টাকার প্রয়োজন, সে দিনে বুরির হোটেল তদনুপেক্ষা অধিক ব্যয় লাগিত। তন্নিমিত্ত সে হোটেল এখন উঠিয়া গিয়াছে। বৈদেশিক ভ্রমণকারী বৎসরে একবার হারজাবাদ দেখিতে যায়, তাহাও প্রতি বৎসর নহে, সেরূপ অবস্থার প্রাসাদভুল্য রাজকীয় ব্যবহার হোটেল দীর্ঘকাল চলিতে পারে না; বাহ্য হউক আমাদের শুভাদৃষ্ট যে সে সময়ে হোটেলটি ছিল, নতুবা ডিউকের পোগৃহে প্রাপ্ত হইত।

আমরা মাল পত্র সহ সেই দিবস সন্ধ্যায় আসিয়া

বুড়ি এবং তৎ গৃহিণীর নিরাপন্ন আশ্রয়ে উপস্থিত হইলেন। শুক্লের তরে হাজি আগমন করিতে হয় নাই; ইহাও এক পরম লাভ।

তিনিরাহিলান হারজাবাদের অভিজাত বংশের ইংরাজি শিক্ষার শিক্ষিত নব্য যুবজনের নির্বন্ধাতিশয্যে ইটালিয়ান বুড়ি হোটেল খুলিয়াছিলেন; প্রতি সন্ধ্যায় বহু মুসলমান যুবক হোটেলে আহাৰ করিতে আসিতেন। তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে ইংরাজি, যোগা এইভুক্তি নানাবিধ ভোজ্য ও পের ঐক্য হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ হইতও, তথাপি হোটেলের প্রত্যহ পান ভোজন করিতে আসিবার কারণ বুঝিতে পারি নাই।

বাংলা দেশের হিন্দু সমাজস্থ নব্য যুবকগণঃ হোটেলের আহাৰের কারণ কতকটা বুঝিতে পারা যায়। হারজাবাদের মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে সে সকল হেতু প্রযোজ্য নহে, তবে বোধ করি বাহিরে গিয়া আহাৰ করিবার মধ্যে একটা নুতনত্ব আছে এবং প্রত্যহ বহু বান্ধবের সহিত একত্রে পান ভোজন করিবার একটা আমোদের প্রলোভনও কম নহে, সেই জন্যই হয়ত তাঁহারা এই ইংরাজি ধরণের হোটেল প্রতিষ্ঠিত করাইয়া থাকিবেন। এই হোটেলকেই তাঁহারা ক্লাবের মত ব্যবহার করিতেন; সন্ধ্যা হইতেই সকলে এখানে সমবেত হইয় হাসি তামাসা গল্প খেলা আরম্ভ করিয়া দিতেন এবং বধা সময়ে খানার ঘণ্টা পড়িলে তাঁহারা সকলে একটি পৃথক কামরায় গিয়া ভোজনে বসিতেন। আহাৰও যেমন অগ্রসর হইত, হাত্তরবও বর্ধিত ও তেমনি উচ্চতর গ্রামে গিয়া পঙ্কহিত, কক্ষান্তর হইতে আসিয়া সে সকল স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।

অৰ্ধশতাব্দী অভিজাত বংশের সন্তানগণ হোটলে নিত্য পান ভোজনের জন্য আগমন করেন সেই জন্য বুড়ি সাহেব প্রত্যহ পূর্ণা হইতে ফল, বোম্বাই হইতে পম্ফ্রেট মন্ত এবং আঃরাণাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে আঙ্গুর ইত্যাদি বেখানে বাহা কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা আনাঃতেন এবং তাঁহারা দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান-বীনা জন্মগত গৃহিণীর উপরে আগন্তুক অতিথিগণের

সৎকারের ভার দিয়াছিলেন। সকল ব্যবসাতেই ইটালোপীরগণ সর্বোৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ হোটেল চালাইবার ব্যাপারে ইহারা অদ্বিতীয় বলিয়া মনে হয়। বুড়ি এবং বুড়িগরী হোটেলের সকল অতিথিকে সমান বহু আদর করিতেন। পান, ভোজন, শয়ন উপবেশন, বান বাহন, কোন বিষয়ে কোন প্রকার অসুবিধা কোন ব্যক্তিকেই ভোগ করিতে দিতেন না। বুড়ি দম্পতীর কায়মনের অবিচ্ছেদ্য বন্ধ সেই সুদূর বিদেশেও সকলেই যেন গৃহের আশ্রয় উপভোগ করিতেছি এই ধ্রুপদ মনে হইত। হারজাবাদে আমরা তিন সপ্তাহকাল ছিলাম, এক দিনের অন্তঃ মনে হয় নাই যে অপরিচিত বা অনাখ্যার লোকের মধ্যে দিন কাটিতেছে। বুড়ি পত্নীর নিজ ব্যবহারের জন্য যে রবার টাঃরার তিষ্ঠোঁরিয়া এবং খেত আরব ছুড়ি ছিল, তিনি তাহা আমার ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন; সেজন্য হোটেলের অপরাপর ইংরাজ, ফরাসী, আরমান, কথ পৰ্বাটকগণ যে হিংসার অগ্নি বাইত তাহা তাহাদিগের ক্ষুদ্র বক্র দৃষ্টিতেই বুঝা বাইত। আমি তাহাদিগকে ভাল করিয়া আলাইবার জন্য, তাহাদের সমুখ দিয়া সাহস্কারে গাড়ীতে উঠিতাম এবং সেইসে কোচম্যানের প্রতি নিজের ভৃত্যের ভার হুকুম জারি করিতাম। কোন দিন বা উহাদের সমক্ষে বুড়ি এবং তাঁহার পত্নীকে আমার সমতিব্যাহারে সাক্ষা ভ্রমণে বাইবার জন্য সন্নিবেশ অস্বাভাব্য করিতাম, বলা বাহুল্য সে অস্বাভাব্য উপেক্ষিত হইত না। সেই সকল ইটালোপীর পৰ্বাটকগণ এরূপ স্পষ্ট ভাবে তাহাদের ঘেব প্রকাশ করিত যে, বুড়ি এবং তাঁহার গৃহিণীও তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন এবং বুঝিয়া আমার মতই তাঁহারাও আমোদ উপভোগ করিতেন। কখন কখন বুড়ি গৃহিণী একটি বাটন হোল (button hole) আনিয়া আড়ম্বর সহকারে গিন দ্বারা আমার কোটে পরাইয়া দিতেন, সে দিন ইটালোপীরগণের নেত্র হইতে বিদ্যাবৎকি বিনির্গত হইয়া আমোদের উত্তরকেই তন্দ্র করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিত। বোধ করি তদ্রতবাসীর

প্রতি ইউরোপীয় সম্প্রদায় এই বন্ধুৎসলতা অপর ইউরোপীয়ের চক্ষু শূল হইত, নতুবা অন্য কোন হেতুই খুঁজিয়া পাইতাম না। আমার বয়স তখন অল্প, অপরকে “আলাতন” করিয়া একটু আঘাত হইত, সেইজন্য আড়ম্বরের সহিত ঐ সকল কার্য্য করিতাম, আমি হস্ত বা অবসর উপস্থিত হইলেও অপরকে অকারণ ক্লেদ দিয়া আঘাত উপভোগ করিবার ইচ্ছা হয় ন। আমাদের হারজাবাদে অবস্থান কালের মধ্যেই সেই সকল ইউরোপীয় নরনারীগণ আমার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সে কথা বলিতেছি।

হারজাবাদের প্রায় বাৎসরিক মর্শ্ববানী পদার্থ-দেখিবার জন্যই পাশ লইবার দরকার হয়। “ফলুকুমা প্রাসাদ,” “গুরাণা হাবেগী” ও “গোলকতা কেরা” দেখিবার এবং “গোমেন সাগরে” নৌবিহার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের জন্যই পাশের প্রয়োজন ছিল। সে সকল বাহির করা বহু সময় সাপেক্ষ, কারণ কোন পাশ দ্বয় নিভান বাহাজুর, কোন পাশ বা প্রধান সচিব দিবেন; বিশেষ লোকের দ্বারা বিশেষভাবে ধরাও করিতে না পারিলে শীঘ্র পাশ পাওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। বহু ইউরোপীয় ভ্রমণকারী সেকালে বহু আক্ষেপ করিয়াও পাশ বাহির করিতে পারে নাই। আমার পাশ বাহির করিবার একটু সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেইজন্য বিলম্বের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় সে সময়ে হারজাবাদে ছিলেন, এবং সে দিনে তাঁহার কিছু প্রতিপত্তিও সেখানে ছিল। অনেক পদস্থ কর্মচারীকে তিনি জানিতেন। আমি প্রথমে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইয়াছিলাম। ডাক্তার অধোবাসী চট্টোপাধ্যায় তখন ছুটতে থাকার তাঁহার সহিত সে সময়ে পরিচিত হইতে পারি নাই; কিন্তু নিশিকান্ত বাবুর দ্বারা আমার কার্য্য উদ্ধার হইয়াছিল। তাঁহাকে “মুর্কিব” ধরিয়া বলিলাম আমাকে হারজাবাদের সমস্তই দেখাইত হইবে; আমি বাঙ্গালী আপনিও বাঙ্গালী, আমার বদেদীকে ত্যাগ করিয়া আর কাহার পরণাম হইব? তিনি আনন্দের সহিত

স্বীকৃত হইলেন। বাহাকে বেনন করিয়া ধরিয়া বখন যে পাশ বাহির করিতে হইবে সে সকল তিনিই করিলেন; আমাকে কিছুই বেগ পাইতে হয় নাই। প্রতিদানের মধ্যে নিশি বাবুকে রাজির আহার কালে নিমন্ত্রণ করিতাম। অল্প সময়ে ত্রৈব্য হানগুলি দেখিবার এই সকল ছকুমনামা যা পাশ আমরা সংগ্রহ করিতেছি দেখিরা, পূর্ব কথিত ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ আমার সহিত আগোব করিয়া লইল, অর্থাৎ দেখা হইলে আরক্ত নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, বয়ঃ স্মিতহাস্তে কুশল প্রদান করিত এবং চুই এক দিন পরে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল যে তাহাঃঃঃ আমার সমতিব্যাহারী হইতে পারে কিনা? পাশের উপরে আমার নাম এবং friends লিখিত থাকার কোন অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং আমি স্বীকৃত হইলাম। সেই সময় হইতে প্রাচীর কুককারের প্রতি প্রতীচীর গোরালী সুবতীর পক্ষপাতে ক্রুদ্ধ ঐতিহ্যগণের নরনের পূর্ব শোণিমা ক্রমে ক্রমে অভিহিত হইতে লাগিল, কোথ-গন্তীর সুখমণ্ডলের বক্ত রেখাগুলি সরল হইয়া তাহাদের সহজ স্ত্রী ধারণ করিল এবং সময়ে অসময়ে তাহাদের সহস্র কুশল প্রশ্নের জবাব করিতে করিতে আমার বাগবহু ক্লান্ত হইয়া উঠিল। বুরি গৃহীণী তাঁহার বদেদীগণের এই অকস্মাৎ তাবাস্তর লক্ষ্য করিতেছিলেন। আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা জানিয়া লইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “How mean they are, and how very selfish!” অন্তঃ কথার ভাবে বোধ হইল তাঁহার ইচ্ছা নয় যে আমি উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কোথাও বাই, অন্ততঃ আরও কিছুকাল উহাদিগকে আলাতন করিয়া একটু আঘাত উপভোগ করা হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। আমি পূর্বেরই স্বীকৃত হইয়াছি, সুতরাং উহাদিগকে সঙ্গে লইতে হইল। কিন্তু বুরি-পরী আড়ম্বরের সহিত আমার খাতির বহু পূর্বাগেক। আরও অধিক করিতে লাগিলেন। তৎকাল স্থানে তাঁহার দুটি আমার প্রতি সন্মতিক নিবন্ধ রাখিয়া তিনি বখাসস্ত্য উহাদিগকে

বিরক্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টার ি রহিলেন এবং সজ্ঞা-সমীকরণ সেবনার্থ নিত্য আমার সহিত ভ্রমণে বাহির হইতেন। কিন্তু খেতাব পুরুষগণ বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পূর্বের ভার যোব দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ

করিতে পারিত না—কুদ্র বুদ্ধি যে কোন প্রকারের বার্থই হউক, মাহুবকে বার্থক্য পরিবর্তিত না করিয়া যে ছাড়ি না।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিশ্বনাথ রায়।

বক্সিমবাবুর আমগাছ চুরি

তেজো বৎসর হইল হুগলি সহরের অন্তর্গত পিপুলপাতি নামক স্থানে, একটি পুরাতন ঘিটল গৃহ ও তাহার চারিপাশের কলের বাগান আমি জয় করিয়াছিলাম। ক্রমান্বয়ে, বাড়ীটির অর্ধ সংস্কার এবং কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন সাধন করিয়া, সেটির নাম দিয়াছিলাম “আশ্রম”—এবং তদবধি, এই “আশ্রম” আমি বসবাস করিতেছি। বাগানে অনেক অঙ্গল ছিল; মশক নিবারণার্থ সে সমস্ত আমি সাফ করাইয়া ফেলি, তা ছাড়া ভাল ভাল করেকটি কলবান বৃক্ষ রাখিয়া, বাকী সমস্ত গাছ পালারও উচ্ছেদসাধন করি।

এই বাগানের একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র আশ্রমবৃক্ষ ছিল; ক্ষুদ্র বলিয়া, এবং বাড়ী হইতে দূরে বলিয়া, সেটি কাটানো আবস্তক মনে করি নাই—তাই সেটি রক্ষা পাইয়াছিল। পার্শ্বস্থ অস্তিত্ব বৃক্ষ সকল অপসারিত হওয়ার, প্রচুর স্থান ও আলোক লাভ করিয়া, একবৎসর মধ্যেই গাছটি অনেক বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসরে উহাতে ৫০টি ফল ধরিল। পাকিলে, ফলগুলি কামিনীকপোল-কল্প রক্তাভ পীতবর্ণ ধারণ করিল; সেগুলির স্বাদ গ্রহণ করিয়া, মুগ্ধ হইলাম। কয়েক বৎসর পূর্বে লক্ষ্যে পিয়া সেখানে “দশেরী” আম খাইয়াছিলাম, এগুলি

সেই “দশেরী” জাতীয় বলিয়াই মনে মনে সন্দেহ হইল। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে দশেরী আম মাঝে মাঝে দেখা যায়, টাকার ২০টি করিয়া বিক্রয় হয়। বাস্তবিক “দশেরী”কে “আশ্র-সম্রাট” বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একদিন আমি গৃহের বারান্দার বসিয়া ভান্ডার সেবন করিতেছি, আমার প্রতিবেশী বৃদ্ধ —“বাবু আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কি মশার, দশেরী আম কেমন খাচ্ছেন?”

আমি বলিলাম, “বাগানের প্রান্তে ঐ যে আম গাছটি, ওটি কি দশেরী আমের গাছ?—আম খেয়ে, আমার কিন্তু ঠিক সেই সন্দেহই হয়েছে।”

বাবুটি বলিলেন, “হাঁ, ওটি দশেরী আমের গাছই বটে। ও গাছটির চারা, বক্সিমবাবু লক্ষ্যে থেকে আনিয়াছিলেন; কাঠালপাড়ায়, তাঁর বাড়ীর বাগানে পুতেছিলেন। সেইখান থেকে ওটি চুরি করে’ আনা।”

ভনিয়া, গড়গড়ার নল আমার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। মহা বিস্ময়ে আমি বলিয়া উঠিলাম, “বক্সিম বাবুর গাছ! তাঁর বাগান থেকে চুরি করে’ আনা! বলেন কি মশার?”

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, তাই। সে বড়

মহার কাণ্ড। তখনবেল সে সব? আচ্ছ! তবে বলি
তখন।”

বুদ্ধ যে কাহিনীটি বিবৃত করিলেন, তাহা বড়ই
কৌতুকগ্রন্থ। বিশেষতঃ ইহার সহিত সাহিত্য-
সম্রাট অর্গীর বঙ্কিমচন্দ্রের ভুবনবিখ্যাত নাম বিকড়িত;
তাই, পাঠকগণের প্রবণযোগ্য হইবে বিবেচনার, আমরা
নিম্নে ইহা প্রকাশ করিলাম।

প্রত্যক্ষদর্শীর কাহিনী

বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন—

২৫ খৃস্টাব্দ পূর্বে, এই বাড়ীর অধিকারী ছিলেন
৮ম—। তিনি হুগলী কালেক্টরীতে সেরেস্তাদারের
কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আদিও হুগলীর কালেক্টরীতে
কার্য্য করিতাম এবং উত্তরে একজনে বাস
করিতাম।

এই ম—বাবু, বাগান তৈরি করিবার সখ ও
আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই সখ ও আগ্রহের
বশবর্তী হইয়াই, বঙ্কিমবাবুর বাগান হইতে
তিনি ঐ দেশের আমের কণ্ঠ চুরি করিয়া আনিয়া-
ছিলেন।

সেই সময় অর্গীর বঙ্কিম বাবু হুগলীতে ডেপুটি ম্যাজি-
স্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। তিনি আপন কাঁঠালপাড়ার
বাটীতেই বাস করিতেন এবং তথা হইতে প্রত্যহ
গলা পার হইয়া হুগলীতে আসিয়া সরকারী কার্য্য
করিতেন। পরে তিনি চুঁচুড়ার বাগাবাটী লইয়া
বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি
তখন তিনি প্রত্যহ কাঁঠালপাড়া হইতে হুগলী আসিতেন
এবং কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় বাটীতে ফিরিয়া
হাইতেন।

একদা বাটীতে কোন উৎসব উপলক্ষে বঙ্কিম-
বাবু কতকগুলি ড্রলোককে আহ্বারে অহ্বান করিয়া-
ছিলেন। অন্যান্য লোকের সহিত আমার ও ম—
বাবুরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

বর্ধাসময় [মামলা কাঁঠালপাড়ার উপস্থিত হইলাম।
আহারের পূর্বে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ একটি কক্ষে
বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবুও
তথার উপস্থিত ছিলেন।

নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে কোন একটা বিশিষ্ট ড্রল-
ব্যক্তির নিকট, বঙ্কিমবাবু লক্ষ্যের বিখ্যাত ‘দেশেরী’
আমের গল্প করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, এই
আম দেখিতে যেমন নরম-স্বচ্ছকর, খাইতেও তেমনই
সুখাদ। বলিতে গেলে ইহা বালাগার সকল বিখ্যাত
আমের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেই সঙ্গে তিনি আরও
উল্লেখ করিলেন যে, সম্প্রতি তাঁহার কোন লক্ষ্যী
প্রবাসী বন্ধুর নিকট হইতে ঐ আমগাছের একটি
কলম আনিয়া আপন বাগানে রোপণ করিয়াছেন।
বহি কখনো ঐ বৃক্ষ ফলবান হয়, তাহা হইলে তিনি
নিজে ঐ সুখাদ ফল খাইয়া ধন্ত হইবেন; এবং
বন্ধুবর্গকেও খাওয়াইয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন।

গল্প করিতে করিতে তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের
সহিত বাটার সংলগ্ন বাগানে বাহির হইলেন। এবং
সকলকে নবরোপিত ‘দেশেরী’ আমের ক্ষুদ্র গাছটি
দেখাইলেন।

ম—বাবু, দেশ-বিখ্যাত মহা ঔঁঠালগাছের সরস
তাবার এই সরস ফলের বিবরণ শুনিয়া, তাহার
আবাদ গ্রহণ করিবার অল্প লালসিত হইয়া পড়িলেন।
সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষটি কোনও ক্রমে হস্তগত করিবার
অল্প তাঁহার মনে বিষম প্রলোভন উপস্থিত হইল;
এবং কিরূপে চায়াটি হস্তগত করিবেন, তাহার
আমার সহিত তিনি গোপনে পরামর্শ করিতে
লাগিলেন।

বর্ধাসময়ে আহার শেষ হইল। বঙ্কিমবাবু
নিমন্ত্রিতগণকে বিদায় দিতে আসিলে, অল্প সকল
নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আমি
ও ম—বাবু বিদায় লইলাম না। বলিলাম, “দেশেরী
আপনার বাড়ীতে এরকম গুরুতোষনের পরে, আর
আমাদের নড়বার শক্তি নেই। এই রাজ্যে নৌকার

আমরা গণ্য পাত্র হতে পারবো না। আপনি অনুমতি করলে আমরা এই বৈঠকখানা বয়েই আক শুবে থাকি; কাল ভোরে উঠে বাড়ী বাব। তখন আর আপনার দেখা পাব না; তাই এখনই আমরা আপনার কাছে বিদায় নিয়ে রাখছি।”

বঙ্গিমবাবু আমাদের গুপ্ত অভিপ্রায়ের বিষয় অবগত থাকিয়া, এই প্রস্তাবে সহজেই সন্মত হইলেন।

শরন করিয়া আমরা তানারূপ পরামর্শ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন পরামর্শই সুক্টিবুদ্ধ মনে হইল না। কারণ প্রজ্ঞাতে উদ্ভানমধ্যে এই অতিনব আশ্রয়কটি বধাহানে দেখিতে না পাইলে, বঙ্গিমবাবু আমাদেরকেই সন্দেহ করিবেন। চোর বলিয়া ধরা পড়িলে বিলক্ষণ লজ্জিত হইতে হইবে; তা ছাড়া আমাদের চাকুরীর হানি হইবারও সম্ভাবনা।

অবশেষে মধ্যরাত্রে ম-বাবু এক সুক্টি বাহির করিলেন, এবং তাহাই সদ্ব্যুক্তি বলিয়া আমার মনে হইল। নেক্রপ করিলে আমাদের প্রতি বঙ্গিমবাবুর কোনও সন্দেহ জন্মিতে পারিবে না।

তখন গভীর রাত্রি। আমরা বিশ্রাম ও শয্যা ত্যাগ করিয়া গাভ্রোথান করিলাম। বিশ্রাম কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, চন্দ্রালোকে পৃথিবী স্নানিত হইয়াছে; দেখিলাম, সেই চন্দ্রালোকে, উদ্ভান মধ্যে, সেই বাহনীর শিশু-বৃকটি বায়ুতরে হেলিতেছে ছালতেছে।

জ্যোৎস্নালোকে অদূরে কয়েকখানি তৃণচ্ছাদিত কুটীর দেখা গেল। কুটীর গুলির মধ্যে স্থানে স্থানে কয়েকটি বিচালীতৃপ দেখিয়া আমরা অনুমান করিলাম যে, ঐ সকল কুটীর গো-অধিকারী দিগের বাস গৃহ,—তাঁহারা গরুর আহার জন্য বিচালী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। তখন আমরা সেই জন-মানব শূন্য পথ অভিক্রম করিয়া, ঐ সকল কুটীরের নিকটবর্তী হইলাম। দেখিলাম একটি কুটীরে, বেঠান প্রাচীর নাই, তৃণচ্ছাদিত ঢালার মধ্যে কয়েকটি গো-বৎস রক্ষুবৎ হইয়া রহিয়াছে।

অতঃপর প্রকৃত শ্রমিকিত্য চোরের দ্বার ম-বাবু বাহিরে প্রহার্য আমাকে নিযুক্ত করিয়া, গোহাল হইতে একটি বাছুরকে খুলিয়া আনিলেন। এবং তাঁহার উপদেশানুসারে, খড়ের গাদা হইতে আমি কয়েক আঁটি বিচালী টানিয়া বাহির করিলাম।

অতঃপর এক নিতৃত স্থানে বসিয়া, আমরা আপন আপন চরণধর অপহৃত বিচালী দিয়া বাঁধিয়া সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া কেলিলাম এবং বাছুরটি লইয়া স্থপ্তিমগ্ন সাহিত্যসম্রাটের উদ্ভানমধ্যে প্রবেশ করিলাম। গোবৎসের গলরন্ধু ধরিয়া তাহাকে উদ্ভানমধ্যে বার বার ঘুরানো হইল। নিকটবর্তী অপর একটি আশ্রয়ক হইতে কয়েকটি পক্ষ আহরণ করিয়া, সেই দশেশ্বরী চারার চারিপার্শ্বে ছড়াইয়া দেওয়া হইল। পরে ম-বাবু সেই বহু আকর্ষিত চারা গাছকে সুক্টিকার সহিত উঠাইয়া, আপন শুভ্র উত্তরীর মধ্যে সবলে সংগোপন করিলেন।

পদতল বিচালী জড়িত থাকার উদ্ভান-সুক্টিকার মানবের পদচিহ্ন লক্ষিত হইল না; পরন্তু গোবৎসের পদচিহ্ন উদ্ভান বক্ষ চিত্রিত হইয়া রহিল। অপহৃত চারার নিকট কতকগুলি আমপাতা ছড়ানো রহিয়াছে দেখিয়া সকলেই অনুমান করিবে যে, কোনও ছিন্নরন্ধু গোবৎস উদ্ভান মধ্যে প্রবেশ করিয়া, চারাটি দন্তদ্বারা উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে; এবং উঠাইবার সময় তাহা হইতে কয়েকটি পক্ষ ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

অপহৃত বৃকটি লইয়া ম-বাবু ও আমি গদার বাটে আসিয়া তরী ডাঙ্গাইয়া, পরপারে হৃদয়ীতে আসিয়া নাখিলাম। ম-বাবু তাঁহার এই বাগান বাজিতে আসিয়া, উদ্ভানপ্রান্তে বৃক্ছারা-সম্বিত এক নিতৃত স্থানে মহাবলে ঐ বৃক্ক-শিশুকে রোপণ করিলেন।

পরে এক দিন স্বর্গীয় সাহিত্য সম্রাটের নিকট ঐ বৃক্কের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তিনি কোত প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন, “ওহে, বাগানে বাছুর ঢুক গাছটা নষ্ট করে কেলেছে।”

সেই অসীম মেধাবী লোককে ঠকাইতে পারিরাছেন জানিয়া ম-বাবু মনে মনে হাসিলেন; এবং তাঁহাকে, ইহার পর, আর কেহ সম্বোধন করিবে না, তাবিয়া নিশ্চিত হইলেন। কিন্তু সেই বাহনীর যুদ্ধের স্মরণ কলের আনন্দগ্রহণ তাঁহার অন্তরে ঘটে নাই।

পরবর্তী ইতিহাস।

বুদ্ধর কাহিনী শেষ হইল। এক্ষণে, এই বাঙালি পরবর্তী ইতিহাসটুকু বিবৃত করিতেছি।

১২২৯ সালে ম-বাবু তাঁহার বড় সাধের বাগান ও বাগান মধ্যস্থ বাঙালি নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় নামক হুগলীর একজন প্রসিদ্ধ কবিব্রাজকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন।

কবিব্রাজ মহাশয় নিকটবর্তী অপর একটি বাঙালি অবস্থিতি করিয়া এ বাঙালি বিতল করিলেন; এবং ইহার অভ্যন্তর উন্নতি সাধন করিয়া, প্রায় দেড় বৎসর পরে এই বাঙালি আসিয়া বাস করিলেন। না জানি, তিনি কত আশা করিয়া এই বাঙালি নাম করিয়াছিলেন, “আশা কুটার”। তাঁহার আশা ফলবতী হইরাছিল কিনা তাহা জানি না; কিন্তু তিনি সেই মধুর “দশেরী” আত্ম যুদ্ধের কোন সংবাদই জানিতে পারেন নাই। তাহা নিভূতে বাগানের একপার্শ্বে বহু পারিপের অন্তরালে বর্ধিত হইতে লাগিল। কিছু কাল পরে কবিব্রাজ মহাশয় কঠিন রোগে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কবিব্রাজ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার

পত্নী বা পুত্র ঐই বিবাদপূর্ণ বাঙালি আর বাস করিলেন না।

স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর এক ভাগিনের ছিলেন। তাঁহার নাম, রায় কৈলাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর। তিনি জিহ্বত অঞ্চলে সরকারি পুস্তক বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অবসর লইয়া কাঁঠালপাড়া বাঙালি বাস করিতেছিলেন। যে বাঙালি তিনি বাস করিতেছিলেন তাহার ভূমি ইষ্টার্প বেঙ্গল রেলের কুক্ষিগত হওয়ার, তিনি হুগলিতে আসিয়া ১৩১৪ সালে কবিব্রাজ মহাশয়ের পুত্রের নিকট হইতে এই বাঙালি ক্রয় করিলেন; এবং ক্রীত বাঙালি আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনিও ঐ লুকাইত আত্ম যুদ্ধটি আবিষ্কৃত করিতে না পারিয়াই পরলোকগমন করেন।

১৩১৮ সালের ১২ই আষাঢ় তারিখে, পরলোকগত রায় বাহাদুরের পুত্রের নিকট বাঙালি আমি খরিদ করি। তাহার পর কি ঘটনাছিল, পূর্বেই তাহা বলিয়াছি।

এক্ষণে এই যুদ্ধ, শাখা বিস্তার করিয়া বহু কল প্রদান করিতেছে। আমি, পরিজন সহ, ঐ কলের আনন্দ গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু, স্বর্গীয় সাহিত্য-সম্রাটের উত্তান হইতে অপহৃত যুদ্ধের অনুভূতপন কল খাইয়া, আমি কি কখনও তাঁহার চরণপদে হইবার যোগ্যতাও লাভ করিতে পারিব?

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভূমিকম্পে জাপানের ক্ষতি-বৃদ্ধি

বিগত ভূমিকম্পে জাপানের কতদূর ক্ষতি হইরাছে এই লাইগা সারা পৃথিবীর একটা বিষম ইষ্টগোল পড়িয়া গিয়াছে। ভারতের বৌদ্ধমত্রে দীক্ষিত জাপান “The land of the rising sun” সমগ্র প্রচ্যুতগের মধ্যে এখন সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন দেশ। এই জাপান শুধু এশিয়াবাসী কিংবা আশিয়ার প্রতিবেশী নহে। আমরা

নাকি একসময় সেখানে উপনিবেশ পর্য্যন্ত গড়িয়া ছিলাম। কাবেই জাপানের ধর্ম এবং সভ্যতার ভিতর আমদেরও একটু গৌরব এবং স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। এজন্যই আরও আমরা জাপানের ভাল-মন্দ একেবারে উদাসীন থাকিতে পারিতেছি না।

একটা কথা সকলেই জানেন “Brotherhood

of man and fatherhood of God"। এই ছাড়া আমরা বালাকাল অবধি পাত্রীদের মুখে "universal brotherhood," "universal fraternity," "universal federation" প্রভৃতি বড় বড় অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু কয়েক বৎসর বাবৎ আর একটা কথা খুব জোরেই আসিয়া কর্ণপটে আঘাত করিতেছে—"The Great Asiatic Federation." এই জন্তই জাপানের কথা ভাবিতে গেলে সর্বাঙ্গে এই Federationএর কথাটাই মনের মধ্যে বিশেষ করিয়া ভাগিয়া উঠে। কায়েই আমাদের বর্তমান অবস্থা সবদিক দিয়া তাহারা বিবেচনা করিতে গেলে—জাপানের বিপক্ষে আমাদের আন্তরিক সহায়ত্ব হওয়াই স্বাভাবিক।

এই ভূমিকম্পের তুল্য এত বড় ভীষণ এবং ভয়াবহ ভূমিকম্প আর পৃথিবীতে কখনও হয় নাই। ভারতবর্ষের বড় ভূমিকম্পের কথা আগনারা সকলেই অগত্যা আছেন; কিন্তু জাপানের এই ভূমিকম্পের তুলনার উণী কিছুই নহে। বড় ভূমিকম্পের মধ্যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে San Franciscoতে একটা এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জেমসকাতোতে একটা হইয়াছিল, আর খুব বড় ভূমিকম্প হইয়াছিল ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে লিসবনে। লিসবনের ভূমিকম্পে আর ৫০,০০০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু জাপানের ভূমিকম্পের তুলনার ইংগা কিছুই নহে। তাই আর্ড জাপানের জন্ত দেশ বিদেশ হইতে টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল। আমাদের স্রষ্টা মে জর্জ ব্রাং নিজ তহবিল হইতে টাকা দিয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড রেডিং ভারতবর্ষের এক সরকারী ও বে—সরকারী বৃহৎ কণ্ড খুলিয়া বিলক্ষণ টাকা তুলিয়াছিলেন।

আমেরিকা, নিপনের (Nippon) অগ্ৰহার শিশুদের জন্ত সাহায্য করিয়াছেন—পাঁচ "লিটারি ডিগেস্ট"। "The Literary Digest" নামক বিখ্যাত পত্রিকা এক প্রবন্ধে এই ভূমিকম্পে জাপানের ক্ষতিবৃদ্ধি সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। "Digest" বলেন—

"There are voices, of Editors and newspaper writers, expressing confident hope of the rising of finer, safer cities on the ruins of Yokohama and Tokyo; voices declaring faith in Japan's ability to triumph over disaster, with head bloody but unbowed."

ওসাকার সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে কেবল এক টোকিও সহরেই ১, ৫০,০০০ লোক মৃত্যু মুখে পতিত, ১, ৫৮, ৭৯৯ লোক আহত ও অঙ্গহীন এবং ৩, ১৫, ৮২৪ খানি গৃহ ভূমিসং হয়। নিউ ইয়র্কের "The Japanese Times" এই দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ ক্ষতি ১২০,০০০,০০০ এক শত বিংশকোটি ডলার ধার্য করিয়াছেন।

'রেড্ ক্রস্' এবং সেক্রেটারী দ্বারা সংবাদ দিয়াছেন ইওকোহামা ও টোকিও সহরে দুই হইতে তিন লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, নগরদ্বয়ের পনর লক্ষ এবং তাহার বাহিরে আরো আর দশ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। ডিঃ এফ্ পি মুর (H P. Moore) নামক প্রাচ্যদেশের একজন বড় 'ইন্সিগুরেন্স' ব্যবসায়ী,—তিনি উক্ত দুই সহরের ক্ষতি নির্দেশ করিয়াছেন—৮০০,০০০,০০০ আশি কোটি ডলার। ঐ ক্ষতি নির্দেশ করিতে বাইরা মুর সাহেব জাপান সম্বন্ধে এই কম্বী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"The credit of Japan is exceptional. The finances of the Empire have been handled with great discretion. The world war left the Empire richer rather than poorer. Wealth was added in forms permitting increased industry and production. Money was not wasted or spent. The wealth of Japan is estimated by one authority at 23,500,000,000 dollars. A later authority gives the national wealth of Japan at 43,000,000,000 dollars. Obviously in any case, the absorption of an economic loss of 1,000,000,000 dollars or less will not take an indomitable people long. Great as the loss of life is supposed to be, it is infinitesimal when compared with the total population of the Empire, nearly 60,000,000 in Japan proper, 18,000,000 in Korea, 4,000,000 in Formosa—a total of nearly 80,000,000

people, who are among the most industrial and productive of any in the world."

'আমেরিকান' কাগজে Mr. G. W. Hinman বলেন যে, এমন কি যদি এই ছর্ষটনার সমুদ্র কতি অল্পমান ৫০০০০০০০ পঁচশত কোটি ডলার পর্য্যন্তও ধরিয়া লওয়া হয়, তবু এই কতিটা সম্পূর্ণরূপে পুণে কঠিয়া লইবার জন্য জাপানের রাজ দশ বার বৎসর সময় লাগিতে পারে। তিনি বলেন জাপান যদি এই পঁচশত কোটি ডলারকে তার জাতীয় ঋণ হিসাবেও গ্রহণ করিয়া লয়, তবু পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় কাতিদের ঋণ দ্বাধের তুলনার ইহা নিতান্ত অকিঞ্চৎকর হইবে। তিনি আরও বলেন :

"The losses of the great war left Japan almost untouched. The great cost of the war was for her less than half a billion. For the United States, Great Britain and France, it was nearly 50,000,000,000 dollars each. If she had paid in proportion to her wealth as did Great Britain, she would have expended, instead of 491,000,000, hardly less than 12,000,000,000 dollars.

"What do these figures indicate? That even now if she suffers 5,000,000,000 dollars loss by her earthquake, she still is infinitely better off financially than either England or France. In other words, Japan is scourged less cruelly by the great earthquake than the most fortunate nations of Europe were scourged by the Great War. Her prospect of recovery is therefore far brighter than theirs."

হিন্থ্যান সাহেব কেবল এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। জাপান কতদিনে তার স্বচ্ছল অবস্থা কিরিয়া পাইতে পারে সে বিষয়ে ভিজ়াসা করিতে বাইরা তিনি নিজেরই তাহার উত্তর দিয়াছেন। এই উত্তরের মধ্য দিয়া চকুর সাহেব জাপানের প্রতি বদেশীর ব্যবসারীদের লুক্ক মুষ্টি একটু আকর্ষণ করিতেও ছাড়েন নাই। হিন্থ্যান বলেন :—

"All capital in a country,—that is, industrial capital, business capital world producing capital — is supposed to be renewed every twelve years. How much that period can be shortened, under the present pressure of necessity and with the financial facilities of the world at her command, it

remains for Japan to show. Certainly Japanese enterprise will not be lacking. Surely ten or twelve years from this date will find her at least as prosperous as ever. Meantime, she will be re-building, calling for construction materials, and the world business will get the growing benefit of her recovery."

ইংলণ্ডস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূত Baron Hayashi বলেন যে কেবল টোকিও এবং ইওকোহামা ও তৎ পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই জাপানের শিল্পবাণিজ্য সমূলে বিনষ্ট হইয়া বাইতে পারে না। তিনি বলেন :—

"As an asset for restoration of the national strength, we cannot be too thankful that Osaka, the real centre of Japanese industry and business; Nagoya, a commercial and industrial centre of growing importance; the great port of Kobe and the mining districts of Kyushu, all remain intact."

ইওকোহামার বন্দরে সবচেয়ে বেশী কাঁচা রেশম রপ্তানী হয় এবং সেখানে শুধামে দেশী মাল বহু পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু শত ক্ষেত্রের উৎপন্ন কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। হাশিমো বলেন—

"The fields producing raw silk remain undamaged."

নিউইয়র্কের Mr. Adachi Kinnosuke নামক একজন জাপানী এই ভূমিকম্পটাকে একটা ছর্ষটনা বলিয়াই স্বীকার করেন না। তিনি "World" কাগজে একটি সম্বন্ধে ইহাকে "Not a Cataclysm at all" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন :—

"It is a price Japan has paid. And for two things.

"First of all, for a new, thorough-going friendly understanding with her neighbor powers, more especially with the United States. For, after this destruction of the capital city, of the greatest seaport of the Empire, and of the naval base at Yokosuka, the oldest as well as the mightiest base the Japanese Navy has, no American jingo can accuse her of sitting up nights to hatch up a suicidal war with the United States—not for twenty-five years to come, anyway.

"And, secondly, for the new capital city and its seaport that are to rise out of the ashes of the old, Tokyo is to be born again. If one is reasonable and thinks it over, it is plain that nothing short of this tremendous destruction could have been enough for the birth pains of a wonder city to rise out of the ashes."

অতএব আমরা চক্ষু দেখিতে পাইতেছি, যাহাকে আমরা অত্যন্ত ভয়াবহ দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করিতেছি, অমিতবিক্রমশালী নব্য জাপান তাহাকে পৌতাগ্যের অগ্রদূত রূপেই সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছে।

জাপান এই ভূমিকম্পের কিছুকাল পূর্বে হইতেই এক বৃহত্তর টোকিও পড়িবার জন্য উদ্বিগ্ন পড়িয়া লাগিয়াছিল, এবং ঐ কার্যের সহায়তা করিবার জন্য Prof. Charles

A. Beard নামক একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞকে আনিয়া লইয়াছিল। এই সম্পর্কে বইয়ের "Herald" নামক কাগজ বলিয়াছেন :—

"The cities now overthrown will be rebuilt according to western plans. The steel frame will be adopted as the standard. The old beauty of Japan must go, the aspect which has made it so attractive to tourists will disappear, but human life will be more secure."

কিন্তু আমরা বিজ্ঞাসা করি—জাপান কি তার জাতিগত বৈশিষ্ট্য, তার স্বাভাব্য রক্ষা করিতে পারিবে না?
 শ্রীঅবনীকুমার দে।

• The Calcutta Corporation Outdoor Employees' Association." এর সভার পঠিত।

গ্রন্থ-সমালোচনা

কেজ-কতে

শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স (৬৫ নং কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ৥০

শ্রীমান ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি ছেলেনদের জন্য অতি মনোজ্ঞ ভাবার ঐতিহাসিক গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'রাজা-বাদশা' পড়িয়া দেখিলাম, শিশু-সাহিত্যের উন্নতির জন্য এমন করিয়া এমন ভাবার এমন মনোহর করিয়া ঐতিহাসিক গল্প আর কেহ লেখেন নাই, লিখিবার চেষ্টাও করেন নাই। তাই আমি 'রাজা-বাদশা'র লেখক শ্রীমান ব্রজেননাথকে সাধারে অভিনন্দিত করিয়াছিলাম। তার পর ক্রমে ক্রমে তিনি ছেলেনদেরের জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প লিখিয়াছেন; তার কতকগুলি 'রপডকা' নামে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। সম্ভ্রুতি তাঁহার 'কেজ-কতে' বাহির হইয়াছে। বড় ইতিহাস লিখিয়া তিনি বাংলা-সাহিত্যের যে উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন, ছেলেনদের জন্য ঐতিহাসিক গল্প লিখিয়া তিনি তাহা অপেক্ষা অধিকতর কাব্য করিতেছেন,—তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস পঠের বাসনা শিশুদ্বয়ের বহুদূর করিয়া দিতেছেন। তাঁহার এই 'কেজ-কতে' অতি সুন্দর

বই হইয়াছে; ইচ্ছা করিতেছে ইহার যে-কোন একটা গল্প এখানে তুলিয়া দিয়া তাঁহার ভাব-নৈপুণ্য, বর্ণনাকৌশল ও প্রকাশ ভঙ্গীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিই। কিন্তু তাহাতে অনেকটা স্থানের দখল, তাই নিবৃত্ত হইলাম। পাঠক পাঠিকা-গণ আট আনা পরমা ব্যয় করিয়া বইখানি কিনিয়া ছেলেনদেরের হাতে দিবেন। এসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীমান বটীজকুমার সেনের অঙ্কিত প্রচ্ছদপটখানিও অতি সুন্দর।

শ্রীজলধর সেন।

স্বাস্থ্য ধর্ম গ্রন্থপঞ্জিকা

বর্তমান বর্ষের পঞ্জিকা। কলিকাতা ৪৫ নং আনহাষ্ট স্ট্রীট, স্বাস্থ্য ধর্ম সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেন্স ৪৩১ পৃষ্ঠা, মূল্য ৮/১০

সাধারণ পঞ্জিকার বাহা কিছু প্রকাশিত হয়, সেসকলও ইহাতে আছেই, অধিকতর এমন কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্যক নূতন বিষয় সম্মিলিত হইয়াছে বাহা অন্য কোনও পঞ্জিকার নাই। ইহার প্রধান নূতনত্ব, হরপার্কসী সংবাদ। এই ৫৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী অভিনব হরপার্কসী সংবাদে, দেবী পার্কসীতে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম, জীবন-রহস্য, নানা ব্যাধি এবং তাহার প্রতিকার ও প্রতিবেদ

